রাজস্থান

[প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে]

-স্বাধীন ভারতের ইতিহাস

বৃত্ত—(১) মিবার, (২) মারবার, (৩) বিকানীর,

(৫) কোটা, (৬) যশলমীর, (৭) শিখাবতী,

জয়পুর (অম্বর), (পরিশিষ্ট সহ) ।

স্বশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ সম্পাদিত

মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

পঞ্চম সংস্করণ

ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে'

মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

১৩৩১ সাল ... টাকা।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বহুসংখ্যক পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু রাজস্থান-পাঠপিপাসা অনেক মহাত্মারই পরিতৃপ্ত হয় নাই ; অনেকেই নানা কারণে তৎকালে এই রত্ন হস্তগত করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছেন। আমরা পুনঃপুনঃ সেই সকল বিদ্যোৎসাহী সাহিত্যসেবীর অনুরোধে তৃতীয় সংস্করণ রাজস্থান প্রকাশিত করিলাম। ইহাতে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত বা নূতন সংযোজিত হয় নাই, তবে ভ্রমপ্রমাদগুলির সংশোধনে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করা হইয়াছে ইতি।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পুনঃ পুনঃ সংস্করণেও রাজস্থান-পাঠেচ্ছুগণের পাঠপিপাসা প্রশমিত হইতেছে না। বস্তুতঃ ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। এই জন্য রাজস্থানের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে অনেক স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ইতি।

বসুমতী-কার্য্যালয়,
১৩১৪ সাল, ১৫ই মাঘ।

প্রকাশক ;—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

যে সকল অবিনশ্বর গ্রন্থ প্রকাশিত ও নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিয়া সৎসাহিত্য-প্রচার-ব্রত স্বর্গীয় পিতৃদেব বঙ্গসাহিত্যের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল মহাগ্রন্থনিচয়ের মধ্যে 'রাজস্থান' জাতীয়-জীবনগঠনোপযোগী একখানি মহাগ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাবলী ও বসুমতীপ্রচারকার্য্যে ব্যস্ততার জন্য ইহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশে বহু বিলম্ব হইল। এই স্বায়ত্ত-শাসন কামনার যুগে যাঁহারা স্বাধীন ভারতের বীরত্ব-গৌরবের ইতিহাস পাঠের জন্য ব্যাকুল হইয়া এই উদ্দীপনামাদর মহাগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের জন্য বারংবার তাগাদা ও অনুরোধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট আমি এ বিলম্বের জন্য অপরাধী। এত দিনে তাঁহাদের আগ্রহ প্রশমিত করিতে পারিলাম—সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাসূর্য্যের দীপ্তকিরণ-প্রভাবিত ভারতের সমুজ্জ্বল দিবসের কীর্ত্তিকলা প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। এক্ষণে জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য রাজপুত বীরত্ব-প্রভায় বাঙ্গালী-হৃদয় উদ্দীপিত—অনুপ্রাণিত—মহিমান্বিত হইলে এ গ্রন্থপ্রচার সার্থক হইবে—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির গৌরবান্বিত হইবে।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
১৩৩১, রথযাত্রা।

বিনয়াবনত—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কর্ণেল টড সাহেব "রাজস্থান" লিখিলেন কেন?

-:o:-

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক সার উইলিয়ম্ জোন্সের সংস্কৃত-শিক্ষার পূর্ব্বে ভারতেতিহাস-সঙ্কলন-কার্য্যে য়ুরোপীয়েরা একবারে হতাশ্বাস ছিলেন; কিন্তু কি পবিত্র সময়েই ইংলণ্ডের এই সুকৃতী সন্তান ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন! যে দিন আবার তিনি বিবিধ বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক সংস্কৃত-ভাষার অনুশীলনে প্রথম প্রবৃত্ত হন, সেই দিনেই বর্ত্তমানকালীন ভারত-ইতিবৃত্তের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ যে বৎসর তদুদ্যোগে "এসিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল" (Asiatic Society of Bengal) স্থাপিত হয়, সেই বৎসরেই ভারতের প্রকৃত মঙ্গল-বীজ বপনের সূত্রপাত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ২২এ জানুয়ারী "সোসাইটীর" প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ঐ কার্য্যে আমাদের টড্ সাহেব বিলক্ষণ সহৃদয়তায় ও অধ্যবসায়ে কর্ম্মক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছু পরেই টডের সে সব মহিমার পরিচয় দিতেছি। তাহার পর হইতে প্রত্ন-তত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, জীবনবৃত্তান্ত, সত্য-তথ্য ইত্যাদির আবিষ্কার ও প্রচারে মানবজাতির মহোপকারের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল। সংস্কৃত-সাহিত্যশাস্ত্র যত দূর প্রশস্ত, তাহাতে উহাকে সুন্দর, সুশোভন, মহান্, প্রকাণ্ড 'আকর' বলিতেই হইবে। এই সুপ্রকাণ্ড 'আকরে' কত শত মণি অনবরত জ্বলিতেছে, কে তাহার সংখ্যাবধারণ করিবে?

সংস্কৃত-শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রথম উদ্যমে বিদ্যামোদিবৃন্দের আশ্বস্ত হওয়ার আশা। তাহা কিন্তু ক্রমে ঔদাস্যে ও ঔদাসীন্যে পরিণত হইয়াছিল।

যাঁহারা ঘোষণা করিয়া বেড়ান, আমাদের ভারত-ইতিহাস অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, তাঁহারা ভ্রমান্ধ। একে একে তাঁহাদের উক্তি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দেখাইতেছি।

১। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, আগম, সাহিত্যাদি হইতে সারসংগ্রহ করিলেই ইতিবৃত্তের একটি বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায় না কি? কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়া বিশদ করিতেছি।

যদি কোন আধিভৌতিক বিপত্তিতে বিজড়িত হইয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসগুলির বিলোপ-দশা ঘটে, কিন্তু সাহিত্যশাস্ত্র যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলেও কি ইংলণ্ডের ইতিহাস সমুদ্ধার করা অসম্ভব প্রতীত হইবে? "চসার" হইতে "টেনিসন" পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় কাব্যাদির—গদ্য ও পদ্যগ্রন্থগুলির—মর্ম্মনিষ্কাশন করিলেই কি ইংরাজ-সমাজের এক বিশ্বাসজনক প্রামাণিক তত্ত্ব-কথা লব্ধ হওয়া যায় না? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মত, ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তন, ইংরাজ-জাতির রীতি-নীতি, আচার-রীতি, ব্যবহার-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের সামাজিক বিবরণ—ইত্যাদিই কি ইতিহাস নয়? ইহা স্বীকার্য্য যে, ঐ শ্রেণীর পুস্তকে অব্দ, মাস, তারিখ, কোন্ রাজার পর কোন্ রাজার রাজত্ব, এই কথা-কয়টির সমাবেশ থাকিল না মাত্র; কিন্তু কেবল সাল, তারিখ বা রাজ-পরিবর্ত্তন ইতিহাস নামের উপযোগী নয়। সামাজিক বিবরণ যাহাতে জানা যায়, তাহাই যথার্থ ইতিবৃত্ত।

২। "রাজতরঙ্গিণী" এক-কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সুবিশাল খনি—দৈর্ঘ্যে, উচ্চতায়, প্রস্থে সকল দিকেই সুবিস্তৃত—প্রকাণ্ড—উন্নত—গভীর।

৩। বৌদ্ধ রাজত্বের উৎকীর্ণ শিলালিপিও ইতিহাসের উত্তম উপাদান।

৪। "নীলপীত" হিন্দু নৃপতিকুলের উত্তম ইতিবৃত্ত ছিল।

৫। ভাট-গণের পুস্তকও ইতিবৃত্তের উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে প্রচুর প্রামাণ্য। তাঁহারা আবহমান-কাল মুখে মুখে রাজ-স্তোত্র নিচয় আবৃত্তি করিতেন এবং এমন কি—অধুনাও করিয়া থাকেন। সে সব কি অল্প উপকারক?

৬। "চাঁদ বর্দাই" কবির "পৃথ্বী-রাসো"—কাব্যমূলক একখানি মনোহর ঐতিবৃত্তিক গ্রন্থ।

৭। কোন ভিত্তি—কোন অবলম্বন—না পাইলে আবুলফজল কর্ত্তৃক হিন্দুরাজত্ব-বর্ণনের সুযোগ-সজ্ঘটনের উপায় হইতে পারিত কি?

এ স্থলে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বিদ্যমান-কাল-প্রচলিত রাজত্ব-ঘটনা-সংবলিত, অব্দাদি-সংযুক্ত ইতিহাস ছিল না, এমন না। তবে তাহাদের সংখ্যা স্বল্প। সেগুলি এখন লুপ্তপ্রায়।

"রাজতরঙ্গিণী" নামতঃ কাশ্মীরের ইতিহাস। কার্য্যতঃ উহা ভারতের তাৎকালিক এক মহান্ মনোহর মুকুর। ঐ মুকুরের তৎসময়ে পূর্ব্বোক্ত অভাব-দূরীকরণার্থে মধ্য-ভারতের পলিটিকাল এজেণ্ট মহাযশস্বী কর্ণেল টড সাহেব স্বীয় অসাধারণ প্রতিভায়, লোকাতীত যত্নে, অমানুষিক পরিশ্রমে রাজপুতানার ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। হিন্দুর শব-সাধনা অতীব দুঃসাধ্য কাণ্ড। টড সাহেবও যেন ঠিক তাদৃশ দুরূহ কার্য্যই সুসিদ্ধ করিয়া অমর-কীর্ত্তি ও অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া মহাযশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কি নিবিড় অরণ্যানী, কি দুর্গম অদ্রি-গহ্বর, কি দুরারোহ মেঘস্পর্শী ভয়ঙ্কর ভূধর, কি ভঙ্গীমতী উপত্যকাদি বা অধিত্যকাবলী, কি অত্যুন্নত পর্ব্বতরাজিস্থিত শ্বাপদ-সেবিত গভীর মহাবনস্থলীর বন্ধুর গিরিবর্ত্ম—অথবা বিপদ্-বহুল হ্রদ-সরোবর, নদনদী, সুদূর-প্রান্তর—ইত্যাকার বিকট স্থান অন্বেষণপূর্ব্বক ঐ বিলুপ্ত রত্নের উদ্ধারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই অসাধ্য-সাধনে মহাসিদ্ধি—অলোকসামান্য কৃতকার্য্যতালাভও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল।

টড সাহেব আমাদের এক বৈদেশিক বন্ধু। আমাদের স্বদেশীয় অনেকানেক বান্ধব অপেক্ষাও এই বিদেশীয় বান্ধব আমাদের পরম উপকারক। তাঁহার সমান অকপট অমায়িক অকৃত্রিম সুহৃদ্ সাহিত্য-ইতিহাস বিভাগে অধিক কোথায়? তিনি কেবল বৈদেশিক নহেন, তিনি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। তথাপি তিনি তন্ময়ত্বে বিভোর হইয়া যেন ভারতীয় ভারতীর অতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

বিদ্বান্, ভাবুকবর, সুচিন্তাশীল টড সাহেব অদম্য ও অসীম অধ্যবসায়ের বলে, অশেষ সহিষ্ণুতাপ্রভাবে রাজপুতানার কত বিলুপ্ত বিবরণ, বিনষ্ট বৃত্তান্ত—মহার্ঘ মাণিক্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করিতে গিয়া বুদ্ধিবৃত্তি বিপর্য্যস্ত, পর্য্যুদস্ত ও জড়তা প্রাপ্ত হয়। শত শত লুক্কায়িত প্রত্ন-তত্ত্ব ও প্রাচীন তথ্যের উদ্ধার হওয়ায় আমরা কি তাঁহার নিকট ঋণী নহি? একজন বৈদেশিকের—এতদ্দেশ-প্রচলিত ভাষায় একান্ত অনভিজ্ঞের পক্ষে ভারতীয় লুপ্ত রত্নাবিষ্কার, আর নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার—একই নয় কি? দুই-ই অসম্ভব—প্রায় দুঃসাধ্য। ফলতঃ টড সাহেব অতিরিক্ত শ্রমকর—অত্যন্ত দুষ্কর—অতীব আয়াসসাধ্য বিষয়ে করক্ষেপ করিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয়—আশার কথা,—তাঁহাকে বিফলপ্রযত্ন, ভগ্নমনোরথ বা অচরিতার্থ-মনস্কাম হইতে হয় নাই।

তিনি যদ্রূপ কার্য্যবীর, মহাপ্রাণ, কর্ম্মী মানুষ—তাহাতে কি বৈফল্য, তাঁহার কেশনখস্পর্শে সাহস পাইতে পারে? গভীর গবেষণা, অতিমানুষ উৎকট পরিশ্রম তাঁহার সিদ্ধির মহাসহায়। তদাবিষ্কৃত পুরাতত্ত্ব, বিচারগর্ভ প্রবন্ধনিচয় ও সারবান্ সন্দর্ভ-সমূহের বিরাট্ বপু দেখিলেই

বিস্ময়োদ্রেক হয়। তাহার উপর আবার গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য্য, লিপি-লালিত্য, বর্ণনা-পারিপাট্য, রচনায় সুরুচিকর কৌশল, প্রকৃত তত্ত্ব, যথার্থ তথ্য ইত্যাদির সমাবেশ দেখিয়া কোন্ স্বদেশহিতৈষীর প্রাণে আশা বারি-সেচন না হয়, বল দেখি? প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা সকলের সহজে সাধ্যায়ত্ত হয় না; কিন্তু টডের কথা পৃথক্। তিনি ঐ সূত্রসীমার বহির্গত।

বিলাতীয় প্রাচীন গ্রন্থ-তত্ত্ববেত্তাদের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, হ্যামিল্টন, মেজর উইলফোর্ড, হোরেস হেমান, উইলসন, আর্চিবিল্ড প্রাট, কর্ণেল টড প্রভৃতি প্রাধান্য ও প্রখ্যাতি-প্রাপ্ত। তাঁহারাই এখানকার বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁহাদের অমূল্য গ্রন্থাবলীর এক একখানি যেন রত্নখনি।

টডের "রাজস্থান" আমাদের বিজয়-নিশান। উহা ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ব-গৃহের এক বহুমূল্য রত্ন—বহুমূল্য মাণিক্য—অমূল্য কোহিনুর। "রাজস্থানের" সঙ্কলনে ও প্রচারণে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়। পুস্তকের উপকরণ-সঙ্কলনে তিনি কায়ার মায়া ও মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া দুর্গম স্থানে—দুর্ভেদ্য দুর্গে ও অদ্রিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হইতেন। বিবিধ শিলা-লিপি, তাম্রফলক, লৌহফলক, জয়স্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ, নানাবিষয়িণী বংশতালিকা ইত্যাদির দুরারোহ, দুরূহ, কুজ্ঝটিকাময়, অভ্রভেদী, অদ্রি-শৃঙ্গারোহণ বুঝি বা বরং সহজ কাজ, তথাপি কিন্তু অস্পষ্টতাদোষদুষ্ট, জটিল লিপির রহস্যোদ্ভেদ এবং তাৎপর্য্য-সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ।

অমানুষী মনীষা, অসাধারণ জ্ঞান, অমোঘ বোধশক্তি না থাকিলে ঐ উৎকট বিষয়-সঙ্কলন সামর্থসাধ্য হইবার নয়। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষেই ধর্ম্মকর্ম্মের সফলতা-সাধনে সমর্থ। সমল সলিল সুসংস্কৃত হইলেই স্বচ্ছতা লাভ করে। আর ঘোর গাঢ় তিমির-ভিতর হইতে সত্য শিব সুন্দর স্নিগ্ধোজ্জ্বল তত্ত্বের অমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত করিতে পারিলে তাহাই অতি সুদৃশ্য, সুশ্রী দেখায়।

এই বিঘ্ন-বিপত্তি-সঙ্কুল উপায়েই ভারতের রাজন্যগণের অলোকসামান্য অগণ্য বীরত্ব, কীর্ত্তি-কাহিনী, অনন্যসাধারণ ত্যাগস্বীকার, প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি রাজপুতানার মাহাত্ম্য-ক্রিয়াকলাপ তিনি লোক লোচনের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ চেষ্টা না হইলে ভারতেতিহাসের অর্গলবদ্ধ দ্বার কখনও উন্মুক্ত হইত কি? পুরাবৃত্তের যে সমুদয় বিষয় কল্পনার আবরণে আবৃত—মেঘ-মালায় আচ্ছাদিত—কৌতুককর ও কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকায় আচ্ছন্ন ছিল, বর্ষার নিবিড় জলদ জালোন্মুক্ত শুক্লপক্ষীয় পূর্ণশশধরবৎ তাহা পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আমাদের নিকেতন-কোণে রাশীকৃত আবর্জ্জনা-জড়িত মণি অনাদরে অযত্নে পড়িয়া ছিল; টডই সেই মণির উদ্ধারকর্ত্তা। পুরুষপুঙ্গব টড ও অন্যান্য য়ুরোপীয়ের উদ্‌যোগে উদ্‌ঘাটিত পুরাবৃত্তের নিভৃত দ্বারের অভ্যন্তর হইতে ইতিহাসের যে অমল-ধবল জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে বঙ্গবক্ষে বিকীর্ণ হইল,—রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি প্রকৃতির প্রিয়পুত্রগণের হৃদয়কন্দর তাহাতে উদ্ভাসিত হইল।

রীতিমত ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পুস্তকের অসদ্ভাব থাকিলেও ভারতের স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসের অভাব কোথায়? বাস্তবিক তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই বহুল। সুনিপুণ সাহিত্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট ইতিবৃত্তের উপকরণ পর্য্যাপ্ত—সুপ্রচুর। দৃষ্টান্তস্থলে প্রথমেই পুরাণের প্রতি আমাদের অন্তরাত্মা আকৃষ্ট হয়। 'পুরাণ' পুরাতন বিষয়ের উপাদানে পূর্ণ—অবাস্তব ঘটনাবহুল, যাঁহাদের এই সংস্কার, তাঁহাদের উক্তির খণ্ডনার্থে অধিক দূরে যাইতে হয় না।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

শ্লোকের ভাবার্থ এই—

সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা, নানা রাজবংশবর্ণন, চতুর্দ্দশ মনুর পরিবর্ত্তন ও বিবরণ—কথনও বা কোন নির্দ্দিষ্ট রাজবংশের আমূল বৃত্তান্ত, এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত বিষয়, 'পুরাণের' প্রতিপাদ্য। সুতরাং উল্লিখিত লক্ষণপঞ্চক পুরাণ পদের অভিধেয়। স্থলে স্থলে পুরাণে আলঙ্কারিক বর্ণনা—রূপকাদির অতিমাত্র বিবৃতি সত্ত্বেও উহাতে ঐতিহাসিক উপকরণের উদাহরণ-নিদর্শন যথেষ্ট। পূর্ব্বেই ইঙ্গিতে সঙ্কেত করিয়াছি, সেগুলির সঙ্কলনে স্নিগ্ধ-মস্তিক, ধৈর্য্যশীল অনুসন্ধানশালী ঐতিহাসিকাবলীর একান্ত প্রয়োজন।

প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্ত লেখক হিউম সাহেব সাক্সন-জাতীয় রাজন্যবর্গের হেপ্‌টার্কি (Hepterchy) রাজ্য-সপ্তক সম্বন্ধে যে যে বাক্য প্রযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, 'রাজস্থানের' রাজ্যসপ্তক [মেওয়ার, মারবার, অম্বর, বিকানীর, যশল্মীর, কোটা ও বুন্দি] সম্পর্কেও তত্তৎবাক্য যথাবৎ—অবিকল প্রযোজ্য, এই কথা পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইল।

ঐ সকল প্রদেশীয় রাজগণের নাম-তালিকা সুদীর্ঘ; কিন্তু ঘটনায় অতীত কাহিনী-কথার দুর্ভিক্ষতা। এই কারণে সদ্বক্তা উত্তম বাগ্মী, এমন কি, লিপিনিপুণ সুলেখকেরাও ঐ সমুদয় রাজার বিষয় লোকের পক্ষে প্রীতিপ্রদ বা হিতকর ভাবে বিবৃত করিতে অশক্ত। আর ধর্ম্মযাজকেরা তো সাংসারিক ব্যাপারে চিরকালই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকেন।

ইংলণ্ডের 'হেপ্‌টার্কি' এবং ভারতের 'রাজস্থান' এই দুইটির প্রতিই উক্ত উক্তি সমভাবে প্রযোজিত হয়। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপবান্, শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, কত শত মহাবীরই 'রাজস্থানে' জন্মগ্রহণ করিয়া অমরকীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গস্থ হইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যাবধারণে সমর্থ হইবে? ঐ দেখুন—বাপ্পারাও, সংগ্রামসিংহ (রাণা সঙ্গ), পৃথ্বীরায় (পৃথ্বীরাজা) প্রভৃতি শত শত নরসিংহ রাজস্থানে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশের মুখরক্ষা করিয়াছেন। শিশোদীয় (গিহ্লোট), প্রমার, (কচ্ছাবহ), রাঠোর ইত্যাদি প্রধান প্রসিদ্ধ বংশ কি চাকচিক্যময়ই বোধ হয়।

ভাট, বৈতালিক প্রভৃতি স্তুতিবাদকেরাও এককালে ভারতের ঐতিহাসিকের সম্মাননীয় পদে অধিরূঢ় ছিলেন। কবিবৃন্দের খণ্ডকাব্য, কাব্য ও মহাকাব্য হইতেও একদিন ভারত ঐতিবৃত্তিক রত্নরাজির জন্য কি অল্প উপকৃত হইয়াছিল? ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন হিন্দু-নরপাল-কুলের আশ্রয়ে স্তুতি-গীতিকারকগণ যেমন সযত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেন, রাজপুতনায় তাহার কথঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় নাই। সুপ্রাচীন সময় হইতে ঐ সুপ্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়াই ত টড সাহেব মেওয়ারের তদানীন্তন ঐতিহাসিক বেণীদাসকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় প্রতীচ্য প্রদেশে কবিরাই সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ ইতিবৃত্তলেখকের কার্য্যে ব্রতী হইতেন। অতি পুরাকালীন কোন প্রণালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল মনে করা অস্বাভাবিক। অধিক কি, এই জ্ঞানসমুজ্জল কালও কি সকল বিষয়কে নির্দ্দোষ করিতে সমর্থ হইয়াছে?

সেই স্মরণাতীত কালে রাজপুরুষগণের সম্পূর্ণ সহায়তার উপর নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং স্তুতিপাঠকদিগের লিপির স্বাধীনত্ব প্রত্যাশা করা কি সঙ্গত? তথাপি ধর্ম্মসঙ্গত মতে বাধা পাইলে তাঁহাদের মতির গতি ভিন্নরূপ হইত। তীক্ষ্ণবিষ বিষধরের ন্যায় তাঁহারা অতীব দুর্দ্ধর্ষ বৃত্তি পরিগ্রহ করিতেন। অরাতির শাণিত কৃপাণ বা ভীষণ প্রহরণ বরং রাজপুতের সহনীয়, কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ ইতিবৃত্তবিদের আপত্তিকারিণী বাণী যেন উগ্রবীর্য্য হলাহল অপেক্ষাও তাঁহাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর—সুতরাং একেবারেই অসহ্য।

অন্য অন্য প্রদেশের ন্যায় "রাজস্থান" প্রদেশে ঘটনা কিংবা বিবরণ-সঙ্গোপনের বিধান ছিল না। এখনও নাই। এই জন্য পুরাবৃত্তের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে কাহাকেও অধিকতর আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। এতৎপ্রদেশের এমন সঙ্কট-কাল গিয়াছে, যখন ঘটনা সঙ্গোপন একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইত। মেওয়ারের রাণাদের তখনকার ভাবভঙ্গী এবং উক্তি-প্রত্যুক্তি তাঁহাদের ঔদার্য্যের পরিচয় করিয়া দিয়াছে। একবারের ঘটনা এখানে নির্দ্দেশ না করিয়া থাকা যায় না। কোন সময়ে ভয়ানক আপদ্ আপতিত হইলে রাণা বলিয়াছিলেন,—

"আমাদের দেশ চতুর্ম্মুখের রাজ্য। ভগবান্ একলিঙ্গদেবই অত্রত্য মহারাজাধিরাজ। আমি তাঁহার প্রতিনিধিমাত্র। তাঁহাতে আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতিপুঞ্জ আমার সন্ততিতুল্য, তাহাদের নিকট কোন বিষয়ের সংগোপন নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করি।"

সংগীতকারক ঐতিহাসিকবর্গের বর্ণিত পুস্তকগুলির ত্রুটিও যথেষ্ট। বীরত্ব বর্ণনাই তাঁহাদের চিত্ত-ক্ষেত্র অধিকৃত করিয়া রাখিত। তদ্ভিন্ন আর এক বিষয় তাঁহাদের গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ছিল, সেটি নায়ক-নায়িকাদের প্রণয়-কাহিনী। "চাঁদ" কবি ঐ নিয়মের অন্যথা ঘটাইবার জন্য চেষ্টান্বিত ছিলেন। তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যতা লাভও করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষোভ এই যে, তিনিই হিন্দু ঐতিহাসিকগণের সর্ব্বশেষ।

তদ্গ্রন্থে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বীরত্ববর্ণনা ও প্রেমালোচনা ব্যতীত সামাজিক ইতিহাস, পারিবারিক বৃত্তান্ত, রাজস্ব-শাসনপ্রণালী, কুটিল-কূট-বুদ্ধিজাল সঙ্কুল কাপট্য, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অগণ্য রাজন্যগণের সহিত অসরল-ব্যবহার, জটিল রাজনীতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়-নিচয়ে তদ্গ্রন্থের অধ্যায় সমুদায় সমলঙ্কৃত। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহার আনুসঙ্গিক ব্যাকরণের ও রচনার নিয়মও গ্রন্থে উপন্যস্ত। ভৌগোলিক ব্যাপার ইতিহাসের চক্ষুঃস্বরূপ। তাহাও চাঁদ* কবির সুতীক্ষ্ণ দর্শনশক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

রাস-মালা, স্থানীয় পুরাণাবলী, শিলা-লিপি, উৎকীর্ণ তাম্রশাসন, সুবর্ণ রজত ও তাম্রমুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে রাজস্থান সংকলন সম্পূর্ণ হয়। যশল্মীর, মারবার ও মেওয়ারের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত এবং কোটা ও বুন্দির হাররাজগণের ইতিবৃত্ত হইতেও রাজস্থানের যথেষ্ট দেহ-পুষ্টি হইয়াছে। অম্বর-(জয়পুর) রাজ জয়সিংহের সংগৃহীত ঘটনাও পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্বের উপাদান বা উপকরণরূপে কি অল্প কার্য্যকরী হইয়াছিল?

জৈনধর্ম্মাবলম্বী এক বিদ্বানের আনুকূল্যে দশ বৎসর অবিশ্রান্ত শ্রম করিয়াও যিনি শ্রান্তিবোধ করেন নাই, সেই টড সাহেবের সহিষ্ণুতার অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয়।

গ্রীক ও পারসীক সমরে পূর্ব্বোক্ত জাতির বীরত্ব-মাহাত্ম্যে "মেরাথান" ও "থর্ম্মাপলি" প্রখ্যাত হয়। তদুপলক্ষে গ্রীক ভূপতি লিওনাইডস অসীম শৌর্য্য প্রকাশিত করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। আর কোডরস স্বদেশের স্বাধীনতারত্ন রক্ষা করিতে গিয়া সমরে অম্লানবদনে প্রাণাহুতি প্রদান করেন। আমাদেরও ঐরূপ কত শত "মেরাথান" এবং "থর্ম্মাপলির" নাম বিলোপদশায় পড়িয়া

* তিনি, কবি, ঐতিহাসিক ও রাজদূতের কার্য্য করিয়া নিজ জীবন যশোযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং তিনি সর্ব্বঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাকেই বলে—প্রকৃত ইতিবৃত্তলেখক। মেওয়ারের একজন ব্যবস্থাপক ও বীরপুরুষ অমরসিংহ ঐতিহাসিক "চাঁদ" কবির ঐতিবৃত্তিক কাব্য সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাই জগৎ সে তত্ত্ব জানিয়াছে। না হইবে কেন? অমরসিংহ সাহিত্যের উত্তম উৎসাহদাতা ছিলেন।

বিনষ্ট হইয়াছে, কে জানে? কত কত কোডারস, লিওনাইডস এই বীরভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও বলা কাহার সাধ্যসাপেক্ষ? হিরোডটস ও জিনোফনের মত ঐতিহাসিকের অভাবে সমস্ত বীরকীর্ত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

টড সাহেব সরলান্তরে অতি যথার্থ কথাই বলিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন—ভারতে—রাজপুতানায়—সবই ছিল, সবই আছে, কিন্তু গ্রীক ও রোমকদিগের মত গৃহীতব্রত সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিকগণের একান্ত অসদ্ভাব। হিরোডটস বা জিনোফন-সদৃশ ঐতিহাসিক পাইলে ভারত-ইতিহাস কত উন্নততর হইতে পারিত, তাহা কেবল অনুভবেই উপলব্ধি করিবার বিষয়।

১৩১৩ সাল
১০ই জ্যৈষ্ঠ

নিবেদক—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

সচিত্র রাজস্থান

রাজপুত জাতি

প্রথম অধ্যায়

রাজপুত জাতির উৎপত্তিবিবরণ, পৌরাণিক সমন্বয়সাধন এবং
শাকদ্বীপীয়গণের সহিত রাজপুত জাতির তুলনা।

ভারতীয় আর্য্যরাজবংশীয়গণ রাজপুত্র নামে অভিহিত। "রাজপুত" নাম ঐ রাজপুত্র শব্দেরই অপভ্রংশ। রাজপুত্রগণ যে প্রদেশে বাস করেন, যেখানে তাঁহাদিগের বীরত্ববিলাসের শত শত কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান, সেই প্রদেশেরই বিশুদ্ধ নাম রাজস্থান। চলিত ভাষায় উহাকে রাজবারা বা রায়থানা বলে। উহার ইংরাজী নাম রাজপুতানা।

রাজস্থানের প্রাচীন সীমা এক্ষণে অবগত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সীমা উত্তরে শতদ্রু নদের দক্ষিণদিকস্থ জঙ্গল-মরু, পূর্ব্বসীমা বুন্দেলখণ্ড, দক্ষিণসীমা বিন্ধ্যাচল এবং পশ্চিমসীমা সিন্ধু নদ। এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থান রাজস্থান নামে বিদিত।

আমাদিগের পুরাণশাস্ত্রে আর্য্যরাজবংশধরগণের যে কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই কল্পনাবিজড়িত বলিয়া অনুমিত হয়। কোন্ সময়ে কোন্ স্থান হইতে আসিয়া আর্য্যবীর রাজপুতগণ রাজস্থান-প্রদেশে আপনাদের বংশতরু রোপণ করেন, পৌরাণিক ইতিবৃত্তপাঠে তাহা সম্যক্ নিরূপণ করা অতি সুকঠিন।

প্রসিদ্ধ আছে, যখন সপ্তসাগর উদ্বেল হইয়া ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করিতে আরম্ভ করে, তখন বৈবস্বতনামা অষ্টম মনু স্রোতস্বতী কৃতমালার পবিত্র নীরে তর্পণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার অঞ্জলিপুটে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে শূন্যমার্গে দৈববাণী হইল, "মহারাজ! মৎস্যটিকে রক্ষা করুন।" দৈববাণী অনুসারে মনু মৎস্যটিকে রক্ষা করিলেন। মৎস্যটি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশাল দীর্ঘকায় ধারণ করিতে লাগিল, তাহাকে ক্রমান্বয়ে বাপী, সরোবর, নদী ও পরিশেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সময়ে জলপ্লাবন অল্প হইলে মনু একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সবান্ধবে সপরিবারে তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; অর্ণবযানখানিকেও সেই মৎস্যরাজের একটি শৃঙ্গে বান্ধিয়া রাখিলেন।

সুমেরুগিরি বৈবস্বতমনুর রাজধানী ছিল। তাঁহারই এক বংশধর মহাযশা মহামতি কাকুৎস্থ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাকুৎস্থের বংশধরগণ দ্বারাই কালসহকারে ভারতের সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই সুমেরু বা তৎসন্নিহিত অন্য কোন প্রদেশকে তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশধর মহাত্মারা ঐ মেরুশ্রেণীর পবিত্র শিখরপ্রদেশকেই আপনাপন কুলগুরুর আদিস্থান বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন। বহুকাল পরে বৈবস্বতমনুর বংশধরেরা সুমেরুর উচ্চশিখর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। সর্ব্বপ্রথমে কোশলরাজ্যে সরযূতীরে অযোধ্যানগরী প্রতিষ্ঠিত হয়; সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ইক্ষাকু ইহার প্রতিষ্ঠাতা। রামচন্দ্রের রাজত্বের পূর্ব্বে অযোধ্যার ন্যায় সমৃদ্ধিমতী নগরী ভারতে আর দৃষ্ট হয় নাই।

প্রাচীনকালের ধর্ম্মনীতি, বংশাভিধান ও অন্যান্য বিষয়ের পরস্পর সৌসাদৃশ্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, হিন্দু, চীন, তাতার ও মোগলজাতি এক বংশতরুর ভিন্ন ভিন্ন শাখামাত্র।

তাতারীয়দিগের গোত্রপতির নাম মোগল, তাঁহার পুত্র অগজই উক্ত প্রদেশস্থ তাতার ও মোগলজাতির প্রতিষ্ঠাতা। অগজের ছয় পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কায়ন, দ্বিতীয় আয়ু। অগজের ছয় পুত্র হইতে তাতারদিগের ছয়টি রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তাতারেরা আয়ুকেই আপনাদিগের গোত্রপতি বলিয়া জানে। (হিন্দুমতেও প্রথমতঃ দুইটি রাজবংশ;—চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ। এই দুই বংশই কালে চারিটি, তৎপরে ছত্রিশটি রাজবংশে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতে চন্দ্রবংশবিবরণেও চারি জন আয়ুর নামোল্লেখ আছে।)

আয়ুর পুত্র জুলদাস; জুলদাসের পুত্র হয়। মহাভারতে চন্দ্রবংশবিবরণে যে হৈহয়ের নামোল্লেখ আছে, সেই হৈহয় ও হয় যে এক ব্যক্তি, যুক্তি দ্বারা অনেক স্থলেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই হয় হইতে প্রথম চৈন রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল।

তাতার গোত্রপতি আয়ুর নবম বংশধর এলখার দুই পুত্র;—কৈয়ান ও নাগস। কালসহকারে ইঁহাদিগের বংশধরগণ দ্বারাই তাতার প্রদেশ সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, নাগসই পুরাণোক্ত নাগ ও তক্ষকজাতীয়দিগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

পুরাণে বর্ণিত আছে, বৈবস্বতমনুর কন্যা ইলা কোন সময়ে উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন, বুধ তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া সেই উদ্যানেই তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়।

চীনরাজ য়ুর (আয়ুর) জন্মবৃত্তান্তসম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদা কোন গ্রহ (বুধ বা ফো) যদৃচ্ছাবশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, অকস্মাৎ একটি রূপবতী রমণী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হয়, গ্রহরাজ বলপূর্ব্বক সেই রমণীতে উপগত হইলেন; সেই গর্ভেই য়ু নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। য়ু চীনকে নয়ভাগে বিভক্ত করেন। খৃষ্টের ২২০৭ বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারাই একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল যে, তাতারীয় আয়ু, চৈন্ত্র য়ু এবং পৌরাণিক আয়ু এই তিন জনই এক ব্যক্তি।

বুধদেবের ধর্ম্ম যে সেই সুদূর অতীতেও জর্ম্মণ ও স্কন্দনভীয়দিগেরও অবলম্বিত হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রন্থসমূহে তাহার বিস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যগণ যখন আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া উপনিবেশ

সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহাদিগের দ্বারাই তথায় ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় ; কালে বলোপাসক সূর্য্যবংশ-ধরগণের দ্বারা উহা পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়।

পুরাণে এবং আবুলগাজির মতে শক জাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আছে, ডায়োডোরাসও প্রায় সেই বর্ণনারই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আরক্সেশতীরেই (পৌরাণিকমতে আর-ব্রহ্ম) শক জাতির বাস ছিল। অর্দ্ধমানবী ও অর্দ্ধভুজঙ্গিনীরূপিণী কোন ভূকুমারী হইতে এই বংশের প্রথম উদ্ভব হয়। সেই ভূকুমারী জুপিটরের সহবাসে সীথেশ নামে এক পুত্র প্রসব করেন, সেই পুত্রের নামানুসারেই তদীয় বংশের নামকরণ হইয়াছে।

পুরাণেও বর্ণিত আছে যে, শাকদ্বীপবাসীরা বুধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, ভুজঙ্গ বুধের প্রতিকৃতি। এই জন্যই বুধের প্রতিকৃতি আপনাদিগের কুলজননীর অর্দ্ধাঙ্গে আরোপ করিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা ইলা ও বুধ হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি প্রমাণিত করিয়াছেন।

সীথেশের দুই পুত্র ;—পলাশ ও নপাশ। মিশর দেশের নীল নদের প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব মহাসাগর পর্য্যন্ত ইহাদিগের বংশ বহু শাখায় বিভক্ত হয় ; তন্মধ্যে মসমাজিতী, শাকন ও অরি-অশ্বীয়নেরাই বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ। মসমাজিতীরাই হিন্দুমতে জিৎ নামে আখ্যাত। অরি-অশ্বীয়নাদি জাতিরাই আসিরিয়া ও মিডিয়া রাজ্য পর্য্যুদস্ত করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে আরব্রহ্মতীরে আনয়ন করে। তৎকাল হইতে ঐ সমস্ত পরাজিত জাতি সৌরমতিয়ান্ (সূর্য্যোপাসক) নামে অভিহিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্কন্দনভীয় ও শাকদ্বীপীয় প্রধান প্রধান জাতির সহিত রাজপুত
জাতির ধর্ম্ম, সমাজ ও ব্যবহারাদির সমন্বয়সাধন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সমস্ত প্রাচীনতম প্রধান প্রধান জাতির বংশোৎপত্তির বিষয় কথিত হইল, সেই সকল জাতির প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্মের পরস্পর কিরূপ সৌসাদৃশ্য আছে, এক্ষণে তাহারও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন জর্ম্মণজাতিরা টৈষ্ট (মঙ্গল) ও আর্থকেই (পৃথিবীকেই) আরাধ্য দেবতা বলিয়া গণনা করিতেন। মহীশের সহবাসে আর্থ টৈষ্ট নামক পুত্র প্রসব করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও লিখিত আছে, পৃথিবীর গর্ভে মঙ্গলগ্রহের উৎপত্তি হয়।

স্কন্দনভীয়াবাসী জিৎ-জাতির মধ্যে শৈবীরাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। আর্থ (পৃথিবী) ও ঈশীশ ইহাদিগের আরাধ্য দেবতা। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে নরবলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। আরাধ্যা দেবী পৃথিবীর সম্মুখে নরবলি দান করা হইত।

ঈশা শব্দে গৌরী এবং ঈশ শব্দে শিব ; সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রপ্রমাণে বিচার করিলে ঈশীশ শব্দে হর-গৌরী বুঝায়। আমরা যেমন হরগৌরীর পূজা করি, জিৎ-জাতিরাও সেইরূপ ভক্তিসহকারে ঈশীশের আরাধনা করে।

আর্থের রথের বাহন একটি গাভী, শৈবিগণের ধর্ম্মগ্রন্থে এ কথারও উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে গো শব্দে পৃথিবী বা পৃথিবীর প্রতিমূর্ত্তি বুঝায়। সময়ে সময়ে নানাকারণে পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিতেন, পুরাণে ইহাও বর্ণিত আছে।

সমরাঙ্গনে অভিযান করিতে হইলে শৈবীরা শেল-মূষল ধারণ পূর্ব্বক হরিকুলেশ (বলদেব ও টৈষ্টের আকৃতি ও বেশভূষা একপ্রকার) স্তবপাঠ করিতে করিতে তাহাদিগের পতাকা ও প্রতিমূর্ত্তি লইয়া গমন করিত। পৌরাণিক মতে বুধ ও অশ্বের বংশধরদিগের যুদ্ধপ্রণালীও এইরূপ ছিল। পৌরবংশীয় রাজশ্বের বংশধরেরাই গ্রীক ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক অশ্ব নামে অভিহিত।

উপশালার প্রসিদ্ধ মন্দির শৈবিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পূর্ব্বে এই মন্দিরমধ্যে ফ্রেয়া (শুক্র), বোদেন (বুধ) ও থর (বৃহস্পতি) এই তিন গ্রহের মূর্ত্তি রক্ষিত হইত। স্কন্দনভীয়দিগের এই তিনটি মূর্ত্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিগুণময়ী। বসন্তের প্রারম্ভে স্কন্দনভীয়েরা ফ্রেয়াদেবতার উদ্দেশে মহাসমারোহে মহোৎসব করিত; দেবতার উদ্দেশে বন্যবরাহ-বলিদানের প্রথা ছিল, ভক্তেরাও মহানন্দে সেই মহাপ্রসাদ সেবন করিতেন।

বসন্তের প্রারম্ভে রাজপুতগণ কর্ত্তৃক বাসন্তীদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষত্রিয়রাজ সানুচর মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক প্রথম লক্ষ্যীভূত বরাহের বধসাধন করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করেন।

হিন্দুর দেবসেনানী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শাক্সেনিগণের রণদেবও ষড়ানন বলিয়া অভিহিত হয়। মাস, শাকসেনী, সিম্বিয়জিৎ, কাত্তি ও শৈবিগণ এই ষড়াননের পূজা করিতেন।

শান্তশীল ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম ও উপাসনাবিধির সহিত রাজপুতবীরগণের রণধর্ম্ম ও হরোপাসনা-পদ্ধতির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। রাজপুতগণের উপাস্যদেবতাকে সুরা ও মাংসশোণিত বলিদান প্রদান করা হয়। সেই সমর-দেবতার মূর্ত্তিও বীভৎস।—সর্ব্বাঙ্গে ভুজঙ্গভূষণ, করে শোণিতরঞ্জিত নরকপাল, নয়নত্রয় ধুস্তূররসে আরক্ত, উরুদেশে দেবী পার্ব্বতী উপবিষ্টা।

প্রাচীন হিন্দুরাজগণের রাজত্ব হইতে মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবিজয় পর্য্যন্ত যত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে, প্রায় সকলগুলিতেই যুদ্ধরথ ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকাল হইতেই রথ যুদ্ধের একটি অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পারস্যরাজ দারায়ুর সহিত যখন প্রবলবিক্রম আলেকজান্দারের মহা-সংগ্রাম ঘটে, সেই সময় দারায়ুর সাহায্যার্থ আরাবারালাক্ষেত্রে অন্যূন দুই শত যুদ্ধরথ আনীত হইয়াছিল।

রাজপুতগণ রমণীজাতির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া কেহ ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। প্রাচীনকালে তাঁহারা সহধর্ম্মিণীকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেবল রাজপুত নহেন, রমণীর প্রতি জর্ম্মণজাতিরও ঐরূপ ব্যবহার। জর্ম্মণগণের বিশ্বাস, সঙ্কটকালে রমণীর পরামর্শ দৈববাণীস্বরূপ। ফল কথা, রমণীর প্রতি ব্যবহারে রাজপুত, জর্ম্মণ, স্কন্দনভীয় ও প্রাচীন জিৎগণের মধ্যে পরস্পরের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

রাজপুত, জর্ম্মণ ও সীথীয়দিগের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতেই একটি মহান্ অনর্থকর দোষ লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা দ্যূতক্রীড়ার নিতান্ত অনুরাগী। ক্ষত্রিয় ও জর্ম্মণগণ এই ক্রীড়ামোদ চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বস্বপণ রাখিতেও কুণ্ঠিত নহেন। এই অনর্থকরী ক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, মহাভারতে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রতিবর্ষে দেয়ালী উপলক্ষে অদ্যাপি রাজপুতেরা এই ভয়ঙ্করী ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সংস্কার, ইহা দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর প্রীতিসাধন হয়।

সুরাসেবনও রাজপুতগণের নিকট নিতান্ত অনাদরণীয় নহে, বরং সুরাকে তাঁহারা পেয়দ্রব্যের

সারাৎসার বলিয়া বিবেচনা করেন। দেবার্চ্চনা, রণোৎসব প্রভৃতি ব্যাপারেও পানকার্য্যের বিশেষ সমাদর লক্ষিত হয়। গৃহে অতিথি সমাগত হইলে রাজপুত-গৃহী সর্ব্বাগ্রে একপাত্র সুরা লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। ইহার নাম "মান্নার পেয়ালা।" ফল কথা, স্কন্দনভীয়, জিৎ, অসি ও জর্ম্মণদিগের মধ্যে যেরূপ তেজস্বিনী সুরাপ্রিয়তা দৃষ্ট হয়, রাজপুতগণ তাহা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহেন।

স্কন্দনভীয়গণের রণদেবতা থর। থরোপাসকগণের বিবেচনায় সুরাপাত্র তাঁহাদিগের শত্রুকুলের নরকপালস্বরূপ। সমরপিপাসু বীরাচারী রাজপুতগণের সাধারণ উপাস্যদেবতা বীভৎসবেশী মহাদেব। উপাসকেরা হরপূজাবসানে পানোন্মত্ত হইয়া যখন তাণ্ডবনৃত্যে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদিগের সেই বীভৎসদৃশ্য নেত্রগোচর করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও রাজপুত ও জিৎগণের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। যে যে সময়ে স্কন্দনভীয় বীরগণের শবদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত বা অগ্নিদগ্ধ হইত, সেই সেই সময়ে সেই দেশে "যেরুযুগ" বা "অগ্নিযুগ" বলিয়া অভিহিত হইত। অন্ত্যেষ্টিবিধানানুসারেই তৎপ্রদেশের যুগের নামকরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। বোদেন বুধ ঐ প্রদেশে স্ত্রীর সহমরণ ও শবদেহের অগ্নিসংকার প্রথা প্রচলিত করেন। হেরডোটস বলেন, শাকদ্বীপের প্রথা দেখিয়াই ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তির একাধিক রমণী থাকিলে জিৎ ও শৈবীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠাই পতির অগ্নিসংকার করিত। কিংবদন্তী আছে, বল্ডারনামা বোদেনের এক সহচর পরলোকগমন করিলে তৎপত্নী নান্না অনুমৃতা হইয়াছিলেন। তৎপরে স্কন্দনভীয়েরা ক্রমে ক্রমে অগ্নিসংকারের বিদ্বেষী হইয়া উঠিল; তাহারা মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করিতে আরম্ভ করিল।

প্রবাদ আছে, সীথীয় জিৎ মৃতদেহের সহিত তদীয় প্রিয়তম ঘোটককেও অগ্নিদগ্ধ করিত, স্কন্দনভীয় জিৎগণও মরণান্তে অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদিসহ ভূগর্ভে প্রোথিত হইত। রাজপুতবীর সেরূপ অশ্বসহ অগ্নিদগ্ধ হন না সত্য, কিন্তু অশ্বটি জীবিত থাকিলেও চিরকালের জন্য কুলপুরোহিতকে প্রদান করা হয়, বীরপুরুষ অসি-চর্ম্ম ও তরবারিসহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া অনন্তধামে গমন করেন। যেখানে রাজপুতবীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হয়, হিন্দুদিগের মতে সেই স্থান পরম পবিত্র। মৃত্যুর পর পূর্ণ বর্ষে যত দিন প্রথমবার্ষিক শ্রাদ্ধবিধি না হয়, তত দিন কেহই সেই সংকারস্থানে গমন করে না। সকলেরই বিশ্বাস এক বর্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তথায় বিকটরূপিণী প্রেতিনীরা বিচরণ করে এবং জীবজন্তুকে সম্মুখে পাইলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া ফেলে। রণক্ষেত্রে ও মহাশ্মশানে প্রায়ই এক প্রকার ভ্রাম্যমাণ জলন্ত উল্কাগ্নি দৃষ্ট হয়। বোদেনের বীরোপাসকেরা বলেন, ঐরূপ উল্কানল দ্বারা বোদেন স্বয়ং দস্যুতস্করাদি হইতে সমাধিক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিয়া থাকেন।

শবদেহ অগ্নিদগ্ধ হইলে সেই ভস্মাবশেষের উপর স্কন্দনভীয়েরা মৃত্তিকাস্তূপ নির্ম্মাণ করিত। হরোপাসক হিন্দুপুরোহিত ও জিৎগণের মধ্যেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল রাজপুতবীর রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সমাধিক্ষেত্রের উপর ঐ প্রকার স্তূপচিহ্ন ও তদুপরি বীরপুরুষের পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

পূর্ব্বে প্রাচীনতম জাতির মধ্যে সকলেই সূর্য্যোপাসনার অনুরাগী ছিলেন। সূর্য্য হইতেই বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, দিবা ও রাত্রির উৎপত্তি হয়; সূর্য্য হইতেই মেঘ, বৃষ্টি, জল, অনল, জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইতেছে; জ্ঞাননেত্রে মানবগণ যখন ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই সময় হইতেই জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকপূজ্য সবিতৃদেবের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে; সেই সময়

হইতেই দেশ, কাল ও আচারভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে সূর্য্যদেবের পূজাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে অনেকে সবিতৃদেবের প্রীতির জন্য নরবলির শোণিতসেকে পূজাবেদী রঞ্জিত করিতেন; অনেক স্থলে সূর্য্যোপাসকেরা অশ্ব উৎসর্গীকৃত করিয়া আরাধ্যদেবের প্রীতিবিধান করিতেন। শীত-সংক্রান্তিতে এই অশ্বমেধোৎসব সমাহিত হইত। রাজপুত, স্কন্দনভীয়, অশ্ব ও জিৎ সকলেই এক সময়ে এই মহোৎসব সম্পাদন করিতেন। বাল্‌তিকসাগরোপকূলবর্ত্তী প্রাচীন জর্ম্মণগণ এই যজ্ঞকে 'হয়োল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হয় (অশ্ব) ও উল (দাহ করা) এই শব্দদ্বয়ের মিশ্রণে 'হয়োল' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং এ শব্দটি যে জর্ম্মণগণ সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিযুগে অশ্বমেধ শাস্ত্রনিষিদ্ধ; সুতরাং ক্রমে এই মহোৎসব ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীরাম এবং যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ হইতেই প্রাচীনতম আর্য্যনৃপতিগণের উদ্ভব হইয়াছে। মনু সূর্য্যবংশের এবং বুধ চন্দ্রবংশের প্রধান গোত্রপতি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূর্য্যবংশীয় মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকু আদি বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তিনিই প্রথম ক্ষত্রিয়-নরপতি; তৎকর্তৃকই অযোধ্যানগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইক্ষ্বাকু হইতে শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত সপ্তপঞ্চাশৎ নরপতি যথাক্রমে অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইক্ষ্বাকু যে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে আগমন করেন, চন্দ্রবংশের গোত্রপতি বুধও ঠিক সেই সময়ে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; ইক্ষ্বাকুর ভগ্নী ইলা তাঁহার সহধর্ম্মিণী। বুধবংশেই যযাতি রাজার উৎপত্তি হয়। পুরু যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র। পুরুর বংশতরু হইতেই পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যদু। যদুর পাঁচ পুত্র;—সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল, অঞ্জিক। ইতিহাসে সহস্রদ ও ক্রোষ্টারই বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রোষ্টার বংশেই ভগবান্ বাসুদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সহস্রদের দ্বিতীয় পুত্র হৈহয়। সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও তালজঙ্ঘ ঐ হৈহয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতিবংশের গরীয়সী কীর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ বাদরায়ণ সুধাময়ী ভারতকাহিনী রচনা করিয়াছেন।

মিবার, মারবার, জয়পুর, বিকানীর এবং রাজস্থানের অন্যান্য প্রদেশীয় নৃপতিগণ আপনাদিগকে শ্রীরামের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মিবারের রাণাগণ লব হইতে এবং মারবার ও অম্বরের রাজগণ কুশ হইতে আপনাদের উৎপত্তির পরিচয় প্রদান করেন।

পুরাণে লব হইতে তদ্বংশের শেষরাজা সুমিত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ষট্‌পঞ্চাশৎ নৃপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুমিত্রের পর আর সূর্য্যবংশীয় কোন নরপতির বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু

খ্যাতনামা অম্বরাধিপতি গোবিন্দসিংহ সুমিত্র হইতে কনকসেন, বিজয়সেন ও শিলাদিত্য অনুসরণ পূর্ব্বক বাপ্পার অধিকার পর্য্যন্ত আরও চতুর্ব্বিংশতি নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রসমরে বিজয়লাভ করিয়া কিয়ৎকাল রাজ্যশাসনের পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিলে অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী ও রাজাবলী-পাঠে দৃষ্ট হয়, পরীক্ষিৎ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থের শেষরাজা রাজপাল পর্য্যন্ত যথাক্রমে চারি বংশে সর্ব্ব-সমেত ষট্‌ষষ্টি জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজপাল যখন কুমায়ুনরাজ শুকবন্তের রাজ্য আক্রমণ করেন, সেই সময় মহাবল শুকবন্ত মহাযুদ্ধে তাঁহাকে সংহার করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের শূন্য-সিংহাসন শুকবন্তের অধিকৃত হইল। চতুর্দ্দশবর্ষ রাজ্য-শাসনের পর শুকবন্ত বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক সমরে নিহত হন। তদবধি বহুদিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসিংহাসন শূন্য থাকে; পাণ্ডবকুলের রাজলক্ষ্মীও ক্রমে ক্রমে গভীর অন্ধকারে বিলীন হইতে আরম্ভ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

—o—

রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কালসহকারে সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুইটি মহদ্বংশের সহিত আর একটি বংশ সংযুক্ত হয়, তাহার নাম অগ্নিকুল। এই তিন বংশের রাজগণই বহুদিনাবধি ভারতশাসন করিয়াছিলেন। ক্রমে আরও ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্য সামান্য সামান্য রাজবংশ তাঁহাদিগের তালিকাভুক্ত হইল। তন্মধ্যে কয়েকটি স্বতঃ বা পরতঃ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ হইতে সমুৎপন্ন। উহাদের অনেকগুলিই ঔপনিবেশিকরূপে অবস্থান পূর্ব্বক মুসলমানবিজয়ের বহুদিন পূর্ব্বে রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশৎ রাজবংশের মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

সেই ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে গিহ্লোট বা গিহিলোট শাখার নৃপতিগণ আপনাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, গিহ্লোটবংশীয় পূর্ব্ব-নরপতি কনকসেন ২০০ শত সংবতে কোশলরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্রদেশে বিরাট নগরে আসিয়া সাম্রাজ্যস্থাপন করেন। কিছু দিন পরে তাঁহার বংশধর বিজয়সেন তথায় বিজয়পুর নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বংশের নরপতিগণ বহুদিনাবধি বল্লভীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় তাঁহারা "বালকরায়" নামে খ্যাতিলাভ করিলেন। সৌরাষ্ট্রদেশে গজনী বা গায়নী নামে আর একটি নগর ছিল। কনকসেনবংশের শেষরাজা শিলাদিত্য পারদ-নামক অসভ্য-অভিযানকারিগণ দ্বারা গজনীনগর হইতে রাজ্যচ্যুত ও অবশেষে নিহত হন। সৌরাষ্ট্রদেশে তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা রহিল না। কিছু দিন পরে গ্রহাদিত্যনামা নরপতি ইদরনামক স্থানে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। এই নরপতি হইতেই শ্রীরামের বংশধরেরা ক্রমে ক্রমে "গিহিলোট" বা "গিহ্লোট" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। ক্রমে ইঁহাদিগের রাজধানী ইদর হইতে আহরে প্রতিষ্ঠিত হইলে গিহ্লোটগণ "আহর্য্য" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। কিছু

দিন পরে ইঁহাদিগের এক বংশধর শিশোদাপ্রদেশে সাম্রাজ্যস্থাপন করিলে আহর্য্য ও গিহ্লোট নাম "শিশোদীয়" নামে পরিণত হইল বটে, কিন্তু উহা গিহ্লোটের শাখা বলিয়া কুলতালিকায় লিখিত রহিল। আহর্য্য ও শিশোদীয় লইয়া গিহ্লোটবংশ ক্রমে ক্রমে চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

যযাতির অন্যান্য সন্তানসন্ততিগণ অপেক্ষা যদুর বংশধরেরাই অধিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিলে যাদবেরা পঞ্চনদের দোয়াব নামক স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান অদ্যাপি "যদুকা ডাঙ্গন" নামে প্রসিদ্ধ। কতিপয় মাস মাত্র তথায় অবস্থানের পর তাঁহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম পূর্ব্বক জাবালিস্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। অত্যল্পদিনমধ্যেই তথায় গজনী নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সমরখণ্ড পর্য্যন্ত আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কোন্ সময় যে তাঁহারা ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া পুনরায় ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হরিকুলেশের বংশধরেরা সিন্ধুনদ-তীরে পঞ্চনদপ্রদেশে প্রত্যাগত হইয়া শালভানপুর নামক নগর স্থাপন করেন, কিন্তু তথা হইতেও বিতাড়িত হইয়া তাঁহাদিগকে শতদ্রু ও গারা-পারে ভারতের মরুপ্রান্তরে আগমন করিতে হয়। সেই স্থানে জহু, মোহিলা প্রভৃতি জাতিকে দূরীকৃত করিয়া ১২১২ সংবতে তাঁহারা টেনোট, দরোয়াল ও যশল্মীর নামক তিনটি নগরী স্থাপন করেন। যশল্মীর-স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারা তৎসন্নিহিত লোদুর্ব্বাপত্তনবাসিগণকে বিদূরিত করিয়া কিছু দিন তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জাবালিস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া যাঁহারা ভারতে প্রত্যাগত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভট্টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক বলবান্। কালক্রমে তাঁহার নামেই তদ্বংশের নামকরণ হইল; যত দিন রাঠোরগণের প্রাদুর্ভাব না হয়, তত দিন ভট্টিরা গারার দক্ষিণতীরস্থ সমস্ত প্রদেশেরই আধিপত্য করিয়াছিলেন।

যদুবংশের আর একটি শাখার নাম জারিজা। ভট্টির ন্যায় ইঁহারাও পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত শাখার ন্যায় ইঁহাদিগের আধিপত্য তাদৃশ বিস্তারপ্রাপ্ত হয় নাই। শম্বু নামে যে রাজা গ্রীকদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিলেন, তিনিও হরিকুলসম্ভূত। শ্যামনগর তাঁহার রাজধানী ছিল; শ্যামনগরই গ্রীকগণ কর্ত্তৃক মীনগড় নামে অভিহিত।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই যদুর বংশধরগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীয়াদি অনেকেই এই বংশসম্ভূত। যদুবংশ অষ্টশাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে যদু, ভট্টি ও জারিজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তুয়ার যদুবংশের একটি শাখামধ্যে পরিগণিত হইলেও রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। বর্দ্দাই-প্রণেতা বলিয়াছেন, পাণ্ডু হইতে এই বংশের উদ্ভব হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি লইয়া এই বংশের পরিচয় দিতে হইলে তুয়ারকে একটি উচ্চস্থান প্রদান করিতে হয়। যত দিন জগতে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হইবে, তত দিন মহোজ্জল যশোবিভায় বিমণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের পরিণাম সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইবে। তুয়ারের গৌরবসম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর প্রায় আট শতাব্দী ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসিংহাসন শূন্য ছিল। এই দীর্ঘকালব্যাপিনী অরাজকতার পর-সংবতে (৭৯২ খৃষ্টাব্দে) গৌরবান্বিত হিন্দুসূর্য্য মহারাজ অনঙ্গপাল তুয়ারের প্রাচীন সিংহাসনে সমারোহণ করেন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে বিংশতি জন নরপতি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের শেষ রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন, তিনি ১২২০ সংবতে

(১২৬৪ খৃষ্টাব্দে) স্বীয় দৌহিত্র চোহান-পৃথ্বীরাজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই স্থানে তুয়ারবংশেরও শেষ হয়।

রাঠোরবংশের উৎপত্তিবিষয়ে অনেক প্রবাদ আছে। রাঠোরদের কুলতালিকায় লিখিত আছে, ইঁহারা শ্রীরামের প্রথমপুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্যবংশীয় কশ্যপের কোন উত্তরাধিকারীর ঔরসে এক দৈত্যকুমারীর গর্ভে ইঁহাদিগের জন্ম হয়। রাঠোরগণের আদি-বাসস্থান গাধিপুর (কনোজ)। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই রাঠোরদিগের অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়। ভারতের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী যে সময়ে যবনের জয়নাদে কম্পিত হইতে লাগিলেন, ভারতের একাধিপত্যলাভের লালসায় ঠিক সেই সময়েই রাঠোরবীরেরা দিল্লীর তুয়ার ও চোহান এবং আনহল্‌বারার বাল্হিক রায়গণের সহিত মহারণে প্রবৃত্ত হন। এই গৃহ-বিবাদই তাঁহাদের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। এই বিবাদে চোহানরাজ আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলে, যবনেরা ভারতের স্বাধীনতারত্ন হরণ করিল। এ দিকে কনোজ-রাজ জয়চাঁদের অধঃপতনে তৎপুত্র শিবজী মরুস্থলীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুন্দরের পরীহরগণ উৎসন্ন হইলে মারবারে রাঠোরকুলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা শিবজী কর্ত্তৃকই সংস্থাপিত হয়। শিবজীর বংশধরগণের বীরত্বসাহায্যেই মোগল-সম্রাটেরা ভারতের অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

কুশাবহগণ শ্রীরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ হইতে সমুৎপন্ন। অনেকে কুশাবহ স্থলে কচ্ছবাহ পাঠ নির্দ্দেশ করেন; আমাদের মতে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কুশাবহগণ কোশলরাজ্য ত্যাগ করিয়া নরবরে দুর্গ স্থাপন করেন, ঐ স্থানে নলরাজের প্রসিদ্ধ বাসভূমি ছিল। তাতার ও মোগলদিগের শাসনকাল পর্য্যন্ত নলের বংশধরেরা তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, কালক্রমে মহারাষ্ট্রীয়েরা তথা হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইঁহাদিগের মধ্যে একদল দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে অনার্য্য মীনগণের বাসস্থলীতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। অত্যল্পদিনমধ্যেই মীনদিগকে বিদূরিত করিয়া তথায় তাঁহারা অম্বরনগর স্থাপন করিয়াছিলেন। আক্‌বরের রাজত্বকাল হইতেই রাজস্থানের আর্য্যরাজ-বংশ ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইতে আরম্ভ হয়।

সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে যেমন সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, অগ্নিকুলতিলকগণও সেইরূপ অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন। অগ্নি হইতে চারিটি বংশের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ চারি শাখা প্রমার, পুরীহর, চালুক বা শোলাঙ্কি ও চোহান নামে অভিহিত।

কিংবদন্তী আছে, যে সময়ে ধর্ম্মবীর পার্শ্বনাথের অভ্যুদয় হয়, যে সময়ে জৈন ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয় লইয়া ঘোরসংঘর্ষ ঘটে, সেই সময় অগ্নিকুমারেরা জন্মগ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সকল জৈনগণ হিন্দু ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক স্থানভেদে রাক্ষস, দৈত্য ও তক্ষক নামে অভিহিত।

এই ধর্ম্ম-সংঘর্ষের প্রমাণক্ষেত্র সুপ্রসিদ্ধ আরবুধশিখর। অদ্যাপি উহার সমুচ্চ শিখরপ্রদেশে অগ্নিকুণ্ড পরিলক্ষিত হয়। সেই অগ্নিকুণ্ড হইতেই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বীর অগ্নিতনয়দিগের সৃষ্টি হইয়াছিল। অনুমান হয়, সূর্য্য ও চন্দ্রকুলের সমাধিক্ষেত্রের ভস্মরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক এই অমৃতকুণ্ডের জলসিঞ্চন দ্বারা দিব্যশক্তিমান্ বিপ্রবৃন্দ নাস্তিক-হস্ত হইতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষণার্থ এই বীরবংশের উৎপাদন করিয়াছিলেন। মুসলমান-অভিযানের সময় তাঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে অনেকে জৈন বা বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অগ্নিকুলের মধ্যে প্রমারেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদিগের বংশধরেরা পঞ্চত্রিংশ শাখায় বিভক্ত। এক

সময়ে ভারতের অধিকাংশ স্থান ইঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। শোলাঙ্কি ও চোহানবংশ বীর্য্য-সমৃদ্ধিতে প্রমাররাজগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্য, কিন্তু প্রমারগণই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। পুরীগরেরা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রমারনৃপতিগণের অধীনে করপ্রদ নৃপতিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রাচীন মহেশ্বরনগরে পুরাণোক্ত হৈহয়ভূপতিগণ বাস করিতেন। ঐ মহেশ্বরনগরীই প্রমারগণের প্রথম রাজধানী বলিয়া অনুমিত হয়। অল্পকালমধ্যেই প্রমারগণ ঐ নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরিশিখরে ধারা ও মান্দু নামক দুইটি নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমাদিত্যের লীলাভূমি উজ্জয়িনীও ইঁহাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রমার-নৃপতিগণের কীর্ত্তি ও প্রতাপ নর্ম্মদা অতিক্রম পূর্ব্বক সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৭৭০ সংবতের (খৃঃ ৭১৪) প্রাক্কালে রামপ্রমারনামা প্রমারবংশীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক রাজা ত্রৈলঙ্গে স্বীয় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। মহাকবি চাঁদভট্ট বলেন, ইনি সামন্তসমিতির শিরোমণি ও ভারতের রাজাধিরাজস্বরূপ ছিলেন। ত্রৈলঙ্গাধিপতি প্রমার রাজচক্রবর্ত্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ষট্‌ত্রিংশ রাজকুলের মধ্যে এক এক রাজবংশীয়কে এক একটি বিশাল রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ত্রৈলঙ্গেশ্বর প্রমারের লীলাসংবরণের অব্যবহিত পরেই সামন্তনৃপতিগণ স্ব স্ব স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু গিহ্লোটগণ যে সময়ে চিতোর সিংহাসন অধিকার করেন, রাম-প্রমারের বংশধরগণের প্রতাপগৌরব সেই সময় হইতেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। জগতে যত দিন চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হইবে, যত দিন সংস্কৃতশাস্ত্রের আদর থাকিবে, ভোজ-প্রমারের নাম ও তাঁহার নবরত্নের অতুলকীর্ত্তি তত দিন ইহসংসার হইতে তিরোহিত হইবে না। ইতিবৃত্তে ভোজপ্রমার নামক তিনটি নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়; তিন জনই তুল্যপরাক্রমী ও সমান বিদ্যানুরাগী। যে প্রমারের কীর্ত্তিপ্রভা দ্বারা এক সময়ে ভারতের সমস্ত রাজগণ হীনপ্রভ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান ধাতনগরের রাজাই সেই মহাবংশের শেষ প্রতিচ্ছায়া। এক সময়ে যে নৃপতি রাজ্যভ্রষ্ট—পলায়িত হুমায়ুনকে শরণাগত দর্শনে রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার অমরকোট রাজধানীতে জগদ্বিদিত আকবরের জন্ম হইয়াছিল, হায়! আজি কালের কুটিলগতিবশে তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ উদরান্নের জন্য বুলচের চরণতলে দীনভাবে অবস্থিত।

প্রমারবংশ পঞ্চত্রিংশ শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে ভিহিল ও মোরীই সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ। আরাবলী-সন্নিহিত চন্দ্রাবতীনগরী ভিহিলগণের রাজধানী ছিল। অবশিষ্ট শাখাগুলির মধ্যে অনেকেই সুদূর সিন্ধুনদপারে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন; অনেকেই ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদিগের পূর্ব্বগৌরব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

অগ্নিকুলের মধ্যে চোহানই সমধিক বিক্রমশালী; সমগ্র রাজপুতজাতির মধ্যে ইঁহারাই পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ। রাঠোরগণ ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য বটে; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বীরত্বের তুলনা করিলে চোহানকে শীর্ষস্থানে আসন প্রদান করিতে হয়। চোহানের উৎপত্তিসম্বন্ধে প্রাচীন ইতিবৃত্তে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল;—

আরবুধশিখর পরমপবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্রত্য শিখরবাসী ঋষিরা কন্দ-মূল-ফল সেবন পূর্ব্বক নিরন্তর ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। দুরাত্মা দৈত্যগণ তদ্দর্শনে বিদ্বেষী হইয়া তাঁহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিল; দুরাচারেরা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেবতাগণের যজ্ঞভাগ পর্য্যন্ত হরণ করিতে লাগিল। ঋষিরা নৈর্ঋতকোণে হোমকুণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। অসুরেরা মায়াবলে প্রবল ঝটিকা উৎপাদন করিল; ধূলিজালে নভোমণ্ডল অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল; যজ্ঞস্থলের চতুর্দ্দিকে মল, মূত্র, শোণিত প্রভৃতি বর্ষণ করিতে

লাগিল; ঋষিগণ তথাপি নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম না হইয়া যজ্ঞকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক মুদিতনেত্রে ভগবান্ ভূতনাথের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

সহসা অগ্নিকুণ্ড হইতে একটি দিব্যমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল; সে মূর্ত্তিতে বীরত্বের কোন চিহ্নই নাই। ঋষিরা তাহাকে যজ্ঞস্থলের দ্বাররক্ষকপদে নিযুক্ত করিলেন। দেখিতে দেখিতে আর দুইটি মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। ব্রাহ্মণগণ যথাক্রমে এই তিন জনের পুরীহর, চালুক ও প্রমার নামকরণ করিয়া শেষোক্ত বীরকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন; কিন্তু বীরবর সমরে দৈত্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

তখন মহামুনি বিশিষ্ট বদ্ধপদ্মাসন হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা অসি-শরাসনধারী আর এক বীরমূর্ত্তি অগ্নিগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার আকার দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, কেশ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় আকর্ণবিশ্রান্ত, বক্ষঃ বিশাল, পৃষ্ঠদেশে সশর তূণীর, দক্ষিণ-হস্তে শাণিত অসি; বামকরে বিপুল শরাসন। বীরমূর্ত্তির ভয়াবহ যোদ্ধবেশ দর্শন করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মুনিবৃন্দ এই বীরের চোহান আনহল নামকরণ করিয়া সেনাপতিপদে বরণ পূর্ব্বক দৈত্যসমরে প্রেরণ করিলেন, সমরযাত্রার পূর্ব্বে ঋষিগণ সিদ্ধিকামনায় আশাপূর্ণা-নাম্নী কালিকাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ত্রিশূলধারিণী সিংহবাহিনী দেবী স্তব-শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া তথায় আবির্ভূতা হইলেন এবং অভিমত বরপ্রদান করিয়া অবিলম্বেই পুনরায় তিরোহিত হইলেন। দেবীদত্ত বরে উদ্দৃপ্ত ও সমুৎসাহিত হইয়া চোহানবীর দৈত্যদলনার্থ সানন্দে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর একে একে দৈত্যসেনা চোহানবীরের হস্তে হত হইয়া রণক্ষেত্রে ভূমিশায়ী হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে দৈত্যসেনার অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্ট সৈনিকেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহারা নরকের অধস্তন কূপে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ দিকে ঋষিগণ প্রফুল্ল হইয়া অনুষ্ঠিত ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিলেন। এই চোহানবীরের বংশেই মহাবীর পৃথ্বীরাজ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চোহানদিগের কুলতালিকা পাঠে দৃষ্ট হয়, আনহলবীর হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত উনচত্বারিংশ নরপতি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকের মতে এ তালিকা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলিয়া পরিগণিত।

চোহানেরা যে কয়েকটি নগর স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অজমীর ও শম্ভর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। চোহানবংশীয় অজপাল অজমীর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। শম্ভর-হ্রদের তীরে শম্ভরনগর সংস্থাপিত। এই হ্রদের মধ্যভাগে শাকম্ভরীদেবীর একটি প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। বোধ হয়, দেবীর নামানুসারেই তৎপ্রদেশের নাম শম্ভর হইয়াছে।

চোহানবংশের অনেক বীর বীরত্বে জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মাণিকরায় বীরত্বে ও মহত্বে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। মুসলমান-তেজোবহ্নি দুর্ভেদ্য হিমাদ্রিপ্রাকার ভেদ পূর্ব্বক মহাবেগে পঞ্চনদে আসিয়া মহাবিক্রম প্রকাশ করিলে এই মহাবীর মাণিকরায়ই সেই মহাবিক্রম বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। গজনীর মহম্মদের প্রচণ্ড আক্রমণ যে মাণিকরায় কর্ত্তৃক প্রতিহত হয়, মুসলমান ইতিবৃত্তকারেরাও মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মামুদ আত্মজীবনীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিজয়ী সেনাদল অজমীর-দুর্গ আক্রমণ করিলে তত্রত্য নৃপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও অবমানিত হইয়াছিল।

বিশালদেব-নামক নৃপতির রাজত্বকাল হইতেই চোহানদিগের গৌরবের হ্রাস হইতে থাকে;

অধঃপতনেরও সূত্রপাত হয়। ঐ সময়ে আরবীয়েরা তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করে। বিশালদেবও রাজপুত-সেনা সমভিব্যাহারে শত্রুর প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছিলেন। যে সকল নৃপতি তৎকালে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল, তন্মধ্যে উদয়জিৎ-প্রমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ যুদ্ধেই তিনি আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন।

চোহানবংশ সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে হারাবতী বিভাগের বুন্দি ও কোটা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের দ্বারাই বহুদিন পর্য্যন্ত চোহানদিগের গৌরব সংরক্ষিত হইয়াছিল। পিতৃদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের হস্ত হইতে বৃদ্ধ সম্রাট্ শাজিহানকে রক্ষা করিবার জন্য এই বংশের ছয়টি রাজভ্রাতা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের হৃদয়শোণিতদানেও কুণ্ঠিত হন নাই।

জন্মভূমি রাজপুতের মাতৃস্বরূপিণী, জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তরা। জীবনের যাবতীয় সুখের কথা দূরে থাকুক, জন্মভূমির স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য রাজপুতেরা ধর্ম্মরত্ন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহেন। সর্ব্বানিশ, কামিখানি, লোবানিশ, ঈশ্বরদাস প্রভৃতি দ্বাদশটি নরপতি তন্মধ্যে প্রধান আদর্শ।

চোহান ও প্রমার নৃপতিগণের ন্যায় শোলান্কিও খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে সুপ্রসিদ্ধ। শোলান্কি বংশের আদিম বাসস্থান লোহকোট। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মূলতান ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে কতিপয় মুসলমান বাস করিত; তাহারা লঙ্গহ ও তোগ নামে পরিচিত। ইহারা মরুস্থলবাসী ভট্টিদিগের প্রতি সর্ব্বদা শত্রুতাচরণ করিত। কেহ কেহ বলেন, এই লঙ্গহেরা মলবার-উপকূলস্থিত কল্যাণনগরে রাজত্ব করিত। কালক্রমে ঐ কল্যাণ হইতে আসিয়া মূলরাজ-নামক এক জন শোলান্কিবংশধর আনহলবারপত্তনের সূর্য্যোপাসক সৌরগণের সিংহাসন অধিকার করেন। মূলরাজের পিতার নাম জয়সিংহ শোলান্কি। ভোজরাজের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। ৯৮৭ সংবতে ভোজরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র মূলরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমাগত আটান্ন বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগের পর মূলরাজ লোকান্তরগমন করিলে তৎপুত্র চাঁদরাজ পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চাঁদরাজের রাজত্বসময়েই মহম্মদ গজনবের ঈর্ষ্যানলে আনহলবারাপ্রদেশ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। আনহলবারাপ্রদেশ তৎকালে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, সুতরাং মহম্মদ যে রাজধানী উৎসন্ন করিয়া অতুল ধনরত্নরাশি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। ইউরোপের ভিনিস্ নগর যেমন প্রাচীনতম বাণিজ্যস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ, আনহলবারাও তদানীন্তন ভারতের মধ্যে সেইরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রদেশের যাবতীয় পণ্যদ্রব্যই এই স্থানে আনীত হইত। হায়! দুরাচার নররাক্ষস মামুদ সেই মহানগরী লুণ্ঠন করিয়া ভারতের যে মহাসর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভারতের ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাহার জলন্ত উদাহরণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

মামুদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আনহলবারার সমস্ত শোণিত পান করিলেও সিদ্‌রাও জয়সিংহ নামক এক মহাপুরুষ স্বীয় ক্ষমতাপ্রভাবে আনহলবারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। সংবৎ ১১৫০ হইতে ১২০১ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। সৌভাগ্য-সমৃদ্ধিতে কোন হিন্দুরাজাই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। এক সময়ে তিনি কর্ণাট হইতে হিমাচলের প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বাবিংশতি রাজ্য নিষ্কণ্টকে শাসন করিয়াছিলেন। হায়! কালবশে তাঁহার সমৃদ্ধিগৌরব অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই, তাঁহার এক উত্তরাধিকারী স্বীয় অবিবেকিতাদোষে চোহান পৃথীরাজের কোপদৃষ্টিতে পতিত

হইলেন। পৃথ্বীরাজের রোষাগ্নি কর্তৃক তাঁহার গৌরব ভস্মীভূত হইল, আপনিও পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

অতঃপর চোহান-নরপতি কুমারপাল আনহলবারার শোলান্‌কি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুমারপাল ও সিদ্ধরায় উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহাদিগের অধিকারকালে রাজ্যমধ্যে স্থপতিবিদ্যারও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে যে কয়েকটি বিজয়স্তম্ভ আনহলবারাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমস্তগুলিরই নির্ম্মাণকৌশল চিত্তরঞ্জক ও বিস্ময়কর। সেই কালের বিজয়স্তম্ভ অনন্তকালের জন্য ভারতে স্থপতিবিদ্যার উৎকর্ষের আদর্শস্বরূপে বিরাজ করিতেছে।

কুমারপালের শেষ জীবন অতীব শোচনীয়। শাহাবুদ্দীনের প্রতিনিধিগণের উৎপীড়নে বৃদ্ধ-বয়সে তিনি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। সেই অত্যাচারে তাঁহার সাম্রাজ্যের শান্তিসুখ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। ১২৮৪ সংবতে ইংরাজী ১২২৮ অব্দে আনহলবারাক্ষেত্রে কুমারপালের উত্তরাধিকারী বল্লমূলদেবের রাজত্বাবসান হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতৃপুরুষগণের রোপিত বংশতরুও সমূলে উন্মূলিত হইল। বিশালদেবকে সহায় করিয়া ভাগিলা-নামক সিদ্ধরায়ের বংশধরেরা সেই শূন্যসিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। তখন আনহলবারা ক্রমে ক্রমে পুনরায় উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইতে লাগিল; সেই ধ্বংসাবশেষ নগরীর উপর সোমনাথদেবের বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু হায়! বালকরায়দিগের এই লীলাভূমি যেমন ধীরে ধীরে গৌরব-সোপানে আরূঢ় হইতেছিল, অমনি কালস্বরূপ আলাউদ্দীন ইস্‌লামের বিজয়পতাকা হস্তে লইয়া সেই প্রদেশ আক্রমণ করিল। তাহার প্রচণ্ডদণ্ডাঘাতে আনহলবারাপত্তন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে শোলান্‌কিবংশের গৌরব-সূর্য্যও অস্তমিত হইলেন।

তাতারসম্রাটগণের যে সকল প্রতিনিধি দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সকল লোকের লালসারূপ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গুর্জ্জর ও সৌরাষ্ট্রের হাস্যময়ী নগরীরাজি শ্মশানে পরিণত হইল। আদিনাথের মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; সেই ভগ্নমন্দিরের উপর যবনের মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইল; কত শত দেবাগার, ধর্ম্মমন্দির ও পুস্তকালয় দগ্ধ হইল; কত শত দেববিগ্রহ যবনের পদতলে বিদলিত হইল, কে তাহার সংখ্যা করিবে? শোলান্‌কির রাজলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য সৌরাষ্ট্র হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত শোলান্‌কির সিংহাসনে কেহই আরোহণ করেন নাই। শোলান্‌কির রাজবংশধরেরা নিরাশ্রয় হইয়া ভারতের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শিহর্ণতক্ষক-নামা তক্ষকবংশীয় এক বীর যবনরাজের অনুগ্রহে সৌরাষ্ট্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি কুলধর্ম্মে ও কুলমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া উজা-উল-টক্ক নামে পরিচিত হইলেন।

শোলান্‌কি সর্ব্বশুদ্ধ ষোড়শ শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে ভাগিলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত। ভাগিলা হইতেই ভারতের ভাগেলখণ্ড প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সিদ্ধরায়ের পুত্র ভাগ্যরায়ের নামানুসারেই ভাগেলখণ্ড প্রদেশের নামকরণ হইয়াছিল। সিদ্ধরায়ের বংশধরেরা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শোলান্‌কির অন্যান্য শাখার কোন বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পুরীহরগণের মধ্যে একটি নৃপতির একমাত্র মহান্ কার্য্যাভিনয় দ্বারা রাজস্থানের রঙ্গভূমি অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। এই বীরপুরুষের নাম নাহর রাও। ইনি স্বাধীনতালাভের জন্য পৃথ্বীরাজের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া যেরূপ অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, অনুষ্ঠিত উদ্যমে কৃতকার্য্য না হইলেও তাঁহার নাম ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। পুরীহরগণের

অন্যান্য বংশধরেরা দিল্লীর তুয়ার বা অজমীরের চোহান-নৃপতিগণের অধীনে সামন্তনরপতিরূপে অবস্থিতি করিতেন।

মন্দাদ্রি পুরীহরগণের একটি প্রসিদ্ধ রাজধানী। অধুনা ইহা মন্দবার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দুর্গম গিরিদুর্গস্থ প্রাচীরগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে, ইহার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশল ও গঠনের পারিপাট্য অনুধাবন করিলে বোধ হয়, আধুনিক কোন স্থাপত্যবিশারদ তাদৃশ শিল্পপ্রদর্শনে সমর্থ নহেন। রাঠোরেরা মুসলমান কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে বিতাড়িত হইলে এই মন্দাদ্রিতে আগমন পূর্ব্বক পুরীহরগণের শরণ গ্রহণ করেন। কিছু দিন তথায় অবস্থানের পর দুর্দ্দম লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা আশ্রয়দাতার প্রাণসংহার পূর্ব্বক মন্দাদ্রির সিংহাসন অধিকার করিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই মন্দাদ্রিদুর্গের সমুন্নত প্রাচীরোপরি রাঠোরদিগের বিজয়পতাকা বিরাজ করিতে লাগিল। পুরীহরের প্রতাপ ইতিপূর্ব্বেই মিবাররাজ কর্ত্তৃক এক প্রকার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মিবারের রাজপুরুষেরা কতকগুলি রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদিগের রাণোপাধি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তদবধিই মিবাররাজগণ রাণা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

পুরীহর সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত। রাজস্থানের কোন কোন প্রদেশে উঁহাদিগের দুই একটি শাখার কিঞ্চিন্মাত্র গৌরব দৃষ্ট হয়। সিন্দ, কোহারী ও চম্বল নদীর সঙ্গমস্থানে ইঁহাদের একটি উপনিবেশ আছে; ইঁহারা এখন সিন্ধিয়ার অনুগ্রহপ্রার্থী; ইঁহাদিগের পূর্ব্বস্বাধীনতা-গৌরবের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

সৌরগণ কোন্ বংশতরুর শাখার অন্তর্ভূত, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত না হওয়াতে মহামতি টড সাহেব ইঁহাদিগকে শাকদ্বীপীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যখন ইঁহারা বল্লভীপুরে রাজত্ব করিতেন, তখন মিবারের সূর্য্যবংশীয় রাজগণের সহিত ইঁহাদিগের বৈবাহিক-সম্বন্ধ-বন্ধন চলিত। সুতরাং ইঁহাদিগের বীজ যে অতি প্রাচীনকালে ভারতক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে এই জাতি ভারতে যেরূপ মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এক সময়ে ভারতীয়গণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু হায়! আজ সেই বংশের কীর্ত্তি দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্তও ভারতবাসীর স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না।

সৌরগণ যে কয়েকটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, দেববন্দরই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই নগর সৌরাষ্ট্রের অনতিদূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপমাত্র। সোমনাথের মন্দিরও সৌরগণের আর একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ। কোন দুর্ঘটনাবশে দেববন্দর সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইলে রাজা মিবারের রাণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই নগর কি কারণে সাগরগর্ভে প্রবেশ করিল, তৎসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে, তাহাও এ স্থলে উল্লিখিত হইল;—

ম্লেচ্ছগণের প্রতি দেববন্দরেশ্বরের জাতবিদ্বেষ ছিল। তিনি তরণীযোগে সমুদ্রের বিশালবক্ষে বিচরণ করিতেন; ম্লেচ্ছবণিকের বাণিজ্যপোত নেত্রগোচর হইলে তাহাদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইতেন; অধিক কি, দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই কারণেই সাগরাধিষ্ঠাতা-বরুণদেব কুপিত হইয়া দুষ্কর্ম্মের প্রতিফলস্বরূপ দেববন্দর গ্রাস করিয়াছিলেন।

দেববন্দর ধ্বংসের পর সৌরপতি বাণরাজা ৮০২ সংবতে আনহলবারাপত্তম প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধিই ঐ নগর তাঁহাদিগের রাজধানী হয়। বাণের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় ১৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত

তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে শেষ নরপতি ভোজ স্বীয় ভাগিনেয় কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, তাহাতেই আনহলবারাপত্তনে সৌরবংশের আধিপত্যও বিলুপ্ত হইল।

প্রাচীনকালে অভিযানোন্মত্ত হইয়া অনেকগুলি জাতি শাকদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে; তন্মধ্যে তক্ষকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুরাণাদি হিন্দুগ্রন্থে তক্ষক ও নাগের অনেক বিবরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদানীন্তন কবিরা কল্পনাবলে তাহাদিগের এক একটি অমানুষিকী মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাদিগের মূর্ত্তি সেরূপ নহে। তক্ষক ও নাগ উভয়েই নাগবংশসম্ভূত। ঐতিহাসিক গবেষণাবলে জানিতে পারা গিয়াছে, জগতের অসংখ্য অসংখ্য প্রধান ব্যক্তি এই নাগবংশ হইতে উৎপন্ন। তৈমুর, আতিলা, চেঙ্গিস খাঁ, বাবর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বীরগণ তক্ষক (তুর্ক) জাতি হইতে সমুদ্ভূত। তুর্ক তক্ষকশব্দের অপভ্রংশমাত্র। তক্ষক স্বভাবতই ক্রুর জাতি, সুতরাং তাহার বংশধরেরা যে পিতৃপুরুষের আচরিত নীতির অনুসরণ করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই কারণেই তাহাদিগের হৃদয় ভারতীয় আর্য্যগণের শোণিতশোষণে নিরন্তর লোলুপ থাকিত। কোন্ সময়ে এই জাতি ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। হিন্দুশাস্ত্রে এই তক্ষকের বর্ণনা আছে, কিন্তু তৎকালে ইহারা ভারতে তাদৃশ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে পারে নাই। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তীর্থযাত্রাকালে উলূপী নাম্নী বিধবা নাগনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মহাভারতে এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; সুতরাং ভারতীয়গণের সহিত এই জাতির যে বিবাহসম্বন্ধ প্রচলিত ছিল, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। চীন-ইতিহাসবেত্তারা তক্ষককে তুক্যক্, ট্রাবো, তকরী এবং আবুলগাজি তুর্ক নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাবীর সেকেন্দর শাহ যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে পারোপ্যামীসন-পর্ব্বতে অনেকগুলি পার্ব্বত্য তক্ষকের বাস ছিল। এই পর্ব্বত মহানদ সিন্ধুর শাখা কাবুল নদীর তীরে সংস্থিত; ইহা মহাগিরি হিন্দুকুশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। তক্ষশীল সেকেন্দর শাহের সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনিও উক্ত বংশসম্ভূত রাজা বলিয়া অনুমিত হয়েন। কোন কোন ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে, ইঁহাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা ভারত হইতে জাবালিস্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘটনাসূত্রে তথা হইতেই দূরীভূত হইয়া ভারতে পুনঃপ্রবিষ্ট হন এবং সিন্ধুতীরনিবাসী তক্ষকগণকে বিতাড়িত করিয়া শালিবাহনপুর রাজধানী অধিকার করেন।

তক্ষকবংশীয় মোরীরা এক সময়ে চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। গিহ্লোটেরা প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে উৎসাদিত করিলে তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন, উঁহারা চিতোর হইতে দূরীকৃত হইয়া খণ্ডেশপ্রদেশস্থ আশীরগড় দুর্গে গিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহারা আপনাদিগের প্রাচীনধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তৎপরে রাজস্থানের ইতিবৃত্তে তাঁহাদিগের আর কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলেন, ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুর্জ্জরে যখন মহম্মদ তোগলক রাজত্ব করেন, সেই সময়ে তক্ষক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় আর্য্য রাজবীরগণের কুলতালিকামধ্যে জিৎগণেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে রাজপুত, তাহার কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না; কোন রাজপুতের সহিত কখন তাঁহাদিগের কেহ কোনরূপ সম্বন্ধবন্ধনেও আবদ্ধ হন নাই। ইঁহারা একেশ্বরবাদী ছিলেন। ইঁহাদিগের মতে আত্মা অবিনশ্বর। মহামতি ডিগায়েন বলেন, ইঁহারা পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মহাতেজা জিৎগণ বহুদিন পর্য্যন্ত আপনাদিগের আচার-ব্যবহার সমভাবে সগৌরবে রক্ষা করিয়াছিলেন;

মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই ইঁহাদিগের উত্তরাধিকারীরা প্রাচীনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যবনধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।' শাইরসের রাজত্বসময়ে জিৎগণ জাক্সারতীস-তীরে যে রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহা সমগৌরবে বিরাজিত ছিল। মহানদ সিন্ধুর পশ্চিমকূলবর্ত্তী বিশাল প্রদেশই জিৎগণের আদি-বাসস্থান। ইঁহারা আপনাদিগকে যদুবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন; টডসাহেব কিন্তু ইঁহাদিগকে শাকদ্বীপীয় তক্ষকজাতির বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে চম্বলনগরের অদূরবর্ত্তী কংসপ্রদেশের এক মন্দিরে মহামতি টডসাহেব একখানি প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "মহারাজ শম্বুক শালীন্দ্রজিতের প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শম্বুকের পুত্র দিগল। যদুবংশীয় দুইটি রমণীর সহিত দিগলের বিবাহ হয়। তন্মধ্যে একের গর্ভে দিগলের একটি পুত্র জন্মে, তাহার নাম বীর-নরেন্দ্র।

এই প্রস্তরফলক দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, মাতামহকুল ধরিয়াই জিৎগণ আপনাদিগকে যদুবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। ফল কথা, যদুবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও ইঁহারা যে শাকদ্বীপীয় তক্ষকজাতির একটি প্রধান শাখা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, বুন্দির তিন ক্রোশ পূর্ব্বে রামচন্দ্রপুর নামে একটি স্থান আছে। কোন সময়ে তথায় কূপখননকালে একখানি শিলালিপি সমুত্থিত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল, "যে ত্রিভুবনবিদিত জিৎকাথি ভগবতীদেবীর স্তনখিল্লিংস্থত অমৃতক্ষীরপানে পরিবর্দ্ধিত, যাহার আদিপুরুষ মহাবীর তক্ষক ভগবান্ শূলপাণির কণ্ঠহারস্বরূপ বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মহত্ব ও গৌরবের বিষয় আর কি বর্ণনা করিব? আমার সেই শক্রকুলকে নমস্কার।" এই শিলালিপিপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইঁহারা শাকদ্বীপীয় তক্ষক-জাতিরই একটি প্রধান শাখা। ঐ শিলালিপিতে তাঁহাদিগের গৌরবের যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয়, তৎকালে তাঁহারা জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই মহাবিক্রমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। শ্বেতদ্বীপ হইতে চীন ও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থানেই তাঁহাদিগের মহতী সেনা অপ্রতিহতগতিতে বিচরণ করিত। দিগ্বিজয়ী মহম্মদের ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায়, ভারতের পঞ্চনদপ্রদেশে জিৎগণের গৌরববিক্রম বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। শেষ অভিযানের পর মহম্মদ যখন স্বদেশযাত্রা করেন, সেই সময়ে কতকগুলি জিৎ মুলতানের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা মহম্মদকে উৎপীড়িত করিলে তিনি বৈরনির্য্যাতনার্থ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হন। উভয়দলে ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হইল। অল্পকালের মধ্যেই জিৎগণ পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই মহাযুদ্ধই তাঁহাদিগের অধঃপতনের মূল। ইঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে অনেকে এখনও সিন্ধু, গঙ্গাযমুনার সৈকতভূমি এবং সৌরাষ্ট্র-উপকূলে অবস্থিতি করিতেছেন। গঙ্গাযমুনার সৈকতভূমে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা জাট এবং সিন্ধুতীর, সৌরাষ্ট্র ও বেলুচিস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তবাসীরা জট নামে পরিচিত। পঞ্জাবে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা অদ্যাপি জিট নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন।

রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশ জাতির মধ্যে যে কয়েকটি শাকদ্বীপীয় জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে একটির নাম হুণ। ইহারা কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। অনুমান হয়, শাকদ্বীপীয় শাকবাহন, কাত্তি (কাত্তিবারা), মল্ল প্রভৃতি জাতিরা যখন ভারবর্ষে প্রবেশ করে, ইহারাও সেই সময় আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। মিবার-ইতিবৃত্তে লিখিত আছে, মুসলমানেরা যে সময় সর্ব্বপ্রথম চিতোর আক্রমণ করে, চিতোর-রক্ষক

রাজপুতগণের সঙ্গে সেই সময় হূণরাজা অঙ্গুটসিংহও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তলেখক ডিগায়নি বলেন, একশ্রেণী চৈন-সম্প্রদায় এই নামে অভিহিত; অঙ্গুটশব্দ জাতিবাচক। যে বংশে তাতার ও মোগলদিগের উৎপত্তি, হূণগণও সেই বংশসম্ভূত। আবুলগাজিও তাতার ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। একখানি খোদিত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে, বিহারের কোন হিন্দুরাজা দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া হূণদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই জাতির সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে যে ভারতের হূণজাতি বিশেষ পরিচিত ছিল, মহাভারতে তাহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে যে হূণজাতির উল্লেখ আছে, তাহারা ম্লেচ্ছমধ্যে পরিগণিত। বশিষ্ঠদেবের সহিত বিশ্বামিত্রের বিগ্রহকালে সুরভিনন্দিনী নন্দিনী রোষান্বিত হইয়া যে সকল সৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হূণজাতি তন্মধ্যে একতম।*

যাহা হউক, এই বীরজাতি ভারতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে যে বারোল্লিপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ প্রদেশে তাঁহাদিগের অনেকগুলি দেবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিছুদিন পরে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হূণেরা সৌরাষ্ট্র ও মিবারে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এক সময়ে যে মহাতেজা হূণজাতি সগর্ব্বে জগতের অধিকাংশ স্থানে আপনাদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, এখন কেবল হাঙ্গেরি ব্যতীত জগতের আর কোন স্থানেই তাঁহাদিগের সেই তেজস্বিতার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় না।

* চিবুকাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ চীনান্ হূণান্ সকেরলান্।
সসর্জ্জ ফেনতঃ নাগৌ ম্লেচ্ছান্ বহুবিধানপি॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ বশিষ্ঠাশ্রমে অতিথিরূপে অভ্যাগত হইয়া বিশ্বামিত্র ঋষি নন্দিনী গাভীর অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের তুমুল সংগ্রাম ঘটে। বশিষ্ঠ ঋষির সাহায্যার্থ নন্দিনী সেই সময় স্বীয় ক্ষমতাপ্রভাবে চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ কেরল ইত্যাদি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মিবার

প্রথম অধ্যায়

রাজস্থানবিভাগ; ভট্টগ্রন্থাদির বিবরণ, বিবিধ শিলালিপি; কনকসেন ও শিলাদিত্য-বিবরণ, বর্ব্বরগণকর্ত্তৃক বল্লভীপুর আক্রমণ এবং বল্লভীপুর পতন।

রাজস্থানের মধ্যে মিবার ও যশল্মীর অতি প্রাচীন ও গৌরবান্বিত। মিবারের নূতন নাম উদয়পুর। টড সাহেবের লিখিত ইতিহাসে সমগ্র রাজস্থানে আটটি প্রধান রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,— মিবার, যোধপুর, কিষণগড়, কোটা, বুন্দি, জয়পুর, যশল্মীর এবং ভারতমরু। ইতিহাসের অনুরোধে বলিতে হয়, অনেকগুলি রাজ্যের দুই দুই নাম। উদয়পুরের প্রাচীন নাম মিবার, যোধপুরের মারবার, কিষণগড়ের বিকানীর এবং জয়পুরের দ্বিতীয় নাম অম্বর। কোটা ও বুন্দি প্রাচীন নাম; ঐ দুইটি রাজ্য একত্রিত হইয়া এখন হারাবতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বলা হইয়াছে, মিবার অতি প্রাচীন রাজ্য, এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। মিবারের রাজোপাধি রাণা। এই রাণাগণকেই সূর্য্যকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। মিবাররাজ্য অনেকবার অনেক বৈরি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। হিন্দুবিদ্বেষী বহুতর বিপক্ষ মিবারের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া গ্রাম নগর ছারখার করিয়া গিয়াছে। জয়বিলাস, রাজরত্নাকর এবং রাজবিলাস গ্রন্থে মিবার রাজ্যের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিগণের বর্ণনা অনুসারে মিবার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ কনকসেন। ২০০ সংবতে কনকসেন সৌরাষ্ট্ররাজ্যে আগমন করেন; কনকসেনের সৌরাষ্ট্রে আগমন সময়ে প্রমারবংশীয় এক জন নরপতি সৌরাষ্ট্রের অধীশ্বর ছিলেন। কনকসেন স্বপরাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বীরনগর নামে আর একটি নূতন নগর রাজা কনকসেন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

কনকসেনের প্রপৌত্র বিজয়সেন। বিজয়পুর নগর সেই বিজয়সেনের সংস্থাপিত। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, মহারাজ বিজয়সেন বল্লভীপুর ও বিদর্ভ নামে আর দুইটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভাওনগরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে সেই প্রাচীন বল্লভীপুরীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। রাণা রাজসিংহের রাজত্বকালীন ঘটনাবলী অবলম্বনে একখানি গ্রন্থ লিখিত হয়। তাহার অবতরণিকায় দেখা যায়, পশ্চিমদিকে সৌরাষ্ট্র নামে একটি রাজ্য আছে। ম্লেচ্ছেরা তাহা আক্রমণ করিয়া সৌরাষ্ট্রের কুলদেবতা বালনাথকে জয় করিয়াছিল। বল্লভীপুরের ধ্বংসসময়ে প্রমাররাজের একমাত্র দুহিতা রক্ষা পাইয়াছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিল।

কোন্ ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক বল্লভীপুরী আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী এইরূপ যে, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে সিন্ধুতটবর্ত্তী শ্যামনগরে পারদ নামক অসভ্য জাতি বাস করিত; তাহারাই বল্লভীপুরীর আক্রমণকারী। প্রাচীন যাদবগণ অনেক দিন শ্যামনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কনকসেনের অধস্তন অষ্টমপুরুষে শিলাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। তিনিই বল্লভীপুরের শেষ রাজা। শিলাদিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে, তাহা অতি চমৎকার। গুর্জ্জররাজ্যের কৈয়র নগরে দেবাদিত্য নামে এক জন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটি কন্যা ছিল; কন্যার নাম সুভগা। যথাকালেই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু বিবাহ-রজনীতেই সুভগা দুর্ভগা হন। সুভগার গুরুদেব তাঁহাকে সূর্য্যদেবের বীজমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুভগা একদা অসাবধানে বিমনস্কভাবে সেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করাতে দিবাকর মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীর ন্যায় সূর্য্যের কৃপায় গর্ভবতী হইয়া সুভগা যমজ পুত্রকন্যা প্রসব করেন। সুভগার পিতা সুভগাকে গর্ভাবস্থায় এক জন দাসীর সহিত বল্লভীপুরে পাঠাইয়াছিলেন; সেই স্থানেই পুত্রকন্যার জন্ম হয়।

সুভগার পুত্রের নাম গয়বী। গূঢ়জ বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। গয়বী শব্দের অর্থ গুপ্ত। এ নামটি মাতৃদত্ত নহে, পাঠশালার বালকেরা তাহাকে ঐ নামে অভিহিত করিয়া নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিত। মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিত; গুপ্ত তাহাতে কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত। মনের দুঃখ মনেই গোপন করিয়া রোদন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইত। রোদন করিতে করিতে সেই সকল উপহাসের কথা জননীকে শুনাইয়া পুনঃ পুনঃ আগ্রহ সহকারে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিত। সুভগা কিছুই উত্তর দিতেন না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হয়; ক্রমে ক্রমে গয়বীর জ্ঞানোদয় হইল।

সহপাঠিগণের দুরাচরণে বারংবার নিপীড়িত হইয়া গয়বী একদা কর্কশস্বরে জননীকে কহিল, "তুমি যদি আমার পিতার নাম আমাকে না বল, এখনই আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব।"—এই কথা শেষ হইতে না হইতে সূর্য্যদেব তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণন করিয়া তাহার হস্তে একখানি শিলাখণ্ড অর্পণ করিলেন; কহিলেন, "এই শিলাখণ্ড দ্বারা তুমি যাহার গাত্রস্পর্শ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে।"

সূর্য্যদত্ত শিলাখণ্ডপ্রভাবে গয়বী ক্রমে ক্রমে উপহাসকারী সহাধ্যায়িগণকে বিনাশ করিল। দেশের রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া গয়বীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া সেই শিলাখণ্ড পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করিলেন। গয়বী তৎপরিবর্ত্তে সেই শিলাখণ্ডস্পর্শে রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিল। তদবধি গয়বীর নাম শিলাদিত্য হইল।

বল্লভীপুরে তৎকালে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটি পবিত্র কুণ্ড ছিল। রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদি সংঘটিত হইলে রাজা শিলাদিত্য সেই পূতকুণ্ডসমীপে গমন করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেন। সূর্য্যের কৃপায় সেই কুণ্ড হইতে সপ্তাননবিশিষ্ট সপ্তাশ্ব নামে একটি প্রকাণ্ড তুরঙ্গম একখানি দেবরথ লইয়া সমুত্থিত হইত। সেই রথে আরোহণ করিয়া শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন; সমস্ত সংগ্রামেই তাঁহার জয়লাভ হইত।

এক জন দুরাশয়, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর কুচক্রে শিলাদিত্যের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। একদল প্রবলপরাক্রান্ত ম্লেচ্ছ যখন বল্লভীপুরী আক্রমণ করিতে আসিল, সেই মন্ত্রী সেই সময় আপন দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত দুষ্টাভিসন্ধি সফল করিয়া তুলিল। সূর্য্যকুণ্ড হইতে দেবতুরঙ্গ সমুত্থিত হয়, মন্ত্রী তাহা জানিত; ম্লেচ্ছ-বৈরিদলকে তাহা বলিয়া দিল। ঐ কুণ্ডে গোরক্ত নিক্ষেপ করিলে কুণ্ড হইতে আর অশ্ব উঠিবে না, অক্লেশেই শিলাদিত্যকে নিপাত করিতে পারা যাইবে। ম্লেচ্ছেরা তাহাই করিল,

দেবকুণ্ড অপবিত্র হইল। শিলাদিত্য কুণ্ডসমীপে সকাতরে করুণকণ্ঠে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিলেন, ও হইতে সপ্তাশ্ব উঠিল না, রথও আসিল না। তিনি হতাশ হইয়া সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, বীরত্ব-প্রকাশে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু ম্লেচ্ছবীরগণের মহাপরাক্রমের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে পরাভূত হইলেন। সেই যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণ গেল। তাঁহার জীবনের সহিত সেই বংশ নির্ম্মূল হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোহের জন্ম, বাপ্পার চিতোর-প্রাপ্তি এবং বাপ্পার জীবনী;

ম্লেচ্ছবিক্রমানলে শিলাদিত্য-পতঙ্গ বিদগ্ধ, বল্লভাপুরী বিধ্বস্ত এবং সমস্ত

শোভাসমৃদ্ধি অস্তমিত; বল্লভীপুরী শ্মশানভূমিতে পরিণত।

রাজা শিলাদিত্যের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন। সকলেই অনুমৃতা হইলেন, কেবল একটিমাত্র রাণী বাঁচিয়া রহিলেন। সেই রাণীর নাম পুষ্পবতী। বিন্ধ্যাচলতলে তৎকালে চন্দ্রাবতী নামে এক নগরী ছিল। প্রমারবংশীয় নরপতিগণ তথায় রাজত্ব করিতেন। সেই প্রমাররাজকুলে রাণী পুষ্প-বতীর জন্ম। শিলাদিত্য যখন রণশায়ী হন, পুষ্পবতী তখন গর্ভবতী। যুদ্ধঘটনার পূর্ব্বে তিনি পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। পিতৃকুলের অধিষ্ঠাত্রী ভবানীদেবীর মন্দিরে উপনীত হইয়া প্রতি-দিন ষোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন, পুত্রকামনায় ভবানীর নিকটে বরপ্রার্থনা করিলেন; ব্রতপূর্ণ হইলে আর তখন পিত্রালয়ে বাস করা অপরামর্শ ভাবিয়া পতিগৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে ঐ সর্ব্বনাশকর যুদ্ধসংবাদ ও রাজাসহ রাজ্যনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। শিরে যেন বজ্র-পাত হইল, সমস্ত আশা-ভরসা ফুরাইয়া গেল, সেই স্থানেই তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। সহচরীগণের শুশ্রূষায় মূর্চ্ছাপনোদন হইলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। গর্ভে সন্তান না থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই আত্মঘাতিনী হইতেন, সন্তানের স্নেহের অনুরোধে তাহা পারিলেন না। পতিগৃহেও গেলেন না, পিত্রালয়েও তিনি ফিরিয়া আসিলেন না, নিকটবর্ত্তী মালিয়া শৈলমালার এক গহ্বরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই গিরিগুহামধ্যেই একটি নবকুমার প্রসূত হইল।

মালিয়া শৈলমালার অতি নিকটেই বীরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী। সেই পল্লীতে একটি ব্রাহ্মণী বাস করিতেন; তাঁহার নাম কমলাবতী; রাণী পুষ্পবতী সেই কমলাবতীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহার হস্তে সেই নবপ্রসূত শিশুটিকে সমর্পণপূর্ব্বক আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। চিতা-প্রবেশের পূর্ব্বে কমলাবতীর চরণে ধরিয়া সবিনয়ে তিনি বলিলেন, "দেবি! প্রাণকুমারকে আপ-নার করে সমর্পণ করিলাম, আপন গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় ইহার লালন-পালন করিবেন। ব্রাহ্মণ-কুমারগণের যেরূপ শিক্ষা হয়, এই শিশুকে সেইরূপ শিক্ষাপ্রদান করিয়া উপযুক্ত সময়ে একটি ক্ষত্রিয়কুমারীর সহিত ইহার বিবাহ দিবেন।"

কমলাবতী উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পুষ্পবতীর জীবনান্তের পর কমলাবতী সেই শিশুর জননীস্থানীয়া হইয়া অপত্যস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। গুহায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া

কমলাবতী সেই পুত্রের নাম রাখিলেন—গুহ। পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিলেন বটে, কিন্তু কমলাবতী তাহাতে সুখী হইতে পারিলেন না, পুত্রটি অতিশয় অশান্ত ও অবাধ্য হইয়া উঠিল। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সেই দৌরাত্ম্য ক্রমে ক্রমে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কমলাবতীর নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া গুহ সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইত, বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিত না; নীড় হইতে বিহগশাবক অপহরণ করিয়া নির্দ্দয়রূপে বধ করিত, কখন বা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পশুশীকারে প্রবৃত্ত হইত।

বালকের বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ। সেই সময়ে তাহার দৌরাত্ম্য এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, কেহই তাহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। এতৎসম্বন্ধে ভট্টকবি বলিয়াছেন, রাজপুত্রের শৈশব-বীর্য্যও দিবাকরের প্রচণ্ড তেজের ন্যায় দুর্দ্দমনীয়।

মিবারের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শৈলমালার অভ্যন্তরে ইদর নামে একটি জনপদ আছে। মাণ্ডলিক নামে এক জন ভীল-রাজা সেই জনপদের অধিকারী। রাজপুত্র গুহ সেই ভীল-বালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিদিন কেবল বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। শান্তভাব তাহার ভাল লাগিত না। শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্র বাস করিতে সে বালক কদাচ ভালবাসিত না। গুহের প্রতি ভীলবালকদিগের এতদূর অনুরাগ জন্মিল যে, ক্রমে তাহারা গুহ ভিন্ন আর কাহাকেও আদর করিতে পারিল না। শৈলকাননকুন্তলা সেই ইদরভূমি ভীলেরা আগ্রহপূর্ব্বক গুহকুমারের করে সমর্পণ করিল। আবুল-ফজলের গ্রন্থে এবং ভট্টকবিকুলের কাব্যে গুহকুমারসম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য বিবরণ লিখিত আছে।

গুহকুমার একদিন ভীলকুমারগণের সহিত খেলা করিতেছে, এমন সময় ভীলকুমারেরা বলিল, "আমাদের মধ্যে এক জন রাজা হউক।" কে রাজা হইবে, এই তর্ক উঠিল; তর্কে তর্কে ক্রমে ক্রমে সকলেই একমত হইয়া বলিল, "গুহকেই রাজা করিব।" তাহাই স্থির হইল। এক জন ভীলবালক তৎক্ষণাৎ আপন করাঙ্গুলি ছেদন পূর্ব্বক শোণিত লইয়া গুহকুমারের ললাটে রাজতিলক অঙ্কিত করিল। বিধাতার লিখন কে খণ্ডন করিবে? নির্জ্জন কাননে ভীলকুমারেরা একটি রাজপুত্রকুমারের ললাটে রাজটিকা দিল, কেহ আর তাহা মোচন করিতে পারিল না। বৃদ্ধ ভীলরাজ মাণ্ডলিক ইহা অবগত হইয়া গুহকেই রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিলেন।

ভীলেরা বন্য, তাহারা যেরূপে ভালবাসার পরিচয় দিল, ক্ষত্রিয়কুমার গুহ সেরূপে তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিল না। মাণ্ডলিক আপন ঔরসজাত পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া গুহকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। গুহ কি করিল? হায়! হায়! গুহ সেই সরলপ্রকৃতি বৃদ্ধ ভীলরাজের প্রাণসংহার করিল। কাহার পরামর্শে কি অভিসন্ধিতে গুহ এরূপ নৃশংস কার্য্য করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর। গুহের নাম তাহার বংশধরগণের প্রধান গোত্রাখ্যানরূপে ব্যবহৃত হইল। গুহের বংশধরেরা "গোহিলোট" অথবা "গিহ্লোট" উপাধিতে বিখ্যাত।

গুহের পর সেই বংশের আট পুরুষ গিরিকাননপূর্ণ ইদর প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ চিরদিন রাজপুতচরণে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া পরাধীনতা সহ্য করিয়াছিল। আট পুরুষের পর ভীলেরা আর তাহা পারিল না। অধস্তন অষ্টমপুরুষে নাগাদিত্য নামে এক রাজপুত্র রাজা হন। তিনি একদা বনমধ্যে মৃগয়া করিতেছিলেন, ভীলেরা তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া আপনাদের পৈতৃকরাজ্য আপনারা গ্রহণ করিল।

নাগাদিত্য-নিধনের পর তাঁহার পরিবারমধ্যে হাহাকার পড়িল। চারিদিকে ভীল, চারিদিকে

বিপদ্, চারিদিকে বিভীষিকা, চারিদিকেই ভীলগণের ক্রোধমূর্ত্তি। তাহাদের কবল হইতে রাজপুত-মহিলাগণকে রক্ষা করিবে কে? রাজপুতেরা এই চিন্তায় আকুল হইল। নাগাদিত্যের তখন তিনবর্ষ বয়স্ক একটি শিশুপুত্র ছিল; তাহার নাম বাপ্পাদিত্য। বাপ্পার নিমিত্তই অধিক ভাবনা। কে রক্ষা করিবে? বিধাতাই রক্ষাকর্ত্তা। বিধাতা কখনও সূর্য্যবংশ ধ্বংস করিবেন না, ইহাই সূচিত হইল। সেই বীরনগরবাসিনী ব্রাহ্মণকুমারী কমলাবতী—যিনি অসহায় অবস্থায় সুভগাকুমার গুহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধরেরা এই সঙ্কটকালে বাপ্পাদিত্যকে বাঁচাইলেন। তাঁহারা গিহ্লোট রাজপরিবারের কুলপুরোহিত। নাগাদিত্যের শিশুপুত্র বাপ্পাকে লইয়া তাঁহারা ভাণ্ডীর-দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় যদুবংশীয় এক জন ভীল তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। সে স্থানও সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হইল না। সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বাপ্পাকে তথা হইতে পরাশরারণ্যে লইয়া গেলেন। সেই স্থানেই ত্রিকুটপর্ব্বত। ত্রিকুটতলে নগেন্দ্র নামে একটি সামান্য নগর। সেই নগরের ব্রাহ্মণেরা সকলেই শান্তিপ্রিয় এবং ভগবান্ শঙ্করের উপাসক। বাপ্পাদিত্য সেই শান্তশীল বিপ্রগণের রক্ষণাধীনে অর্পিত হইল।

পঞ্চ-ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাপ্পাদিত্য সেই সকল আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের ধেনুচারণ করিত। সূর্য্য-বংশীয় রাজকুমারের বনে বনে গোচারণ বিস্ময়কর ব্যাপার, ইহা কেহই ভাবিত না। বাপ্পাদিত্য পরিণামে কি হইবেন, তাহাও কেহ ভাবিত না। ভট্টকবিগণ সেই সময়ের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন।

ঝুলনপূর্ণিমা রাজপুতগণের একটি সুপ্রসিদ্ধ আনন্দোৎসব। এই উৎসবকাল উপস্থিত হইলে বালকবালিকাগণ মহানন্দে মত্ত হয়। নগেন্দ্রনগরে শোলান্‌কিবংশীয় এক রাজা ছিলেন। ঝুলন-পর্ব্ব সমাগত হইলে সেই রাজার একটি কন্যা সহচরিগণ সমভিব্যহারে ক্রীড়াকৌতুকার্থ কুঞ্জকাননে গমন করেন। ঝুলনমঞ্চে দুলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু দোলারজ্জুর অভাবে তাঁহারা চিন্তিতা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় বাপ্পা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন। বালককে দেখিবা-মাত্র বালিকাগণ তাহাকে বলিল, "তুমি একগাছা রজ্জু আনিয়া দাও।" বাপ্পা অতি চঞ্চলস্বভাব অথচ কৌতুকপ্রিয়; বালিকাগণের কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি রজ্জু দিতে পারি। বালিকাগণ তাহাতেই সম্মত হইল।" ক্রীড়াচ্ছলে কৌতুকবিবাহ সেই স্থলেই সম্পন্ন হইল। রাজকুমারীর ওড়্‌নার সহিত বাপ্পার পরিহিত বসনাগ্র একত্র সংবদ্ধ হইল। সমস্ত বালিকাগণ পরস্পর পরস্পরের করধারণ পূর্ব্বক বাপ্পার সহিত একত্র একটি প্রকাণ্ড সহকারতরুর চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিল। কি হইল, বাপ্পা তখন কিছুই বুঝিলেন না, পরিণামে কি হইবে, তাহা ভাবিতেও পারিলেন না।

শীঘ্রই বিচ্ছেদ হইল। বাপ্পা আর অধিকদিন নগেন্দ্রনগরে থাকিতে পারিলেন না, অচিরে তাঁহাকে নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই রাজপুত-বালিকাগণ তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়িল। সেই মহিলাগণের গর্ভে যে সকল পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিল, তাহাদের বংশাবলী এখন পর্য্যন্ত রাজপুতনায় আছে। পূর্ব্বকথিত লীলাপরিণয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাহারা আপনাদিগকে বাপ্পাকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে দিন সেই লীলা-বিবাহ, রাজপুত-বালিকাগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিয়া সে দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিয়দ্দিন অতীত হইলে সেই শোলান্‌কি-রাজকুমারী বিবাহের উপযুক্তা হইলেন। তাঁহার পিতা একটি সুপাত্র স্থির করিলেন। বিবাহের অগ্রে পাত্রগৃহ হইতে এক জন সামুদ্রিক

ব্রাহ্মণ সেই রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার করপাত্রিকা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাজা কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া কন্যাটিকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কন্যার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া আগ্রহসহকারে ব্রাহ্মণ তাহার পাণিতল পরীক্ষা করিলেন; বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি! পূর্ব্বেই ইহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

রাজা মহা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পুরীশুদ্ধ সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন। কোথায় কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, কন্যা তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য রাজা অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। ঘটনাক্রমে বাপ্পাও ক্রমে ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, ছন্দাংশেও সে কথা প্রকাশ পাইলে তিনি বিপদে পড়িবেন; অতএব কোন গতিকে কিছু প্রকাশ না হয়, তদর্থে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া রহিলেন। বাপ্পার সহিত যে সকল রাখাল বালক ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকেও তিনি সাবধান করিয়া দিলেন। বালকেরা তাঁহার যেরূপ অনুগত, তাঁহার প্রতি তাহাদের যে প্রকার ভক্তি, তাহাতে আদেশ লঙ্ঘনের কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল না, তথাপি বাপ্পা তাহাদিগকে এক কঠোর অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ করিলেন। স্বহস্তে একটি সংকীর্ণ কূপখনন করিয়া হস্তে এক শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বালকগণকে তিনি কহিলেন, "আইস, শপথ কর, সম্পদে বিপদে তোমরা আমার চিরানুগত থাকিবে। আমার সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না; আমার নামে যেখানে যাহা শুনিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমাকে আসিয়া জানাইবে। এই অঙ্গীকার যদি পালন করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমস্ত সৎকার্য্য এই শিলাখণ্ডের ন্যায় রজককূপে নিক্ষিপ্ত হইবে।" রাজপুত-বিশ্বাসে রজককূপ অতি অপবিত্র স্থান। বালকগণকে ঐরূপে অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত বাপ্পা সেই প্রস্তরখণ্ডটি পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্রকূপে নিক্ষেপ করিলেন। বালকেরা তৎক্ষণাৎ সমস্বরে সেইরূপ শপথ গ্রহণ করিল। এত সতর্কতা সত্ত্বেও বাপ্পা সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না. অল্পদিনমধ্যেই গুপ্তবিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। শোলান্‌কিরাজ বিশেষ প্রমাণে বুঝিতে পারিলেন, লীলাবিবাহে বাপ্পাই প্রধান নায়ক।

রাখাল বালকেরা জনশ্রুতিতে এই বিষয় জানিতে পারিয়া বাপ্পার নিকটে সমাচার দিল। বাপ্পা তচ্ছ্রবণে বিপদাশঙ্কা করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। অধিকদূরে গমন করিতে হইল না, সেই পর্ব্বতমালার এক নিভৃততম বিজনস্থলে সঙ্গোপনে তিনি আশ্রয় লইলেন। দুইটি ভীলবালক তাঁহার সঙ্গে রহিল; তাহাদের নাম বালীয় এবং দেব। উহারা বন্য ভীলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু হৃদয় পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ। গৃহবাস, আত্মীয়স্বজন এবং শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বাপ্পার সহিত বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। কতবার কত বিপদে পতিত হইয়াছে, কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় দিবাযামিনী যাপন করিয়াছে, তথাপি অঙ্গীকার-পালনে তাহারা পরাঙ্মুখ হয় নাই; মুহূর্ত্তের জন্যও বাপ্পাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা বাপ্পার জীবনসহচর। বাপ্পা যদি সেরূপ বন্ধু না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে অনেক দুর্গতি হইত; তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত হয় ত মিবারের রাজকুলের কুলপঞ্জী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

সেই ভীলবন্ধুযুগলের সহবাসে বাপ্পা অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কালচক্রের অসংখ্য পরিবর্ত্তনেও বাপ্পার পরবর্ত্তী বংশধরগণ অভিষেককালে অদ্যাপি সেই ভীলদিগের পুত্রপৌত্রাদির প্রদত্ত রক্ততিলক সাদরে ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন।

বাপ্পার পলায়ন এবং পলায়নের প্রকৃত কারণ যুক্তিপথে সুসঙ্গত বোধ হয়; কিন্তু ভট্টকবিগণ ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করেন নাই। তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ যে, দৈবনির্দ্দেশবশতই বাপ্পা তখন নগেন্দ্রনগর-পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভট্টকবিগণের কাব্যগ্রন্থে বাপ্পাদিত্যের জীবনী নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে মিবারবাসিগণের এতদূর দৃঢ় অনুরাগ যে, সে সকল অলঙ্কার উন্মোচন করিবার প্রয়াস পাইলে তাঁহাদের মতে দেবগণের অপমান করা হয়। কবিরা বলেন, সূর্য্যবংশীয় শিলাদিত্যের বংশধর বাপ্পাদিত্য বনমধ্যে ব্রাহ্মণগণের গরু চরাইয়া বেড়াইতেন; সেই গাভীগণের মধ্যে একটি পয়স্বিনী গাভী ছিল। দিনান্তে সেই গাভী আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে তাহার স্তন হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দুগ্ধ নির্গত হইত না। ইহাতে ব্রাহ্মণদের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইত। তাঁহারা ভাবিতেন, বাপ্পা বিজনে গাভীস্তনের সমস্ত দুগ্ধ পান করিয়া আইসে; এই সন্দেহে তাঁহারা সর্ব্বদা সতর্কভাবে বাপ্পার প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করেন। বাপ্পা তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কি করিবেন, যতদিন তাঁহাদের সেই সন্দেহ নিরাকৃত করিবার প্রকৃত উপায় অবধারিত না হয়, তত দিন মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া মৌন থাকিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলেন। তাঁহার মনেও একটি সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, সেই সন্দেহবশেই তিনি উক্ত পয়স্বিনী গাভীর গতিক্রিয়ার প্রতি সর্ব্বক্ষণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। বনমধ্যে গাভী যে দিকে যায়, বাপ্পাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে গমন করেন। গাভী এক দিন একটি নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে প্রবেশ করিল, বাপ্পাও গুপ্তভাবে তথায় গমন করিলেন। অদ্ভুত দৃশ্য! বাপ্পা দেখিলেন, এক নিবিড় লতাগুল্মের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া পয়স্বিনী বর্ষাধারার ন্যায় পয়োরাশি বর্ষণ করিতেছে। বাপ্পার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, লতামণ্ডপসমীপে গমন করিয়া তিনি দেখিলেন, তন্মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত; সেই শিবলিঙ্গের মস্তকেই দুগ্ধধারা সিঞ্চিত হইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য ব্যতীত আর একটি দৃশ্য সেই সময় বাপ্পার নেত্রগোচর হইল। সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে এক বেতস-বন; তাহার অভ্যন্তরে এক জন যোগী নেত্রনিমীলন করিয়া সমাসীন;—ধ্যান-মগ্ন। বাপ্পা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল।

অসময়ে যোগিগণের ধ্যানভঙ্গ হইলে ক্রোধের উদয় হয়, কিন্তু এই যোগিবর উন্মীলিত-নয়নে বাপ্পাকে দেখিলেন, ধ্যানবিঘ্নকারী জানিলেন, তথাপি কিছুমাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। বাপ্পা কিয়ংক্ষণ তাঁহার সম্মুখে করপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই গিরিকন্দর নির্জ্জন, অভ্যন্তরভাগ চিরশান্তির নিলয়, যোগী ও তপস্বী ভিন্ন অপরে সেই পবিত্র স্থল কখন [illegible] না; পুণ্যবলে বাপ্পা তাহা দেখিলেন। শিবলিঙ্গের মস্তকে পয়স্বিনীর যে পয়োধারা ব[illegible]ত ত, যোগিবর তাহা পান করিতেন। ইতিহাস-প্রমাণে সেই যোগীর নাম হারীত।

রাজকুমার বাপ্পা হারীতের পদতলে প্রণিপাত করিলেন। হারীত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বপরিচয় বাপ্পার পরিজ্ঞাত ছিল না, যতদূর জানা ছিল, অকপটে তাহাই তিনি যোগিবরকে কহিলেন। সে দিন আর অন্য প্রসঙ্গ কিছুই উপস্থিত হইল না। যথা-সময়ে বাপ্পা ধেনুপাল লইয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যে দিন গিরিগুহামধ্যে হারীতের সহিত বাপ্পার প্রথম সাক্ষাৎ, তাহার পরদিন হইতে বাপ্পা প্রতিদিন তাঁহার নিকট গমন করিতেন; প্রতিদিনই ভক্তিসহকারে তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া পানার্থ দুগ্ধ উপহার দিতেন। যোগিবর হারীত ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বরের উপাসক; কাননমধ্যস্থ সেই শিবলিঙ্গের পূজা করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। বাপ্পা প্রতিদিন শিবপূজার উপযোগী

কুসুমচয়ন করিয়া আনিতেন। বাপ্পার অকপট ভক্তিদর্শনে হারীত নিত্য নিত্য পরমপ্রীতি লাভ করিতেন; অবকাশক্রমে তাঁহাকে নানারূপ নীতিশিক্ষা প্রদান করিতেন, তাঁহার কৌতুক হইত।

কিছু দিন অতিক্রান্ত হইল। ক্রমে ক্রমে বাপ্পার প্রতি হারীত এতদূর প্রসন্ন হইলেন যে, তাঁহাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিলেন। তদবধি বাপ্পার উপাধি হইল, "একলিঙ্গকা দেওয়ান।"

বাপ্পার অকপট ভক্তিতে ভগবতী পার্ব্বতীও প্রীত হইয়াছিলেন। একদা তিনি শূন্যমার্গ হইতে কেশরী আরোহণে বাপ্পার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত শূল, খড়্গ, ধনুঃশর, তূণীর এবং অসি-চর্ম্ম প্রভৃতি বহুতর দিব্যাস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভূতনাথের কৃপায় ভবানী-প্রদত্ত দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাপ্পা শত্রুকুলের অজেয় হইয়া উঠিলেন।

যোগিবর হারীতের মহাপ্রস্থানের দিন সমাগত হইল। যে দিন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, সেই দিন অতি প্রত্যূষে বাপ্পাকে ঐ গিরিগুহায় উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাপ্পা সে দিবস ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে বাপ্পা তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, যোগিবর হারীত এক দীপ্তিময় রথে আরোহণপূর্ব্বক শূন্যপথে কিয়দ্দূর উত্থিত হইয়াছেন। প্রিয়-শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত যোগিবর ইচ্ছানুসারে রথের গতিরোধ করিলেন এবং বাপ্পাকে তৎসমীপে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। অকস্মাৎ বাপ্পার দেহ বিংশতি হস্ত বাড়িয়া উঠিল; তাহাতেও তিনি গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যোগিবর তাঁহাকে মুখব্যাদান করিতে কহিলেন। বাপ্পা আদেশপালনে বিরত হইলেন না। হারীত তাঁহার মুখবিবরে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলেন। ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বাপ্পা মুখ অবনত করাতে সেই নিষ্ঠীবন তদীয় পদতলে নিপতিত হইল। যদি তিনি ঘৃণা না করিতেন, তাহা হইলে অমরত্বলাভ করিতে পারিতেন। যদিও অমর হইতে পারিলেন না, কিন্তু যোগিবরের প্রসাদে তাঁহার দেহ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের অভেদ্য হইবে, এইরূপ বরলাভ হইল। হারীতের রথ অচিরকালমধ্যে সুনীল নভোমণ্ডলে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কবিগণের কাব্যগ্রন্থে বাপ্পার সম্বন্ধে অনেক প্রকার অদ্ভুত কথা বর্ণিত আছে। তাঁহার পরিধেয়-বসন অর্দ্ধসহস্র হস্ত দীর্ঘ ছিল এবং ভগবতী ভবানীর নিকটে তিনি যে তরবারিখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ বত্রিশ সের।

বাপ্পা যে দিন ঐরূপ গুরুদত্ত বরে অনুগৃহীত হইলেন, সেই দিন হইতে তিনি মূলমন্ত্রের সাধনায় কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বরদায়িনীমূর্ত্তিতে সিদ্ধি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। বাপ্পা একদা জননীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি চিতোরের তদানীন্তন মৌর্য্যনৃপতির ভাগিনেয়। সেই সম্বন্ধবন্ধনের বিষয় স্মরণ করিয়া বাপ্পা ইষ্টমন্ত্রসাধনে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইলেন। তদবধি কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে তিনি সেই আরণ্যবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকালয়ে দর্শন দিলেন। লোকালয়-দর্শন তাঁহার সেই প্রথম। লোকালয়ের জীবন্ত ভাব দর্শন করিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বননিবাস হইতে বহির্গত হইবার সময় প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ নামক সিদ্ধপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে একখানি সুদীর্ঘ তরবারি প্রদান করিলেন। সেই মহাস্ত্রের উভয়দিক্ সুশাণিত। মন্ত্রপূত করিয়া সেই প্রচণ্ড তরবারি-সাহায্যে গিরিগাত্র বিদারণ করা যায়। যাঁহার প্রদত্ত সেই তরবারি, সেই সিদ্ধপুরুষ ব্যাঘ্রমেষ

পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। উদয়পুরের পূর্ব্বদিকস্থ গিরিপথের সাত মাইল দূরে ব্যাঘ্রমেরু পর্ব্বত। সিদ্ধপুরুষপ্রদত্ত সেই পবিত্র তরবারি আজিও উদয়পুরে আছে। রাণা আপন সামন্তদলের সহিত প্রতি বর্ষে ভক্তিসহকারে সেই তরবারির পূজা করিয়া থাকেন। খড়্গশুদ্ধির মন্ত্র এইরূপ,—"গুরু গোরক্ষনাথ, দেবদেব একলিঙ্গ তক্ষক, মহর্ষি হারীত এবং ভবানীর আজ্ঞাক্রমে আঘাত কর।"

প্রমারবংশের একটি শাখা মৌর্য্যবংশ। সেই বংশের নরপতিগণ ইতিপূর্ব্বে মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা তদানীন্তন ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি। বাপ্পা যে সময় চিতোরে উপস্থিত হন, তৎকালে চিতোরে যে মৌর্য্যনরপতি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নাম মান। বাপ্পার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মানরাজ তাঁহাকে পরমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আপন অধীনস্থ সামন্ত-সমিতির নায়কত্বে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মানসিংহের শাসন-সংক্রান্ত যে প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়, রাজস্থানে তৎকালে সামন্তপ্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। রাজপুত-সামন্তগণ বিপুল ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া রাজার সাহায্যার্থ বিপক্ষসমরে অবতীর্ণ হইতেন। বাপ্পার আগমনের পর হইতে সন্তানগণের প্রতি রাজার অনুরাগ ও যত্ন হ্রাস হইতে লাগিল। বাপ্পাই সমরবিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। সামন্তেরা বাপ্পাকে শত্রু বিবেচনা করিয়া হিংসাবশে তাঁহার অনিষ্টসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এই সময় এক মহাবল বৈদেশিক বৈরি কর্ত্তৃক চিতোরপুরী আক্রান্ত হয়। রাজা মানসিংহ আপন অধীনস্থ সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করেন। সামন্তেরা সগর্ব্বে আপনাদের বৃত্তিমূল সনন্দপত্রগুলি তাচ্ছল্য ভাবে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমরা কোন কার্য্যের নহি। আমাদিগকে আহ্বান কেন? আপনার প্রিয়সেনানী বাপ্পাকেই সমররঙ্গে বরণ করুন।" রাজা মানসিংহ সামন্তগণের এইরূপ উক্তিতে ক্ষুব্ধ হইলেন. তাঁহার অন্তরে কিছু ভীতি-সঞ্চার হইল; কিন্তু বীরবর বাপ্পা সামন্তগণের সদর্পবাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বয়ং সুদৃঢ় বর্ম্মাবৃত শরীরে সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন। গর্ব্বিত সামন্তগণ রাজবৃত্তি পরিহার করিলেও সুসজ্জিত সেনাপতির অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেন। বাপ্পার বিপুল পরাক্রমে বিপক্ষদল পরাজিত হইল। সামন্তগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। রাজা মানসিংহের বিজয়নিনাদে নগরডঙ্কা বাদিত হইতে লাগিল। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাপ্পা সেই রণজয়ী বেশে চিতোরনগরে মাতুল-সমীপে গমন না করিয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের রাজধানী গজনীনগরে গমন করিলেন। এক জন ম্লেচ্ছরাজ তৎকালে গজনীর অধিপতি ছিলেন; তাঁহার নাম সেলিম। বাপ্পা সেই সেলিমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সূর্য্যবংশীয় এক জন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সেনাদল সমভিব্যাহারে সগৌরবে চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, সেলিমকে পরাজিত করিয়া সেলিমের একটি কন্যাকে বাপ্পা স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিলেন।

বাপ্পার বীরত্বে ও গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়া চিতোরের পুরাতন সর্দ্দারগণ চিতোর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন। রাজা মানসিংহ তাহাতে সুখী হইলেন না। সর্দ্দারগণকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি বারংবার দূত প্রেরণ করিলেন, সমস্তই বিফল হইল। সামন্তগণ কিছুতেই বিষম বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অধিক কি, গুরুর অনুরোধ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল। এক জন রাজদূতকে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমরা মানসিংহের নিমক খাইয়াছি, বহুদিন তাঁহার অধীনে সসম্মানে দিনপাত করিয়াছি, এক বৎসর বিশ্বাস নষ্ট করিব না, এক বৎসরকাল প্রতিশোধ লইতে নিবৃত্ত থাকিব।"

চিতোরের গৌরব নষ্ট করা চিতোরের সামন্তগণের ব্রত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এক জন উপযুক্ত অধিনায়কের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি না হইলে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের ঘোষণাবাক্য। প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া তাঁহারা এক অনার্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, বাপ্পাকে পাইয়া রাজা আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই বাপ্পাকেই আমরা বৈরনির্য্যাতনের সহায় করিয়া লইব। সেই সঙ্কল্পই স্থির হইল। অবশেষে বাপ্পার অসীম শৌর্য্য ও গুণগৌরবের বশীভূত হইয়া তাঁহারা সম্মান সহকারে বাপ্পাকেই আপনাদের সেনাপতি নির্ব্বাচন করিলেন। অহো! রাজ্যলিপ্সা কি ভয়ঙ্করী! ইহার মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মনুষ্যেরা হিতাহিত বিবেক পরিত্যাগ করে, ধর্ম্ম-জ্ঞানে জলাঞ্জলি দেয়, পবিত্র কৃতজ্ঞতাকে দমন করিয়া চির-উপকারী সুহৃজ্জনের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সামন্তেরা রাজ্যলিপ্সায় প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয় নাই, কিন্তু বীরবর বাপ্পা রাজ্য-লোভেই দুরাকাঙ্ক্ষ সামন্তগণের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেন। মানরাজ তাঁহার মাতুল, তাঁহার অনুগ্রহই তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রধান হেতু। তিনি তাঁহার জন্য আপন সামন্তগণের বিষনয়নে পতিত, অথচ বাপ্পা তৎসমস্ত বিস্মৃত হইয়া, তৎকৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনচ্যুত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মাতুলকে বিনাশ করিয়া বিদ্রোহী সামন্তগণের সহায়তায় চিতোরের সিংহাসন অধিকার করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল। বাপ্পা তখন দৈববলে বলীয়ান্, দেবদত্ত অসি তাঁহার সহায়, ধর্ম্মবিরোধী হইলেও তাঁহার সেই সঙ্কল্পসাধনে বিলম্ব হইল না। বাহুবলে মানসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনি চিতোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে "হিন্দুমুকুট" "হিন্দুসূর্য্য" "রাজগুরু" ও "সার্ব্বভৌম" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যের সময় অনেক প্রকার সহায়লাভ হয়। বাপ্পাসিংহ চিতোরাধিপতি হওয়াতে চিতোরের সামন্তগণ তাঁহার অনুবল হইয়া রহিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য; তদতিরিক্ত রাজস্থানের অপরাপর রাজ্য হইতেও অনেক বীরপুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অপর কোন বলবান্ রাজা কিছু দিন চিতোর আক্রমণে সাহসী হইলেন না। বাপ্পা নিরুদ্বেগে নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কতকগুলি পুত্র তাঁহাদের পৈতৃকরাজ্য সৌরাষ্ট্রদেশে গমন করিল। তাহাদের সন্তানগণ পর্য্যায়ক্রমে ঘোরতর প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আইন আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বাপ্পা-বংশের পঞ্চাশৎ সহস্র বীর আকবর শাহের সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া নানাস্থানে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। বাপ্পার পাঁচটি পুত্র মারবার রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় গোহিল নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা মারবারে থাকিতে পারেন নাই; শীঘ্রই বিপক্ষকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা বল্লভীপুরের ধ্বংসাবশেষ পুরীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন। তথায় তাঁহারা দীনভাবে কালযাপন করিতেছেন। আপনাদিগের পবিত্র কুলগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা এখন আরবদিগের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

পরিণতবয়সে বাপ্পারাও আপন মাতৃভূমি, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতীচ্য খোরাসান রাজ্যে উপস্থিত হন। খোরাসান জয় করিয়া তিনি তত্রত্য অনেকগুলি ম্লেচ্ছ-কামিনীকে বিবাহ করেন। সেই সকল কামিনীর গর্ভে বাপ্পার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

শতবর্ষ বয়ঃক্রমে বীরকেশরী বাপ্পা মানবলীলা সংবরণ করেন। কৈলবারার রাজনিকেতনে একখানি প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহার নির্ঘণ্টমধ্যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাণ, তুরাণ ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় নানা প্রদেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া বাপ্পা তাঁহাদিগের দুহিতৃগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সকল রাণীর গর্ভে বাপ্পার ঔরসে একশত ত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল পুত্র "নৌসেরা পাঠান" নামে বিখ্যাত। তাহারা আপনাদের জননীর নামানুসারে এক একটি স্বতন্ত্র বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। হিন্দুমহিষীগণের গর্ভে বাপ্পার অষ্টনবতিটি পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয় অগ্নি-উপাসক।

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, বাপ্পার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দেহের সংকারসম্বন্ধে তদীয় হিন্দু ও ম্লেচ্ছ সন্তানগণের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুপুত্রেরা দাহ করিতে অনুরাগী, মুসলমানপুত্রেরা ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য ব্যগ্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও ঘটিয়াছিল, কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারেন নাই; দাহ কি সমাধি এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসাও হয় নাই। দ্বন্দ্বকালে পুত্রেরা পিতার দেহাবরণ উত্তোলন করিয়া দেখিয়াছিল, পঞ্চভূতাত্মক দেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম বিরাজ করিতেছে। সেই সকল পদ্ম তথা হইতে মৃণালসহ উৎপাটিত করিয়া মানস সরোবরে স্থাপন করা হইয়াছিল। এক জন কবি লিখিয়াছেন, যবনকন্যাগণকে বিবাহ করিবার পর বাপ্পা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুমেরু-শিখরে তপস্যা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, শিলাদিত্যের রাজত্বকালে ২০৫ সংবতে বল্লভীপুরী উৎসন্ন হয়। বাপ্প রাও শিলাদিত্যের অধস্তন নবম পুরুষ। রাণার প্রাসাদে যে সকল ভট্টগ্রন্থ রক্ষিত আছে, তাহার সহিত এ বর্ণনার মিল নাই। সে সকল গ্রন্থে লিখিত আছে, ১৯০১ সংবতে বাপ্পারাওয়ের জন্ম। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতুল কর্ত্তৃক সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়া সামন্তগণের আনুকূল্যে মাতুলকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। এই সকল বিরোধী মতের মধ্যে কোন্‌টি পরিশুদ্ধ, ইতিহাস দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না উদ্যমশীল টড সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল বিরোধী মতের যথাসম্ভব সমন্বয়সাধন করিয়াছিলেন। শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, খোদিত স্তম্ভ প্রভৃতি নিদর্শনে মিবার রাজ্যের যতদূর সত্য পরিচয় পাওয়া যায়, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে টড সাহেব সেই সকল ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর টড সাহেব সৌরাষ্ট্রনগরে সোমনাথদেবের মন্দিরগাত্রে একখানি শিলালিপি দর্শন করেন। সেই লিপিখানির সাহায্যে তিনি নানাপ্রকার সত্য-সামঞ্জস্য স্থির করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সেই শিলালিপিতে "বল্লভী সংবৎ" নামে একটি বর্ষগণনার উল্লেখ আছে। বিক্রমাদিত্য-সংবতের তিন শত পঁচাত্তর বৎসর পরে তাহা প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ২০৫ সংবতে বল্লভীপুরী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেই সংবৎ বিক্রমাদিত্য সংবৎ নহে, বল্লভী-সংবৎ।

বাপ্পা যৎকালে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র। মিবাররাজ্যের মধ্যে আইতপুর নামে একটি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সে নগর এক্ষণে অসভ্য ভীল ও বন্য পশুকুলের আশ্রয়স্থান হইয়াছে। আইতপুরের ধ্বংসরাশির মধ্যেও একখানি স্মারকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ শক্তিকুমার পর্য্যন্ত মিবারের চতুর্দ্দশ নৃপতির বংশবিবরণ সেই লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বাপ্পার নামও তাহাতে আছে। সে লিপিতে তিনি শৈল নামে

বর্ণিত। রাজপরিবারের কোষ্ঠীপত্রিকার সহিত উক্ত শিলালিপির প্রায় সকল বিষয়েই ঐক্য আছে, কেবল একটিমাত্র নাম শিলালিপিতে অধিক; ভট্টগ্রন্থেও ঐরূপ।

হিউম সাহেব বলিয়াছেন, ভট্টকবিরা যদিও আপনাদের কল্পনাবলে প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেন, যদিও তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সত্যঘটনার অঙ্গে অদ্ভুত অদ্ভুত অলঙ্কার জড়িত করিয়া দেন, তথাপি তাঁহারাই প্রাচীন জগতের একমাত্র ইতিহাসবেত্তা। তাঁহাদের অতিরঞ্জনের অভ্যন্তরেও প্রকৃত সত্য সর্ব্বদা বিরাজ করে। কবিকল্পনার মহিমাকে যাঁহারা অনাদর করেন, তাঁহারা পণ্ডিত-বর হিউম সাহেবের ঐ সার কথাগুলি স্মরণ করিবেন। আদিত্যপুরীর ধ্বংসরাশির সহিত যে নৃপ-নামাবলী লোকলোচন হইতে অন্তরিত হইতেছিল, কবিকল্পনার মহিমায় নিবিড় আবরণেও সেই সকল নাম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।

বাপ্পারাওয়ের সমসময়েই মুসলমানেরা সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতভূমি আক্রমণ করিয়াছিল। পঞ্চনবতিতম হিজিরা-শকে খলিফা ওয়ালীদের সেনাপতি মহম্মদ বীন কাশিম সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভাগীরথীর সৈকতভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আরবগ্রন্থকারেরা এই সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে লিখিয়াছেন। অজমীরাধিপতি মাণিকরায়ের রাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে একদল বৈরী কর্ত্তৃক উৎসন্ন হইয়াছিল। সেই বৈরিদল সমুদ্রপথে পোতারোহণে আগমন করিয়া আজ্মর নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়। অনেকে অনুমান করেন, সেই আক্রমণকারী বৈরী দুর্দ্ধর্ষ বীরকেশরী বীন কাশিম। আবুলফজল লিখিয়াছেন, হিজিরা ৯৫ অব্দে কাশিম সদর্পে সিন্ধুরাজ দাহিরকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য নষ্ট করেন। দাহিরের পুত্র চিতোরে পলায়ন করিয়া মৌর্য্যনৃপতির নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বাপ্পা ও শক্তিকুমারের রাজত্বকালের মধ্যবর্ত্তী সময় দুই শত বৎসর। ইহার মধ্যে নয় জন নৃপতি চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন প্রধান;—কনক-সেন, শিলাদিত্য, বাপ্পারাও এবং শক্তিকুমার।

তৃতীয় অধ্যায়

বাপ্পার বংশাবলী—আরব আক্রমণ।

বাপ্পার রাজসিংহাসন-পরিত্যাগের পর সমরসিংহের রাজত্ব পর্য্যন্ত চারি শতাব্দীকাল মিবার-ইতিবৃত্তগ্রন্থে একটি প্রধান যুগস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাপ্পা ৭৮০ সংবতে চিতোর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ছত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসনের পর, ৮২০ সংবতে পারস্যরাজ্যে গমন করেন। সেই সময় হইতে সমরসিংহের রাজত্বকাল ১২৪৯ সংবৎ পর্য্যন্ত চারি শতাব্দীর মধ্যে অষ্টাদশ জন নৃপতি চিতোর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই অষ্টাদশ নৃপতির কীর্ত্তিগরিমা আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই স্বর্ণবর্ণে সুরঞ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভট্টকবিগণ ইতিবৃত্তগ্রন্থে ইঁহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ বর্ণন করেন নাই।

বাপ্পা ও সমরসিংহের মধ্যবর্ত্তী কালের ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।

কোন ইতিবৃত্তগ্রন্থপাঠে ইহার সত্যের আবিষ্কার করা কঠিন। ফেরেস্তা গ্রন্থে এ বিষয়ের যে কিছু বর্ণনা আছে, তাহাও জটিল ও দুর্বোধ। খোমানরাস প্রভৃতি দুই চারিখানি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, যে সময়ে ভারতে মুসলমানধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এবং ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী দিগ্‌বিজয়ী আর্য্যবৈরী দুর্দ্দান্ত গজনরাজের করগত হয়, সেই ব্যবধানগতকালের মধ্যে দুর্দ্দম আরবেরা ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিল। খোমানরাস গ্রন্থের এক স্থানে স্পষ্টই লিখিত আছে, বাপ্পা ও সমরসিংহের মধ্যবর্ত্তী ৮১২ ও ৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানেরা একবার চিতোর আক্রমণ করিয়াছিল। আইতপুরে একখানি প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে, বাপ্পা ও সমরসিংহের মধ্যবর্ত্তী কালে সম্ভবতঃ ১০২৪ সংবতে চিতোরের সিংহাসনে শক্তিকুমার নামে এক হিন্দু রাজা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর একখানি খোদিত লিপিতে দৃষ্ট হয়, শক্তিকুমারের চারিপুরুষ পূর্ব্বে ৯২২ সংবতে উন্নুলনামা নৃপতি চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চিতোরবিজয়ের অব্যবহিত পরেই বাপ্পারাও সৌরাষ্ট্ররাজ্যে যাত্রা করেন। ইসফগুল নামক সৌরবংশীয় এক রাজা সেই সময় দেববন্দরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই ইসফগুলই আনহুলবারাপত্তনের প্রতিষ্ঠাতা বাণরাজের পিতা। দেববন্দরে বাণমাতানাম্নী ভগবতীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে; তত্রত্য অধিবাসীরা সেই দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। বাপ্পা সৌরাষ্ট্রে উপস্থিত হইয়া ইসফগুলের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং নববধূসহ বাণমাতা-দেবীমূর্ত্তি লইয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন। চিতোরে বাণমাতার সমুন্নত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। অদ্যাপি গিহ্লোটেরা ভক্তিসহকারে এই দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইতিহাসে লিখিত আছে, গিহ্লোটকুল চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে বাপ্পা হইতেই অধিকাংশ শাখার উৎপত্তি হইয়াছে।

ইসফগুল রাজার কন্যার গর্ভে অপরাজিত নামে বাপ্পার এক পুত্র জন্মে। চিতোরেই ইহার জন্ম হয়। দ্বারকার নিকটবর্ত্তী কালিবাওনরাধিপতি কাব্য-প্রমারের কন্যা বাপ্পার অন্যতমা মহিষী। তাঁহার গর্ভে অশীল নামে বাপ্পার আর একটি পুত্র জন্মে। প্রাচীন কুলতালিকাপাঠে জানা যায়, অশীলগড় দুর্গ এই অশীল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। চিতোরে জন্মিয়াছে বলিয়া অপরাজিত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অশীলকে বঞ্চিত করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন।

যবনেরা চিতোর আক্রমণপূর্ব্বক খোমানরাজের নিকট কর প্রার্থনা করিলে বীরনৃপতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; সগর্ব্বে ম্লেচ্ছের প্রস্তাবে ঘৃণাপ্রদর্শন করিয়া মহাবিক্রমে তাহাদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যবনেরা পর্য্যুদস্ত, পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল, যবনসেনাপতি মহম্মদ খোমানরাজ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইলেন।

কতবার যে ভারতের বক্ষে যবনের অপবিত্র পদাঘাত পড়িয়াছে, কত শতবার যে দুর্দ্দান্ত চিরবৈরিগণ ভারতের চিরকীর্ত্তি বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কত শতবার যে ভারতবর্ষকে নানা উৎপীড়ন, নানা যন্ত্রণা, নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, প্রাচীন ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতের সুখ-সমৃদ্ধিই ভারতের ঐরূপ সর্ব্বনাশের মূল। ভারতের ঐশ্বর্য্যদর্শনে, ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী, এই বিশ্বাসে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শত শতবার শত শত হিন্দুবৈরী ভারতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে।

গুর্জ্জর ও সিন্ধু এই দুইটি রাজ্য পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল। ঐ বাণিজ্যস্থল দুটির সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি দেখিয়া বোগ্‌দাদের অধিপতি খলিফা ওমারের লালসা বলবতী হইল। রাজ্য দুইটির পণ্যদ্রব্য হস্তগত করিবার অভিলাষে টাইগ্রীস নদীর মোহানাপ্রদেশে তিনি বসোরানাম্নী

নগরী স্থাপন করিলেন। ক্রমে রাজ্যবৃদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল; একদল দুর্দ্ধর্ষ সেনাসমভিব্যাহারে সেনাপতি আবুল আয়েষকে তিনি সিন্ধুদেশে প্রেরণ করিলেন। তখন ভারত-সন্তানেরা হীনবীর্য্য হন নাই; সেনাপতি আবুল আয়েষকে তাঁহারা পতঙ্গবৎ সমরাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। বিজিগীষু খলিফা ওমারের বিজিগীষাও সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইল।

কিছু দিন অতীত হইল। খলিফা ওসমান বোগ্দাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিতে তাঁহার বাসনা হইল; একটি বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তিনি ভারতে প্রেরণ করিলেন। যথাকালে প্রেরিত ব্যক্তি প্রত্যাগত হইলে ওসমান স্বয়ং ভারত আক্রমণের উদ্যম করিলেন। কিন্তু সে উদ্যমে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আশাভরসা হৃদয়মধ্যেই বিলীন হইয়াছিল।

ইহার কিছু দিন পরে খলিফা আলীর সেনাপতিরা সিন্ধুদেশ জয় করিয়া তথায় আপনাদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন এবং বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত তথায় অবস্থান করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রতিষ্ঠা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। খলিফার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহা-দিগকে সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। ইহার পর খলিফা আবদুল মেলেকও একবার ভারত আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইয়াজিদ যখন খোরাসানের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তখনও একবার হিন্দুবৈরী মুসলমানেরা ভারতবিজয়ের উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু কেহই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই।

ভারতের পূর্ব্বঘটনার ভবিতব্যতা স্মরণ করিলে এখনও রোমাঞ্চিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়। এ দিকে খলিফা ওয়ালিদ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, ভারতের ভয়াবহ ভবিতব্য-তার উপযুক্ত সময়ও নিকটবর্ত্তী হইল। ওয়ালিদ অগণিত সেনাসমভিব্যাহারে ভারত আক্রমণ-পূর্ব্বক প্রথমেই সিন্ধু ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহ করায়ত্ত করিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড বাহুবলে পরাজিত হইয়া ক্রমে গঙ্গার পশ্চিমকূলবর্ত্তী রাজগণও করপ্রদ, বশীভূত ও বাধ্য হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা অনন্তবিক্রমে গঙ্গা ও ইরাবতীতীরে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও আপনা-দিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া দিল। মুসলমান-রাহুর ভীমকবলে পড়িয়া ভারতের সুখরবি ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইতে লাগিলেন। এ দিকে মহম্মদ বীন কাশিমের হস্তে সিন্ধুকূলবর্ত্তী দাহির-দেশাধিপতির পতন হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও অধঃপতন। আর এক দিকে আবার বদারিক-রাজের মৃত্যু, সঙ্গে সঙ্গে আন্দালুস-সাম্রাজ্যে গথরাজকুলের অবসান। ৭১৮ খৃষ্টাব্দে হিজিরা ৯৯ সালের প্রথমে দাহিররাজের সহিত মহম্মদ বীন কাশিমের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে; সেই যুদ্ধেই দাহির-রাজ নিহত হন। দাহিররাজের দুইটি কন্যা যবনের হস্তে পতিত হয়। সেই দুটি রাজকুমারীই হতভাগ্য বীন কাশিমের পতনের মূল। কুমারী দুটি পরমরূপবতী ছিলেন।

কিংবদন্তী এইরূপ, কুমারী দুটির সৌন্দর্য্যের কথা খলিফা ওয়ালিদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি জ্যেষ্ঠা কুমারীটিকে তাঁহার নিকট দামস্কে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে জ্যেষ্ঠা কুমারী তথায় উপনীত হইয়া বিনম্রস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! দুরাত্মা কাশিম অগ্রেই আমাদিগের সতীত্বনাশ করিয়াছে। আমি কলঙ্কিনী, এ কলঙ্কিনী আপনার পরিগ্রহের যোগ্য নহে।" এই কথা শুনিবামাত্র খলিফার হৃদয়ে রোষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; আমচর্ম্মাবদ্ধ থলিয়ায় পুরিয়া কাশিমকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন। কাশিমও তদবস্থায় দামস্কে আনীত হইলেন। বন্দিনী রাজকুমারীও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি কাশিমকে তদবস্থ দেখিয়া মৃদুহাস্যে সম্রাটকে কহিলেন,

"মহারাজ! আমার পিতার প্রাণনাশ করিয়াছে বলিয়াই কাশিমের এই দুর্দশা করিলাম; ইহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল; বন্ধনমোচনে অনুমতি হউক, কাশিম নির্দ্দোষ।"

ওয়ালিদের পর আল্‌মনসুরের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ বিবরণ ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। ইয়াজিদ যখন খোরাসানের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রাজবিদ্রোহী বলিয়া তিনি তখন বোগদাদপতির কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার পুত্র ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক সিন্ধুদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে বোগদাদের সিংহাসনে যে আট জন খলিফা অধিরূঢ় হন, ভারতের বিষয় চিন্তা করিতে তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও অবসর প্রাপ্ত হন নাই; ইউরোপের ঘোরতর রণব্যাপারে অভিনিবিষ্ট থাকিয়াই তাঁহাদিগকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সেই সময় সৌভাগ্যবশে তুর্কক্ষেত্রে যদি চার্ল'স মার্‌লেটের আবির্ভাব না হইত, তাঁহার ভীমবিক্রমে মুসলমানগর্ব্ব যদি সমূলে খর্ব্ব না হইয়া পড়িত, তাহা হইলে হয় ত ফরাসীদিগকে কোরাণের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চিরদিন দুর্দ্দান্ত যবনের প্রচণ্ড পদাঘাত হৃদয়ে ধারণ করিতে হইত।

মহারাজ বাপ্পারাও যখন চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক ইরাণরাজ্যে প্রস্থান করেন, খলিফা আব্বাসের প্রতিনিধি আল্‌মনসুর তখন সিন্ধুদেশ ও ভারতের পশ্চিমদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। বেখের ও আরোর নগর তাঁহার শাসনপাট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল; তন্মধ্যে আপন নামানুসারে তিনি আরোরে মনসুরা নামকরণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ হারুণ-অল্‌ রসীদ যখন আপন পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন, খোরাসান, জাবালিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধু ও ভারতবর্ষ তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আলমামুনের হস্তে সমর্পিত হয়। হারুণের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে আলমামুন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে চিতোরের সিংহাসন খোমানের অধিকারে ছিল। খলিফাদের ইতিহাসে খোরাসানপতি কোন মহম্মদের উল্লেখ নাই, কিন্তু রাজভবনের ইতিবৃত্তগ্রন্থে লিখিত আছে, ঐ সময়ে খোরাসানপতি মহম্মদ জাবালিস্থান হইতে আসিয়া চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনার পর বিংশতি বৎসরের মধ্যে মুসলমানের বিজয়পতাকা একমাত্র সিন্ধুপ্রদেশেই উড্ডীন হইতে দেখা গিয়াছে। সেই সময় সিন্ধুপ্রদেশ মোতাবকের অধিকারভুক্ত ছিল। ইনি সুপ্রসিদ্ধ হারুণ-অল-রসীদের পৌত্র।

মোতাবকের মৃত্যুর পর বোগদাদের সিংহাসন বাত্যাবিতাড়িত কদলীতরুর ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বসমৃদ্ধি, পূর্ব্বশ্রী ক্রমশই হ্রাস পাইতে লাগিল। এই সময় হইতে ভারতবর্ষও কিছু দিনের জন্য শত্রুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শবক্তিগীর রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত সে বংশ ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন নাই।

শবক্তিগী গজনীনগরে একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ আক্রমণের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়। ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩৬৫ হিজিরা সালে বহুসেনা সমভিব্যাহারে তিনি সিন্ধুনদের পূর্ব্বপার আক্রমণ করেন। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি তত্রত্য হিন্দুগণের প্রতি নানারূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিজিরা ৪র্থ শতাব্দীর শেষে তিনি আর একবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই শেষ আক্রমণ হইতেই ভারতের ভাবী সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

শবক্তিগীর পুত্র দুর্ম্মতি কঠোরহৃদয় মহম্মদ শেষ আক্রমণের সময় পিতার সহিত ভারতবর্ষে

আগমন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ভারতের হৃদয়শোণিত শোষণের জন্য সেই পিশাচের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।' অচিরেই দুরাত্মা সদলবলে মহাবিক্রমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। মহম্মদ দ্বাদশবার দ্বাদশমূর্ত্তিতে ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিল। মহম্মদের আসুর ব্যবহারে—তাহার কঠোর উৎপীড়নে—তাহার পৈশাচিক নৃশংস-বৃত্তিতে সেই দুঃসময়ে ভারতের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, দীর্ঘ দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি সে ক্ষতির পূরণ হইল না। মহম্মদের নিষ্ঠুরাচরণে ভারতের যে পতন হইয়াছিল, সে পতন হইতে ভারত আর পুনরুত্থিত হইতে সমর্থ হইল না। সোমনাথ, গর্ণার ও চিতোরের মন্দিরসকলের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি সেই দুরাত্মার দুরাচরণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ফল কথা, মহম্মদের দ্বাদশবার আক্রমণে ভারত হীনশ্রী, নিঃসম্বল ও পথের ভিখারীপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। মহম্মদ যে সকল মহানগর ধ্বংস করে, আইতপুর তন্মধ্যে একতম। এই নগর শক্তিকুমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই নগরে একখানি প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, শক্তিকুমার শবক্তিগীর সমসাময়িক।

চিতোরে মোরীবংশীয় মানরাজার শাসনসময়ে ম্লেচ্ছেরা একবার তদীয় রাজ্য আক্রমণ করে। সেই সময় হইতেই বাপ্পার ভবিষ্য-সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে অনুমান করেন, ইস্‌জিদ বা মহম্মদ বীন কাশিমের অধীনস্থ আরবেরাই সিন্ধুদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক চিতোর আক্রমণ করে। হিন্দুরাজবংশের ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায়, কেবল খলিফাগণ নহে, তাঁহা-দের অধীনস্থ বিদ্রোহী সেনাপতিরাও সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেন। ঐ সকল খলিফা-দের রাজত্বসময়ে ভারতে একপ্রকার যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত ভারত-আক্রমণকারী কখন দৈত্যবেশে, কখন বা ঐন্দ্রজালিকবেশে ভারতে প্রবিষ্ট হইতেন; তাঁহারা কখন কখন সিন্ধুপ্রদেশীয় স্থলপথে, কখন কখন বা সমুদ্রপথে আগমন করিতেন। হিন্দু ইতিবৃত্তগ্রন্থে সেই সকল মুসলমানই ম্লেচ্ছ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

একটি কিংবদন্তী এইরূপ, কোন সময়ে গড়বিটলীতে (অজমীরে) রোসান আলি নামে এক ফকির আগমন করে। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া গড়বিটলীপতির নবনীভাণ্ডে করস্পর্শ করাতে রাজা ফকিরের হস্তাঙ্গুলি কর্ত্তনের আদেশ করেন। তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। কথিত আছে, সেই সকল ছিন্ন অঙ্গুলি শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া মক্কায় খলিফার সম্মুখে নিপতিত হইয়াছিল। অঙ্গুলি দেখিয়াই খলিফা চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ ছদ্ম বণিক্‌বেশে তিনি সসৈন্যে অজমীর আক্র-মণ করিলেন। তাঁহার হস্তেই অজমীররাজের প্রাণবিনাশ হয়। চৌহানদিগের ইতিবৃত্তগ্রন্থে লিখিত আছে, এই যুদ্ধঘটনার সময় রাজা অজয়পাল অজমীরে রাজত্ব করিতেন। সাগরপথে যখন শত্রুপক্ষ আগমন করে, অজয়পাল তখন কচ্ছোপকূলে আঞ্জোর নামক স্থানে গিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য-সমাবেশ করেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে অজয়পালের পতন হয়। ঐ স্থানে একটি বেদী ও তদুপরি অজয়পালের একটি পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিমূর্ত্তিটি অশ্বপৃষ্ঠে বিরাজিত, করে ভল্ল। আজি পর্য্যন্ত ঐ স্থানে একটি মহতী মেলা হইয়া থাকে; বহুদেশের বহু-লোক প্রতিবৎসর তথায় সমাগত হয়। মেলার নাম "অজয়পালের মেলা।"

৭৫ সংবৎ হইতে ১০০ সংবৎ পর্য্যন্ত সৌর, চৌহান, গিহ্লোট ও যাদবদিগের রাজ্যে নানারূপ উপপ্লব, উৎপীড়ন ও মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। ৭৫ সংবতে যদুবংশীয় একজন ভট্টিরাজ শালপুরনগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিলেন, ফরিদ নামক শত্রু কর্তৃক বিদ্রুত হইয়া তাঁহাকে

শতদ্রুপারে মরুপ্রান্তরে গমন করিতে হয়। অজমীরের চোহানরাজ মাণিকরায়ও ঐ সময়ে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রণক্ষেত্রে লীলা সংবরণ করেন। এই যুদ্ধের সময় মাণিকরায়ের শিশুপুত্র লোট দুর্গ-প্রাকারের উপরিভাগে ক্রীড়া করিতেছিলেন, অকস্মাৎ বিপক্ষপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি বাণ আসিয়া শিশুগাত্রে পতিত হয়; লোট তৎক্ষণাৎ ভূশায়ী হন। লোটের পদদ্বয়ে একপ্রকার রজতালঙ্কার ছিল, তদবধি চোহানবংশীয়েরা কেহই আর সেরূপ অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করেন না। শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া যদুবংশীয় প্রথমরাজাকে পঞ্চনদের দোয়াব প্রদেশ হইতে এবং হয়বংশীয় রাজাকে গোলকুন্দা হইতে এক সময়েই পলায়ন করিতে হইয়াছিল। যে শত্রু দ্বারা ইঁহারা বিতাড়িত হন, তাহার নাম "গদ আবাদ" অর্থাৎ বিশ্রামরহিত। হিন্দুগ্রন্থে এই শত্রু দানব নামে অভিহিত হইয়াছে। এই দানব গঙ্গোত্তরীর নিকটবর্ত্তী হিমাদ্রির গজলিবন্দ নামক আরণ্যপ্রদেশে বাস করিত। পত্তনগবর্মাধিষ্ঠাতার পূর্ব্বপুরুষও ঠিক ঐ সময়ে সৌরাষ্ট্র-উপকূলবর্ত্তী স্বীয় দীপরাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। অনেকে অনুমান করেন, ইয়াজিদ বা খলিফার অন্য কোন সেনাপতি তৎকালে এই সমস্ত বিপ্লবের মূলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকে কাশিমকে এই সকল বিপ্লবের প্রধান অভিনেতা বলিয়া বর্ণন করেন। চিতোরপতি মানরাজার সাহায্যার্থে যে সমস্ত নৃপতির সমাবেশ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। যাঁহারা মানরাজার সাহায্যার্থ সমাগত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে অঙ্গুটসিংহ নামক হূণরাজ, ডুল, ওহির, মালুন, শিপৎ, আশ্বরীয়, কুলহর, অজমীরপতি, সৌরাষ্ট্ররাজ, গুর্জ্জর-নরপতি, জঙ্গলদেশাধিপতি জহু, ঝারিজাপতি শিব, উত্তরপ্রদেশের অধীশ্বর বুসা প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান বীর ছিলেন। এই সকল নামের অনেকগুলির সহিত হিন্দু নামের কিছুমাত্র সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। কালে ইহারা নির্ব্বংশ হইয়াছে।

প্রমারবংশীয় রাজগণ সেই সময় কখন চিতোরের রাজপীঠ রক্ষা করিতেন, কোন সময়ে বা উজ্জয়িনীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। টড সাহেব বলেন, গ্রীক সিলুকসের সহিত মোরীবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের মৈত্রীভাব ও বৈবাহিক-সম্বন্ধবন্ধন ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে প্রমারকুল বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ভট্টচাঁদ বলেন, প্রমারবংশীয় রাজারা সেই সময় ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। চিতোরের মোরী-নৃপতির রাজসভায় অনেক বৃত্তিভোগী রাজা ছিলেন।

শত্রুর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে মহাবীর বাপ্পা যেরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর কাহাকেও তাদৃশ বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার মহাবিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া বৈরিকুল পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক সিন্ধু ও সৌরাষ্ট্রপথে পলায়ন করিয়াছিল। বাপ্পা তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক পিতৃরাজ্য গজনীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ম্লেচ্ছরাজ সেলিম পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। বাপ্পার রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্পে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন; অচিরে মহাবিক্রমে দুরাচারকে পিতৃসিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া আপন ভাগিনেয়কে তথায় সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

যে বাপ্পার বীরত্বে দিন দিন তদীয় বংশের মুখোজ্জ্বল হইতেছিল, যে বাপ্পার বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারতের নানাস্থানে সমুড্ডীন হইয়াছিল, যাঁহার গুণে সেই বংশের ভাবী পুরুষগণের গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, চরমে সেই বাপ্পা এক মহান্ কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়াতে ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সমস্তই নরকের অধস্তনপ্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া গেল। যবনের প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া বাপ্পারাও অচিরে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সেলিমের কন্যা পরমরূপবতী ছিলেন। সেলিম রাজ্যচ্যুত হইলে রাজকুমারীর রূপে বিমুগ্ধ হইয়া বাপ্পারাও

তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। বিবাহের পর তিনি চিতোরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন তথায় অবস্থান করেন নাই। "হিন্দুসূর্য্য" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "নৌসিরা-পাঠান" বংশের প্রতিষ্ঠাপক হইতে তিনি ইরাণপ্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন।

মহম্মদ খোরাসানপতি অধিনায়ক হইয়া ৮১২ হইতে ৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানসেনা সমভিব্যাহারে যখন চিতোর আক্রমণ করেন, মহারাজ খোমান তখন চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। চিতোর-আক্রমণকারী এই মহম্মদ যে কে, তাহা নিঃসন্দেহে নিরূপণ করা কঠিন। বহু-গবেষণায় স্থির হইয়াছে যে, খলিফা হারুণ-রসীদের পুত্র মামুদের পরিবর্ত্তে ভ্রমবশে 'মামুদ' বা 'মহম্মদ' নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। খোমানরাজার রাজত্বকালে মামুদেরই আবির্ভাব হইয়া-ছিল। যে সকল হিন্দুরাজা সেই যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা পাঠ করিলে যে স্থান হইতে সে নামের উৎপত্তি, তাহা জানিতে পারা যায়। উক্ত তালিকাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, গজনী হইতে গিহ্লোট, আশীর হইতে তক্ষক, নদালের হইতে চৌহান, রাহিরগড় হইতে শোলান্‌কি, সেটবন্দর হইতে জিরকের, মুন্দর হইতে খৈরবী, মঙ্গরল হইতে মাক-বাহন, জিতগড় হইতে জোরিয়া, তারাগড় হইতে রিবর, নিরবর হইতে কচ্ছব, সঙ্গোর হইতে কালুম, জোয়েনগড় হইতে দুশানো, অজমীর হইতে গর, লোহাদুরগড় হইতে চান্দানেও, কাসুন্দি হইতে ধর, দিল্লী হইতে তুয়ার, পত্তন হইতে সৌর, ঝালোর হইতে শোণগুরু, শিরোহি হইতে দেওরা, গাগ্রোণ হইতে খীচি, জুনগড় হইতে যদু, পত্রী হইতে ঝালা, কনোজ হইতে রাঠোর, চোটিয়ালা হইতে বল্ল, পুরাণগড় হইতে গোহিল, জিষলগড় হইতে ভট্টি, লাহোর হইতে বুসা, রোণিজা হইতে শঙ্কলা, খেরালিগড় হইতে শিহুত, মণ্ডলগড় হইতে নকুম্রা, রাজোর হইতে বীরগুজর, কর্ণগড় হইতে চন্দেল, শিকুর হইতে শিকুরবল, অমারগড় হইতে জৈত্ব, পল্লী হইতে বীরগোট, খণ্টরগড় হইতে জারিজা, জিতেরগা হইতে খেরবার এবং কাশ্মীর হইতে পুরীহর নাম উৎপন্ন। ইহাদিগের মধ্যে চোহানকুল অজমীর রাজবংশের একটি শাখা। ইহারাই শিরোহির দেবরগণের আদিপুরুষ এবং ঝালোরের শোণিগুরু। খৈরবী প্রমারবংশের একটি শাখা। শোণিগুরু চোহানবংশের অন্যতম শাখা। যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশসম্ভূত, ইঁহারা বহুদিন যাবৎ জুনাগড় (গরনর) রাজ্যে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। প্রমারবংশের শঙ্কল নামক একটি শাখা হইতে রোণিজাধিপতিগণের উদ্ভব হইয়াছে; রোণিজা মারবাররাজ্যের অন্তর্ভূত। শিহুতেরা রাজপুত, ইহারা মহানদ সিন্ধুর উত্তরদিক্‌বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। এখন যে প্রদেশ বুন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত, পূর্ব্বে ঐ প্রদেশ চন্দেলদিগের অধিকারে ছিল। এই সমস্ত নরপতি খোমানরাজের সাহায্যার্থ আগমন করিয়া সমরে অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; আপন আপন অমূল্য জীবনপাতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

খোমানরাজ চতুর্ব্বিংশতিবার শত্রুর প্রতিকূলে রণযাত্রা করিয়াছিলেন। স্বজাতির মধ্যে তাঁহার গৌরব এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অদ্যাবধি কাহাকেও আশীর্ব্বাদকালে উদয়পুরের লোকেরা বলিয়া থাকেন, 'খোমান্ তোমাকে রক্ষা করুন।' রোমসম্রাট্ সিজরও গরীয়সী কীর্ত্তির জন্য এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ খোমান পুত্রদ্বেষী বলিয়া কলঙ্কিত। তাঁহার একটি পুত্র পিতৃহন্তার প্রধান আদর্শ ছিল। খোমানের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম জগরাজা। জগরাজের গুণে দেশবাসী ব্রাহ্মণেরা তৎপ্রতি একান্ত প্রীত ছিলেন। কিছু কাল রাজ্যশাসনের পর সেই সকল ব্রাহ্মণের পরামর্শে খোমানরাজ কনিষ্ঠ পুত্র জগরাজকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পকালমধ্যেই খোমানের হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধবয়সে আবার রাজ্য-লালসা—সুখভোগবাসনা অন্তরে বলবতী হইল। যাঁহাদিগের পরামর্শে তিনি পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিলেন; পুনরায় রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহাকে অধিক দিন রাজমুকুট ধারণ করিতে হইল না। তাঁহার অন্যতম পুত্র মঙ্গল তাঁহাকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। পিতৃহত্যার কলঙ্কিত রাজমুকুটও অধিক দিন মিবার-সিংহাসন কলুষিত করে নাই, অত্যল্পদিনের মধ্যেই সর্দ্দারেরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। [illegible] পিতৃহন্তা মঙ্গল উত্তরমরুপ্রদেশে গিয়া একটি রাজ্যস্থাপন করিলেন। তদবধি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তথায় 'মাঙ্গলীয় গিহ্লোট' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

ভর্তৃভট্টের চলিত নাম ভট্ট। উপরি-উক্ত ঘটনাসমূহের পর ইনিই চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ কর্ত্তৃক চিতোরের সীমা বহুপরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মিহিনদীর তীর হইতে আবুগিরির প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশের মধ্যে তাঁহারা অনেকগুলি নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ধাবণগড় ও অজয়গড় অদ্যাপি তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। ঐ সমস্ত প্রদেশের অসভ্য বন্যজাতিরা যথাসময়ে চিতোররাজকে রাজকর প্রদান করিত।

ভর্তৃভট্টের ত্রয়োদশ পুত্র; তাঁহারা মালব ও গুর্জ্জররাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ত্রয়োদশটি রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ত্রয়োদশ পুত্রের বংশধরেরা 'ভটিয়া গিহ্লোট' নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

খোমানরাজ হইতে সমরসিংহ পর্য্যন্ত পঞ্চদশজন রাজা ক্রমে ক্রমে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইঁহাদিগের জীবনী পাঠ করিলে ইঁহাদিগকে নিরক্ষর বলিয়া বোধ হয়। রণ-প্রিয়তাই ইঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। ইঁহারা যৌবনে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, পরস্ব-লুণ্ঠন করিতেন, পরের জীবনকে জীবন বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না; বৃদ্ধাবস্থায় আবার ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ইঁহারা এরূপ বিবাদ-বিগ্রহ ভালবাসিতেন যে, দেশে যুদ্ধ উপস্থিত না হইলেও, বিপক্ষপক্ষ রাজ্য আক্রমণ না করিলেও, রাজ্যমধ্যে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও অন্ততঃ তাঁহারা গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াও আপনাদিগের রণলালসা মিটাইতেন। এই পঞ্চদশজন রাজকুমারের রাজত্বকালে গিহ্লোটগণ ও অজমীরের চৌহানদিগের মধ্যে কখনও পরস্পর সৌহৃদ্যস্থাপন হইত, কখনও বা তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-ভাব প্রদর্শন করিতেন। গিহ্লোট-নৃপতি বীরসিংহ একসময়ে কবারিয়ো ক্ষেত্রে চৌহান-রাজ দুর্ল্লভকে নিহত করিয়াছিলেন। ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায়, তেজসিংহের রাজত্বকালে যবনেরা চিতোর আক্রমণ করিলে দুর্ল্লভের পুত্র বিশালদেব সসৈন্যে চিতোররক্ষার জন্য যবনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সময়ে গিহ্লোট ও চৌহান নৃপতিগণের মধ্যে পরস্পরের এইরূপ বিপরীত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

চাঁদভট্ট. অনঙ্গপাল, পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ ও রাহুপ তাতারগণকর্ত্তৃক ভারত বিজয়।

সমরসিংহের রাজত্বকালে ভারতে যে সকল রাজন্যবর্গ বিরাজ করিতেন, তন্মধ্যে ভোলাভীম-পত্তনে শোলান্‌কিবংশীয় আয়াসদহের অবস্থিতি ছিল। রণক্ষেত্রে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় অচলভাবে যিনি শত্রুর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান থাকিতেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ মহাবল জিৎপ্রমার আবু-পর্ব্বতে বাস করিতেন। মহাবিক্রম সমরসিংহের পরাক্রম কাহারও অবিদিত ছিল না; পরাক্রমশালী রাজারাও তাঁহার বশীভূত থাকিয়া কর প্রদান করিতেন। যে যে সময়ে দিল্লীশ্বরের শত্রুপক্ষ আসিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণে সমুদ্যত হইত, মহাবল সমরসিংহই তখন সেই সমস্ত শত্রুর প্রবেশপথ রোধ করিয়া রাখিতেন। ১২০৬ সংবতে সমরসিংহের জন্ম হয়। তাঁহার রাজত্বকালে দিল্লীনগরীতে সকলের অধীশ্বর রাজাধিরাজ অনঙ্গপাল বিরাজিত ছিলেন। লাহোর, পেশোয়ার, সিন্ধু, মন্দর, নাগর, জলবৎ, কান্‌গ্রা, কাশী, প্রয়াগ, গড়দিওগির প্রভৃতি প্রদেশের নৃপতিগণ নিরন্তর দিল্লীশ্বরের অনুশাসন শিরোপরি ধারণ করিতেন। ঐ সময়ে দুর্দ্ধর্ষ নাহররাও মরুস্থলীর রাজা ছিলেন।

ভট্টবংশীয়েরা জাবালিস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া পঞ্চনদপ্রদেশে আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। ঐ প্রদেশের তন্নোট, শালিবাহনপুর, দেবরল এবং মরুমধ্যবর্ত্তী লদর্ব্ব ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এই কয়েকটি নগরের মধ্যে দেবরল নগর তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। যশল্মীর প্রদেশ তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত বা তাদৃশ বিস্তৃতিপ্রাপ্ত হয় নাই। বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত এই অপ্রশস্ত ভূখণ্ডের মধ্যে ভট্টিবংশীয়েরা অবস্থান করিয়াছিলেন। খলিফার আবোরস্ত সেনাপতিবর্গের সহিত তাঁহাদিগের মহা মহা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সমস্ত যুদ্ধেই তাঁহারা বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। সিন্ধুকূলবর্ত্তী তাকনগর পর্য্যন্ত আপনাদিগের প্রাচীন রাজ্যসমূহও ক্রমে ক্রমে পুনরায় তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত হইল। পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালেই তাঁহাদিগের প্রভাব, মহিমা ও গৌরবের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। ভট্টি-নৃপতির ভ্রাতা অখিলেশ সেই সময় দিল্লীশ্বরের এক জন প্রধান সামন্ত বলিয়া গৌরবপ্রাপ্ত হইতেন।

মহাকবি চাঁদভট্ট স্বপ্রণীত গ্রন্থে অনঙ্গপালের যেরূপ গৌরবকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কল্পনানুরঞ্জিত নহে; অনঙ্গপাল সেই সময় ভারতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উজ্জয়িনী ভারতের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের লীলাভূমি ইন্দ্রপ্রস্থনগরী বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীহীন হইয়া থাকে; জনশূন্য শ্মশানরূপে পরিণত হয়। তৎপরে বীলনদেব-নামা এক মহাপুরুষ বহুযত্নে, বহুপরিশ্রমে ও বহুবিক্রমে এই মহানগরীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন; সেই মহাপুরুষই অনঙ্গপাল নামে পরিচিত। অনঙ্গ শব্দে বিধ্বস্ত এবং পাল শব্দে পালনকর্ত্তা বুঝায়। বিধ্বস্তনগরের পুনরুদ্ধার করিয়া রাজ্যপালন করেন বলিয়াই তাঁহার নাম অনঙ্গপাল হইয়াছিল। টড্ সাহেব একখানি খোদিত প্রস্তরফলক পাইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে, বীলনদেব ঠাক্কুর উপাধিধারী ক্ষত্রিয়বংশের এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন;

রাজ্যলাভের পর অনঙ্গপাল নাম ধারণ করেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও 'অনঙ্গপাল' উপনামে আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতেন।

অষ্টাদশ রাজপুরুষের পর যে অনঙ্গপাল দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, চাঁদভট্ট তাঁহারই বিষয় স্বপ্রণীত গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। এই অনঙ্গপালই সেই বংশের শেষ রাজা। অজমীরের চোহান-নৃপতিরাও ইঁহার শাসনাধীন ছিলেন। কিছু দিন পরে রাজা বিশালদেব আপন বিক্রমে এই অধীনতাপাশ ছেদন করেন। দিল্লীর শেষ অনঙ্গপালের সহিত যখন রাঠোর-নৃপতির মহাসংগ্রাম সংঘটিত হয়, চোহানবংশীয় চতুর্থ রাজা সোমেশ্বর তৎকালে অজমীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি অনঙ্গপালের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই মহাযুদ্ধে অনঙ্গপালেরই জয়লাভ হয়। এই উপকার স্মরণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ অনঙ্গপাল অজমীরেশ্বরের করে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন। সেই কন্যার গর্ভে সোমেশ্বরের এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রই আর্য্যবীর পৃথ্বীরাজ নামে পরিচিত।

অনঙ্গপালের আর একটি কন্যা ছিল, রাঠোর-নৃপতি বিজয়পালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই কন্যার গর্ভে ক্রূরপ্রকৃতি কুটিলমতি জয়চাঁদের জন্ম। পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ উভয়েই অনঙ্গপালের দৌহিত্র, উভয়েই মাতামহের সমান যত্ন, সমান স্নেহ ও সমান আদরের অধিকারী; কিন্তু জয়চাঁদের ভাগ্য পৃথ্বীরাজের ন্যায় সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে নাই।

দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। পৃথ্বীরাজের বয়ঃক্রম যখন অষ্টমবর্ষ, অনঙ্গপাল সেই সময়েই তাঁহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লীলাসংবরণ করিলেন। মাতামহের এইরূপ পক্ষপাতিতা দর্শনে জয়চাঁদের হৃদয়ে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; ঈর্ষানল প্রশমিত করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বী সহ পতঙ্গবৎ তাহাতে ভস্মীভূত হইলেন। ভারতের পূর্ব্বমহিমার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর গৌরব রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। কুক্ষণে ভারতে গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হওয়াতেই শত শত সর্ব্বনাশকর অনর্থ উৎপাদিত হইয়াছে; অধিক কি, ভারত শ্মশানে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুরুক্ষেত্র মহাসমর আত্মবিচ্ছেদের জলন্ত আদর্শ, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা মোহমুগ্ধ হইয়া জন্মভূমির সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে জয়চাঁদ ঈর্ষানলে সন্ধুক্ষিত হইয়া দেশে দেশে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বজনসমক্ষে আপনাকেই সর্ব্বজনেশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজের সার্ব্বভৌমত্ব তিনি স্বীকার করিলেন না। মুন্দরের পুরীহররাজকন্যার সহিত ইতিপূর্ব্বে পৃথ্বীরাজের বিবাহ-সম্বন্ধ একপ্রকার স্থির হইয়াছিল, কিন্তু জয়চাঁদের প্ররোচনায় পুরীহর-নৃপতি সে সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তিনি এবং আনহলবারাপত্তনের রাজা জয়চাঁদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পৃথ্বীরাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে পুরীহর-নৃপতির প্রতিকূলে সমর-যাত্রা করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারই জয়লাভ হইল।

রাজা জয়চাঁদের সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী এইরূপ, সম্রাট্ উপাধিলাভের জন্য তিনি একটি রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সমস্ত নৃপতিরই আহ্বান ও অধিষ্ঠান হইয়াছিল, কেবল সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজ আহূত হন নাই। তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ দুইটি স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করিয়া জয়চাঁদ যজ্ঞ সমাধা করিলেন। যজ্ঞসমাপ্তির কতিপয় দিনমাত্র পরেই জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তা স্বয়ংবরা হইয়া পৃথ্বীরাজের হৈমপ্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জয়চাঁদের বিরুদ্ধে কনোজে রণযাত্রা করেন।

যুদ্ধে জয়চাঁদের পরাজয় হয়, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে লইয়া প্রত্যাগমন করেন। নবীনা মহিষীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া তদবধি দিল্লীশ্বর আর রাজকার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ করিতেন না, অহর্নিশি প্রায় অন্তঃপুরেই অবস্থান করিতেন।

সমরসিংহের সহিত পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার বিবাহ হয়। কোন সময়ে নাগরকোটের এক স্থানে ভূগর্ভে সপ্তক্রোর-পরিমিত স্বর্ণমুদ্রার আবিষ্কার হয়; দিল্লীশ্বর তাহা গ্রহণের অভিলাষ করেন। ক্রূরমতি কনোজপতি ও পত্তনরাজ তাহাতে বিঘ্নোৎপাদনার্থ তাতারসেনা সহায় করিয়া পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সমরসিংহকে দিল্লীশ্বরের সাহায্যার্থ সমরে অগ্রসর হইতে হইল। পত্তনরাজের সহিত সমরসিংহের বৈবাহিক-সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে সমরসিংহ দণ্ডায়মান না হইয়া শাহাবুদ্দিনের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সসৈন্যে প্রস্তুত রহিলেন। এই যুদ্ধে সমরসিংহ যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার "মহাদেবের প্রতিনিধি ও একলিঙ্গের দেওয়ান" উপাধি সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার তৎকালীন তাপসজনোচিত শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া মহাকবি মহাকাব্যে "যোগীন্দ্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে বিপক্ষসেনার অধিনায়ক পৃথ্বীরাজকরে বন্দী হইলেন। সপ্তক্রোরপরিমিত স্বর্ণমুদ্রা দিল্লীশ্বরের হস্তগত হইল। ভগিনীপতির পরামর্শে সেই অতুল অর্থ তিনি আপন সৈন্যগণকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

এই প্রকার সামান্য সামান্য যুদ্ধব্যাপারে কতিপয় বৎসর অতীত হইল। কিছু দিন বিশ্রামের পর দিল্লীর পরিত্রাণার্থ সমরসিংহকে পুনরায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পৃথ্বীরাজের হৃদয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিল, তিনি আলস্যের বশবর্ত্তী হইলেন, অবসর বুঝিয়া মুসলমানেরাও ভারত আক্রমণ করিল। সমরসিংহ কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের হস্তে চিতোর-রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ সসৈন্যে দিল্লীযাত্রা করিলেন।

এ দিকে কনিষ্ঠের প্রতি রাজ্যভার অর্পিত হইল দেখিয়া সমরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যনিবাসী বিদুরনামা আবদী পাতশাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমরসিংহের আর একটি পুত্রও নেপালের শৈলপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক একটি গিহ্লোটশাখা স্থাপিত করিলেন।

মহামতি চাঁদকবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, সমরক্ষেত্রে ব্যূহরচনায়, ভল্ল এবং অশ্বচালনায় সমরসিংহের তুল্য বীর আর কেহই ছিলেন না। ধর্ম্মনীতিতে, মন্ত্রিনির্ব্বাচনে এবং মন্ত্রণাদানেও তাঁহার অসাধারণী বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইত। কাগগারনদীতীরে তিন দিন মহাসংগ্রামের পর সমরসিংহ ও তৎপুত্র কল্যাণ মহাবিক্রমে অসংখ্য মুসলমানসেনা নিপাতিত করিয়া আপনাদিগের ত্রয়োদশ সহস্র সেনা ও বহুসংখ্যক সামন্তসহ রণক্ষেত্রে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। আর তাঁহাকে চিতোর-দর্শন করিতে হইল না। পৃথ্বীরাজ শত্রুকরে বন্দী হইলেন।

সমরকেশরী প্রিয়তম পতি মুসলমান-সমরে নিপতিত হইয়াছেন, প্রাণের সহোদর পৃথ্বীরাজ শত্রুকরে বন্দী হইয়াছেন, দিল্লীর ও চিতোরের অসংখ্য অসংখ্য আর্য্যবীর কাগ্‌গারতটে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন; যেমন এই দারুণ শোকসংবাদ কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি সমরসিংহের প্রিয়তমা মহিষী পৃথা অচিরে চিতাগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক পতির অনুগামিনী হইলেন। দিল্লীনগরে তাতার সৈন্যেরা ভীষণ বিপ্লব সমুত্থাপন করিল। চোহান-রাজকুমার রণসিংহও অদ্ভুত সমর-কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক শেষে শত্রুহস্তে লীলাসংবরণ করিলেন। যে নগরী পাণ্ডবগণের লীলাভূমি বলিয়া চিরপরিচিত, আর্য্যগণের বিজয়স্তম্ভ বলিয়া আর্য্যবীরগণ উচ্চকণ্ঠে যে মহানগরীর প্রশংসা করেন,

আর্য্যলক্ষ্মীর বিশ্রামভূমি বলিয়া যাহার ভূয়সী কীর্ত্তি পরিকীর্ত্তিত হয়, সেই দিল্লীনগরী পাপিষ্ঠ মুসলমানকর্ত্তৃক অধিকৃত, বিদলিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

সমরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তদীয় জননী পত্তনরাজকন্যা কর্ম্মদেবী যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এমন কি, নয় জন হিন্দুরাজা ও রাবৎ উপাধিধারী একাদশটিমাত্র সেনানী লইয়া তিনি স্বয়ং এক সময়ে কুতুবুদ্দীনের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরবালার সহিত যুদ্ধে যবনরাজেরই পরাজয় হয়।

১২৪১ সংবতে (খৃঃ ১১৯৩ অব্দে) কর্ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কর্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত হইয়া মরুপ্রান্তরে গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। অনেকে বলেন, কর্ণের দুই পুত্র ছিল; মাহুপ ও রাহুপ; কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক। সূর্য্যমল্ল নামে সমরসিংহের একটি ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার পুত্র ভরত। চোহানবংশীয়া একটি কন্যার সহিত কর্ণের বিবাহ হয়, সেই কন্যার গর্ভেই মাহুপ জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিপক্ষের ষড়্‌যন্ত্রে পতিত হইয়া ভরতকে চিতোর পরিত্যাগ করিতে হয়; সিন্ধুপ্রদেশে আগমনপূর্ব্বক তত্রত্য মুসলমান নৃপতির সাহায্যে তিনি আরোর নগর প্রাপ্ত হন। পূগলের ভট্টিবংশীয়া একটি রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই নারীর গর্ভে তিনি রাহুপ নামে একটি পুত্র উৎপাদন করেন।

এ দিকে মাহুপ পিতৃভবনে না থাকিয়া চিরদিন মাতুলালয়েই বাস করিতে লাগিল। পুত্র অকর্ম্মণ্য, একপ্রকার অবাধ্য বলিলেও হয়, প্রিয়তম ভ্রাতা ভরতও দেশত্যাগী হইলেন, মনস্তাপে কর্ণের হৃদয়পঞ্জর যেন ভগ্ন হইয়া পড়িল; অচিরেই তিনি লীলাসংবরণ করিয়া সমস্ত যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। কর্ণের কন্যার সহিত ঝালোরের শোণিগুরুবংশীয় সর্দ্দারের বিবাহ হইয়াছিল। সেই কন্যার গর্ভে রণধবল নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সর্দ্দার চিতোরের প্রধান প্রধান গিহ্লোটগণকে সংহার করিয়া স্বীয় পুত্র রণধবলকে তত্রত্য রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, পিতৃরাজ্য অপরের হস্তগত হইল, মাহুপ তদুদ্ধারে কোনরূপেই সমর্থ হইলেন না।

এক জন উচ্চহৃদয় কুলপাঠকাচার্য্যের মুখে ভরত এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন। পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্য ও গৌরব-উদ্ধারের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। সিন্ধুদেশীয় সেনাসমভিব্যাহারে অবিলম্বে তিনি মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চিতোর-রাজের অধীনস্থ সর্দ্দারেরা আসিয়া তাঁহার সহায় হইলেন। তাঁহাদিগকে সহায় করিয়া মহাবিক্রমে ভরত পল্লীনামক স্থানে শোণিগুরুবংশীয়গণকে সমরে পরাভূত করিলেন। চিতোররাজ্যে ভরতের বিজয়পতাকা সমুড্ডীন হইল।

কিছু দিন পরে ১২৫৭ সংবতে (খৃঃ ১২০১ অব্দে) রাহুপ চিতোর-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। রাজ্যাভিষেকের অল্পদিন পরেই নাগোর নামক স্থানে মুসলমানসেনাপতি সামসুদ্দীনের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ ঘটে। যবনেরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই সময় হইতেই মিবারের রাজপুরুষেরা গিহ্লোটের পরিবর্ত্তে "শিশোদীয়।" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন; যুদ্ধে রাহুপের বৈরিদল অসংখ্য, তন্মধ্যে মন্দুরাধিপতি পুরীহররাজ মকুল রাণাই প্রধান। যুদ্ধে রাহুপের হস্তে তিনি বন্দী হন; রাণা উপাধির সহিত আপন অধিকৃত গদবারপ্রদেশ রাহুপকে প্রদান করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন। তদবধিই মিবারের রাজপুরুষেরা পুরুষানুক্রমে 'রাণা' উপাধিতে ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহাদিতে রাহুপের পারদর্শিতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। চিতোরের প্রণষ্টগৌরব তৎকর্ত্তৃকই পুনরুদ্ধৃত হয়; তাঁহার শাসনগুণে রাজ্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত

হইয়াছিল। তিনি আটত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছেন। তাহার পর লক্ষ্মণসিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে নয় জন নৃপতি পর্য্যায়ক্রমে চিতোর-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তন্মধ্যে যবনগ্রাস হইতে গয়াধামকে উদ্ধার করিয়া ছয় জন নৃপতি সমরে আত্মবিসর্জ্জন করেন। মহাবীর পৃথ্বীমল্লই সেই ছয় জনের মধ্যে বীরত্বে শ্রেষ্ঠ; রণক্ষেত্রে তাঁহার বিক্রম ও বীরত্ব দেখিয়া যবনসেনাগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল; অধিক কি, স্বধর্ম্মপ্রিয় পৃথ্বীমল্লের অত্যদ্ভুত ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া যবনদিগের কঠোর হৃদয়েও যেন প্রীতির ছায়া নিপতিত হইল; হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার পরিত্যাগ করিয়া তাহারা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তদবধি আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণকে আর যবনবিপ্লবে উপদ্রুত হইতে হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

রাণা লক্ষ্মণসিংহ, ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর অদ্ভুত বৃত্তান্ত, আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ, রাণার মৃত্যু এবং হাম্মিরের রাজ্যলাভ।

বিজাতীয় আক্রমণে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ বিধ্বস্ত, সৌন্দর্য্যরাশি প্রণষ্ট এবং মহামূল্য ধনরত্ন বিলুণ্ঠিত হইলেও চিতোর অনেক দিন পর্য্যন্ত যশোগৌরবে গৌরবান্বিত ছিল; এই সমৃদ্ধিশালী প্রদেশে কোনরূপ বিকৃতভাব লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু কালবশে ভাগ্যদোষে দুর্দ্ধর্ষ নররাক্ষস পাঠান-সম্রাট্ আলাউদ্দীন কালস্বরূপ হইয়া কুক্ষণে ভারতে পদার্পণ করিল। চিতোরনগর দুইবার সেই ভীষণ দুর্দ্দান্ত ভারতশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। রাণা লক্ষ্মণসিংহের রাজত্বকালেই দুর্দ্দান্ত যবন-সম্রাট্ ভারতে প্রবেশ করেন। ১৩৭১ সংবতে (১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সিংহলদ্বীপবাসী চোহানবংশীয় হাম্মিরশঙ্কের কন্যা পদ্মিনীর সহিত ভীমসিংহের বিবাহ হয়। পদ্মিনী সতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, ললামভূতা রাজকুমারী। পদ্মমুখী পদ্মনয়না পদ্মিনীর অসাধারণ সৌন্দর্য্যের তুলনা ভারতের কোন স্থানেই দৃষ্ট হইত না। সেই লোকললামভূতা সুন্দরীকে পদ্মবাসিনী পদ্মালয়া বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। পদ্মিনী রূপে যেমন রূপবতী, গুণেও সেইরূপ প্রতিষ্ঠাবতী ছিলেন। আজিও ভারতে রাজবারাপ্রদেশে তাঁহার গুণগরিমাদি কবিবর্ণনার প্রধানতম উপমা ও উপাদান হইয়া রহিয়াছে।

আলাউদ্দীনের হৃদয়ে বিজয়বাসনা তাদৃশী বলবতী হয় নাই; পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপের কথা শুনিয়াই তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পদ্মিনীলাভের আশায় আলাউদ্দীন চিতোর-নগর আক্রমণ করিলেন, বহুদিন পর্য্যন্ত নগর অবরোধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, "রূপবতী পদ্মিনীকে পাইলেই আমি তৎক্ষণাৎ ভারত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিব।"

রাজপুতবীরগণের বীরহৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অঙ্ক হইতে অঙ্কলক্ষ্মী অপহৃত হইয়া অপরের ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করিবে—যবনের বিলাসের সামগ্রী হইবে, এ অবমাননাকর প্রস্তাবে আর্য্যবীরগণ দূরে থাকুক, কোন্ পামরও কুলাঙ্গারই বা সম্মত হইতে পারে? আলাউদ্দীনের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইল না, পদ্মিনীর আশাও তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কহিলেন, "একবারমাত্র মুকুরে সেই ভুবনমোহিনীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেই আমি স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইব। সকলের পরামর্শে ভীমসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। রাজপুতের মুখ হইতে একবার যে বাক্য বহির্গত হয়, প্রাণান্তেও তাঁহারা তাহা উল্লঙ্ঘন করেন না; প্রবল আততায়ী অতিথি হইলেও রাজপুতের নিকট পূজা ও সম্মানলাভের যোগ্য; তাঁহারা বঞ্চক বা বিশ্বাসঘাতক নহেন, সম্রাট্ আলাউদ্দীনের হৃদয়ে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। তিনি কতিপয়মাত্র আত্মরক্ষক সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে সশস্ত্র-সৈন্যপরিবেষ্টিত রাজপুতশিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যথোচিত সম্মাননা ও সংবর্দ্ধনায় কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। সসম্মানে অতিথিসৎকার করিয়া ভীমসিংহ তাঁহাকে দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করাইলেন। শিষ্টালাপের সহিত আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সম্রাট্ আলাউদ্দীন বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আপন শিবিরে যাত্রা করিলেন। সরল-হৃদয় ভীমসিংহও দুর্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন।

শতধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনত্ব দূর হয় না। অটলধর্ম্মনিষ্ঠার শত শত উপদেশ শ্রবণ করিলেও, সদাচারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও, পাপহৃদয়ের পাপপ্রবৃত্তি বিদূরিত হয় না। বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দীন স্বয়ং প্রতারক, তাঁহার হৃদয় প্রতারণাধর্ম্মেরই বশবর্ত্তী হইল। শিষ্টালাপ করিতে করিতে ভীমসিংহ আলাউদ্দীনের সহিত গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে এক দল অস্ত্রধারী পাঠানসেনা অতর্কিতে গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। যবনসম্রাটের আদেশ প্রচার হইল, পদ্মিনীকে পাইলেই ভীমসিংহের মুক্তি হইবে।

অচিরেই এই অশুভসংবাদ চিতোরে পৌছিল। নগরবাসী বীরগণের মুখপদ্ম নিশাকমলের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল। কি উপায়ে ভীমসিংহের উদ্ধার হইবে, কি উপায়েই বা পদ্মিনীর নিকট এই অশুভ সংবাদ—এই জঘন্য ঘৃণিত প্রস্তাবের কথা উত্থাপন করিবেন, কেহই কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলেই ভগ্নহৃদয়ে চিন্তানিমগ্ন রহিলেন।

এ দিকে লোকপরম্পরায় সমস্ত সংবাদই পদ্মিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বহুক্ষণ চিন্তার পর তিনি কহিলেন, "পতিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পবিত্র সতীত্বরত্ন তিনি যবনকরে সমর্পণ করিতে সম্মত আছেন।" ইহা শুনিয়া নগরবাসী সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। পদ্মিনী এই প্রকারে সম্মতিদান করিয়া একটি নিভৃতকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গোরা ও বাদল নামে দুইটি আত্মীয়লোক তাঁহার নিকট আহূত হইল। ইঁহারা দুই জন পদ্মিনীর পিতৃরাজ্যে বাস করেন। কি কৌশলে পতির উদ্ধার হইবে, কি কৌশলেই বা স্বয়ং অকলঙ্কিতদেহে পবিত্রতম সতীত্বরত্ন লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যবনশিবির হইতে প্রত্যাগত হইবেন, গোরা ও বাদলের সহিত পদ্মিনী গুপ্তগৃহে বসিয়া তাহারই গুপ্তমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ মন্ত্রণার পর কর্ত্তব্য স্থির হইল। অবিলম্বেই আলাউদ্দীনের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, পদ্মিনী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সাম্রাজ্ঞী। উপযুক্ত সম্মানের সহিত যবনশিবিরে গমন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যখন রাজমহিষী পদ্মিনী সম্রাট্শিবিরে উপস্থিত হইবেন, তদ্গতপ্রাণা চিরসহচরীগণ তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত

রাজপুতললনা পদ্মিনীকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও চিরবিদায় লইবার জন্য একবারমাত্র শিবির পর্য্যন্ত অনুগমন করিবেন। তাঁহাদিগের সম্মানরক্ষণে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয় এবং কেহ যেন তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া মর্য্যাদালঙ্ঘন না করে। ঐ সকল ভদ্রমহিলা শেষবিদায় লইয়া পুনরায় চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট্ অবরোধকারী সৈন্যগণকে উঠাইয়া যে দিন অপেক্ষাকৃত দূরে গিয়া শিবিরস্থাপন করিবেন, এই সত্য অঙ্গীকার শ্রবণে পদ্মিনী সেই দিনেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন।

আনন্দে আলাউদ্দীনের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; অবরোধকারী সৈন্যগণকে উঠাইয়া লইবার দিনও ধার্য্য হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে অন্যূন সাতশত পটাবৃত শিবিকা চিতোর হইতে যবন-শিবিরাভিমুখে প্রস্থিত হইল। প্রত্যেক শিবিকাভ্যন্তরে চিতোরের এক একটি মহাবীর অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গুপ্তভাবে সংস্থিত। প্রতি শিবিকাই গুপ্তাস্ত্রধারী ছদ্মবেশী ছয় জন যোদ্ধার দ্বারা বাহিত হইতে লাগিল। সাত শত শিবিকাই একে একে যবন-শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

প্রিয়তমা পদ্মিনীর সহিত জন্মের মত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে অর্দ্ধঘণ্টামাত্র সময় প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশ অনুসারে ভীমসিংহ যেমন শিবিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনি তাঁহার কতিপয় সেনানী একখানি শিবিকাভ্যন্তরে তাঁহাকে গোপনে আরোপিত করিয়া চিতোরাভিমুখে প্রস্থান করিল; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলি যান অনুগামী। আলাউদ্দীনের আগমন-প্রতীক্ষায় অবশিষ্ট শিবিকাগুলি যবনশিবিরাভ্যন্তরেই থাকিল। যে শিবিকাগুলি চিতোরাভিমুখে প্রতিগমন করিতেছে, তাহা দেখিয়া আলাউদ্দীন ভাবিলেন, পদ্মিনীর নিকট চিরবিদায় লইয়া চিতোরবাসিনী কুলললনারাই ঐ সকল শিবিকাতে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন, পদ্মিনীর চিরসঙ্গিনী সহচরীরাই অবশিষ্ট শিবিকাগুলিতে শিবিরাভ্যন্তরে রহিয়াছেন।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত। পত্নীর নিকট হইতে ভীমসিংহ প্রত্যাগত হইলেন না। প্রিয়তমার সহিত তিনি বহুক্ষণ আলাপ করিতেছেন, আলাউদ্দীনের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না; বিষময়ী ঈর্ষা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াও তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শিবিকার পটাবরণ উন্মোচন করিতে তিনি আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বেই শিবিকা আবরণোন্মুক্ত হইল। আলাউদ্দীন চমকিত ও বিস্মিত। শিবিকায় ভীমসিংহ নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভীমসিংহও নাই, পদ্মিনীও নাই, কেহই নাই। কতকগুলি সশস্ত্র যোদ্ধা পুরুষ বীরবিক্রমে বিরাটবেশে অসিহস্তে শিবিকাভ্যন্তর হইতে দলে দলে বহির্গত হইতেছে। অচিরেই সেই ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। ভীমসিংহকে লইয়া যাহারা পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য এক দল যবনসেনা প্রেরিত হইল। তাহারাও পথিমধ্যে রাজপুতসেনার সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুই স্থানে দুইটি সংগ্রামে দুই পক্ষই জিগীষু। শিবিকা হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ভীমসিংহ বেগবান্ তুরঙ্গারোহণে অবিলম্বে চিতোর-দুর্গে প্রবেশ করিলেন, পাঠানেরা দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত সমাগত হইল। আত্মজীবনকে বিপন্ন করিয়াও গোরা ও বাদল উভয়ে রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাউদ্দীনের অভীষ্ট ব্যর্থ হইয়া গেল। চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক সসৈন্যে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

মহাবীর গোরা এই যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইতিবৃত্তগ্রন্থে তাহার প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যবনের হস্ত হইতে চিতোররাজ্য এবং ভীমসিংহ ও পদ্মিনীকে উদ্ধার করিয়া গোরা রণক্ষেত্রে জীবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার

বীরত্বগৌরব অদ্যাপি কেহ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। এই যুদ্ধকে কবিরা অর্দ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই আক্রমণ ধরিয়া চিতোরোৎসাদন সর্ব্বসমেত সার্দ্ধবারত্রয় বলিয়া পরিগণিত হয়। এই যুদ্ধস্থল হইতে কতিপয়মাত্র বীর প্রাণ লইয়া চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে বালক-বীর বাদল এক জন। বাদলের বয়স তখন দ্বাদশবর্ষ মাত্র। রাজপুতবীরেরা কৈশোরেই রণচর্য্যায় সুশিক্ষিত হন, কৈশোরেই তাঁহাদিগের হৃদয়ে রণপিপাসা বলবতী হইয়া উঠে, সুতরাং এত অল্প-বয়সে রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন বালকবীর বাদলের পক্ষে বিচিত্র নহে।

বাদল রণজয়ী হইয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইলে তদীয় পিতৃব্যপত্নী শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রাণ-পতির যুদ্ধকাহিনী প্রকাশ করিতে বলিলেন। বালকবীর বলিলেন, "মা! আমার পিতৃব্যের বিপুল বিক্রমের কথা আর কি বলিব, তাঁহার বীরত্বদর্শনে বিপক্ষপক্ষেরাও বিস্মিত হইয়া শত শত ধন্য-বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। অসংখ্য অসংখ্য শত্রুসৈন্যের মস্তক করবালচ্ছিন্ন করিয়া তিনি সম্মানের সুখশয্যায় একটি যবনরাজের শবদেহে মস্তকবিন্যাসপূর্ব্বক অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া বীরপত্নী বাৎসল্যভাবে বাদলের মুখচুম্বন করিলেন; কালবিলম্ব না করিয়া অচিরেই চিতাগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক তিনি উপরত পতির অনুসঙ্গিনী হইলেন।

দুর্দ্ধর্ষ আলাউদ্দীনের পিপাসার শান্তি নাই। ১৩৪৬ সংবতে (১২৯০ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। যদিও পূর্ব্বযুদ্ধে চিতোরের অসংখ্য বীর রণশায়ী হইয়াছেন, যদিও চিতোর ক্ষীণকায় হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি বীরত্বপ্রদর্শনে, বিক্রমে, রণোৎসাহে রাজপুতজাতি অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। অবিলম্বেই তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া যবনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। যবনেরা নগরের দক্ষিণভাগস্থ পর্ব্বতশ্রেণী অধিকার করিয়া তথায় শিবির-স্থাপন ও তাহার চতুর্দ্দিক পরিখাখনন করিয়াছিল। অবিলম্বেই হিন্দু-মুসলমানে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। অসংখ্য চিতোরবীর একে একে রণভূমে শয়ন করিতে লাগিলেন।

এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রাসাদকক্ষে বসিয়া চিতোরের রাণা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। দৈনন্দিন যুদ্ধব্যাপারে প্রিয়তম চিতোরবীরেরা একে একে লীলাসংবরণ করিতে লাগিলেন, চিতো-রের ভবিষ্যগগন ক্রমে নিবিড় মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, চারিদিকেই মহাযুদ্ধে মহা-নিপাতের আর্ত্তনাদ; এ অবস্থায় কিরূপে চিতোররাজ্য রক্ষা পাইবে, কিরূপেই বা দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একটিও জীবিত থাকিবে, এই চিন্তায় রাণার হৃদয় একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। একটি পুত্র জীবিত থাকিলেও বংশমর্য্যাদা রক্ষিত হয়, পিতৃপুরুষেরা এক গণ্ডূষ জল প্রাপ্ত হইতে পারেন।

গভীররাত্রে গভীরচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রাণা লক্ষ্মণসিংহ কক্ষমধ্যে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট আছেন, সহসা সুগভীর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, "মেই ভুখা হুঁ।" চমকিত হইয়া বিস্ময়বিকসিতলোচনে রাণা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে সুবর্ণপ্রদীপে আলোক প্রজ্বলিত ছিল, প্রকোষ্ঠভিত্তিতে একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি বিরাজিত।—মর্ম্মরস্তম্ভরাজির মধ্যভাগে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে চিতোররাজের সম্মুখে আবির্ভূতা।

দেবীকে দেখিবামাত্র রাণা বলিয়া উঠিলেন, "মা! এখনও কি তোমার ক্ষুধার শান্তি হয় নাই? আমার বংশের অষ্টসহস্র পুরুষ ক্রমে ক্রমে রণশায়ী হইলেন, তাঁহাদিগের শোণিতপানেও কি তোমার তৃষ্ণাশান্তি হইল না?" দেবী কহিলেন, "চিতোরের জন্য রাজমুকুটধারী দ্বাদশটি রাজপুত্র

প্রাণ উৎসর্গ না করিলে আমার পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না ; চিতোরও অন্যের করতলগত হইবে।" এই বলিয়া দেবী তিরোহিত হইলেন।

প্রভাতে রাণা সভামণ্ডলীতে রজনীবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, সেনানীগণ তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। কথাগুলি নৃপতির বিকৃতমস্তিষ্কের ভ্রমবিজৃম্ভিত বলিয়াই তাঁহাদিগের ধারণা হইল। তখন রাণা সেই দিন নিশাভাগে সেনানীগণকে তাঁহার কক্ষে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন। তাহাই হইল। পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় গভীর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেবী পুনরাবির্ভূতা হইলেন ; কহিলেন, "সহস্র সহস্র যবন নিপাতিত হইলেও আমার তৃপ্তি হইবে না। প্রত্যহ এক একটি রাজকুমার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিন দিন রাজ্যশাসনের পর চতুর্থ দিবসে রণক্ষেত্রে আত্মজীবন উৎসর্গ করিবে। এই প্রকারে দ্বাদশটি পুত্র প্রাণত্যাগ করিলেই চিতোরের ভাগ্যগগন মেঘমুক্ত হইয়া উঠিবে।" এই বলিয়াই দেবী তিরোহিত হইলেন।

জন্মভূমিরক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন দিতে রাজপুতবীরেরা স্বতই চির-অভ্যস্ত ; তাহার উপর দেবীর আদেশ, প্রজ্বলিত অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। দ্বিগুণবিক্রমে—দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বাদশটি রাজকুমারই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। অরিসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ; প্রথমে তিনিই রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিন দিন রাজ্যভোগের পর চতুর্থ দিবসে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মহাবিক্রমে মহাবীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি আত্মজীবন পরিত্যাগ করিলেন। অজয়সিংহ দ্বিতীয় পুত্র। রাণা তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। পিতার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় অজয়সিংহ অগ্রজের অনুগমন করিলেন না ; অগত্যা অবশিষ্ট দশ ভ্রাতাও পর্য্যায়ক্রমে চিতোরসিংহাসনে আরোহণ, পর্য্যায়ক্রমে যবন-সমরে প্রবেশ এবং পর্য্যায়ক্রমে রণক্ষেত্রে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বদেশহিতৈষিতার ও আর্য্যবীরত্বের দেদীপ্যমান উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন।

বিজাতীয় জেতৃকুলের অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়মহিলাগণকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া জহরব্রতের অনুষ্ঠান করা পূর্ব্বে রাণাবংশের প্রথা ছিল। শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষার যখন আর কোন উপায় থাকিত না, তখন এই ব্রতের অনুষ্ঠান হইত। সেইরূপ সঙ্কটসময় দেখিয়া রাণাও সেই কঠোরব্রতানুষ্ঠানে সমুদ্যত হইলেন। রাজপুরীর অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্য স্থানে একটি বিশাল কূপ ছিল, তন্মধ্যে প্রচণ্ড বহ্নিকুণ্ডসমূহ প্রজ্বলিত থাকিত। পতিপুত্রবিহীনা অসংখ্য রাজপুতমহিলা সেই কুণ্ডে জীবনবিসর্জ্জনার্থী হইয়া ধীরে ধীরে সেই বিশাল গহ্বর-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। লোকললামভূতা পদ্মিনীও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারিণী ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট মহিলাগণ সমবেত হইলে একে একে সকলেই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথ দিয়া গহ্বরমধ্যে অবতরণ করিলেন। বিশাল গহ্বরের বিশাল লৌহকপাট উপরিভাগ হইতে অবরুদ্ধ হইল। অহো ! সেই গহ্বরমধ্যে কি ভয়ঙ্কর শোকাবহ অভিনয় হইল, স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত, স্তম্ভিত ও বিশুষ্ক হইয়া উঠে। হায় ! আজি চিতোরের কুললক্ষ্মীগণ চিরবিদায় হইলেন। সেই লোকললামভূতা পদ্মিনী কোথায় ? দুরাত্মা আলাউদ্দীনের জীবনতোষিণী সতীশিরোমণি আজি করাল গহ্বরমধ্যে অনলে দেহত্যাগ করিলেন। সেই গহ্বরমধ্য হইতে নিবিড় ধূমরাশি উদ্‌গত হইতে লাগিল। তদবধিই ঐ গহ্বর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। কিংবদন্তী এইরূপ, একটি মহান্ অজগরসর্প রক্ষকরূপে সর্ব্বদা সেই গহ্বরমধ্যে বাস করে। কেহ দীপহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশের উপক্রম করিলে কালসর্পের বিষময় নিশ্বাসে সেই দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ; রহিলেন কেবল রাণা লক্ষ্মণসিংহ আর তাঁহার স্নেহাস্পদ দ্বিতীয়

পুত্র অজয়সিংহ। জহরব্রত উদযাপিত হইলে রাণা স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য রণসজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। উপযুক্ত পুত্র বিদ্যমানে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া পিতার পক্ষে অনুচিত, পিতৃভক্ত অজয়সিংহ এই প্রকারে নানা দৃষ্টান্ত দেখাইলেও পুত্রবৎসল রাণা স্নেহপাশ ছেদন করিয়া প্রিয় পুত্রকে সমরসাগরে অবগাহন করিবার অনুমতি দিতে পারিলেন না।

পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন পিতৃভক্ত পুত্রের ধর্ম্ম নহে; কাজেই পিতার অনুমতি লইয়া অজয়সিংহ অল্পমাত্র সৈনাসমভিব্যাহারে শত্রুশিবির অতিক্রমপূর্ব্বক কৈলবারাপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন; দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে বাপ্পাবংশে এক জন মাত্র জীবিত রহিলেন।

এ দিকে রাণা দ্বিগুণ উৎসাহে সমুৎসাহিত হইয়া শত্রুসমরে জীবনবিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইলেন। যে কতিপয়মাত্র সর্দ্দারবীর চিতোরে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগকে সহায় করিয়া রাণা লক্ষ্মণসিংহ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যবনেরাও ভীমবিক্রমে বিপক্ষের সেনাসাগরে ঝম্পপ্রদান করিল। ভীমপরাক্রমে উভয়দলে তুমুলসংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। ভীষণ যুদ্ধের পর চিতোরবীরগণ একে একে রণশায়ী হইলেন। চিতোরের পথ, ঘাট, প্রাঙ্গণ, চত্বর, চতুষ্পদ সমস্ত স্থানই আর্য্যবীরগণের ছিন্নবিচ্ছিন্ন শোণিতাক্ত মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন হইল। চিতোর শ্মশান, সেই জনশূন্য শ্মশানভূমি তখন নরশোণিতপিপাসু আলাউদ্দীনের অধিকৃত। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে এইরূপে আলাউদ্দীনের কঠোর হস্তের কঠোর আঘাতে অমরাবতীসদৃশ চিতোরনগরী বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

চিতোর অধিকার করিয়া আলাউদ্দীন স্বপ্রচলিত মুদ্রায় "সেকন্দর শাহ" (দ্বিতীয় আলেক্জন্দর) উপাধি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেব যেরূপ বিজয়ী ও কপটধর্ম্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ, আলাউদ্দীনও তদপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। আলাউদ্দীনের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী অতি বিরল। চিতোরের সমস্ত শোভা, সমস্ত সমৃদ্ধি এবং সমস্ত গৌরব দুরাচার আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। কেবল ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর বাসভবনটি যবন-কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় নাই। কেবল চিতোরনগরই যে আলাউদ্দীন নষ্ট করিয়াছিল, এমন নহে; অবন্তী, মুন্দর, দেবগড়, আনহুলবারা, প্রাচীন ধারা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলিও তৎকর্ত্তৃক উৎসাদিত হইয়াছিল। কালে ঐ সকল রাজ্য পুনরুন্নতি প্রাপ্ত হয়। রাঠোর ও অম্বরের কচ্ছবাহকগণ তৎকালে ধীরে ধীরে আপনাদিগের মস্তক উন্নত করিতেছিলেন। রাঠোরেরা তখন পুরাতনদিগের সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

এ দিকে রাণা অজয়সিংহ সামান্য কৈলবারা নগরে দীনভাবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। মিবাররাজ্যের পূর্ব্বদিকে আরাবল্লী-পর্ব্বতমালামধ্যভাগে শিরোনাল নামে যে একটি উপত্যকাপ্রদেশ আছে, সেই উপত্যকার উচ্চতম অংশে সামান্য কৈলবারা নগর প্রতিষ্ঠিত। চিতোর উদ্ধারের আশা অজয়সিংহের হৃদয় হইতে একেবারে উন্মূলিত হয় নাই, চেষ্টা করিতেও তিনি ত্রুটি করিলেন না; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, পুত্রেরাও পৈতৃকরাজ্য উদ্ধারের পন্থা প্রশস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছু দিন পরে অজয়সিংহের জ্যেষ্ঠ সহোদর অরিসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হামির যবন হস্ত হইতে পৈতৃক-রাজ্য, পৈতৃক-প্রণষ্টগৌরব ও পৈতৃক-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিলেন। হামিরের জন্ম ও বাল্যলীলাসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

একদা অরিসিংহ মৃগয়ার্থ অন্দাবারণ্যে প্রবেশ করেন। চিতোরের কতিপয় সর্দ্দারও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। একটি বন্যবরাহের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বিশাল জনারক্ষেত্রের (এক-প্রকার শস্য) নিকটবর্ত্তী হন। একটি কৃষককুমারী তথায় তাঁহাদিগের নেত্রপথে নিপতিত হইল। ক্ষেত্রের মধ্যভাগে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত ছিল, তদুপরি আরোহণ করিয়া কৃষককুমারী

শস্যবিঘ্নকারী পশুপক্ষীদিগকে তাড়াইতেছিল। রাজাকে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া কুমারী নিজে সেই বরাহ ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল, বিস্ময় মানিয়া রাণা ও তাঁহার সহচরগণ পশুর অনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন। ক্ষেত্রমধ্য হইতে প্রায় ছয় হাত দীর্ঘ একটি জনার-দণ্ড উৎপাটন করিয়া কুমারী ছুরিকা দ্বারা তাহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ করিয়া লইল; ভল্লের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ করিল, অবিলম্বেই মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া সেই কৃত্রিম ভল্ল দ্বারা নিমিষমধ্যে লক্ষ্যীভূত বরাহকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। এই বিস্ময়করী অস্ত্রচালনদক্ষতা দর্শনে রাজা ও তৎসহচরগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন।

মৃগয়া সমাপন করিয়া সকলে বনমধ্যে তটিনীনীরে আনাহ্নিক সমাপন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা তীরে বসিয়া কৃষককুমারীর অসামান্য শক্তি, কৌশল ও বাহুবলের বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, অকস্মাৎ শূন্যপথ হইতে একটা মৃৎপিণ্ড আসিয়া রাণা অরিসিংহের অশ্বপদে সবেগে আঘাত করিল, ভগ্নপদ হইয়া অশ্বটি তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। চমকিত হইয়া সকলে ইতস্ততঃ নেত্রচালনা করিলেন;—দেখিলেন, কৃষককুমারী আপন উচ্চমঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া মৃৎপিণ্ডপ্রক্ষেপে পক্ষিকুলকে ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, তাহারই হস্তনিক্ষিপ্ত একটি মৃৎপিণ্ড আসিয়া অশ্বপদে পতিত হইয়াছিল। কুমারী শশব্যস্তে মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া রাণার নিকট উপস্থিত হইল, আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ করপুটে মিনতি করিতে লাগিল।

মিষ্টবাক্যে ক্ষেত্রপালকুমারীকে বিদায় দিয়া রাণা অরিসিংহ সহচরগণ সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র পথিমধ্যে পুনরায় সেই কৃষকদুহিতা তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। মস্তকে একটি গুরুভার দুগ্ধকুম্ভ, সম্মুখে দুইটি মহিষ-শাবক। কুমারী যুগলহস্তে রজ্জুধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। রাজপারিষদগণের কৌতুকস্পৃহা জন্মিল; তাঁহারা কুমারীর মস্তক হইতে দুগ্ধপাত্রটি ভূতলে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। এক জন দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া কুমারীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। গতিসংযমে অসমর্থ হইয়া অশ্বারোহীর অশ্বটি কৃষকবালার গাত্রে গিয়া প্রতিহত হইল। অশ্বারোহীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কৃষকবালা উচিত প্রতিফল প্রদানে অভিলাষিণী হইল। রজ্জুবদ্ধ বৎসদুটিকে রাজবয়স্যের ঐ প্রতিহত ঘোটকের পদের সহিত এরূপভাবে জড়িত করিয়া দিল যে, অশ্বসহ অশ্বারোহী তৎক্ষণাৎ ভূশায়ী হইয়া পড়িলেন। কৌতুকিনীর কৌতুকে পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া রাজপুতগণ ধীরে ধীরে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

অনুসন্ধান করিয়া রাজকুমার অরিসিংহ জানিলেন, সেই বীর্য্যবতী কুমারী চন্দানোবংশসম্ভূত* এক দরিদ্র রাজপুতের দরিদ্র কন্যা। পরদিন রাজা পুনরায় সেই বনমধ্যে গমন করিয়া কুমারীর পিতাকে আপনার নিকট আহ্বান করিলেন। সংবাদ পাইয়া দরিদ্র বৃদ্ধও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। সমুচিত সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া রাজা তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ অসম্মত হইল। ভগ্নমনোরথ হইয়া রাজা চিতোরে প্রতিগমন করিলেন।

ভবিতব্য খণ্ডন করে, কাহার সাধ্য? বৃদ্ধ রাজপুত গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পত্নীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। চিতোররাজ জামাতা হইলে আপনাদিগের সম্মানগৌরবের বৃদ্ধি হইত, দুঃখদশার শেষ হইয়া সুখের মুখ দেখিতে পাইত, অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। পতির অবিমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিয়া সে নানারূপে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তখন বৃদ্ধের চৈতন্যোদয় হইল; সে তখন

* চোহানবংশের একটি শাখার নাম চন্দানো।

অবিলম্বে কন্যাটিকে লইয়া চিতোরে গমনপূর্ব্বক রাণা অরিসিংহের করে সম্প্রদান করিল। সেই কন্যার গর্ভেই অরিসিংহের ঔরসে মহাবীর হামিরের জন্ম।

যে সময়ে যবনবিপ্লবে চিতোর বিধ্বস্ত হয়, হামির তখন মাতামহগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম সে সময় দ্বাদশবর্ষমাত্র। পার্ব্বত্য সর্দ্দারগণের সহিত সেই সময়ে অজয়সিংহের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল; সুতরাং তিনি চিতোর উদ্ধারের জন্য কোন উপায় করিতে পারিলেন না। যে সকল পার্ব্বত্য-সর্দ্দার তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তন্মধ্যে মুঞ্জবলায়ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ। মুঞ্জের সহিত যুদ্ধে একবার অজয়সিংহ মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অজয়সিংহের দুই পুত্র;—আজিমসিংহ ও সুজনসিংহ। আজিম তখন পঞ্চদশ এবং সুজন চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক। মহাবিপ্লবের সময় পুত্রদ্বয় দ্বারা অজয়সিংহ কিছুমাত্র আনুকূল্য প্রাপ্ত হন নাই। বিপদসমাচার পাইয়া হামির মাতুলালয় হইতে পিতৃসমীপে প্রত্যাগত হইলেন এবং অচিরেই পিতৃব্যের অনুকূল হইয়া মুঞ্জের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, "মুঞ্জের ছিন্নমস্তক যদি আনয়ন করিতে পারি, যদি তাহার অত্যাচারের প্রতিশোধ দিয়া বিজয়-বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন করিতে সমর্থ হই, তবে রণক্ষেত্র হইতে দেশে ফিরিব, নচেৎ এই পর্য্যন্ত।"

অচিরেই রণক্ষেত্রে বীরকুমারের বীরপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল, অচিরেই তিনি মুঞ্জের ছিন্নমস্তক আনয়নপূর্ব্বক পিতৃব্যচরণে সমর্পণ করিলেন। আনন্দে অজয়সিংহের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সস্নেহে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের কপোলদেশ চুম্বন করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া মুঞ্জের ছিন্নমস্তক হইতে শোণিতবিন্দু লইয়া তিনি হামিরের ললাটদেশে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। আজিমের ও সুজনের রাজ্যলাভের আশা এইখানেই নির্ম্মূল হইল। যন্ত্রণাময়ী চিন্তায় দগ্ধ হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই আজিম কৈলবারা-প্রদেশে লীলাসংবরণ করিলেন। ভবিষ্যতে পাছে হৃদয়ের অশান্তি উপস্থিত হয়, পাছে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইয়া রাজসংসারের অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় সুজনসিংহ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমনপূর্ব্বক নূতন একটি রাজধানী স্থাপন করিলেন। কালে তাঁহার বংশধরেরা এরূপ বিপুলপরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের পদভরে বসুমতী বিকম্পিতা হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যবন-দর্পহারী মহাবীর শিবজী এই মহাবংশসম্ভূত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাজপুতরাজবর্গের মধ্যে টীকাডোরব্রতের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অভিষেকের দিন প্রভাতে রাজতিলক প্রাপ্ত হইবার অব্যবহিতপরক্ষণেই নবীন নৃপতি সসৈন্যে সন্নিহিত কোন শত্রুপুরী আক্রমণ করেন। শত্রুর সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠন ও দুর্গাদি অধিকারের পর সানন্দোৎসাহে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। নিকটে শত্রু না থাকিলেও, রাজ্যের সমন্তাৎ শান্তি বিরাজ করিলেও, কৌতুকাভিনয়ে এই প্রাচীন প্রথা সমাপিত হইয়া থাকে। হামির ১৩৫৭ সংবতে (১৩০২ খৃষ্টাব্দে) যে দিন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, সেই দিবসেও ঐরূপ টীকাডোরব্রতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। একাদিক্রমে হামির ৬৪ বৎসর রাজত্ব করেন, যবনের হস্তে মিবাররাজ্যের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, হামির তৎসমস্তেরই পূরণ করিয়াছিলেন।

হামির যখন মিবার-রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন, মালদেব তখন দিল্লীর যবনসেনার আশ্রয়ে রক্ষিত হইয়া চিতোর-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। যবনসেনা অপেক্ষা হামিরের সেনাবল অল্প, সুতরাং নগরসমূহ আক্রমণ না করিয়া প্রথমে তিনি জনস্থানভূভাগগুলিকে উৎসাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ঘোষণাও তিনি প্রচার করিলেন যে, যাহারা তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার

করিবে, তাহারা যেন অচিরে মিবারের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকৃস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া সপরিবারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে বিপক্ষমধ্যে পরিগণিত হইয়া ঘোরবিপদে নিমগ্ন হইতে হইবে।

ঘোষণাপ্রচারমাত্র মিবারের অসংখ্য অধিবাসী পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হামির সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে কৈলবারানগরে রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। কৈলবারার দৃশ্য অতি মনোরম। নগরের সমন্তাৎ পর্ব্বতমালা। নগরের শিরোদেশ দিয়া একটি সংকীর্ণ গিরিপথ তৎপার্শ্ববর্ত্তী নাত্যুন্নত পর্ব্বতশিখর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। হামিরের পরবর্ত্তী বংশধরেরা এই গিরিশিখরে কমলমীর নামে একটি পরম সুন্দর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কৈলবারাপ্রদেশ ধরাপৃষ্ঠ হইতে আট শত হস্ত এবং সাগরের সমতলস্থান হইতে দুই সহস্র হস্ত উন্নত। অন্যূন ২৫ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া এই প্রদেশ শোভা পাইতেছে। যে সকল জাতি সখ্যভাব স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধে হামিরের সহায়তা করিয়াছিল, ভীলজাতিই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আপনাপন হৃদয়শোণিত দিয়াও ইহারা হামিরের সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হামির কৈলবারানগরে একটি সুবৃহৎ সরোবর ও তত্তীরে একটি অত্যুচ্চ দেবীমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সরোবরটি "হামিরতালাও" নামে প্রসিদ্ধ; উহা অদ্যাপিও বিরাজিত রহিয়াছে।

যখন সার্ব্বজনীন বিবাদ-বিসংবাদ সমুপস্থিত হয়, ঘোর বিপ্লবে সমস্ত রাজ্য বিকম্পিত হইতে থাকে, সেই সময়ে পৈতৃকরাজ্য চিতোরের পুনরুদ্ধারে হামির অহর্নিশি চিন্তানিমগ্ন। সেই সময় হঠাৎ মালদেব চিতোর হইতে কৈলবারাতে হামিরের নিকট একটি বিবাহসম্বন্ধসূচক সংবাদ প্রেরণ করিলেন। হামিরের করে মালদেবদুহিতা সমর্পিতা হইবেন, এই সংবাদ লইয়া একটি দূত কৈলবারায় উপস্থিত হইল। প্রাচীন আর্য্য রাজন্যবর্গের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, বিবাহসম্বন্ধসূচক সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে তৎসমভিব্যাহারে একটি নারিকেলফল প্রেরিত হইত। ইহা ব্যতীত কন্যাকর্ত্তা স্বীয় দুহিতার বাসভবনের বহির্দ্বারে একটি তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতেন। উহা তিনটি সমদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে গঠিত হইত, আকার সমকোণ ত্রিভুজের ন্যায়। ইহার উপরিদেশে একটি ময়ূরমূর্ত্তিও স্থাপিত হইত। কুমারীর সহচরীরা তোরণের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া বরের আগমনী-গীত গান করিত। তাহাদিগের হস্তে নানাবর্ণের চূর্ণফল থাকিত, বর অশ্বারোহণে আসিয়া যেমন হস্তস্থ ভল্ল দ্বারা তোরণটি ভাঙ্গিতে উদ্যত হইতেন, অমনি পূর্ব্বোক্ত রমণীরা চূর্ণফলগুলি বরের গাত্রে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বর তোরণটি ভগ্ন করত কুমারী-ভবনে প্রবিষ্ট হইতেন।

ঘোর সংঘর্ষ-সময়ে—মহাবিপ্লবের সূত্রপাতকালে মহাশত্রু হইয়া শত্রুকরে কন্যাসম্প্রদানে সমুদ্যত হওয়া যার-পর-নাই বিস্ময়কর হইলেও হামির কিছুমাত্র পরিণাম বিবেচনা না করিয়া নারিকেলফল গ্রহণ করিলেন; সম্বন্ধ স্বীকৃত হইল; বিবাহের দিনও ধার্য্য হইয়া রহিল। শুভসংবাদ লইয়া দূত বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক চিতোরে প্রতিগমন করিল।

অমাত্য, পারিষদ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই এ বিবাহে হামিরকে স্বীকৃত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হামির কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না; ভাবী বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কাও তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইল না। শান্তস্বরে মধুরসম্ভাষণে তিনি সকলকে এইমাত্র বলিলেন, "যে প্রাসাদ আমার পিতৃপুরুষগণের চিরলীলা-নিকেতন, অন্ততঃ একবারমাত্র তদুপরি পদার্পণ করিলেও আমি পরমসুখী হইব।" রাজপুতের ভাগ্য দুর্ব্বোধ্য; আজি হয় ত শত্রুসমরে জর্জরিত

হইয়া শোণিতাক্ত ও ক্ষতবিক্ষতদেহে দেশত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, কা'ল হয় ত আবার তাঁহারই শিরে সসাগরা পৃথ্বীর রাজমুকুট সুশোভিত হইল। রাজার মুখে এইরূপ নির্ভীকতা ও বীর্য্যবত্তার কথা শুনিয়া সকলেই নিরুত্তর রহিলেন।

বিবাহবাসর সমাগত। পাঁচশতমাত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বরযাত্রিগণ রাজাকে লইয়া চিতোরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নগরীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হামিরের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল; বিবাহতোরণ সজ্জিত হয় নাই। স্বতঃসিদ্ধ সাহসে ভর করিয়া তিনি মনশ্চাঞ্চল্য মনোমধ্যেই বিলীন রাখিলেন। মালদেবের পঞ্চপুত্র প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। প্রাসাদপ্রাঙ্গণে প্রবেশমাত্র মালদেব, তৎপুত্র বনবীর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজপুতবীরেরা করযোড়ে হামিরের যথাসম্মানে অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। অবিলম্বে যথানিয়মে মালদেবকন্যা হামিরের করে সমর্পিতা হইলেন। সমারোহের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না।

সন্দেহের উপর নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়া হামিরের হৃদয় আন্দোলিত করিতে লাগিল। বিবাহ সমাপনান্তে হামির বাসরগৃহে প্রবেশ করিলে নববধূ পতির মনোবেদনা ও সন্দেহের অপনোদন করিয়া দিলেন। তাঁহার মুখেই হামির শুনিলেন, নববধূ বিধবা। অতি শৈশবে ভট্টিবংশীয় এক সেনানীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের অল্পদিন পরেই পতির মৃত্যু হয়। শৈশবাবস্থায় যে বিবাহ হইয়াছিল, রাজকন্যার তাহা আদৌ স্মরণ হয় না। এই কারণে পিতা সঙ্গোপনে পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিলেন, এই কারণেই সে বিবাহে সমারোহ হইল না, আমোদপ্রমোদ হইল না, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবাদি কেহই নিমন্ত্রিতও হইলেন না।

বিধবাবিবাহ মহা অবমাননাকর কার্য্য, হামিরও বীরগর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইতেন, কিন্তু নবপ্রণয়িনীর সত্যনিষ্ঠা, সরলতা ও ঐকান্তিক অনুরাগ দর্শনে সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে ক্রোধসংবরণ করিয়া থাকিতে হইল। বিশেষতঃ পত্নীর উপদেশমত উপায় অবলম্বনের জন্য তিনি উচিত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। মেহতাবংশীয় জাল নামক একজন সুবিচক্ষণ কর্ম্মচারী তখন চিতোরের রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হামির নবীনা পত্নীর পরামর্শে মালদেবের নিকট হইতে যৌতুকস্বরূপে সেই কর্ম্মচারীকে প্রার্থনা করিলেন। কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া মালদেবও তাঁহাকে সেই কর্ম্মচারী প্রদান করিলেন।

এক পক্ষ অতীত। জালকে লইয়া নবদম্পতি কৈলবারাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মালদেবদুহিতার গর্ভেই হামিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রসিংহের জন্ম হইল। দৌহিত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মালদেব নিজ অধিকৃত সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশ হামিরকে যৌতুক প্রদান করিলেন। ক্ষেত্রসিংহের বয়ঃক্রম যখন দুই বর্ষ, তখন দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন, "ক্ষেত্রসিংহের প্রতি রাজপরিবারের অধিষ্ঠাতৃদেব ক্ষেত্রপালের রোষদৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাঁহার ক্রোধের প্রশমন না হইলে কুমারের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

চিতোরে ক্ষেত্রপালদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আরাধনা করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে তাঁহারই চরণতলে কুমারকে অর্পণ করিয়া দেবকোপের শান্তি করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে ক্ষেত্রপালসিংহের জননী পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দুহিতৃবৎসল মালদেবও তৎক্ষণাৎ কন্যা-দৌহিত্রকে লইয়া যাইবার জন্য একদল অস্ত্রধারী সৈন্য কৈলবারায় প্রেরণ করিলেন। সেই দিন হইতেই হামিরের সৌভাগ্যগগনে সুখ-সূর্য্যের উদয় হইল।

পিতৃপ্রেরিত সেনাদলের সহিত মালদেব-কন্যা পিতৃদত্ত কর্ম্মচারী জালকে লইয়া চিতোরাভিমুখে

যাত্রা করিলেন। পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াই তিনি শুনিলেন, মাদেরিয়ার মীরগণকে দমন করিবার জন্য পিতা সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। তখন মেহতাসর্দ্দার জালের পরামর্শে তিনি চিতোরবাসী বীরগণকে আশু আপনার হস্তগত করিয়া লইলেন। এ দিকে হামিরও সসৈন্যে চিতোরে উপস্থিত হইয়া নগর অবরোধ করিলেন। মালদেবের বশীভূত কতকগুলি বীর তাঁহার পথরোধ করিলেন; কিন্তু বীরবর হামির দৃঢ় অধ্যবসায় ও কঠোর উদ্যম সহকারে তাঁহাদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অচিরে চিতোর অধিকার করিলেন; অচিরেই পৈতৃক-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। চিতোরের সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল।

এ দিকে মালদেব নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। চিতোরের রাজছত্র হামিরের মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় চমকিত হইল। আলাউদ্দীনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ খিলিজি সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে মালদেব তৎক্ষণাৎ তদভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যাহারা চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক কমলমীর উপত্যকাভূমি ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা একে একে পুনরায় আসিয়া চিতোরে আনন্দবাস স্থাপন করিল। দাসত্বশৃঙ্খল হইতে চিতোরপুরী পুনর্মুক্ত হইল দেখিয়া প্রদেশবাসী সকলেই জয়ধ্বনি সহকারে হামিরকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিল।

কঠোর উদ্যমে ও দৃঢ় অধ্যবসায়ে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া হামির অভিনিবেশসহকারে স্বরাজ্য দৃঢ়ীকরণে যত্ন করিতেছেন, রাজ্যের উন্নতিবিধানে,—প্রজার সুখশান্তিবিধানে অভিনিবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে মালদেবের অনুরোধে মহম্মদ খিলিজি সসৈন্যে হামিরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। অবিলম্বেই হামিরের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিল। যবন-আক্রমণ ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সসৈন্যে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

মহম্মদ যখন হামিরবিরুদ্ধে অগ্রসর হন, দুর্ভাগ্য তাঁহার প্রিয় সহচর হইয়াছিল। বিজয়লক্ষ্মী যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহেন, মহম্মদ তাহা তখন বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে পথ দিয়া মিবাররাজ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা অত্যন্ত দুর্গম গিরিপথ। সেই গিরিসঙ্কটের কূটপথ দিয়া গমন করাতে তাঁহার সৈন্যগণ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। শিঙ্গোলি-নামক স্থানে তিনি শিবিরসন্নিবেশ করিলেন।

অবিলম্বেই হামির আসিয়া যবনসেনা আক্রমণ করিলেন। উভয়দলে তুমুলযুদ্ধ বাধিল। বনবীরের কনিষ্ঠ সহোদর হরিসিংহ সম্রাটের পক্ষ হইয়া চিতোররাজের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে রণভূমে শয়ন করিয়া চিরদিনের জন্য সমরসাধ মিটাইতে হইল। মহম্মদ খিলিজিও হামিরের মহাতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বন্দী অবস্থায় চিতোরে আনীত হইলেন। যবনসেনার অধিকাংশ নিহত হইল; অবশিষ্ট সেনাদল ক্ষতবিক্ষত, বিতাড়িত ও পলায়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

তিন মাস অতীত। মহম্মদ খিলিজি চিতোর-কারাগারে বন্দী। মুক্তির উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অবশেষে তিনি শপথপূর্ব্বক হামিরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন; যত দিন জীবিত থাকিবেন, চিতোরদুর্গ আক্রমণ দূরে থাকুক, চিতোরের বহির্ভাগেও আর পদার্পণ করিবেন না। ইহা ব্যতীত অজমীর, রন্থনবোর, নাগোর, শুষোপুর, এই কয়টি রাজ্য এবং পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ও একশত হস্তী নিষ্করস্বরূপ হামিরকে প্রদান করিলেন। যথাযোগ্য সম্মানের সহিত কারামোচনপূর্ব্বক

তাঁহাকে বিদায় দিয়া হামির নিষ্কণ্টকে সাম্রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মারবার, জয়পুর, বুন্দি, গোয়ালিয়র, শিক্রি, অর্ব্বুদ, কল্পী, চন্দেরি, রৈষিণ প্রভৃতি প্রদেশসমূহের অধিপতিগণও অধীনতা স্বীকার করিয়া চিতোররাজের অনুগ্রহপ্রার্থীরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ফল কথা, তৎকালে হামিরের সমকক্ষ নৃপতি ভারতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হইত না। তাতারচরণে ভারতের স্বাধীনতা বিক্রীত হইবার পূর্ব্বে মিবাররাজ্যের যেরূপ গৌরব ও প্রচণ্ড-পরাক্রম দেদীপ্যমান ছিল, এতদিন পরে হামির পুনরায় বীরবিক্রমে সেই গৌরব ও সেই পরাক্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। যত দিন মহাবল বাবর-ভারত আক্রমণ না করিয়াছিলেন, তত দিন হামিরের পরবর্ত্তী বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই গৌরব ও এই পরাক্রম অটলভাবে সুরক্ষিত ছিল।

এ দিকে মালদেবের যত্ন, উৎসাহ, উদ্যম সমস্তই বিফল হইল দেখিয়া অগত্যা তৎপুত্র বনবীর চিতোরে আগমনপূর্ব্বক হামিরের শরণাগত হইলেন। শ্বশুরকুল গৌরবভ্রষ্ট ও সম্মানচ্যুত হইয়া চিরদিনের নিমিত্ত উৎসাদিত হয়, হামিরের সে ইচ্ছা ছিল না। শ্বশুরকুল সুখে সম্মানে পুরুষানুক্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এই অভিলাষে তিনি নিমচ, জীরণ, রতনপুর ও কৈয়র প্রদেশ বনবীরকে প্রদান করিলেন; পাট্টা লিখিয়া দিবার সময় কতকগুলি হিতগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া চিরানুগত থাকিতেও আদেশ দিলেন। ভগিনীপতির উপদেশমত প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া বনবীরও বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

হামিরের রাজত্বের পর প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে যে সমস্ত নরপতি চিতোরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, জিগীষাপ্রণোদিত মুসলমানের হস্ত হইতে সকলেই মহাবিক্রমে মিবাররাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। যবনেরা কিছুতেই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে নাই।

বহুদিন পরে যবনের মধ্যে পরস্পর তুমুলসংঘর্ষ সংঘটিত হইল। দিল্লীর সিংহাসনলাভের জন্য খিলিজি, লোদী ও শূরবংশীয় যবনেরা পরস্পর বিজিগীষু হইয়া উঠিল। শুভ অবসর বুঝিয়া সেই সময়ে শিশোদীয়গণ আত্মবল দৃঢ়ীভূত করিয়া লইলেন। বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদে মিবারবাসীরা ক্রমে ক্রমে উন্নতি-সোপানে সমারূঢ় হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সুখশান্তিভোগ করিতে লাগিলেন।

সুদীর্ঘকাল রাজ্যসম্ভোগের পর পরিণতবয়সে হামির ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, ১৪২১ সংবতে (১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে) ক্ষেত্রসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অত্যল্পদিনমধ্যেই পিতার দক্ষতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় গুণেই তিনি পিতার অনুরূপ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে জিগীষা তাঁহার অন্তরে বলবতী হইল। সবলে আজমীর ও জিহাজপুর অধিকার করিয়া তিনি মণ্ডলগড়, দাশোর ও চপ্পনপ্রদেশ চিতোরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। দিল্লীর সম্রাট্ হুমায়ুনের সহিত * বাকরোলনামক স্থানে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে ক্ষেত্রসিংহেরই বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। এই ঘটনার পর আর অধিক দিন তাঁহাকে সুখসাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতে হয় নাই। বুনোদারহারবংশীয় কোন সামন্তনৃপতির কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হয়; কিন্তু ভবিষ্যতে সে বিবাহ সুসিদ্ধ না হওয়াতে সেই সূত্রে অন্তর্ব্বিবাদ ঘটে;—সেই সামান্য বিবাদ ক্ষেত্রসিংহের অমূল্যজীবনের বিনিময়ে প্রশমিত হইয়া গেল। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনন্তকালের জন্য অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

ক্ষেত্রসিংহের পুত্র লক্ষসিংহ। রাণা ক্ষেত্রসিংহের পরলোকগমনের পর ১৪৩৯ সংবতে (১৩৮৩

* এ হুমায়ুন কে, তাহার কোন স্থির নিরূপণ নাই। বহু গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, তোগলককুলজাত দ্বিতীয় নাসীরুদ্দীনের একতম পুত্র।

খৃষ্টাব্দে) লক্ষসিংহ পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অত্যল্পকালমধ্যেই মারবারের পার্ব্বত্য-প্রদেশান্তর্গত বিরাটগড় দুর্গ অধিকার করিলেন। তাঁহার কোপদৃষ্টিতে বিরাটগড় চূর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল; অবশেষে তিনি সেই ধ্বংসাবশেষের উপর বেদনোর দুর্গ স্থাপন করিলেন। ক্ষেত্র-সিংহ ভীলজাতির চপ্পনপ্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। সেই প্রদেশের জবুরা নামক স্থানে রাণা লক্ষ-সিংহ একটি টিন ও রৌপ্যের আকর আবিষ্কার করিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, পূর্ব্বে এই খনিতে সপ্তধাতুরই উৎপত্তি হইত। ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এখন সে আকরও লুক্কায়িত হইয়াছে। এখন সেই দুর্গম স্থানে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য। তথায় অনেকগুলি ভগ্নমন্দিরের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভীলেরা আর পূর্ব্ববৎ সেই সমস্ত মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবতার পূজা করে না।

রাণা লক্ষসিংহের প্রতাপ, বিক্রম ও কীর্ত্তি আজিও মিবারে সর্ব্বত্র সকলের মুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্থাপত্যবিদ্যায় তিনি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। আলাউদ্দীনের অত্যাচারে মিবার-রাজ্য একপ্রকার শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, সুদক্ষ লক্ষসিংহের শাসনগুণেই সেই রাজ্য পুনরায় অমরনগর সদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। রাজ্যমধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদ্ব্যতীত লোকললামভূতা পদ্মিনীর আবাসভূমির অনুকরণে লক্ষসিংহ একটি সর্ব্বোচ্চ দিব্য প্রাসাদও নির্ম্মাণ করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে বিশাল বিশাল সরোবর, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করা হইল। রাণা ব্রহ্মোপাসনার জন্য রাজধানীমধ্যে একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। অদ্যাপি উহা চিতোর নগরে বিরাজমান রহিয়াছে।

রাজ্যলাভের পর সম্রাট্ মহম্মদশাহ লোদীর প্রতিকূলেও রাণা লক্ষসিংহকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল, সম্রাট্ই তাহাতে পরাজিত হন। অম্বরান্তর্গত নগরাচলবাসী রাজপুতগণও রাণার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। একসময়ে বিধর্ম্মী যবনেরা পবিত্র গয়াভূমি আক্রমণ করিলে রাণা লক্ষসিংহ সসৈন্যে তৎপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যবনগ্রাস হইতে ধর্ম্মক্ষেত্রের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হন নাই; ধর্ম্মক্ষেত্র রক্ষা করিতে গিয়া, অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সেই যুদ্ধেই তিনি আত্মজীবন সমর্পণ করেন।

রাণা লক্ষসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মকুল পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কোন বিশেষ ঘটনাসূত্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডকে পৈতৃক রাজ্যে বঞ্চিত হইতে হয়। রাণা লক্ষসিংহের আরও অনেকগুলি সন্তানসন্ততি ছিল, তাঁহাদিগের দ্বারা রাজস্থানের নানা প্রদেশে নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। লুণাবৎ ও দুলাবৎ নামক সর্দ্দারেরাও লক্ষের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। চপ্পনের সন্নিহিত কানোরবাসী সারঙ্গদেবৎ সর্দ্দারেরাও লক্ষের বংশজাত।*

ষষ্ঠ অধ্যায়

—o—

মকুলজীর জন্ম ও রাজ্যলাভ, রাঠোরকর্ত্তৃক মিবার আক্রমণ,
চণ্ডের মুন্দরাধিকার এবং মকুলজীর প্রাণত্যাগ।

মানবপ্রবৃত্তি কখন্ কোন্ দিকে প্রধাবিত হয়, মানবহৃদয়ের বেগ কখন্ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা নিরূপণ করা একান্ত কঠিন। অদৃষ্টচক্র কোন্ সময়ে সুখের দিকে, কোন্ সময়ে বা দুঃখের দিকে আবর্ত্তিত হয়, তাহাই বা কে বলিতে সমর্থ? চণ্ড রাণা লক্ষসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র; ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই পৈতৃকসম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কিন্তু চণ্ড চিরবাঞ্ছিত পৈতৃকরাজ্যে কেন বঞ্চিত হইলেন, কি জন্যই বা কনিষ্ঠপুত্র মকুলের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হইল, মিবার ইতিহাসে তাহা সবিস্তারে বিবৃত আছে।

একদিন পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধবাপ্পা রাণা লক্ষসিংহ পাত্রমিত্রাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট আছেন, মারবারের মাননীয় রাজদূত আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। যথোচিত প্রত্যভিবাদন করিয়া রাণাও তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। শুভপরিণয়সূচক একটি নারিকেলফল সম্মুখে রাখিয়া রাজদূতও আসনগ্রহণ করিলেন; কহিলেন, "মারবার রাজকুমারীর সহিত কুমার চণ্ডের শুভবিবাহ হয়, ইহাই মারবারপতি রণমল্লের একান্ত বাসনা।" চণ্ড তখন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি আসিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন, এই কথা জানাইয়া রাণা রাজদূতের সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে মৃদুহাস্যপূর্ব্বক পরিহাসবাক্যে তিনি কহিলেন, "আমার ন্যায় শ্বেতশ্মশ্রুধারী পুরুষের জন্য বোধ হয়, এ প্রকার ক্রীড়াসামগ্রী প্রেরিত হয় নাই।"

সভাস্থ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। রাজকুমার চণ্ডও সেই মুহূর্ত্তে রাজসভায় সমুপস্থিত। তাঁহার কর্ণেও সেই পরিহাসোক্তি প্রবেশ করিল। তিনি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন। নিমেষমাত্রের জন্য পিতা পরিহাসচ্ছলেও যে সম্বন্ধ আত্মার্থে মনে স্থান দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংবদ্ধ হওয়া উপযুক্ত পুত্রের অকর্ত্তব্য, চণ্ডের মনে তখন এই ভাবের উদয় হইল। সঙ্কল্প করিলেন, এ বিবাহ করিবেন না; প্রকাশ্যে সভাসমক্ষেও সে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

উভয় সঙ্কট! একদিকে পুত্রের দৃঢ় পণ, অন্যদিকে রণমল্লের অবমাননা। তুচ্ছকথা শুনিয়া পুত্রের প্রাণে আঘাত লাগিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। নারিকেলফল গ্রহণ না করিলে মারবারপতির অবমাননা করা হয়। কি করিবেন, কি উপায়ে উভয় দিক্ রক্ষিত হইবে, রাণা লক্ষসিংহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া অবশেষে সম্বন্ধ আপনিই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। আশা ছিল, চরমজীবনে সংসারপাশ ছেদনপূর্ব্বক শান্তিময়ী তাপসবৃত্তি অবলম্বনে আর্য্যকুলপ্রথা রক্ষা করিবেন, তাহা হইল না; তাঁহাকে আবার সংসারের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দুর্ভেদ্য মায়াজালে বন্দী হইতে হইল।

পুত্রকে অনুরোধ করিতে রাণা কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, সভাসদ্‌গণও অনুনয়বাক্যে শান্ত করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিছুতেই চণ্ড আপনার প্রচণ্ডপ্রতিজ্ঞা হইতে—দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। যে পুত্র পিতার মুখ চাহিল না, সে পুত্রে কি প্রয়োজন? ক্রোধে

দুঃখে, মনের ঘৃণায় রাণা জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডকে রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার কল্পনা করিলেন। পুত্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "মারবারদুহিতার গর্ভে যদি আমার পুত্র জন্মে, তোমাকে তাহার নিকট প্রধান সামন্তরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে।" একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া বীর-হৃদয় চণ্ডও তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন।

যথাকালে মারবাররাজ রণমল্লের কন্যার সহিত বৃদ্ধ রাণার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই কন্যার গর্ভেই রাণা লক্ষসিংহের এক পুত্র জন্মে, তাঁহারই নাম মকুলজী।

চরমবয়সে পুত্রপৌত্রাদির প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া শান্তিময়ী মুনিবৃত্তি অবলম্বন করাই আর্য্য-রাজন্যবর্গের সনাতন ধর্ম্ম। রাজ্যপরিচালনায় বিমুক্ত থাকিয়া জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক সময় অনেকরূপ অধর্ম্মের আচরণ করিতে হয়, পরিণতবয়সে রাজ্যসুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করাই কর্ত্তব্য। রাণা লক্ষসিংহ সেই বৃত্তি অবলম্বনে সঙ্কল্প করিলেন। মকুলের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চবর্ষমাত্র। চণ্ডের অনুরোধে সেই শিশুপুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নরপতি কঠোরব্রতের অনুসরণ করিলেন। মকুলের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে চণ্ডই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, এইরূপ অবধারিত হইল। কিরূপে রাজ্যের উন্নতিবৃদ্ধি হইবে, কিরূপে কনিষ্ঠের উপকার সাধিত হইবে, কিরূপে মকুল ক্রমে ক্রমে পিতার অনুরূপ গুণশালী হইয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইবেন, চণ্ড এই চিন্তাতেই দিবানিশি নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পিতৃভক্তি, অকপট ভ্রাতৃস্নেহ, নিঃস্বার্থ ত্যাগশীলতা ও অমানুষিক বীরহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সকলেই নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

রাজপুতের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে জননীই রাজ্যশাসন ও রাজকার্য্যানুশীলনের ভার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; মকুলের জননী তাহাতে বঞ্চিতা হইলেন। চণ্ড রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, চণ্ডের মাহাত্ম্য, অতুলনীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া রাজ্যবাসী সকলেই দিন দিন তৎপ্রতি অনুরক্ত, স্বার্থপরায়ণা পিশাচিনী মুকুলজননীর হৃদয়ে তাহা আর সহ্য হইল না। চণ্ডের প্রতি তিনি বিদ্বেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চণ্ডের ছিদ্রান্বেষণই তাঁহার নিত্যব্রত হইয়া উঠিল, এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া চণ্ডের হৃদয়ে বিষম ঘৃণার উদয় হইল, পাছে কুহকিনীর কুহকে মায়াবিনীর কৌশলজালে তাঁহার কলঙ্ক রটনা হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অবিলম্বে চিতোর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মান্দুরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে বিমাতৃপদে প্রণামপূর্ব্বক এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "শিশোদীয়বংশের মঙ্গলের প্রতি যেন তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকে, প্রতি কার্য্যারম্ভের প্রথমেই যেন পরিণাম বিবেচনা করা হয়।" এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "জগদীশ্বরের নিকট করপুটে কামনা, মকুলের রাজ্যে প্রজাবৃন্দ নিরাপদে বাস করুক। কিন্তু আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, হয় ত এমন দিন উপস্থিত হইবে যে, এই চণ্ডের জন্য আপনাকে তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।"

এই সময়ে মান্দুরাজ্য ধীরে ধীরে মস্তক উন্নত করিতেছিল। যথোচিত সম্মানসহকারে মান্দু-রাজ চণ্ডকে গ্রহণ করিলেন। চণ্ডের বীরত্ব, গুণাবলী, অমায়িকতা এবং উদারহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই মান্দুরাজ তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া বৃত্তিস্বরূপ হল্লার নামক প্রদেশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

মকুলজননীর অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহার পিতৃকুটুম্বগণের আনন্দের অবধি রহিল না। মকুলের মাতামহ রণমল্ল, মাতুল যোধ এবং অসংখ্য মুন্দরবাসী

আত্মীয়গণ স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চিতোরে উপস্থিত হইলেন। উর্ব্বরভূমি মিবারের সরস দ্রব্যাদি উপভোগ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল, আনন্দে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারা মকুলের দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিলেন।

সুখশান্তিময়ী নিজনগরী পরিত্যাগ করিয়া রণমল্ল পররাজ্যে আগমন করিলেন কেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন। পাপাত্মাদিগের দুরভিসন্ধি ভেদ করা সাধারণের পক্ষে সুসাধ্য নহে। দৌহিত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রণমল্ল বাপ্পার সিংহাসনে আরোহণ করিতেন; বালস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া মকুল সভাতল হইতে স্থানান্তরে ক্রীড়াসক্ত হইলে মিবারের রাজচ্ছত্র রণমল্লের শিরোদেশে বিরাজ করিত। এ অভিসন্ধির গূঢ়মর্ম্ম কি, কেহ কেহ না বুঝিতেন, এমন নহে; কিন্তু প্রকাশ করিতে কাহারও ক্ষমতা ছিল না।

হিন্দুনৃপতিগণ ধাত্রীকে পরম যত্ন ও পরমসমাদরে রাজবাটীতে স্থান প্রদান করিতেন। ধাত্রী-পুত্রেরা 'ভাই ভাই' সম্বোধনে অভিহিত হইত। তাহারা রাজদত্ত চিরন্তনী ভূমিবৃত্তি ভোগ করিত। বিবাহসম্বন্ধের বা সন্ধিবিগ্রহাদির দৌত্যকার্য্য উপস্থিত হইলে ইহারাই সেই সকল বিশ্বস্তব্যাপারে নিয়োজিত হইত। শিশোদীয়বংশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বৃদ্ধা ধাত্রী রাজকুমার মকুলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। নানা সূত্রে নানা কারণে অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ম্মতি রণমল্লের দুরভিসন্ধির বিষয় সেই ধাত্রী বুঝিতে পারিয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবিলম্বে রাজমাতার নিকট গমন করিয়া সে সকল কথা ব্যক্ত করিল। রণমল্ল পিতা, পিতা কন্যার শুভাকাঙ্ক্ষী, পিতা হইয়া কন্যার সর্ব্বনাশ করিবেন, মকুলজননীর হৃদয়ে প্রথমতঃ এ বিশ্বাস স্থানপ্রাপ্ত হইল না, কিন্তু ধাত্রীর উপদেশে অবশেষে তাঁহার হৃদয় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। রাজ্যলাভের জন্য রাজপুত্রগণের মধ্যে অনেকে কপট কৌশল, নিকৃষ্ট পন্থা এবং জঘন্য উপায় অবলম্বনেও কুণ্ঠিত নহেন, এই বিশ্বাসে মকুলজননী তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার সন্দেহ যাথার্থ্যে পরিণত হইল, জানিতে পারিলেন, রণমল্ল গুপ্ত-কৌশলে মকুলের নবজীবন সংহার করিয়া স্বয়ং চিতোরের রাজসিংহাসন অধিকার করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার অনুগত। মুন্দর হইতে যে সকল আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সঙ্গে চিতোরে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই চিতোরের প্রধানপদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। মকুলের সাহায্য করিতে রণমল্লের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, মকুলের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্নসহ উপায়বিধান করে, অধিক কি, আপদে, বিপদে সুপরামর্শ প্রদান করে, মকুলজননী এরূপ একটি পরামর্শদাতাও দেখিতে পাইলেন না। রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই যেন বিভীষিকার করালচ্ছায়া বিকটবেশে পরিভ্রমণ করিতেছে।

এ দিকে আর একটি বিপদের অশুভসংবাদ মকুলজননীর কর্ণগোচর হইল। চণ্ডের দ্বিতীয় সহোদর রঘুদেব কৈলবারা-প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, ক্রূরকর্ম্মা দুরাচার রণমল্ল তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়াছে। একটি সম্মানসূচক রাজবেশ প্রস্তুত করাইয়া নররাক্ষস রণমল্ল রঘুদেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। রাজা বা রাজপরিবার কর্ত্তৃক সম্মানসূচক রাজপরিচ্ছদ প্রেরিত হইলে রাজপুতেরা তৎক্ষণাৎ তাহা অঙ্গে ধারণ করিয়া দাতার সম্মানরক্ষা করিতেন। রঘুদেবও সেই প্রথার অনুসরণ করিয়া যেমন সেই পরিচ্ছদটি পরিধান করিতেছিলেন, অমনি রাজবেশের অভ্যন্তরস্থাপিত গুপ্ত অসি তাঁহার মস্তকোপরি নিপতিত হইল। অবিলম্বে তিনি গতাসু হইয়া, ধরাশায়ী হইলেন।

রূপে, গুণে, ধর্ম্মে, সাহসে বীরবর রঘুদেবের সমকক্ষ অতি বিরল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র

রাজস্থানবাসীর হৃদয়ে স্নেহ, ভয় ও ভক্তির উদয় হইত। তাঁহার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই পরিতপ্ত হইলেন। রঘুদেবের মৃত্যুর পর রাজস্থানবাসী প্রত্যেকের গৃহেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল। তদবধি দৈবসম্ভ্রমের সহিত প্রত্যহই সেই সকল মূর্ত্তির পূজা হয়। অধিকন্তু প্রতিবর্ষে দুইবার মহাসমারোহে মহোৎসবসহকারে রঘুনাথদেবের উদ্দেশে বিশেষ পূজা হইয়া থাকে।

ঘোর বিপদে পড়িয়া মকুলজননী যেন চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। নরপিশাচ দুর্ম্মতি পিতার জিঘাংসারূপ পাশবপ্রবৃত্তি হইতে কিরূপে শিশুটিকে রক্ষা করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। প্রচণ্ডবিক্রম চণ্ডের প্রশান্ত বদনমণ্ডল তখন তাঁহার স্মৃতিপটে সমুদিত হইল, বিদায়কালে অশ্রুপূর্ণলোচনে বিনম্রভাবে সপত্নীপুত্র চণ্ড যে সমস্ত কথা বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত হৃদয়ে জাগরিত হওয়াতে রাণী অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পৈতৃকভূমি চিতোরনগরী ত্যাগ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে চণ্ড প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া মকুলজননীর হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মর্ম্মভেদী বাক্যে অতীতের অনুশোচনা অঙ্কিত করিয়া চণ্ডের নিকট তিনি সমস্ত গুপ্তসংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে চণ্ডের নিকট সংবাদ পৌঁছিল চিরজীবনের জন্য তিনি পৈতৃক সিংহাসনে বঞ্চিত হইয়াছেন সত্য, তথাপি শিশোদীয়বংশের গৌরবরক্ষার্থ শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। কিরূপে চিতোর উদ্ধার করিতে হইবে, কিরূপে শিশুভ্রাতার জীবন রক্ষিত হইবে, মুহূর্ত্তমধ্যে চণ্ড তাহার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। চিতোররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন মান্দুরাজ্যে আগমন করেন, ভীলজাতীয় দুই শত বীর তখন তাঁহার অনুসঙ্গী ছিল। চণ্ডের মঙ্গলের জন্য আপন আপন হৃদয়শোণিতদানেও তাহারা কুণ্ঠিত ছিল না। তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি পূর্ব্ববৎ চিতোরেই অবস্থিতি করিতেছে। চণ্ডের পরামর্শানুসারে পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ব্যপদেশে তাহারা চিতোরদুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বাররক্ষকগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

এ দিকে চণ্ড মকুলজননীর নিকট গোপনে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, "যে সকল গ্রাম চিতোরের পারিপার্শ্বিক, তত্রত্য অধিবাসিগণকে ভোজদানার্থ মকুল যেন প্রত্যহ চিতোর হইতে অবতরণ করেন, সঙ্গে যেন কতকগুলি বিশ্বস্ত রক্ষক ও পরিচারক থাকে। এক গ্রাম, দুই গ্রাম, তিন গ্রাম, এইরূপ করিতে করিতে দিন দিন যেন দূরত্ব বৃদ্ধি করা হয়। দেওয়ালী মহোৎসব নিকটবর্ত্তী; ঐ দিন চিতোরের ৭ মাইল দূরস্থ গো-সুন্দনগরে মকুল যেন অবশ্য উপস্থিত থাকে। এইটি স্মরণ থাকিলেই মকুলের সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত হইবে।" চণ্ডের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইল; পরামর্শানুসারে তাঁহার আদেশও যথাযথ প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

দেওয়ালী মহোৎসব উপস্থিত। কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে মকুল গো-সুন্দনগরে উপস্থিত হইলেন; তত্রত্য অধিবাসিগণকে ভোজদানে পরিতুষ্ট করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত। চণ্ড আসিলেন না। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর তামসী মূর্ত্তি ক্রমে ঘোরবেশে জগৎ অধিকার করিল। নৈরাশ্য, চিন্তা, ভয় যুগপৎ উপস্থিত হইয়া মকুলকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল; শূন্যহৃদয়ে অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র পশ্চাদ্ভাগে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। চমকিত হইয়া নেত্রপাত করিবামাত্র মকুল দেখিলেন, চল্লিশজন অশ্বারোহী; প্রচণ্ডবিক্রম চণ্ড ছদ্মবেশে সকলের অগ্রবর্ত্তী রহিয়াছেন। চণ্ডের অলক্ষিতসঙ্কেতে মকুলের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অশ্বারোহিগণ তোরণদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারপালেরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পুরোবর্ত্তী অশ্বারোহী

উত্তর করিলেন, "আমরা নগরীর সন্নিহিত প্রদেশে বাস করি। চিতোররাজ্যের অধীনস্থ সর্দ্দার। গোমুন্দের মহোৎসবদর্শনার্থ আসিয়াছিলাম, রাত্রি হইয়াছে, রাজকুমারকে প্রাসাদে রাখিয়া যাইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছি।" কেহই সন্দেহ করিল না, কেহই আপত্তি করিল না, অবাধে অশ্বারোহীরা নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহাবিক্রমশালী চণ্ড বিপুলবিক্রমে ভীমকোষ হইতে ভীষণ করবাল উন্মুক্ত করিলেন; জলদগম্ভীর-জয়নাদে পুরী কম্পিত করিয়া শত্রুদল আক্রমণ করিলেন। এ দিকে পূর্ব্ব-প্রেরিত ছদ্মবেশী ভীলেরাও দ্বাররক্ষকদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। ক্রুদ্ধকেশরী-পালের ন্যায় ভীমগর্জ্জনে চিতোর-রক্ষকেরাও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিল। সমরে চণ্ডের প্রচণ্ডবিক্রম সহ্য করে, তাদৃশ মহাবীর চিতোরে অতি বিরল; যে কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, ভীম অসিপ্রহারে তাহাকেই তিনি শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

শত শত রাঠোর ও তাহাদিগের অসংখ্য অসংখ্য রক্ষক ধরাশায়ী হইতেছে, সমুচ্চ বীরগর্জ্জনে চিতোর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, ভীষণ বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নগরী ছারখার করিতেছে, দুরাত্মা রণমল্ল কিছুই জানিতে পারিতেছে না। অহিফেন ও সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া একটি সুন্দরীর বিশাল বক্ষে তাহার শিরীষ-সুকুমার বাহুলতিকাবেষ্টনে দুরাত্মা নরপিশাচ অচেতনাবস্থায় অনুপম স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে।

মকুলজননীর পরমরূপবতী একটি সহচরী ছিল। তাহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নররাক্ষস দুরাচার রণমল্ল বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্বনাশ করিয়া তাহারই কক্ষে শয়ন করিয়াছিল। দুরাত্মা মদিরাঘোরে অচেতন হইলে সহচরী তাহার উষ্ণীষের দীর্ঘবসন উন্মোচনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পর্য্যঙ্কের সহিত তাহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল; আপনিও গৃহদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক বহির্ভাগে পলায়ন করিল। দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ; তথাপি রণমল্লের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অবিলম্বে চণ্ডের অনুচরেরা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের ভীমনাদে রণমল্লের নিদ্রাভঙ্গ হইল; চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া সে বুঝিতে পারিল, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিকটবর্ত্তী। দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া দুরাচার বন্ধন-চ্ছেদনে প্রয়াস পাইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষনিক্ষিপ্ত গুলী আসিয়া তাহার পাপজীবন সংহার করিল।

রণমল্লের পুত্র যোধরাও নগরের অপর অংশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি বেগগামী অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। চণ্ড তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য মুন্দরাভি-মুখে অনুগামী হইলেন। যোধরাও নিরুপায় হইয়া মুন্দর পরিত্যাগপূর্ব্বক ছদ্মবেশে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। চণ্ডকর্ত্তৃক মুন্দর অধিকৃত হইল। চণ্ডের পুত্র কণ্ঠজী ও মুঞ্জজী মুন্দররাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শিশোদীয়গণ বহুদিন পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে রাজস্থানে একপ্রকার সম্প্রদায় ছিল, অভ্যাগত অতিথির যথাবিহিত সৎকার ও বিপন্নের বিপদ্‌মোচন করাই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রধান ব্রত। তাঁহারা চিরজীবন কৌমারাবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। গৃহাগত হইলে অথবা শরণগ্রহণ করিলে আততায়ী শত্রুও তাঁহাদিগের নিকট যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইত। বিপন্ন ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার বিপদুদ্ধারার্থ হৃদয়-শোণিতদানেও এই সম্প্রদায়ের লোক কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজবারার অনেক স্থানে ঐরূপ বিশ্ব-প্রেমিক সম্প্রদায়ের পবিত্র আশ্রম নেত্রগোচর হইত। শ্বাপদসঙ্কুল গহনবনমধ্যে, প্রখর বালুকাময় সন্তপ্ত মরু-প্রান্তরে, শান্তির আস্পদ তাপস-তপোবনে রাজস্থানের সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের আশ্রম

প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা, ভূম্যধিকারী, জায়গীরদার ধনাঢ্যব্যক্তি সকলেই ঐ সমস্ত সন্ন্যাসীর আশ্রমে যথাসাধ্য অভিরুচিমত সাহায্য প্রদান করিতেন। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের অতিথিসৎকার "সদাব্রত" নামে অভিহিত হইত।

যে সময়ে চণ্ড কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া যোধরাও মুন্দররাজ্য হইতে পলায়ন করেন, সেই সময় হরবাশঙ্কল নামে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত এক জন সন্ন্যাসী রাজবারার একপ্রান্তে বাস করিতেন। পলায়িত যোধরাও তাঁহারই আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সদাব্রত সমাপন করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হরবা আপন শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন, ইত্যবসরে বিংশত্যধিকশত অনুচর সমভিব্যাহারে যোধরাও তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সন্ন্যাসী সকলকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। সানুচর যোধরাও আসনপরিগ্রহ করিলে সন্ন্যাসী গভীরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একে গভীর রাত্রি, তাহাতে গৃহে যে কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি ছিল, ইতিপূর্ব্বে সদাব্রতে তৎসমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে। নগরে যাইয়া আহারোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করেন, এ গভীররাত্রে তাহাও অসম্ভব। কিরূপে এতগুলি লোকের আতিথ্যবিধান করিবেন, সন্ন্যাসী কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ চিন্তার পর স্মরণ হইল, কতকগুলি মুঞ্জকাষ্ঠ * তাঁহার গৃহমধ্যে বহুদিন হইতে সংগৃহীত রহিয়াছে, কিঞ্চিৎ শর্করা, বেসবার ও গোধূমচূর্ণও ছিল, হরবা মুঞ্জকাষ্ঠের চূর্ণের সহিত ঐ তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিলেন। একপ্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইল। যোধরাও সানুচর তাহা ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। হরবা-নির্দ্দিষ্ট শয্যাতলে শয়ন করিয়া সকলেই সুনিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করিলেন।

যামিনী প্রভাতা। অরুণোদয়ে পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যোধরাও ও তাঁহার অনুচরবর্গ বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। নিশাভাগে রঞ্জনকাষ্ঠ ভোজন করাতে তাঁহাদিগের গুম্ফরাজি বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। কি কারণে গুম্ফ রঞ্জিত হইয়াছে, হরবাশঙ্কল ব্যতীত আর কেহই তাহা জানেন না, হরবাও প্রকাশ করিলেন না। প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া তিনি কহিলেন, "আশার প্রাভাতিক নবীনরাগে বয়সের ধূসর রোমরাজি যেমন রঞ্জিত হইয়াছে, আপনাদের ভাগ্যও সেইরূপ আশু তরুণজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে, আপনারা অচিরেই পুনরায় মুন্দরের সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিবেন।"

সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী ফলেও পরিণত হইয়াছিল; যোধরাও স্বীয় অধ্যবসায়গুণে দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়া যোধপুরনগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার বংশধরেরা সিন্ধুনদের সৈকতভূমি হইতে যমুনার পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত এবং শতদ্রুকূলবর্ত্তী মারবক্ষেত্র হইতে আরাবল্লী-পর্ব্বতমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত আপনাদের একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এক সময়ে ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গই তাঁহাদিগের সম্মান-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বদিন উপযুক্ত পানভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, ত্রুটিস্বীকার করিয়া হরবা পরদিনও আতিথ্য-স্বীকারে অনুরোধ করিলে যোধরাও সগণে সম্মতিদান করিলেন। সন্ন্যাসীর আশ্বাসবচনে তাঁহার হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎসাহের সঞ্চার হইল; সন্ন্যাসীকে তিনি আপনাদিগের দলভুক্ত

* পূর্ব্বকালে এই কাষ্ঠ রঞ্জনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। দুর্ভিক্ষের সময় মরুপ্রান্তবাসীরাও ইহা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিত। এই কাষ্ঠ অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, রৌদ্র ও বৃষ্টিতেও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ভট্টগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সৌরাষ্ট্রের আদিনাথদেবের মন্দির এই কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

করিলেন। যথাযথ পানভোজনাদি সমাপিত হইলে যোধরাও ও তাঁহার সহচরদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া হরবা মিবোপ্রদেশের অধিপতির নিকট গমন করিলেন। মিবোরাজার অশ্বশালায় একশত কার্য্যদক্ষ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব ছিল। প্রয়োজন হইলে যোধরাওয়ের সাহায্যার্থ তিনি সেই সকল অশ্ব-প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। পবনজী নামে এক জন স্বাধীন রাজপুত-সর্দ্দার ছিলেন, সংগ্রামকালে তিনি "অঙ্গারকৃষ্ণ" নামক সুদক্ষ বেগগামী অশ্বারোহণে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন; যোধরাওয়ের সাহায্যার্থ সমরে অগ্রসর হইতে তিনিও প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে ক্রমে যোধরাও বহুবল ও বহুসহায়সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন, অচিরেই তিনি পৈতৃকরাজ্য উদ্ধারের অভিলাষে সসৈন্যে তদভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

চণ্ডের পুত্র কণ্ঠজী ও মুঞ্জজী এ সমস্ত বৃত্তান্তের কিছুই অবগত ছিলেন না, নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যসুখভোগ করিতেছিলেন, সহসা নগরপ্রান্তে উচ্চনাদে যোধরাওয়ের রণভেরী বাজিয়া উঠিল। বিস্মিত, চমকিত ও স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া শিশোদীয় সৈন্যগণও অচিরে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইল। যোধরাওয়ের সৈন্যগণ মুন্দরের চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে বিপুলবিক্রমে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শিশোদীয়গণ যোধসৈন্যের গতিরোধে সমর্থ হইল না। তখন বীরবিক্রমে মহাবীর কণ্ঠজী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এত দিনের পর তাঁহার মুন্দররাজ্যসম্ভোগ শেষ হইল; অচিরেই তিনি অনুচরসহ বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। জ্যেষ্ঠের পতন দর্শনে ভীত হইয়া মুঞ্জজী আত্মরক্ষার্থ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলেন না; অনুসরণকারী যোধসৈন্য কর্ত্তৃক তিনি গদবারসীমায় ধৃত ও নিপাতিত হইলেন। পৈতৃকরাজ্য মুন্দর পুনরায় মহাবীর বিজয়ী যোধরাওয়ের করগত হইল।

মুন্দররাজ্য হস্তচ্যুত হইল, উপযুক্ত পুত্রদুটিও সমরে প্রাণত্যাগ করিলেন, সুতরাং ইহার প্রতিশোধ লইতে প্রচণ্ডবিক্রম চণ্ড কখনই নিরস্ত থাকিবেন না। যোধরাও স্বয়ং বলহীন, পরকীয় বলের সাহায্যে মুন্দররাজ্য অধিকার করিয়াছেন; ভবিষ্যতে চণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে দণ্ডায়-মান হইতে কখনই সমর্থ হইতে পারিবেন না। অগত্যা চণ্ডের নিকট সন্ধিপ্রার্থনায় যোধরাও একটি বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন; সরলহৃদয় চণ্ডও তৎক্ষণাৎ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সন্ধিপত্র স্থির হইল, যে স্থানে মুঞ্জজীর মৃত্যু হইয়াছে, ভবিষ্যতে সেই স্থান মিবার ও মারবার রাজ্যের বিভাগরেখাস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে! ইহা ব্যতীত যোধরাও প্রচণ্ডবিক্রম চণ্ডকে দণ্ডস্বরূপ মুণ্ডকাটী প্রদান করিলেন। *

সৌভাগ্য কখনই চিরস্থায়ী নহে। সন্ধিপত্র দ্বারা সমগ্র গদবারপ্রদেশ মিবাররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। শতাব্দীকাল নির্ব্বিঘ্নে শিশোদীয়েরা সেই প্রদেশ ভোগ করিলেন। পুনরায় তাঁহাদিগের নিকট হইতে রাঠোরেরা তাহা অধিকার করিল। একপুরুষ পরেই আবার শিশোদীয়গণের সহিত রাঠোরকুলের দৃঢ়মৈত্রভাব সংবদ্ধ হইল। অত্যল্পদিনের মধ্যেই মকুল গুপ্তভাবে নিহত হইলে মার-বারপতি ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইয়া উপযুক্ত শাস্তিদানার্থ গুপ্তহন্তার অনুসন্ধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন হত্যাকারী ধৃত ও দণ্ডপ্রাপ্ত না হয়, যত দিন মকুলের শিশুপুত্র চিতোর-সিংহাসনে অধিরূঢ় না হয়, তত দিন তিনি শয্যায় শয়ন বা মস্তকোপরি উষ্ণীষবন্ধন করিবেন না।

* হত ও হন্তৃপক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের সময় হন্তপক্ষ অর্থ, ভূমি বা অন্য কোন স্বত্বত্যাগস্বরূপ যে দণ্ডগ্রহণ করেন, রাজস্থানের চলিতভাষায় তাহাতে মুণ্ডকাটী বলে

আত্মত্যাগী পরহিতৈষী মহাবীর চণ্ডের সহায়তাবলে মকুল তরুণবয়সে পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে নিরাপদে সুখসম্ভোগ করিতে হয় নাই। বিজয়ী তৈমুর বিজয়িনী সেনাসমভিব্যাহারে মহাবিক্রমে প্রতীচ্যদ্বারে আসিয়া গম্ভীরনাদে রণভেরী বাদন করিলেন। ভট্টগ্রন্থে তৈমুরের নামোল্লেখ নাই; এইমাত্র বর্ণিত আছে, মকুলের রাজত্বকালে দিল্লীর সম্রাট একবার তাঁহার রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিলেন। ভট্টকবিগণ বলেন, তৎকালে ফিরোজশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ফিরোজশাহের এক পৌত্র তৎকালে দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তৈমুরের বীরবিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি গুর্জ্জরাভিমুখে পলায়ন করেন। গুর্জ্জরযাত্রাকালে তিনিই একবার মিবার আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিলেন। কোন সূত্রে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই মকুল সসৈন্যে আরাবল্লী-সন্নিহিত রায়পুর নামক স্থানে গিয়া সম্রাটের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। সে যুদ্ধে তাঁহারই জয়লাভ হয়। সম্বরপ্রদেশ ও তন্মধ্যস্থ লবণহ্রদগুলিও সেই সময় রাণার অধিকারভুক্ত হইল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া রাণা নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। লক্ষরাণা একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রাণা মকুল যত্নসহকারে সেই প্রাসাদটি সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। চিতোরের পশ্চিমদিকে যে পর্ব্বতমালা বিরাজিত আছে, তাহার মধ্যস্থলে মকুল চতুর্ভুজা ভগবতীদেবীর একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মকুলের তিন পুত্র, এক কন্যা। কন্যাটি পরমরূপবতী;—নাম লালবাই। গাগরৌণের খীচিবংশীয় রাজপুত্র ধীরাজের করে মকুল কন্যা সম্প্রদান করেন। বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক জামাতৃরাজ্য আক্রান্ত হইলে তাহার উদ্ধারের জন্য সেনাসাহায্য করিবেন, কন্যাসম্প্রদানকালে মকুলকে এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশেও আবদ্ধ হইতে হইল। মহাসমারোহে বিবাহ সমাহিত হইলে রাণার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নবদম্পতি চিতোররাজ্যে যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন অতীত। মালপতি সোহাও গাগ্‌রৌণরাজ্য আক্রমণ করিলেন, এ দিকে পার্ব্বত্য প্রজাগণ বিদ্রোহী হওয়াতে তাহাদিগের দমনার্থ মিবারের রাণা মাদেরিয়াতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। খীচিরাজের পুত্র ধীরাজের প্রার্থনায় তাঁহার সাহায্যার্থ একদল সেনা গাগ্‌রৌণে প্রেরণ করিয়া তিনি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। মাদেরিয়া রঙ্গ-ভূমিই রাণা মকুলের জীবনের শেষ অভিনয়স্থল। সূত্রধরবংশীয়া একটি সুন্দরী পরিচারিকার গর্ভে মকুলের পিতামহ রাণা ক্ষেত্রসিংহের দুইটি পুত্র জন্মে: জ্যেষ্ঠের নাম চাচা, কনিষ্ঠের নাম মৈর। মিবারের এই পারশব পুত্রেরা রাজার অনুগ্রহে মধ্যে মধ্যে বিশ্বস্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাণা মকুল ঐ দুই পিতৃব্যকে মাদেরিয়াযুদ্ধে সপ্তশত অশ্বারোহী সেনার সেনানীপদে বরণ করিলেন। দাসীপুত্রদ্বয়ের এই উচ্চপদপ্রাপ্তিদর্শনে অন্যান্য সেনানীগণের হৃদয়ে ঈর্ষাবহ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল। কিরূপে চাচা ও মৈরের অধঃপতন হয়, তাঁহারা দিবানিশি তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন রাণা সর্দ্দারগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মাদেরিয়াক্ষেত্রে একটি নিভৃতকুঞ্জে উপবিষ্ট আছেন, কথাপ্রসঙ্গে সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া পারিষদ্‌গণকে তিনি সেই বৃক্ষটির নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণার পার্শ্বে এক জন চোহান সামন্ত উপবিষ্ট ছিলেন, অনুচ্চস্বরে জনান্তিকে তিনি রাণাকে কহিলেন, "আপনার পিতৃব্যদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বৃক্ষের নাম জানিতে পারিবেন।" চোহান-সামন্তের এই কথার গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া

সরলহৃদয় রাণা পিতৃব্য চাচাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা, এ বৃক্ষটির নাম কি?"

প্রশ্ন শ্রবণমাত্র চাচা ও মৈরের নিষ্ঠুরহৃদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও জিঘাংসার উদয় হইল। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, সূত্রধরকন্যার গর্ভজাত বলিয়াই রাণা তাঁহাদিগকে এইরূপ শ্লেষপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মনোভাব গোপনপূর্ব্বক চাচা ও মৈর তখন কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া অবনত-বদনে অবস্থিত রহিলেন। সেই দিন সায়ংকালে রাণা ধ্যানমগ্ন হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, অলক্ষিতে দুরাচার চাচা ও মৈর অসি-হস্তে পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া এক আঘাতে তাঁহার বাহুচ্ছেদন করিলেন; দ্বিতীয় আঘাতেই মিবাররাজ চিরদিনের মত অনন্ত-নিদ্রিত হইলেন। পিশাচসদৃশ পাষণ্ডদ্বয় এই নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াও ক্ষান্ত হইল না, দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া চিতোররাজ্য হস্তগত করিবার জন্য তদভিমুখে প্রধাবিত হইল। কিন্তু তাহাদিগের সে আশা ফলবতী হইল না। চিতোর-দুর্গের তোরণ অবরুদ্ধ ছিল, দুরাত্মারা প্রবেশ করিতে পারিল না। মকুলের বালকপুত্র কুম্ভ ইতি-পূর্ব্বে কেন যে তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ়মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে না পারিয়া চাচা ও মৈর মাদেরিয়ার নিকটবর্ত্তী এক দুর্গে আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিল। মারবারপতি এ সংবাদ পাইবামাত্র দুষ্টদ্বয়ের শাস্তিবিধানার্থ মাদোরিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে চাচা ও মৈর প্রাণভয়ে মাদেরিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পায়ী নামক স্থানে প্রস্থান করিল। তথায় রাতকোট নামক শৈলের উচ্চতম সানুপ্রদেশে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা বসতি করিল। শত শত বিপদ, বাধা ও সঙ্কট উপস্থিত হইলেও পাপীর পাপ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। সুজা নামক চোহানবংশীয় এক ব্যক্তির কন্যাকে কুমারিকাবস্থায় ইহারা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য কর্ম্মকারদলে মিলিত হইয়া সুজা রাতকোটে উঠিবার সমস্ত পথ চিনিয়া লইলেন। দুহিতৃহরণের কথা রাজসন্নিধানে নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে কুম্ভ ও রাঠোররাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজকুমারদ্বয় আমূল-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সসৈন্যে সুজাকে লইয়া রজনীযোগে রাতকোট-দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একে দুর্গম পার্ব্বত্যপথ, তাহাতে তামসী রজনীর ঘোর অন্ধকার। পরস্পর পরস্পরে গাত্র-বসন ধরিয়া, লতাগুল্মাদি অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সকলে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। পুরোবর্ত্তী হইয়া সুজা সকলকে পথপ্রদর্শন করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র একটি ব্যাঘ্রীর নয়নদ্বয়ের তীব্র রশ্মিরেখা সকলের নেত্রপথে পতিত হইল। অবিলম্বে তরবারিপ্রহারে মারবারপতি ব্যাঘ্রীর প্রাণসংহার করিলেন। রাজপুতগণের বিশ্বাস, পথিমধ্যে এরূপ ঘটনা সুলক্ষণ। সেই জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যুদ্ধের সময় রাজপুতসেনার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ভট্টকবিও গমন করেন। জয়ঘোষণা তাঁহাদিগের কার্য্য। তাঁহাদিগের গলদেশে এক একটি পটহ বিলম্বিত থাকে; যুদ্ধে জয় হইলে তিনি সেই পটহবাদ্য করিতে করিতে গমন করেন। রাতকোট-দুর্গে গমনকালেও কুম্ভ ও মারবারপতির সঙ্গে এক জন ভট্টকবি ছিলেন। দুর্গের প্রাকারসমীপে গমনমাত্র পদস্খলন হওয়াতে তিনি নিম্নভাগে যেমন পতিত হইলেন, অমনি কণ্ঠলগ্ন পটহ ঘোর নিঃস্বনে বাজিয়া উঠিল। গভীর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রণবাদ্য বাদিত হইবামাত্র চাচার কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া চাচা তাহাকে কহিলেন, "মা, ভয় নাই, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া নিদ্রা যাও। বর্ষাকাল, মেঘের

গভীরগর্জ্জন কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। শত্রুভয় নাই; আমাদিগের শত্রু বহুদূরে অবস্থিত।" চাচার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই দলবলসহ রাঠোর-রাজকুমার রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। কাল পূর্ণ হইলে কেহই রক্ষা পাইতে পারে না। অবিলম্বে সুজা প্রচণ্ডবিক্রমে তরবারি-প্রহারে পিশাচ-কল্প চাচাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন, রাঠোর-রাজকুমারের হস্তে পাপাত্মা মৈর নিহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। বিজয়-বৈজয়ন্তী তুলিয়া জয়নাদ সহকারে সেনাগণ রাতকোটদুর্গের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। এত দিনের পর বিধাতা দুরাচার পাষণ্ডদ্বয়ের পাপের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

রাণা কুম্ভ কর্ত্তৃক মালবরাজের কারারোধ, পুত্রহস্তে রাণার মৃত্যু, মিবার আক্রমণ এবং রায়মল্লের নিধন।

পিশাচ রাজঘাতিদ্বয়ের উপযুক্ত শাস্তি হইল। মারবাররাজের আনুকূল্যে ও অধ্যবসায়ে রাণা কুম্ভ পৈতৃক-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ১৪৭৫ সংবতে (১৪১৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি চিতোর-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার সুশৃঙ্খল ও সুচারু শাসনপ্রভাবে প্রজাবৃন্দ নিরুপদ্রবে পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। রাণা কুম্ভের কার্য্যাবলীর মধ্যে অনেকগুলি বিস্ময়কর ঘটনা আছে; তাঁহার অনেকগুলি কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি মিবাররাজ্যে বিরাজিত রহিয়াছে।

খিলিজি-নৃপতিগণের রাজত্বাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দুর্ভাগ্যবশে দিল্লীশ্বর ক্ষীণবল হইয়াছিলেন। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বিজয়পুর, গলকন্দ, মালব, গুর্জ্জর, জৌনপুর, কল্পী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণ অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। চিতোরের অভ্যুদয় দর্শনে মালবরাজ ও গুর্জ্জররাজের হৃদয় ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া উঠিল। সখ্যসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়ে ১৪৯৬ সংবতে (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) চিতোরপুরী আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বেই মালবরাজ্যের বিশালপ্রান্তরে রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরযুদ্ধ সংঘটিত হইল। সেই যুদ্ধে চিতোররাজের বিজয়বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন হইল। মালবের খিলিজিরাজ মহম্মদ রাণা কুম্ভ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইয়া চিতোরনগরে আনীত হইলেন।

বিজিত শত্রুর প্রতি দয়াপ্রকাশ হিন্দুবীরের একটি প্রধান রণধর্ম্ম; হিন্দুবীরের চরিত্র দয়া, দাক্ষিণ্য ও রাজনৈতিক গুণগ্রামে সংগঠিত। রাণা কুম্ভের চরিত্রই ইহার প্রধান আদর্শস্থল। ছয় মাস কারাবাসের পর মহম্মদকে তিনি কারামুক্ত করিয়া বিপুল উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক সম্মান সহকারে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। মুক্তির বিনিময়ে পণস্বরূপ মালবরাজের নিকট হইতে তিনি কোনরূপ নিষ্ক্রয় গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার এই মহতী সদ্গুণাবলীর পক্ষপাতী হইয়া মহম্মদ নিজ ইতিবৃত্তগ্রন্থে তদীয় যশঃকীর্ত্তন না করিয়া নিরস্ত হইতে পারেন নাই। মহম্মদের রাজমুকুট এবং জয়লব্ধ কতিপয় সামগ্রীমাত্র চিতোর-রাজধানীতে রক্ষিত ছিল। বহুদিন পরে বাবর রাণা সিঙ্গের নিকট হইতে ঐ রাজমুকুট উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। রাণা কুম্ভনির্ম্মিত একটি বিজয়স্তম্ভে এই

সমস্ত বৃত্তান্ত উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। বিজয়লাভের একাদশ বর্ষ পরে রাণা এই স্তম্ভনির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দশবৎসরে কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়াছিলেন।

রাণা কুম্ভের কার্য্যাবলী সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য। সকল কার্য্যেই তাঁহার বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাগোররাজ্য অধিকার করিয়া তিনি তথা হইতে কতকগুলি বহুমূল্য কপাট সহ হনুমানের বিশালমূর্ত্তি আনয়ন করেন। চিতোরের একটি দ্বারদেশে অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি রক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ দ্বার "হনূমান্দ্বার" নামে প্রসিদ্ধ। আবুগিরির সানুপ্রদেশে একটি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ ছিল, প্রমারগণ বহুদিন হইতে তাহার অধিকারী ছিলেন। রাণা কুম্ভ স্বীয় প্রতাপে সে দুর্গটিও হস্তগত করিয়া লইলেন। সেই দুর্গমধ্যে একটি নূতন কোট, কোটমধ্যে অস্ত্রাগার ও রক্ষাগার নির্ম্মাণ করাইয়া রাণা তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। রাণা অধিকাংশ সময়ই সেই দুর্গে অবস্থিতি করিতেন। দুর্গমধ্যে অনেকগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটি মন্দিরে রাণা কুম্ভ ও তাঁহার পিতার পাষাণমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। রাজপুতেরা মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকেন। আবুগিরির উপরিভাগে রাণার আর একটি সুবিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজিত আছে; তাহার নাম কুম্ভশ্যাম। ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মাণকৌশল দর্শন করিলে নয়নের সার্থকতাসম্পাদন হয়। আবুপর্ব্বতের নিকটে গিরিপথে রাণা বাসন্তী নামে আরও একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সম্প্রতি শিরোহিগণকে তথায় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। আরাবল্লীপর্ব্বতে মৈরগণের বাস ছিল; শিরোমল্ল ও দেবগড় আরাবল্লীর নিকটবর্ত্তী। পাছে মৈরগণ কর্ত্তৃক ঐ দুটি স্থান আক্রান্ত হয়, এই আশঙ্কায় রাণা তথায় মাচিন নামে আর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ সংস্থাপন করিলেন। মারবার ও মিবাররাজ্যের সীমাবিভাগও রাণা কুম্ভ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। পানোর ও জারোলবাসী ভূমিয়া ভীলদিগের গতিরোধের জন্য তিনি আহোরাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গের জীর্ণসংস্কারও করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাণা সদ্রিনামা পর্ব্বতপথের মধ্যভাগে একটি সুবৃহৎ জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটি ত্রিতল; অনেকগুলি সমুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ সেই মন্দিরগাত্রে সুশোভিত। এক একটি স্তম্ভের উচ্চতা সপ্তবিংশতি হস্তের ন্যূন নহে। জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজমন্ত্রীর উপদেশে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। রাণা কুম্ভ ঋষভদেবের পবিত্র নামে এই পবিত্র মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তিমন্দিরটি নির্ম্মাণে দশ কোটি মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়াছিল। মিবাররাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ চতুরশীতি দুর্গ বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে দ্বাত্রিংশৎটি দুর্গ রাণা কুম্ভ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই চতুরশীতি দুর্গের মধ্যে কুম্ভমেরুই সর্ব্বপ্রধান। এরূপভাবে এরূপ দুর্ভেদ্য গিরিপথে এই দুর্গটি সংস্থাপিত যে, সেই কূটপথ লঙ্ঘন করিয়া সহজে তন্মধ্যে প্রবেশ করা বিপক্ষপক্ষের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। যে স্থানে কুম্ভমেরু প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বে তথায় পার্ব্বত্যগণের একটি প্রাচীন দুর্গ দৃষ্ট হইত। অনেকে অনুমান করেন, সম্প্রীতনামা চন্দ্রগুপ্তবংশীয় এক রাজা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রাণা কুম্ভ রণচর্য্যায় যেমন সুদক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কবিত্বশক্তিতেও তাঁহার সেইরূপ অসাধারণী ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচিত সদ্বিষয়িণী কবিতাগুলি পাঠ করিলে—কবিত্বশক্তির মহিমা পর্য্যালোচনা করিলে সত্য সত্যই বিমুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার রচিত গীতগোবিন্দের পরিশিষ্ট তদীয় কবিত্বশক্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন। বহুযত্নে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া রাণা আপনার মহিষীকেও অতুলবিদ্যায় বিদ্যাবতী করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী মীরাবাই তাঁহার প্রধানা-মহিষী ছিলেন। মারবারের

সামন্তবংশীয় এক রাঠোরের ঔরসে মীরাবাই জন্মগ্রহণ করেন। রূপে, গুণে, পাতিব্রত্যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে কিছুতেই তদানীন্তন রাজকুলে মীরাবাইয়ের সদৃশী রমণী পরিদৃষ্ট হইত না। অনেকে অনেক সূত্রে মীরাবাইয়ের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন, কিন্তু তাদৃশী গুণবতী নারীর প্রতি সেরূপ অযথা-কলঙ্কারোপ করা সাধুজনবিগর্হিত সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের প্রতি রাজমহিষীর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। বৃন্দাবন হইতে দ্বারকাপুরী পর্য্যন্ত যতগুলি তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তীর্থেই তিনি গমন, সমস্ত তীর্থেই দেবদর্শন এবং সমস্ত তীর্থেই দীনদুঃখীকে প্রচুরপরিমাণে অর্থদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ধর্ম্মগর্ভিণী রসময়ী কবিতাগুলি পাঠ করিলে তাহার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। অনেকের বিশ্বাস, মহিষী পতির নিকট শিক্ষিতা হন নাই, বরং পত্নীর রচনানৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির অনুকরণ করিয়াই রাণা কুম্ভ মহাকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

রাঠোরদিগের সহিত শিশোদায়গণের যে মৈত্রীভাব দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, আপদে বিপদে পরস্পর যে বন্ধুভাবের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছিলেন, এত দিনের পর সেই সৌহার্দ্দভাব বিষম শত্রুতা-ভাবে পরিণত হইল। প্রেমলাভের আশায় রাণা কুম্ভ বিবাদবহ্নি পুনরায় সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিলেন। ঝালাবার সর্দ্দারের এক কন্যার সহিত মারবাররাজের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে রাণা কুম্ভ সেই কুমারীটিকে হরণপূর্ব্বক কুম্ভমের-দুর্গে আনিয়া রাখিলেন। কামিনীলাভের আশায় বঞ্চিত হইয়া রাঠোররাজ অনুতাপে চিন্তায় দিন দিন জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। কুমারীকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেকবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হন নাই। রমণীও রাঠোর-রাজের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন, রাঠোররাজের প্রতি তাঁহার প্রণয়-সঞ্চারও হইয়াছিল, কুম্ভমেরু দুর্গে অবস্থিত থাকিয়াও সে প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কুম্ভমেরুর প্রাসাদশ্রেণী মুন্দরদুর্গ হইতে স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইত। সর্দ্দারকুমারী দুর্গমধ্যে আপন কক্ষে যে নিশাপ্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতেন, রাঠোররাজ তাহাই গুপ্ত সঙ্কেত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, জীবন-তোষিণী আজিও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই, সেই জন্যই প্রণয়ের স্মৃতিসূচক নিশাপ্রদীপ প্রজ্বালিত রাখিতেন। প্রেমের আশায় মুগ্ধ হইয়া রাঠোররাজ সেই কুমারীর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য অনেকবার অনেক প্রকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, দুর্গপার্শ্বস্থ নিবিড় বনভূমি ভেদ করিয়া একবার অভীষ্টস্থানে প্রবেশও করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণতোষিণীর দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই।

রাজস্থানে যে সকল যতি, ভট্ট, চারণ ও ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহারা সকলেই "মাগন্ত" নামে অভিহিত হয়। প্রতিগ্রহই ইহাদের উপজীবিকা। হামিরের রাজত্বকালে ঐ জাতির মধ্যে চারণেরাই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। কোন সূত্রে চারণদিগের প্রতি রাণা কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ শ্রেণীয় এক কুচক্রী ব্রাহ্মণ রাণার ভগ্নীর বিষয়-সম্পত্তির উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত ছিল। রাণা এক সময়ে পীড়িত হইলে ঐ ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, সে রোগে তাঁহার নিস্তার নাই; রাজাও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ কুচক্রী ব্রাহ্মণই রাণার রোগপরীক্ষা করিত, মতামত প্রকাশ করিত, আপন ব্যবস্থামত ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাজাকে সেবন করাইত। ঐ সময় মহামতি টড সাহেব দেশভ্রমণ করিতে করিতে মিবাররাজ্যে উপস্থিত হন; রাণার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাণার মুখেই ঐ সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর অবগত হইয়া চক্রীদত্ত ঔষধ পরীক্ষা করেন; পরীক্ষায় বুঝিলেন, আপন গণনা ফলবতী করিবার জন্য সেই দিন চক্রী রাজাকে সপ্তধাতু-মিশ্রিত বিষাক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছে। টড সাহেব তৎক্ষণাৎ

রাজার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ একজন ইউরোপীয় চিকিৎসক উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুচিকিৎসাগুণে রাণা অল্পদিনের মধ্যেই কঠোর পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। কপটী ব্রাহ্মণ অচিরেই পদচ্যুত হইল। তাহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া মিবাররাজ রাণা কুম্ভ তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

রাণা কুম্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র রায়মল্ল। পিতার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া রায়মল্ল দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া ইদর প্রদেশে গমন করেন। যে কারণে রায়মল্ল নির্ব্বাসিত হন, তাহা অতীব বিস্ময়কর।—রাণা কুম্ভের হস্তে ঝুন্‌ঝুনুনরপতি যে দিন পরাজিত হন, তৎপরদিন হইতেই রাণা প্রত্যহ একটি বিস্ময়কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাই যেন তাঁহার একটি নিত্যকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রত্যহই কোন আসনে উপবেশনের অগ্রে তিনি স্বীয় তরবারি আপনার মস্তকোপরি তিনবার ভ্রামিত করিতেন। রায়মল্ল প্রত্যহই দেখিতেন, মর্ম্মগ্রহণ করিতে পরিতেন না। ক্রমে তাঁহার কৌতূহলবৃদ্ধি হইল। একদিন তিনি ধীরে ধীরে পিতার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র রাণার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ইদররাজ্যে নির্ব্বসিত করিলেন। তদবধিই পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রায়মল্লকে ইদরভূমে দিনপাত করিতে হয়।

কুচক্রী ব্রাহ্মণের কুচক্রে পড়িয়া রাণার অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইতেছিল, জগদীশ্বরের কৃপায় সেই সাংঘাতিক মৃত্যু হইতে তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর অধিক দিন তাঁহাকে চিতোরের সুখসম্ভোগে পরিলিপ্ত থাকিতে হইল না। তাঁহার মৃত্যু শোচনীয় হইতেও শোচনীয়তর। যে বংশের মহান্ গৌরব সমুচ্চসোপানে সমারূঢ় হইয়াছিল, সেই পবিত্রবংশ দুরপনেয় কলঙ্ককালিমায় চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইল। সেই মহাগৌরবান্বিত কুলে কুলাঙ্গার নরপিশাচের আবির্ভাব হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিয়া যে জীবন ধীরে ধীরে গৌরবের সহিত মরধাম হইতে বিদায় হইতে অগ্রসর হইতেছিল, এক নররাক্ষস দুরাচারের ছুরিকাঘাতে রাণার সেই পবিত্রজীবন অসময়ে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল। সেই দুরাচার কলঙ্কী কে?—সে অপর কেহ নহে, রাণার পাষণ্ড পুত্র উদা। ইতিহাসে কলঙ্ক হইবে বলিয়া ভট্টকবিরা তাঁহাদের গ্রন্থে এই পিশাচের নামোল্লেখ না করিয়া "নরঘাতী" অভিধানে সেই দুরাচারের পরিচয় দিয়াছেন।

পিতৃহন্তা পাষণ্ড উদা ১৫২৫ সংবতে (১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে) এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সম্পাদনের পর পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইল বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসরের অধিক তাহাকে রাজ্যভোগ করিতে হইল না। পিতৃহত্যাপাপের সমুচিত ফল সে অচিরেই প্রাপ্ত হইল। এই পঞ্চবর্ষের মধ্যেই মিবারের পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বসমৃদ্ধি ও পূর্ব্বশ্রীর অর্দ্ধাংশেরও অধিক বিনষ্ট হইয়া গেল। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা কেহই নরাধম উদার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা কপট-বন্ধুতা জানাইয়া আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেন। সম্বর, আজমীর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশগুলি যোধপুররাজকে এবং আবুপর্ব্বতের স্বাধীনতা দেবরনৃপতিকে প্রদান করিয়া উদা তাঁহাদিগকে স্বদেশে রাখিতে কল্পনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল। ১৫৩০ সংবতে (১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে) রায়মল্ল আসিয়া সবলে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। একজন চারণ সেই সময়ে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই সে রায়মল্লের অনুগত ছিল। কুম্ভ সে চারণকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহাদিগের বৃত্তিলোপ করিয়াছিলেন। রায়মল্ল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে পুনরায় তাহারা পূর্ব্ববৃত্তির অধিকারী হইল; পুনরায় চিতোর-রাজ্যে আসিয়া তাহারা পূর্ব্ববৎ সপরিবারে বাস করিতে লাগিল।

এ দিকে নরপিশাচ উদা নিরুপায় হইয়া দিল্লীর যবন-সম্রাটের চরণতলে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল; দুরাত্মা আপনার কন্যাটিকে যবনরাজের করে সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। পাপমূর্ত্তি উদা নিঘৃণের ন্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বাপ্পার পবিত্র কুলে চিরকলঙ্করেখা অঙ্কিত করিতে উদ্যত হইল বটে, কিন্তু বিধির কৃপায় সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। দুরাত্মা দিল্লী হইতে বিদায় লইয়া স্বরাজ্যে আগমনকালে পথিমধ্যে বজ্রাঘাতে আত্মপ্রাণ হারাইল। তখন দিল্লীশ্বর উদার পুত্র শেষমল্ল ও সূর্য্যমল্লকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রাচীন সিয়ার (নাথদ্বার) নামক স্থানে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রায়মল্লও অষ্টপঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী ও একাদশ সহস্র পদাতিক সমভিব্যাহারে যবনের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মিবারের সর্দ্দার ও সেনানীগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল। গর্ণারের সামন্তদ্বয় সংগ্রামে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর যবন-সম্রাট পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

রায়মল্লের তিন পুত্র;—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুইটি কন্যাও ছিল। একটি গর্ণারপতি যদুবংশীয় শূরজীকে, অপরটি শিরোহীর দেবরাজবংশীয় জয়মল্লকে সম্প্রদান করেন। কনিষ্ঠ জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ রায়মল্ল আবুপ্রদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন। কোনরূপেই পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে না পারিয়া শেষমল্ল ও সূর্য্যমল্ল অবশেষে পিতৃব্য চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া পিতৃব্যের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। উদারহৃদয় রায়মল্ল তাঁহাদিগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে সমাদরের সহিত আপন পরিবারভুক্ত করিয়া রাখিলেন। মালবরাজ গিয়াসুদ্দীনের সহিত অনেকবার রায়মল্লের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, সেই সমস্ত যুদ্ধে পিতৃব্যের পক্ষ হইয়া শেষমল্ল ও সূর্য্যমল্ল আপনাদিগের মহাবীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কোন যুদ্ধেই গিয়াসুদ্দীন জয়লাভ করিতে না পারিয়া পূর্ব্বসঙ্কল্পিত সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক রায়মল্লের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। সমস্ত বিঘ্ন, সমস্ত বাধা ও সমস্ত কণ্টক এতদিনে দূরীভূত হইল। দিল্লীর সম্রাট্‌ও নিস্তেজ। রায়মল্ল নির্ব্বিঘ্নে—নিষ্কণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। লোদীবংশীয় রাজারা সেই সময় জলবুদ্বুদের ন্যায় মধ্যে মধ্যে একবার দর্শন দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে চিতোর-রাজকে তাদৃশ চিন্তিত, ভীত বা শঙ্কিত হইতে হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল, রায়মল্লের এই তিন পুত্র। তিন জনই বীর, সাহসী, উদ্যমশীল ও শৌর্য্যশালী। রাজ্যলাভের জন্য রাজপুত্রেরা অন্তর্বিপ্লবে—গৃহবিচ্ছেদে যদি আপনাদিগের চরিত্র কলুষিত না করিতেন, মধ্যে মধ্যে আপন আপন তরবারির শোণিতপিপাসা নিবারণের জন্য যদি তাঁহারা গৃহবিচ্ছেদরূপ পাশববৃত্তির অনুসরণ না করিতেন, তাহা হইলে কখনই ভারতভূমির এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত না। রায়মল্লের তিন পুত্রই রাজ্যলাভের আশায় পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তুলিলেন। দ্বিতীয় পুত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ন্যায় বীরচরিত্রে প্রসিদ্ধ। নামের সাদৃশ্যের ন্যায় গুণেও তাঁহারা উভয়ে সমকক্ষ ছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই গুণগরিমা চাঁদভট্টের কাব্যগ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে অনুরঞ্জিত আছে। রায়মল্লের পুত্র শেষ পৃথ্বীরাজের কার্য্যবিবরণ যখন শিশোদীয়গণ পাঠ করেন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে পুলকিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ পৃথ্বীরাজের বীরত্বগাথা শিশোদীয়গণের একটি অত্যুত্তম শ্রুতিসুখকর আত্মসান্ত্বনার সমগ্রী হইয়া রহিয়াছে।

সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল, চিতোরসিংহাসনলাভের জন্য তিন ভ্রাতাই সমুৎসুক। ক্রমে এই

বিষয় লইয়া তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। একদিন তাঁহারা পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের নিকট বসিয়া এই সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছেন, স্থিরমীমাংসা হইতেছে না, ইত্যবসরে সঙ্গ বলিয়া উঠিলেন "নাহরা মুগরার * চারণীদেবীর পরিচারিকা সন্ন্যাসিনী যাহাকে রাজা নির্ব্বাচিত করিবেন, তিনিই মিবাররাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন।" সকলেই ইহাতে সম্মত হইলেন। স্ব স্ব ভাগ্যপরীক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সকলে সন্ন্যাসিনীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়মল পুরোবর্ত্তী হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আসন মাদুরোপরি উপবিষ্ট হইলে সঙ্গও অনুগমনপূর্ব্বক একখানি ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন; সূর্য্যমল্লও তাঁহার পার্শ্বে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই নীরব। কিয়ৎক্ষণ পরে মৌনভঙ্গ করিয়া পৃথ্বীরাজ আপনাদিগের আগমন-কারণ ব্যক্ত করিলে যোগিনী অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন দেখাইয়া দিলেন। সঙ্কেতে প্রকাশ পাইল, সঙ্গ রাজসিংহাসনের যোগ্য, সূর্য্যমল কিয়দংশ ভোগের অধিকারী।

উগ্রস্বভাব পৃথ্বীরাজের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি জ্যেষ্ঠের নিধনার্থ তরবারি উত্তোলিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ নিজের অস্ত্রের সাহায্যে তাহার প্রতি-রোধ করিয়া সূর্য্যমল্ল ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবনরক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ে মহাভয়সঞ্চার হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন। সূর্য্যমল্লের সাহায্যে সঙ্গের জীবন রক্ষিত হইল দেখিয়া পৃথ্বীরাজ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, সূর্য্যমল্লকে সংহার করিবার জন্য তিনি তাঁহাকেই আক্রমণ করিলেন। দেবীমন্দিরে ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল; অস্ত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে উভয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল, বারিধারার ন্যায় শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া দেবনিকেতন অনুরঞ্জিত করিল। সঙ্গও বিষম আঘাতে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার একটি চক্ষু চিরদিনের জন্য নষ্ট হইল। নিরুপায় হইয়া তিনি চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তথা হইতে শিবাস্তিপ্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক তিনি বীদা নামক রাজপুতের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বীদা উদাবৎবংশের একজন ধনাঢ্য বলবান্ রাজপুত। বিদেশগমনার্থ সুসজ্জিত হইয়া তিনি তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, ইত্যবসরে রক্তাক্তকলেবরে সঙ্গ আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখি-তেই তাঁহার পশ্চাতে তীক্ষ্ণ তরবারি-হস্তে মহাবীর জয়মল্ল উপস্থিত। আশ্রিতের জীবনরক্ষা করা, প্রপন্ন অতিথিকে নিরাপদ্ করা রাঠোর-জাতির কুলব্রত; কালবিলম্ব না করিয়া বীদা তৎক্ষণাৎ আপনার তরবারি কোষোন্মুক্ত করিলেন। অচিরেই জয়মল্লের সহিত তাঁহার তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। সেই সংগ্রামে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া বীদা আশ্রিতের প্রাণরক্ষা করিলেন।

পৃথ্বীরাজ রুগ্নশয্যায় শায়িত। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাকে কিছু দিন কষ্টভোগ করিতে হইল। উপযুক্ত চিকিৎসকের উপযুক্ত চিকিৎসার গুণে তিনি দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। সহোদরের বিরুদ্ধে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে জিঘাংসার যে অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে, কিছুতেই তিনি তাহার উন্মূলনে সমর্থ হইলেন না; বরং উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সঙ্গকে প্রতিফল দিবার অভিলাষে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ তিনি চারিদিকে ছদ্মবেশী গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন।

কনিষ্ঠের শত্রুভাব জানিতে পারিয়া সঙ্গকেও আত্মগোপন করিতে হইল। রাজপুতকুলের রাজ-কুমার হইয়া তিনি অনাথের ন্যায় এক নিভৃতস্থানে ছাগরক্ষকদিগের আশ্রয়ে জীবনযাপন করিতে

* ব্যাসমেরুর অপর নাম "নাহরা মুগরা" এই স্থান উদয়পুরের পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত

লাগিলেন। রাখালবৃত্তিতে সঙ্গের তাদৃশ পটুতা ছিল না, গোচারণে—ছাগাদিচারণে রাখালদিগের ন্যায় তিনি নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন না, রাখালেরা তাঁহাকে সর্ব্বদাই তাড়না করিত, সময়ে সময়ে ক্রোধভরে তাড়াইয়া দিত। সঙ্গ কিছুতেই দুঃখবোধ না করিয়া মনের দুঃখ মনোমধ্যে বিলীন রাখিয়া অদৃষ্টের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়ংকালে গৃহে উপস্থিত হইলে রাখালেরা তাঁহাকে ভুসিমিশ্রিত গোধূমচূর্ণের পিষ্টক আহার করিতে দিত। এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় সঙ্গের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজের ঔদ্ধত্যবশতই ভ্রাতৃগণের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ সঙ্গই প্রকৃত উত্তরাধিকারী, বহুদিন হইতে তিনি নিরুদ্দেশ, জীবিত আছেন কি না, তাহাও সন্দেহ, এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাণা রায়মল্ল মধ্যমপুত্র পৃথ্বীরাজের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন; অচিরেই পৃথ্বীরাজকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে তিনি রাজ্য হইতে স্থানান্তরে প্রস্থানের আদেশ করিলেন। বীরবর পৃথ্বীরাজের বীরহৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; পাঁচজনমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গদবারান্তর্গত বালিয়ো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।' গদবার-প্রদেশ তখন বন্যজাতির উপদ্রবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অসভ্য বন্যজাতিকে দমন করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে অভীষ্টসিদ্ধির অনেক সম্ভাবনা; এই উদ্দেশেই পৃথ্বীরাজ ঐ প্রদেশে আগমন করিলেন। তিনি নদালয়নগরে উপস্থিত হইয়া আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য তত্রত্য ওঝা নামক বণিকের নিকট একটি অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইলেন। সেই অঙ্গুরীয়কটি উক্ত বণিক্ কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই বণিকের নিকট হইতেই রাজকুমারের জন্য উহা পূর্ব্বে ক্রয় করা হয়। অঙ্গুরীয়কটি দর্শনমাত্র বণিক্ রাজকুমারকে চিনিতে পারিলেন। পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসনের আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভূত হইল। শপথ করিয়া বণিক পৃথ্বীরাজের অভীষ্টসিদ্ধির সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

মীনেরাই এই সকল গিরিসঙ্কট পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিপতি; রাবৎ উপাধিধারী এক জন মীন সেই সময় নদালয়-নামক স্থানে রাজধানীস্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই বন্যরাজের প্রতাপে অসংখ্য রাজপুত তাঁহার বশীভূত ছিলেন। ওঝার পরামর্শে পৃথ্বীরাজ মীনপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুচরদলের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন। যে পাঁচজন অনুচর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল, তাহারাও মীনরাজের নিকট পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ঐ পাঁচজন যথাক্রমে যশ, সিনদীয়া, সঙ্গমদেবী, অভয় ও জুঞ্জ নামে পরিচিত।

কিয়ৎকাল অতীত হইল। যে শুভাবসরের প্রতীক্ষায় পৃথ্বীরাজ আত্মগোপন করিয়া অজ্ঞাতবাসে দিনযাপন করিতেছিলেন, ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে সেই শুভ অবসর উপস্থিত। মীনরাজের রাজ্যে প্রতিবৎসর আহেরিয়া বা শাবরোৎসব নামে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দিন দাসগণ আপন আপন পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পায়; সেই দিন তাহারা স্বাধীনতা-সুখের রসাস্বাদন করে। অন্যান্য অনুজীবীর ন্যায় সেই দিন পৃথ্বীরাজও অবকাশপ্রাপ্ত হইলেন। মীনরাজ রাবৎকে সংহার করিয়া রাজসিংহাসন হস্তগত করিবেন, এই বাসনা পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে বহুদিন হইতে বলবতী ছিল। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তিনি আপন অনুগত রাজপুতগণকে রাবতের প্রাণবধার্থ প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং তোরণদ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার মনোরথ সুসিদ্ধ হইল। রাজপুতেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মীনরাজকে আক্রমণ করিলে তিনি

প্রাণভয়ে অশ্বারোহণে পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া পৃথ্বীরাজও তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া ফেলিলেন। অবিলম্বেই রাজপুতগণ নদালয়ের চারিদিকে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। প্রজ্বলিত অগ্নি ভীষণমূর্ত্তিতে নগর ভস্মীভূত করিতে লাগিল। মীনগণ সেই ঘোরকাণ্ড দর্শনে ভীত হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল, পৃথ্বীরাজের প্রচণ্ড রোষাগ্নিতে অল্পক্ষণমধ্যেই নগরী ছারখার হইয়া গেল। সমগ্র গদবার প্রদেশ তাঁহার হস্তগত হইল, কেবল চোহানাধিকৃত দৈশূরী-দুর্গে তিনি হস্তক্ষেপ করিলেন না। ঐ প্রদেশের সদগড় নামক স্থানে সর্দ্দারনামক এক জন শোলাঙ্কি-রাজপুত বাস করিতেন। তাঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক ঐ স্থান প্রতিষ্ঠিত। দৈশূরী-দুর্গপতি চোহানরাজের কন্যার সহিত সর্দ্দারের বিবাহ হয়। পৃথ্বীরাজ ঐ দৈশূরী-দুর্গ ও তৎসন্নিহিত ভূমিবৃত্তি চিরকালের জন্য সর্দ্দারকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে আপনার বশীভূত করিয়া রাখিলেন। দানপত্রের প্রথমেই আপন ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণকে দিব্য দিয়া এরূপ লিখিত হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে যেন কেহ কখনও ভ্রমেও সর্দ্দার-উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে সেই ভূমিবৃত্তি পুনর্গ্রহণ করিয়া মহাপাপে লিপ্ত না হন।

অজমীরের অনতিদূরে শ্রীনগর নামক পল্লী। প্রমারবংশীয় করিমচাঁদ সর্দ্দার তথায় বাস করিত। দস্যুব্যবসায়ই করিমচাঁদের উপজীবিকা। তাহার দলে অনেকগুলি দস্যু ছিল; দেশলুণ্ঠনই তাহাদিগের প্রধান কার্য্য। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত মধ্যে মধ্যে গোপনে সঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সেই সকল রাজপুতের নিকট হইতে সঙ্গ একটি অশ্ব ও কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদেরই পরামর্শে সঙ্গ করিমের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহারই দলভুক্ত হইয়া রহিলেন। পবিত্র বংশের বংশধর হইয়া পাপকরী দস্যুবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পাপময় দস্যুতস্করের সঙ্গে তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন। যত দিন পিতৃসিংহাসন তাহার হস্তগত না হইয়াছিল, তত দিন তিনি করিমচাঁদের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। করিমচাঁদের কন্যার সহিত সঙ্গের বিবাহ হয়। কি কারণে অধীনস্থ সামান্য একজন দস্যুর হস্তে করিম কন্যাদান করে, সেই সম্বন্ধে ইতিবৃত্তগ্রন্থে একটি বিস্ময়কর উপন্যাস বর্ণিত আছে।

জয়সিংহ বলীয় এবং জয়সুর সিন্দিল নামে দুইটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্ব্বদাই সঙ্গের সমভিব্যাহারে থাকিত। সঙ্গকে গিরিসঙ্কটে, দুর্গম প্রান্তরে—দুর্ভেদ্য গহন বনে পরিভ্রমণ করিতে হইত, ঐ দুটি বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া আনিত, রন্ধনাদির আবশ্যক হইলে খাদ্যসামগ্রীও প্রস্তুত করিত। একদিন সঙ্গ একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন, অনুচর দুটি অনতিদূরে আহারীয় প্রস্তুত করিতেছে, ইত্যবসরে একটি বিশালকায় কৃষ্ণসর্প আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃক্ষপত্রের অভ্যন্তর দিয়া একটি সূর্য্যরশ্মিরেখা আসিয়া সঙ্গের মুখপদ্মে পতিত হইয়াছিল, কৃষ্ণসর্প ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকোপরি আপন ফণাবিস্তার করিয়া বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। ইত্যবসরে শুভসূচক একটি পক্ষী আসিয়া সেই সর্পফণার উপর উপবেশনপূর্ব্বক উচ্চতানে মধুরশব্দে বনভাগ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অদূরে মারুনামক একজন শাকুনশাস্ত্রবিৎ রাখাল এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে সঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইল; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, অচিরেই সঙ্গ সার্ব্বভৌমপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। করিমের কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশ করিল। প্রকাশ না করিয়া, গুপ্তবৃত্তান্ত গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়া করিম সাদরে সঙ্গের করে আপনার

দুহিতা সম্প্রদান করিল। পরমযত্নে পরমাদরে দস্যুরাজ করিমের গৃহে সঙ্গ নবপ্রণয়িনী সহ দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শোলান্‌কিবংশীয় রায় শূরতান তোড়াটঙ্কের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তোড়াটঙ্কের প্রাচীন নাম তক্ষশিলা। যদিও তক্ষশিলার পূর্ব্বসৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি অনেক প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। পাঠানেরা শূরতানকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তোড়াটঙ্ক অধিকার করিল। শূরতানের তারাবাই নাম্নী একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়া যে ব্যক্তি তোড়াটঙ্ক উদ্ধার করিতে পারিবেন, তারাবাই পুরস্কারস্বরূপে তাঁহারই হস্তে অর্পিত হইবে, রায় শূরতান সর্ব্বত্র সেই ঘোষণা প্রচার করিলেন। সুন্দরী রমণীলাভের আশায় জয়মল্লের হৃদয় বিমুগ্ধ হইল। তোড়াটঙ্ক উদ্ধারে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না। মনোমোহিনীলাভের আশাও ছাড়িতে না পারিয়া তিনি তারাবাই হরণের উদ্যোগ করিলেন। এই অসদ্‌ব্যবহারের বিনিময়ে শূরতানের হস্তে তাঁহাকে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল। ভট্টকবিগণ লিখিয়াছেন, অসদ্ব্যবহার করিয়া পুত্র নিহত হইল, রাণা এই কারণে রুষ্ট না হইয়া বরং প্রীতিসহকারে শূরতানকে বেদনোর প্রদেশের সমগ্র ভূমিবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

পিতৃহন্তা উদা নৃশংসের কার্য্য করিয়া কিছু দিনের জন্য পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল; সূর্য্যমল্লও সেইরূপ নানা অসদুপায়ে রাজসিংহাসনলাভের আশা করিতে লাগিলেন। চারণীদেবীর পরিচারিকা যোগিনীর মুখে যে দিন তিনি শুনিয়াছেন, চিতোররাজ্যের অংশভাগী হইবেন, সেই দিন হইতে সেই যোগিনীবাক্য তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি সে কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এখন সঙ্গ নিরুদ্দেশ, পৃথ্বীরাজ পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত, জয়মল্ল নিহত, অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত লক্ষণ দেখিয়া সূর্য্যমল্লের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁহার সে আশা—সে আনন্দ অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠপুত্র নিরুদ্দেশ, কনিষ্ঠ জয়মল্লও অকালে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন, পৃথ্বীরাজের প্রতি রাণা রায়মল্লের পিতৃস্নেহ পুনর্ব্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজকে তিনি চিতোরে আহ্বান করিলেন।

পৃথ্বীরাজ আজন্ম রণপ্রিয়। যে কার্য্যে জীবননাশের সম্ভাবনা, অস্ত্রচালনা ব্যতীত যে কার্য্যসাধনের উপায়ান্তর নাই, পৃথ্বীরাজ সানন্দে সেই কার্য্যে অগ্রসর হইতেন। পিতা কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীত হইয়া চিতোররাজ্যে আগমনের অব্যবহিত পরেই তিনি তোড়াটঙ্ক উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; মহতী সেনা সমভিব্যাহারে অচিরেই তিনি যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; অচিরেই তাঁহার জয়লাভ হইল; অচিরেই তারাবাই তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া চিতোররাজ্যে আনীত হইলেন। তাঁহার এইরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়, উদ্যম ও অমানুষিক বীরত্ব দর্শনে রাণা রায়মল্ল পরমসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

সূর্য্যমল্লের ধারণা ছিল, বিধাতা চিতোরের সিংহাসন তাঁহারই অদৃষ্টে লিখিয়াছেন; তাহা সিদ্ধ হইল না। হৃদয়ে বিদ্বেষানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি প্রকাশ্যে পৃথ্বীরাজের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সারঙ্গদেব নামে লক্ষরাণার আর একটি বংশধর ছিলেন, সূর্য্যমল্ল তাঁহাকে সহায় করিয়া মালবরাজ মোজাফরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মালবপতিদত্ত সেনার সহায়তায় অবিলম্বে তিনি মিবারের দক্ষিণসীমা আক্রমণ করিলেন। সদ্রি ও বাটেরা এবং নায়ী ও নিমচের মধ্যবর্ত্তী একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ক্রমে সূর্য্যমল্লের হস্তগত হইল। বিজয়মদে মত্ত হইয়া অবশেষে তিনি চিতোররাজ্য আক্রমণ করিলেন। অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া রায়মল্লও তৎক্ষণাৎ গাম্ভীরী নদীকূলে উপস্থিত হইয়া

শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। উভয় দলে ঘোরযুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে রাণার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল, অবিরল শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অনুরঞ্জিত করিল। ক্রমশই তিনি নিস্তেজ ও নির্জীব হইয়া পড়িলেন।

ইত্যবসরে সহস্র অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে পৃথ্বীরাজ আসিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। [illegible] তিনি বিপুলবিক্রমে রণভূমে পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের বহু অসংখ্য সৈন্য রণশায়ী হইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইল, কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না। সে দিনের মত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া সৈন্যগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিল। রজনী অতিবাহিত হইল।

রাজপুতজাতির চরিত্রে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্র দেখা যায়, কোন মানবচরিত্রেই সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। সূর্য্যমল্লের উত্তরকালে যে ঝালাসন্দার মন্ত্রিরাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপিতে আর্য্যবীর রাজপুতের মহান্ হৃদয়ের একটি প্রীতিকর চিত্র চিত্রিত আছে। প্রথমদিন যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ পিতৃব্য সূর্য্যমল্লকে দর্শন করিবার অভিলাষে তদীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যমল্ল তখন শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, একটি অনুচর ক্ষতস্থানগুলি সীবন করিয়া দিতেছিল। যাঁহার কঠোর অস্ত্রাঘাতে দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, রাজ্যলাভের জন্য যে ব্যক্তি তাঁহার প্রাণসংহারে সমুদ্যত, যাহার জিঘাংসা সর্ব্বক্ষণ ভীমবেশে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেছে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্মুখে দেখিবামাত্র সূর্য্যমল্ল শয্যাত্যাগ করিলেন, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সাদরসম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিলেন, স্নেহালিঙ্গনে বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থানকালে ক্ষতমুখ হইতে আবার অনর্গল রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে পৃথ্বীরাজের বদনমণ্ডলে ক্লেশ-চিহ্ন প্রকাশিত হইল; ক্ষতস্থানগুলির রক্ত নিবারণে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পৃথ্বীরাজ আসনপরিগ্রহ করিলে পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ের প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ক্ষতস্থানগুলি কেমন আছে? কিছু উপশম হইয়াছে কি?"

"বৎস, তোমাকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। এখন আর আমার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইতেছে না, আমি যেন সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছি।"

"আমি অগ্রেই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। এখনও পিতার নিকট গমন করি নাই। আমার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, পটগৃহে কিছু আহারীয় আছে কি?"

তৎক্ষণাৎ আহারের আয়োজন হইল। একাসনে বসিয়াই পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র একপাত্রে আহার করিলেন। বিদায়গ্রহণকালে পৃথ্বীরাজ বলিলেন, "তাত! কল্য আবার আমরা উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব, কল্যই শেষযুদ্ধ।"

"হাঁ বৎস! তাহাই স্থির, প্রত্যূষেই যুদ্ধ হইবে।"

রজনী-প্রভাতে পুনরায় ঘোরযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে সারঙ্গদেবের গাত্রে পঁয়ত্রিশটি আঘাত নিপতিত হয়। তাঁহার বীরত্ব দর্শনে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। অসংখ্য মৃতদেহে রণভূমি সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করিলেন, তাঁহার অঙ্গে সাতটিমাত্র অস্ত্রচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্যমল্ল পলায়ন করিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন না। সূর্য্যমল্ল বাতেরো নামক দুর্গম বনমধ্যে একটি নিভৃতস্থলে বৃক্ষব্যবধানে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। তদীয় অনুচরগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। অনুসন্ধানে অনুসন্ধানে

পৃথ্বীরাজ সেখানেও উপস্থিত হইলেন। সহচর সারঙ্গদেবের সহিত রাত্রিকালে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া সূর্য্যমল্ল যুদ্ধ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন, সহসা দারুপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া মহাবীর পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধকেশরীর ন্যায় লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পিতৃব্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যমল্লের প্রতি যেমন তিনি তরবারি উত্থাপিত করিয়াছেন, অমনি সারঙ্গদেব নিজ অস্ত্রাঘাতে তদীয় অস্ত্র নিবারণ করিলেন।

সূর্য্যমল্লের অনুরোধে সে দিন যুদ্ধ স্থগিত রহিল। ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস! আমার বংশধরেরা রাজপুত, দেশলুণ্ঠন করিয়াও জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে, আমি মরিলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমি মরিলে চিতোরের অদৃষ্টে কি হইবে? লোকে আমাকে অভিসম্পাত করিবে, আমার নিন্দাবাদ করিবে, আমার আর কলঙ্কের অবধি থাকিবে না।"

উভয়ের উন্মুক্ত অসি স্ব স্ব কোষমধ্যে রক্ষিত হইল। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। সূর্য্যমল্লকে সম্বোধন করিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন, "তাত! আপনারা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া কি করিতেছিলেন?"

"পানভোজনাদি সমাপনের পর অসংবদ্ধ গল্পে প্রবৃত্ত ছিলাম।"

"আমার ন্যায় প্রবল বৈরি মস্তকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান, জানিয়াও আপনি এরূপ নিশ্চিন্তভাবে গল্প করিতেছিলেন, ইহারই বা কারণ কি?"

সূর্য্যমল্লের অধরবিম্বে মৃদুহাস্য দেখা দিল। স্নেহের স্বরে সম্বোধন করিয়া পৃথ্বীরাজকে তিনি কহিলেন, "বৎস! একটা অবলম্বন ত চাই; কোন প্রকারে ত আমাকে দিনপাত করিতে হইবে। তুমি আমাকে নিরুপায় ও নিঃসম্বল করিয়া ফেলিয়াছ, আমি কি করিব?"

কথাপ্রসঙ্গে রাত্রি অধিক হইল, কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলেই বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিলেন। প্রভাতে পৃথ্বীরাজ কালিকাদেবী-দর্শনার্থ পিতৃব্যকে অনুরোধ করিলেন। অদূরেই কালিকামন্দির বিরাজিত। সূর্য্যমল্ল রণশ্রমে একান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে সারঙ্গদেব পৃথ্বীরাজের সহিত দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

দেবীপূজা আরম্ভ হইল। অতঃপর বলিদান। প্রথমে একটি মহিষ বলিদান করিয়া পৃথ্বীরাজ ছাগবলি প্রদান করিলেন। ছাগবলি পরিসমাপ্ত হইবামাত্র তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া তিনি সারঙ্গদেবকে আক্রমণ করিলেন। দেবীমন্দিরে উভয়ের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর সারঙ্গদেব নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন; অবিলম্বেই তাঁহার ছিন্নমস্তক কালিকাদেবীর খর্পরোপরি বলিস্বরূপ অর্পিত হইল। ক্ষিপ্রহস্তের চালনকৌশলে সুতীক্ষ্ণ তরবারি আঘাতে মহাবীর পৃথ্বীরাজ বিশ্বাসঘাতক সারঙ্গদেবের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ভবানীদেবীর খর্পরোপরি বলিপ্রদান করিলেন। কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার জিঘাংসার শান্তি হইল। বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তিনি দেবীমন্দির হইতে বহির্গত হইলেন; অবিলম্বে পিতৃব্যের দারুদুর্গ লুণ্ঠন করিলেন; বাতেরো নগর অচিরেই তাঁহার করায়ত্ত হইল।

পৃথ্বীরাজের মহাপ্রতাপের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সূর্য্যমল্ল সদ্রিনগরে পলায়ন করিলেন। সহায় নাই, সম্বল নাই, ভবিষ্যজীবনের আশাভরসাও বিলুপ্ত; তাঁহার যে কিছু ভূমিবৃত্তি ছিল, ব্রাহ্মণ ও ভট্টগণকে সমস্তই দান করিলেন; অবিলম্বেই মিবাররাজ্যের নিকট চিরবিদায় লইয়া কনখল-নামক মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র একটি শুভলক্ষণ তাঁহার নেত্রগোচর হইল;—দেখিলেন, একটি ছাগশাবক তাহার মাতার নিকট ক্রীড়া করিতেছে, অদূরে এক বিশালকায়া ব্যাঘ্রী তাহাকে হরণ করিবার উদ্যম করিতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। ব্যাঘ্রীর আক্রমণ হইতে শাবকটিকে তাহার জননী রক্ষা করিতেছে। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনমাত্র নবীন আশায়, নবীন উৎসাহে সূর্য্যমল্লের হৃদয় সমুৎসাহিত হইয়া উঠিল।* চারণীমন্দিরবাসিনী যোগিনীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। পুনরায় নূতন আশার সঞ্চার হইয়া তাহার অন্তরকে ধীরে ধীরে উৎসাহের পথে লইয়া চলিল। আর অন্যত্র গমন না করিয়া তিনি সেই স্থানেই বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে স্বীয় বাহুবলে তিনি তত্রত্য অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তথায় দেবগড়-নামক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপন করিলেন। ক্রমে ক্রমে দেবগড়ের চতুষ্পার্শস্থ সহস্র গ্রাম তাঁহার আয়ত্ত হইল। সেই সমস্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম অদ্যাপি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বংশধরগণের অধিকারভুক্ত আছে।

পুত্রগণের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় ভ্রাতৃবিরোধ দেখিয়া অনুতাপে অনুতাপে রাণা রায়মল্লের চিরজীবন অতিবাহিত হইল। পরিণত বয়সে দুঃসহ পুত্রশোক তাঁহার শেষজীবনের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। অকালে পৃথ্বীরাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে বৃদ্ধ রাণা চিন্তাশোকে জর্জ্জরিত হইয়া অচিরেই বীরপুত্রের অনুগমন করিলেন।

শিরোহিরাজ পাভুরায়ের হস্তে রায়মল্ল আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পাভু অত্যন্ত মাদকপ্রিয় ছিলেন। মত্ততার আবেশ হইলে তিনি নৃশংসমূর্ত্তি ধারণ করিতেন; স্বীয় পত্নীর উপরেই অধিক উৎপীড়ন হইত। এমন কি, পৈশাচিক-বিলাসিতা-পরিতৃপ্তির জন্য তিনি সহধর্ম্মিণীকে প্রায়ই সমস্ত রাত্রি পর্য্যঙ্কতলে ভূমিশয্যায় শায়িত রাখিতেন। দিন দিন যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজকুমারী আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপনে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনপূর্ব্বক সহোদর পৃথ্বীরাজের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। সহোদরার যন্ত্রণাসংবাদ পাইয়া পৃথ্বীরাজ ব্যথিত হইলেন, ভগিনীপতির দুষ্ক্রিয়ার উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানার্থ অবিলম্বে শিরোহী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রজনীযোগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে পাভুরায়ের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি স্বচক্ষে ভগিনীর যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। রোষসংবরণ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া ভীমগর্জ্জনে তিনি দুরাত্মার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলেন। পতিপ্রাণা কামিনীর কোমল হৃদয় তখন পতিবিয়োগাশঙ্কায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। পতি পাষণ্ড—নিষ্ঠুর হইলেও পতিপ্রাণা রমণী স্বচক্ষে পতির মৃত্যু নেত্রগোচর করিতে পারেন না; কাজেই অগ্রজের পদতলে পতিত হইয়া রাজকুমারী করুণকণ্ঠে পতির জীবনভিক্ষা চাহিলেন। পাভুরায়ও বিনয়নম্রস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য পত্নীর পদসেবা করিতে হইবে, পত্নীর পাদুকা মস্তকে রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে ভ্রমেও পত্নীকে কোনরূপ যন্ত্রণা দিতে পারিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া পৃথ্বীরাজ ভগিনীপতিকে ক্ষমা করিলেন। তদীয় করবাল পুনরায় কোষমধ্যে রক্ষিত হইল।

প্রতিজ্ঞা পালিত হইল। শিরোহিরাজ পাভুরায় পত্নীর পাদসংবাহন করিলেন, ক্ষণকাল

* রাজপুতবিশ্বাসে এরূপ ঘটনা শুভসূচক।

পত্নীর পাদুকা মস্তকে ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, ভবিষ্যতে পত্নীকে কোনরূপ যন্ত্রণায় দগ্ধ করিবেন না, শপথ করিয়া সেরূপ প্রতিজ্ঞাও করিলেন।

পাঁচ দিন অতীত। ভগিনীপতির অনুরোধে—তাঁহার বন্ধুভাবদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিন শিরোহিরাজ্যে অবস্থিতি করিলেন। ষষ্ঠদিবসে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের আয়োজন হইল। পাভুরায় এক প্রকার সুস্বাদু মোদক প্রস্তত করিতে জানিতেন। বিদায়কালে শ্যালককে তিনি কয়েকটি মোদক উপহার প্রদান করিলেন।

কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া কমলমীরে উপস্থিত হইবামাত্র পিপাসাবোধ হওয়াতে পৃথ্বীরাজ মোদকের কিয়দংশ ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিবন্ধন যেন শিথিল হইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলেন, নররাক্ষস পাভু তাঁহার প্রাণসংহারার্থ কালকটপূর্ণ মোদক উপহার দিয়াছিল। কমলমীরের অনতিদূরেই দেবীমাতার মন্দির, অতিকষ্টে সেই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পৃথ্বীরাজ প্রাঙ্গণে শয়ন করিলেন। প্রিয়তমা তারাকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু আর তাঁহাকে প্রাণপ্রতিমা প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল না। পতিপ্রাণা তারাদেবী উপস্থিত হইতে না হইতেই তাঁহার প্রাণপতির প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া প্রস্থান করিল। প্রিয়বল্লভের শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া পতিপ্রাণা তারা অচিরেই কমলমীরে প্রজ্বলিত চিতানলে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

সঙ্গের রাজ্যলাভ, বাবর কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ এবং সঙ্গের মৃত্যু।

পুত্রশোকে রাণা রায়মল অচিরেই ১৫৬৫ সংবতে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) জীবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গ দস্যুপতি করিমচাঁদের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছদ্মবেশে শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র চিতোরে আগমনপূর্ব্বক পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার শাসনগুণে প্রজামণ্ডলী তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার অধ্যবসায়গুণে মিবাররাজ্য উন্নতি ও গৌরবের উচ্চসোপানে সমুত্থিত হইয়াছিল। রাণা সঙ্গের রাজত্বকালে উত্তরে পীলাখাল, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, দক্ষিণে মালবরাজ্য এবং পশ্চিমে মিবারের দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারস্বরূপ প্রতীচ্য অচলশ্রেণী, মিবাররাজ্য এই চতুঃসীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সঙ্গের গুণানুরূপ অপর একটি নাম সংগ্রামসিংহ। তাঁহাকে ভট্টকবিরা সঙ্গ এবং মোগল ঐতিহাসিকেরা সিঙ্ক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আশ্রয়দাতা করিমচাঁদ সংগ্রামসিংহের হৃদয় হইতে বিস্মৃত হন নাই। বিপদে তিনি আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়া জামাতৃপদে বরণ করিয়া পরমসুখে রাখিয়াছিলেন, সংগ্রামের তাহা বিলক্ষণ স্মরণ আছে। পৈতৃকরাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি অজমীর প্রদেশ করিমচাঁদকে প্রদান করিয়া তৎপুত্র জগমল্লকে রাও উপাধি দান করিলেন।

ইতিবৃত্তপাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুরাজগণের মধ্যে কোনকালেই একতা ছিল না,

আর্য্যনৃপতিরা পরপ্রদেশের সুখদুঃখের সহিত সমবেদনা করিতে জানিতেন না, সেই জন্যই ভারত-ভূমিকে মধ্যে মধ্যে যবনের প্রচণ্ড পদাঘাত সহ্য করিতে হইত। যখন দিল্লী, বিয়ানা, কল্পী ও জৌনপুর, এই চারি প্রদেশের শাসনদণ্ড একাদিক্রমে চারি জন রাজার করবিলাসে চালিত হইতে লাগিল, রাণা সংগ্রামসিংহ তখন তাঁহাদিগকে নৃপতিমধ্যেই গণনা করিতেন না। তাঁহার বীরত্ব, অসীম প্রতাপ ও রণকৌশল দর্শনে ভীত হইয়া গোয়ালিয়র, অজমীর, রায়সেনা, কল্পী, বুন্দি, রাম-পুর, আবু, গাগ্রোণ প্রভৃতি প্রদেশের সামন্ত নৃপতিগণ চিরদিন অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া নিয়মিতরূপে কর প্রদান করিতেন। অধিক কি, যবনরাজেরাও সংগ্রামসিংহের ভয়ে মিবারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হন নাই। দিল্লী ও মালবের নৃপতিগণ অষ্টাদশবার তাঁহার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। বাকরোল ও ঘাটোলি নামক দুই স্থানে দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর সহিত সংগ্রামসিংহের দুই মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, দিল্লীশ্বরের সেনাদল দুই যুদ্ধেই দলিত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

রাণা সংগ্রামসিংহের যশোবিভায় সমগ্র প্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে, মিবাররাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ অবিচারিতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে, তাঁহার শাসনদণ্ড সর্ব্বত্র সমভাবে সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত হইতেছে, এমন সময়ে বিপুলবিক্রম মহাবীর বাবরের রণভেরী ভারতের পশ্চিমদ্বারে ঘোরনিঃস্বনে উদ্‌ঘোষিত হইল। যবননৃপতিরা মিবাররাজের প্রতাপে চারিদিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাবর তাঁহাদিগকে একত্র করিলেন, উত্তেজনা-বাক্যে তাঁহাদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, তাঁহাদিগের নিস্তেজ হৃদয়ও পুনর্ব্বার নবীন-বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল।

তুর্কীবংশে বাবরশাহের জন্ম। * পুরাণোক্ত শাকদ্বীপে জাক্ষবতীস নদীর উভয়তীরে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই স্থানে জিৎ-মহিষী ভূমিয়া বাস করিতেন। এই স্থান হইতেই জগতের নানা স্থানে গমন করিয়া জিৎগণ নানা রাজ্যের—নানা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বাবর শাহের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বর্ষ, তখন তিনি জাক্ষরতীস নদীতীরবর্ত্তী ফরগণা (কোকণ) প্রদেশের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কৈশোরবয়সেই তিনি স্বীয় বীরত্বের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহাকে কখনও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল, কখন বা রাজমুকুটশিরে রাজাসনে বসিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে হইয়াছিল। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া সিন্ধু নদের পর-পারে উপস্থিত হন। পঞ্জাব ও কাবুলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। এই প্রকার ঘটনাতরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়াই তিনি স্বরাজ্যত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আগমন করেন, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অভিযাত হন নাই।

সাত বর্ষ অতীত। ইব্রাহিম লোদী তখন দিল্লীর রাজদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন। আত্মো-ন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার জন্য বাবরশাহ দিল্লীশ্বরের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতিই প্রসন্না হইলেন। ইব্রাহিম রণভূমে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। সেনাদল ছিন্নভিন্ন

* ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, তক্ষকের বংশজাত যবনতুর্ক চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয়গণের চিরশত্রু, ভবিষ্যতে ভার-তের আধিপত্য তাহাদের হস্তগত হইবে। বাবর তুর্কবংশসম্ভূত; সুতরাং পুরাণোক্তি ইহা দ্বারা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল, বাবরের জয়পতাকা দিল্লীর প্রাসাদ-চূড়ায় সমুড্ডীন হইল। দৃঢ় অধ্যাবসায়, কঠোর সহিষ্ণুতা ও অসাধারণী উদ্যমশীলতার সাহায্যে তিনি ভারতভুমির মধ্যস্থলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

এক বর্ষ অতীত হইল। মিবারের উপর বিক্রমকেশরী বাবরশাহের দৃষ্টি পড়িল। অবিলম্বে সেনাসজ্জা করিয়া তিনি সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যাত্রা করিলেন। মিবাররাজের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিল। যবনসেনার আক্রমণ নিবারণার্থ তিনিও তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে, ১৫৮৪ সংবতে (১৫২৮ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিক মাসের পঞ্চম দিবসে বিয়ানার নিকটবর্ত্তী কহুয়া নামক স্থানে উভয়দলের সাক্ষাৎ হয়। অচিরেই ঘোর যুদ্ধ বাধিল; অল্পক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য যবনসেনা রণক্ষেত্রে শয়ন করিল; প্রচণ্ডবিক্রমী সংগ্রামসিংহের প্রতাপের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। যবনসেনার আর একটি প্রধান দল অনতিদূরে অবস্থিতি করিতেছিল, ভগ্নদূতমুখে অশুভ বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহারাও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল; সেনানিবেশের চতুর্দ্দিকে তাহারা পরিখাখনন করিতে আরম্ভ করিল।

বীরকেশরী বাবরশাহ মুহূর্ত্তের জন্য নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইলেন না; সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য তিনি নানা পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিলেন না। আর একটি বিশেষ কারণে তিনি মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা প্রাপ্ত হইলেন। তাতারগণের মধ্যে অনেকেই সেই সময় জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক জন জ্যোতির্বিদের গণনায় প্রকাশ পাইল, মঙ্গলগ্রহ তখন পশ্চিমদিকে অধিষ্ঠিত, যাহারা তাহার বিপরীত দিক্ হইতে আসিবে, তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই কথা শুনিয়া বাবরের হৃদয় ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িল।

চিন্তায় চিন্তায় এক সপ্তাহ অতীত। বাবরশাহ উপস্থিত বিপদ্‌নিবারণার্থ দৈবশক্তির সাহায্য কামনা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি সুরাপান করিতেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানার্থ তিনি চিরদিনের জন্য মাদক-সেবন পরিত্যাগ করিলেন। শিবিরমধ্যে যেখানে যে সকল সুরাভাণ্ড নেত্রগোচর হইল, তৎসমস্তই তিনি ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণের হৃদয় হতাশে অবসন্ন হইয়া পড়িল। বাবরের হৃদয়রাজ্যও নৈরাশ্যের অধিকৃত হইয়াছিল, ধৈর্য্যসহকারে তিনি মনোভাব গোপন করিয়া নানারূপ উৎসাহবাক্যে সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; তাহাদিগের ভগ্নহৃদয় ক্রমে ক্রমে আবার নবীন বলে—নবীন তেজে—নবীন উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেকের হস্তে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া বাবরশাহ তখন কহিলেন, "শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, হয় মস্তকে বিজয়-মুকুট ধারণ করিবে, নচেৎ রণক্ষেত্রেই মহাবীরত্ব দেখাইয়া বীরোচিত কার্য্যের নিদর্শন রাখিয়া ছারদেহ নিপাত করিবে।"

সকলেই স্বীকৃত হইল। শপথ করিয়া সকলেই উচ্চনাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অচিরেই রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মহাবীর বাবর রাজপুতগণের প্রতিকূলে রণযাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব হইতে বাবর কামানশ্রেণী একত্র রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে স্থলে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, সে স্থানও তাদৃশ নিরাপদ্ নহে; সুতরাং অচিরেই রাজপুতসেনাগণ মহাবিক্রমে উপস্থিত হইয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল। এই সময় বিজয়গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামসিংহও আলস্যের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই আলস্যদোষেই তাঁহার ভাবী সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। তাহার উপর

বিশ্বাসঘাতকের প্রবল বিশ্বাসঘাতকতা। এই উভয় কারণেই বীরকেশরী সংগ্রামসিংহের সমস্ত আশা-ভরসা বিনষ্ট হইয়া গেল।

পীলাখালের নিকট বাবর সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শিবিরবেষ্টিত পরিখা-মধ্যে কিছু দিন অবরুদ্ধ থাকিয়া বাবর একপ্রকার নিকত্তম হইয়া পড়িলেন; মিবাররাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য সমুৎসুক হইলেন। বাইমিন প্রদেশের অধিপতি তুয়ারবংশীয় শিলাইদী এই সন্ধিস্থাপনের মধ্যস্থ হইতে মীমাংসা হইল, দিল্লী ও তদন্তর্ভূত প্রদেশগুলি বাবরের অধীনস্থ থাকিবে। পীলাখাল উভয়রাজ্যের সীমারেখারূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। রাণাকে বাবর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিবেন। সন্ধিবন্ধনে এইরূপ স্থির হইল বটে, কিন্তু অবশেষে সে সন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না।

পুনরায় সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যবনের কামানশ্রেণীর অগ্নিময় গোলকাঘাতে শত শত ক্ষত্রিয়বীর রণভূমে শয়ন করিতে লাগিলেন। তথাপি অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়বীরেরা নিরুৎসাহ না হইয়া বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সমর-সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। বিপুল বিক্রমে বিপক্ষসৈন্য সংহার করিতে করিতে তাঁহারা যেমন অগ্রসর হইতেছেন, অমনি বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ শিলাইদী আপন অধীনস্থ সেনাদল সমভিব্যাহারে যবনরাজ বাবরশাহের পক্ষ অবলম্বন করিল। চিতোরেশ্বর সংগ্রামসিংহের আশা-ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সঙ্গরক্ষী সেনাদলপরিচালনের ভার তুয়ার শিলাইদীর উপর সমর্পিত ছিল। বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রতিফল দিল। যে সমস্ত বীর নৃপতি সংগ্রামসিংহের সাহায্যার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একে একে প্রায় সকলেই তাঁহারা যবনের হস্তে আত্মজীবন সমর্পণ করিলেন; সঙ্গ নিজেও ঘোরতর আহত। তাঁহার হৃদয়রাজ্যে নৈরাশ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। ভগ্নহৃদয়ে তিনি রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মিবারের পর্ব্বতমালার দিকে প্রস্থান করিলেন।

রণক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গে বাবরের জয়চিহ্নস্বরূপ কয়েকটি পিরামিড স্থাপিত হইল। সেই দিন হইতে তিনি জয়সূচক "গাজি" উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও পর্য্যায়ক্রমে এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে চিতোরে প্রত্যাগমন করিবেন, নচেৎ আর আসিবেন না। বীরের বীর-প্রতিজ্ঞা হৃদয় হইতে অপগত হয় নাই; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মিবারের পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সহোদর পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাদকালে তাঁহার একটি চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছিল, ইব্রাহিম লোদীর সহিত যুদ্ধ-কালে তাঁহার একটি বাহুও ছিন্ন হইয়া যায়, আর একটি যুদ্ধে গোলা লাগিয়া তাঁহার একটি পদও ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং চিরজীবনের জন্য তিনি খঞ্জ হইয়া রহিলেন। রাণা সংগ্রামসিংহ খর্ব্বা-কার হইলেও বীরত্বে রাজপুতজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বাবরের আন্তরিক ভক্তি ছিল; প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও তিনি সঙ্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করি-তেন, আন্তরিক ভয়ও করিতেন। গুণগ্রাহী বাবর গুণের প্রতি কখনই উদাসীন ছিলেন না।

রাণা সংগ্রামসিংহ দেশত্যাগী হইয়া প্রতিজ্ঞাপালন করিলেন বটে, কিন্তু মিবাররাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিলেন না। কি উপায়ে পুনরায় পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইবেন, দিবানিশি নিভৃতে বসিয়া সেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের আশা মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

আর তাঁহাকে অধিক দিন মরধামে অবস্থান করিতে হইল না। মিবারের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালার মধ্যে বুখা নামক স্থানে তিনি প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। জনরব, সঙ্গের নিষ্ঠুর মন্ত্রিগণ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ জনরব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যে স্থানে এই প্রসিদ্ধ বীরের দেহ ভস্মীভূত হইল, তাহার উপরিভাগে একটি স্মরণার্থ অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

রত্নের রাজ্যলাভ ও মৃত্যু, চিতোর-আক্রমণ, হুমায়ুন কর্ত্তৃক চিতোর উদ্ধার, বনবীরের অভিষেক এবং বিক্রমজিতের মৃত্যু।

সঙ্গের সাত পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় পুত্র অকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র রত্ন ১৫৮৬ সংবতে (১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজপুত-শরীরে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, রত্ন তৎসমস্ত গুণেই বিভূষিত ছিলেন। তেজস্বিতা, ধৈর্য্য, সাহস সমস্ত বীরগুণই তাঁহার দেহে বিরাজ করিত। তিনি দিল্লী ও মান্দুরাজ্যকে চিতোরের সিংহদ্বারস্বরূপ মনে করিয়া নগরীর তোরণদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতেন। তাঁহার এরূপ গর্ব্বিতভাব অধিকদিন স্থায়ী হইল না। অনর্থক বিবাদবিসংবাদে পরিচালিত হইয়া অনেক তেজস্বী রাজপুত যৌবনকালে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন; রত্নের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।

রাজ্যলাভের বহুদিন পূর্ব্বে রত্ন অম্বররাজ পৃথ্বীরাজের কন্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। কেহই এই গুপ্ত বিবাহের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। অম্বররাজকুমারীর রূপে বিমুগ্ধ হইয়া হরবংশীয় রাজা সূর্য্যমল্ল তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। যে দিন তিনি নবপত্নীকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, সেই দিনেই মহা অনর্থের সূত্রপাত হইল। গুপ্ত বিবাহের বিষয় সূর্য্যমল্ল অবগত ছিলেন না, সুতরাং তিনি কোন মতেই অপরাধী নহেন। লজ্জা ও অপমানের ভয়ে অম্বরকুমারীও গুপ্ত বিবাহের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে রাণা রত্নই সম্পূর্ণ অপরাধী। চিতোরসিংহাসনে অধিরোহণের পর সকলের সাক্ষাতে এই বিষয় জানাইয়া প্রকাশ্যরূপে তিনি সেই কুমারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিতেন; তাহা তিনি করিলেন না। অভিমানই তাঁহার পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। গূঢ় বিবাহবৃত্তান্ত অন্ধকারের গর্ভেই বিলীন রহিল। অম্বররাজকুমারী বহুদিন পর্য্যন্ত রত্নের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, রত্ন আসিলেন না, তাঁহাকে লইয়া গেলেন না। বিবাহকালে দম্পতির মধ্যে তরবারিবিনিময় হইয়াছিল, রত্ন সে তরবারিরও পুনর্বিনিময় করিলেন না, অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া সূর্য্যমল্লের করে আত্মসমর্পণ করিলেন।

সূর্য্যমল্লের ভগিনীর সহিত রাণার বিবাহ হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধবন্ধন থাকিলেও শ্যালককে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য রাণা রত্ন মনে মনে নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা বসন্তকালে উভয়ে অনুচর সমভিব্যাহারে মৃগয়া উদ্দেশে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি

লক্ষ্যীভূত মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে অনুচরগণকে পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে গহনবনে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানেই উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিল। জিগীষাপরবশ হইয়া উভয়েই উভয়কে সংহার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর পরস্পরের অসি-প্রহারে উভয়েই লীলাসংবরণ করিলেন। রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই রাণা রত্নের সমস্ত লীলার অবসান হইল।

কালস্বরূপ যৌবনকালের কুহকে পড়িয়া রাণা রত্ন অম্বরকুমারীর রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, গুপ্ত-বিবাহ করিয়া পরিশেষে বন্ধপত্নীকে গ্রহণ করিলেন না, পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইল। ১৫৯১সংবতে (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা বিক্রমাজিত চিতোরসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। যে সমস্ত গুণে অল্পবয়সেই রাণা রত্ন প্রজাপুঞ্জের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, বিক্রমের চরিত্রে তাঁহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হইল না। তিনি উদ্ধত, ক্রুদ্ধস্বভাব ও তেজস্বী ছিলেন. ক্ষমাগুণ তাঁহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। যে সকল সামন্ত-নৃপতি ও সর্দ্দারবংশীয় বীরগণ পুরুষানুক্রমে সম্মানসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত চিতোর-নৃপতিগণ কখনও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মানসম্ভ্রম-প্রদর্শন দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের পরামর্শগ্রহণ দূরে থাকুক, সভাতলের পূর্ব্বভাগে তাঁহারা অবস্থান করিতেন, রাণা বিক্রমাজিত তাহাও ভালবাসিতেন না।

পদাতিকসেনা রাজপুতবীরগণের বিশ্বাসে ঘৃণার পাত্র। বিপক্ষের দুর্গাদি অবরোধ করিবার সময়েই তাঁহারা পদাতিক সৈন্যের প্রয়োজন বিবেচনা করিতেন। রাণা বিক্রম সে প্রথার অনুসরণ করিলেন না। তিনি মল্লক্রীড়া ও অলীক যুদ্ধাভিনয় দর্শনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সামন্তনৃপতি-গণ ও সর্দ্দার বীরেরা আবহমানকাল হইতে যে সম্মান-গৌরব সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন, রাণা বিক্রম তাঁহাদিগের সেই সমস্ত মানসম্ভ্রম হরণপূর্ব্বক নিকৃষ্ট মল্ল ও পদাতিকগণকে সমর্পণ করিলেন। সম্মানের যোগ্যপাত্রেরা উপযুক্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হইলেন।

বিক্রমাজিতের অবিমৃষ্যকারিতা ও দুর্ব্ব্যবহারে রাজ্যমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। সামন্তগণ ও সর্দ্দারবীরেরা রাণার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। রাজ্যমধ্যে নানা বিঘ্ন ও নানারূপ দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া পার্ব্বত্যগণ চিতোরের দুর্গ-প্রাকারের নিকট হইতে অগণিত পশুপাল অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মিবাররাজ্যে বিষম সঙ্কট উপস্থিত।

পার্ব্বত্যগণকে দমন না করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। সর্ব্বদাই তাহারা নানা বিঘ্ন ও নানা বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিবে, রাজ্যে সুখশান্তি রক্ষা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া রাণা সামন্ত ও সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিয়া পার্ব্বত্যগণের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। কেহই স্বীকৃত হইলেন না, শ্লেষাক্ষরে সগর্ব্বে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয়তম পদাতিকগণ ও মল্লেরা থাকিতে আমাদিগকে আহ্বান করিবার কি প্রয়োজন? তাহাদিগকেই আজ্ঞাপালনে নির্দ্দেশ করুন।"

মিবারের রাণা পৃথ্বীরাজ মজাফরকে কারারুদ্ধ করিয়া সুলতানবংশের চিরকলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, চিতোররাজ্যের হৃদয়শোণিতপাতে সে কলঙ্করেখার অপনোদন করিবেন, গুর্জ্জরের বাহাদুরের এ সঙ্কল্প বহুদিন হইতেই হৃদয়মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত ছিল; উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত না হওয়াতে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। এখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত দেখিয়া বাহাদুর

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অচিরেই তিনি সৈন্যসামন্ত সুসজ্জিত করিয়া রাণার বিরুদ্ধে চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মান্দুরাজ-প্রেরিত সেনাদলও আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ মহাবিক্রমে যোগদান করিল।

এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাণা বিক্রমাজিৎ ভীত বা নিরুৎসাহ হইলেন না। আপনার সেনাদল লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহাদুরের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। বুন্দিপ্রদেশান্তর্গত লৈচা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি শিবিরসংস্থাপন করিলেন। বাহাদুরের বিপুল সেনাদলও অচিরে তাঁহার সম্মুখীন হইল। যেরূপ প্রণালীতে, যেরূপ কৌশলে, যেরূপ বীরত্বসহকারে পূর্ব্বপুরুষেরা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতেন, সেইরূপ প্রণালীতে, সেইরূপ কৌশলে এবং সেইরূপ বীরত্বসহকারে রাণা বিক্রমাজিৎ শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। গুর্জ্জররাজ বাহাদুর হীনসাহস নহেন, প্রচণ্ডবিক্রমে তিনিও রাণার সেনাদলকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। উভয়দলে ঘোর সংগ্রাম বাধিল; উভয়দলেই অসংখ্য অসংখ্য সেনা ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন ও হতাহত হইতে আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর চিতোর-সৈন্যগণ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতেছে দেখিয়া মিবারের সামন্ত ও সর্দ্দারবীরেরা সঙ্কটসময়ে রাণাকে পরিত্যাগ করিয়া চিতোরপুরী ও রাণা সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্রটিকে রক্ষা করিবার জন্য চিতোরনগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পদাতিকেরা আপন আপন হৃদয়-শোণিতদানে পণ করিয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু রাণাকে তাহারা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না।

পদাতিকগণের প্রতি অনুরাগপ্রদর্শন করিয়া রাণা বিক্রমাজিৎও সর্দ্দারগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, সঙ্কটসময়ে তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এখন এ ক্ষেত্রে রাণাকে উদ্ধার করিবে কে? এ সঙ্কটে উদ্ধারকর্ত্তা কে আছে?—আছেন, উদ্ধারকর্ত্তা একমাত্র জগদীশ্বর। যিনি মিবারকে মহাগৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় শত শতবার শত শত আক্রমণ হইতে মিবার পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, যাঁহার অনুগ্রহে চিতোররাজগণের পবিত্র মহিমা সর্ব্বত্র সকলের মুখেই কীর্ত্তিত হয়, সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই বিপদুদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন। চিতোরের চিরন্তন সম্মান ও গৌরব বিনষ্ট হয়, চিতোরের রাজসিংহাসন একজন ম্লেচ্ছ নৃপতির হস্তগত হয়, রাজস্থানের অন্যান্য রাজগণের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য অসংখ্য রাজপুত স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিলেন। ঝালোর-নৃপতি, আবুরাজ, শোণিগুরু, দেবর, সূর্য্যমল্লের পুত্রগণ প্রভৃতি রাজপুতবীরেরা রাজবারার চারিদিক্ হইতে বিপুলবিক্রমে আসিয়া রাণা বিক্রমাজিতের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মহাসমর উত্তরোত্তর মহাভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভট্টগ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, মধ্য-ভারতবাসী মুসলমান কর্তৃক যতবার চিতোর-নগর আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই আক্রমণটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম। এই যুদ্ধে বাহাদুরের পক্ষে লাব্রি খাঁ নামে একজন ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। তাহার নৈপুণ্যবলে বাহাদুর অনেকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় বিরুপর্ব্বতের নিকটে ভূগর্ভে একটি বৃহৎ সুড়ঙ্গ খনন পূর্ব্বক লাব্রি খাঁ তন্মধ্যে বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিল। তাহাতে চিতোরদুর্গের একটি প্রাকারের পঞ্চত্রিংশহস্ত-পরিমিত স্থান তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া পড়িল। সত্তু ও দুদু নামক চন্দাবৎবংশীয় দুটি বীরপুরুষ এবং রাও দুর্গা বহু সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সেই রন্ধ্রপথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্গপ্রবেশের ইচ্ছায় শত্রুগণ যেমন রন্ধ্রমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি রক্ষকদিগের

বীর্য্যাগ্নিতে পতিত হইয়া পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইল। একদল শত্রু নিপাত হয়, তৎক্ষণাৎ অন্য দল আসিয়া সেই স্থান অধিকার করে। ম্লেচ্ছের গগনবিদারী ভীমগর্জ্জনে চিতোরপুরী কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্রমশই উচ্ছ্বসিত সাগরতরঙ্গের ন্যায় প্রবলবেগে শত্রুকুলের বিপুল চণ্ডবিক্রম চিতোরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই যেন প্রলয়কালীন মহামেঘের ন্যায় শত্রুকুল চিতোর রাজ্যের চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। চিতোরের আশা আর নাই, চিতোর-রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া রাঠোরকুমারী রাজমহিষী জবহরবাই অস্ত্র-শস্ত্রে ও বর্ম্মে সুসজ্জিত হইয়া কতকগুলি প্রবলপরাক্রমশালী বীর সমভিব্যাহারে সেই ভীষণ সমর-সাগরে অবগাহন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই বিপক্ষের প্রধান প্রধান কতকগুলি বীর তাঁহার হস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিলেন। স্বদেশরক্ষার্থ শত্রুসাগরে ঝম্পপ্রদান করিয়া এই বীর-রমণী যেরূপ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন, ভবিষ্যতে আর কোন রমণী এরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। বহুক্ষণ ঘোরযুদ্ধে মহাপরাক্রম দেখাইয়া, অনেকগুলি ম্লেচ্ছবীরের মস্তক করবালচ্ছিন্ন করিয়া রাজকুমারী রাজমহিষী জবহরবাই রণক্ষেত্রেই অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

চিতোররক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। এখন সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্রটিকে লইয়াই সকলে চিন্তিত। কিরূপে শিশুটির প্রাণরক্ষা হইবে, কিরূপে সংগ্রামসিংহের একমাত্র বংশধর জীবিত থাকিবে, কিরূপে উপযুক্ত সময়ে পৈতৃকগুণের অধিকারী হইয়া সেই পুত্র মিবারের একাধিপত্য গ্রহণ করিয়া চিতোরের ভাগ্যলক্ষ্মী হস্তগত করিবে, এই চিন্তায় সামন্ত ও সর্দ্দারগণ একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। নিভৃতে বসিয়া সকলেই মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একমত দেখিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন, চিতোর-সিংহাসনে অন্য রাজা অভিষিক্ত হইয়া চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে আত্মোৎসর্গ না করিলে চিতোর রক্ষা পাইবে না। রাজবলির উদ্যোগ হইল। সূর্য্যমল্লের ধার পুত্র দেবলরাজ বাঘজী ক্ষণবিধ্বংসী রাজসম্মানলাভের প্রত্যাশী হইলেন। সকলের অনুমোদনে তাঁহার মস্তকে মিবারের রাজমুকুট পরিশোভিত হইল। সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্র উদয়সিংহকে সর্দ্দারগণ বুন্দিরাজ শূরতানের করে অর্পণ করিলেন।

এ দিকে শোকাবহ—ভয়াবহ জহরব্রতের আয়োজন হইল। বীরবর অর্জ্জুন-হারের ভগিনী রাজমাতা কর্ণবতী ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতললনা সঙ্গে লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ করিতে অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্ত পরেই ত্রয়োদশ সহস্র রমণীর আর কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। একসঙ্গে চিরদিনের জন্য তাঁহারা সকলেই অনন্তকালের গভীর উদরে তিরোহিত হইলেন।

ভগ্নপ্রাকারপথে অগণিত শত্রুকুল নদীস্রোতের ন্যায় চিতোরদুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। রন্ধ্রপথ রক্ষকশূন্য, কে আর তাহাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগ্নদ্বার রক্ষা করিবে? দুর্গের সিংহদ্বারসকল উন্মুক্ত হইল, চরম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, অমানুষিক সাহসে নির্ভর করিয়া, অবশিষ্ট বীরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেবলরাজ বাঘজী ক্রুদ্ধকেশরীর ন্যায় উন্মত্তভাবে সমর-সাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। অচিরেই তাঁহার শোণিতপানে শোণিতপিপাসু যবনের অসি অনুরঞ্জিত হইল। চিতোররক্ষার জন্য তিনি আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর শোণিতপিপাসার শান্তি করিলেন।

চিতোরের পথ, ঘাট, চত্বর সমস্তই শোণিতকর্দ্দমে পঙ্কিল হইয়া উঠিল। রাস্তার উপর কোন স্থানে মস্তকহীন কবন্ধ, কোথাও ছিন্নবাহু, কোথাও অশ্বমুণ্ড, কোথাও বা রাশি রাশি ভগ্নাস্ত্র

স্তূপীকৃত। চারিদিকেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। চিতোরের দুর্দ্দশা দেখিয়া, আর্য্যবীরগণের অকাল-পতন দেখিয়া অনেকে প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া বিষপাত্র-হস্তে জীবন-বিসর্জ্জনে উদ্যত হইল; কেহ কেহ বা সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া স্বহস্তে আপনার হৃৎপিণ্ডচ্ছেদনে সমুদ্যত। চিতোর-রক্ষার্থ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র রাজপুতবীর এই কালসময়ে জীবনবিসর্জ্জন করিলেন। চিতোর নগর শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। চিতোরের দুর্দ্দশা ও বীভৎসদৃশ্য দর্শনে বাহাদুরের কঠোরহৃদয় বিগলিত হইল।

এক পক্ষ অতীত। গুর্জ্জররাজ বাহাদুর এই পঞ্চদশ দিবস চিতোরে অবস্থিত। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল, বাবর-তনয় হুমায়ুন গুর্জ্জরপ্রদেশ অধিকার করিবার জন্য তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। আর কালবিলম্ব করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ গুর্জ্জররাজ বাহাদুরকে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে যাত্রা করিতে হইল।

ভট্টগ্রন্থে কথিত আছে, রাণী কর্ণবতীর অনুরোধে হুমায়ুন চিতোর-রক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কাজেই গুর্জ্জররাজের দ্বারা চিতোরের সর্ব্বনাশ ঘটিল; মহিষী কর্ণবতীর সহিত হুমায়ুন ধর্ম্মভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আবশ্যকমত সাহায্যদানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; এই জন্য রাজপুতগণ তাঁহাকে "রাখিবন্ধ ভাই" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন বা সঙ্কটে পড়িলে রাজপুত-মহিলারা মনোনীত বীরপাত্রের নিকট রাখি প্রেরণ করেন, তৎসঙ্গে তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রাতা অভিধান অর্পণ করিয়া থাকেন। হুমায়ুন-কেও এইরূপে কর্ণবতী ধর্ম্মভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। অবস্থানুসারে কোন মহিলা পশমের ডোর, কেহ বা মহার্ঘ্য রত্নমণ্ডিত হেমহারে রাখি নির্ম্মাণ করেন। রাখিবন্ধ ধর্ম্মভ্রাতাও আপন অবস্থানুসারে উহার প্রতিদানস্বরূপ সামান্য পশমনির্ম্মিত কিংবা বহুমূল্য মুক্তা ও স্বর্ণমণ্ডিত এক একটি কাঁচলী ধর্ম্মভগিনীর নিকট পাঠাইয়া দেন। বিপদে—সঙ্কটে—প্রয়োজনমত ধর্ম্মভগিনীকে ধর্ম্মভ্রাতা উদ্ধার করিতে আন্তরিক চেষ্টা করিবেন, ঐ কাঁচলী তাহারই প্রতিজ্ঞাবন্ধনের পরিচায়ক-স্বরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। মহাবীর হুমায়ুনও এইরূপ নিয়মে কর্ণবতীর নিকট ধর্ম্মভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

যথাকালে হুমায়ুন চিতোরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, চিতোরের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, শত্রুকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করা উচিত, এই অভিলাষে হুমায়ুন অচিরে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া গুর্জ্জরপ্রদেশ আক্রমণ করিলেন। অচিরেই পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া গুর্জ্জররাজ বাহাদুর স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। মান্দুরাজ বাহাদুরের সহায় হইয়াছিলেন, হুমায়ুন তদীয় রাজধানী অধিকারপূর্ব্বক রাণা বিক্রমাজিতকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গুর্জ্জররাজকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিলেন।

গুর্জ্জররাজ ও মান্দু-অধিপতি রাজ্যচ্যুত হইলেন। ঘোর বিপদ্‌রাশি বিদূরিত হইল। হুমায়ুনের সহায়তায় রাণা বিক্রমাজিত পুনরায় রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। গভীর বিপৎসাগরে পড়িয়াও বিক্রমের হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইল না, আবার তিনি অধীনবর্গের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। করিমচাঁদ তাঁহার পিতা সংগ্রামসিংহকে বিপদে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, করিমচাঁদ সংগ্রামসিংহের প্রতিপালক, বিপদে পরমসহায় ও একমাত্র বন্ধু। সেই পরমসুহৃৎ করিমচাঁদকে একদিন রাণা বিক্রম সভাস্থলে সকলের সমক্ষে গুরুতররূপে প্রহার করিলেন। রাণার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার ও বৃদ্ধ করিমের অবমাননা দর্শনে সমস্ত সর্দ্দারবীর সন্তপ্ত ও মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

রাণাকে পরিত্যাগ করাই তাঁহাদিগের দৃঢ়সঙ্কল্প হইল; রাজবাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছামত স্থলে প্রস্থান করিলেন।

ক্রুদ্ধ হইয়া যখন সভাতল হইতে সকলে প্রস্থান করেন, চন্দাবৎ-সামন্ত কানজী নামক এক জন প্রধান সর্দ্দার তখন সহচরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এত দিন আমরা কেবল পুষ্পের আঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমরা তাহার ফলভক্ষণে অধিকারী হইব!" অবমানিত ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ করিমচাঁদও সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "আগামী কল্যই ইহার সৌরভ জানিতে পারা যাইবে।"

অসংখ্য বিপদ্ ও অন্তরায় অতিক্রম করিয়া বিক্রমাজিত স্বীয় রাজদণ্ড পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু আপনার মূর্খতা ও কাপুরুষতাদোষে আবার চিরদিনের জন্য তাঁহাকে তাহাতে বঞ্চিত হইতে হইল; সর্দ্দারগণ অবমানিত হইয়া অবিলম্বে পৃথ্বীরাজের উপপত্নীগর্ভসম্ভূত পুত্র মহাবীর বনবীরের নিকট উপস্থিত হইলেন; তাঁহার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া তাঁহারা বনবীরকে চিতোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে অনুরোধ করিলেন। সে প্রস্তাবে বনবীর প্রথমে সম্মত হইলেন না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মিবারের গৌরবসমৃদ্ধির প্রতিবিম্ব তাঁহার মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইবামাত্র তিনি সর্দ্দারগণের অনুরোধে সম্মতিপ্রদান করিলেন। অচিরেই চিতোরের রাজসিংহাসনে তিনি অধিরোহণ করিলেন, অচিরেই মিবারের রাজমুকুট ও শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি বিরাজ করিতে লাগিল।

দশম অধ্যায়

—o—

উদয়সিংহের রাজ্যলাভ, বনবীরের রাজ্যচ্যুতি, ভোঁশলাদিগের বৃত্তান্ত এবং আকবরের জন্ম।

হতভাগ্য অদূরদর্শী মূর্খ বিক্রমাজিত পদচ্যুত হইয়া চিতোরের রাজপরিবারের মধ্যেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দারুণ মনোবেদনায় দিন দিন তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্র উদয়সিংহের বয়ঃক্রম তখন ছয়বর্ষমাত্র। উদয়সিংহকে চিরদিনের জন্য রাজ্যোপাধি হইতে বঞ্চিত রাখিবেন, এ অভিপ্রায়ে সর্দ্দার-সামন্তগণ বনবীরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। উদয়সিংহের শৈশবাবস্থা, তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে কেবলমাত্র রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন, এই অভিপ্রায়েই পরামর্শ করিয়া তাঁহারা বনবীরের হস্তে মিবারের শাসনদণ্ড সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বনবীর যে সমস্ত সদ্গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন, সিংহাসনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেই সদ্গুণাবলী একেবারে তিরোহিত হইল। সর্দ্দার-সামন্তগণের যে অনুরোধ প্রথমে তিনি পালন করিতে সম্মত হন নাই, এখন তাহাই তিনি কল্যাণময় বরস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। চিরদিনের জন্য চিতোররাজ্য যাহাতে তাঁহার হস্তগত থাকে, নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে

তিনি যাহাতে আজীবন চিতোরের সুখসম্ভোগ করিতে পারেন, তাহার উপায় করাই এখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। উদয়সিংহ জীবিত থাকিলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে না, পদচ্যুত বিক্রমাজিতও জীবিত, এই দুইটি বিষমকণ্টক জন্মের মত উন্মূলিত না হইলে তাঁহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অচিরে বিক্রমাজিত ও উদয়সিংহের প্রাণহরণ করিতেই বনবীর কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দিবাভাগ অতীত। সন্ধ্যা সমাগত। রজনীর ঘোর অন্ধকার সমস্ত জগৎ গ্রাস করিল। পানভোজন সমাপনান্তে উদয়সিংহের শিয়রে বসিয়া ধাত্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, ইত্যবসরে অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়া ধাত্রীকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। এমন সময় অন্তঃপুরচারী ক্ষৌরকার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, বনবীর রাণা বিক্রমাজিতকে সংহার করিয়াছেন। মর্ম্মভেদী শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া ধাত্রীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে নিরতিশয় শঙ্কাও সেই উদ্বেলিত হৃদয়সাগর অধিকার করিল। বুদ্ধিমতী ধাত্রীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ ধারণা হইল, কেবলমাত্র বিক্রমাজিতের প্রাণবধ করিয়াই যে নররাক্ষস বনবীরের জিঘাংসার শান্তি হইবে, ইহা অসম্ভব, সে অবিলম্বে উদয়সিংহের প্রাণ-সংহারের জন্যও উপস্থিত হইবে। রাজকুমারের প্রাণ-রক্ষার জন্য ধাত্রীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কক্ষমধ্যে একটি প্রশস্ত পুষ্পকরণ্ডিকা ছিল, ধাত্রী তন্মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে শয়ন করাইয়া তদুপরি কতকগুলি পুষ্পবিল্বপত্রাদি আচ্ছাদন করিল; ক্ষৌরকারের হস্তে করণ্ডিকাটি দিয়া বৃদ্ধা বলিয়া দিল, "অবিলম্বেই ইহা লইয়া দুর্গের বাহিরে যাও।"

ক্ষৌরকার তাহাই করিল। কিছুমাত্র তর্কবিতর্ক না করিয়া সে সেই মুহূর্ত্তে ধাত্রীর উপদেশ পালন করিল। ধাত্রী এ দিকে রাজকুমারের শয্যায় আপনার নিদ্রিত শিশুপুত্রটিকে স্থাপনপূর্ব্বক যেমন বহির্গমনের উদ্‌যোগ করিতেছে, অমনি ভীমবেশে ভীমমূর্ত্তি বনবীর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধাত্রীকে সম্মুখে দেখিবামাত্র তিনি উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধার প্রাণ উড়িয়া গেল, মুখে একটিমাত্রও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে রাজকুমারের শয্যা দেখাইয়া দিল।

নৃশংস বনবীর তৎক্ষণাৎ শাণিত ছুরিকাঘাতে ধাত্রীনন্দনের বক্ষঃপ্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সম্মুখে প্রাণপুত্রের সুকোমল হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইল, বৃদ্ধা একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতেও পাইল না; সন্তপ্তহৃদয়ে দুঃসহ বেদনা হৃদিমধ্যে নিহিত রাখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইল; উদয়সিংহের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ দুর্গের বাহিরে প্রস্থান করিল। বনবীরের নিষ্ঠুরাচরণে সংগ্রামসিংহের বংশলোপ হইল ভাবিয়া অন্তঃপুরললনারা আর্ত্তনাদে অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন।

ধাত্রীর এইরূপ অত্যদ্ভুত আত্মত্যাগ মহোচ্চহৃদয়ের পরিচায়ক, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আপনার পুত্রকে কালমুখে অর্পণ করিয়া রাজকুমারের প্রাণরক্ষা করা, সামান্যা পরিচারিকা কখনও এরূপ উচ্চহৃদয়ের পরিচয় দিতে পারে না। বস্তুতঃ ধাত্রী নীচকুলোদ্ভবা রমণী নহে, রাজপুতকুলে তাহার জন্ম;—নাম পান্না।

চিতোরের পশ্চিমপ্রান্তে বীরানাম্নী একটি ক্ষুদ্র নদী। বিশ্বাসী ক্ষৌরকার করণ্ডিকা সহ রাজকুমারকে লইয়া সেই বীরাতীরে একটি নিভৃতস্থলে পান্নার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। সৌভাগ্যের বিষয়, তখন পর্য্যন্তও রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। পান্না উপস্থিত হইবামাত্র উভয়ে পরামর্শ করিয়া

দেবলরাজ সিংহরাওয়ের নিকট উপস্থিত হইল। সিংহরাও মহাবীর বাবজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। বনবীরের ভয়ে দেবলরাজ রাজকুমারকে আশ্রয়দানে সম্মত হইলেন না। অগত্যা পান্না রাজকুমারকে লইয়া ডুঙ্গরপুরের রাওয়াল ঐশকর্ণনামা সামন্তনৃপতির নিকট উপস্থিত হইল, সে স্থলেও অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। কতিপয় পার্ব্বত্য ভীলগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বুদ্ধিমতী ধাত্রী সেই বন্ধুর উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া একটি গিরিদুর্গে গমন করিল, বনবীরের ভয়ে সে দুর্গপতিও উদয়সিংহকে আশ্রয়দানে সম্মত হইলেন না। অবশেষে বৃদ্ধা কমলমীরপ্রদেশের কুম্ভমেরু-দুর্গে উপস্থিত হইল। আশা-শা নামক জৈনধর্ম্মাবলম্বী বীর তৎকালে তত্রত্য শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন; বনবীরের ভয়ে তিনিও রাজকুমারকে আশ্রয়দানে অসম্মত হইলেন। আশা-শার দয়াবতী জননী সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন, পুত্রের এই ব্যবহার দর্শনে তিনি বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, পরিশেষে কহিলেন, "তুমি মিবাররাজ্যের সামন্ত নৃপতি; উদয়সিংহ তোমার প্রভুর পুত্র; ইহাকে রক্ষা করিলে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; এই পুণ্যফলে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।" জননীর আদেশ আশা-শাকে শিরোধার্য্য করিতে হইল, আপনার ভাগিনেয় পরিচয় দিয়া রাজপুত্রকে তিনি কুম্ভমেরুদুর্গে রক্ষা করিলেন। পাছে অপরিচিতা রাজপুতরমণী দর্শনে লোকের মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, এই আশঙ্কায় পান্না এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না; আশা-শার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত উদয়সিংহের শরীরেও দিন দিন তেজস্বিতার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। তিনি যে আশা-শার প্রকৃত ভাগিনেয় নহেন, তদীয় তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া সকলেই তাহা এক প্রকার অনুমান করিয়া লইল। একদিন আশা-শার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন, পরিবেশকেরা খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিতেছে, ইত্যবসরে উদয়সিংহ এক জন পরিবেশকের হস্ত হইতে দধিভাণ্ড কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন। উভয়ে ঘোর কলহ আরম্ভ হইল। অনেকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ভয়ও দেখাইলেন, উদয়সিংহ কিছুতেই দধিভাণ্ড পরিত্যাগ করিলেন না; দধিভাণ্ড কাড়িয়া লইয়া আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। আর একটি ঘটনায় তাঁহার গূঢ় পরিচয় এক প্রকার প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কিছু দিন পরে আশা-শার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শোণিগুরু-সর্দ্দার কমলমীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ উদয়সিংহ নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজকুমারের তেজস্বিতা, উচ্চ ও উদারভাব এবং মর্য্যাদাপ্রদর্শন প্রভৃতি দর্শনে শোণিগুরুর মনে সন্দেহের উদয় হইল। রাজপুত ভিন্ন আশা-শার ভাগিনেয় কদাচ এরূপ বীর্য্যবত্তা ও তেজস্বিতার আধার হইতে পারে না। জনশ্রুতি শতকণ্ঠ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ রাজপুতানার চারিদিকে ঘোষণা করিল। ক্রমশঃ উদয়সিংহের প্রকৃত পরিচয় রাজবারার সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শুভসংবাদ পাইয়া মিবারের চতুর্দ্দিক্‌বাসী সামন্ত ও সর্দ্দারগণ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। উদয়সিংহকে অভিনন্দন করিবার জন্য শত শত বীর নবোৎসাহে কমলমীরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ধাত্রী পান্না ও সেই ক্ষৌরকার পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তান্ত সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিল।

সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। আশা-শা সেই দিনেই কমলমীর-দুর্গে একটি মহতী সভা আহ্বান করিলেন। বহুসংখ্যক রাজপুতবীর, সামন্ত-নৃপতিগণ ও সর্দ্দার-বীরেরা যথাযোগ্য আসনে উপবেশন

করিলে, আশা-শা কোতারিও চৌহানের ক্রোড়ে উদয়সিংহকে সমর্পণ করিলেন। উদয়সিংহের জীবনীর সমস্ত ঘটনাই কোতারিও সবিশেষ অবগত ছিলেন। রাজপুত্র-সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ সন্দেহ না রাখেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি কুমার উদয়সিংহের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলেন। সংগ্রামসিংহের পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া তখন সকলেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মিবারের প্রধান প্রধান সামন্তেরা সেই কমলমীরদুর্গের সভাতেই সর্ব্বসমক্ষে উদয়সিংহের ললাটে চিতোরের রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

যে দিন মালবরাজের বিধবা কন্যার সহিত হামিরের বিবাহ হয়, বিধবাবিবাহরূপ পাপকলঙ্কে যে দিন শিশোদীয়কুল কলঙ্কিত হয়, সেই দিন—সেইমুহূর্ত্তে হামির একটি কঠোরবিধির বিধান করিয়াছিলেন। সেই বিধির কঠোরনিয়মে শোণিগুরুবংশের সহিত শিশোদীয়কুলের বৈবাহিক-বন্ধন বিলুপ্ত হয়। এত দিন সেই বিধি সমভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু আর সেই বিধি থাকিল না, এত দিনের পর সে বিধি ভঙ্গ হইয়া গেল। শোণিগুরু রাও প্রমার উদয়সিংহের করে কন্যাসমর্পণ করিলেন।

এ দিকে রাজ্যাপহারক দুর্দ্দান্ত বনবীর দিন দিন অশান্ত ও ক্রূরমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। দাসীগর্ভজাত হইয়া বনবীর চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, চিতোরের শুদ্ধজাত সম্ভ্রান্ত নৃপতিগণের যোগ্যসম্মান প্রাপ্ত হইবেন, মনে মনে তাঁহার এই ধারণা ছিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সেরূপ সম্মান করিল না।

রাজপুতরাজগণের ভুক্তাবশেষের নাম দুনা। কেহ কেহ ইহাকে দুয়া শব্দেও অভিহিত করেন। যে সমস্ত সর্দ্দার রাজসমক্ষে ভোজন করিবার অধিকারী, তাঁহারাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ দুনা (রাজ-প্রসাদ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দুনা-প্রাপ্তি সর্দ্দারগণের পক্ষে সম্মানের চিহ্ন। অপরে রাজযোগ্য সম্ভ্রম প্রদান না করিলেও নিজদর্পে দর্পিত হইয়া বনবীর একদিন চন্দাবৎ-নামা এক জন রাজপুত-বীরকে দুনা ভক্ষণ করিতে অনুমতি করিলেন। দাসীপুত্রের উচ্ছিষ্টসেবন করিতে হইবে, এই আদেশ শুনিয়া চন্দাবৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বাপ্পার পবিত্রবংশধরের দুনা পাইলে সগৌরবে মস্তকোপরি ধারণ করিতাম; শীতলসেনী-নাম্নী দাসীর গর্ভজাত সন্তানের প্রসাদ কদাচ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।"

বনবীরের প্রতি সর্দ্দারগণের বিরাগ জন্মিল। এ দিকে কমলমীরে সংগ্রামসিংহের পুত্র মহাতেজা উদয়সিংহও মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন, সমস্ত ঘটনাই বনবীরের শ্রবণগোচর হইল, নৈরাশ্যের তীব্রযন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। স্বহস্তে নরহৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া তিনি সুখের আশা করিয়াছিলেন, সকল আশাই ফুরাইল। অনুতাপানলে তিনি দিবানিশি দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

চন্দাবতের অবমাননা করাতে বনবীর সর্দ্দারগণের বিষম বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িলেন। সকলেই তাঁহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। কিসে বনবীরের অনিষ্ট সাধিত হইবে, কিসে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে, কিরূপে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া চিতোরসিংহাসনে উদয়সিংহকে অভিষিক্ত করিবেন, সেই জন্য তাঁহারা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া সদুপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে বনবীরের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহারা আরাবল্লীর দুর্গম পার্ব্বত্যপথ দিয়া কমলমীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র পশ্চাদ্‌ভাগে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। চমকিত ও বিস্মিত হইয়া সকলেই দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে পাঁচ শত অশ্ব ও দশ সহস্র বৃষ সমভিব্যাহারে প্রায় সহস্র রাজপুত তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অশ্ব ও বৃষভগণের পৃষ্ঠে গুরুভার পণ্যদ্রব্য আরোপিত। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল; বনবীরের কন্যার যৌতুকস্বরূপ ঐ সকল দ্রব্য কচ্ছদেশ হইতে চিতোরে আনীত হইতেছে।' পরিচয় পাইয়া মিবার-সর্দ্দারগণের হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইল। কৃষ্ণকেশরিবিক্রমে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সেই সমস্ত রাজপুতবীরকে আক্রমণ করিলেন, সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিলেন, অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। উদয়সিংহের বিবাহোৎসবের উপঢৌকনস্বরূপে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী তৎক্ষণাৎ কমলমীরে প্রেরিত হইল। সর্দ্দারগণও অবিলম্বে কমলমীরদুর্গে উপস্থিত হইলেন। মাহোলী ও মালজী নামক দুই জন শোণানৃকি-সর্দ্দার ব্যতীত রাজস্থানের সমস্ত নৃপতি, সামন্ত ও সেনানীগণ উদয়সিংহের বিবাহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কুক্ষণে দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া মাহোলী ও মালজী কমলমীরে বিবাহোৎসবে যোগদান না করিয়া বনবীরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সর্দ্দারবীরগণ সেই দুই রাজদ্রোহীকে উপযুক্ত শাস্তি-প্রদানার্থ তাহাদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অচিরে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। আশ্রিত মিত্রদ্বয়ের প্রাণরক্ষার জন্য বনবীর স্বয়ং তরবারি ধারণ করিলেন; কিন্তু বন্ধুদ্বয়ের প্রাণরক্ষা করিয়া আপনার বীরত্ব-প্রদর্শনে সমর্থ হইলেন না। মালজী সেই যুদ্ধে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, মাহোলী পরাজিত হইয়া সর্দ্দারগণের শরণাগত হইলেন।

নিঃসহায়, নিঃসম্বল, আত্মীয়স্বজনপরিত্যক্ত ও অনন্যোপায় হইয়া বনবীর চিতোরের তোরণ-দ্বার অবরোধপূর্ব্বক নগরমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে তদীয় মন্ত্রীর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া উদয়সিংহের এক সহস্র বিপুলবিক্রম সৈন্য নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গরক্ষকদিগকে সংহার করিতে লাগিল। অবিলম্বেই উদয়সিংহের বিজয়বৈজয়ন্তী দুর্গচূড়ায় সমুড্ডীন হইল। বনবীরের প্রাণসংহারে কেহই ইচ্ছা করিলেন না। আপন ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া বনবীর মিবার-রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। সেই প্রদেশেই তাঁহার বংশ বিস্তৃতি-প্রাপ্ত হয়। নাগপুরের ভোঁশলাগণ তাঁহারই বংশের একটি শাখা।

আনন্দোৎসবে চিতোরনগর আনন্দময়। উদয়সিংহের মাঙ্গলিক অভিষেক উপলক্ষে রাজপুত-ললনাগণ চারিদিকে আনন্দসঙ্গীতগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপুত-রমণীরা সেই সময়ে যে সকল গীত গান করিয়াছিলেন, আজিও প্রতিবর্ষে ঈশানী-পূজোৎসবে সেই সমস্ত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ১৫৫৭ সংবতে (১৫৪১-২ খৃষ্টাব্দে) উদয়সিংহ চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মিবারের রাজমুকুট এত দিনের পর সংগ্রামসিংহের পুত্রের মস্তকে শোভিত হইল।

বিক্রমাজিতের অদূরদর্শিতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ও প্রমত্ততায় চিতোরের মহা অনর্থ ঘটিয়াছিল, উদয়সিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সকল অনর্থের নিরাস হইয়া পুনরায় চিতোর উন্নতি-সোপানে আরূঢ় হইবে, এই অভিলাষে সামন্ত ও সর্দ্দারগণ নানা উপায়ে বনবীরকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, প্রফুল্লচিত্তে কুমার উদয়সিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার ভবিষ্য-মঙ্গলের আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত আশাই বিলুপ্ত হইয়া গেল। মিবারের দুর্ভাগ্যবশতই উদয়সিংহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার ন্যায় কাপুরুষ শিশোদীয়কুলে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে সমস্ত গুণ রাজার অলঙ্কার, উদয়সিংহ তাহার একটিমাত্রেরও

অধিকারী ছিলেন না। অধিক কি, তাঁহাকে অপদার্থ, পুরুষার্থশূন্য, রাজপুতকুলাঙ্গার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাজগুণপরিশূন্য উদয়সিংহ হীনপুরুষ হইয়াও একপ্রকার আলস্যে ও বিলাসিতায় ছারজীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে তাহা ঘটিল না। যাঁহার সমস্ত তেজোবহ্নি এক সময়ে সমস্ত ভারতভূমি পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, যাঁহার কঠোর দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া হিন্দু-জাতি বহুদিন পর্য্যন্ত সে নিগড়বন্ধনমোচনে সমর্থ হন নাই, এক সময়ে সমস্ত ভারতভূমির অদৃষ্টচক্র যাঁহার ভ্রূবিলাসে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, ভারতের দুর্ভাগ্যবশে মরুপ্রান্তরের একটি ছায়াকাননমধ্যে সেই মহাপুরুষ রাজকুমার আক্‌বর জন্মগ্রহণ করেন। এই শিশু একসময়ে রাজকুলচূড়ামণি হইয়া সমগ্র ভারতভূমির শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

হুমায়ুনের মৃত্যু, আক্‌বরের রাজ্যলাভ, তৎকর্তৃক চিতোর আক্রমণ, উদয়পুর-প্রতিষ্ঠা এবং উদয়সিংহের মৃত্যু।

আক্‌বরের যখন জন্ম হয়, তাঁহার পিতা হুমায়ুন তখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অমরকোটের পর্ব্বতারণ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিংহাসনে অধিরোহণের পর সহোদরগণের সহিত অন্তর্ব্বিবাদে জড়ীভূত থাকিয়া প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যার-পর-নাই বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুমায়ুন রাজসম্মানে সম্মানিত, তাঁহার সহোদরেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের অধিকারী, স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষাবশে কাজেই তাহারা হুমায়ুনের রাজসম্মান অপহরণে অভিলাষী হইল; কিন্তু তাহাদিগের সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; পাঠানবংশীয় মহাবীর সেরশাহ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনার একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। সেরশাহের প্রভুত্ব কিছুদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ রহিল।

দুর্দ্দান্ত বৈরী কর্ত্তৃক উপক্রুত হইয়া হুমায়ুনকে কত লাঞ্ছনা, কত যন্ত্রণা ও কত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইতিবৃত্তই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ. কনোজের কালসমরে পরাজিত হইয়া যে দিন তিনি পলায়ন করিলেন, যে দিন তাঁহার মস্তক কিরীটশূন্য ও রাজাসন অপরের অধিকৃত হইল, সেই দিন হইতেই দুর্দ্দান্ত বৈরী নিরন্তর তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীমমূর্ত্তিতে আক্রমণ করিতে লাগিল। তিনি যেখানে যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান হইতেই প্রবল বৈরী তাঁহাকে দূরীভূত করিল। এই প্রকার নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া তিনি আগরা হইতে লাহোরে পলায়ন করিলেন, কেহই আশ্রয়দান করিল না। পরিশ্রান্ত পরিবারবর্গ ও কতিপয় বিশ্বস্ত সেনা সমভিব্যাহারে তিনি একে একে অনেকগুলি হিন্দু-নরপতির নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কেহই আশ্রয় দিলেন না।

ভগ্নমনোরথ হইয়া হুমায়ুন সিন্ধুপ্রদেশে গমন করিলেন। মূলতান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত সিন্ধুনদকূলবর্ত্তী দুর্গগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি অনেকবার চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য্য হইতে

পারিলেন না। যে কতিপয়মাত্র সৈন্য এত দিন তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল, তাহারাও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। অগত্যা তিনি পথিমধ্যে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গসহ তথা হইতে পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণ নিরাশ্রয় হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল, আশ্রয়লাভের জন্য কত লোকের শরণপ্রার্থী হইল, কেহই আশ্রয় প্রদান করিলেন না। কতকগুলি সৈন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল; কেহ কেহ শত্রুমুখে পতিত হইয়া অনন্তকালের জন্য জীবনের সমস্ত যন্ত্রণার উপশম করিল।

চিন্তার মর্ম্মভেদী দংশনে হুমায়ুন একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। যশল্মীর, যোধপুর, ভটি একে একে তিনি সমস্ত প্রদেশের নৃপতিগণের করুণা প্রার্থনা করিলেন, কেহই আশ্রয় দান করিলেন না। কুটিলহৃদয় মালদেবের নিকট গমন করিলে তিনি আশ্রয়দানচ্ছলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন, সুবিচক্ষণ হুমায়ুন সেই দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক মরুস্থলীতে উপস্থিত হইলেন। ছায়াকুঞ্জবিহীনা বিশাল মরুভূমির ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কোমলাঙ্গী সঙ্গিনী অঙ্গনাগণ একান্ত ভীত ও কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহাদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। যে দিকে নেত্রপাত করেন, সেই দিকেই হুমায়ুনের নয়ন-সমক্ষে ভীষণ বিপদ্‌রাশির হৃদয়স্তম্ভন চিত্র। অলৌকিক সহিষ্ণুতা সহকারে তিনি সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে অমরকোটের সোদারাজ রাণার প্রাসাদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

যে আশার কুহকে বিমুগ্ধ হইয়া হুমায়ুন এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, সেই আশাই আবার মোহিনী মূর্ত্তিতে তাঁহার নেত্রসম্মুখে উপস্থিত হইল। অচিরেই অমরকোট পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হুমায়ুন জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাহার উৎকর্ষসাধনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চেষ্টা করেন নাই। আকবরও পিতার নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তরুণবয়সেই তাহাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া ক্রমাগত দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত হুমায়ুন বিপদের সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখন তিনি সমস্ত বিঘ্নবাধার মস্তকে পদাঘাত করিয়া গান্ধারদেশে বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, কখন কাশ্মীরচূড়ায় বিজয়কেতন তুলিয়া দিয়াছেন, কখন বা বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মভূমি তাতারে পলায়ন করিয়াছেন, কখন বা সংগ্রামে পরাভূত হইয়া পারস্যরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অদৃষ্টের প্রতিকূলতরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এই প্রকারে তাঁহাকে অসংখ্য ঘোরতর আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে, সহিষ্ণুতাগুণে সমস্তই তিনি সহ্য করিয়াছিলেন।

এই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে ছয়জন পাঠানবংশধর পর্য্যায়ক্রমে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এই ছয়জনের মধ্যে সেকন্দর শাহই শেষরাজা। হুমায়ুন কাশ্মীরে অবস্থিতি করিয়া অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এ দিকে তাঁহার সৌভাগ্যবশে সেকেন্দর শাহ গৃহবিবাদে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। এই গৃহবিবাদেই তাঁহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইলে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া হুমায়ুন সিন্ধুনদ পার হইয়া স্বকীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে শরহিন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; সেই স্থানে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইল।

অবিলম্বেই হুমায়ুনের বীরোন্মাদিনী রণভেরী বাজিয়া উঠিল। অনর্থকর গৃহবিবাদে জড়ীভূত হইয়া সেকন্দর শাহ আপনিই আপনার কালকে আক্রমণ করিয়াছেন, এত দিনে তাহা বুঝিতে

পারিলেন। কালবিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ তিনি সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে হুমায়ুনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তরুণবীর আক্‌বরের উত্তেজনাতে অবিলম্বে উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। আক্‌বর কৈশোরেই পিতার নিকট রণচর্য্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া অনুকূল প্রতিকূল উভয়পক্ষীয় বীরেরাই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আক্‌বরের মহাবিক্রমে বিপক্ষসৈন্যেরা মথিত, বিদলিত ও ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। অধিকক্ষণ রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তাহারা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় আক্‌বর সমরক্ষেত্রে এইরূপ মহাবীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। "আক্‌বরের জয়—আক্‌বরের জয়" এই জয়নাদে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আক্‌বরের পিতামহ মহাবীর বাবরশাহও এইরূপ সুকুমারবয়সে শত্রুকুলের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ফরগণার পৈতৃকসিংহাসন অটল রাখিয়াছিলেন। সেই বংশের কুলপ্রদীপ আক্‌বর শাহ যে তরুণ-বয়সে মহাবীরত্বের অধিকারী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

উপযুক্ত বীর পুত্রের সাহায্যে মহাসমরে জয়লাভ হইল. বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু আর অধিক দিন তিনি সেই সৌভাগ্য উপ-ভোগ করিতে পারিলেন না, দিল্লীর পুস্তকাগারের শিরোমঞ্চ হইতে নিপতিত হইয়া অচিরেই তিনি লোকলীলা সংবরণ করিলেন।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আক্‌বর পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশে অল্পদিনের মধ্যে দিল্লী ও আগরা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল, অগত্যা তিনি পঞ্চনদ-প্রদেশের একপ্রান্তে গিয়া সাম্রাজ্যস্থাপন করিলেন। অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে অচিরেই আবার তাঁহার প্রতি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নদৃষ্টি নিপতিত হইল। মহাতেজা বৈরাম খাঁর সাহায্যে তিনি শত্রুকুল বিতাড়িত করিয়া পুন-রায় দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিলেন। স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভাবলে অচিরেই তিনি আপন আধিপত্য অচলবৎ অটল করিয়া তুলিলেন। ক্রমে ক্রমে কল্পী, চন্দারি, কলিঞ্জর ও বুন্দেলখণ্ড-প্রদেশ তাঁহার অধিগত হইল। অষ্টাদশবর্ষবয়ঃক্রমেই তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়া উঠিলেন; ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহার মহত্ব ও বীরত্ব প্রচারিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া হুমায়ুন যখন মালদেবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হন, মালদেব তখন আশ্রয়দানব্যপদেশে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘটনাসূত্রে অনেক দিন পরে সেই কথা আক্‌বরের শ্রুতিগোচর হয়। এই সময় পিতৃবৈরিনির্য্যাতনার্থ জিগীষা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল; অবিলম্বেই তিনি বিপুলসেনা সম-ভিব্যাহারে রাঠোরের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

মারবারের অন্তর্গত মৈরতা একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। প্রথমেই মৈরতা মহাবীর আক্‌বরের অধিকৃত হইল। তরুণবয়সে আক্‌বরের মহাবীরত্ব দর্শনে অম্বররাজ ভরমল ও তৎপুত্র ভগবান্‌দাস অত্যন্ত শঙ্কিত ও ভীত হইয়া উঠিলেন। অচিরেই তাঁহারা পিতাপুত্রে আক্‌বরের শরণা-গত হইয়া অধীনতা-নিগড়ে বদ্ধ হইলেন। অম্বররাজের কন্যাও আক্‌বরের করে সমর্পিতা হইল। অম্বরপতি আক্‌বরের শরণাগত হইলেন সত্য, কিন্তু অচিরেই অধীনতা তাঁহার পক্ষে দারুণ যন্ত্রণাময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিরূপে অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদন করিবেন, অহর্নিশি তাহারই উপায়-চিন্তনে নিরত থাকিলেন।

ইত্যবসরে আক্‌বরের অধীনস্থ উজবেক সেনানীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই সূত্রে তখন সম্রাট্ চিতোর আক্রমণে অবসর প্রাপ্ত হইলেন না; বিদ্রোহী সেনানীগণের মধ্যে শান্তিস্থাপনার্থ তাঁহাকে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে হইল। দৃঢ় অধ্যবসায়ে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত বিশৃঙ্খলার শান্তিবিধান করিলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, মালবের পদচ্যুত রাজা এবং নরবরপতি চিতোররাজ্যে আগমন করিয়াছেন, চিতোররাজ সযত্নে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া আপদ্-বিপদে সাহায্য করিবেন আশা দিয়াছেন, আক্‌বরের হৃদয়ে ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, অচিরেই তিনি চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

যে রাজার গুণে সমগ্র প্রজাপুঞ্জ উন্নতিসোপানে আরূঢ় হয়, সেই রাজাই প্রকৃত রাজপদবাচ্য। অনর্থকর মোহ ও ষড়রিপু পরিত্যাগপূর্ব্বক যে রাজা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুসরণে রাজ্যপালন করেন, কোন অনর্থই তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে পারে না, সেই রাজ্যের প্রজাপুঞ্জই প্রকৃত সুখের অধিকারী হয়; ইহার বিপরীত হইলেই সর্ব্বনাশ ঘটে; মোগলকেশরী আক্‌বরশাহের সহিত তুলনা করিলে চিতোররাজ অপদার্থ উদয়সিংহকে মুষিক সদৃশ জ্ঞান হয়। উদয়সিংহ যে বয়সে পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, আক্‌বর তদপেক্ষা অনেক অল্পবয়সে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আক্‌-বর পিতার নিকট সুশিক্ষিত, ভাগ্যতরঙ্গের ঘোরতর ঘূর্ণিপাকে পতিত হইয়া তিনি মানবপ্রকৃতির গুহ্যতত্ত্ব অবধারণে সুপটু, সংসারের কূটনীতি বুঝিতে তিনি সমর্থ; সুতরাং ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। উদয়সিংহ আত্মজন্মবৃত্তান্তও সবিশেষ অবগত হইতে পারেন নাই; চিরদিন সুখবিলাসের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া পরগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছেন; বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ জীবনে তাঁহার নেত্রগোচরে পতিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত কার-ণেই সৎসহবাসে তাঁহার ইচ্ছা হইত না; অমাত্য, পারিষদ প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সর্ব্বনাশকরী একটি বারবিলাসিনীর হস্তে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দুশ্চারিণীর হস্তেই উদয়সিংহের অদৃষ্টচক্র ও মিবাররাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল, সুতরাং ভাগ্যলক্ষ্মী যে উদয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবেন, ইহা অযৌক্তিক হইতে পারে না; বিস্ময়ের বিষয়ও নহে।

দুইবার চিতোরে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর সন্তোষবিধান করিয়া রাজপুতবীরেরা দুইবারই স্বরাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমবার হিন্দুশোণিতপিপাসু আলা-উদ্দীন বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলে দ্বাদশটি রাজপুত্র পর্য্যায়ক্রমে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর সম্মুখে আত্মবলি দিয়াও রাজ্যরক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বিতীয়বার দুর্দ্দান্ত বাহাদুর জিঘাং-সার বশবর্ত্তী হইয়া চিতোর ছারখার করিলে দেবলরাজ চিতোরেশ্বরের প্রীতির জন্য আপনার দেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার তৃতীয় সঙ্কটে—তরুণবীর আক্‌বরের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করেন, সেরূপ মহাপুরুষ দৃষ্ট হইল না। অত্যল্পকালের মধ্যেই চিতোরনগরী ছারখার হইল, শিশোদীয়কুলের চিরস্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, তাঁহাদিগের চিরগৌরব যবনকরে প্রণষ্ট হইল, হত-ভাগ্য উদয়সিংহের সহিত চিতোরেশ্বরীর দেবীমূর্ত্তিও তিরোহিত হইলেন। যে চিতোর বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় নগরসমূহের শীর্ষস্থল অধিকার করিয়াছিল, যে চিতোর আর্য্যরাজচক্রবর্ত্তিগণের লীলানিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে নগরী একসময়ে কমলার বাসভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইত, এত দিনে সেই মহানগরী বন্যজন্তুসমূহের আশ্রয়কুহরে পরিণত হইল।

মুসলমান ইতিবৃত্তলেখকেরা বলেন, আক্‌বর কেবল একবারমাত্র চিতোর আক্রমণ

করিয়াছিলেন। যেবার চিতোরের সর্ব্বনাশ হয়, চিতোর চির-অধঃপতনের ভীমকূপে নিহিত হয়, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আপনাদের গ্রন্থে কেবল সেইটিরই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভট্টকবির রচিত ইতিহাসপাঠে আর একটি আক্রমণের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

আক্‌বর শাহ প্রথম যেবার চিতোর আক্রমণ করেন, সেবার তাঁহাকেও পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিতে হইয়াছিল। যে বারবিলাসিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাণা উদয়সিংহ তাহার করে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, রাজ্যভার পর্য্যন্ত যাহার করে সমর্পিত হইয়াছিল, সেই বীররমণীর বীরত্বপ্রভাবেই আক্‌বর ব্যর্থকাম হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আক্‌বর যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, বীরনারী কতিপয়মাত্র সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে নির্ভয়-হৃদয়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। অপদার্থ উদয়সিংহ নিজমুখেই সেই রমণীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বীর্য্যবতী রমণীর সাহায্য না পাইলে আমি কখনই শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতাম না; বারবিলাসিনীর প্রশংসা শুনিয়া অবমাননা বোধে সর্দ্দারবীরগণের অন্তরে ক্রোধের উদয় হইল; বীরনারীর প্রাণবধ করিয়া তাঁহারা ক্রোধের শান্তি করিলেন। এই সূত্রে চিতোরে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সুযোগেই আক্‌বর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়া চিতোর-রাজ্য উৎসাদিত করিলেন।

'চিতোর হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে আক্‌বর শিবিরশ্রেণী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান শিবিরের মধ্যভাগে একটি মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম "আক্‌বরকা দেওয়া" (আক্‌বরের দীপমন্দির)। অদ্যাপি উহা বিদ্যমান আছে।

উদয়সিংহের অবিমৃশ্যকারিতাদোষে যদিও চিতোরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির হ্রাস হইয়াছিল, যদিও রাজপুত-বীরগণের হৃদয় বীরতেজে তাদৃশ উত্তেজিত ছিল না, তথাপি সেই দুর্দ্দিনে অপরাপর রাজ্যখণ্ডের রাজপুতবীরেরা চিতোর-রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে চিতোরে সমবেত হইয়াছিলেন। স্বদেশরক্ষার জন্য—স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য—আর্য্যবীরগণের হৃদয় শতগুণে উত্তেজিত হইয়া উঠে, শতগুণবলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আক্‌বর শাহ চিতোরের সম্মুখে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিবামাত্র চারিদিক্ হইতে রাজপুতবীর মহাবিক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অসংখ্য চন্দাবৎসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া শাহিদাস চিতোরের সূর্য্যতোরণ রক্ষার জন্য জীবনান্তকর রণে প্রবৃত্ত হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার দেহে প্রাণবায়ু বিদ্যমান ছিল, শত্রুসৈন্যের এক জনও ততক্ষণ সে দ্বারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ তোরণদ্বারে যে স্থলে তিনি শোণিতাক্ত-কলেবরে রণশায়ী হইয়াছিলেন, আজিও তথায় তাঁহার চিতাবেদিকা বিরাজিত আছে।

শাহিদাস রণভূমে নিপতিত হইলে সামন্ত সঙ্গের বীরবংশধরগণকে লইয়া নাদেরিয়ার রাবৎ-দুদা সমরে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গের বংশধরেরা চন্দাবৎগোত্রের একটি শাখা, ইঁহারা সঙ্গাবৎ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। এ দিকে বৈদলাও কোতেরা হইতে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বংশজাত দুই জন সামন্তনৃপতি, বিজলি ও সদ্রি হইতে প্রমার ঝালাপতি এবং বেদনোরের অধিপতি জয়মল্ল ও কৈলবার শাসনকর্ত্তা পুত্ত আসিয়া সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে জয়মল্ল ও পুত্ত এই দুই জনই রাজপুতবীরমধ্যে শ্রেষ্ঠ। কবিগণ ইঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহাদিগের গুণে, মহত্বে ও বীরত্বে বশীভূত হইয়া তৎকালীন রাজপুতবীরেরা প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় প্রথমেই ইঁহাদিগের পবিত্র নাম স্মরণ করিতেন। অদ্যাপি রাজবারাপ্রদেশের অনেক স্থলে সেই প্রথা প্রচলিত আছে। রাণা উদয়সিংহ ইঁহাদিগকে

যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন নাই, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই ইঁহারা চিতোর-রক্ষার জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই মহাসমরে স্বরাজ্যরক্ষার উদ্দেশে—স্বধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশে—অনেকগুলি অসূর্য্যম্পশ্যা ক্ষত্রিয়কুমারীও অসিচর্ম্মধারণপূর্ব্বক বর্ম্মাবৃতকলেবরে রণচণ্ডী-বেশে সমরক্ষেত্রে দর্শন দিয়াছিলেন।

সূর্য্যতোরণরক্ষক শাহিদাস শত্রুহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিলে কৈলবার পুত্র সেই পদে নিয়োজিত হইলেন। পুত্তের বয়ঃক্রম তখন ষোড়শবর্ষ। চিতোররক্ষার জন্য তাঁহার বীর পিতা ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। পুত্তের প্রতিপালনার্থ তদীয় জননী পতির সহগামিনী হইতে পারেন নাই। আজি তিনি স্বহস্তে পুত্রকে রণশয্যায় সজ্জিত করিয়া চিতোররক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। পুত্রকে রণসাগরে ঝম্প প্রদানে আদেশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; বীরপুত্রের অনুগমন করিয়া জগতে তিনি বীরবালার জলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। পত্নীর জন্য চিন্তা করিয়া রণক্ষেত্রে পাছে পুত্র নিস্তেজ হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রের বালিকা স্ত্রীকেও এই ভীষণ কঠোরব্রতে দীক্ষিত করিলেন। কঠিন লৌহবর্ম্মে পুত্রবধূর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইল; বধূকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রফুল্লবদনে তিনি রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। বীরাঙ্গনাদ্বয়ের বীরত্ব-দর্শনে চিতোর-বীরগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। বীরাঙ্গনাদ্বয়ের কুসুমসুকোমল হস্তে অসংখ্য যবনবীর নিপতিত হইয়া রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

পুত্তের জননী ও পত্নীর এইরূপ মহাবীরত্ব দেখিয়া চিতোরবাসিনী রাজপুতললনাগণের হৃদয়ে বীর্য্যবহ্নি সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা রণমদে উন্মত্ত হইয়া, জীবনের মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, গগনবিদারী ভীমনাদে রণভূমি বিকম্পিত করিয়া প্রচণ্ডবেগে মোগলসেনার দিকে প্রধাবিত হইলেন। জীবনস্বরূপিণী চিতোরপুরীরক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; চিতোররক্ষা হইল না।

চরমসাহসে নির্ভর করিয়া রাজপুতবীরাঙ্গনাগণ বীরবিক্রমে যবনব্যূহের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একটি প্রজ্বলিত গুলিকা সবেগে আসিয়া সেনাপতি জয়মল্লের গাত্রে আঘাত করিল; তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। ভীষণ ক্রোধে জয়মল্লের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল; জিঘাংসা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া তুলিল। কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করিয়া শত্রুপক্ষ তাঁহাকে আঘাত করিল, যাতনায় বীরবরের হৃদয়বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভবিষ্যভাগ্যগগনের দিকে তিনি আর নেত্রপাত করিলেন না; স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, চিতোর-রক্ষার আর আশা নাই। তখন তিনি জহরব্রতানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎক্ষণাৎ ভীষণব্রতের আয়োজন হইল।

এ দিকে আট সহস্র রাজপুতবীর একত্র বসিয়া চিরদিনের জন্য শেষ তাম্বূলচর্ব্বণ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট শেষবিদায় গ্রহণ করিলেন। চরমকালীন পীতবস্ত্র ধারণ করিয়া অবিলম্বেই সকলে বিপুলবিক্রমে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চিতোরের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইল। ভয়ঙ্করী হত্যার ভীষণমূর্ত্তি যেন চিতোরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। একে একে সমস্ত রাজপুতবীর অম্লানবদনে রণভূমে নিপতিত হইয়া নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ একটিমাত্র রাজপুত জীবিত রহিল, ততক্ষণ যবন-সেনার কেহই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। জন্মভূমি চিতোর রক্ষার জন্য আপন আপন হৃদয়-শোণিতদানে মোগলসম্রাট্ আকবরের শোণিতপিপাসার শান্তি করিয়া এক্ষে একে ত্রিংশৎ সহস্র

রাজপুতবীর অনন্তনিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন; যবনেরা আক্‌বরকে "জগদ্‌গুরু" অভিধানে সম্বোধন করিতেন, সম্রাটের সেই উপাধি আজি সার্থক হইল; অসংখ্য রাজপুতবীরের ছিন্নমস্তক পদদলিত করিয়া, অসংখ্য নরনারীর হৃদয়শোণিতে পদতল বিধৌত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিঃশঙ্কহৃদয়ে মহাবীর সম্রাট্ আক্‌বর বিষাদময় চিতোরদুর্গে প্রবেশ করিলেন।

চিতোরদুর্গ জনশূন্য, শোকাবহ বিষাদের তিমিরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন; চিতোর শ্মশানভূমিতে পরিণত! ১৬২৪ সংবতে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) ১২ই চৈত্র রবিবার চিতোরের এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। বাপ্পার কুলদেব ভগবান্ দিবাকর এই শেষ রবিবারে তাঁহার হতভাগ্য বংশধরগণের প্রতি বিমুখ হইলেন। চিতোরের সপ্তদশশত আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য সেনাপতি ও অসংখ্য সৈন্য এই কালসমরে চিরদিনের জন্য অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। নয় জন মহিষী, পাঁচ জন রাজকুমারী, দুইটি শিশু এবং সামন্তসমিতির অসংখ্য সীমন্তিনী আপন আপন প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধস্থলে বীরত্বের পরিচয় দিয়া, কেহ বা অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। পাষাণহৃদয় আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোরের সুন্দর সুন্দর দেবালয় ও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইল। নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন ও বাহাদুরের বিদ্বেষাগ্নি হইতে চিতোরের যে সমস্ত রাজপ্রাসাদ ও অট্টালিকা নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, আক্‌বর কর্ত্তৃক তৎসমস্তই বিধ্বস্ত হইল। ভারত-আক্রেমণকারিগণের মধ্যে তিনিই নৃশংসতম বলিয়া কলঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

যে সকল রাজপুতবীর চিতোরের মহাযুদ্ধে রণশায়ী হইলেন, তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত ওজন করিয়া মহাবীর আক্‌বর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪৷৷০ মণ হইল। তৎকালে চারি চারি সেরে এক এক মণ ধরা হইত। আক্‌বরের আদেশে তদবধি প্রত্যেকের লিখিত পত্রে ঐ ৭৪৷৷ সংখ্যা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। গৃহস্থ, বণিক্, শ্রেষ্ঠ, প্রেমিক যিনি যখন আপন আপন অভিপ্রেত ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন, শিরোনামের বিপরীত দিকে ঐ ৭৪৷৷ সংখ্যা অঙ্কিত থাকিবে; নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন যিনি ঐ পত্র খুলিবেন, তাঁহাকে চিতোরধ্বংসের পাপ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ দিব্য দিয়া আক্‌বর সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন। তদবধিই আবহমানকাল ভারতের সর্ব্বত্র ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

চিতোরযুদ্ধে আক্‌বরের হস্তেই বীরবর জয়মল্ল প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যে বন্দুকের সহায়ে আক্‌বর জয়মল্লের প্রাণসংহার করেন, সেই বন্দুকটি "সংগ্রাম" আখ্যায় আখ্যাত হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আক্‌বর গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁহার নিকট কদাচ গুণের অনাদর হইত না; জয়মল্ল ও পুত্তের মহাবীরত্ব দর্শনে আক্‌বর পরমপ্রীত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু মহাবীরদ্বয়ের মহাবীরত্ব ও মহাকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি দিল্লীনগরীতে আপন প্রাসাদের তোরণের সম্মুখে বীরযুগলের দুইটি পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্যাপি উহা দর্শনার্থ অনেকে তথায় উপস্থিত হন।

আরাবল্লীপর্ব্বতমালার মধ্যভাগে গিরণবো নামে একটি উপত্যকা আছে। চিতোরের সর্ব্বনাশঘটনার অনেক দিন পূর্ব্বে রাণা উদয়সিংহ ঐ উপত্যকাভূমিখণ্ডে একটি সুদীর্ঘ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। সেই সরোবরটি উদয়সাগর নামে অভিহিত। উদয়সাগরের পার্শ্বে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরিভাগে "নচৌকি" নামক একটি সমুন্নত অট্টালিকাও তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ্যচ্যুত হইবার পর উদয়সিংহ সেই প্রাসাদে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। মহাসংগ্রামে যখন চিতোর চূর্ণবিচূর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, উদয়সিংহ তখন পলায়নপূর্ব্বক প্রথমতঃ রাজপিপ্পলীর অরণ্যানীমধ্যে

মহিলাগণের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন; কতিপয় দিবসমাত্র তথায় অবস্থানের পরেই তিনি এই গিরণবো উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে অত্যল্পদিনের মধ্যেই নাকি নচৌকি প্রাসাদের চারিদিকে অসংখ্য অট্টালিকা ও আবাসসমূহ নির্ম্মিত হইল; ক্রমে ক্রমে উহা একটি নগরে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। রাণা উদয়সিংহ উহার উদয়পুর নামকরণ করিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্রই পৈতৃক সিংহাসনলাভের প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু রাণা উদয়সিংহ কর্ত্তৃক এই চির-স্তন বিধি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। মৃত্যুর কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রাণা জ্যেষ্ঠপুত্রকে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র জগমলকে আপন উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিলেন। সেই সূত্র লইয়া রাণার চতুর্ব্বিংশতি পুত্রের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে। এই চতুর্ব্বিংশতি পুত্রের বংশধরগণের শাখা-প্রশাখা রাজস্থানের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই রণবৎ উপাধিতে অভিহিত।

চিতোরের সর্ব্বনাশ-ঘটনার চারি বৎসর পরে ফাল্গুন মাসের বাসন্তীপূর্ণিমাতে দ্বিচত্বারিংশৎবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে গোগুণ্ডা নামক স্থানে রাণা উদয়সিংহ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। জয়মল্লের ভ্রাতৃগণ মিবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দারসমভিব্যাহারে পিতার মৃতদেহ লইয়া শ্মশানভূমে গমন করিলেন, এ দিকে রাজবেশ, রাজমুকুট, রাজদণ্ড ধারণ করিয়া জগমলও উদয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সূত্রে চিতোরে মহাগণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকে ষড়যন্ত্র করিয়া জগমলের প্রতিকূলে গুপ্তমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শোণিগুরুবংশীয় ঝালোররাজের কুমারীর সহিত উদয়সিংহের বিবাহ হয়। সেই রাজকুমারীর গর্ভে রাণা উদয়সিংহের ঔরসে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম প্রতাপসিংহ। প্রতাপের মাতুল আপন ভাগিনেয়কে উদয়পুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক হইলেন। মিবারের প্রধান সামন্তরাজ চন্দাবৎ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যমানে সর্ব্বকনিষ্ঠ জগমল কখনই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে। আপনি সজীব থাকিয়া এরূপ অবৈধ আচরণে কিরূপে অনুমোদন করিলেন?"

মৃদু হাস্য করিয়া চন্দাবৎ কুলচূড়ামণি কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "চরমসময়ে একটু দুগ্ধ পানে রোগীর ইচ্ছা হইয়াছে, ক্ষতি কি? কেন আমরা অসম্মত হইব?" এইরূপ সগর্ব্ব উক্তির পর ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ঝালোরপতিকে তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমরা আপনার ভাগিনেয় প্রতাপের পক্ষই অবলম্বন করিব। প্রতাপই আমার একান্ত মনোনীত;—প্রতাপ উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং প্রতাপই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী।"

এ দিকে জগমল ক্ষণকালের জন্য রাজ্যসুখসম্ভোগে অবস্থিত আছেন, ইত্যবসরে গোয়ালিয়রের পদচ্যুত নৃপতি, শোণিগুরুরাজ, চন্দাবৎ কৃষ্ণ ও অন্যান্য কতিপয় প্রধান প্রধান সর্দ্দার প্রতাপকে সমভিব্যাহারে লইয়া জগমলের নিকট উপস্থিত হইলেন; অচিরেই গোয়ালিয়রপতি ও রাবৎকৃষ্ণ উভয়ে জগমলের বাহুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক গদি হইতে তাঁহাকে নামাইয়া ধীরে ধীরে নিম্ন আসনে উপবেশিত করিলেন। জগমলের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। শোণিগুরু-সর্দ্দার তখন ধীর-গম্ভীরে সম্বোধন করিয়া জগমলকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার ভ্রম জন্মিয়াছে, এই প্রতাপসিংহ আপনার অগ্রজ; উদয়পুরের সিংহাসন প্রতাপেরই উপযোগী, আপনার ইহাতে অধিকার নাই।" এই বলিয়া তাঁহারা দেবীদত্ত করবালে প্রতাপকে সজ্জিত করিয়া তিনবার ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহাকে মিবারেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সর্দ্দার ও প্রধান প্রধান

ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। প্রতাপসিংহের ভাগ্য এত দিনে সুপ্রসন্ন হইল। উদয়পুরের অদৃষ্টচক্র এখন তাঁহার হস্তে নির্ভর করিল।

আহেরিয়া পর্ব্ব। রাজপুতগণ পুরুষানুক্রমে এই মহোৎসবে আমোদ-প্রমোদ করিয়া আসিতে-ছেন। এই উৎসবের দিবস রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রীতি উদ্দেশ্যে রাজা স্বগণে মহোল্লাসে মৃগয়াযাত্রা করিয়া থাকেন। নবীন ভূপতি প্রতাপসিংহও পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত এই প্রথা অবহেলা করিলেন না; স্বগণে পরিবৃত হইয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে মহতী মৃগয়ার উদ্দেশে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই দিন ক্রীড়াযুদ্ধে প্রতাপের বীরপ্রতাপদর্শনে মিবার-সর্দ্দারগণের হৃদয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিল; মিবারের ভবিষ্যমঙ্গলের আশা আসিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় আনন্দপূর্ণ করিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রতাপসিংহ, মোগলসন্ধি, মানসিংহ, সেলিমের মিবার আক্রমণ, উদয়পুর অধিকার, পৃথ্বীসিংহ, খোসরোজ, প্রতাপনির্ব্বাসন, উদয়পুর পুনরুদ্ধার।

প্রবলপ্রতাপ প্রতাপসিংহ শিশোদীয়কুলের রাজ-উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু ইহা একপ্রকার বিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান হইল। প্রতাপের রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, উপায় নাই, অবলম্বনস্বরূপ সম্বলও নাই। যে কয়েকজন স্বদেশীয় সেনানী মুসলমানের প্রলোভনে বিভ্রান্ত না হইয়া প্রতাপের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও উপর্য্যুপরি বিপদের উপর বিপৎপাতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। প্রতাপের বীরহৃদয় কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও আশাভঙ্গে বিকম্পিত হয় নাই। তাঁহার মহাবীর পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রশস্তপথে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্র হইয়াছিলেন, প্রতাপ তাঁহাদেরই পন্থানুসরণ করিয়া তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। স্বজাতির প্রণষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধারমানসে অচিরেই তিনি তৎসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার অভিলাষে প্রোৎসাহিত হইয়া প্রচণ্ড স্বদেশবৈরীর বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বালিত করিবার প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে সমুদিত হইল। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে একটি চিন্তা আসিয়া তাঁহার মানসপট মলিন করিল। তিনি একাকী নিঃসম্বল, নিঃসহায়; আকবর শাহ বিপুল সহায়-বলসম্পন্ন, প্রবল প্রতাপশালী, ইহা ভাবিয়া একবারমাত্র তাঁহার বদনমণ্ডল নিষ্প্রভ হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব তিরোহিত হইয়া গেল, আবার দ্বিগুণতর উৎসাহে পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ।

স্বদেশীয় কবিগণের কাব্যগ্রন্থে পূর্ব্বপুরুষগণের অদ্ভুত বীরকীর্ত্তির বহু দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া প্রতাপসিংহ সমরসম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিশুকালে সেই সকল কাব্যপাঠ করিবার সময় প্রতাপের সুকুমারহৃদয় প্রবীণ বীরপুরুষগণের দুর্জ্জয় বীরত্বপ্রভাবে পরিপূর্ণ হইত; কোমলহৃদয় সহসা যেন পর্ব্বতের ন্যায় কঠিন হইয়া আসিত। সহস্র সহস্র বৈরী যেন ভীষণবেগে সম্মুখে উপস্থিত, ইহাই উপলব্ধি করিয়া মনে মনে তিনি রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। যতবার

তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিগৌরব পাঠ করিয়াছেন, ততবারই দেখিয়াছেন, চিতোর কখনও শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হয় নাই। দেশবৈরীরাই বরং আপনাদের স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া কয়েকবার চিতোরের কারাগারে বাস করিয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অসংখ্য প্রচণ্ড বৈরীর ভাষণ আক্রমণ হইতে যে চিতোর সগৌরবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, সর্ব্বদা অটলভাবে চিরগৌরব-সম্ভোগ করিয়াছে, সেই চিতোর কি এখন একজনের দ্বারা চিরকালের নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ হইবে? সেই চিতোর কি এখন একজনমাত্র শত্রুর প্রহারে এককালে রসাতলে যাইবে? কখনই না, কখনই না; ঈশ্বর রক্ষা করিবেন। চিতোরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে, এ আশঙ্কা প্রতাপের কর্ণে বিন্দুমাত্রও স্থান পাইল না। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, আজি যেন চিতোর শত্রু-কবলিত, কল্য আবার আপন সামর্থ্য-বলে তিনি সেই চিতোর উদ্ধার করিয়া দিল্লীর সিংহাসনকে চিতোরের অধীন করিতে পারিবেন। যে বংশে জন্ম, তাহা স্মরণ করিলে প্রতাপের এরূপ বিশ্বাস কদাচ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হইবে না; কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, শত্রুদল দ্রুতবেগে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা ও সে আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া আসিল। আক্‌বর শাহ প্রতাপের আত্মীয়-কুটুম্বগণকে প্রতাপের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। মারবার, অম্বর, বিকানীর এবং বুন্দির অধীশ্বর পর্য্যন্ত মোগলসম্রাটের প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া আপনাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় গৌরব দিল্লীর সিংহাসনে উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। অবোধ রাজপুতেরা আত্মপরবিবেচনাপরিশূন্য হইয়াই জন্মভূমির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প। প্রতাপের সহোদর ভ্রাতা সাগরজীও বিশ্বাসঘাতক। তিনিও প্রিয়তম সহোদরের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগলের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। হায় হায়! সেই কাপুরুষতার কি পুরস্কার? আক্‌বরের প্রসাদে আপনাদের প্রাচীন রাজধানী পুনঃপ্রাপ্তি। প্রতাপসিংহ এই সংবাদ যখন প্রাপ্ত হইলেন, জিঘাংসার অনলে তাঁহার হৃদয় তখন দহ্যমান হইতে লাগিল, রোষ ও বিষাদ যুগপৎ সমুত্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়সাগর মন্থন করিতে লাগিল। এতদূর হইল, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আপন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলেন না।

প্রতাপের প্রতিজ্ঞা ছিল, মাতৃদুগ্ধ কখনই কলঙ্কিত করিবেন না। শতসহস্র বিপদ্ ও শতসহস্র বিঘ্ন তাঁহার প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেও নিমেষের জন্য তিনি সাহসশূন্য হন নাই; বিপদের সঙ্গে সঙ্গে বরং তাঁহার সাহস ও উদ্যমশীলতা দ্বিগুণিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই সাহসের সহায়েই তিনি একাকী পঞ্চবিংশতিবৎসর দুর্দ্দান্ত মোগলসম্রাটের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! কখন কেশরিবিক্রমে জনস্থানসমূহে অবতীর্ণ হইয়া তিনি প্রচণ্ড শত্রুকুল উৎসন্ন করিয়াছেন, কখন বা পর্ব্বতান্তরে আশ্রয় লইয়া নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে সপরিবারে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কখন বা অবসর বুঝিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে অনুরাগী হইয়াছেন; বনবাসের মহাসঙ্কটসময়ে প্রতাপের চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। পুত্র ও পরিবারবর্গের কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না, সুখসেব্য রাজভোগে বঞ্চিত হইয়া বন্য-ফলমূলে ক্ষুন্নিবারণ, নির্ঝরিণীনীরে পিপাসা-শান্তি ও আকাশাবরণে শরীর আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে, কখন বা সমস্ত দিন অনাহারে অতিবাহিত হইয়াছে, স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়াছেন। ক্ষোভে—পরিতাপে অন্তর দগ্ধ হইয়াছে, তথাপি প্রতাপ ক্ষণকালের জন্যও স্বকর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, ক্ষণকালের জন্যও মোগলের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। বীরপ্রবর বাপ্পারাওয়ের বংশধর এক জন বিধর্ম্মী মানবের পদানত হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া প্রতাপসিংহ ঘৃণাবশে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরাধীনতা—তাহা কি?

পরাধীনতার নামান্তর দাসত্ব ;—আত্মবিক্রয়। উঃ! এ পাপচিন্তা তেজস্বী প্রতাপের অন্তরে কিছুমাত্র স্থান পায় নাই। অনেকগুলি রাজপুতবংশধর আপনাদের বংশগৌরবকে প্রবল পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া আকবরের হস্তে আপনাদের কন্যা ভগিনী অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদ ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ সে পাপে পরিলিপ্ত হন নাই। যাঁহারা যবনের সহিত কোন কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন, নিতান্ত আত্মীয়-বন্ধু হইলেও প্রতাপ তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবন্ধন রাখেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্ব অসীম ; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপও লোকবিখ্যাত। মিবারের প্রত্যেক উপত্যকায় আজিও সেই সকল কীর্ত্তিকলাপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে ; প্রত্যেক রাজপুতবীর আজিও তাহা জপমালার ন্যায় জপ করিয়া থাকে ; শত্রুগণও প্রতাপের সেই সকল কীর্ত্তিকলাপ বিস্মিতনয়নে দর্শন করে। যাবনিক ইতিহাসে প্রতাপের বীরত্ব ও কীর্ত্তিমহিমা পদে পদে প্রশংসার সহিত পরিবর্ণিত হইয়াছে। মিবাররাজ্য পরিভ্রমণপূর্ব্বক মিবারের সৈনিক ও সামন্তবর্গের বর্ত্তমান বংশধরদিগকে প্রতাপের বীরত্ববার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে আজিও তাহারা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করে। জন্মভূমির প্রতি যাঁহাদের অতুল স্নেহমমতা, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক লোকেও ভয়ে প্রতাপকে ত্যাগপূর্ব্বক মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়াও প্রতাপসিংহ ভগ্নোদ্যম হন নাই ; তাঁহার ভরসা ছিল, বিশ্বস্ত সর্দ্দারগণের মধ্যে একজনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই ; পরাক্রান্ত যবন নানা প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহাদের একজনকেও বশীভূত করিতে সমর্থ হন নাই। মহা মহা বিপদে ভীষণ যন্ত্রণায় ও ভীষণ শেলপ্রহারেও রাজভক্ত সর্দ্দারেরা প্রতাপসিংহের পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। নৈরাশ্যের সময় কেহ কেহ বরং প্রতাপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অম্লানবদনে স্বহস্তে আপন আপন হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন। জগমল ও পুত্তের বংশধরেরা প্রতাপের জন্য হৃদয় পাতিয়া বৈরিপ্রহরণ ধারণ করিয়াছিলেন। শালুম্ব্রার বীরগণ চণ্ডের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

চিতোর ধ্বংস হইবার সময় ভট্টকবিগণ চিতোরপুরীকে বিভূষণা বিধবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পিতামাতার মৃত্যু হইলে সন্তানসন্ততিগণ যেমন শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ ও বিলাসলালসা পরিত্যাগ করেন, জননী জন্মভূমির শোকে প্রতাপসিংহও সেইরূপ বিষাদচিহ্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, হৈমপাত্র ও রজতপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাসনসময়ে রাণা প্রতাপ তরুপত্র ব্যবহার করিতেন ; তাঁহার শয়নার্থ তৃণশয্যা প্রস্তুত হইত। কেবল তিনি নিজেই যে এইরূপ সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এরূপ নহে, আপন বংশধরদিগের নিমিত্তও তিনি এইরূপ কঠোর অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মর্ম্ম এই যে, যত দিন চিতোরের পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধার না হইবে, তত দিন কেহই কোন প্রকার বিলাসচিহ্ন ধারণ করিতে পারিবে না। কেবল ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, চিতোরের শোচনীয় অধঃপতন কীর্ত্তন করিয়া মিবারবাসিগণকে,চিতোর উদ্ধারে প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত প্রতাপসিংহ আর একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথা ছিল, সেনাদলের পুরোভাগে রণডঙ্কা বাজিত। অধঃপতনের পর প্রতাপের আজ্ঞা, সেই সময় হইতে সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগে রণবাদ্য বাজিবে। চিতোরবাসিগণ তাদৃশ সময় হইতে অদ্যাপি সেই আজ্ঞাপালন করিয়া থাকে। স্বদেশপ্রেমিক আর্য্যবীর রাণা প্রতাপের বংশধরগণ সেই সকল নিয়মপালন করিতেছেন। যাঁহারা সম্যক্পালনে অক্ষম, তাঁহারা তবু সুবর্ণ ও রৌপ্যপাত্রের নিম্নদেশে এক একটি বৃক্ষপত্র সংলগ্ন করিয়া লন এবং সুখশয্যার অধস্থলে এক একটি তৃণগুচ্ছ স্থাপন করেন।

জন্মভূমির দুরবস্থা দর্শন করিয়া প্রতাপসিংহ প্রায়ই বলিতেন, কাপুরুষ উদয়সিংহ যদি এ বংশে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তুর্কবংশীয় কোন ব্যক্তিই রাজস্থানের বক্ষে পদাঘাত করিতে পারিত না। যে বৎসর চিতোরের সর্ব্বনাশ, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় আর্য্যসমাজে এক অভিনবযুগের অবতারণা দৃষ্ট হয়। গঙ্গাযমুনার তীরভূমি হইতে যে বিশাল ভূভাগ ইতিপূর্ব্বে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, এই সময় যেন তাহা আবার ধীরে ধীরে পূর্ব্বগৌরবের দিকে উন্নত হইতেছিল। স্তূপীকৃত শ্মশানভস্মের অভ্যন্তর হইতে যেন অগণিত আর্য্যবীর নিঃশব্দে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন, মারবারের মরুভূমি উর্ব্বরভূমিতে পরিণত হইতেছিল, মরুস্থলীর অধীশ্বর একাকী পাঠানসিংহ সেরসাহের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চম্বলনদীর উভয়তীরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অভিনব সৌষ্ঠবে সজ্জিত হইয়াছিল। তত্তৎপ্রদেশীয় রাজগণ শত্রুদমনোপযোগী বল-বিক্রম লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একজন বিচক্ষণ অধিনায়কের অভাবে তাঁহারা বল-পরীক্ষায় অগ্রসর হইতে কিছু সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। সংগ্রামসিংহ সেই সময় তাঁহাদের অধিনায়ক হন। তাতাররাজ বাবর সেই সংগ্রামসিংহের প্রদীপ্ত তেজঃপ্রভাবে একদিন আপন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় হায়! যবনের অধীনতাস্বীকার ভারতভূমির অখণ্ডনীয় বিধিলিপি; অতএব সেই সময়েই সংগ্রামসিংহের পতন, তাঁহার অনুবলগণের পরাভব, অভাগ্য হিন্দু নরপতিগণের আগুলব্ধ রাজ্য পুনর্ব্বার পরহস্তগত, আর্য্যরাজগণ যবনের অধীন! গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যে নক্ষত্রে উদয়সিংহের জন্ম, সেই সময় সেই নক্ষত্রে যদি প্রতাপসিংহ জন্মগ্রহণ করিতেন কিংবা আকবর অপেক্ষা অল্পবলশালী সেই সময় যদি দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতের তাদৃশী দুর্দ্দশা সংঘটিত হইত না।

নীতিজ্ঞ সামন্তগণের সাহায্যে প্রতাপসিংহ তৎকালে আপন রাজ্যমধ্যে কতকগুলি নূতন বিধি প্রণয়ন করিলেন। সামরিক কার্য্যে সাহায্য পাইবার নিমিত্ত সৈন্যগণকে তিনি নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি দান করিতে লাগিলেন। সেই সময় কমলমীরে প্রধান রাজপাট সংস্থাপিত হয়। রাণা সেই সময় গোগুণ্ডা এবং অন্যান্য গিরিদুর্গের দৃঢ়সংস্কার করেন। তিনি আপন প্রজাদিগকে পর্ব্বতপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। প্রশস্ত রণক্ষেত্রে বহুসৈন্য প্রেরণ এবং পর্ব্বতে সেনানিবেশস্থাপন করিলে আপন সৈন্য দ্বারা বিপক্ষের বহুসৈন্য বিনাশ করা সহজসাধ্য হয়, পরীক্ষা দ্বারা প্রতাপসিংহ ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। রাজ্যের মঙ্গলার্থ অস্ত্রধারণ করিয়া যাহারা পর্ব্বত আশ্রয় না করিবে, রাজবিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে, রাজ্যমধ্যে প্রতাপ এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সে ঘোষণার প্রতিবাদী কেহই হয় নাই। প্রজাগণ পর্ব্বত আশ্রয় করিল, সুতরাং জনস্থানগুলি শীঘ্রই বিজন বিপিনে পরিণত হইল। যদবধি সেই ঘোরতর সমরের অবসান না হইয়াছিল, আরাবল্লীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ সমস্ত ভূভাগ তদবধি এককালে দীপশূন্য বোধ হইয়াছিল।

ঐরূপ বিনিময়সম্বন্ধে রাজস্থানে নানাপ্রকার কিংবদন্তী আছে। রাজঘোষণা সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত রাজা স্বয়ং কতিপয় পারিষদ সমভিব্যাহারে পর্ব্বততলে অবতরণ করিতেন, তন্ন তন্ন করিয়া চতুর্দ্দিক পরিদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় পর্ব্বতাশ্রমে প্রত্যাগত হইতেন। ঘোষণা যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছিল। প্রতাপ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইতেন, কিন্তু মিবারের দুঃখে তাঁহার হৃদয় যেন ক্ষণে ক্ষণে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। মিবার তাঁহার পিতৃপুরুষগণের লীলাভূমি, পুত্রসদৃশ প্রজাগণের আমোদ-প্রমোদের স্থান। বিবিধ সঙ্গীতামোদে, বিবিধ সুস্বর

বাদিত্রবাদনে এবং নানাপ্রকার জনকোলাহলে যে স্থান নিরন্তর জীবন্ত বলিয়া প্রতীত হইত, আজি তাহা নিষ্প্রভ, নীরব ও নিতান্ত শোচনীয়। যাহার উর্ব্বর ক্ষেত্রনিচয় নিরন্তর সুন্দর শ্যামল শস্যরাশির হরিতরাগে সুরঞ্জিত থাকিত, তাহা এখন বনলতাগুল্মে ও দীর্ঘ দীর্ঘ তৃণরাজিতে সমাচ্ছন্ন। যে সকল সুপ্রশস্ত রাজপথ সর্ব্বদা পান্থগনে সমাকীর্ণ থাকিত, এখন তাহা আরণ্য কণ্টকবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত। মিবারের সে সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই। যে সৌন্দর্য্যপ্রভাবে মিবার ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের আদর্শস্থল বলিয়া গণ্য হইত, মিবারের এখন সেই সৌন্দর্য্যের অণুমাত্রও চিহ্ন নাই। মিবারের সৌধরাজির অভ্যন্তরে সুখলালিত অধিবাসী ও অধিবাসিনীগণের মনোহর হাস্যজ্যোতিঃ অবিরত বিকসিত হইত, সে সকল সমুন্নত সুখময় হর্ম্ম্য এখন ঘোর অন্ধকারময়। সেই সকল রম্যনিকেতনে বন্য শ্বাপদকুল অবস্থান করিতেছে। সে সকল স্থলে মানুষের এখন প্রবেশ করিতে ভয় হয়।

মিবারের এখন এই দশা। রাণা প্রতাপ একদা সদলে সেই শ্মশানক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন; এমন সময় দেখিলেন, একজন মেষপালক তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া নদসলিলবিধৌত প্রশস্ত সমতলক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্তে পশুপাল চরাইতেছে। প্রতাপ তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। মেষপালক একটি প্রশ্নেরও সন্তোষকর উত্তর দিতে পারিল না। প্রতাপ দয়ার সাগর হইয়াও নিতান্ত বিষাদসন্তপ্তচিত্তে সেই অবাধ্য মেষপালকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। আরও আজ্ঞা হইল, তৎসদৃশ অপরাপর রাজদ্রোহীর ভীতি উৎপাদনার্থ তাহার মৃতদেহ প্রকাশ্য প্রান্তরমধ্যে বিলম্বিত করা হইবে। রাজাজ্ঞার এইরূপ কঠোরতা নিবন্ধন রাজস্থানের কুসুমকানন সদৃশ উর্ব্বরভূমিভাগ অচিরে মহাশ্মশানে পরিণত হইল। দীর্ঘ দীর্ঘ বনপাদপ ভিন্ন সে সকল ক্ষেত্রে আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। কেন এরূপ করা হইল, প্রতাপসিংহই তাহা জানিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কেবল ধনলোভেই বৈদেশিক বিপক্ষেরা সম্পদশালী নগর ধ্বংস করিতে আগমন করে। নগরগুলি শ্মশান করিয়া ফেলিলে তাহাদের আর সে সকল স্থান অধিকার করিবার জন্য স্পৃহা জন্মিবে না। ইউরোপখণ্ডের সহিত ইতিপূর্ব্বে ভারতের যে বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের পণ্যদ্রব্যসমূহ সৌরাষ্ট্রে ও অপরাপর বন্দর হইতে মিবারের ভিতর দিয়া ভারত মহাসাগরের উপকূলে নীত হইত। প্রতাপের প্রতাপশালী অনুচরবর্গ বিজনপর্ব্বতাবাস হইতে অবতরণ করিয়া সেই সমস্ত বাণিজ্যসামগ্রী বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিত। যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থসংগ্রহের নিমিত্তই ঐ গর্হিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়।

আকবর শাহ অজমীরে সৈন্যস্থাপন করিয়া রাজপুতনৃপতিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেই প্রজ্বলিত সংগ্রামবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার অভিলাষে কেবল একজনমাত্র রাজপুতবীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিলেন; মোগলের প্রখর অস্ত্র ধারণ করিবার নিমিত্ত কেবল একজনমাত্র রাজপুতবীর হৃদয় পাতিয়া দিয়াছিলেন। নতুবা অপর সমস্ত নৃপতি মোগল-সম্রাটের প্রতাপের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শান্তিলাভার্থ মুসলমানের অধীনতাস্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। মারবারপতি মালদেব ইতিপূর্ব্বে সের শাহের ভীষণ আক্রমণ নিবারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবরের নাম শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার বীরত্ব ও তেজস্বিতা এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অম্বররাজ ভগবান্‌দাসের ঘৃণিত উদাহরণের অনুসরণ করিয়া তিনি আপন গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া আকবরের পদানত হইলেন। তাঁহার পুত্র উদয়সিংহও তৎকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া আপন দুহিতা যোধবাইকে মোগলসম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই আত্মবিক্রয়ের বিনিময়ে কাপুরুষ উদয়সিংহ সেই নবীনজামাতার প্রসাদস্বরূপ কি প্রাপ্ত হইলেন?—চারিটি প্রদেশ জায়গীর। সেই চারিটি জায়গীরের

বার্ষিক আয় প্রায় ষোল লক্ষ টাকা। গদবার-প্রদেশ, বার্ষিক আয় নয় লক্ষ টাকা; উজীন, দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নয় শত চৌদ্দ টাকা; দেবলপুর, এক লক্ষ বিরাশী হাজার পাঁচ শত টাকা এবং বদনাবর, দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। ইহাতে মারবাররাজের কিছু লাভ হইল বটে, কিন্তু মালদেব এই অকিঞ্চিৎকর জায়গীরের বিনিময়ে যে অমূল্য ধন বিক্রয় করিলেন, তাহাতে তিনি অনন্তকালের জন্য কাপুরুষগণের অগ্রগণ্য হইয়া রহিলেন। ক্ষুদ্রদলে গড্ডালিকাপ্রবাহ দৃষ্ট হয়। ভারতের বীরক্ষেত্র রাজপুতনার রাজগণের মধ্যেও এই সময় বিলক্ষণ গড্ডালিকাপ্রবাহ। মালদেবের দৃষ্টান্তে রাজস্থানের অন্যান্য সামান্য সামান্য রাজারাও দিল্লীশ্বর আকবর শাহের প্রসাদ-প্রত্যাশী হইয়া আপনাদিগকে তাঁহার চরণতলে উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে রাজস্থানের অনেকগুলি রাজা মোগলের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া মোগলপক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাণা প্রতাপের সহায়বল অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরাও তখন তাঁহার ভীষণ শত্রুরূপে পরিগণিত হইল। মিবারের জন্য একদিন যাঁহারা 'অম্লান-বদনে হৃদয়-শোণিত দান করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদেরই বংশধরেরা বিধর্ম্মী যবনের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী। আহা! মোগলের প্রলোভনে বশীভূত হইয়া, ক্ষত্রকুলভূষণেরা সনাতন ক্ষত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মাতৃভূমির বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল এই বুন্দির নরপতিগণ আপনাদের জাতিগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতাপসিংহ কেবল এই বুন্দি ভিন্ন অপরাপর রাজ্যের রাজপুতগণের সহিত আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। মহাযুদ্ধে বহুবল আবশ্যক, প্রতাপ তন্নিমিত্ত দিল্লী, পত্তন, মারবার ও ধারা প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যরাজ্যসমূহের রাজপুতগণকে সন্ধান করিয়া তাঁহাদের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে লাগিলেন। সে বন্ধন সহস্র সহস্র বিঘ্ন-বিপদেও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহারা অথবা তাঁহাদের বংশধরেরা কেহই মোগলবংশে আপনাদের ভগ্নী বা কন্যা সম্প্রদান করেন নাই। মোগল দূরের কথা, স্বজাতীয়ের মধ্যে যাঁহারা মোগলের সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধে মিলিত হইলেন, তাঁহাদের সঙ্গেও করণ-কারণ রহিত করিয়া দিলেন। জগতে যত দিন রাজপুতনামের আদর থাকিবে, যত দিন প্রতাপসিংহের পবিত্র নাম রাজপুত মহাপুরুষগণের প্রাতঃস্মরণীয় থাকিবে, তত দিন ঐ সমস্ত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজগণের এই ধর্ম্মানুরাগ কেহই বিস্মৃত হইবেন না। মিবারের সহিত বৈবাহিকবন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মারবার, অম্বর ও অন্যান্য রাজ্যের কলঙ্কিত রাজগণ আপনাদিগকে নিতান্ত পতিত ও অবমানিত মনে করিতেন। সে কলঙ্ককালিমা কিসে ধৌত হয়, তাহার উপায় ও তাহার চেষ্টা করিতেন। শিশোদীয় নৃপতিগণের নিকটে সবিনয়ে তাঁহারা এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আপনারা আমাদিগকে বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া জাতীয় কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করুন।

প্রতাপসিংহের প্রতিজ্ঞা ছিল, পতিত রাজগণের সহিত তিনি কোন সংস্রব রাখিবেন না। সেই প্রতিজ্ঞা সংরক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে অনেকবার অনেক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে, এক এক সময় প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞাপালনে মুহূর্ত্তের জন্য পরাঙ্মুখ হন নাই। ভট্টকবিগণের গ্রন্থে এবং মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের ইতিহাসে প্রতাপের এই মাহাত্ম্যের বিবরণ বিষদরূপে বর্ণিত আছে। একটি উদাহরণ এই স্থলে পরিগৃহীত হইল।

মানরাজা অম্বরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলে তাঁহার সমস্ত রাজ্য ক্রমে ক্রমে উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। সম্রাটের প্রসাদে তিনিও প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরাগভাজন হইলেন। বিজিত হিন্দুরাজ্যগুলি সুনিয়মে পালন করিবার অভিলাষে বাবর শাহ যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,

তাহা ঐ মানরাজার দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। আকবরের সহিত সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্‌দাসের কন্যার বিবাহ হয়। তিনিই রাজপুতানামধ্যে অসবর্ণবিবাহের প্রথম প্রবর্ত্তনকর্ত্তা। শতবর্ষ পূর্ব্বে বাবরের অন্তরে যে সঙ্কল্প সমুদিত হইয়াছিল, ঐ সময়ে ঐ উপলক্ষেই তাহা সুসিদ্ধ হইল। ভগিনীপতির সৌভাগ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত রাজা মানসিংহ যথেষ্ট উদ্যম ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবরও মানসিংহকে যথোচিত সম্মানপ্রদান করিয়া ভারত-ইতিহাসে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের উপলক্ষ হইয়া গিয়াছেন। মানসিংহের বাহুবলেই আকবরের প্রায় অর্দ্ধেক রাজ্যলাভ। ককেসসের তুষার-মণ্ডিত শিখর হইতে আরবসাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ মানসিংহের অসিপ্রভাবে বশীভূত হইয়াছিল। একদিকে কাবুলের ঘনসন্নিবিষ্ট ঘনপ্রতিম পর্ব্বতমালা, অন্য দিকে আরাকানের নিবিড় অরণ্যানী, এই দূরপ্রসারিণী সীমামধ্যে যতগুলি রাজ্য আছে, মোগলের অনুকূলে রাজা মানসিংহ তাহা জয় করিয়াছিলেন। সেই দুঃসাহসিক মহৎকার্য্য আজি পর্য্যন্ত রাজা মানসিংহের বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

শোলাপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অম্বররাজ মানসিংহ দিল্লীতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে কমলমীরে প্রতাপসিংহের নিকট আতিথ্য স্বীকার করিলেন। যথাবিহিত সম্মানের সহিত তাঁহার অভিনন্দন করা হইল; আহারীয় প্রস্তুত হইলে অম্বরপতি ভোজনার্থ আহূত হইলেন। উদয়-সাগরের শ্বেত-প্রস্তরমণ্ডিত সুমুন্নততটভূমে ভোজনাসন আস্তীর্ণ হইল। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র কুমার অমরসিংহ মানরাজের সম্মানসংবর্দ্ধনা করিবার জন্য তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন; রাণা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। অমরসিংহের মুখে প্রকাশ পাইল, রাণা শিরঃপীড়াবশতঃ আসিতে পারেন নাই। অম্বরপতির সন্দেহ হইল, কুমারের কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। পুনঃ পুনঃ তিনি রাণাকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, রাণাও পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকার ব্যপদেশ করিয়া উপ-স্থিত হইলেন না। মানসিংহের সন্দেহ ক্রমেই দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। অন্ন গ্রহণে তিনি অস্বীকার করিলেন। অগত্যা রাণা প্রতাপসিংহকে উপস্থিত হইতে হইল। মানরাজের সম্মুখে আসিয়া তিনি সগর্ব্বে বলিলেন,"রাজপুতকুলে জন্মিয়া যে ব্যক্তি তুর্কীর সহিত একত্র পান-ভোজন করেন, তুর্কীর করে যিনি আপনার ভগিনী সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত একত্র পান-ভোজন করা সূর্য্যবংশীয় রাণার কর্ম্ম নহে।"

অম্বরপতি নিরুত্তর। তাঁহার জ্ঞাননেত্র তখন উন্মীলিত হইল। স্পষ্টই তিনি বুঝিতে পারি-লেন, আপন দোষে আপনার অপমান আপনি আহ্বান করিয়াছেন। অনাহূত হইয়া তিনি রাণার গৃহে অভ্যাগত অতিথি, ক্ষাত্রধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া রাণাকে আত্মপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইল, মান-সিংহের সহিত তিনি ভোজন করিলেন না, ইহাতে তিনি অপরাধী হইতে পারেন না।

রাজা মানসিংহ কয়েকটিমাত্র অন্ন ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়াছিলেন, কেবল সেই কয়েকটি অন্ন আপন উষ্ণীষমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইলেন, অবিলম্বেই অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন; কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপে প্রতাপের দিকে নেত্রপাত করিয়া তিনি কহিলেন, "আপনার সম্মান-গৌরব রক্ষার জন্যই আমরা আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া তুর্কীর হস্তে কন্যা-ভগিনী সমর্পণ করিয়াছি। এখন বুঝিলাম, অনন্তকাল বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করা—অনন্তকাল সঙ্কটের ভীষণ গভীরতম কূপে নিমগ্ন থাকাই আপনার বাঞ্ছনীয়, তাহাই হইবে, অধিক দিন আপনাকে এ রাজ্যে বাস করিতে হইবে না। নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার দর্প খর্ব্ব করিতে না পারিলে আর আমি মানসিংহ বলিয়া পরিচয় দিব না।"

প্রতাপের অনুরূপ স্বরে তৎক্ষণাৎ প্রতাপসিংহও উত্তর করিলেন, "আপনার কথায় পরম সন্তুষ্ট হইলাম। রণক্ষেত্রে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরমসুখী হইব।" প্রতাপের বাক্য নিঃশেষ হইতে না হইতে পার্শ্বভাগ হইতে অমনি একটি শ্লেষব্যঞ্জক স্বর সমুত্থিত হইল, "সেই সময় তোমার ফুফা আক্‌বরকে সমভিব্যাহারে আনিতে বিস্মৃত হইও না।" মানসিংহ কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না, অবিলম্বে সগণে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহের জন্য উদয়সাগরের সমুচ্চ তটশিখরে আহার্য্যদ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল, ঐ স্থান অপবিত্র হইয়াছে বিবেচনায় রাণা সমস্ত দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি করিলেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। গঙ্গাজলসিঞ্চনে সরোবরতট পবিত্রীকৃত হইল। যাঁহারা যাঁহারা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আপনাদিগকে কলঙ্কিত বিবেচনায় তাঁহারা স্নান করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলেন।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইল। মানসিংহের অবমাননায় আপনাকে তিনি অপমানিত জ্ঞান করিলেন। ভীষণ রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রাণার প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। চিরস্মরণীয় হল্‌দীঘাটে মহাসংগ্রামের আয়োজন হইল। সম্রাট আক্‌বর শাহ প্রথম যুদ্ধে যুবরাজ সেলিমকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। যুবরাজকে সুমন্ত্রণাদানের জন্য সুমন্ত্রীর আবশ্যক, মানসিংহ ও সাগরজীর ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্র মহব্বৎ খাঁ সেলিমের সঙ্গে থাকিয়া সুমন্ত্রণা প্রদান করিতে নিয়োজিত হইলেন।

রাণা প্রতাপ গিরিদুর্গবাসী। তাঁহার রাজ্য নাই, সহায় নাই, সম্বলও নাই। কেবলমাত্র দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতবীর এবং কতিপয় ভীল মাত্র তাঁহার সহায়। ইঁহারা যবনের সহস্র সহস্র প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, প্রতাপসিংহের উন্নতিসাধনার্থ দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার হস্তেই হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের হৃদয়ের প্রচণ্ড উৎসাহই প্রতাপের একমাত্র সম্বল। সেই সামান্য সহায় ও সম্বলের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি প্রবলপ্রতাপশালী সুবিশাল যবনসেনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ প্রথমে অপ্রতিহত-গতিতে আরাবল্লী পর্ব্বতমালার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইল; ক্রমে নিবিড় পর্ব্বতরাজির পশ্চিমসীমাস্থ অপেক্ষাকৃত সুগম পথ দিয়া মোগল অনীকিনীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

উদয়পুরের পশ্চিমে দীর্ঘে প্রস্থে দশ দশ যোজন বিস্তীর্ণ একটি সমচতুষ্কোণ সুবিশাল প্রদেশ দৃষ্ট হয়, বীরকেশরী প্রতাপসিংহ সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন, ঐ স্থান সুবিস্তীর্ণ কূটপন্থাময় ও দুর্ভেদ্য। উদয়পুরের পার্শ্ববর্ত্তী দুর্গম সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া ঐ প্রদেশে উপস্থিত হইতে হয়। ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশ উদয়পুরের মধ্যবিন্দুর ন্যায় অধিষ্ঠিত। এই পার্ব্বত্যারণ্যপরিবেষ্টিত সুবিশাল প্রদেশের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী কুটিলগতিতে চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই দুর্ভেদ্য কূটপন্থাময় স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই গগনভেদী পর্ব্বত-প্রাকার ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই দুর্গম প্রদেশই সুপ্রসিদ্ধ হল্‌দীঘাট নামে পরিচিত।

চিরস্মরণীয় হল্‌দীঘাটের মনোহর গিরিব্রজের অধিত্যকাপ্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত রাজপুতবীরগণ চতুষ্পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত বিশাল ক্ষেত্রের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, মহাবল ভীলগণও সেই পর্ব্বতমালার অভ্রভেদী সানুপ্রদেশে উত্থিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে তূণীর ও করে কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সোৎসাহহৃদয়ে রণপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইল। একদিকে সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে

শত্রুকুল ছিন্ন করিবে, আর একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলারাশির প্রক্ষেপে বৈরিকুলের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে, এই অভিসন্ধিতে ভীলগণ আপন আপন পদতলসমীপে রাশি রাশি শিলাখণ্ড স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল। এইরূপে সৈন্যসামন্তে সুসজ্জিত হইয়া বীরপুঙ্গব রাণা প্রতাপসিংহ যবন-বাহিনীর আক্রমণ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

বর্ষাকাল। ১৬৩২ সংবতে (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণমাসের সপ্তম দিবসে যবনসেনাগণ রাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যদলের সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। অবিলম্বেই হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর মহাযুদ্ধ বাধিল। মিবারের স্বাধীনতারক্ষার জন্য—মিবারের চিরগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজপুতবীরেরা দ্বিগুণ উৎসাহে মহাবিক্রমে মোগলসেনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া ভীমবিক্রমে মোগলব্যূহভেদের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার রণনৈপুণ্য, বিপুলবিক্রম ও অলৌকিক সাহস দেখিয়া রাজপুতবীরগণের হৃদয় রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল;* রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া—জগতের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রুদ্ধকেশরি-বিক্রমে তাঁহারা দলে দলে মোগলসেনার উপর পতিত হইতে লাগিলেন।

মহাপ্রতাপ প্রতাপের প্রতাপসম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, তাঁহার অমানুষিক বিক্রমের প্রভাবে ভীত হইয়া যবনসেনারা অবিলম্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই ছিন্নভিন্ন যবনবাহিনীকে দলিত, মথিত ও বিতাড়িত করিয়া বীরকেশরী প্রতাপ সদলে উন্মত্তের ন্যায় রাজপুতকুলাঙ্গার মানসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতাপের প্রচণ্ডগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য মোগলবীরেরা নানারূপে প্রয়াস পাইলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। রাণা প্রতাপসিংহের করবালমুখে পতিত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য মোগলবীর দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল, শত শত যবনবীর ভল্লাগ্রে সংবিদ্ধ হইয়া রণভূমে শয়ন করিল, শত শত শত্রু প্রতাপের পদতলে বিদলিত ও মথিত হইতে লাগিল।

প্রতাপ কুলাঙ্গার মানসিংহকে দেখিতে পাইলেন না; মোগল-সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে, দ্বিগুণ সাহসে ও দ্বিগুণ বিক্রমে প্রতাপের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে তাঁহার শাণিত ভীষণ করবালের আঘাতে সেলিমের শরীররক্ষকগণ দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল; সেলিম প্রতাপের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ প্রিয়তম অশ্ব চৈতকের পৃষ্ঠে সমারূঢ়; সেলিম প্রমত্ত রণমাতঙ্গোপরি আসীন। প্রভুর অদ্ভুত সাহস, অদ্ভুত বীরত্ব ও অমানুষিক সাহস দেখিয়া চৈতক যেন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। সেলিমের রণমাতঙ্গের উৎকট শুণ্ডাস্ফালন ব্যর্থ করিয়া চৈতক তাহার বিস্তৃত কুম্ভোপরি আপন দক্ষিণপদ স্থাপন করিল; সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া প্রতাপও আপন করস্থিত মহাশূল মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। লৌহমণ্ডিত হাওদাতে প্রতিহত হইয়া সেই মহাশূল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, সৌভাগ্যবশে সে যাত্রা যুবরাজ সেলিম প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। প্রতাপের মহাশূল ব্যর্থ হইবার নহে, লৌহবিমণ্ডিত হাওদায় প্রতিহত হইবামাত্র দ্বিগুণবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাহুতের উপর নিপতিত হইল, গজপাল সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণবিসর্জ্জন করিল। অগত্যা সেলিম রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। মহাবীর প্রতাপসিংহ পলায়িত যুবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাসংগ্রাম ক্রমশঃ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। একদিকে সেলিমের প্রাণরক্ষার জন্য মোগলসেনারা উন্মত্ত, অন্যদিকে প্রতাপের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিতে রাজপুতবীরগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হিন্দুবীরগণ বীরবিক্রমে শত শত মোগলসৈন্য নিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দলে দলে মোগলসৈন্য আসিয়া রণক্ষেত্র সমাকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রতাপের

প্রাণরক্ষার্থ শত শত হিন্দুবীর রণভূমে শয়ন করিতে লাগিলেন, অসংখ্য অসংখ্য বীরপাতে রাজপুতসৈন্য ক্ষীণ হইয়া আসিল, তথাপি মহাপ্রতাপ প্রতাপের ভ্রূক্ষেপ নাই। মানসিংহের অনুসন্ধানার্থ উন্মত্তের ন্যায় তিনি সমরভূমে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মিবারের রাজচ্ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি সমুত্থিত হইল, রাজচিহ্ন দর্শনে চারিদিক্ হইতে মোগলসেনা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এই রাজচিহ্ন হইতে আরও তিনবার তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিলেন না। ক্রমে অগণন শত্রুসেনা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। যে দিকে তিনি নেত্রপাত করেন, অসংখ্য শত্রুমুণ্ড ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

এবার প্রতাপের বিষম সঙ্কট উপস্থিত! জীবন সঙ্কটাপন্ন! এরূপ ভীষণসঙ্কটেও রাণা প্রতাপসিংহ নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইলেন না; দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত মহাবিক্রমে শত্রুদল বিদলিত করিয়া মদমত্ত বারণপতির ন্যায় রণক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুনিক্ষিপ্ত ভল্ল হইতে তিনটি, গুলী হইতে একটি এবং তরবারি হইতে তিনটি, প্রতাপ সর্ব্বসমেত এই সাতটি আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িল, অনর্গল শোণিতস্রোতে সর্ব্বাঙ্গ অনুরঞ্জিত হইল, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, ব্যাকুলতা নাই। প্রতাপের নিকটে সহায় নাই, রক্ষক নাই, কেহই নাই। এরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ শত্রুব্যূহের মধ্যে থাকিলে জীবনসংশয়, এই বিবেচনায় তিনি ব্যূহভেদ করিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহসা অদূরে "জয় প্রতাপের জয়" এই জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। রাণাও তখন সদম্ভে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে সমুৎসাহিত হইয়া ছত্রধরও তৎক্ষণাৎ সমুজ্জ্বল রাজচ্ছত্র প্রভুর মস্তকোপরি ধারণ করিল।

অবিলম্বেই ভৈরবনাদে রণস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া ঝালাপতি মান্না উল্লম্ফনপূর্ব্বক সদলে ব্যূহমধ্যে প্রতাপের নিকটবর্ত্তী হইলেন; অবিলম্বে রাণার মস্তক হইতে রাজচ্ছত্র লইয়া আপনার মস্তকোপরি তুলিয়া দিলেন; লোহিত বৈজয়ন্তী উদ্যত করিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুসেনার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। রাজচিহ্ন দেখিয়া শত্রুগণ তাঁহাকে রাণা বলিয়া মনে করিল; তাঁহাকেই সংহার করিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল। বীরবর মান্না অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া, শত শত যবনবীর নিপাত করিয়া, সদলে জীবনবিসর্জ্জনপূর্ব্বক রাণা প্রতাপসিংহের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের জন্য মান্না এবং মান্নার ভবিষ্য বংশধরেরা তদবধি উচ্চতম রাজসম্মান ও উচ্চতম সম্ভ্রমচিহ্ন ধারণ করিয়া আসিতেছেন। *

প্রতাপের সেনা অপেক্ষা মোগলসেনার সংখ্যা শতগুণে অধিক, তাহাতে তাহারা আবার আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত; সুতরাং প্রতাপসিংহের সৈন্যগণ আর কতক্ষণ তাহাদের সম্মুখে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবে? ক্রমে ক্রমে দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতসৈন্যের মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র বীর রণভূমে শয়ন করিলেন। হলদীঘাটের প্রথম দিনের যুদ্ধাভিনয় সমাপ্ত হইল।

দুর্দ্দম রণশ্রমে প্রতাপ নিতান্ত পরিশ্রান্ত; সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও শোণিতানুরঞ্জিত, চৈতকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী তিনি রণভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া চৈতক

* প্রতাপসিংহ মান্নার বংশধরগণকে সপ্তি জনপদ ও অন্যান্য ভূমি বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা তদবধি রাজা উপাধিতে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। গমনকালে রাজবাটীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সম্মানসূচক নাগরাবাদ্য বাদিত হয়।

পর্ব্বতপ্রদেশের দিকে প্রধাবিত হইল। প্রতাপ যখন পলায়ন করেন, তখন তিনি একটি মুলতানী ও একটি খোরাসানী শত্রুসৈন্যের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ দুই দুর্ব্বৃত্ত গুপ্তভাবে রাণার অনুসরণ করিল। দ্রুতগতিতে গমন করিতে করিতে চৈতক একটি গভীর গিরিতরঙ্গিণীসমীপে উপস্থিত হইল; একলম্ফে তটিনী পার হইয়া প্রভুকে লইয়া প্রস্থান করিল। শত্রুদ্বয়ের অশ্ব চৈতকের ন্যায় লম্ফপ্রদানে সমর্থ নহে; নদী পার হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, চৈতক এই অবসরে প্রভুকে লইয়া অনায়াসে বহুদূরে পলায়ন করিতে পারিত, কিন্তু সমর্থ হইল না। রণশ্রমে অশ্বরাজ ক্ষীণবল হইয়াছিল, পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতগমনের শক্তি ছিল না; এ দিকে শত্রুদ্বয়ও আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল।

ইত্যবসরে অদূরে বন্দুকের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল; সঙ্গে সঙ্গে কে যেন রাজপুতভাষায় গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, "হো নীল ঘোড়ার আসওয়ার" (হে নীল অশ্বারোহী!) চমকিত হইয়া প্রতাপ পশ্চাদ্ভাগে নয়ন ফিরাইবামাত্র দেখিলেন, এক জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতেছে। সে অশ্বারোহী অপর কেহ নহে, প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ। যুগপৎ বিস্ময়, রোষ ও জিঘাংসা সমুদিত হইয়া প্রতাপের হৃদয় অধীর করিয়া তুলিল।

বিষম ভ্রাতৃবিরোধে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শক্তসিংহ আক্‌বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভ্রাতার হৃদয়শোণিতপানে একদিন জিঘাংসার শান্তি করিবেন, শক্তসিংহের মনে মনে বহুদিন হইতে এই সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু হলদীঘাটের রণক্ষেত্রে যবনব্যূহের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি যখন দেখিলেন, প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একাকী পলায়ন করিতেছেন, তাঁহার স্বাধীনতা যবনের হস্তে বিপন্ন, তখন শক্তসিংহের হৃদয়ে ভ্রাতৃভক্তির উদয় হইল। আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার বিপদুদ্ধারার্থে যবনবাহিনী পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুইটি দুর্ব্বৃত্ত যবনসেনা প্রতাপকে সংহার করিবার জন্য গুপ্তভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, পথিমধ্যে তাহাদিগের প্রাণবধ করিয়া শক্তসিংহ জ্যেষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

প্রতিহিংসা লইবার জন্যই হয় ত শক্তসিংহ উপস্থিত হইয়াছেন, হয় ত এত দিনের পর উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া জিঘাংসার শান্তি করিবার জন্যই তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছেন, এই সন্দেহে প্রতাপসিংহের হৃদয়ে বিষম ক্রোধের উদয় হইল; বাণবিদ্ধ ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় সিংহনাদ করিতে করিতে স্বীয় করাল করবাল সমুত্থাপিত করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। শক্তসিংহের হৃদয় তখন প্রশান্ত, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ স্মরণ করিয়া, ভূতবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক ভাবিয়া করুণরসে দ্রবীভূত। তাঁহার বদনমণ্ডল মলিন, বিষণ্ণ ও লজ্জাবশে অবনত। শক্তসিংহের এইরূপ নবীনভাব দেখিয়া অবিলম্বেই রাণা প্রতাপের সন্দেহ বিদূরিত হইল। শক্তসিংহও সম্মুখীন হইয়া জ্যেষ্ঠের পদতলে প্রণাম করিলেন, গলদশ্রুলোচনে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বকৃত অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস। বহুদিনের পর এই অপূর্ব্ব ভ্রাতৃমিলনে দুঃখের অবসান হইল; পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্নেহালিঙ্গনে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুসেকে পরস্পরের বক্ষ সিঞ্চিত করিলেন। অননুভূত আনন্দোচ্ছ্বাসের সময় হঠাৎ একটি শোকাবহ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। প্রতাপের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম অশ্ব চৈতক প্রাণবিসর্জ্জন করিল। হর্ষে বিষাদ ঘটিল।

চৈতক উপযুক্ত বীরের উপযুক্ত তুরঙ্গ। চৈতকের গুণেই প্রতাপ হলদীঘাটের প্রথমযুদ্ধে ভীষণ মোগলসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া নিরাপদে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চৈতক যে প্রভুর প্রাণরক্ষক, প্রতাপসিংহ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। সেই প্রাণোপম স্নেহাস্পদ চৈতককে গতায়ু দেখিয়া প্রতাপের শোকের পরিসীমা রহিল না। বহুদিনের পর প্রিয়জনের সহিত প্রিয়জনের মিলন স্বর্গ সুখপ্রদ, প্রতাপ সেই আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, বিধাতা তাহাতেও গরলরাশি ঢালিয়া দিলেন। যে স্থানে চৈতকের প্রাণবিয়োগ হয়, সেই স্থান বর্ত্তমান জারোলের অনতিদূরে অবস্থিত। অত্যল্পদিন পরেই প্রতাপ সেই স্থানে একটি বেদিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা "চৈতকা চাবুত্রা" নামে অভিহিত; মিবারের প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই প্রতাপের চিত্রের সহিত তদীয় প্রিয়তম অশ্ব চৈতকের চিত্র অঙ্কিত আছে।

অনেক বিলম্ব হইতেছে, পাছে সেলিমের হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়, এই আশ-ঙ্কায় শক্তসিংহ আপনার অনোকা্যা নামক অশ্বটি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মোগলশিবিরে পুনর্মিলিত হইতে গমন করিলেন। বিদায়গ্রহণকালে অগ্রজের পদতলে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "সুবিধা অনুসারে শীঘ্রই আপনার সহিত পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা করিব।"

ভ্রাতৃ-প্রদত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া রাণা প্রতাপসিংহ উদয়পুরে প্রস্থান করিলেন। যে দুইটি যবনসৈনিক প্রতাপসিংহের অনুসরণ করিতে গিয়া শক্তসিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের একজনের নাম খোরাসান, দ্বিতীয়ের নাম মূলতান। খোরাসানী সৈনিকের অশ্বে আরোহণ করি-য়াই শক্তসিংহ সেলিমের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে বিলম্বে ও ভাবভঙ্গী দর্শনে সেলিমের হৃদয় সন্দিগ্ধ হইল; শক্তসিংহের নিকট তিনি খোরাসানী ও মূলতানী সৈনিকদ্বয়ের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। শক্তসিংহের মনে ইতঃপূর্ব্বে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, অচিরে তাহাই ঘটিল। কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ জড়িতস্বরে কহিলেন, "প্রতাপ সেই দুই জনকেই সংহার করি-য়াছে, আমার অশ্বটি প্রতাপের হস্তে নিহত হইয়াছে. খোরাসানীর অশ্বে আরোহণ করিয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

শক্তসিংহকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সেলিমের সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল। অভয়দান করিয়া তিনি পুনরায় শক্তসিংহকে কহিলেন, "সত্য কথা বলিলে আমি আপনার সকল দোষ ক্ষমা করিব।" শক্তসিংহের বদনমণ্ডল তখন বর্ষাকালীন গগনের ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিল; নির্ভীক-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর করিলেন, "আমার ভ্রাতা প্রতাপসিংহ একটি বিশাল রাজ্যের অধি-পতি, তাঁহার ভাগ্যচক্রের উপর সহস্র সহস্র লোকের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে; তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি আমার কর্ত্তব্য?"

নিমেষমাত্র গম্ভীরবদনে থাকিয়া সেলিম শক্তসিংহকে বিদায় প্রদান করিলেন; আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শক্তসিংহের সহিত কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন না। শক্তসিংহ অচিরে অগ্রজের পদবন্দনা করিতে উদয়পুরে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভিনসোর-দুর্গ জয় করিয়া সেই দুর্গাধিকারই নজরস্বরূপ লইয়া ভ্রাতৃপদে বন্দনা করিলেন। উদারহৃদয় প্রতাপ ভ্রাতৃজিত দুর্গ স্বয়ং না লইয়া শক্তসিংহকেই ভূমিবৃত্তিস্বরূপ সমর্পণ করিলেন। ঐ দুর্গ বহুদিন পর্য্যন্ত শক্ত-সিংহের বংশধরগণের অধিকৃত ছিল। শক্তসিংহের জননী ভিনসোর-দুর্গেই অবস্থিতি করিতেন; তিনি "বাই জি রাজ" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

ভ্রাতৃবিরোধকালে জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি ভ্রাতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমান সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তিনিই আবার অনুকূলে দাঁড়াইয়া প্রতাপের জীবনরক্ষা করিলেন, শক্তসিংহের এই মহত্ত্ব ও এই গৌরবের বৃত্তান্ত চিরদিনের জন্য ইতিবৃত্ত-গ্রন্থে অক্ষুণ্ণভাবে কীর্ত্তিত রহিয়াছে। শক্তসিংহের কোন বংশধর দৃষ্টিপথের গোচর হইলে আজিও ভট্টগণ আনন্দের স্বরে তাঁহাকে "খোরাসানী-মুলতানীকা অগ্‌গল" বলিয়া সম্বোধন করেন।*

যে দিন পুণ্যভূমি হলদীঘাটের পর্ব্বতগাত্র ও শৈলপথ মিবারের বীরপুত্রগণের হৃদয়শোণিতে অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল, সেই ১৬৩২ সংবতের (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের) শ্রাবণ মাসের সপ্তম দিবস আর্য্যগৌরবের একটি জ্বলন্ত মহাযোগ। যত দিন জগতে রাজপুতজাতির একটিমাত্র বংশধরও জীবিত থাকিবেন, তত দিন কেহই এই প্রসিদ্ধ দিবসের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না; তত দিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে এই ঘটনা অঙ্কিত থাকিবে; এই মহাযুদ্ধে যে সকল আর্য্যবীর বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঝালাপতি মান্নার বীরত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। এই মহাবীর সার্দ্ধৈকশত সামন্তমাত্র সঙ্গে হইয়া সমুদ্রবৎ বিশাল মোগল-বাহিনীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অসংখ্য যবনসেনা নিপাত করিয়া সদলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হলদীঘাটের মহাসংগ্রামে মিবারের সমস্ত বীরবংশই একপ্রকার বীরশূন্য হইয়াছিল; অধিকাংশ বীররমণীর সীমন্তসিন্দূর অনন্তকালের জন্য বিধৌত হইয়াছিল। আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে চতুর্দ্দশ সহস্র বীর এই যুদ্ধে অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাণা প্রতাপসিংহের পাঁচ শত নিকট-কুটুম্ব, গোয়ালিয়রের রাজ্যভ্রষ্ট বিতাড়িত নৃপতি রামশা এবং তৎপুত্র বীরপুঙ্গব খাঁদেরাও সার্দ্ধত্রিশত বীরসহ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন।†

বর্ষাকাল; দিবারাত্রি অবিরল বারিধারা-পতন; পর্ব্বতপ্রদেশ ক্রমশই দুর্গম হইয়া উঠিল। অগত্যা বিজয়ী যুবরাজ সেলিম হলদীঘাট গিরিব্রজ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিছু দিনের জন্য প্রতাপসিংহ বিরামলাভের অবসর পাইলেন। দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, এইরূপে এক বর্ষ অতীত হইল। নববসন্তের নবীনা শোভা দর্শন দিল। পথঘাট পরিষ্কার হইলে দুর্দ্দান্ত মোগলেরা আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আবার তাহারা রণমদে উন্মত্ত হইয়া প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করিল। মোগলসেনার প্রতিকূলে পুনরায় প্রতাপকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল।

১৬৩৩ সংবতে (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে) মাঘ মাসের সপ্তম দিবসে পুনরায় হলদীঘাটে হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। দুর্ভাগ্যবশে সে যুদ্ধেও রাণা প্রতাপসিংহ পরাজিত হইলেন; তাঁহাকে উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া সেনাদল সমভিব্যাহারে কমলমীরে গমন করিতে হইল। এ দিকে মোগল-সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি কোকা শাহাবাজ খাঁ অবিলম্বেই কমলমীরে গমনপূর্ব্বক সেই গিরিদুর্গ আক্রমণ করিল। দুর্জ্জয় মোগল-আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া মহাবিক্রমে প্রতাপ অনেক দিন কমলমীরে রহিলেন বটে; কিন্তু আবুপতি স্বদেশদ্রোহী দেবররাজ আততায়ী হওয়াতে প্রতাপকে কমলমীর-দুর্গও পরিত্যাগ করিতে হইল। একটিমাত্র কূপ ভিন্ন কমলমীরে অন্য জলাশয় ছিল না। দেবররাজের নিকট এই গূঢ়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মোগলেরা বিষধর পতঙ্গ দ্বারা কূপজল দূষিত

---

* অর্থাৎ খোরাসানী ও মূলতানীর অর্গলস্বরূপ; যিনি খোরাসানী-মূলতানীর ভীষণ প্রতিরোধকারী।

† গোয়ালিয়রের পদচ্যুত রাজা রামশা মিবারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছিলেন।

করিয়া দিল। জলাভাবে নিরতিশয় কষ্ট হওয়াতে প্রতাপ সসৈন্য চৌন্দ নামক গিরিদুর্গে গমন করিলেন। মিবারের দক্ষিণপশ্চিমদিকে পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্যস্থলে চপ্পন নামে একটি জনপদ আছে। ভীলজাতি তত্রত্য অধিবাসী। চপ্পনের মধ্যে প্রায় তিন শত পঞ্চাশৎ নগর ও পল্লী আছে, সেই সমস্ত নগরের মধ্যে চৌন্দ একতম।

প্রতাপসিংহ চৌন্দের গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শত্রুর অত্যাচারে সে স্থানেও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। দুর্দ্ধর্ষ মোগলেরা সে দুর্গও আক্রমণ করিল। সে স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, সেই যুদ্ধে চৌন্দদুর্গ উদ্ধারের জন্য শোণিগুরু সর্দ্দার ভগসিংহ অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। একটি ভট্টকবিও এই সমররঙ্গে অদ্ভুত রণাভিনয় প্রদর্শন করিয়া আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন। যুদ্ধের সময় এই মহাকবি কতকগুলি হৃদয়োত্তেজক সমর-সঙ্গীত এবং স্বীয় নৃপতির বীরত্বকীর্ত্তনসূচক কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আজিও মিবারবাসীরা আনন্দের সহিত সেই সকল কবিতা পাঠ ও সঙ্গীতগুলি গান করিয়া থাকেন। সেই সকল সমর-সঙ্গীত-শ্রবণ করিলে নির্জ্জীব হৃদয়েও উৎসাহ ও বল সমুত্তেজিত হইয়া উঠে।

কালচক্রের আবর্ত্তনে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতাপ যবনকর্ত্তৃক চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। একদিন কমলমীর-দুর্গ যবনকর্ত্তৃক অধিকৃত, ধর্ম্মতী ও গোগুণ্ডা নামক গিরিদুর্গ দুটি মানসিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং মহব্বৎ খাঁ কর্ত্তৃক উদয়পুর অধিকৃত হইল, আমিশাহ নামক একজন যবনরাজ-কুমার চৌন্দ ও অগুণাপানোর মধ্যভাগে থাকিয়া ভীলগণের সহিত প্রতাপের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন; আর একদিকে ফরিদ খাঁ নামক অন্যতম যবনসেনানী চপ্পন আক্রমণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ হইতে একবারে প্রতাপের আশ্রয়স্থান চৌন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। বীরপুঙ্গব প্রতাপ একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। যে বিশাল মিবার-রাজ্যের একেশ্বর বলিয়া রাণা প্রতাপসিংহ গৌরবান্বিত, সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে আজি তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। প্রান্তরে প্রান্তরে, অরণ্যে অরণ্যে, কন্দরে কন্দরে যেখানে যেখানে তিনি গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই দুর্দ্দান্ত যবনেরা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশে কেহই প্রতাপকে ধৃত বা বন্দী করিতে সমর্থ হইল না। রাণা প্রতাপসিংহ যে প্রাণভয়ে পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতেন, তাহা নহে, গুপ্তভাবে থাকিয়া শত্রুর কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন; উপযুক্ত অবসর পাইলেই বীরবিক্রমে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিদলিত করিতেন।

এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে বহু দিন অতীত হইল। চৌন্দনগর অবরোধ করিয়া ফরিদ খাঁ মনে মনে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এইবার প্রতাপ তাঁহার হস্তে বন্দী হইবেন, সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। প্রতাপকে ধৃত করা দূরে থাকুক, তাঁহার বীরবিক্রমে অসংখ্য অসংখ্য যবনসেনা নিপতিত হইতে লাগিল। এ দিকে বর্ষাকালও উপস্থিত, পথঘাট দুর্গম হইয়া উঠিল; অগত্যা যবনসেনাপতিরা কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন।

বর্ষের পর বর্ষ আসিতে লাগিল। প্রতিবর্ষেই বর্ষাকালে মোগলেরা প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ধৃত বা বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রতাপ ক্রমে ক্রমে নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন, সমস্ত আশ্রয়স্থানগুলি ক্রমে ক্রমে যবনের হস্তগত হইল। দুঃখ-রাশির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন প্রতাপের চিন্তা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আত্মরক্ষার জন্য তিনি তত দূর ব্যাকুল হইলেন না, কিন্তু পুত্রকলত্রাদির ভাবনাই তাঁহাকে একান্ত অধীর করিয়া তুলিল। পাছে তাহারা শত্রুহস্তে নিপতিত হয়, পাছে পবিত্র শিশোদীয়বংশ যবনকলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে, এই

আশঙ্কা তাঁহার হৃদয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। একবার রাণার পরিবারবর্গ শত্রুহস্তে পতিত হুইবার উপক্রম হইলে ভীলেরা বংশকরণ্ডিকামধ্যে সকলকে রাখিয়া জবুরার টিনখনিতে লইয়া রক্ষা করিয়াছিল। বৃক্ষস্কন্ধে লৌহকীলক ও লৌহবলয় প্রোথিত করিয়া তাহাতে করণ্ডিকাগুলি ঝুলাইয়া ভীলেরা তন্মধ্যে রাজপুত্রগণকে স্থাপনপূর্ব্বক হিংস্রজন্তু হইতে রক্ষা করিত। অদ্যাপি জবুরা ও চৌন্দের গভীর অরণ্যানীমধ্যে বৃক্ষগাত্রে সেই সমস্ত কীলক ও লৌহবলয় বিদ্যমান আছে। পরিবারবর্গ টিনখনিমধ্যে লুক্কায়িত, রাজকুমারেরা বৃক্ষশাখায় করণ্ডিকামধ্যে রক্ষিত, এরূপ দুর্দ্দশাতেও প্রতাপ নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ হন নাই।

বীরকেশরী প্রতাপের দৃঢ় অধ্যবসায় এবং অদম্য ও অতুলনীয় সহিষ্ণুতার কথা লোকপরম্পরায় ক্রমে ক্রমে দিল্লীশ্বর আক্‌বরের কর্ণগোচর হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আক্‌বরের নিকট গুণের অনাদর হইত না, প্রতাপের এরূপ মহত্বের পরিচয় পাইয়া আক্‌বর তাঁহার উদ্দেশে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; সংবাদ সত্য কি না, অবগত হইবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিল, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতাপের উদ্দেশে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন।

ঘোর অরণ্যানীমধ্যে স্বীয় সামন্ত ও পারিষদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বিশাল পাদপতলে তৃণাসনে বসিয়া রাণা প্রতাপসিংহ বন্য কটুতিক্ত-ফলমূলাদি ভোজন করিতেছেন, সেই সামান্য দুনা (রাজপ্রসাদ) প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত সর্দ্দারেরাও আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, এমন সময়ে সম্রাট্‌-প্রেরিত গুপ্তচর গুপ্তভাবে থাকিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ দর্শন করিল। বিস্ময়ে তাহার হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুপ্তচর সম্রাটের নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত বর্ণনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রতাপের প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রতাপের মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া সম্রাট্‌ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; রাণার প্রতি তাঁহার মহতী ভক্তির উদয় হইল। যে সমস্ত রাজপুতকুলাঙ্গার স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যাবনিক ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রতাপের মাহাত্ম্যশ্রবণে তখন তাঁহাদিগেরও হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ভট্টকবির কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে, দিল্লীশ্বরের প্রধান সামন্ত খাঁ-খানান * প্রতাপের মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "জগৎসংসারের কিছুই নিত্য নহে, কিছু দিন পরে সমস্তই লয় পাইবে; কিন্তু মহাপুরুষ প্রতাপসিংহের কীর্ত্তি অনন্ত জগতে অনন্তকাল সজীবরূপে কীর্ত্তিত থাকিবে।"

বিশালরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাণা প্রতাপসিংহ আজি মহারণ্যে নিভৃতস্থানে অনাহারে অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনাতেও তিনি নিজের কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিলেন না, কিছুতেই তিনি বিচলিত হইলেন না; অটল-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার চির-অনুগত, যাঁহারা আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে সমুদ্যত, কিসে তাঁহাদিগের মানসম্ভ্রম রক্ষিত হইবে, কেবল এই চিন্তাতেই রাণা অহর্নিশ ম্রিয়মাণ। আর একটি চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময়ী। পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ অনাহারে অনিদ্রায় দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হইতেছে। উপাদেয় রাজভোগ্য সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া যাঁহারা দুগ্ধফেননিভ সুখশয্যায় লালিতপালিত, আজি তাঁহাদিগকে পশুপালের ন্যায় অরণ্যবাসে থাকিয়া তিক্তকষায়-ফলমূলাদি ভক্ষণপূর্ব্বক

* খাঁ-খানান অত্যুচ্চ গৌরবসূচক উপাধি। বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জ্জা খাঁ এই উপাধি ধারণ করিতেন, খাঁ-খানান বলিয়াই সকলে তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন।

তৃণশয্যায়—ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। রাণা প্রতাপকে মধ্যে মধ্যে এরূপ অবস্থাতেও পতিত হইতে হইয়াছে যে, আহারীয় প্রস্তুত, শিশুসন্তানগণ আহার করিতে উদ্যত, সহসা দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মোগলসৈন্যের আগমনাশঙ্কা হইল, আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লুক্কায়িত হইলেন।

একদিন রাণার মহিষী ও পুত্রবধূ তৃণবীজচূর্ণে কয়েকখানি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধেক বালক-বালিকাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া অবশিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলেন। বালক-বালিকারা আহার করিতেছে, পার্শ্বে অনতিদূরে তৃণশয্যায় শয়ান হইয়া রাণা আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, সহসা তাঁহার কন্যার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চমকিত হইয়া রাণা বালিকার দিকে নেত্রপাত করিবামাত্র দেখিলেন, একটি বনবিড়াল পিষ্টকার্দ্ধ হরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে, সেই জন্যই সুকুমারী বালিকা রোদন করিয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপ যেন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে, প্রাণোপম পুত্রগণ কালসমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, বিশ্বস্ত আত্মীয়স্বজন চিতোরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তথাপি একদিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য রাণা প্রতাপের হৃদয় নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হয় নাই। আজি সে উদ্যম—সে উৎসাহ—সে অধ্যবসায় সমস্তই বিলুপ্ত হইল। আহারাভাবে প্রাণোপমা স্নেহপুত্তলী সুকুমারী বালিকা রোদন করিতেছে, বীরহৃদয় প্রতাপের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না; অধীর হৃদয়ে উন্মত্তের ন্যায় তৃণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় নির্ব্বোধ পাষণ্ডকে ধিক্! এরূপ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়া যদি রাজসম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়, সে রাজসম্ভ্রমেও সহস্র সহস্র ধিক্!" এই বলিয়াই যন্ত্রণার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনপূর্ব্বক তিনি তৎক্ষণাৎ আক্‌বরের নিকট যন্ত্রণা-প্রশমনের উপায় করিবার জন্য একখানি প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিলেন।

দিল্লীশ্বর আক্‌বরের হৃদয়সাগর আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যাঁহার জন্য বহুদিন হইতে ভীষণ ভীষণ মহাযুদ্ধে পরিলিপ্ত রহিয়াছেন, যাঁহাকে আত্মবশে আনিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির হৃদয়শোণিতে তরবারি অনুরঞ্জিত করিতে হইয়াছে, যাঁহার জন্য রাজবারার প্রায় সমগ্র বীর তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, সেই মহাপুরুষ—সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহাপ্রতাপ রাণা প্রতাপসিংহ আজি যাজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এ আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। দিল্লীশ্বরের আদেশে দিল্লীনগরী অবিলম্বেই আনন্দনগরী হইয়া উঠিল। নগরের প্রত্যেক গৃহে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। মোগলবংশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যেন আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িল।

১৫১৫ সংবতে মুন্দরাধিপতি যোধরাও যোধপুরে রাজধানী স্থাপন করিলে তাঁহার পুত্র বিকা মরুপ্রান্তরে বিকানীর রাজ্য সংস্থাপন করেন। অল্পদিনের মধ্যে বিকানীর উন্নতি-সোপানে আরোহণ করে। বিকানীর মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিকার বংশধর বিকানীরপতি রায়সিংহ আপনাদিগের জ্যেষ্ঠ মারবাররাজ মালদেবের ঘৃণিত উদাহরণের অনুসরণ করিলেন। রায়সিংহের ভ্রাতার নাম পৃথ্বীরাজ। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে পৃথ্বীরাজ দিল্লীশ্বর আক্‌বরের হস্তে বন্দী। পৃথ্বীরাজের বীরত্ব, মহত্ব, স্বদেশপ্রেমিকতা প্রভৃতি গুণাবলী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ঘটনাবশে যবনসম্রাটের নিকট বন্দী হইলেও তাঁহার হৃদয় বীরতেজে সমুত্তেজিত ছিল। বাগ্দেবীর করুণায় কবিত্বশক্তিতে তিনি তাৎকালিক ভট্টকবিগণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর আক্‌বর শাহ প্রতাপের প্রার্থনাপত্রখানি পৃথ্বীরাজকে দেখাইলেন।

পত্রখানি পাঠমাত্র পৃথ্বীরাজের হৃদয় দারুণ মর্ম্মবেদনায় নিপীড়িত হইল। প্রতাপের লিখিত পত্র বলিয়া কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। নির্ভীকহৃদয়ে সম্রাট্‌কে সম্বোধন করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন, "আমি প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনি, তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করি, আপনি যদি স্বয়ং তাঁহার মস্তকে দিল্লীর রাজমুকুট পরাইয়া দেন, তথাপি মহাতেজা প্রতাপ আপনার নিকট অবনতিস্বীকার করিবেন না। আমার বিশ্বাস, এ পত্র কখনই তাঁহার লিখিত নহে।"

দিল্লীশ্বর আর কোন কথাই কহিলেন না। সম্রাটের অনুমতি লইয়া পৃথ্বীরাজ প্রতাপসিংহের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রখানি কবিতায় লিখিত হইল। পত্রের গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ। পত্রখানি পাঠ করিলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন পৃথ্বীরাজ প্রতাপের অবনতি-স্বীকারের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু তাহা নহে। যাহাতে যবনের নিকটে অবনতি স্বীকার করিয়া প্রতাপ কুলগৌরব, সম্ভ্রমগৌরব নষ্ট না করেন, ইঙ্গিতে তাহারই অনুরোধ করা হইয়াছে। দূতের হস্তে পত্রখানি প্রেরিত হইল। যথাসময়ে পত্র হস্তগত হইলে রাণা প্রতাপ-সিংহ পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ,—

"হিন্দুগণের আশা-ভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর রহিয়াছে। কিন্তু রাণা তৎসমস্তই পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত। আমাদের রাজন্যগণের জাতীয়-বীরত্ব আর নাই, রাজপুত-মহিলারাও পবিত্র সম্মানগৌরব হারাইয়াছেন, প্রতাপ না থাকিলে আক্‌বর সকলকেই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। রাজপুতবংশরূপ বিশাল বিপণিতে একজনমাত্র ক্রেতা,—কে সে ক্রেতা?—আক্‌বর শাহ! আক্‌বর কর্ত্তৃক সকলেই ক্রীত হইয়াছেন, অবশিষ্ট একমাত্র উদয়ের পুত্র প্রতাপ।—প্রতাপ অমূল্য। প্রকৃত রাজপুত বলিয়া যিনি পরিচয় দেন, নৌরোজার জন্য তিনি কি আপন মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিতে পারেন?—তথাপি কত লোক তাহা দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া কি চিতোরও এই হাটে উপস্থিত হইবে? রাণা বিষয়-বিভব, রাজ্য সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে অমূল্য রত্ন এখনও ত্যাগ করেন নাই। অনন্যোপায় হইয়া অনেকেই এই হাটে আগমনপূর্ব্বক স্বচক্ষে আপনাদিগের অবমাননা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এ কলঙ্ক কেবল হামিরের বংশধরকে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। জগৎ প্রশ্ন করিতেছে, কাহার সাহায্যে প্রতাপ এই কলঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন?—নিষ্কোষিত তরবারি ও মহাপ্রাণতার সাহায্যেই অমূল্য রত্ন রক্ষিত হইয়াছে, এ প্রশ্নের উত্তর ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানব বিপণির ক্রেতা, চিরদিন জীবিত থাকিবেন, ইহাও অসম্ভব; একদিন তাঁহাকে অবশ্যই ইহলোক হইতে শেষবিদায় লইতে হইবে। তখন আমাদের কুলগৌরব ও মানসম্ভ্রমরক্ষার ভার প্রতাপের উপর সমর্পিত হইবে; আমাদিগের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে তখন প্রতাপ রাজপুতবীজ রোপণ করিবেন। যাহাতে এই বংশমর্য্যাদা রক্ষিত হয়, যাহাতে ইহার পবিত্রতা একদিন সমুজ্জ্বল আভা ধারণ করে, সতৃষ্ণ নয়নে প্রতাপের দিকে চাহিয়া সকলেই সেই জন্য উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইল। তেজস্বিনী কবিতার তেজস্বিনী রচনাপাঠে মহোৎসাহে প্রতাপের হৃদয় সমুৎসাহিত হইয়া উঠিল; তাঁহার শিরায় শিরায় যেন উষ্ণ-শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, নবীন বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতাপ আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। সতৃষ্ণ-নয়নে প্রতাপের দিকে চাহিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে, এ কথা পাঠ করিয়া কি প্রতাপ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন?

সূর্য্য যে সময় মেষরাশিতে প্রবিষ্ট হন, পূর্ব্বদেশীয় মুসলমানেরা সেই সময় একটি মহোৎসবের

অনুষ্ঠান করে; সেই মহোৎসবের নাম "নৌরোজা" (নববর্ষারম্ভ)। পৃথ্বীরাজের কবিতামধ্যে যে নৌরোজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উঁহার অর্থ নববর্ষারম্ভ নহে, একটি গূঢ় অর্থে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল। আক্‌বর স্বেচ্ছাক্রমে খোসরোজ (আনন্দবাসর) নামে একটি মহোৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এখানে নৌরোজ শব্দে সেই আনন্দবাসরই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহা একটি প্রসিদ্ধ উৎসবের দিন। এই দিবসে মোগলরাজ্যের সকলেই আনন্দে উন্মত্ত থাকিত। রাজসভাতে সকল অবস্থার লোকই উপস্থিত থাকিত। মহিষীও মহাসমারোহে দরবারে বসিতেন; সম্রান্ত সম্রান্ত বংশীয় মুসলমান-রমণীগণ ও সমস্ত রাজপুত-মহিলারাও এই সমারোহে যোগদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত রাজবাটীর নিকটে স্ত্রীলোকের একটি মেলা হইত। তথায় পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিত না। নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি লইয়া রাজপুত-ললনাগণ ও মুসলমান-রমণীরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেন। রাজপরিবারভুক্ত রমণীরা তন্মধ্য হইতে মনোমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইতেন। ছদ্মবেশে সম্রাট্ ঐ মেলায় উপস্থিত হইয়া পণ্যদ্রব্যের প্রকৃত মূল্য অবগত হইতেন; রাজ্যের অবস্থা ও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধে কে কি প্রকার মতামত প্রকাশ করে, গোপনে তাহাও জানিতেন।

এই উৎসবের মূলে যে একটি ঘৃণিত দুষ্প্রবৃত্তির বীজ রোপিত ছিল, বুদ্ধিমানেরা সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আবুলফজল নিজ গ্রন্থে সেই দুরভিসন্ধি গোপন রাখিবার জন্য অনেক কৌশল করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভট্টগণের কাব্যগ্রন্থে সম্রাটের সমস্ত গুপ্ত অভিসন্ধিই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে কত অভাগিনী রাজপুতললনার পবিত্র সতীত্বরত্ন যে কুলাঙ্গার মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, কত পবিত্র রাজপুতকুলের মানসম্ভ্রম যে কলঙ্কস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, ভট্টগ্রন্থে বিষাদের কালিমামণ্ডিত শোকাক্ষরে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে। আক্‌বরকে সকলে "জগদ্‌গুরু" "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ইত্যাদি পবিত্র উচ্চসম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এই পাপময় কলঙ্কোৎসবের কথা মনে পড়িলে মোগলকেতন সেই আক্‌বরকে ঐ সমস্ত উপাধির যোগ্য বলিয়া বিবেচনা হয় না; বরং কপটতাপূর্ণ বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতে হয়।

একবার আনন্দবাসরের আনন্দবাজারে ছদ্মবেশে সম্রাট্ আক্‌বর শাহ ভ্রমণ করিতেছিলেন, পৃথ্বীরাজের স্ত্রীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার নেত্রমুকুরে প্রতিফলিত হইল; সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনপ্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল, হৃদয়ে পাপ-প্রবৃত্তির উদয় হইল; রাজপুতসুন্দরীকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর শক্তসিংহের কন্যার সহিত বিকানীর রাজকুমার পৃথ্বীরাজের বিবাহ হয়। উচ্চবংশের অনুরূপ উচ্চতম গুণেও রাজকুমারী বিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনা তৎকালে রাজবারার মধ্যে দৃষ্ট হইত না। বহু পুণ্যবলে পৃথ্বীরাজ তাদৃশী রূপবতী গুণবতী রমণী লাভ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশে পৃথ্বীরাজ আক্‌বরের নিকট বন্দী বটে, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও সম্রাটের পদানত বা প্রসাদপ্রত্যাশী হন নাই। সহধর্ম্মিণীর গুণে, সহধর্ম্মিণীর পবিত্র প্রেমালাপে বন্দী অবস্থাতেও তিনি একপ্রকার সুখে দিনপাত করিতেন।

যে পথ দিয়া সরলা রাজকুমারী সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, সেই পথ দিয়াই মেলা হইতে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, কিয়দ্দূর আসিয়াই দেখিলেন, চারিদিকের দ্বার অবরুদ্ধ, কোন দিকেই

পথ নাই। বিস্ময়ে, সন্দেহে, ভয়ে তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। সহসা একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল। উন্মুক্ত দ্বারপথে মদনোন্মত্ত আকবর বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান। নানারূপ প্রলোভন-বাক্যে তিনি রাজকুমারীকে প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রোষে অধীরা হইয়া বীরাঙ্গনা তৎক্ষণাৎ কটিদেশ হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া আকবরের হৃদয়োপরি স্থাপন করিলেন এবং কঠোরস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাপিষ্ঠ! যবনকুলাঙ্গার! ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল্, যত দিন বাঁচিয়া থাকিবি, রাজপুতকুলে কলঙ্কার্পণ করিতে ইচ্ছা করিবি না; শীঘ্র বল্, শপথ কর্; নচেৎ এই ছুরিকা এই মুহূর্ত্তেই তোর হৃদয়শোণিত পান করিবে।"

সতীর অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহস দর্শনে আকবরের হৃদয় স্তম্ভিত হইল; পাপপ্রবৃত্তি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয়মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। জ্ঞানালোকের দিব্যজ্যোতি তাঁহার হৃদয়ে দর্শন দিল, সতীর আদেশ পালন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। এই সতীপ্রধানা রাজকুমারীর বিমলচরিত্র সম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থে নানাপ্রকার প্রশংসা কীর্ত্তিত আছে। পৃথ্বীরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রায়সিংহের পত্নী সামান্য রত্নভূষণের বিনিময়ে আকবরের হস্তে অমূল্য সতীত্বরত্ন বিক্রয় করিয়াছিলেন। পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া রায়সিংহপত্নী পতিগৃহে প্রত্যাগত হইলে, পৃথ্বীরাজ মর্ম্মভেদী স্বরে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, "মণিকাঞ্চনময় বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া শিঞ্জিনীরবে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ঐ যে আপনার ধর্ম্মপত্নী আবার আপনার অঙ্কলক্ষ্মী হইতে আসিতেছে; কিন্তু দাদা, এ কি? আপনার বদনালঙ্কার গুম্ফ হরণ করিয়া লইল কে?" *

তেজস্বিতায়, বীরত্বে ও সাহসে পৃথ্বীরাজ যেরূপ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, তাঁহার গুণবতী সতীপ্রধানা মহিষীও সেইরূপ তেজস্বিনী, সাহসসম্পন্না বীরাঙ্গনা। পৃথ্বীরাজের পত্র পাঠ করিয়া প্রতাপসিংহের হৃদয় পুনরুত্তেজিত হইয়া উঠিল। এ দিকে সম্রাট্ তাঁহাকে অবনত মনে করিয়া দিল্লীনগরে আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত আছেন, সহসা সেনাদল লইয়া প্রতাপ অবিলম্বেই মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন; রাজপুতসেনার হস্তে অসংখ্য অসংখ্য মোগলসেনা নিহত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রতাপের অভীষ্টসিদ্ধি হইল না; লক্ষ লক্ষ মুসলমানসৈন্য আসিয়া যোগদান করিতে লাগিল। ক্রমে মোগলসেনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া প্রতাপ সদলে পলায়ন করিলেন। আবার মুসলমানসেনাগণ পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে, বনে বনে প্রতাপের অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধানে সমর্থ হইল না। যখন যখন উপযুক্ত অবসর দেখেন, সেই সেই সময়েই সদলে উপস্থিত হইয়া রাণা প্রতাপ মোগলসেনা বিদলিত, মথিত ও ছিন্নভিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। ক্রমে প্রতাপের সহায়-সম্বল ক্ষীণ হইয়া পড়িল। বন্যফল-মূল ও বৃক্ষপত্রাদি ভক্ষণ করিয়া অতি কষ্টে দিনযামিনীযাপন করিতেছিলেন, ক্রমে বনমধ্যে সেরূপ ফলমূলাদিরও অভাব হইল। আহারাভাবে মরিতে হইবে, সে জন্য প্রতাপ কিছুমাত্র চিন্তিত নহেন, কিন্তু যে জন্মভূমির জন্য এত কষ্টভোগ করিতেছেন, যে জন্মভূমি রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়শোণিতপাতে পৃথিবী রঞ্জিত হইল, তাহার কি করিলেন? হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী মহিষী চিন্তার বিষদংশনে জর্জ্জরিত—পথের কাঙ্গালিনী; হৃদয়ের প্রীতিপ্রস্রবণ পুত্রকন্যাগণ আহারা-ভাবে জীর্ণ-শীর্ণ; সহায় নাই, সম্বল নাই, স্বাধীনতাও বিপন্নপ্রায়। এ অবস্থায় কিরূপে ভীমপরাক্রান্ত

* রাজপুতকুলের গৌরবচিহ্ন

মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে রণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? উপায়ান্তর না দেখিয়া বীরকেশরী প্রতাপ সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী সগদিরাজ্যে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্ত কতিপয় সর্দ্দার ও পুত্রকন্যাদি লইয়া রাণা প্রতাপসিংহ অবিলম্বে আরাবল্লী-শিখরে সমুত্থিত হইলেন; প্রাণ ভরিয়া চিতোরের দিকে নেত্রপাত করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে জন্মের মত শেষবিদায় গ্রহণ করিলেন। জীবনে আর কখনও মিবাররাজ্য দর্শন করিতে পাইবেন না, জীবনে আর বুঝি ম্লেচ্ছগণকে দূরীভূত করিয়া জন্মভূমির কলঙ্ক দূর করিতে সমর্থ হইবেন না, এই চিন্তায় বিষাদের ছায়া আসিয়া প্রতাপের মুখচন্দ্র মলিন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে মলিনবদনে তিনি গিরিশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

যিনি যতই চেষ্টা করুন, যিনি যতই ব্যাকুল হউন, আপন ইচ্ছায় সিদ্ধিলাভে কেহই সমর্থ নহেন, বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই অবশ্যম্ভাবী। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন্ কাহার প্রতি সুপ্রসন্না হন, কে বলিতে পারে? এত কষ্ট ভোগ করিয়া—এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া—পশুর ন্যায় বনে বনে বাস করিয়াও মুহূর্ত্তের জন্য রাণা ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। আজি জন্মের মত জন্মভূমির নিকট শেষ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিতেছেন, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; রাণার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও করুণার সঞ্চার হইল। আরাবল্লী হইতে অবতরণ করিয়া প্রতাপ যেমন মরুভূমির সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, সহসা তাঁহার পরমবিশ্বস্ত মন্ত্রী ভামশা সম্মুখে উপস্থিত; অতুল ধনরাশি লইয়া মন্ত্রিবর প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিলেন। ভামশা পুরুষানুক্রমে মিবারের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত। পুরুষানুক্রমে যাঁহাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া এত দিন ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, ভামশা সেই আশ্রয়দাতার বংশধরেরই পদে সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ সমর্পণ করিলেন। সেই ধনরাশি দ্বারা একাদিক্রমে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যের ভরণপোষণ চলিতে পারে। এই সময় হইতেই মন্ত্রিবর ভামশা "মিবারের উদ্ধারকর্ত্তা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে লাগিলেন।

প্রতাপের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অচিরেই তিনি সৈন্যসামন্তের আয়োজন করিয়া মোগল-সেনাপতি শাবাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দেবীরক্ষেত্রে উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। প্রতাপের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শাবাজ খাঁ সদলে রণশায়ী হইলেন। কতিপয়মাত্র মুসলমানসেনা জীবন লইয়া পলায়ন করিল। রাণা প্রতাপ পলায়মান সেনাগণের অনুসরণ করিতে করিতে আর একটি মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হইলেন, তাহারাও প্রতাপের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। অচিরে সমস্ত মোগলদিগের মধ্যেই এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। প্রতাপকে সদলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য অগণ্য মোগলসেনা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। এ দিকে মহাপ্রতাপ প্রতাপ কমলমীর দুর্গে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সেনাপতি আবদুল্লাকে সদলে সংহার করিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বাত্রিংশৎটি দুর্গ প্রতাপের পুনরধিকৃত হইল। এইরূপে ১৫৮৬ সংবতে (১৫৩০ খৃষ্টাব্দে) অল্পদিনের মধ্যেই চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত মিবারের সমগ্র প্রদেশই প্রতাপ অধিকার করিয়া লইলেন। স্বদেশদ্রোহী দুরাচার মানসিংহকে প্রতিফল দিবার অভিলাষে রাণা প্রতাপসিংহ অম্বররাজ্য আক্রমণ করিলেন; অল্পক্ষণমধ্যে তত্রত্য প্রধান বাণিজ্যনগর মালপুর ছারখার হইয়া গেল। উদয়পুর পুনরুদ্ধারে প্রতাপকে অধিক আয়াসস্বীকার করিতে হইল না। তাঁহার ভীমপ্রতাপ ও মহাবিক্রম দর্শনে ভীত ও পরিতুষ্ট হইয়া মুসলমানেরা বিনা বিগ্রহে উদয়পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

প্রতাপ মিবারের প্রায় সমস্ত স্থানই অধিকার করিলেন, কিন্তু প্রতাপের মনে শান্তি নাই;

প্রতাপ সুখী হইতে পারিলেন না। যাহার জন্য তিনি সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা ও তত লাঞ্ছনা সহ্য করিলেন, সে চিতোর যবনের অধিকৃত রহিল; সহস্র বৎসর ধরিয়া গিহ্লোটকুল যাহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিতোর আজি দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছ-করে শাসিত হইতেছে। প্রতাপ সে চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না। যে দুর্দ্দান্ত হিন্দুবৈরী যবনকুলাঙ্গার আজীবন তাঁহাকে যুদ্ধবিগ্রহে পরিলিপ্ত রাখিয়াছে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে, অরণ্যে অরণ্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়া যে প্রকাণ্ডবৈরী তাঁহাকে পশুর ন্যায় চালন করিতেছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ যবনসম্রাট আক্‌বরকে প্রতিফল দিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং প্রতাপের শান্তি কোথায়? প্রতাপের হৃদয়ে সুখই বা কোথায়?

প্রতাপের আর যৌবনের আশা নাই। প্রবীণবয়সের প্রারম্ভেই অকালবার্দ্ধক্য উপস্থিত। চিন্তায় চিন্তায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থল দগ্ধীভূত। তেজস্বিনী আশার পরিবর্ত্তে এখন তাঁহার হৃদয়ে শান্তি-ভাব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহা হইতে চিতোরোদ্ধার হইল না, আশাও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। চিতোর জীবন অপেক্ষাও তাঁহার প্রিয়তম। উদয়পুরের সমুন্নত সুদৃশ্য সৌধশিখরে সমাসীন হইয়া তিনি প্রায়ই চিতোরের গগনভেদী স্তম্ভরাজির দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; কঠোর-তম উদ্যমে ও অধ্যবসায়েও চিতোরনগরী উদ্ধার করিতে পারিলেন না, দারুণ মনস্তাপে তিনি অনুদিন দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতেন।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে উদয়পুরের সমুচ্চ-সৌধশিরে বসিয়া রাণা প্রতাপসিংহ চিতোরের অভ্রভেদী স্তম্ভরাজির দিকে নেত্রপাত করিয়া আছেন, সান্ধ্যসূর্য্যের অরুণরশ্মিমালায় স্তম্ভগুলি সুরঞ্জিত হইয়াছে, সেই মনোহারিণী শোভা দেখিতে দেখিতে রাণা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার নেত্রপদ্ম উন্মীলিত বটে, কিন্তু দৃষ্টি বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতের একটি বিশাল চিত্রে সন্নি-বিষ্ট। রাণার বহিশ্চক্ষু চিতোরের প্রাকার ও স্তম্ভের দিকে সংযত, কিন্তু অন্তশ্চক্ষু অন্তর্জগতের নানা চিত্র—নানাকাণ্ড দর্শনে সন্নিবিষ্ট। তিনি দেখিতেছেন, যেন তরুণবয়স্ক বাপ্পা মানরাজার মস্তক হইতে রত্নকিরীট কাড়িয়া লইয়া আপনার শিরোপরি ধারণ করিলেন; পরক্ষণেই মহাবীর সমর-সিংহ যবনকবল হইতে ভারতের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী উদ্ধার করিবার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন এবং স্বদেশরক্ষার্থ আত্মবলি দিয়া মহারাজ বীর পৃথ্বীরাজের সহিত দৃষদ্বতীতীরে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিলেন। সহসা নিবিড় মেঘমালা আসিয়া চিতোর সমাচ্ছন্ন করিল। সেই কৃষ্ণজলদজাল অপ-সারিত করিয়া চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর তেজোময়ী প্রতিমূর্ত্তি চিতোরের দুর্গপ্রাকারোপরি আবির্ভূত হইল; তাঁহার ভীমনাদে সমস্ত মিবারভূমি বিকম্পিত হইয়া উঠিল। অমনি রাণা লক্ষ্মণসিংহ একা-দশটি কুমার সহ হৃদয়শোণিতদানে চামুণ্ডাদেবীর প্রীতিসম্পাদন করিলেন। দেখিতে দেখিতে আরও ভীষণ দৃশ্য! দেবলসর্দ্দার বাঘজী, মহাবীর জয়মল্ল, বীরকেশরী পুত্ত এবং তাঁহার বীর্য্যবতী জননী ও বীরপ্রধানা পত্নী সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। চিতোরের সর্ব্বাঙ্গ যেন নিবিড় জলদ-মালায় সমাচ্ছন্ন হইল। অমনি বিদ্যুদ্গতিতে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে চিতোরনগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মাদিনীর ন্যায় পলায়ন করিলেন। চারিদিকে হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল; যেন জগতের মহাপ্রলয় সমুপস্থিত।

বিস্মিত, চমকিত, বিষাদিত ও মনঃপীড়ায় নিপীড়িত হইয়া প্রচণ্ডবেগে রাণা প্রতাপসিংহ শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান পুনরুদিত হইল। দিবাকর তখন অস্তমিত। প্রচণ্ডবেগে পবনদেব প্রবাহিত। জাগ্রত স্বপ্নের এই ভয়াবহ অভিনয়ের পর আবার রাণা প্রতাপসিংহ

আত্মবিষয়িণী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। আবার শোক ও জিঘাংসা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। শত্রুকুল যুদ্ধ না করিয়া বিনা বিবাদে উদয়পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল, তাহাদিগের সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া বীরকেশরী প্রতাপ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

চিন্তায় চিন্তায় বীরপুঙ্গব প্রতাপের হৃদয়পঞ্জর ভগ্ন হইয়া পড়িল। অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও যে হৃদয় এককালে অটলভাবে অবস্থিত ছিল, এখন তাহা একেবারে শোচনীয়রূপে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ভগ্নহৃদয় লইয়া আর অধিক দিন তাঁহাকে মানবজগতের ভীষণচিত্র দেখিতে হইল না; অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

বীরকেশরী প্রতাপ পেশোলাসরোবরতীরে অনেকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মিবারের অধঃপতনের সময় কুটীরগুলি ভগ্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়। রাণা প্রতাপসিংহ আত্মরক্ষার জন্য সর্দ্দারগণকে লইয়া প্রথমে সেই সকল কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজি জীবনের চরমসময়েও প্রতাপ সেই সরোবরতীরে একটি কুটীরমধ্যে সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া কালের কঠোর আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রহিলেন। শয্যার চারিপার্শ্বে বিষণ্ণবদনে সর্দ্দারগণ উপবিষ্ট, রাণার নিষ্প্রভ মুখমণ্ডলের দিকে সকলেরই নেত্র দৃঢ়সংযত। সহসা মিবাররাজের শীর্ণকঙ্কাল তাড়িতবেগে বিকম্পিত করিয়া একটি প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস বিনিষ্ক্রান্ত হইল। সর্দ্দারগণ অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন শালুম্ব্রারাজ কাতরস্বরে সম্বোধন করিয়া রাণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহারাজ! এরূপ করিতেছেন কেন? কি দুঃখে আপনার আত্মা ব্যথিত হইল? আপনি অন্তিমশয্যায় শায়িত, কিসে আপনার শান্তিবিঘ্ন হইল?" ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রতাপসিংহ বলিলেন, "সর্দ্দারচূড়ামণি! আমা হইতে চিতোর উদ্ধার হইল না; জন্মভূমিকে যবনকবল হইতে উদ্ধার করা আমার পুত্র অমরসিংহের সাধ্য নহে। সে চিরদিন সুখলালিত, ক্লেশ স্বীকার করিতে সমর্থ হইবে না। আপনাদিগের নিকট আমার একটি অনুরোধ, আপনারা সেই অনুরোধে স্বীকৃত হইলেই আমি সুখে প্রাণত্যাগ করিতে পারি; তাহা হইলেই আমি মনের সুখে চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করি। মনে দ্বিধা বা সন্দেহ না রাখিয়া আপনারা শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, জীবন থাকিতে তুর্কীর হস্তে মাতৃভূমিকে অর্পণ করিবেন না; ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।"

প্রতাপের পাণ্ডুবদন গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া পুনরায় তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রাণোপম পুত্র অমর বিলাসিতার বশীভূত হইবে, মিবারের দুরবস্থা তাহার স্মরণ থাকিবে না। অন্তিমকালে আমি এই যে কুটীরে অবস্থান করিতেছি, এ স্থানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে। ক্রমাগত পঞ্চবিংশতিবর্ষ কঠোরব্রতে ব্রতী থাকিয়া আমি যে সমস্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিলাম, অমর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার বোধ হইতেছে, আত্মসুখের জন্য অমর চিরস্বাধীনতাগৌরবে জলাঞ্জলি দিবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও সেই পথের অনুগামী হইয়া মিবারের পবিত্রকীর্ত্তি কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে।"

প্রতাপ নীরব হইলেন। সমস্বরে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারগণ বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! বাপ্পার পবিত্র সিংহাসনের শপথ করিয়া বলিতেছি, এক জনমাত্র রাজপুত জীবিত থাকিতে মিবারভূমি তুর্কীর হস্তগত হইবে না; যত দিন আমরা জীবিত থাকিব, কুমার অমরসিংহ কখনই তত দিন আপনার আদেশ লঙ্ঘনে সমর্থ হইবে না; মিবারের পূর্ণ স্বাধীনতা যত দিন পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার

না হয়, শপথ করিয়া বলিতেছি, তত দিন এই সকল কুটীরে বাস করিয়াই আমরা পরিতৃপ্তিলাভ করিব; বিলাসিতা বা সুখসম্ভোগে আমরা তত দিন বঞ্চিত থাকিব।"

প্রতাপের পাণ্ডুবদনের বিশুদ্ধ অধরপ্রান্তে মৃদুহাস্য দেখা দিল। সর্দারগণের আশ্বাসবচনে তিনি হৃদয়ে পরমশান্তি বোধ করিলেন; এতক্ষণের পর সকল চিন্তা—সকল যন্ত্রণা তিনি বিস্মৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মূর্ত্তি যেন অপূর্ব্ব প্রশান্তভাব ধারণ করিল, অভুতপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি আসিয়া যেন তাঁহার রাজবপু সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, অবিলম্বেই তাঁহার দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া প্রাণবিহঙ্গম পলায়ন করিল।

স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসিপ্রবর প্রতাপসিংহ জগতের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। ভারতের ভাগ্যগগন হইতে একটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্র পরিভ্রষ্ট হইল। সমগ্র ভারতভূমি আজ মহাশোকে সমাচ্ছন্ন। ধনী-নির্ধনী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, সকলেই প্রতাপের শোকে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এই শোকাবহ দুর্দ্দিনের পর কত শতাব্দী হইল, ভারতের ভাগ্যচক্র কত আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইল, তথাপি ভারতসন্তানেরা প্রতাপের নাম ভুলিতে পারিলেন না। প্রতাপের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিষয় স্মরণ করিলে নির্জ্জীব হীনবল বঙ্গসন্তানের হৃদয়েও যেন অভুতপূর্ব্ব বলের উদয় হইয়া থাকে।

বীরকেশরী রাণা প্রতাপসিংহ ক্রমাগত পঞ্চবিংশতিবৎসর পর্য্যন্ত কতিপয়মাত্র সৈন্যসহায়ে বিপুলসহায়সম্পন্ন দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে পরিলিপ্ত ছিলেন। মিবারক্ষেত্রে একজন "থুসিদাইসিস বা জিনোফণ" * অবতীর্ণ হইয়া যদি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে মিবারের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতেন, পিলোপনীসাসের মহাযুদ্ধবৃত্তান্ত অথবা দশসহস্রের শোচনীয় প্রত্যাগমনবিবরণ কদাচ এই যুদ্ধের সমতুল্য হইত না। মিবার-রঙ্গভূমে ঐ প্রকারের যে কত রণাভিনয় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রতাপসিংহের মহাবীরত্বের নিদর্শনস্থল হলদীঘাটক্ষেত্র। এই বিরাট্ পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্যে এমন স্থান নাই, যাহা রাণা প্রতাপের বীরত্বগৌরবের চিহ্নে অঙ্কিত নহে। জগতে যত দিন বীরত্বের মহিমা, বীরত্বের গৌরব ও বীরত্বের আদর থাকিবে, ভূতসাক্ষী ইতবৃত্ত যত দিন আর্য্যবীরগণের কীর্ত্তিকাহিনী কীর্ত্তন করিবে, প্রতাপের বীরত্ব, গৌরব, মহিমা, মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের বিষয় তত দিন নরহৃদয় হইতে অন্তরিত হইবে না; তত দিন হলদীঘাট, মিবারের ধর্ম্মপল্লী এবং তদন্তর্ব্বর্ত্তী দেবীরক্ষেত্র উহার মারাথন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবে। †

* থুসিদাইসিস একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক-ইতিহাসবেত্তা। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭১ অব্দে এথেন্সনগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে গ্রীসীয় সেনাদলে সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধিনায়কত্বে সেনাদল পরাজিত হইলে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞাতবাসে ২৫ বৎসর যাপন করেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪০৩ অব্দে পুনরায় তিনি স্বদেশে আগমন করিয়াছিলেন। পিলোপনীসাস যুদ্ধের প্রথমকাণ্ড ইঁহা দ্বারাই রচিত। জিনোফণও একজন ইতিহাসবেত্তা। ইনি প্রসিদ্ধ সক্রেটিসের শিষ্য। পারসিক নৃপতি সাইরস ভ্রাতার প্রতিকূলে যুদ্ধে উপস্থিত হইলে তাঁহার পক্ষ হইয়া এই জিনোফণ মহাসমরে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এথেন্সনগরে ইঁহারও জন্ম। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে, সমস্ত গ্রন্থেরই ভাষা অতি চিত্তরঞ্জন।

† ধর্ম্মপল্লী একটি সংকীর্ণ পর্ব্বতবর্ত্ম। ইহা গ্রীসদেশের অন্তর্গত। মারাথন গ্রীসের অন্তর্গত আটিকাজনপদের একটি ক্ষুদ্র পল্লী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অমরসিংহের রাজ্যলাভ, আক্‌বরের মৃত্যু, চিতোরে সাগরজীর অভিষেক, চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগের সংঘর্ষ, পারবেজ ও মহাব্বৎ খাঁর পরাজয়, মিবার আক্রমণ, অমরের মৃত্যু।

বীরকেশরী প্রতাপসিংহের সপ্তদশ পুত্র; অমরসিংহ তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৬৫৩ সংবতে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) পিতার পরলোকগমনের পর অমর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। যে সময়ে তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার কয়েকটি পুত্রও জন্মিয়াছিল; অল্পবয়সেই তাঁহারা সকল গুণে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে পিতার পরলোকগমনকাল পর্য্যন্ত অমরসিংহ নিরন্তর পিতার নিকট অবস্থিতি করিতেন; পিতৃপার্শ্বে থাকিয়া ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে নিরন্তর তদীয় মহান্ চরিত্রের অনুকরণ করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

এ দিকে অর্দ্ধশতাব্দীকাল সুশৃঙ্খলে রাজ্যসুখসম্ভোগ করিয়া দিল্লীশ্বর মোগল-কুলচূড়ামণি আক্‌বর শাহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। এত দিন যে আশালতাকে তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, যে আশার কুহকে বিমুগ্ধ হইয়া অজস্র নরশোণিতে আপনার করবাল রঞ্জিত করিয়াছিলেন, সে আশা ফলবতী হইল না; বীরসিংহ রাণা প্রতাপ কিছুতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন না, তাঁহার বশীভূত হইলেন না।

আক্‌বরের সুশাসনগুণে, তাঁহার রাজনীতির সুব্যবস্থায় তদীয় বিরাট্ সাম্রাজ্য বহুদিন পর্য্যন্ত অটলভাবে সমবস্থিত ছিল। আক্‌বরের রাজত্বকালে ফ্রান্সের সিংহাসনে চতুর্থ হেনরী, স্পেনে পঞ্চম চার্লস এবং ইংলণ্ডের সিংহাসনে ভুবনবিদিতা মহারাণী এলিজাবেথ অধিরূঢ় ছিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপন অভিলাষে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ রো সাহেবকে দূতস্বরূপ ভারতে প্রেরণ করিতে আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই; অচিরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রথম জেম্‌স্ ইংলণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সময়ে রো সাহেব ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যবশে সম্রাট্ আক্‌বর অনুরূপ সুবিচক্ষণ মন্ত্রীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফরাসীমন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ শল্লির ন্যায় মোগলসচিব বৈরামখাঁও নীতিজ্ঞানে, ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও রণপাণ্ডিত্যে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। আক্‌বর মিবারের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভট্টকবিগণ তাঁহার রাজগুণের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে পক্ষপাত করেন নাই। আক্‌বর রাজনীতিবিশারদ, রণপণ্ডিত, দূরদর্শী ও মহানুভব সম্রাট্ ছিলেন, ভট্টগ্রন্থ পাঠ করিলে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহার একটি অনুষ্ঠানের বিষয় পাঠ করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়, তাঁহার গুণের পক্ষপাতী না হইয়া বরং তাঁহার হৃদয়কে ঈর্ষা, দ্বেষ, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধতম নরককূপ বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা স্বজাতীয় নৃপতির কলঙ্ককাহিনী নানাকৌশলে আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভট্টকবিগণ স্পষ্টাক্ষরে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। টড সাহেবের মত ভট্টকবিগণের লিখিত সমস্ত বর্ণনাই বিশ্বাসযোগ্য।

বুন্দির ভট্টকবিগণের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে, মানসিংহের প্রতাপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয় ঈর্ষা-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উপযুক্ত অবসর পাইলেই মানসিংহ দিল্লীর সিংহাসন হইতে আক্‌বরকে পদচ্যুত করিবেন, সম্রাটের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। মানসিংহের প্রতি তাঁহার দারুণ ঈর্ষা জন্মিল। ঈর্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা, আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে জিঘাংসার উদয়। মোগলসম্রাট্ কাপুরুষের ন্যায় গুপ্তভাবে মানসিংহকে হত্যা করিয়া সেই জিঘাংসার শান্তি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া একদিন দিল্লীশ্বর একপ্রকার মাজন প্রস্তুত করিলেন, মানসিংহের জন্য তাহার অর্দ্ধাংশ বিষ-মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন; কিন্তু দৈবের বিচিত্রগতিবশে ভ্রমান্ধ হইয়া সম্রাট্ সেই বিষমিশ্রিত অর্দ্ধাংশ আপনিই ভক্ষণ করিলেন; অচিরেই তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। অচিরেই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল। কোন্ সূত্রে যে সম্রাটের হৃদয়ে এরূপ কুপ্রবৃত্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। আক্‌বরের অন্তিমবয়সে মোগলসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া তাঁহার সহিত মানসিংহের মনোভঙ্গ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মানসিংহের বাহুবলেই তাঁহার অর্দ্ধরাজ্যলাভ, মানসিংহ তাঁহার রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ, মানসিংহ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত; কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সম্রাট্ যে বিষ-প্রয়োগে মানসিংহকে হত্যা করিবেন, ইহা স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এ কূটসমস্যার মীমাংসা সহজ নহে। সম্রাট্ আক্‌বর শাহের নিকট মানসিংহ তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, মনে করিলে সম্মুখ-সংগ্রামেই দিল্লীশ্বর মানসিংহকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানে সমর্থ হইতেন; তবে যে এরূপ পাশবী বৃত্তির অনুসরণ করিয়া দিল্লীশ্বর আপনার পবিত্র নামে কলঙ্কবীজ রোপণ করিলেন কেন, তাঁহার হৃদয়ে যে কি গুপ্তভাব নিহিত ছিল, কেহই তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহেন।

পিতৃসিংহাসনে আরোহণের পর অমরসিংহ রাজ্যমধ্যে নূতন নূতন নিয়ম, নূতন নূতন প্রথা ও নূতন নূতন করস্থাপন এবং সামন্তগণকে নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি প্রদান করিয়া রাজ্য বিলক্ষণ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন। তিনি উষ্ণীষবন্ধনের যে একটি নূতন প্রথা বিধিবদ্ধ করিলেন, অদ্যাপি মিবারের সর্দ্দারগণ সেই প্রথানুসারে উষ্ণীষবন্ধন করিয়া থাকেন। উহার নাম "অমরশাহী পাগড়ী।" অমর যে সমস্ত নূতন নিয়ম ও নূতন প্রথার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মিবাররাজ্যের অনেক স্তম্ভগাত্রে ও শিলালিপিতে অদ্যাপি তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে।

বহুদিন পর্য্যন্ত বিরামদায়িনী শান্তির ক্রোড়ে থাকিয়া অমরসিংহ আলস্যের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পিতার চরমকালীন আদেশ তিনি বিস্মৃত হইলেন। পেশোলাতটবর্ত্তী পর্ণকুটীরগুলি ভগ্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তিনি অমরমহল নামে একটি ক্ষুদ্র বিলাসভবন নির্ম্মাণ করাইলেন এবং চাটুকার পারিষদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই প্রাসাদে নিশ্চিন্তমনে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সুখভোগের পথে বিষম কণ্টক দৃষ্ট হইল; মিবারের প্রান্তভাগে মোগল-সম্রাট জাঁহাগীরের প্রচণ্ড রণভেরী বাজিয়া উঠিল।—দিল্লীসিংহাসনে অধিরোহণের পর চারিবৎসর-মধ্যেই জাঁহাগীর মিবারের প্রতিকূলে তরবারি ধারণ করিলেন। ভারতের প্রায় সমস্ত নরপতিই দিল্লীশ্বরের অনুগত, কেবল মিবাররাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন না, এত দর্প—এত অহঙ্কার, এত গর্ব্ব কেন? সে দর্প—সে অহঙ্কার, সে গর্ব্ব চূর্ণ করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ সংকল্প করিয়া সম্রাট্ মিবারের প্রতিকূলে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইলেন।

এ দিকে দুষ্টসরস্বতী আসিয়া অমরসিংহের স্কন্ধে আরোহণ করিল। তিনি বিলাসসম্ভোগ

পরিত্যাগ করিয়া অমর্থকর যুদ্ধবিভ্রাটে সংলিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। এক একবার যশো-লিপ্সা আসিয়া তাঁহার মনে সমুদিত হয়, পরক্ষণেই বিলাসিতার মোহিনী ছায়া আসিয়া তাহাকে আবরণ করিয়া ফেলে। রাণার উভয় সঙ্কট। নিকৃষ্টমতি চাটুকারেরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে যুদ্ধে নিবারণ করিতে লাগিল। তাদৃশ সেনাবল নাই, অর্থবল নাই, সহায়-সম্বলও নাই; ভারতের সমস্ত নরপতি মোগলসম্রাটের অনুবল; এ অবস্থায় তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে, বরং সন্ধিস্থাপন করিলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়; চাটুকারেরা রাণাকে এইরূপে নিরুৎসাহ করিয়া ফেলিল। অগত্যা তাহাদিগের মতানুসারে রাণাও নিশ্চিন্ত হইয়া অমরমহলে প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মিবারের সর্দ্দারগণ দারুণ চিন্তানলে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। সামন্ত-শিরোমণি চন্দাবৎকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাঁহারা অমরমহলে উপস্থিত হইলেন। ভীমগম্ভীরস্বরে অমরকে সম্বোধন করিয়া চন্দাবৎ-সামন্তরাজ কহিলেন, "মহারাজ, প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া সঙ্কটসময়ে এইরূপে নিশ্চিন্ত থাকা কি আপনার কর্ত্তব্য? পবিত্র কুলগৌরব নষ্ট হইবে, বীরকেশরীর পুত্র হইয়া কিরূপে তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন? প্রচণ্ড মোগলশক্র আপনার শিয়রে দণ্ডায়মান, আপনি কি না এ সময়ে চাটুকারদলে পরিবেষ্টিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? যবনের হস্তে মিবাররাজ্য ছারখার হইবে, পবিত্র রাজপুতললনা কলঙ্কস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে, কোন্ প্রাণে আপনি তাহা সহ্য করিবেন? পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র কীর্ত্তি যদি অক্ষুন্ন রাখিতে না পারিবেন, পবিত্র শিশোদীয়-বংশে তবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? আপনার রাজ্যে ধিক্, আপনার ঐশ্বর্য্যে ধিক্, আপনার কুলগৌরবেও ধিক্!"

বীরপ্রবর সর্দ্দারের তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়াও রাণার জড়ভাব বিদূরিত হইল না। রোষে সর্দ্দারবীরের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। আস্তৃত গালিচার এক প্রান্তে একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড ছিল, তাহা লইয়া প্রচণ্ডবেগে সভাগৃহের ভিত্তিস্থিত মুকুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শোভনীয় মুকুর-খানি তৎক্ষণাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। অমরসিংহের দক্ষিণবাহু ধারণপূর্ব্বক চন্দাবৎ-সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন; জলদগম্ভীরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সর্দ্দারগণ! শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রতাপের পুত্রকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা কর।"

রাণা অমরসিংহ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, অপমানকারী রাজদ্রোহী বলিয়া চন্দাবৎকে ভর্ৎসনা করিলেন; চন্দাবৎ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। কর্ত্তব্যসাধনের জন্য তিনি উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন; কর্ত্তব্যপালন করাই তাঁহার ধর্ম্ম। সে ক্ষেত্রে তিনি সে উপায় অবলম্বন না করিলে অমরসিংহের অদৃষ্টে দারুণ শোচনীয় দুর্গতি ঘটিত সন্দেহ নাই।

সমস্ত সর্দ্দারবীর চন্দাবতের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন; তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে অস্ত্রশস্ত্রকরে সকলে যবনসেনার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাণাকে তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে হইল। মিবারের জগন্নাথ দেবের মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়াই রাণার হৃদয় রোষপরিশূন্য হইল, জ্ঞানের দিব্যজ্যোতি আসিয়া হৃদয়ক্ষেত্র উদ্ভাসিত করিল। তখন তিনি আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা ও আত্মকৃত অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া চন্দাবৎ-কৃষ্ণের শত শত প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। মধুরস্বরে সম্বোধন করিয়া তিনি সর্দ্দারচূড়ামণিকে কহিলেন, "আপনিই আমার পিতার একমাত্র পরমবন্ধু, আপনিই শিশোদীয়বংশের যথার্থ হিতৈষী। আমি মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, আপনি জাগরিত করিয়া প্রকৃত বীরের কার্য্য করিয়াছেন; আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।"

রাণার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সর্দ্দারগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; সকলেরই হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে, দ্বিগুণ বিক্রমে ও দ্বিগুণ তেজে সমুত্তেজিত হইল। গগনবিদারী সিংহনাদে পর্ব্বতপ্রদেশ বিকম্পিত করিয়া সকলেই শত্রুসেনার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। মোগলসেনাপতি খাঁ খানান সেনাদল সমভিব্যাহারে দেবীরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, অচিরেই সেই প্রশস্ত পর্ব্বতপথের উপরিভাগে হিন্দু-মুসলমানের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। স্বদেশের গৌরবরক্ষার জন্য রাণা অমরসিংহ রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বিস্ময়কর বীরত্বদর্শনে অনুকূল প্রতিকূল উভয়পক্ষই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয় দলেই অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য রণশায়ী হইতে লাগিল; কিন্তু কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় দৃষ্ট হইল না।

মধ্যাহ্ন অতীত। দিনমণি মধ্যাহ্নগগন অতিক্রম করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিমদিকে অবতরণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার প্রচণ্ড ময়ূখমালা হইতে যেন অগ্নিকণা বিনির্গত হইতেছিল। এ দিকে বিকটগর্জ্জনে মোগলের আগ্নেয়াস্ত্র (কামান) সমূহ নিবিড় ধূমরাশি উদ্গিরণপূর্ব্বক মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড রশ্মিজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আর্য্যবীরগণ সেই গভীর ধূমপটল ভেদ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে যবনসেনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসংখ্য যবনসেনা রাজপুতবীরগণের বিক্রম-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইল। বিপক্ষের গতিরোধে সমর্থ না হইয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বিজয়ডঙ্কা বাদন করিয়া রাজপুতবীরগণ রাণা অমরসিংহের বিজয়গৌরবের চিহ্নস্বরূপ বিজয়-বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন করিয়া দিলেন।

এইরূপে ১৬৩৪ সংবতে (১৬০৮ খৃষ্টাব্দে) দেবীরক্ষেত্রের ঘোরযুদ্ধে প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহ জয়লাভ করিয়া সগৌরবে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যে সকল আর্য্যবীর মোগলযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রাণার পিতৃব্য বীরপুরুষ কর্ণই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কর্ণ হইতেই বিশাল কর্ণাবৎ-বংশের উৎপত্তি।

দিল্লীশ্বর মোগলসম্রাট্ জাহাগীর পরাজিত হইলেন সত্য, কিন্তু নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইলেন না; বরং তাঁহার রণপিপাসা আরও শতগুণে সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। একবর্ষ পরেই ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনমাসের সপ্তম দিবসে তিনি আবার ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। তাঁহার আদেশে অসংখ্য মোগলবাহিনী লইয়া মহাবীর সেনাপতি আবদুল্লা মিবারের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সংবাদ পাইয়া রাজপুতবীরগণের হৃদয় বীরতেজে উত্তেজিত হইয়া উঠিল; স্বদেশপ্রেমিকতার পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা মহাবিক্রমে মোগলসেনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

অবিলম্বেই রণপুরনামক প্রশস্ত পর্ব্বতপথে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল; অবিলম্বেই হিন্দু-মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মোগলসেনাপতির বিশাল সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া রাজপুতবীরেরা তাহাদিগকে বিদলিত, মথিত ও বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। একে একে মোগলসেনাগণের অধিকাংশই রাজপুত-হস্তে নিহত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সেই দিন গিহ্লোটবংশের বীরত্বপ্রদর্শনের একটি প্রসিদ্ধ দিন। বহুদিনের পর সেই দিন গিহ্লোটকুলচূড়ামণি বাপ্পার লোহিতবর্ণ বিজয়কেতন আর একবার গদবারারাজ্যের চতুঃসীমায় সমুত্থাপিত হইয়াছিল। দেবগড়ের দুদো, সঙ্গাবৎ নারায়ণদাস, সূর্য্যমল, ঐশকর্ণ এই কয়জন প্রথমশ্রেণীর সর্দ্দার এবং শক্তাবৎ-সর্দ্দার ভাণসিংহের পুত্র পূর্ণমল্ল, রাঠোর হরিদাস, সদ্রিতি ঝালা ভূপৎ, কহিরদ্যার কচ্ছুবাহ, বৈদলার চৌহান কেশবদাস, মুকুন্দদাস রাঠোর ও জয়মলোট এই সমস্ত রাজপুত

বীর সেই দিন সেই পুণ্যক্ষেত্র রণপুর-রণক্ষেত্রে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

উপর্য্যুপরি দুইটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়াতে দিল্লীশ্বরের হৃদয় শঙ্কিত, ভীত ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। সামান্য সেনাবলের সহায়ে কিরূপে যে অমরসিংহ বিশাল মোগলসেনা পরাজয় করেন, সম্রাট্ কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার হৃদয় রোষে ও জিঘাংসায় শত গুণে সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল। মিবারের বিরুদ্ধে তিনি আবার বিপুল সেনাসজ্জার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাণার সেনাদল ক্ষয় করিবার জন্য আর একটি নূতন কৌশলও অবলম্বিত হইল। রাজপুতকুলাঙ্গার সাগরজীকে সম্রাট্ চিতোরের ধ্বংসাবশেষের উপর রাণা নামে অভিষেক করিলেন। স্বহস্তে দিল্লীশ্বর জাঁহাগীর সাগরজীকে অভিষেক করিয়া রাজবেশ ও রাজকরবালে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। এই সাগরজী কর্ত্তৃকই পবিত্র শিশোদীয়কুল কলঙ্কিত হইয়াছিল। যবনের কঠোর উৎপীড়নে—যবনের নিষ্ঠুর ব্যবহারে—যবনের ঘোরতর অত্যাচারে যদিও চিতোরের পূর্ব্বসৌন্দর্য্য নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও নিতান্ত সামান্য বলিয়া অনাদরণীয় নহে। সেই ধ্বংসরাশির মধ্যে একদল মোগলসেনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নূতন রাণা রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ধ্বংসাবশেষ চিতোরের প্রণষ্টগৌরবের শেষচিহ্ন দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্তে সার টমাস রো সাহেব ইংলণ্ডে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সার মর্ম্ম এই স্থানে পরিগৃহীত হইল।

"চিতোর ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন মহানগরী। দুরারোহ পর্ব্বতের শিখরপ্রদেশে এই নগরী সংস্থাপিত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রায় পাঁচক্রোশব্যাপী বিশাল প্রাকার। অদ্যাপি এখানে শতাধিক ভগ্ন দেবালয় ও অনেকগুলি সুদৃশ্য অট্টালিকা বিরাজিত আছে। এই সমস্ত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ হইতেই প্রাচীন গৌরবের অনেক চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় এই সমস্ত প্রাসাদের মধ্যে প্রস্তরোৎকীর্ণ অসংখ্য সুন্দর স্তম্ভ সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত। চিতোরনগরে অন্যূন লক্ষ প্রস্তরবাটী বিদ্যমান। কঠিন পর্ব্বতগাত্রে একটিমাত্র সোপানশ্রেণী দৃষ্ট হয়, সেই সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া নগরোপরি আরোহণ করিতে হয়। চিতোরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে পূর্ব্বপ্রণষ্ট সৌন্দর্য্য-গৌরবের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। আক্‌বর শাহের পিতা হুমায়ুন এই নগরী জয় করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পর নগরবাসীরা নির্জ্জীবপ্রায় হইলে আক্‌বর ইহা হস্তগত করেন; চিতোরবীরগণের প্রাণ থাকিতে আক্‌বর অধিকার করিতে পারেন নাই।"

ধ্বংসাবশেষ চিতোরের সিংহাসনে রাজপুতকুলাঙ্গার সাগরজী সমারূঢ়। শ্মশান সদৃশ চিতোরপুরী ক্রমে ক্রমে একপ্রকার নবীন সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইল; কিন্তু জাঁহাগীর যে উদ্দেশ্যে সাগরজীকে তত্রত্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। মিবারবাসী কেহই অমরসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সাগরের নিকটে উপস্থিত হইল না; একবার মুহূর্ত্তের জন্য কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করিল না; বরং তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র সকলে ঘৃণায় মুখভঙ্গী করিতে লাগিল।

সাত বৎসর অতীত। দারুণ মনোবেদনায় ব্যথিত হইয়া সাগরজী এই সাত বর্ষ চিতোরে অবস্থিতি করিলেন। স্বজাতীয়গণের ঘৃণা ও বিদ্বেষবিষ পান করিয়া দারুণ কষ্টে তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে হইতেছে। তিনি মোগল-সম্রাটের প্রসাদভোগী, তাঁহার আপনার সামর্থ্য নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই, স্বাধীনতা নাই। এরূপ সিংহাসনে—এরূপ রাজ্যে—এরূপ সুখসম্ভোগে লাভ কি? ইহা কেবল

বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ নানা চিন্তায় দিবানিশি জর্জ্জরীভূত হওয়াতে মুহূর্ত্তের জন্য সাগরের শান্তিলাভ হইল না। চিন্তার বিষদংশনে তিনি প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে শান্তিসুখ নাই, হৃদয় মন অধীর হইয়া উঠে, একবার তিনি সমুচ্চ গগনভেদী অট্টালিকার ছাদে উত্থিত হইতেন, চিতোরের গৌরবস্তম্ভ দেখিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের কথা স্মরণ হইত, অমনি নিঃসংজ্ঞের ন্যায় বসিয়া পড়িতেন, চারিদিক্ শূন্যময় বলিয়া বোধ হইত, জগৎসংসার তাঁহার নিকট ভীষণ নরককূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত; তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিয়া পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেন। চিন্তার বিভীষিকায় প্রপীড়িত হইয়া সাগরজী ক্রমে ক্রমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রিকালে একাকী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিনি চিন্তার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, সহসা এক ভীমাকার ভৈরবমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল; গভীর নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরস্বরে সেই মূর্ত্তি বলিয়া উঠিল, "নরাধম! রাজপুতকুলাঙ্গার! শীঘ্র এ পাপরাজ্য হইতে প্রস্থান কর্। নতুবা তোর মঙ্গলের আশা নাই।"

ভৈরবের ভৈরবমূর্ত্তি দেখিয়াই হউক্ অথবা যে কারণেই হউক্, সাগরজী আর চিতোরে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহকে আহ্বান করিয়া তিনি চিতোরের সমগ্র রাজ্যভার তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন; বিজন স্কন্ধপর্ব্বতের উচ্চতর বিজনশৃঙ্গে গিয়া স্বয়ং বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী ও চম্বলের সঙ্গমস্থল এবং প্রসিদ্ধ রন্থম্বর-দুর্গের মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূভাগে এই স্কন্ধগিরি সংস্থিত; ইহা একটি বিচ্ছিন্ন শৈল।

কিছু দিন অতীত হইল। শৈলশৃঙ্গেও সাগরজীর শান্তিলাভ হইল না; পুনরায় তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজপুতকুলাঙ্গারকে সে স্থানেও শান্তিলাভে বঞ্চিত হইতে হইল। সম্রাট্ জাঁহাগীরের তিরস্কারবাক্যে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। সহ্য করিতে না পারিয়া সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষেই তিনি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক নরাধমের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল। সাগরজীর কুলাঙ্গার পুত্র স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমানধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার নাম মহাব্বৎ খাঁ। এই মহাব্বৎ জাঁহাগীরের এক জন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতিমধ্যে পরিগণিত।

অন্তিমকালে দূরদর্শী অমরাত্মা প্রতাপসিংহ বলিয়া গিয়াছিলেন, অমরসিংহ রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে না; সে চিরদিন সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত; বিলাসিতায় উন্মত্ত হইয়া মোহবশে সকল দিক্ নষ্ট করিবে। প্রতাপের ভাবিদর্শন এখন কার্য্যে পরিণত হইল। অমরসিংহ চিতোরনগরী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন, পার্ব্বত্যপ্রদেশের দুর্গম দুর্গের প্রতি আর তাঁহার ততদূর দৃষ্টি রহিল না। সেই স্থানে থাকিয়া—গিহ্লোটকুলের চিরপ্রথা অবলম্বন করিয়া যদি তিনি সেই দুর্গম বাসভূমির মধ্য হইতে শত্রুকুলকে নিপীড়িত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি চিরস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতেন না। অমরসিংহ সে প্রথা অবলম্বন করিলেন না, চিতোরে অবস্থান করিয়া চিতোরের প্রণষ্টসৌন্দর্য্যের পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন, অচিরেই তাঁহার স্বাধীনতারত্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল।

চিতোর পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পর মিবারের প্রায় অশীতি দুর্গ ও নগর অমরসিংহের অধিকৃত হইল। তন্মধ্যে অন্তলাদুর্গ হস্তগত হইবার সময় মিবারের দুইটি শ্রেষ্ঠ সামন্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ সমুপস্থিত হয়। দিল্লীশ্বর তৃতীয়বার মিবারের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতেছেন, সংবাদ পাইয়া অমরসিংহও সেনাবল উপচয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। যবনসৈন্যের আগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া তিনি

আর কতিপয় নগর ও পল্লী যবনকবল হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রণযাত্রার আয়োজন সমস্তই সুসজ্জিত, এমন সময় সেনাদলের হিরোলচালনের (সম্মুখভাগরক্ষণের) ক্ষমতা লইয়া চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণের মধ্যে মহাকলহ বাধিয়া উঠিল। চন্দাবতেরাই ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, শক্তাবতেরা অপেক্ষাকৃত পরাক্রমশালী হওয়াতে আপনাদের বিক্রমোৎকর্ষের হেতুবাদ দেখাইয়া ঐ সম্মানগ্রহণে সমুদ্যত হইলেন। এক দলকে সম্মানিত করিলে অন্য দল ক্রুদ্ধ হয়, উভয়সঙ্কটে পড়িয়া রাণা দারুণ চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলেন। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে মৌনভাব ধারণ করিতে হইল। অগত্যা উভয় দলে অসি উত্তোলন করিয়া পরস্পর যুদ্ধের উপক্রম করিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে উভয় পক্ষকেই সম্বোধন করিয়া রাণা অমরসিংহ কহিলেন, "সর্ব্বাগ্রে যে দল অন্তলাদুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে, হিরোলরক্ষার ভার সেই দলের হস্তেই অর্পিত হইবে।"

তৎক্ষণাৎ উভয়দলই মহাবিক্রমে অন্তলাদুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিল। অন্তলা একটি উচ্চভূমির উপর অধিষ্ঠিত; পাষাণ-প্রাকারে সুশোভিত। সেই সমুচ্চ প্রাকারের উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে এক একটি গোলাকার রক্ষকাগার বিদ্যমান। প্রাচীরের পাদদেশে একটি নদী কলকলরবে প্রবাহিত হইতেছে। দুর্গের মধ্যে পরিখাবেষ্টিত একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দুর্গরক্ষক সেই অট্টালিকায় বাস করেন। দুর্গমধ্যে প্রবেশপথ একটিমাত্র। এই দুর্গ চিতোরের নয় ক্রোশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। দুর্গটি এখন আর নাই, কেবল প্রাচীর ও কয়েকটি অট্টালিকা ধ্বংসাবশেষের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আজি শক্তাবৎ ও চন্দাবৎ উভয় পক্ষের বীরত্বপরীক্ষার দিন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উভয় দল অন্তলাদুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইল। অন্তলা জয় করিতে পারিলে গৌরবের রত্নকিরীটে মস্তক সুশোভিত হইবে, তাহার হস্তে মিবারের সেনাদলের হিরোলভার সমর্পিত হইবে, এই মহাসম্মানলাভের প্রত্যাশায় উৎসাহ ও জিগীষা-প্রণোদিত হইয়া উভয় দলই মহাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। উদাত্তস্বরে বীণা বাজাইয়া ভট্টকবিরা তাঁহাদিগের মঙ্গলগানে প্রবৃত্ত হইলেন; রাজপুত অঙ্গনাগণও সেই স্বরে আপনাদিগের কোকিলকণ্ঠরব মিলাইয়া সামন্তদ্বয়কে দ্বিগুণ উৎসাহে সমুৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

পূর্ব্বগগনে দিনমণি সমুদিত। তরুণ-অরুণকিরণে পর্ব্বতশৃঙ্গ ও পাদপ-শির কাঞ্চনবর্ণে অনুরঞ্জিত। শক্তাবৎগণ অন্তলাদুর্গের তোরণসম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহাবিক্রমে যবনশত্রুকে আক্রমণ করিলেন। অচিরেই মোগলসেনারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ভীমবেশে প্রাকার-শীর্ষে দর্শন দিল। তৎক্ষণাৎ উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ বাধিল।

এ দিকে চন্দাবৎগণ পথভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া একটি জলাভূমির মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুতেই তাঁহারা পথনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না। ইত্যবসরে একজন মেষপালক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া অন্তলাদুর্গসমীপে উপস্থিত হইল। চন্দাবতেরা কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপান আনয়ন করিয়াছিল। সেই সমস্ত সোপানাবলম্বনে চন্দাবৎ-সর্দার দুর্গ-প্রাকারে উঠিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; হিরোলপরিচালনের আশাও বিলুপ্ত হইল। বিপক্ষনিক্ষিপ্ত গোলকাঘাতে তিনি যেমন সোপানস্খলিত হইয়া নিম্নভাগে নিপতিত হইলেন, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু দেহকারাগার পরিত্যাগ করিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অব্যবহিত নিম্নপদস্থ সর্দার বান্দা ঠাকুর (ক্ষিপ্ত সর্দার) চন্দাবৎদলের অধিনায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শক্তাবৎ-সর্দার একটি রণমাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া গজরাজকে রুদ্ধ দুর্গদ্বারের প্রতি চালনা

করিলেন। ঘোরতর বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে বারণরাজও মহাবেগে তোরণদ্বার আক্রমণ করিল; কিন্তু কিছুতেই দ্বার ভগ্ন হইল না। বিপক্ষনিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতে শক্তাবৎদলের অসংখ্য সেনা রণভূমে শয়ন করিতে লাগিল, তথাপি সর্দ্দার নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হইলেন না। কবাটে অসংখ্য লৌহশঙ্কু প্রোথিত ছিল, শক্তাবৎ-সর্দ্দার সে কীলকগুলির উপর আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন-পূর্ব্বক মাহুতকে কহিলেন, "হস্তীকে আমার প্রতিকূলে তাড়াইয়া আন্, নচেৎ এখনই তোর শির-শ্ছেদন করিব। তৎক্ষণাৎ গজপাল প্রভুর আদেশ পালন করিল। ঘন ঘন ভীষণ অঙ্কুশতাড়নে প্রপীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমগর্জ্জনে গজরাজ মহাবেগে সেই রুদ্ধদ্বারের উপর পতিত হইল। তোর-ণের বিশাল কবাটদ্বয় নিমেষমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; সঙ্গে-সঙ্গে শক্তাবৎ সর্দ্দারও ভূতলে নিপতিত হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন। দলপতি প্রাণত্যাগ করিলেন, ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাঁহার মৃতদেহ পদদলিত করিয়া সৈন্যগণ বীরবিক্রমে উন্মুক্ত দ্বারপথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহাদিগের বীরনাদে সমস্ত দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বান্দা ঠাকুরের বীরত্ব সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার তেজ, সাহস ও নির্ভীকতা প্রশংসার যোগ্য। চন্দাবৎ সর্দ্দার ভূপতিত হইলে উত্তরীয় দ্বারা তাঁহার শবদেহ জড়াইয়া আপন পৃষ্ঠে বন্ধনপূর্ব্বক বান্দা ঠাকুর দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিলেন, ভীষণ মহাশেলাঘাতে মোগলসৈন্য নিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; অবিলম্বেই দুর্গশিরে উত্থিত হইয়া সর্দ্দারের মৃতদেহ তথায় নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মুখপদ্ম হইতে "হিরোল হিরোল! চন্দাবতেরা হিরোল প্রাপ্ত হইলেন" এই বাক্য নির্গত হইল। অনন্ত গগনপথে উঠিয়া সেই ধ্বনি একে একে সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। যবনহৃদয় ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। দুর্গমধ্যে যে সমস্ত যবনসৈন্য ছিল, বান্দা ঠাকুরের বীর্য্যবহ্নিতে প্রায় সকলেই ভস্মীভূত হইল; কতিপয়মাত্র সেনা পলায়নপূর্ব্বক আত্মপ্রাণ রক্ষা করিল। তৎক্ষণাৎ অন্তলার দুর্গচূড়ায় মিবারের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন হইল। লজ্জাবনতবদনে স্বদলসমভিব্যাহারে শক্তাবৎ-সর্দ্দার স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কিংবদন্তী আছে, রাজপুতবীরগণ যখন অন্তলার দুর্গ আক্রমণ করেন, দুইটি প্রসিদ্ধ মোগল-সেনাপতি সেই সময় দাবাখেলায় এরূপ অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে, সৈনিকেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বিপদ্‌বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেও তাঁহাদিগের চৈতন্য হইল না; রাজপুতগণের গগনভেদী জয়-নাদে সমস্ত দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইল, তথাপি তাঁহাদের সংজ্ঞা নাই; তাঁহারা পরস্পর দাবাখেলায় রাজা মারিতে ব্যতিব্যস্ত। যখন বিপক্ষেরা নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন তাঁহারা বিনয়গর্ভ-বচনে কহিলেন, "ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, আমাদের ক্রীড়া শেষ হউক, পরে আমাদিগের প্রাণ সংহার করিবেন।" রাজপুতবীরেরা তাহাতেই সম্মত হইলেন, বহুক্ষণ অপেক্ষাও করিলেন, খেলা শেষ হইল না; অবশেষে উভয়েরই প্রাণবধ করিলেন।

রাণা উদয়সিংহের চতুর্ব্বিংশতি পুত্র, তন্মধ্যে শক্তসিংহ দ্বিতীয়। শক্তসিংহের কোষ্ঠীপত্রিকা লিখিবার সময় দৈবজ্ঞ গণনায় জানিতে পারিয়াছিলেন, শক্তসিংহ মিবারের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠি-বেন। গণনা ভবিষ্যতে ফলবতীও হইয়াছিল। দৈবজ্ঞের মুখে ঐ কথা অবগত হইয়া শক্তসিংহের প্রতি উদয়সিংহের ঘৃণা জন্মিল; কালে শক্তসিংহ পিতার যেন চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িলেন। সুকুমার-বয়সে একদিন পিতার নিকট বসিয়া শক্তসিংহ ক্রীড়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে একজন অস্ত্রকার একখানি নূতন ছুরিকা লইয়া রাণার নিকট উপস্থিত হইল। ছুরিকার ধার পরীক্ষার উদ্‌যোগ হইতেছে, এমন সময় সুকুমার শক্তসিংহ অস্ত্রকারের নিকট হইতে ছুরিকাখানি কাড়িয়া

লইয়া পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! এ ছুরী দ্বারা কি অস্থিমাংস কাটিতে পারা যায় না?" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার কুসুমকোমল হস্তের উপর সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা সবেগে যেমন বসাইয়া দিলেন, অমনি প্রবলবেগে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাজাসন পর্য্যন্ত শোণিতসেকে সিক্তিত ও অনুরঞ্জিত হইল। সভাসদ্‌গণ মহাবিস্ময়ে চমকিত! উদয়সিংহের মনে কি ভাবের উদয় হইল, জানি না, তৎক্ষণাৎ তিনি পুত্রের মস্তকচ্ছেদনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

বালক শক্তসিংহ বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। এই সময় শালুম্ব্রা-সর্দ্দার উদয়সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, "মহারাজ! এই পদাশ্রিতের একটি নিবেদন শ্রবণ করুন্। অনেক সময় অনেক সূত্রে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আপনি আমাকে বরপ্রদানে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত। আশ্রিতের প্রতি কৃপা করিয়া এখন একটি অনুগ্রহ-বর প্রদান করিলে কৃতার্থ হই।" রাণা তৎক্ষণাৎ অভীষ্টপূরণে স্বীকৃত হইলেন, আশা আসিয়া সামন্তচূড়ামণির হৃদয় উৎফুল্ল করিল; সাহসে ভর করিয়া তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আপনার প্রসাদে আমি যে অর্থের অধিপতি, তাহাই যথেষ্ট, আর অর্থলাভে অভিলাষ নাই, উচ্চপদ, সম্মানসম্ভ্রম, গৌরব কিছুই চাহি না। আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই, বিষয়বিভবের ও কুলসম্ভ্রমের অধিকারীও নাই। রাজকুমারকে ধর্ম্মপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া চন্দাবৎ-গোত্রের রক্ষাবিধান করি, ইহাই আমার কামনা; রাজপুত্রের দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া আমার কামনা পূর্ণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা; অন্য বর-প্রার্থনা কিছুই নাই।"

তৎক্ষণাৎ সামন্তের অভীষ্ট পূরণ করিয়া উদয়সিংহ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিলেন। শক্তসিংহের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল। শালুম্ব্রাপতি কুমারকে ধর্ম্মপুত্রস্বরূপে লইয়া পরমযত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধবয়সে শালুম্ব্রাপতির পুত্রকন্যা জন্মিল। উভয় সঙ্কট। দত্তকপুত্র শক্তসিংহ তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার ভবিষ্যমঙ্গলের জন্য কি উপায় করা যায়, চিন্তা করিয়া শালুম্ব্রাপতি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে রাণা প্রতাপসিংহের এক দূত শালুম্ব্রাদুর্গে উপস্থিত হইল, ভ্রাতা শক্তসিংহকে প্রতাপসিংহ স্মরণ করিয়াছেন, দূতমুখে শালুম্ব্রাপতি এই কথা শ্রবণ করিলেন।

শক্তসিংহ জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। চন্দাবৎ-সর্দ্দারের অনুমতি লইয়া তিনি জ্যেষ্ঠের নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ভ্রাতায় সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু সে ভ্রাতৃসৌহৃদ্য অধিকদিন স্থায়ী হইল না। একদিন উভয়ে মৃগয়া করিতে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, একটি লক্ষ্য সম্বন্ধে উভয় ভ্রাতার ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বাদানুবাদ করিতে করিতে উভয়েই ক্রমে রোষে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতাপ সরোষে বলিলেন, "ভাল, আইস, কাহার লক্ষ্য অব্যর্থ, পরীক্ষা হউক।" শক্তসিংহ আশৈশব উগ্রস্বভাব ও মহাতেজস্বী, তৎক্ষণাৎ তিনি সাহসের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সেই কথাই ভাল, আসুন, দেখা যাউক, এখনই পরীক্ষা হইবে।"

উভয়েই আপন আপন শেল উদ্যত করিয়া ভীমবিক্রমে দণ্ডায়মান। উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত; যাঁহারা যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, বাধা দিতে বা নিবারণ করিতে কেহই সাহসী হইলেন না। অদূরে গিহ্লোটকুলের কুল-পুরোহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন, "মহারাজ, ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন," বলিতে বলিতে তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের

মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন; সানুনয়-বাক্যে তাঁহাদিগকে শান্ত-ভাব ধারণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলই বিফল হইল; ভ্রাতৃদ্বয়ের রোষের উপশম হইল না। তখন পরমমিত্র পুরোহিত ছুরিকা দ্বারা আপন হৃৎপিণ্ড ছেদনপূর্ব্বক রাজকুমারদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

ক্ষত্রিয়ের সম্মুখে ব্রহ্মহত্যার মহাপাতকে রাজপুত্রদ্বয় পাতকী হইলেন, তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ককালিমার রেখা অঙ্কিত হইল। তখন তাঁহারা জ্ঞাননেত্রে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া প্রশান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তুচ্ছকথায় ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন, জ্ঞান-নেত্রে তখন তাঁহারা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। প্রতাপ তখন শক্তসিংহকে মিবার পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থানের আদেশ করিলেন। মহাতেজা শক্তও অগ্রজের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বলবতী জিঘাংসা তাঁহার হৃদয় অধি-কার করিল। জ্যেষ্ঠের দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য তাঁহার উগ্র হৃদয় সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল; তিনি সঙ্কল্পসিদ্ধির অভিলাষে আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

প্রতাপসিংহ পরমোপকারী পুরোহিতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রকে উত্তরাধিকারিক্রমে একটি ভূমিবৃত্তি প্রদান করিলেন। অদ্যাপি পুরোহিতের বংশধরেরা সেই ভূমি-বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রাণার মহোপকার-সাধনের জন্য যে স্থানে ব্রাহ্মণের দেহপাত হইয়াছিল, তথায় একটি স্মারক-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল, ঐ সময় হইতে রাজকুমারদ্বয় সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত শত্রুভাবে কালযাপন করিলেন। যে দিন প্রতাপের জীবনরক্ষা করিয়া শক্তসিংহ "খোরসানী মূলতানিকা অগ্‌গল" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, সেই দিন পুনরায় উভয় ভ্রাতা ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দে সংবদ্ধ হইলেন; জীবনে এ সৌহার্দ্দ আর বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

শক্তসিংহের সপ্তদশ পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভণজী, দ্বিতীয়ের নাম অখিল। শক্তসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসমাপনের জন্য পুত্রগণ নদীপুলিনে গমন করিলেন, জ্যেষ্ঠ ভণজী তাঁহাদের সহিত না গিয়া ভিনসোরদুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যথাবিধি কার্য্য শেষ করিয়া ষোড়শ সহোদর দুর্গে প্রত্যাগত হইবামাত্র দেখিলেন, দুর্গদ্বার সংরুদ্ধ, ভণজী দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, কিছুতেই ভণজী দ্বার খুলিয়া দিলেন না। পুনঃ পুনঃ আহ্বানে বিরক্ত হইয়া দুর্গমধ্য হইতেই ভণজী শেষে কহিলেন, "অনেকগুলি উদরপোষণের ভার এখন আমার স্কন্ধে পড়িল, এখানে তোমাদিগের থাকিবার সুবিধা হইবে না, তোমরা স্থানান্তরে যাও।" এই কথা শুনিয়া শক্তের দ্বিতীয় পুত্র অখিল বিনয়নম্র-বচনে কহিলেন, "এখানে আমাদিগের অবস্থিতি যদি আপনার অনভিমত হয়, আমরা এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। আপনি একবার দ্বার উন্মোচন করুন, পুত্রকলত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব লইয়া আমরা বিনা আপত্তিতে ভিনসোর-দুর্গ হইতে বিদায় লইয়া যাই।" দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। পঞ্চদশ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অখিল স্ব স্ব অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্রাদি ও পরিবার-বর্গ লইয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। জ্যেষ্ঠের অসদ্ব্যবহার দর্শনে তাঁহাদিগের হৃদয়ে ঘৃণা জন্মিল, অবিলম্বেই তাঁহারা ইদররাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইদররাজ্য তখন মারবারের রাঠোরদিগের অধিকারে ছিল। অখিলের স্ত্রী গর্ভবতী, সুতরাং তাঁহাকে লইয়া অতি সাবধানে গমন করিতে হইল। নীমহৈরা জনপদের অন্তর্গত পালোড়ে উপ-স্থিত হইবামাত্র অখিলের পত্নী প্রসববেদনায় কাতর হইলেন। পালোড় তখন শোণিগুরু-সর্দ্দারের

অধিকারে ছিল। অখিল তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, দুরাচার পালোড়-শাসনকর্তা তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিলেন না। অনতিদূরে জাহ্নবী দেবীর একটি ভগ্নমন্দির ছিল, নিরুপায় হইয়া তাঁহাদিগকে সেই মন্দিরেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। মন্দিরের মধ্যে একপ্রান্তে আসন্নপ্রসবা রাজপুতরমণী ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমে ঘনঘটায় নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল, মুষলধারে জলবর্ষণ হইতে লাগিল, প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইয়া ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, বাত্যাবিতাড়িত হইয়া ভগ্নমন্দিরের ভিত্তিগাত্র হইতে একখানি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড স্খলিত হইয় আসন্নপ্রসবা রাজপুতরমণীর উপর পড়িবার উপক্রম করিল; তদ্দর্শনে ছুটিয়া যাইয়া অখিলের কনিষ্ঠ সহোদর বল্ল তাহা আপন মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। অন্যান্য ভ্রাতারা ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া একটি বাবুলতরু ছেদন করিয়া আনিলেন; অবিলম্বেই সেই পতনোন্মুখ শিলাখণ্ডের নিম্নভাগে উহা স্তম্ভস্বরূপে স্থাপন করিলেন। এ পর্য্যন্ত সেই গুরুভার বৃহৎ শিলাখণ্ড মহাবীর বল্লের মস্তকোপরিই রক্ষিত ছিল।

সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে জাহ্নবীদেবীর ভগ্নমন্দিরাভ্যন্তরে অখিলের পত্নীর গর্ভে একটি নবকুমার প্রসূত হইল। সদ্যোজাত শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া অখিল ও তাঁহার সহোদরগণ মনে নানা আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে একমত হইয়া সকলে কুমারের নাম আশা রাখিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি মহামায়া জাহ্নবীদেবীর কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইল; আশাপূর্ণাদেবী বরদায়িনীরূপে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। দেবীর প্রভাবে নবপ্রসূতির দেহ সবল ও সতেজ হইয়া উঠিল; অচিরেই তিনি পতি ও দেবরগণ সহ ইদরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যথাকালে সকলেই ইদররাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ইদরের শাসনকর্ত্তা রাঠোররাজ ধর্ম্মশীল, উদারহৃদয় ও পরহিতৈষী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি পরমসমাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয়প্রদান ও তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত ভূমিবৃত্তি প্রদান করিলেন। শক্তসিংহের পুত্রগণ সপরিবারে পরমসুখে ইদররাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

জৈনদিগের পাঁচটি পবিত্র গিরি আছে; শত্রুঞ্জয় তন্মধ্যে একতম। একদা রাণার প্রধান মন্ত্রী শত্রুঞ্জয় গিরি হইতে প্রত্যাগমনকালে ইদররাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নিশাগমদর্শনে যামিনীযাপন ইচ্ছায় সেই স্থানেই তিনি পটগৃহ স্থাপন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। সহসা ঘোরতর ঝটিকা সমুত্থিত হওয়াতে পটগৃহ ছিন্নভিন্ন হইবার উপক্রম হইল; মন্ত্রিবর সপরিবারে তন্মধ্যে অবস্থিত ছিলেন, ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল; তিনি জীবনে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে বল্ল ও যোধ অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেই মহাসঙ্কটে সপরিবার রাজমন্ত্রীকে রক্ষা করিয়া পরহিতৈষিতাগুণের পরিচয় প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদিগের এই মহত্ত্বদর্শনে অনুগৃহীত হইয়া মন্ত্রিবর করযোড়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বল্ল পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। তখন বিনয়নম্রবচনে রাজমন্ত্রী কহিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে উদয়পুরে চলুন, মহারাজকে অনুরোধ করিয়া আমি আপনাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। এখানে থাকা আপনাদিগের পক্ষে উপযুক্ত নহে।" রাজার নিমন্ত্রণ ব্যতীত উদয়পুরে গমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এই কথা বলিয়া শক্তসিংহের পুত্রগণ মন্ত্রীর অনুরোধ-রক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। বিদায়গ্রহণ করিয়া রাজমন্ত্রী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সম্রাটের প্রতিকূলে তরবারি ধারণ করিবার জন্য এ দিকে রাণা পার্ব্বত্যসেনাবল সংগ্রহ করিতেছিলেন, মন্ত্রিমুখে সমস্ত সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ইদররাজ্যে এক দূত প্রেরণ করিলেন।

অবিলম্বেই দূতের সহিত বল্ল সহোদরগণ ও পরিবারবর্গ লইয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। রাণা সাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয়প্রদান করিয়া উচ্চ উচ্চ পদে সকলকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজভক্ত শক্তাবৎগণ রাণার অনুকূলে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের অটলা রাজভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবনযুদ্ধের সময় একদিন শীতঋতুর রজনীযোগে তুষারমণ্ডিত গিরিপ্রদেশে রাণাকে কটকস্থাপন করিতে হইয়াছিল। বল্ল ও যোধ নিবিড় জঙ্গলমধ্য হইতে রাশি রাশি কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাজাকে দুরন্ত হিমানীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আত্মগৌরবলাভের জন্য অন্তলাদুর্গে উপস্থিত হইয়া যিনি প্রাণপণে দুর্গজয়ে চেষ্টা করিলেন, যাঁহার অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মহিমাগুণে শক্তাবৎবংশের কীর্ত্তি চারিদিকে প্রসৃত হইল, তিনিই শক্তাবৎ-সেনাদলের অধিনায়ক মহাবীর বল্ল।

অন্তলার বিরাট্ দুর্গ মোগলের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়াছে, মহাবীর বল্ল দুর্গদ্বারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, বাকরোলের সামন্ত-নৃপতির মুখে এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র রাণা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বীরবর বল্লের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। রাণাকে দেখিবামাত্র তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "দুনা দাত্তার চৌগুণা জুজার, খোরাসানী মুলতানিকা অগ্গল।" অর্থাৎ রাজা তাঁহাদিগের প্রতি উত্তরোত্তর যত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদিগের আত্মোৎসর্গ উত্তরোত্তর তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। *

আসন্নমৃত্যু মহাবীরের মুখে এইরূপ তেজোগর্ভ মহোৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণার হৃদয়-সাগর আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, প্রফুল্লহৃদয়ে তিনি মহাবীরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ভট্টগণের মুখে মহাবীর বল্লের ঐ শেষ উক্তি অদ্যাপি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ঐ কথা শ্রবণমাত্র এখনও শক্তাবৎগণের হৃদয় যেন নবীনবলে বলীয়ান্ হয়; অতীত ঘটনার প্রতিচ্ছায়া যেন তাঁহাদিগের মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইতে থাকে। তাঁহারা যেন বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইয়া সেই অতীতের গৌরবক্ষেত্রে মহাবিক্রমে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

কোন বিশেষ সূত্রে শক্তসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগজী রাণীর অনুগ্রহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সেই মনোদুঃখে তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হইতে হইল। কিন্তু অচিরেই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। কোন সময়ে ভাণ্ডীরদুর্গের রাঠোরেরা রাণার প্রতি অবমাননা করে; ভগজী স্বীয় সেনাদল সমভিব্যাহারে সেই দুর্গ আক্রমণ করিলেন; অচিরেই সে দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল। রাঠোরেরা পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করিলেন। এরূপ মহাবীরত্ব ও রাজভক্তিদর্শনে রাণা পরম সন্তুষ্ট হইয়া ভগজীকে ভাণ্ডীরদুর্গ পুরস্কার প্রদান করিলেন। তদবধি ভাণ্ডীরদুর্গ ভিনসোরের সহিত সংযুক্ত হইল। ইতিবৃত্তগ্রন্থে শক্তসিংহ হইতে পর্য্যায়ক্রমে ঐ সময় পর্য্যন্ত দশ জন সর্দ্দারের নামোল্লেখ আছে; তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে শক্তাবৎকুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের শাখা-প্রশাখা এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রয়োজন হইলে দশ সহস্র শক্তাবৎবীর একত্র রাণার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেন। যে শক্তাবৎকুল বীরত্বে ও সাহসে ভূয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহাদিগের বংশের সন্তানের

* শক্তাবৎদিগের ন্যায় চন্দাবৎদিগেরও "দশ সহস্র মিবারকা বড়া কেওয়াড়ি" এই একটি গৌরবসূচক বাক্য আছে। উহার অর্থ—দশ সহস্র নগরের সিংহদ্বারের কবাট। জনশ্রুতি এইরূপ যে, চন্দাবৎদিগের এই গৌরবব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে ঈর্ষাপরবশ হইয়া শক্তসিংহ প্রধান ভট্টকবি-সমীপে গিয়া বলিয়াছিলেন, "তবে আমার আর কি রহিল?" কবি উত্তর করিয়াছিলেন, "কেওয়াড়কা অগ্গল" অর্থাৎ আপনি সেই দ্বারের অর্গল।

বীরত্বপ্রদর্শন দূরে থাকুক, যুদ্ধবিগ্রহের নাম শ্রবণ করিলে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠেন। ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবে তাঁহাদিগের বিস্তৃত কুলও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

অন্তলাদুর্গ রাণার অধিকৃত হইল। দুর্গবাসী অসংখ্য মোগলসেনা রাজপুত-হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। অচিরেই এই অশুভসংবাদ দিল্লীশ্বরের নিকট পৌছিল। একে একে তিন চারিবার অমরসিংহের সহিত যুদ্ধে মোগলসেনা পরাজিত হইল, সম্রাট্ জাঁহাগীর অত্যন্ত ভীত হইলেন। নিরুদ্যম না হইয়া—নিরুৎসাহ না হইয়া--ভগ্নমনোরথ না হইয়া, কিসে দুর্দ্ধর্ষ রাণার দর্প চূর্ণ হইবে, সম্রাট্ তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অজমীরের অভ্যন্তর দিয়া রাণাকে আক্রমণ করাই স্থির হইল। অবিলম্বেই এক প্রচণ্ড মোগলবাহিনী সুসজ্জিত করিয়া, দিল্লীশ্বর মিবারের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। সেই মহতী মোগলবাহিনীর পর্য্যবেক্ষণের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীশ্বর অন্যতম পুত্র পারবেজকে সেনানীপদে বরণ করিলেন। অচিরেই যবনসেনারা অজমীরে উপস্থিত হইল। পুত্রকে সম্বোধন করিয়া জাঁহাগীর বলিলেন, "বৎস! আমি দেখিব, তুমি দুর্জ্জয় মহাদর্পী মিবারপতির মহাদর্প খর্ব্ব করিতে পার কি না? আজি তোমার বাহুবলের ও বীরত্বের পরীক্ষা হইবে। আর একটি কথা শ্রবণ কর,মনোযোগের সহিত এ কথাটি স্মরণ রাখিও। মিবারের রাণা অমরসিংহ কিংবা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণ যদি সংগ্রামে পরাজিত বা যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হন, তাঁহার উপযুক্ত রাজসম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিও না; মিবাররাজ্যেরও যেন কোন ক্ষতি হয় না। কেবল তোমাকেই যে বলিতেছি, তাহা নহে; সৈন্যগণকেও এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিও।"

সম্রাট্ মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, অমরসিংহ যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবেন, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সে আশা ফলবতী হইল না। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, মোগলবাহিনীর অভিযান শ্রবণমাত্র অমরসিংহের হৃদয় মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত তিনি সেনাসজ্জা করিয়া যবনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরাবল্লীর দ্বারস্বরূপ ক্ষেমনর নামক একটি প্রশস্ত পর্ব্বতবর্ত্মে উভয়পক্ষ মিলিত হইল। স্বদেশরক্ষার জন্য সমুত্তেজিত হইয়া রাজপুত-বীরগণ বিপুলবিক্রমে মোগলসেনা আক্রমণ করিলেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর মহাবল রাজপুতগণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া মোগলসেনা ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল, অসংখ্য অসংখ্য যবনবীর রণভূমে শয়ন করিতে লাগিলেন; হতাবশেষ সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া অজমীরাভিমুখে পলায়ন করিল। মোগল ঐতিহাসিকেরা সেই দিনকে মিবারের পক্ষে শুভদিন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অবমাননা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে সত্যের অপলাপ করিয়া সম্রাট্ জাঁহাগীর তাঁহার দৈনিকলিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন, "বিশেষ কারণে লাহোরে আসিবার আবশ্যক হয়; সেই জন্যই পারবেজকে আমি সংবাদ দিয়াছিলাম, আমার আদেশে পারবেজ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া লাহোরে উপস্থিত হইয়াছিল; রাণার গতিবিধি পরিদর্শনার্থ কতিপয় সেনানীর সহিত আমার পৌত্রকে সেই স্থানে অবস্থিতির আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।"

পারবেজ পরাজিত, অবমানিত ও লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্রকে সেনানীপদে বরণ করিয়া সম্রাট রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি করিলেন। পৌত্রের সহিত যবনবীর মহাব্বৎ খাঁও প্রেরিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ কয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাটের হৃদয়ে ক্রোধ ও জিঘাংসা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, মনে মনে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, মিবারপতির হৃদয়শোণিতে সেই ক্রোধ ও জিঘাংসার শান্তি করিবেন, কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল

না ; মনে মনে যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইল না। মিবাররাজের দোর্দণ্ড বাহুবলে যবন-সেনাপতি পরাজিত হইলেন। পারবেজের পুত্র সদলে রণক্ষেত্রে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। যেমন অসংখ্য যবনসেনা যুদ্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অমনি আবার দলে দলে নূতন বাহিনী আসিয়া মিবাররাজকে আক্রমণ করে। রাণা সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। ক্রমে ক্রমে রাণা সহায়বলহীন হইয়া পড়িলেন। কতিপয়মাত্র বীর অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়াই রাণা অনন্ত যবনসেনাসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে আর্য্যবীরগণের বীরত্ব-বহ্নির মহাতেজে যবনসেনাসাগর অচিরেই শুষ্ক হইয়া গেল।

বীরকেশরী প্রতাপের মৃত্যুর পর রাণা অমরসিংহ এইরূপে সপ্তদশবার যবনবিরুদ্ধে সমরসাগরে অবগাহন করিলেন ; এই সপ্তদশবারই তিনি বিজয়কেতন সমুড্ডীন করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া সম্রাটের হৃদয় মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পুনরায় মহাসমরের আয়োজন করিয়া তিনি অন্যতম পুত্র ক্ষুরমকে মিবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ক্ষুরম তরুণবয়সেই যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, বীরত্বে, সাহসে ও বিক্রমে তিনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইনিই ভবিষ্যতে শাজিহান নামে প্রসিদ্ধ হন।

এবার এই ভীষণ সঙ্কটে চিতোরপুরী কে রক্ষা করিবে ? বিশাল যবনসেনাসাগরে ঝম্পপ্রদান করিয়া কে সুলতান ক্ষুরমের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের প্রতিরোধ করিবে ? নীরবে বসিয়া, মিবারের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিয়া রাণা অমরসিংহ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কোষাগার অর্থশূন্য, দুর্গ সৈন্যশূন্য, অস্ত্রাগার অস্ত্রশূন্য। এবার মিবারের অধঃপতন অনিবার্য্য। যে মিবারভূমির রমণীগণ পর্য্যন্ত বীর্য্যবত্তার জ্বলন্ত চিত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক বীরাঙ্গনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অধঃপতন অনিবার্য্য বলিয়া কি সেই মিবারভূমিকে যবনসম্রাট্ মেষের ন্যায় শৃঙ্খলিত করিবেন ? এখনও অসংখ্য নরনারী মিবারের বক্ষে প্রতিপালিত হইতেছে ; তাহারা কি তবে নির্জীব মাংসপিণ্ড ? মিবারভূমি কি বিনা বিবাদে মোগলের অপবিত্র হস্তে সমর্পিত হইবে ? কখনই না, কখনই না। মিবারের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, জীবন থাকিতে মিবারভূমি যবনের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া দলে দলে সকলে আসিয়া অমরসিংহের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ক্ষমতা অনুসারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সকলেই রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল ; মিবারবাসিনী বীরাঙ্গনারা আপন আপন বসন-ভূষণ বিক্রয় করিল, কৃষকেরা হল গোধন বন্ধক রাখিল, যাহা সংগ্রহ হইল, তৎক্ষণাৎ রাজকোষে প্রেরণ করিল। বণিকেরা আপন আপন উদ্বৃত্ত অর্থরাশির অধিকাংশই প্রফুল্লমনে রাজকোষে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অত্যল্পকালমধ্যেই সেই অর্থে যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হইল, পুত্রগণের সহিত রাজপুত-সৈন্য লইয়া রাণা অমরসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অবিলম্বেই উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল। নূতন রাজপুত-সৈন্যেরা রণদক্ষ মোগলসেনার সহিত মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহারা কখনও অস্ত্রধারণ করে নাই, যাহারা জীবনে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই, এই যুদ্ধে তাহারাও সুদক্ষ প্রাচীন যোদ্ধার ন্যায় অদ্ভুত রণকৌশল, অদ্ভুত বীরত্ব ও অদ্ভুত সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু কতক্ষণ এরূপে অনন্ত সেনার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে ? মুষ্টিমেয় রাজপুতসেনা আর কতক্ষণ অপরিমিত মোগলসেনায়

আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে ? সুতরাং মিবারের ভাগ্যে যাহা ঘটিল, তাহা অনুমানেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে লেখনী স্তম্ভিত হয়, হস্ত কম্পিত হইতে থাকে, অশ্রুসেকে বক্ষ ভাসিয়া যায়। যে বিজয়বৈজয়ন্তী বহুকাল পর্য্যন্ত গিহ্লোটরাজগণের মস্তকোপরি বিরাজ করিত, বীরকেশরী বাপ্পার বংশধর ভিন্ন আর কেহ কখন যে বিজয়কেতন মস্তকোপরি সমুত্তত করিতে সমর্থ হন নাই, আজ জাহাগীরের পুত্র সুলতান ক্ষুরমের সম্মুখে তাহা অবনত হইয়া পড়িল, আত্মকাহিনী বর্ণনায় সম্রাট জাহাগীর শিশোদীয়কুলের এই মহাশোচনীয় অধঃপতনের বিষয় যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে তাহা পরিগৃহীত হইল।

"রাজত্বলাভের পর অষ্টম বৎসরে ১০২২ হিজিরাসালে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) অজমীরের মধ্য দিয়া আমি ক্ষুরমকে মিবারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করি। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল ভিন্ন সেনাপতি আজিম খাঁর সহিত আরও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তৎসকাশে প্রেরিত হয়। সমস্ত কর্ম্মচারীকেই যথাযোগ্য উপহার দিয়াছিলাম।

নবম বর্ষের প্রারম্ভকালেই আমার নিকট শুভসংবাদ আসিল। ক্ষুরমের হস্তে রাণা পরাজিত হইয়াছেন। রাণার প্রিয়তম হস্তী আলাম গোমান এবং আরও সপ্তদশটি হস্তী জয় করিয়া প্রিয়-পুত্র ক্ষুরম আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। পরদিন আলাম গোমানে আরোহণ করিয়া আমি নগরভ্রমণ করিলাম, দীনদুঃখিগণকে অপরিমিত স্বর্ণরত্নাদিও প্রদত্ত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল, মিবারের অনেকগুলি দুর্গ ক্ষুরমের অধিকৃত হইয়াছে, রাণাও অধীনতা স্বীকারে সম্মত আছেন। আমার সৈন্যগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া সমগ্র মিবার দলিত করিয়াছিল, অনেক-গুলি ভদ্রলোকের স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গও বন্দী হইয়াছিলেন; অগত্যা রাণা হতাশ হইয়া শুভকর্ণ ও হারদাস ঝালা নামক দুইটি সর্দ্দারকে ক্ষুরমের নিকট প্রেরণ করেন। সর্দ্দারদ্বয়ের মুখেই প্রকাশ পায়, রাণা বৃদ্ধ, স্বয়ং আমার নিকট থাকিতে পারিবেন না, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া-ছেন, তাঁহার পুত্র কর্ণ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া যথাযথ নিয়ম প্রতিপালন করিবেন এবং অন্যান্য নৃপতিগণের ন্যায় আমার সেবা করিবেন।

আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমার পুত্রকে প্রতিনিধিস্বরূপে প্রেরণ করিয়া রাণাকে মার্জ্জনা করিয়া পাঠাইলাম; আমার আশ্রয়ে তিনি যেন নির্ভয়ে বাস করেন, এ কথাও বলিয়া দিলাম। যে প্রমাণপত্র পাঠাইলাম, তাহাতে আমার পঞ্চাঙ্গুলীও অঙ্কিত থাকিল। * পুত্রের নিকটেও বলিয়া পাঠাইলাম, রাণা সম্মানের পাত্র, কোন প্রকারে যেন তাঁহার সম্মানের ত্রুটি না হয়, তাঁহার ইচ্ছানুসারেই যেন সকল বন্দোবস্ত করা হয়। যথাকালেই আমার পুত্র আমার পাঞ্জাঙ্কিত প্রমাণপত্র রাণার নিকট প্রেরণ করেন। স্থির হইল, ২৬এ তারিখে রাণা আমার পুত্রের নিকট উপস্থিত হইবেন। অত্যল্পদিনের মধ্যেই ক্ষুরমের অধীনস্থ মহম্মদবেগের নিকট সংবাদ পাইলাম, রাণা আমার পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ পরম সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়পাত্র

*প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে, বিশ্বাস উৎপাদনার্থ সরল ব্যবহারের প্রমাণস্বরূপ করে করস্থাপন বা আঙ্করিত পত্রে অঙ্গুষ্ঠাঙ্ক অঙ্কিত করা হয়। অমরসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া জাহাগীর যে প্রমাণপত্রে "পাঞ্জা" অঙ্কিত করিয়াছিলেন, আজিও রাণার দপ্তরখানায় তাহা বিদ্যমান আছে। রক্তচন্দনে পঞ্চাঙ্গুলী নিমজ্জিত করিয়া ঐ প্রমাণ-পত্রের উপর অঙ্কিত হইয়াছিল। মহামতি টড সাহেব স্বচক্ষে প্রমাণপত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলেন।

মহম্মদবেগকে একটি হস্তী, একটি অশ্ব ও একখানি ছুরিকা পুরস্কার দিয়া 'জুলফিকর খাঁ' উপাধিদান করিলাম।

২৬এ রবিবার রাণা আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সম্মান-সম্ভ্রম ও অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সাতটি হস্তী, নয়টি অশ্ব ও কাঞ্চনমণ্ডিত কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র এবং একখানি পদ্মরাগমণি রাণা করস্বরূপ ক্ষুরমকে প্রদান করিলেন। ক্ষুরমের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে আমার পুত্রও তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া একটি হস্তী, গুটিকতক অশ্ব, একখানি তরবারি এবং রাজযোগ্য আরও কতিপয় দ্রব্য উপহার দিলেন। রাণার সঙ্গে যে সমস্ত রাজপুত উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যথাযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। রাণার পুত্র পিতার সহিত আগমন করেন নাই। হিন্দু নৃপতিরা পিতাপুত্রে শত্রুসমীপে উপস্থিত হন না, রাজপুতগণের মধ্যে এ প্রথা চিরদিন প্রচলিত আছে; শীঘ্রই কর্ণকে পাঠাইবেন, এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সেই দিনেই রাণা বিদায় গ্রহণ করিলেন। যথাকালে কর্ণ ক্ষুরমের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথাযোগ্য উপহার (খেলাত) দিয়া উভয়ে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্রের অনুরোধে কর্ণকে আমি আমার দক্ষিণপার্শ্বে আসন দিয়া উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলাম। কর্ণ কিছু লজ্জাশীল ছিলেন, অধিক কথা কহিতে ভালবাসিতেন না। আমার নিকটে উপস্থিত হইবার একদিন পরেই আমি তাঁহাকে একখানি রত্নমণ্ডিত ছুরিকা দিয়া অনুরাগের চিহ্ন প্রদর্শন করিলাম; তৃতীয় দিবসে একটি ইরাবতী অশ্ব দিয়া মহিষী নুরজিহানের নিকট তাঁহাকে লইয়া উপস্থিত হইলাম। মহিষীও একটি হস্তী ও কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্য কর্ণকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। আমিও সেই দিন কর্ণকে একছড়া মুক্তাহার দিলাম। তৎপরদিবসেও একটি হস্তী উপহার প্রদত্ত হইল। দুষ্প্রাপ্য ও সুদৃশ্য সামগ্রী পাইলেই তাহা আমি কর্ণকে উপহার দিতাম। একদিন তাঁহাকে আমি তিনটি বাজপক্ষী ও তিনটি তুরাপক্ষী উপহার দিলাম। এইরূপে সময়ে সময়ে অনেক অনেক দ্রব্যসামগ্রী দিয়া অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

আমার রাজত্বের দশম বর্ষে মোবারিক খাঁকে সঙ্গে দিয়া কর্ণকে তাঁহার জায়গীর চিতোর-গমনে অবকাশ প্রদান করিলাম। বিদায়কালে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তাহারের সহিত আরও কতকগুলি মহামূল্য দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করা হইল। যত দিন কর্ণ আমার নিকট ছিলেন, তত দিনের মধ্যে আমি তাঁহাকে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়ের মূল্য অন্যূন দশ লক্ষ টাকারও অধিক। এতদ্ভিন্ন আমার পুত্র ক্ষুরমের নিকটও তিনি বহু-মূল্যের দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ণের সহিত রাণাকে উপহার দিবার জন্য একটি হস্তী, একটি অশ্ব ও অন্যান্য কতকগুলি বহুমূল্য দ্রব্যও প্রেরিত হইল।

১০২৪ হিজিরাব্দে ৮ই সফরদিবসে কর্ণ পাঁচহাজারী মনসবদারী পদ প্রাপ্ত হইলেম। তৎসহ রাণা দেবল্ল ও দুনগারপুরের সামন্ত-নৃপতিদ্বয়ের উপর আধিপত্য এবং খৈরার, ফুলিয়া, বেদ-নোর, মণ্ডলগড়, জীরণ ও তিনসোর (ভিমসরোর) এই কয়টি জনপদও প্রাপ্ত হইলেম। ২৪এ মহরমের দিন কর্ণের পুত্র জগৎসিংহ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ-বর্ষ। যথাযোগ্য বন্দনাদির সহিত তাঁহাকে আসন প্রদান করা হইল। সাবনের দশম দিবসে বহুমূল্যের উপহার লইয়া জগৎসিংহ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কর্ণের শিক্ষক হরিদাস ঝালার জন্যও বহুমূল্যের পুরস্কার প্রেরিত হইল; সেই সঙ্গে রাণাকে ছয়টি স্বর্ণপ্রতিমা অর্পণ করিলাম।

আমার রাজত্বের একাদশবর্ষে ২৮এ রবি-উল-আউয়ল দিবসে শুভ্রমর্ম্মর-প্রস্তরে খোদিত দুইটি

প্রতিমূর্ত্তি আমার নিকট আনীত হইল ; একটি মিবারের রাণা অমরসিংহের, অন্যটি তৎপুত্র কর্ণের। আমার আদেশেই উহা প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই দিনই আগরার উদ্যানে ঐ দুইটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে অনুমতি প্রদান করিলাম। কিছুদিন পরেই এটিমদ খাঁ আমার নিকট একখানি আরজী প্রেরণ করিলেন। তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, ক্ষুরম রাণার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাণা ও রাজকুমার তাঁহাকে সাতটি হস্তী, সপ্তবিংশতি অশ্ব এবং বহুমূল্য স্বর্ণরত্নাদি করস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, ক্ষুরম তিনটিমাত্র ঘোটক লইয়া আর সমস্ত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন আরও স্থির হইল, আবশ্যক হইলে যুদ্ধের সময় পঞ্চদশশত রাজপুত অশ্বারোহী লইয়া কর্ণ ক্ষুরমের নিকট উপস্থিত থাকিবেন।

রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষে আমি সিন্দিলা নামক স্থানে সভায় সমুপবিষ্ট আছি, রাজকুমার কর্ণ উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, দক্ষিণপ্রদেশ জয়ের জন্য তিনি আমার সহায়তা করিবেন। এক শত মোহর, সহস্র মুদ্রা, কয়েকটি হস্তী, অশ্ব এবং একবিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্যের কতকগুলি স্বর্ণরত্নাদিও তিনি আমাকে নজর প্রদান করিলেন। আমি অশ্বকয়টি ফিরাইয়া দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি রাজকোষে স্থাপন করিলাম; কর্ণকে একটি সম্মানসূচক সজ্জা, হস্তী, অশ্ব, ছুরিকা ও তরবারি এবং রাণার জন্য একটি অশ্ব দিয়া বিদায় প্রদান করিলাম।

রাজত্বের চতুর্দ্দশবর্ষে ১০২৯ হিজিরাব্দে রবি-উল-আউল ১৭শ দিবসে রাণার অন্যতম পুত্র ভীমসিংহ ও পৌত্র জগৎসিংহ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট অবগত হইলাম, রাণা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভীমসিংহ ও জগৎসিংহকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া রাজা কিশোরীদাস দ্বারা একখানি প্রবোধপত্র, কয়েকটি তুরঙ্গ ও আভিষেচনিক দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণপূর্ব্বক কর্ণকে রাণা উপাধি প্রদান করিলাম। ৭ই সাবনদিবসে আমার পাঞ্জাঙ্কিত একখানি প্রমাণপত্রও তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। আদেশে জানাইলাম, তাঁহার পুত্র সসৈন্যে যেন আমার নিকট আগমন করেন। বিহারীদাস বর্ম্মণ পত্র লইয়া প্রস্থান করিল।"

জাঁহাগীরের এই আত্মকাহিনী পাঠ করিলেই তাঁহার উচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বীরকেশরী প্রতাপসিংহের পুত্র অমরকে পরাজয় করিয়া তিনি গভীর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু সে আনন্দ তাঁহার হৃদয়কে বিচালিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি স্বতঃসিদ্ধ মহত্ত্বগুণে বিভূষিত ছিলেন। নিরুপায়, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া রাণা অবশেষে সম্রাটের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বীরহৃদয় যে সেই জন্য কঠোর বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল, সম্রাট জাঁহাগীর তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সম্রাটের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা করা, এ কঠোর অবমাননা সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়াই রাণা স্বয়ং ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া পুত্রকে দিল্লীর সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, জাঁহাগীর ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাণার মর্ম্মান্তিক যাতনা বুঝিতে পারিয়া সম্রাট্‌ জাঁহাগীরের হৃদয়ও ব্যথিত হইয়াছিল।

শিশোদীয়-রাজগণই রাজপুতদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই মহোচ্চ রাজবংশের উপর জয়লাভ করিবার জন্য পিতৃপুরুষেরা কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। আজি সম্রাট্‌ জাঁহাগীর সেই মহোচ্চবংশের মহাবিক্রমশালী রাণার উপর জয়লাভ করিয়া আপনাকে মহাগৌরবান্বিত বিবেচনা করিলেন। উপর্য্যুপরি সপ্তদশবার অসংখ্য নরশোণিতপাত করিয়াও তিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আজি রণদক্ষ ক্ষুরম সদ্ব্যবহারের সাহায্যে সেই কঠোরকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। কেবলমাত্র পশুবলে বা অসিবলে ভারত

শাসিত হয় না, একমাত্র মোগলেরাই এই গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। মিবার-রাজের উপর জয়লাভ করিয়া জাঁহাগীর আপনাকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কর্ণকে আপনার দক্ষিণপার্শ্বে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। ফল কথা, রাজপুতরাজের প্রতি সম্রাট জাঁহাগীরের যে কোন আচরণের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার উচ্চহৃদয়তা, বীরোচিত গৌরব ও শিষ্টাচারের জলন্ত পরিচয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সম্রাট্ জাঁহাগীর অমরসিংহের প্রতি যেরূপ সম্মান-সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কোন বিজিত নৃপতিই কোন কালে জেতার নিকট সেরূপ সম্মান-সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু সে সম্মান-সম্ভ্রমে তেজস্বী অমরসিংহ আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন নাই, বরং যখনই ঐ সম্মান-সম্ভ্রমের কথা স্মরণ হইত, তখনই তাঁহার গর্ব্বান্বিত হৃদয় যেন বিষদিগ্ধ সুতীক্ষ্ণ শরজালে সংবিদ্ধ হইয়া পড়িত; তখনই নিদারুণ যন্ত্রণাতরঙ্গ তাঁহার হৃদয়-সাগর উদ্বেলিত করিত। এক এক সময় উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি ক্ষুরমের মহত্ত্ব ও জাঁহাগীরের সদ্ব্যবহারকে শত শত অভিশাপ প্রদান করিতেন। অম্বরের কচ্ছবাহ-বংশীয় রাজকুমারীর গর্ভে ক্ষুরমের জন্ম। রাজপুতবীরগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল, তিনি রাজপুতবীরত্বের যথেষ্ট আদর করিতেন। ক্ষুরমের আন্তরিক ভক্তি ও আদরে বিমুগ্ধ হইয়াই মহাতেজা অমরসিংহ জাঁহাগীরের অধীনতা স্বীকারে সম্মতিদান করিয়াছিলেন। রাণার সহিত সন্ধিস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ক্ষুরম অমরসিংহের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, "নগরের বহির্ভাগে আসিয়া আপনি যদি একবার সম্রাটের পাঞ্জাঙ্কিত প্রমাণপত্র গ্রহণ করেন, সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত যবনসেনাকে আমি মিবার হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিব। মিবারের মধ্যে আপনি মুসলমানের আর চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না।"

মহাতেজস্বী রাণা অমরসিংহের উন্নত হৃদয় মহাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বীরকেশরী প্রতাপসিংহের পুত্র হইয়া তিনি কি একজন স্বাধীনতাপহারী মোগলের বশীভূত হইবেন?—কখনই না। ক্ষুরমের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইতে পারিলেন না। বন্ধুভাবে একবার ক্ষুরমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে কথায় সম্মতিদান করিতে পারিলেন না। ক্ষুরমের সহিত সাক্ষাতের অত্যল্পকাল পরেই পুত্রের কপালে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া ১৬৭৩ সংবতে (১৭১৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালেই পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস! সাবধান, এখন হইতে মিবারের সম্মান-গৌরব তোমার হস্তে ন্যস্ত রহিল। সুবিবেচনা ও দক্ষতা সহকারে সেই সম্মান-গৌরব রক্ষণে অলস হইও না।" পুত্রকে এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাণা ন-চৌকির গিরিগহনে প্রস্থান করিলেন।

উদয়পুরের উত্তরদিকে একটি মনোহারিণী পর্ব্বতমালা বিরাজিত। তাহারই উপরিভাগে রাণা উদয়সিংহ একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানই ন-চৌকি নামে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি সেই অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রাণা অমরসিংহ সেই গিরিগহনে তাপসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে দুঃখে একপ্রকারে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। যে দিন তিনি ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন, যে দিন তাঁহার পূত আত্মা নরদেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মরধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থিত হয়, সেই দিন তিনি প্রাসাদাভ্যন্তরে আনীত হইয়াছিলেন।

অমরসিংহের অমর চরিত্রের তুলনা নাই। যে সকল গুণ রাজার অলঙ্কার, যে সমস্ত গুণ বীরের অঙ্গবিভূষণ, অমরসিংহ তৎসমস্তেই সমলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নত ও বলিষ্ঠ নরপতি তৎকালে অতি বিরল ছিল। গুণগ্রাহিতায়, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, প্রজারঞ্জনে, সকল

বিষয়েই তাঁহার মহত্ব পরিলক্ষিত হইত। সকলেই তাঁহার প্রতি দেবভাবে অকপট ভক্তি প্রদর্শন করিত। রাজস্থানের বহুসংখ্যক স্তম্ভগাত্রে ও শৈলগাত্রে তাঁহার মহত্বের বিষয় অঙ্কিত রহিয়াছে, যত দিন ভট্টগ্রন্থ জগৎসংসারে বিদ্যমান থাকিবে, যত দিন রাজস্থানের গিরিগাত্র অক্ষত রহিবে, রাণা অমরসিংহের গুণগরিমা তত দিন জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কর্ণ, ভীমের মৃত্যু, জগৎসিংহ, জাঁহাগীরের মৃত্যু, শাজিহান, জগৎসিংহের মৃত্যু, রাজসিংহ, আরঙ্গজেব, মুণ্ডকর, প্রভাবতীহরণ, আরঙ্গজেবের যুদ্ধযাত্রা ও পরাজয়, ভীমের গুর্জ্জরাক্রমণ, মালব লুণ্ঠন, মিবার উদ্ধার, সুলতান আকবরের সিংহাসনলাভ, রাণার মৃত্যু।

বীরপ্রসবিনী মিবারভূমির আর সে গৌরব নাই। মোগল-সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে হীনপ্রভ হইয়া মিবার-রাজ্য এখন একটি সামান্য গ্রহের ন্যায় ক্ষীণতেজ ধারণ করিয়াছে। এক সময়ে সূর্য্যবংশীয় বাপ্পার বংশধরগণের যে তেজ ও যে গৌরব সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজি সে তেজ, সে গৌরব মিবার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কালবশে মিবারের হিন্দুসূর্য্যগণ আপনাদিগের প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড শক্তি, প্রচণ্ড বীর্য্য সমস্তই হারাইয়াছে। যে দিন বীরকেশরী মহারাজা কনক সৌরাষ্ট্রের শীর্ষদেশে বিজয়কেতন তুলিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে প্রায় সার্দ্ধৈক-সহস্র বৎসর অতীত হইল, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনে মিবারের বীরবংশের যেরূপ যেরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, স্মরণ করিলে—সেই অবস্থার জ্বলন্ত চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিলে,—স্তম্ভিত, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

১৬৭৭ সংবতে (১৬২১ খৃষ্টাব্দে) অমরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণ পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর গুণ রাজপুতচরিত্রের অলঙ্কার, কর্ণ তৎসমস্ত গুণেই বিভূষিত ছিলেন। গাম্ভীর্য্য, রণপাণ্ডিত্য, বীর্য্যবত্তা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সকল গুণেই তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন, সাহসে ও কর্ত্তব্যবিচারেও তিনি অদ্বিতীয়।

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, সাহসী হইয়া, বীরকেশরী হইয়া, রণপণ্ডিত হইয়া রাণা কর্ণ নীরবে যবনের অধীনতাপাশে থাকিয়া কিরূপে সে অবমাননা সহ্য করিলেন? মোগল-সম্রাট মিবার-ভূমিকে জায়গীর অভিধা প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ণ নীরবে থাকিয়া তাহাও সহ্য করিলেন; করে রাজপুত-অসি বিদ্যমানে সে কলঙ্ক দূর করিবার জন্য রাণা অগ্রসর হইলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আছে। ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইল যে, রাণা কর্ণ কর্ত্তব্যবিচারে অদ্বিতীয় ছিলেন, সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানেই তিনি তৎকালে নীরবে থাকিয়া শান্তিতরুর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট কর্ত্তৃক মিবার জায়গীর নামে অভিহিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু একদিনের জন্যও কর্ণকে দিল্লীশ্বর জায়গীরদারের ন্যায় বিবেচনা করেন নাই; বরং পরম মিত্রজ্ঞানে তাঁহাকে আপনার

দক্ষিণপার্শ্বে আসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাদৃশ সরল ব্যবহারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলে রাজ্যে শান্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শান্তিকাননের স্নিগ্ধতরুর মূল উৎপাটনে তিনি অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। যবনের প্রতিকূলে অসিধারণ করিলেই যে সিদ্ধকাম হইতেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয় ত তাহা হইলে শিশোদীয়বংশের অস্তিত্বও আর জগতে পরিদৃষ্ট হইত না। এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধেই পরিণামদর্শী মহাবুদ্ধি রাণা কর্ণ যবনের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই।

বিগত যুদ্ধসমূহে মিবারের রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। রাজ্যমধ্যে অর্থসংগ্রহের আর কোন উপায় নাই। যবন-বিপ্লবে মিবারের সৌন্দর্য্যরাশি প্রণষ্ট হইয়াছে, অর্থসংগ্রহ না হইলে সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য-গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে না, সুতরাং অর্থসংগ্রহের জন্য রাণা একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি সুরাটপ্রদেশে গমন করিলেন; মহা-বিক্রমে তত্রত্য নাগরিকবর্গকে বিত্রাসিত করিয়া তাহাদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেন; সেই সমস্ত অতুল অর্থ লইয়া অচিরেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই অর্থের সাহায্যেই রাজ্যের দুরবস্থা দূর হইল, প্রণষ্ট সৌন্দর্য্যরাশিরও পুনরুন্নতি হইতে লাগিল।

অমরসিংহের সহিত মোগলসম্রাটের যখন সন্ধিস্থাপন হয়, দিল্লীশ্বর তখন এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, অমরসিংহের পুত্রগণের মধ্যে যত দিন কেহ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় না হই-বেন, তত দিন রাজকুমারগণকে সম্রাটের সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে; যে দিন কোন রাজপুত্র রাণা উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা এ দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। এ বিধি যথাবিধি প্রতিপালিত হইল। যে দিন কর্ণ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, যে দিন তিনি পবিত্র রাণা উপাধি ধারণ করিলেন, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে সম্রাটের সভায় উপস্থিত থাকিতে হইল না।

কর্ণের কনিষ্ঠ সহোদর ভীম। সাহসে, তেজে ও বিক্রমে তৎকালে ভীমের সমকক্ষ বীর অতি বিরল ছিল। যে সমস্ত শিশোদীয়-সর্দ্দার মোগলসম্রাটের অধীনে ছিলেন, ভীম তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ। আবশ্যক হইলে সম্রাটের সাহায্যার্থ রাণাকে যে সেনাদলের সংযোজনা করিতে হইত, ভীম সেই সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। ভীম খুরমের অকপট বন্ধু বলিয়া পরিগণিত। পুত্রের অনুরোধে দিল্লীশ্বর রাজা উপাধির সহিত ভীমকে বুনাসের তীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র জনপদ প্রদান করি-লেন। তোড়া সেই জনপদের রাজধানী। ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভীমের দুরাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল; বুনাসের তীরে তিনি রাজমহল নামে একটি সমৃদ্ধিশালী নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজমহলের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে এখনও পূর্ব্ব সমৃদ্ধির অনেক অনেক বিচিত্র বিচিত্র নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত রাজমহল ভীমের বংশধরগণের করগত ছিল।

ভীম স্বভাবতঃ তেজস্বী, উগ্রস্বভাব ও নির্ভীক ছিলেন; স্বীয় গৌরব ও পুরুষত্বের বিনিময়ে তিনি সামান্য রাজোপাধি বা অকিঞ্চিৎকর রাজ্যের প্রত্যাশা করিতেন না। তাঁহাকে বশীভূত রাখিবার জন্য সম্রাট অনেকপ্রকার কৌশল করিলেন, কিছুতেই সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না। ভীম খুরমের অকপট বন্ধু। আপনার জ্যেষ্ঠ পারবেজকে বঞ্চিত করিয়া মহাবল ভীমের সাহায্যে পৈতৃক সিংহাসন করায়ত্ত করিবেন, খুরমের মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি ছিল; সম্রাটের মনেও সেই সন্দেহ জন্মিল। ভীমকে খুরমের নিকট হইতে অন্তরিত করিবার জন্য দিল্লীশ্বর তাঁহার হস্তে

গুজরাটের শাসনভার সমর্পণ করিলেন। ভীম কিন্তু সে পদ গ্রাহ্য করিলেন না, সুলতান ক্ষুরমের নিকট বাস করাই তাঁহার সঙ্কল্প।

পারবেজ কর্ত্তৃক মিবারের ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। তিনি শিশোদীয়কুলের পরম শত্রু; কিসে রাজপুতজাতির সর্ব্বনাশ হইবে, এই চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। সেই জন্যই মহাতেজা ভীম তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পারবেজ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, ভীমের প্রাণে তাহা সহ্য হইবে না। ক্ষুরমের হস্তে ভারতের শাসনদণ্ড সমর্পিত হয়, ইহাই ভীমের আন্তরিক বাসনা, ইহাই ভীমের সঙ্কল্প। এই কারণেই গুজরাটের শাসনদণ্ড উপেক্ষা করিয়া—সম্রাটের আজ্ঞায় অবহেলা করিয়া দিল্লীতে ক্ষুরমের নিকটেই তিনি অবস্থিতি করিলেন; কিসে তাঁহার অকপট প্রিয় মিত্র ক্ষুরমের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, কিরূপে ক্ষুরমকে রাজরাজেশ্বর দেখিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া সম্রাট্-পুত্রগণের মধ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব ঘটিল। বীরকেশরী ভীমের সহিত গুপ্তমন্ত্রণা করিয়া ক্ষুরম স্থির করিলেন, সম্রাট্পদবী লাভ করিতে হইলে অচিরে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পারবেজকে ইহলোক হইতে বিদূরিত করাই কর্ত্তব্য। তাহাই হইল। ক্ষুরম আর মুহূর্ত্ত বিলম্বও সহ্য করিতে পারিলেন না; অবিলম্বে সসৈন্যে জ্যেষ্ঠের প্রতিকূলে ধাবিত হইলেন। ক্ষুরমের তেজোবহ্নিতে নিপতিত হইয়া অচিরেই হতভাগ্য পারবেজ পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইলেন। তখন ক্ষুরম পিতার প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় যে সকল রাজপুত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, মারবাররাজ গজসিংহই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইনি ক্ষুরমের মাতামহ, ইনিই এই গর্হিত কার্য্যের প্রধান উত্তেজক। পাছে তাঁহার প্রতি দিল্লীশ্বরের কোনরূপ সন্দেহ হয়, এই জন্য চতুর গজসিংহ দূরে দূরে অন্তরালে থাকিয়া ক্ষুরমকে গুপ্তমন্ত্রণা প্রদান করিতেন।

বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য সম্রাট্কে অগত্যা বিদ্রোহিদলের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইল। জয়পুরাধিপতিকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পিতাপুত্র প্রতিদ্বন্দ্বিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। গজসিংহ চতুর, পাছে সম্রাটের হৃদয়ে সন্দেহ হয়, এই জন্য তিনি স্বয়ং রণমুখে অগ্রসর না হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভীমের হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, হয় আপনি প্রকাশ্যভাবে সমরভূমে আসিয়া আমাদিগের সহায় হউন, নচেৎ আমাদিগের বিরুদ্ধে অসিধারণ করুন।

ভীমের গর্ব্বিতবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া রাঠোররাজ গজসিংহ মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; তৎক্ষণাৎ তিনি ভীমের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। অণুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত না হইয়া বীরকেশরী ভীমও দ্বিগুণতর উৎসাহে বিপুলবিক্রমে রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। পরমমিত্র ক্ষুরমকে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে দেখিয়া তিনি সুখী হইবেন, বহুদিন হইতে মনে মনে এই আশা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। অচিরেই তাঁহার সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইল, তিনিও স্বয়ং রণভূমে চিরদিনের জন্য শয়ন করিলেন। সকল সাধই মিটিল।

শক্তাবৎ সর্দ্দার মানসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা গোকুলদাস, এই দুই জন ভীমের পরামর্শদাতা ছিলেন। খৈরার জনপদের অন্তর্গত সনওয়ার নগরের শাসনভার মানসিংহের হস্তে ছিল। অমরসিংহের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিয়া এই মহাবীর শিশোদীয়কুলের মহাযোধ উপাধি প্রাপ্ত

হন। ভীম মানের পরম মিত্র। ভীমের সহিত মান প্রত্যহই একত্র ভোজন করিতেন। ভীম যখন রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন, মান কিন্তু তখন আহত অবস্থায় রুগ্নশয্যায় শায়িত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, ক্ষতমুখে পট্টবন্ধনী সংলগ্ন। ভীমের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিলে সে অবস্থায় মানের জীবন-সংশয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার নিকট এ সংবাদ কেহই প্রকাশ করে নাই। পাচক ব্রাহ্মণ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল, ভীমকে দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পাচক সত্যকথা গোপন করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মানসিংহের হৃদয় সন্দেহে অধীর হইয়া উঠিল। দন্তে দন্ত পেষণপূর্ব্বক তিনি সবলে ক্ষতাবরক পট্টবন্ধনীগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অচিরেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহকারা পরিত্যাগ করিল। মিত্রবিরহশোক সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

বীরকেশরী ভীম অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত। যাঁহার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া, যাঁহার উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া, যাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া, সুলতান ক্ষুরম অভীষ্টসিদ্ধির আশা করিয়াছিলেন, সেই বীরপুরুষ পরমমিত্র ভীম ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন; সেনাদলও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল, অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষুরম সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁকে সমভিব্যাহারে লইয়া উদয়-পুরে পলায়ন করিলেন। উদয়পুরের শান্তিতরুর ছায়াতলে রাণার প্রাসাদের স্বতন্ত্র এক অংশে তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন অতীত হইল। সুলতানের অনুচরবর্গ রাজপুতসংস্কারের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিত না; ক্ষুরম মনে মনে তাহাতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন; রাজভবনের একাংশে বাস করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল না। ক্ষুরমের উদারভাব ও উন্নতহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া রাণা পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার আদেশে অচিরেই হ্রদগর্ভস্থ দ্বীপের উপর একটি মনোহর অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইল। বহুমূল্য রত্নরাজি ও মহার্হ দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা উহা সুসজ্জিত হইল। অট্টালিকার উচ্চতম চূড়াপ্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্রসুশোভিত ইসলামের বিচিত্র পতাকা সমুড্ডীন হইল। সেই সুরম্য অট্টালিকার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমে সুলতানের অভিপ্রায়ানুসারে রাণা কর্ণ মাদারশাহ ফকিরের স্মরণার্থ একটি ক্ষুদ্র চৈত্যও নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অনুচর ও পারিষদদলে পরিবেষ্টিত হইয়া সুলতান ক্ষুরম সেই মনোহারিণী অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন।

সুলতান ক্ষুরম কর্ণকে যেরূপ প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন, রাণা কর্ণও তাঁহাকে সেইরূপ পরমমিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। জেতা বিজেতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ক্ষুরম ও তাঁহার পিতা মিবাররাজের প্রতি একদিনের জন্যও সেরূপ ব্যবহার করেন নাই। ক্ষুরম মিবাররাজ্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন, রাণা কর্ণও তাহার প্রতিদানে বিস্মৃত হন নাই। যে বস্তু তিনি সুল-তানকে প্রতিদান করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গীয় হৃদয়ের অকৃত্রিম পবিত্র কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। সেই নিদর্শন কি?—আপনার মস্তকের উষ্ণীষ। উষ্ণীষ-বিনিময় রাজপুতগণের প্রধান ধর্ম্ম, ভ্রাতৃত্ববন্ধনের প্রধানতম নিদর্শন। যে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে বসিয়া উভয়ের মধ্যে উষ্ণীষ-বিনিময় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে মাদারশাহের সমাধিমন্দির সুপরিষ্কৃত রহিয়াছে। আজিও সেই মন্দির আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া থাকে। মিবারের শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিশো-দীয় বংশধরেরা সেই সমাধি-মন্দিরের প্রদীপে তৈলযোজনা করিতে একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন না, তজ্জন্য প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ না হইয়া দিবাযামিনী সমভাবেই প্রজ্বলিত রহিয়াছে। *

---

* মহামতি ভারতবন্ধু টড সাহেব স্বচক্ষে মাদারশাহের সমাধিমন্দির এবং ধর্ম্মভ্রাতৃত্ব নিবন্ধনের নিদর্শনস্বরূপ

সুলতান ক্ষুরম উদয়পুরের হ্রদগর্ভস্থ দ্বীপভবনে সেই সুরম্য হর্ম্ম্যতলে বাস করিতে লাগিলেন সত্য, পেশোলার বিমল সলিলকণাবাহী সুশীতল মারুতহিল্লোল সেবন করিতে লাগিলেন সত্য, কিছুতেই কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শান্তিবোধ হইল না। নানা চিন্তা, নানা আশঙ্কা নিরন্তর তাঁহার হৃদয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্যরাজ্যে গমন করিলেন। * কর্ণের বিষাদের সীমা রহিল না। তিনি আশা করিয়াছিলেন, সেই দ্বীপভবনেই ক্ষুরমকে সর্ব্বাগ্রে সম্রাট বলিয়া সম্বোধন করিবেন, সেই ক্ষুদ্র দ্বীপভবনেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে সম্রাটের আসনে অভিষেক করিয়া পবিত্র মিত্রতার—অকপট কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া পরমসুখী হইবেন; তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। ক্ষুরম অচিরেই পারস্যরাজ্যে যাত্রা করিলেন, মিত্রবিরহে এ দিকে কর্ণও নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন।

রাণা কর্ণের রাজ্যাভিষেকের পর আট বৎসর অতীত হইল। এই আট বর্ষকাল বিরামদায়িনী শান্তির ক্রোড়ে থাকিয়া রাণা মিবারের রাজদণ্ড পরিচালন করিলেন। তাঁহার অমানুষিক রাজগুণে সকলেই অনুরক্ত ও বশীভূত ছিলেন। আট বর্ষ নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগের পর ১৬৮৪ সংবতে (১৬২৮ খৃষ্টাব্দে) স্বীয় পুত্র জগৎসিংহের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া রাণা কর্ণ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পরে বীরকেশরী মহামতি সম্রাট জাঁহাগীরও দিল্লীর সিংহাসন শূন্য রাখিয়া মরধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরধামে গমন করিলেন।

উদারহৃদয় সম্রাট জাঁহাগীর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। দিল্লীর সিংহাসন শূন্য। ক্ষুরমের ভাগ্যগগন এত দিনে সুপ্রসন্ন হইল। যাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাণা কর্ণ ও ভীমসিংহ প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, সে সিংহাসন শূন্য দেখিয়া কি জগৎসিংহ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? শুভসমাচার পিতৃবন্ধুকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি অবিলম্বে কতিপয় রাজপুতসেনানী সমভিব্যাহারে আপন ভ্রাতাকে ক্ষুরমের নিকট প্রেরণ করিলেন। ক্ষুরম তৎকালে সৌরাষ্ট্রের একটি সুখময় প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। সংবাদ প্রাপ্তমাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি উদয়পুরে রাণা জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। উদয়পুর সে দিন আনন্দপুর হইয়া উঠিল। আলোকমালায় নগরী সুসজ্জিত হইল। রাজপুতানার নানা স্থান হইতে অসংখ্য অসংখ্য সম্ভ্রান্তলোক সমাগত হইলেন। উদয়পুরের বাদলমহল প্রাসাদের অভ্যন্তরে মণ্ডলাকারে মহতী সভার অধিবেশন হইল। দিল্লীর সামন্ত ও করদাতৃভূপতিগণ সুলতানকে সর্ব্বাগ্রে "শাজিহান" নামে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষুরমের মনোরথ এত দিনে সুসিদ্ধ হইল; শিশোদীয়রাজারও আজন্মসাধ পরিপূর্ণ হইল। উদয়পুরের গৃহে গৃহে নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ ও মহোৎসব হইতে লাগিল। ক্ষুরমের অভিষেককালে হিন্দুগণ যেরূপ বিমল আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন, কোন মুসলমানরাজার রাজ্যাভিষেককালে সেরূপ আনন্দ উপভোগ করেন নাই। পরমধর্ম্মাত্মা শাজিহান জগৎসিংহের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন;—

উক্তীব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "যে পরমোপকারী বন্ধুর সরল ব্যবহারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজপুতেরা আপনাদের প্রাসাদগর্ভে যবন ফকিরের সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা অশেষ প্রকারে প্রপীড়িত করিলেও শিশোদীয়গণ সেই পবিত্র কৃতজ্ঞতানিদর্শন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আমরা অহংজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া এই সকল মহাত্মার পবিত্র হৃদয়ের পবিত্রভাব বুঝিতে পারি না।" মহানুভব উদারহৃদয় টড সাহেব ভারতের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর্য্যজাতির গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই ভারতের আর্য্য বীরগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই জন্যই ভারতের অধঃপতনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল।

* কোন কোন ইতিবৃত্তে লিখিত আছে, ক্ষুরম গোলকুণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

পাঁচটি প্রাচীন জনপদ উদ্ধার করিয়া তিনি রাণাকে প্রদান করিলেন এবং একখানি মহার্হ পদ্মরাগ-মণি উপহার দিয়া চিতোরের দুর্গপ্রাসাদগুলির জীর্ণসংস্কারে আদেশ প্রদান করিলেন। শাজিহান জগৎসিংহকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অল্পকাল পরেই রাণার নিকট বিদায় লইয়া ধর্ম্মমতি শাজিহান দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাণা জগৎসিংহ এক জন অতি সম্মানিত নরপতি ছিলেন। ভট্টগ্রন্থে তাঁহার রাজত্বসময়ের কোন বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত নাই। মিবারের ভট্টগণ বীররসপ্রিয়, বীররস বর্ণন করিতেই তাঁহারা ভালবাসিতেন। জগৎসিংহের সময় রাজ্য শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল, যুদ্ধবিগ্রহের উপদ্রবে রাজ্যবাসিগণকে উপদ্রুত হইতে হয় নাই, কাজেই ভট্টকবিগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থে জগৎসিংহের বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে তাদৃশ উৎসাহী ছিলেন না। রাণা জগৎসিংহ স্থাপত্যবিদ্যায় নিতান্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি ষড়্‌বিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি রাজ্যমধ্যে স্থাপত্যবিদ্যানুরাগের অনেক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উদয়পুরে তাঁহার নামে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তাহার নির্ম্মাণকৌশল ও শোভাসৌন্দর্য্য দেখিলেই শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজনীতির অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজদণ্ড পরিচালন করিলে অসংখ্য বিপদের মধ্যেও রাজ্য উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে পারে; তাহা না হইলে কঠোরতম বিপদ ও অনিষ্টপাতের পরেও মিবারের রাণারা এরূপ ব্যয়সাধ্য গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যের ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সমর্থ হইতেন না।

জগমন্দির নামক প্রাসাদ স্বচ্ছসলিল পেশোলাহ্রদের বক্ষশোভিত দ্বীপদ্বয়ে সংস্থিত এবং জগনিবাস হ্রদের তটোপরি প্রতিষ্ঠিত। যে কয়েকটি প্রাসাদ রাণা জগৎসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে এই দুইটিই সর্ব্বজনপ্রশংসিত ও সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দুইটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্তম্ভ, স্নানাগার, জলাধার, কৃত্রিম প্রস্রবণ প্রভৃতি দৃশ্য বিরাজিত আছে। প্রাসাদদ্বয়ের দ্বার ও বাতায়নসমূহের কবাটাবলী বিবিধ বর্ণের কাচ দ্বারা সুশোভিত। সূর্য্যদেবের ময়ূখমাখা যখন সেই সকল কবাটের উপর নিপতিত হয়, প্রকোষ্ঠভিত্তিতে তখন অসংখ্য ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই দুইটি প্রাসাদের চিত্র সূক্ষ্মরূপে অঙ্কিত করিতে কবির তুলিকাও বিকম্পিত হয়।

রাণা জগৎসিংহের স্বতঃসিদ্ধ সদ্‌গুণাবলীতে, তাঁহার মধুর আলাপনে ও অত্যুদার সরলব্যবহারে শত্রুরও কঠোরহৃদয় প্রীতিপ্রস্রবণে অভিষিক্ত হইত। যে একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত, একবার তাঁহার মধুরস্বর শ্রবণ করিত, জীবনে সে তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিত না। চিতোর শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, জগৎসিংহের অধ্যবসায়ে ও যত্নে পুনরায় অনেকাংশে পূর্ব্বসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইল। চিতোরের তৃতীয় উৎসাদনকালে আকবরই বারুদাগ্নি দ্বারা মালবুরুজ উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেই মালবুরুজ, সিংহদ্বার ও ছত্রকোট প্রভৃতি বিধ্বস্ত স্থানগুলিও জগতের গুণে পুনরায় সুদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

জগৎসিংহের দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠের নাম রাজসিংহ। মারবাররাজকুমারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। জগৎসিংহের রাজত্বের পর রাজসিংহই মিবারের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মিবাররাজ্যে যে বিরামদায়িনী—আনন্দদায়িনী শান্তি বিরাজিত ছিল, রাজসিংহের রাজ্যাভিষেকের পর সে শান্তি একেবারে তিরোহিত হইল। কালচক্রের আবর্ত্তনে আবার চিরন্তনী জাতিবৈরতা ঘোর-মূর্ত্তিতে মিবারের চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল; কেবল মিবার নহে, সমগ্র রাজবারার চতুর্দ্দিকেই

হিন্দুমুসলমানের প্রচণ্ড বিবাদবহ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে রাণা রাজসিংহকেই এই বিবাদের একপ্রকার মূলকারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

দিল্লীর সম্রাট্ শাজিহান বৃদ্ধ। তাঁহার চারি পুত্র ;—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম দারা। পিতা বিদ্যমানেই পুত্রগণ নানা অসদুপায়ে মোগলসিংহাসন হস্তগত করিতে উদ্যত হইল। এই ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব দেখিয়া সম্রাট্ শাজিহান পরিণতবয়সে মর্ম্মবেদনায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। এই বিষম বিগ্রহবহ্নিতে পতিত হইয়া ভারতভূমির অনেক হতভাগ্য পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইল। সম্রাটের পুত্রগণ আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য রাজবারার সমস্ত নৃপতিরই সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শাজিহানের চারিপুত্রই এককালে রাণা রাজসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, শাস্ত্র অনুসারে তিনিই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী, এই বিবেচনা করিয়া রাণা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাজবারার প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গই রাণার সহিত একমত হইয়া দারার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইলেন। অবিলম্বে ফতিহাবাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হইল। দারা, সুজা ও মুরাদ তিন জনেই পরাজিত হইলেন। অত্যল্পকালমধ্যেই বিজয়লক্ষ্মী সম্রাট্ আরঙ্গজেবের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

আরঙ্গজেবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। ফতিহাবাদের রণক্ষেত্রে তিনি জয়লাভ করিলেন। বিজয়-বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন করিয়াও তাঁহার শান্তিলাভ হইল না ; যাহারা যাহারা তাঁহার সুখভোগের পথে কণ্টকস্বরূপ, তাহাদিগকে অন্তরিত করিবার জন্য তিনি অসিহস্তে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার মনোরথও পরিপূর্ণ হইল। পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন, অধিক কি, স্বহস্তে স্বীয় পুত্রের হৃদয়-শোণিতপাত করিতেও তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। রাজ্যলিপ্সার বশীভূত হইয়া তিনি যে সকল জুগুপ্সিত ও পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়, জগৎসংসার নৃশংসতার নরককুপ বলিয়া অনুমিত হয়। আপনিই যে আপনার ভবিষ্য বংশধরগণের মঙ্গলপাদপের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, তখন তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

মোগলকুলচূড়ামণি আক্‌বর পিতামহ বাবর কর্ত্তৃক অবলম্বিত নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই রাশি রাশি বিঘ্নবাধার মস্তকে পদার্পণ করিয়া রাজাসন অটল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই নীতির অনুসরণ করিয়াই জাঁহাগীর ও তৎপুত্র শাজিহানও রাজাসন অটল রাখিয়া হিন্দুরাজগণের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। দুরাচার আরঙ্গজেব তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তিনি সে নীতির অনুসরণ করিলেন না, পাপমোহে মুগ্ধ হইয়া আপনিই আপনার পদে কুঠারাঘাত করিলেন। বাবর কর্ত্তৃক অবলম্বিত নীতির অনুসরণ করিলে তত শীঘ্র মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিত না, শাজিহানের মনোহর ময়ূরাসনও বোধ হয় আজিও দিল্লীর প্রাসাদে বিরাজ করিত। বাবর কর্ত্তৃক অবলম্বিত নীতির মূলে একটি মহান্ নৈতিকবল গুপ্তভাবে নিহিত ছিল, সাধারণতঃ সে ভাব কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বিজিত হিন্দুরাজগণের সহিত আপনাদিগকে বৈবাহিকসম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া জেতা মোগলসম্রাটগণ সেই মহান্ নৈতিকবল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারই সাহায্যে সমগ্র ভারতে তাঁহাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন হইয়াছিল। চতুরচূড়ামণি জাঁহাগীর ও শাজিহান হিন্দুগণকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য যত্নবান্ থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিতেন। জাঁহাগীর ও শাজিহান উভয়েই রাজপুতরমণীর গর্ভজাত ; সেই জন্যই তাঁহারা হিন্দুজাতির মঙ্গলসাধনে যত্নবান্ থাকিতেন। তাঁহারা যত্নবান্ থাকিতেন বলিয়াই রাজপুতগণ তাঁহাদিগের জন্য আপনাদিগের হৃৎপিণ্ডচ্ছেদনেও

কুণ্ঠিত হইতেন না। আরঙ্গজেব এই মহান্ নীতির মহতী উপকারিতা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, কাজেই সে সহানুভূতির দৃঢ়বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, মহাদুর্দ্দিনের নিবিড় ছায়া আসিয়া ভারতক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করিল; হিন্দুমুসলমানে জাতিবৈরভাবহ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

তাতাররমণীর গর্ভে দুরাচার আরঙ্গজেবের জন্ম; তাতার-শোণিতে তিনি পরিপুষ্ট; সুতরাং রাজপুতগণের সহিত তাঁহার সহানুভূতি অসম্ভব। ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, সহোদরগণের হৃদয়শোণিত পান করিয়া, স্বীয় পুত্রের হৃৎপিণ্ডচ্ছেদন করিয়াও তিনি রাজাসন লাভ করিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। কোন রাজপুতবীরই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই; বরং অনেকে তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যখন আরঙ্গজেবের মহানিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, বিবেক যখন তাঁহার হৃদয়ের একপ্রান্তে স্থানগ্রহণ করিয়াছিল, বাবরপ্রচলিত মহান্ নীতির গূঢ়মর্ম্ম যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখন সেই নীতির অনুসরণ করিয়া তাহার ফলও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই ফল—শাহ আজিম ও কমবক্স।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশাল রাজবারা প্রদেশ আট ভাগে বিভক্ত। আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রত্যেক রাজ্যেই এক একটি খ্যাতনামা নরপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসের একটি নূতন বিস্ময়কর চিত্র সন্দেহ নাই। তৎকালে অম্বরে জয়সিংহ, মারবারে যশোবন্তসিংহ, বুন্দি ও কোটায় হাররাজগণ, বিকানীরে রাঠোর এবং অর্চ্চার ও টাতিয়ায় বুন্দেলাগণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। ইঁহারা প্রত্যেকে এক একটি মহাতেজস্বী প্রচণ্ড বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। মোহান্ধ না হইয়া, পরিণাম বিবেচনা করিয়া আরঙ্গজেব যদি সুনীতির অনুসরণপূর্ব্বক ইঁহাদের পরামর্শমত কার্য্য করিতে পারিতেন, মোগলক্ষমতা নিঃসন্দেহ আজিও অটলভাবে ভারতে একাধিপত্য করিত। বলদর্পিত আরঙ্গজেবের দর্পই মোগল-অধঃপতনের কারণ হইয়া উঠিল। যে রাজপুতগণের হৃদয়ে প্রীতির বীজ বপন করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, যাঁহাদিগের সহায়তা ও অনুরাগিতা-লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন, সেই রাজপুতবীরগণের গুণরাজি বিস্মৃত হইয়া মোহান্ধ আরঙ্গজেব তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আপনার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিলেন, আপনার দোষে আপনি সমগ্র হিন্দুজাতির বিষনয়নে পড়িলেন। কিসে তাঁহার অনিষ্ট হইবে, কিসে তিনি উপযুক্ত প্রতিফল পাইবেন, সমবেত হিন্দুমণ্ডলী তাহারই উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত; অচিরে তাঁহাদিগের মনস্কামও সুসিদ্ধ হইল। সহসা বীরকেশরী সুপ্রসিদ্ধ শিবজী মোগলসূর্য্যের প্রচণ্ড রাহুরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন; তাঁহারই অপূর্ব্ব কৌশলে আরঙ্গজেবের অসদাচরণের প্রায়শ্চিত্তবিধান হইল।

যে বিদ্যা পরোপকারের জন্য নিয়োজিত হয়, সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা এবং যে বিক্রম বিপন্নের বিপদুদ্ধারার্থ নিয়োজিত হয়, তাহাই প্রকৃত বিক্রম বলিয়া গণনীয়। আরঙ্গজেব বিদ্যাবত্তায় ও বিক্রমে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পাশব স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া উহা আপনার দুরভিসন্ধিসাধনের জন্য ব্যবহার করিতেন। ভারতের ভাগ্য যতগুলি মুসলমান-নৃপতির হস্তে পতিত হইয়াছিল, কপটতায় ও স্বার্থপরতায় কেহই আরঙ্গজেবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। জগতের কাহারও প্রতি আরঙ্গজেবের বিশ্বাস ছিল না; তিনি কাহারও নিকট গূঢ়-কথা প্রকাশ করিতেন না। বলবতী দুরাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার অসদাচরণের মূল; দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

স্বহস্তে পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের হৃৎপিণ্ডচ্ছেদন করিয়া আরঙ্গজেব মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, চিরজীবন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবেন, তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না; ক্রমশই নানারূপ দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধীর করিয়া ফেলিল। শত শতবার, সহস্র সহস্রবার তিনি চেষ্টা করিলেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবেন, পারিলেন না। পিতৃহত্যা, পুত্রহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি দুর্ব্বহ পাপভার যাহার মস্তকে বিন্যস্ত, তাহার হৃদয় কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পদে পদে যন্ত্রণাময়ী চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। একে ত জগতের কাহারও প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, তাহার উপর এইরূপ চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হওয়াতে তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। নানা শঙ্কা, নানা সন্দেহ ও নানা বিভীষিকা যেন তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। তাঁহার যেন বোধ হইল, জগতের সকলেই তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান;—আত্মীয়-স্বজন, সভাসদ্‌গণ, অমাত্যবর্গ, বন্ধুবান্ধব সকলেই যেন তাঁহার অনিষ্টাচরণে ষড়্‌যন্ত্রে সংলিপ্ত। দিন দিন কুচিন্তার বৃদ্ধি;—দিন দিন অধীরতার বৃদ্ধি। জীবনধারণ যেন তাঁহার নিকট বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিসে হৃদয়ে শান্তিস্থাপন হইবে, আরঙ্গজেব তখন তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তব্য স্থির হইল। দুরাচার আরঙ্গজেব মনে মনে স্থির করিলেন, আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়-শোণিতপাতে হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, নিরাশ্রয় নিঃসহায় হিন্দুপ্রজাগণের হৃদয়শোণিতপাত করিয়া সেই কলঙ্কিত হস্ত বিধৌত করিবেন; তাহা হইলেই স্বজাতিগণ পরিতুষ্ট থাকিবেন, তাহা হইলেই আপন হৃদয়ও শান্তিলাভ করিতে পারিবে। দুরাচারের দুষ্টহৃদয়ে যেমন এই পাপকল্পনার উদয় হইল, দুরাচারের মস্তক হইতে অমনি রাজমুকুট স্খলিত হইয়া পড়িল; মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন বলিয়া যবনরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন, রাজ্যমধ্যে যে সকল হিন্দুপ্রজা বাস করে, অচিরে তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। যাঁহারা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন, সম্রাটের লোক বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রাজ-আদেশপালনে বাধ্য করিবে, এমন কি, আবশ্যক হইলে অসিবল-প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবে না।

আজি ভারতের প্রলয়কাল উপস্থিত। চারিদিকে হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। হিন্দুর জাতিগৌরব, কুলধর্ম্ম, সম্মানমর্য্যাদা, সমস্তই যবনকুলাঙ্গারের হস্তে প্রণষ্ট হয়; কে রক্ষা করিবে? যাঁহার উপর প্রজার জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, মান-সম্ভ্রম সমস্তই নির্ভর করে, তিনি যদি পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া পুত্রসম আশ্রিত প্রজার কষ্টে কষ্টবোধ না করিয়া, স্বজাতি বিজাতি ভেদজ্ঞান করিয়া উৎপীড়ন করেন, যিনি রক্ষক, তিনিই যদি ভক্ষক হন, নিঃসহায় নিরুপায় হতভাগ্য প্রজাগণ তবে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কাহার কাছে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে, হৃদয়ের কবাট খুলিয়া কাহার নিকট প্রাণের বেদনা জানাইবে? স্বজাতি বিজাতি প্রজাকে যিনি সমান চক্ষে দেখেন, তিনিই প্রকৃত রাজপদবাচ্য। ন্যায়ান্যায়-বিচারে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারে, ইষ্টানিষ্ট-বিচারে যাহার ক্ষমতা নাই, তাদৃশ পাষণ্ড রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজসিংহাসন কলঙ্কিত হয়।

যবনকুলাঙ্গার দুরাচার আরঙ্গজেবের কঠোর আজ্ঞা প্রচার হইবামাত্র সনাতন ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া হতভাগ্য হিন্দুগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অনেকে দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিল। যাহাদিগের পলায়ন করিবার উপায় নাই, স্বহস্তে তাহারা আপনাদিগের হৃৎপিণ্ডচ্ছেদন করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল; অনেকে অগ্রে হৃদয়ের প্রিয়তমবস্তু পুত্র-কলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং বিষপান করিয়া

দুর্ব্বৃত্ত যবনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। রাজ্যের চারিদিকেই হাহাকার, চারিদিকেই শোকরোল, চারিদিকেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! ভারতের ভাগ্যগগনে আরঙ্গজেবরূপ প্রচণ্ড ধূমকেতু উদিত হইয়া প্রজার সুখসূর্য্য গ্রাস করিবে, মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করে নাই। দুর্ব্বৃত্ত কুলপাংসনের ঘোরতর অত্যাচারে রাজ্য শ্রীহীন হইয়া পড়িল; নগর, গ্রাম, পল্লী, সমস্তই জনশূন্য হইল; গৃহ গৃহিশূন্য, হাটবাজার ব্যবসায়শূন্য, বাণিজ্যাগার বণিক্‌শূন্য। রাজ্যমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত। দস্যুতস্করের উৎপীড়নে—লুণ্ঠনকারীর লুণ্ঠনে রাজ্য ক্রমে ক্রমে শ্মশানে পরিণত হইল। সম্রাটের রাজকোষ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। রাজ্যে প্রজা নাই, রাজস্ব দিবে কে? যে কতিপয়মাত্র প্রজা আছে, তাহারাও দস্যুতস্করের উৎপীড়নে মুমূর্ষুপ্রায়।

অত্যাচারের উপর নূতন অত্যাচার। রাজকোষ শূন্যপ্রায় দেখিয়া সম্রাট্ আরঙ্গজেব একান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ভারতের সমগ্র হিন্দুপ্রজার উপর একটি মুণ্ডকর (জিজিয়া) ধার্য্য করিলেন। প্রজাবৃন্দের মস্তকে যেন ভীষণ বজ্রপাত হইল। কি উপায়ে এই মহাসঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, কেহই কিছু নিরূপণ করিতে পারিল না। মর্ম্মভেদী হাহাকাররবে ভারতভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হতভাগ্য হিন্দুগণের শোচনীয় দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াও যবনকুলাঙ্গার দুরাচার আরঙ্গজেবের কঠোরহৃদয়ে বিন্দুমাত্র করুণাসঞ্চার হইল না।

এ দিকে বিষময়ী চিন্তায় আরঙ্গজেবের হৃদয় ক্রমে ক্রমে দ্বিগুণতর অধীর হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বি-প্রহরের গভীর নিশীথিনীতে সমস্ত জগৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিত, জগৎ-সংসারের সমগ্র জীব বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইত, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেব গভীর চিন্তার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতেন। সেই গভীর নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যেন তাঁহার পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের মর্ম্মভেদী গম্ভীর স্বর তাঁহার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তাঁহারা যেন তীব্রস্বরে অভিশাপ দিয়া বলিতেন, "কুলাঙ্গার! আমাদিগকে সংহার করিয়া তুই নিশ্চিন্তভাবে সুখে সাম্রাজ্যভোগ করিতে পারিবি কি?—কখনই পারিবি না। ঐ দেখ্, ভীষণ যমদণ্ড তোর মস্তকোপরি উত্থিত হইয়াছে।" বিস্ময়ে চমকিত হইয়া আরঙ্গজেব শয়নগৃহ হইতে বহির্গমনে উদ্যত হইতেন, পারিতেন না, স্খলিতপদে পুনরায় শয্যায় শয়ন করিতেন। চিন্তা—যাতনা—অধীরতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; গতিশক্তি—উত্থানশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইল; দুর্ব্বৃত্তের কলঙ্কিত দেহ হইতে প্রাণহরণের নিমিত্ত দণ্ডহস্তে শমন আসিয়া তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইলেন। দুঃখ, শোক, নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহাকে একান্ত অধীর করিয়া ফেলিল; বিষময়ী চিন্তার তীব্রদংশনে তিনি নিপীড়িত হইতে লাগিলেন; বিভীষিকার ভীষণমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। আর তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না; সহসা অধীর হইয়া চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! আমার সম্মুখে কে এ? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যে কেবল দেবতা।" আরঙ্গজেব চতুর্দ্দিকে ক্রোধ ও জিঘাংসাময়ী দেবমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সম্রাট্ আরঙ্গজেব বিদ্যাবত্তায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন, দুরাকাঙ্ক্ষার পাপমোহে বিমুগ্ধ না হইয়া যদি তিনি সুনীতির অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে অধীতবিদ্যাবলে জগতে তিনি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। মৃত্যুর কতিপয় দিবস পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। সেই সময় তিনি আপন প্রিয়তম পুত্র শাহ আজিম ও রাজকুমার কমবক্‌সকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্র দুইখানিতে আপনার চরমজীবনের

বিভীষিকাময় শোকোদ্দীপক চিত্র তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছিলেন যে, পাঠ করিলে পাষণ্ডেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়। অনিত্য জগৎ-সংসারের মূলতত্ত্ব সেই পত্র-দুইখানিতে সুব্যক্ত হইয়াছিল। পত্র দুইখানি এই স্থানে পরিগৃহীত হইল।

"বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি নীরোগে অবস্থান কর। আমার মন নিরন্তর তোমার নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত; জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে; আমি দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি; আমার শরীরযন্ত্রসকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, অপরিচিতের ন্যায় একাকী আমি জগতে আসিয়াছিলাম, আবার অপরিচিতের ন্যায় একাকীই বিদায় গ্রহণ করিব। কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি, আবার এখন কোথায় যাইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! অনিত্য বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বৃথা আড়ম্বরে সময় কাটাইয়াছি। হায় হায়! অমূল্য সময় বৃথা অপব্যয় করিয়াছি! আমার হৃদয়কারাগারে একজন রক্ষক ছিল। কে সেই রক্ষক?—বিবেক! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে অন্ধচক্ষু দ্বারা তাঁহার দিব্যজ্যোতি দেখিতে পাই নাই। জীবন অনিত্য। আমি জগৎ-সংসারে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই, কিছুই লইয়াও যাইব না। মুক্তির বিষয় ভাবিয়া আমি মুহুর্ম্মুহুঃ যাতনায় নিপীড়িত হইতেছি। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এখন একমাত্র ভরসা জগদীশ্বরের দয়া-দাক্ষিণ্য ও করুণা। আমার দেহতরী কালসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছি। পুত্র কমবক্স বিজয়পুরের দিকে প্রস্থান করিয়াছেন, সম্মানার্হ শাহ আলম বহুদূরে অবস্থিত; পৌত্র আজিম হোসেনও নিকটে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটে কেবল তুমিই আছ। প্রিয়তম পৌত্র বিদারবক্সকে আমার শেষ আশীর্ব্বাদ দিবে। তাহার কন্যা বেগমও বোধ হয় দুঃখার্ত্তা; কিন্তু বলিতে পারি না, মানবহৃদয়ের ভাব ঈশ্বর ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারিবে? এখন শেষ বিদায়! বিদায়!! বিদায়!!!"

প্রিয়পুত্র শাহ আজিমকে এইরূপ পত্র লিখিয়া অন্যতম পুত্র রাজকুমার কমবক্সকেও সম্রাট্ আরঙ্গজেব একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ;—

"প্রাণাধিক পুত্র! জগৎপিতা পরমেশ্বরের আদেশে জগতে অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়া আমি তোমাকে অনেকগুলি সুপরামর্শ দিয়াছিলাম, তোমার সহিত কঠোরতম কষ্ট সহ্য করিতেও পরাঙ্মুখ হই নাই; কিন্তু তুমি আমার সুপরামর্শে তাদৃশ মনোযোগ প্রদান কর নাই। এখন আমি অপরিচিতের ন্যায় ইহসংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিতেছি। নিজের অকিঞ্চিৎকরত্ব চিন্তা করিয়া এখন আমি শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি কি বলিতে পার, ইহাতে আমার কি লাভ? মনুষ্যমাত্রই অপূর্ণ। আমি এখন সংসার-কারাগার হইতে বাহির হইতেছি। কি লইয়া বহির্গত হইতেছি? —অপূর্ণতা আর স্বকৃত পাপের ফল। হায় হায়! জগৎপিতার লীলা কি বিচিত্র! অপরিচিতের ন্যায় সংসারে একাকী আসিয়াছিলাম, আবার অপরিচিতের ন্যায় একাকী বিদায় গ্রহণ করিতেছি। মহাযাত্রার উদ্যোগ করিয়াছি সত্য, কিন্তু পথপ্রদর্শক নাই। এখন যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই দেবতা নেত্রগোচর করি। আমি নিজের বিষয় কিছুই জানি না, কিন্তু সেনাকটক ও অনুচরবর্গের ভাবনায় আকুল হইতেছি। আমার জ্বর এখন নাই বটে, কিন্তু অঙ্গ-সন্ধিসমূহ শিথিল, পদদ্বয় গতিশক্তিহীন, মেরুদণ্ড বিনমিত। আমি যে সকল পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। সেই পাপের পরিণাম যে কিরূপ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ধার্ম্মিকের প্রতি, পুত্রের প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেরূপ যত্ন প্রদর্শন করিতে হয়, আমি জীবনে তাহা করি নাই। বৎস! তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, জীবনে ধার্ম্মিকের অবমাননা বা তাহার প্রাণসংহার করিও না।

ধার্ম্মিকের প্রাণবধ করিলে সে মহাপাপ আমার মস্তকে আরোপিত হইবে। আমি এখন মহাপ্রস্থানের উদ্‌যোগ করিয়াছি। তোমাকে, তোমার মাতাকে, তোমার পুত্রকে পরমপিতা জগদীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম। পাপ ও পুণ্য যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা তোমারই জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার প্রতি যে কিছু অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, সমস্ত বিস্মৃত হও; পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ভুলিয়া যাও; নচেৎ পরলোকে উহার জন্য আমাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। নিজ আত্মার দেহত্যাগ কখনও কি কেহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?—আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভৃত্য, পারিষদ্‌বর্গ, অনুচরদল যতই কেন প্রবঞ্চক হউক না, তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিও না। ভদ্রব্যবহারে ও সুকৌশলে আপনার উদ্দেশ্যসাধন করিবে ও উপদেশগুলি স্মরণ রাখিও, এখন আমি চলিলাম।"

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শিশোদীয়কুলের কেহ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজ্যাভিষেককালে টীকাডোর-বিধির অনুষ্ঠান করা হয়। নানা কারণে কিছু দিন সেই প্রথা স্থগিত ছিল, মহারাজ রাজসিংহের রাজ্যাভিষেককালে সেই লুপ্তবিধি পুনরুজ্জীবিত হইল। সেই বীরপ্রথার অনুসরণ করিয়া রাণা রাজসিংহ অজমীরের অনতিদূরবর্ত্তী মালপুর নগর আক্রমণ করিলেন। নগর লুণ্ঠিত হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া রাণা স্বরাজ্যে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। অচিরেই এ সংবাদ সম্রাট্ শাজিহানের কর্ণগোচর হইল। সম্রাটের ক্রোধোদ্দীপনার্থ রাজবয়স্যেরা নানারঙ্গে চিত্রিত করিয়া এই ঘটনা বর্ণনা করিলে উদারহৃদয় শাজিহান মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার ভ্রাতুষ্পৌত্র রাজসিংহ বালক, স্বতঃসিদ্ধ চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া না বুঝিয়া এ কার্য্য করিয়াছেন।"* বয়স্যেরা লজ্জাবনতবদনে মৌনভাবে অবস্থান করিলেন।

সাহস, অধ্যবসায়, বিক্রম, বীর্য্যবত্তা, লোকরঞ্জকতা প্রভৃতি যে সকল গুণ রাজার প্রকৃত বিভূষণ, রাণা রাজসিংহ সেই সমস্ত গুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার হৃদয়সাগর বীররসে পরিপূর্ণ। তাঁহার ন্যায় মহাবীর তেজস্বী নরপতি তৎকালে রাজবারার কোন প্রদেশেই পরিলক্ষিত হয় নাই। রাণা রাজসিংহ শৈশবাবস্থা হইতেই আরঙ্গজেবকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, আরঙ্গজেবের নাম শ্রবণ করিলেই তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিতেন। যে দিন আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, সেই দিনে—সেই মুহূর্ত্তেই রাজসিংহের ক্রোধানল দ্বিগুণতর সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। দুরন্ত যবনের হস্ত হইতে মিবারের চিরস্বাধীনতা উদ্ধার করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, কি প্রকারে অভীষ্টসিদ্ধি করিবেন, অনুক্ষণ তাহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উদারহৃদয় তেজস্বী রাণা রাজসিংহের প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ হইয়াছিল। এমন কি, দুরাচার আরঙ্গজেবকে বহুকষ্টে রাণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল। যে সূত্র অবলম্বন করিয়া রাণা রাজসিংহ মোগলসম্রাটের প্রতিকূলে অসি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে পরিগৃহীত হইল।

মোগলসাম্রাজ্যের মধ্যে রূপনগর নামে একটি নগর আছে, মারবারের রাঠোরবংশের শাখার কতিপয় রাজকুমার স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই স্থানে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মোগলের অধীনে সামান্য সামন্ত-নৃপতিরূপে পরিগণিত হইতেন। আরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রূপনগরের সামন্তরাজের গৃহে সেই সময় একটি পরমসুন্দরী রাজকুমারী নবযৌবনের লাবণ্যের সহিত দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছিলেন। সেই রূপবতী কুমারীর

---

* সম্রাট্ শাজিহানের সহিত রাণা কর্ণের ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছিল।

নাম প্রভাবতী। প্রভাবতীর অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা দুরাচার আরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। সুন্দরীর সৌন্দর্য্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার ক্রূরহৃদয়কে বিমোহিত করিয়া ফেলিল; সেই রমণীরত্ন হস্তগত করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্তের পাপহৃদয় ব্যাকুল হইল। অন্য কোন উপায়ে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না বিবেচনায় দিল্লীশ্বর প্রভাবতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আপনার সমুচ্চপদগৌরব ও অসীম ক্ষমতায় বিমুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ মনে করিলেন, বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণমাত্র প্রভাবতী সম্মত হইবেন। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া সম্রাট্ প্রভাবতীর পিতার নিকট বিবাহ-প্রস্তাবের সহিত দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন।

সম্রাটের আদেশ লইয়া অবিলম্বেই সেনাগণ রূপনগরে উপস্থিত হইল; প্রভাবতীর পিতার নিকট তাহারা দিল্লীশ্বরের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিল। সামন্তরাজ ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। কি উপায়ে এই মহাসঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, কি উপায়ে পবিত্রকুল কলঙ্কের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে সকল বৃত্তান্ত প্রভাবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বয়ং পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন; বিপদুদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভয়ে ও চিন্তায় রাঠোরসামন্ত এরূপ হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কিছুই উপায় স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। পিতাকে মৌনভাবে হতসংজ্ঞের ন্যায় থাকিতে দেখিয়া প্রভাবতী আপনিই আপনার বিপদুদ্ধারের উপায় স্থির করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। প্রথমতঃ তিনি মনে মনে আপনার অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা একজন সামান্য সামন্ত-নরপতি। তাঁহার সেরূপ সহায় নাই, সম্বলও নাই। প্রভাবতী মনে মনে ভাবিলেন, তবে কি মারবাররাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবেন?—তাহাও সম্ভবে না। মারবার-নৃপতি দিল্লীশ্বরের একপ্রকার বেতনভোগী। তবে এ ঘোর সঙ্কটে রক্ষাকর্ত্তা কে? দিল্লীশ্বরের প্রতিকূলে অসিধারণ করিয়া তাঁহাকে ঘোর সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিতে সাহসী হইবে, এমন বীরকেশরী তবে কে? তবে কি রক্ষার আর কোন উপায় নাই? ম্লেচ্ছমণ্ডূকের উপভোগের জন্যই কি তবে বিধাতা কোমলাঙ্গী পদ্মিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন? আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা করে, আর্য্যকুলের চিরগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে, আর্য্যকুলবতীর সতীত্বরত্ন রক্ষা করিয়া অতুলকীর্ত্তি উপার্জ্জন করে, ভারতে কি এমন মহাবীর কেহই নাই? রক্ষা করে, এমন বীর না থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সতীত্বরত্ন-রক্ষার কি অন্য কোন উপায় নাই?—আছে, অনেক উপায় আছে;—শাণিত ছুরিকা,—প্রজ্বলিত বহ্নি,—বিষ,—উদ্বন্ধন। এ সমস্ত উপায় ত দুর্ল্লভ নহে? ইহার জন্য ত কাহারও অনুগ্রহের অপেক্ষা করিতে হইবে না? ইহার জন্য ত কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না? প্রভাবতী সঙ্কল্প করিলেন, এই কয়টি উপায়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করিয়া তিনি ধর্ম্মরত্ন রক্ষা করিবেন। সঙ্কল্প করিলেন এই বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। একটি নূতন আশা আসিয়া তাঁহার হৃদয় আশ্বাসিত করিল। কে যেন গোপনে তাঁহার কানে কানে বলিয়া দিল, "নিরাশ হও কেন? সতীর সতীত্বনাশ কে করিতে পারে? ঈশ্বর সতীকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তোমার উদ্ধারকর্ত্তা আছেন, —মিবারের বীরকেশরী রাণা রাজসিংহই তোমার উদ্ধারকর্ত্তা।"

রাণা রাজসিংহের গুণ ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইতিপূর্ব্বে প্রভাবতী রাণার সদ্‌গুণের বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাণা রাজসিংহ মহাবীর, গুণগ্রাহী, সদালাপী, বিশেষতঃ একজন রসজ্ঞ ভূপতি। রাণার নাম স্মরণমাত্র প্রভাবতীর হৃদয় আশ্বস্ত হইল, তৎক্ষণাৎ মিবারপতির প্রতি তাঁহার

অনুরাগ জন্মিল, আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি অচিরেই রাণার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিত থাকিল, যদি তিনি এই ঘোরসঙ্কটে বিপদুদ্ধার করিয়া সতীর সতীত্বরক্ষা করিতে পারেন, প্রভাবতী তাঁহারই অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন। অবিলম্বে রূপনগরাধিপতির বিশ্বস্ত পুরোহিত পত্রখানি লইয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাকালে পত্রখানি রাণা রাজসিংহের হস্তে পৌঁছিল। আদ্যোপান্ত পত্রখানি পাঠ করিয়া রাণা প্রভাবতীর উচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। পত্রখানি অতি সুন্দর, মনোজ্ঞ ও উত্তেজকভাবে পরিপূর্ণ। পত্রখানির উপসংহারে প্রভাবতী লিখিয়াছেন, "রাজপুতকুলের কুমারী কি বানরমুখ ম্লেচ্ছের উপভোগ্য হইবে? কোমলাঙ্গী পদ্মিনী কি মণ্ডুকের গৃহবাসিনী হইবে? রাজহংসীকে কি বকের সহচরী হইতে হইবে? মহারাজ! দুরাচার যবনের কবল হইতে যদি আপনি আমাকে রক্ষা না করেন, মিবারের রাণা হইয়া যদি আপনি আর্য্যকুলের মর্য্যাদালঙ্ঘন করেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আত্মহত্যা করিয়া আমি এ সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব।"

যুগপৎ শত শত শরবিদ্ধ হইলে মৃগেন্দ্র যেরূপ উত্তেজিত হয়, গভীর উত্তেজনাপূর্ণ পত্রখানি পাঠ করিয়া রাণা রাজসিংহও সেইরূপ সমুত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দুর্ব্বৃত্ত যবনকুলাঙ্গার সম্রাটের দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। ঘৃণা, রোষ, জিঘাংসা ও বিজিগীষা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। মনে মনে যে কল্পনা করিয়া রাণা রাজসিংহ এত দিন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত; এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পিতৃপুরুষগণের চির-স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র পবিত্র মিবাররাজ্য এখন ঘৃণিত জায়গীর নামে কলঙ্কিত। সেই দুর্ব্বহ কলঙ্কভার এত দিনের পর মোচন করিতে রাণা রাজসিংহ সমুত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাহস, উৎসাহ, বিক্রম ও জিঘাংসা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বাপ্পা রাওয়ের লোহিত-বৈজয়ন্তী সমুত্থিত করিলেন, অচিরেই সমরায়োজন করিয়া সৈন্যদলসমভিব্যাহারে সম্রাটের প্রতিকূলে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

প্রভাবতীর উদ্ধারসাধনই প্রথম কর্ত্তব্য। রণবীর সর্দ্দার ও সেনানীগণ বীরনাদে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া রূপনগরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন; আরাবল্লী পর্ব্বতমালার পাদদেশে রূপনগর অধিষ্ঠিত। রাণা রাজসিংহ সেই বিশাল পাদদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক বিপুলবিক্রমে যবনসেনা আক্রমণ করিলেন। হিন্দুমুসলমানে ঘোরযুদ্ধ বাধিল। বাপ্পার বংশধর রাজসিংহের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, মোগলসেনার মধ্যে এমন বীর কোথায়? মিবারপতি মহাবিক্রমে মোগল-যোদ্ধ্গণকে বিদলিত ও মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন, রণভূমে শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। মোগলের অসংখ্য মৃতদেহে রণভূমি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট কতিপয় মোগলসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। রাজসিংহ বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ অচিরে প্রভাবতীকে প্রাপ্ত হইলেন। অবিলম্বেই তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাণার এইরূপ অমানুষিক সাহস ও অসীম বীরত্বদর্শনে আর্য্যরাজপুতগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা রাণাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মোগলসম্রাট দুরাচার আরঙ্গজেবের প্রতিকূলে রাণার অসিধারণ এই প্রথম।

নবীনা মহিষী লইয়া রাণা রাজসিংহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। নবীনা রাজ্ঞীর মঙ্গলোদ্দেশে রাজভবন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সমস্ত নগরী আনন্দময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। নগরের চতুর্দ্দিক্ কুসুমমালায় ও সমুদ্ভাবিত আলোকমালায় সুসজ্জিত হইল। গৃহে গৃহে নৃত্যগীত,

আমোদ-প্রমোদ ও মহোৎসব হইতে লাগিল। অগণিত সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া রাজ্ঞী প্রভাবতী পরমসুখে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহ ও মারবাররাজ যশোবন্তসিংহ, এই দুই তেজস্বী বীর সম্রাটের বেতনভোগী ছিলেন। ইঁহারা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সনাতন আর্য্যধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই। তেজস্বিদ্বয়ের তেজ বা বিবেকশক্তিও আরঙ্গজেব হরণ করিতে সমর্থ হন নাই। সম্রাট মনে করিয়াছিলেন, এই বীরকেশরীকে তিনি স্বহস্তে ক্রীড়াপুত্তলি-স্বরূপ করিয়া রাখিবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেব যখন যখন কোনরূপ পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমুদ্যত হইতেন, এই বীরদ্বয় সেই সেই সময়েই ক্রুদ্ধকেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সেই সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার হইতে দুর্ব্বৃত্তকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, এই সকল কারণেই সম্রাট্ অভীপ্সিত পৈশাচিক কাণ্ডে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। জয়সিংহ ও যশোবন্ত উভয়েই পরম হিন্দু; স্বজাতির প্রতি তাঁহাদিগের অকৃত্রিম গাঢ়প্রেম; ইঁহারা মোগলসম্রাটের বেতনভোগী সত্য, কিন্তু বিপুলসহায়সম্পন্ন, মহাযোদ্ধা ও সকল কার্য্যেই সুদক্ষ; বিশেষতঃ মোগলসেনার অধিকাংশই ইঁহাদের অনুগত। হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার করিলে, ইঁহারা স্বজাতির পক্ষে অসিধারণ করিবেন, সেই সঙ্গে যদি আবার অন্যান্য রাজপুত-বীরেরা যোগদান করেন, তাহা হইলে রাজ্যে ভীষণ মহাবিপ্লব ঘটিবে, এই সকল চিন্তা করিয়াই দুরাচার সম্রাট আরঙ্গজেব আপনার অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইতেন না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, এই দুই মহাবীরকে হত্যা করিয়া বিষম কণ্টক উন্মূলিত করিবেন।

নররাক্ষস আরঙ্গজেব যখন এইরূপ দুরভিসন্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, মারবারপতি মহারাজ যশোবন্তসিংহ তখন কাবুলরাজ্যে এবং অম্বরপতি জয়সিংহ সুদূর দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়কেই হত্যা করিবার জন্য দুই প্রদেশে দুইটি গুপ্তচর প্রেরিত হইল। কালকূটবিষপ্রয়োগে ভূপতিদ্বয়ের প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইল। হায়! পরমবিশ্বস্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতিদ্বয় যেরূপ অকপট কৃতজ্ঞতা ও অলৌকিকী প্রভুপরায়ণতা প্রদর্শন করিতেন, দুরাচার নরপিশাচ আরঙ্গজেব তাহার উপযুক্ত প্রতিদান করিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, রাক্ষস কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া পিশাচ গুপ্তচরদ্বয় অবিলম্বেই কালকূটপ্রয়োগে ভারতের স্তম্ভস্বরূপ বীরকেশরিদ্বয়ের প্রাণবিনাশ করিল।

পাপাত্মা মোগলসম্রাট ভাবিয়াছিলেন, জয়সিংহ ও যশোবন্তকে ইহলোক হইতে বিদায় করিতে পারিলেই তাঁহার অভীষ্টপথের কণ্টক উন্মূলিত হইবে, জঘন্য সঙ্কল্পগুলিও সিদ্ধ করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশাও ফলবতী হইল না। স্বজাতিপ্রেমিক—স্বদেশপ্রেমিক বীরপুঙ্গব রাণা রাজসিংহের মহাপরাক্রমের সম্মুখে তদীয় সেই পাশব সঙ্কল্প অবিলম্বেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। সম্রাটের অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইল না, কেবল দুর্ব্বহ পাপভার মস্তকোপরি বহন করিতে হইল।

দুইটি বীরকেশরী হিন্দুনরপতির হৃদয়শোণিতপাত করিয়া পিশাচ আরঙ্গজেব হস্ত কলঙ্কিত করিলেন, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিল না। যশোবন্তসিংহের শিশুপুত্ত্রগণকে বিনাপরাধে কারারুদ্ধ করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। অচিরেই সঙ্কল্পসাধনের আয়োজন হইতে লাগিল। এই সংবাদ অবগত হইয়া রাঠোররাজের সৈন্যসামন্তগণ সতর্ক হইল; রাজকুমারগণকে বিঘ্নবাধা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা অবহিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

মারবারপতি যশোবন্তসিংহের অনেকগুলি পুত্ত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম অজিত। কুলাঙ্গার

আরঙ্গজেব যখন যশোবন্তের প্রাণহরণ করেন, অজিত তখন নিতান্ত শিশু। মারবারমহিষী মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, শিশুপুত্রকেই সিংহাসনে বসাইয়া তাহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এই জন্যই রাজ্ঞী পতির অনুগমন করেন নাই। তাঁহার মনের আশা মনোমধ্যেই বিলীন হইল। পতিশোক ভুলিতে না ভুলিতে তিনি পুত্রশোকের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যে পুত্রের জন্য তিনি পতির অনুগমন করিয়া পবিত্র সতীধর্ম্মের নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, বিধাতা কি আজ সেই পুত্রধনে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন? নিরুপায় হইয়া মারবারমহিষী রাণা রাজসিংহের শরণ গ্রহণ করিলেন। শিশোদীয়কুলেই মারবার-মহিষীর জন্ম। সেই শিশোদীয়বংশের সমুজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ বীরপুঙ্গব রাণা রাজসিংহের অনুগ্রহ-প্রার্থিনী হইয়া তিনি একখানি পত্রসহ মিবারে একটি বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন।

যথাকালে দূত মিবারে উপস্থিত হইল। রাণা আনুপূর্ব্বিক পত্রখানি পাঠ করিয়া মারবার-রাজ্ঞীর প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মতিদান করিলেন; মারবাররাজের শিশুকুমারগণকে রক্ষা করা কর্ত্তব্যজ্ঞানে অবিলম্বেই তিনি মারবার হইতে তাঁহাদিগকে মিবারে আনয়ন করিলেন। যশোবন্ত-সিংহের শিশুপুত্রগণ মিবারে রাণার আশ্রয়ে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

মারবাররাজকুমার অজিতসিংহ যখন মিবারে আগমন করেন, সার্দ্ধ-দ্বিশত মহাবল রাজপুত সৈন্য তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। তাহারা যখন আরাবল্লী-পর্ব্বতমালার দুর্ভেদ্য কূটবর্ত্মের মধ্যে উপস্থিত হইল, অকস্মাৎ এক দল মোগলসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রায় পঞ্চসহস্র শত্রুসৈন্য চারিদিক্ পরিবেষ্টন করিয়া কুমার অজিতসিংহকে হরণ করিতে উদ্‌যোগ করিল। রাঠোর-বীরেরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অসি উত্তোলনপূর্ব্বক যবনসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। উভয়-দলে ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এ দিকে কুমার অজিতসিংহ আপন শরীররক্ষকগণের সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে মিবারে উপস্থিত হইলেন। মহাবিক্রমশালী রাঠোর-সৈন্যেরা যবনসেনার গতিরোধ করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা কুমারের অনুসরণে সমর্থ হইল না।

মিবারের অন্তর্গত কৈলবাজনপদে দিব্য সমুন্নত রাজভবনে অজিত স্বজনগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দুর্গাদাস নামক এক জন মহাবীর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত হইলেন। মারবারমহিষীও পুত্রের সহিত মিবারে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন তথায় না থাকিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন; কিরূপে আততায়ী মহাশত্রু দুরাচার আরঙ্গজেবের উপ-যুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহাতে রাজ-স্থানের প্রধান প্রধান রাজগণের মধ্যে পরস্পর একতাবন্ধন হয়, অজিতের জননী প্রথমে তদ্বিষয়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার সঙ্কল্প অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধও হইল। অবিলম্বেই মিবার, মার-বার ও অম্বর একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইল; অচিরেই তত্তৎপ্রদেশের বীরগণ যবনের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অভিন্ন সহানুভূতিসূত্রে—পরস্পর একতাবন্ধনে বদ্ধ হওয়া সুখের বিষয় বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে সে বন্ধন দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। অচিরেই আবার শিশোদীয়, রাঠোর ও কুশাবহের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ন্যূনতঃ এক শতাব্দী যদি ইঁহাদের একতাবন্ধন শিথিল না হইত, তাহা হইলে কদাচ ভারতের রাজসিংহাসন যবনের হস্তগত হইত না।

জয়সিংহ ও যশোবন্তসিংহ ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। দুরাচার সম্রাটের দুরভিসন্ধি-সাধনের বিঘ্ন বিদূরিত হইল। আশায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি নির্ব্বিরোধে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে

যত্নবান্ হইলেন বটে, কিন্তু সহসা বীর নৃপতি রাণা রাজসিংহ তাঁহার পথে ঘোরতর প্রতিরোধ স্থাপন করিলেন। রাজকোষ শূন্যপ্রায় দেখিয়া মোগলসম্রাট্ যখন রাজ্যমধ্যে হিন্দুজাতির প্রত্যেকের উপর মুণ্ডকর স্থাপন করিলেন, করভাবে প্রপীড়িত হইয়া যে সময় হিন্দুপ্রজাগণ আর্ত্তনাদে সমগ্র ভারত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, বীরকেশরী রাণা রাজসিংহের হৃদয় তখন প্রজাদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিল। মনে মনে তিনি কতকগুলি তর্কচিন্তা করিতে লাগিলেন। "যাহার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্ম, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি খ্যাতনামা ক্ষত্রিয়-নরপতিগণ অসীম বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, আজি কি সেই মাতৃভূমি—সেই ভারতভূমি ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে? বিধাতৃদত্ত অমরবরে চিরজীবী হইয়া কি পাষণ্ড মোগল সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছে?—কখনই না—কখনই না। মুসলমানের দাসত্বশৃঙ্খলে অভাগা আর্য্যসন্তানেরা ত বহুদিন হইতে আবদ্ধ রহিয়াছেন, কত কত অত্যাচারী যবন ত প্রচণ্ডবিক্রমে ভারতের ভাগ্যচক্র নিয়মিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৈ, এই দুরাচার যবনকুলকলঙ্ক আরঙ্গজেবের তুল্য কঠোরতম অত্যাচারে ত কেহই প্রজাগণকে প্রপীড়িত করে নাই? এই দারুণ অত্যাচার কি ভারত-সন্তানগণকে অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে?" এইরূপ তর্কচিন্তা করিতে করিতে মহারাজ রাজসিংহের হৃদয় ক্রোধে সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি মুণ্ডকরের প্রতিবাদ করিয়া মোগলসম্রাটের নিকট অবিলম্বে একখানি সুদীর্ঘ পত্রিকা প্রেরণ করিলেন। পত্রিকাখানি যেরূপ তেজস্বিনী, সেইরূপ ভাবময়ী। মানব-জগতে আর কখনও কাহারও লেখনী হইতে সেরূপ ভাবের সেইরূপ পত্রিকা বহির্গত হইতে দেখা যায় নাই। পত্রিকাখানি মানবহিতৈষণা, উদারনীতি ও বিশ্বপ্রেমিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একে প্রভাবতীকে হরণ করিয়া রাণা রাজসিংহ তাঁহাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছেন, সম্রাট আরঙ্গজেবের হৃদয়বহ্নি হৃদয়মধ্যেই বিলীন ছিল, তাহার উপর এই তেজস্বিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া সেই অন্তর্নিগৃহীত অগ্নি প্রচণ্ডবেগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জিঘাংসার উদয় হওয়াতে সম্রাট একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন; ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাণার প্রতিকূলে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল। রাণা একপ্রকার নিঃসম্বল, মোগল-সম্রাটের অধীনে এক জন সামান্য জমীদারমাত্র; কিন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সম্রাট যেরূপ বিপুল আয়োজন করিলেন, এক জন বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলেও সেরূপ বিপুল আয়োজনের আবশ্যক হয় না। প্রধানতম সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া দিল্লীশ্বর সগর্ব্বে বলিলেন, "আমার এই বিশাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যেখানে যত সৈন্য আছে, অবিলম্বে সকলকে একত্র কর। অচিরেই এমন একটি প্রচণ্ড দল সজ্জিত কর যে, দেখিবামাত্র সকলেই অজেয় বলিয়া নিশ্চয় করিবে।"

আদেশ প্রতিপালিত হইল। সেনাপতি ঘোষণা প্রচার করিবামাত্র সাম্রাজ্যের সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনানীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত বিজয়কেতনের নিম্নে একত্র হইল। রাজকুমার আক্বর তৎকালে বঙ্গরাজ্যে এবং কুমার আজিম কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই প্রচণ্ড মোগলবাহিনীর পৃষ্ঠপূরণ ও বলবৃদ্ধি করিবার জন্য সম্রাটের আজ্ঞায় তাঁহারাও দিল্লীতে আগমন করিলেন। মোগলসম্রাটের উত্তরাধিকারী সুলতান্ মোজাম্ তৎকালে মহারাষ্ট্রসিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, অচিরে তিনিও দিল্লীতে আনীত হইলেন। এইরূপে যুদ্ধসজ্জা সম্যক্ সুসজ্জিত হইলে সম্রাট্ আরঙ্গজেব সেই বিশাল মোগলবাহিনী লইয়া সদর্পে মিবার

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গের ন্যায় যবনসৈন্য সিংহনাদ করিতে করিতে মিবাররাজ্যে প্রবেশ করিল। দূর হইতে রাণা রাজসিংহ সেই ভীষণ রব শ্রবণ করিলেন। তাঁহার বীরহৃদয় বীরতেজে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি যবনসেনার রণকণ্ডূয়ন দূর করিবার জন্য সেনাগণকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অচিরেই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। রাণা সেনাদলের স্বল্পতা দেখিয়া গিহ্লোট-বীরগণের চিরন্তনী প্রথার অনুসরণপূর্ব্বক সদলে পর্ব্বতপ্রাকারের মধ্যভাগে উপযুক্ত স্থানে শিশোদীয়বীরগণকে রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেই সঙ্গে মিবারের প্রজাগণ নিম্নপ্রদেশস্থিত জনস্থান-ভূভাগগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্ভেদ্য আরাবল্লী পর্ব্বতমালার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে মিবারের অধস্তন ভূমিসমূহ একপ্রকার জনশূন্য হইয়া পড়িল। দুরাচার মোগলসম্রাট্ সেই বিজন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, সহজেই সে প্রদেশ তাঁহার করায়ত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে অত্যল্পকালমধ্যেই সম্রাট্ চিতোর, মণ্ডলগড়, মুন্দিসর, জীরণ ও অপরাপর অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিলেন। সমস্ত অধিকৃত দুর্গগুলিতেই যবনসেনা রক্ষিত হইল। অতঃপর সম্রাট্ রাণা রাজ-সিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রচণ্ড যবনবাহিনী লইয়া আরাবল্লীর দুর্গম কূটবর্ত্মে প্রবেশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই প্রচণ্ড মহাসমরে যবনসেনার বৃংহণে মিবারভূমি বিকম্পিত হইতে লাগিল; হিন্দুগণের হৃদয় ভয়ে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যবনের অত্যাচারে—যবনের উৎপীড়নে—যবনের দুর্ব্ব্যবহারে বিত্রস্ত, উৎপীড়িত ও ভীত হইয়া সকলে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাণা রাজসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, এই মহাসংগ্রামে যে কেবল শিশোদীয়বংশের সনাতন ধর্ম্ম, রাজ্য ও মানসম্ভ্রম বিপন্ন, তাহা নহে, সমগ্র রাজপুতজাতির সনাতন ধর্ম্ম ও চিরন্তন সংস্কার পর্য্যন্ত ইহাতে ব্যাহত হইবার উপক্রম হইল। দুর্ব্বৃত্ত যবনের কবল হইতে হিন্দুজাতির পবিত্র ধর্ম্মরক্ষার জন্য তদীয় পিতৃপুরুষেরা ইতিপূর্ব্বে আপন আপন হৃদয়শোণিত-প্রদানে কুণ্ঠিত হন নাই। আজি কেবল সেই বিশুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম নহে, রাজপুত-রমণীকুলের স্বর্গীয় পবিত্র সতীত্বরত্নও কুলপাংশুল যবনের হস্তে কলঙ্কিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই ভীষণ সঙ্কট সমুপস্থিত দেখিয়া কি চির-গৌরবান্বিত রাজপুতবীরেরা হীনবীর্য্যের ন্যায়—কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন? যাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারের ও ন্যায্য আচরণের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইলে তাঁহাদিগের অন্তরে বজ্রাগ্নি সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, যবনের পাপস্পর্শ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য যাঁহাদিগকে তাঁহারা স্বহস্তে বিনাশ করেন অথবা জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিতেও কষ্ট বোধ করেন না, শরীরে প্রাণ বিদ্যমান থাকিতে কোন্ রাজপুতকুলাঙ্গার সেই রাজপুতসতীগণের সতীত্বনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়? কাজেই বীরকেশরী রাণা রাজসিংহ আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না, যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সমস্ত রাজপুতবীর সমবেত হইলেন। রাণা রাজসিংহের পতাকামূলে সকলেই একত্র। দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেবের প্রচণ্ড আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মিবারের পশ্চিমপার্শ্বে বনমধ্যে পলিন্দ ও পলিপৎগণ অবস্থিতি করে। তাহারাই ঐ স্থানের আদিম অধিবাসী। হিন্দুরাজগণের মানসম্ভ্রমরক্ষার জন্য, হিন্দুরাজমহিলাগণের সতীত্বরক্ষার জন্য তাহারাও বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। অচিরেই তাহারা করে সশর শরাসন ধারণপূর্ব্বক রাণা রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইল। বহু-দিনের পর আজি আবার বীরকেশরী বাপ্পার প্রচণ্ড ছেজি গিহ্লোটরাজ্যের মস্তকোপরি বিরাজিত

হইল। সেই ছেঙ্গির প্রদীপ্ত জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া সমবেত বীরগণের হৃদয় উৎসাহে, বিক্রমে ও মহাতেজে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। সকলেই ভীমনাদে জয়ধ্বনি করিয়া পর্ব্বতপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুবীরগণের সেই সিংহনাদ যেমন মোগলসৈন্যের শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারাও অমনি সদম্ভে "আল্লা হো আক্‌বর" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। হিন্দু মুসলমান উভয়পক্ষীয় সৈন্যেরাই ক্রমে ক্রমে পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

রাণা রাজসিংহ সমগ্র সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিন জন উপযুক্ত সেনানীর হস্তে তিন দল সমর্পিত হইল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার জয়সিংহ এক দল সৈন্য লইয়া আরাবল্লীর সানুপ্রদেশে অবস্থিত রহিলেন। তিনি এরূপ সুকৌশলে শৃঙ্গোপরি সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিলেন যে, উভয়দিক্ হইতে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারা যায়। গুর্জ্জর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশস্থ ভীলগণের সহিত সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিবার অভিপ্রায়ে রাজকুমার ভীমসিংহ পর্ব্বতমালার পশ্চিমদিক্ সংরক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। রাণা রাজসিংহ স্বয়ং প্রধান সেনাদল সমভিব্যাহারে নাইননামক পর্ব্বতবর্ত্মের মধ্যে অবস্থিত রহিলেন। রাণা স্বয়ং যে স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, সে স্থানে শত্রুগণের আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। উহা দুর্ভেদ্য সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম। পার্ব্বত্য সঙ্কটময় পথে হিন্দুসৈন্যগণ এরূপ সুকৌশলে সজ্জিত হইল যে, বিপক্ষসেনা আগমনমাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে। শক্তাবৎ-অধিনায়ক গরীবদাস এই কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তিন ভাগে সুকৌশলে বিভক্ত হইয়া হিন্দুসৈন্যগণ সমরপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। সেই নাইনগিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিলে সম্রাট্‌কে সদলে নিঃসন্দেহে প্রাণ হারাইতে হইত, কিন্তু সৌভাগ্যবশে তিনি সে পথে প্রবেশ করিলেন না। দোবারি নামক ভীলজনপদে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র আক্‌বরকে তিনি উদয়পুরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। চতুরচূড়ামণি টাইবর খাঁর পরামর্শে এই উপায় অবলম্বিত হইল। যে প্রদেশে সম্রাটের সেনাশিবির সন্নিবেশিত হইল, ঐ স্থান অণ্ডাকারভাবে সংস্থিত। উদয়পুরকে ঐ প্রদেশের মধ্যবিন্দু কল্পনা করিয়া উচ্চতম স্থান হইতে সমন্তাৎ দৃষ্টিপাত করিলে ঠিক অণ্ডাকৃতি বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই প্রদেশ উত্তর-দক্ষিণভাগে সুপ্রশস্ত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে সঙ্কীর্ণ। দীর্ঘভাগ প্রায় সাত এবং সঙ্কীর্ণভাগ প্রায় ছয় ক্রোশ। গগনভেদী সুবিস্তৃত আরাবল্লী পর্ব্বতমালার বিরাট্ গাত্র হইতে কতকগুলি শাখাপর্ব্বত বহির্গত হইয়া ঐ অণ্ডাকার পর্ব্বতপ্রদেশের প্রশস্ত দেহ পরিপুষ্ট করিয়াছে। এই গিরিপ্রদেশের মধ্যভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহারই একপ্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ স্বচ্ছসলিল পেশোলাহ্রদ বিরাজমান। এই নিবিড় পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ইহার পূর্ব্বভাগস্থ বিস্তৃত জনস্থানে প্রবেশ করিতে হইলে তিনটি পর্ব্বতবর্ত্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমটি অধিকতর উত্তরে অবস্থিত; উহা দৈলবারার পার্শ্বদেশ দিয়া বিলম্বিত। প্রথম ও তৃতীয়ের মধ্যভাগে দ্বিতীয় বর্ত্ম; উহা দোবারির পার্শ্ববর্ত্তী। তৃতীয়টি দুরারোহ চপ্পনের দিকে বিস্তীর্ণ,—নাম নাইন। রাজসিংহ এই স্থানেই শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। এই তিনটি গিরিবর্ত্মের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সুগম, সম্রাট্ আরঙ্গজেব সেই পথেই অগ্রসর হইলেন। ঐ পর্ব্বতবর্ত্মের প্রবেশদ্বারের পথে উদয়সাগরের অনতিদূরেই তাঁহার স্কন্ধাবার স্থাপিত হইল।

এ দিকে পিতার আদেশে পঞ্চাশৎসহস্র সৈন্য লইয়া আক্‌বর উদয়পুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অচিরেই তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে অথবা তাঁহার আক্রমণের প্রত্যাক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল না, একটিমাত্র প্রাণীও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল

না। রাজপ্রাসাদ, অন্যান্য অট্টালিকা, উপবন, সরোবর, যাহা যাহা তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল, যেখানে যেখানে তিনি উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তৎসমস্তই জীবশূন্য মিবারের প্রজাবৃন্দ যে সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতবাস আশ্রয় করিয়াছে, রাজকুমার আক্‌বর তাহা অবগত ছিলেন; সুতরাং জনশূন্য নগরী দর্শনে তাঁহার কিছুমাত্র বিস্ময়বোধ হইল না। বিনাবিগ্রহে সহজেই নগরী অধিকৃত হইল, এই বিবেচনা করিয়া কুমার আক্‌বর নিশ্চিন্তমনে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার আক্‌বর যে মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার সৈন্যসামন্তগণও প্রফুল্লচিত্তে আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইল। কেহ কেহ দাবাখেলায় নিমগ্ন হইয়া করতলে কপোলবিন্যাসপূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কেহ কেহ নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া অপরাপর বন্ধুর সহিত আনন্দভোজে আনন্দিত, অনিত্য জগতের অনিত্যতা হৃদয়ে উদিত হওয়াতে সংসারের মায়ামমতায় ঘৃণা করিয়া কেহ কেহ বা মুদিতনেত্রে পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনায় অভিনিবিষ্ট। ইত্যবসরে রাণার বীরপুত্র মহাবুদ্ধি জয়সিংহ অলক্ষিতে সসৈন্য আক্‌বরকে আক্রমণ করিলেন। তখন যবনগণের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। জয়সিংহের বীরবিক্রমের সম্মুখে পতিত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য ম্লেচ্ছসৈন্য বিতাড়িত, বিদলিত ও মথিত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই যবনের অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু বহির্গমনের পথ না পাইয়া আর্য্যবীরগণের তরবারিমুখে প্রাণত্যাগ করিল। রাজপুতগণ মুহুর্ম্মুহুঃ বীরনাদে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পিতার আনুকূল্যলাভের আশায় কুমার আক্‌বর দোবারির দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হইল না। রাণা রাজসিংহ স্বয়ং কতকগুলি সৈন্যকে সেই পর্ব্বতবর্ত্মের অভ্যন্তরে প্রেরণ করিলেন, রাজকুমার আক্‌বর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আত্মরক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া তখন তিনি গোগুণ্ডার মধ্য দিয়া মারবারের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বহির্গমনের উদ্‌যোগ করিলেন।

বিপৎপাতের সময় যাহাদিগের বুদ্ধিবিলোপ হয়, যাহারা বিপদের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা হয়, উত্তরোত্তর তাহারা আরও অধিকতর বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া থাকে। রাজকুমার আক্‌বরেরও সেই দশা ঘটিল। তিনি কুসুমলতিকাজ্ঞানে কণ্টকবল্লরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন; কাজেই তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ কণ্টকজালে বিজড়িত হইতে হইল; চন্দনতরুর আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া তিনি বিষবৃক্ষমূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে পথ অবলম্বনে তিনি শত্রুকটক হইতে বহির্গত হইতে উদ্যম করিলেন, সে পথ আরও মহা সঙ্কটে সমাকীর্ণ। যেমন তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি দেখিলেন, প্রচণ্ডবিক্রম ভীলসৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া পার্ব্বত্য ভূমিয়া সামন্তেরা তাঁহার নির্গম-পথ অবরোধ করিবার জন্য সশস্ত্রে দণ্ডায়মান। সঙ্কীর্ণ উপত্যকার উপরিভাগে দারুপ্রাচীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক অধিত্যকাভূমে আরোহণ করিয়া কতকগুলি মহাবল পার্ব্বত্যসৈন্য যবনসেনার উপর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরজাল ও গুরুভার শিলাখণ্ডসকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। আক্‌বর যে পুনরায় পশ্চাদ্দিকে প্রতিগমন করিবেন, সে পন্থাও বিনষ্ট। কুমার জয়সিংহ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতিপূর্ব্বক প্রতিগমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

রাজকুমার আক্‌বর মহাসঙ্কটে বিপন্ন। চারিদিকই শত্রুগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। যে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই ভীতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি নেত্রগোচর হয়। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিপদও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। প্রথমে আহারাভাবে তাঁহার

ও তদীয় হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের প্রাণ কণ্ঠাগত হইল; দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি জয়সিংহের করুণাপ্রার্থী হইলেন। যুদ্ধবিগ্রহের মূলীভূত কারণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি কুমার জয়সিংহের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। হিন্দুবীরের পবিত্র হৃদয় চিরদিনই করুণার সাগর; বিশেষতঃ বিপন্ন ও আশ্রিত ব্যক্তি আততায়ী হইলেও তাহাকে রক্ষা করা হিন্দুবীরেরা সনাতন পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। আক্‌বরের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা শুনিয়া কুমার জয়সিংহের পবিত্র হৃদয় দ্রবীভূত হইল তৎক্ষণাৎ তিনি আক্‌বরকে সেই সঙ্কট হইতে মুক্তিদান করিলেন। কতিপয় রাজপুতবীর তাঁহাকে ও তাঁহার হতাবশিষ্ট সেনাগণকে জিলবারার গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া দিল। সম্রাট্-তনয় তখন নির্ব্বিঘ্নে কূটবর্ত্ম হইতে বহির্গত হইয়া চিতোরের প্রাকারতলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

এ দিকে আর এক দল যবনসৈন্য লইয়া মোগলকেশরী দেলহির খাঁ মারবার হইতে দৈশূরী গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া সেই দুর্ভেদ্য প্রদেশে আগমন করিতেছিলেন। অনেকের অনুমান, আক্‌বরের বিপদুদ্ধার করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গিরিপ্রদেশে প্রবেশকালে কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হয় নাই; কিন্তু যেমন তিনি সুদীর্ঘ পর্ব্বতসঙ্কটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি রূপনগরের অধিপতি বিক্রম শোলান্‌কি এবং গদবারের অন্তর্গত গানোরনগরাধিপতি গোপীনাথ রাঠোর মহাবিক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বেই হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী হিন্দুবীরগণের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। হতভাগ্য দেলহির খাঁ সদলে রণক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। এই দুইটি যুদ্ধেই অসংখ্য যবনসেনা ক্ষয় হইল, জেতৃগণ তাহাদিগের বহুপরিমিত দ্রব্যসামগ্রীও লুণ্ঠন করিলেন।

আশার মোহকরী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বলগর্ব্বিত সম্রাট্ আরঙ্গজেব যুদ্ধের ফলাফল অবগত হইবার জন্য দোবারিগ্রামে অবস্থিত ছিলেন। কুমার আক্‌বর মহাবীর, নির্ব্বিঘ্নে তিনি উদয়পুর অধিকার করিবেন; বীরকেশরী দেলহির খাঁর বীরত্বও অতুলনীয়, অচিরেই তাঁহারা বিজয়পতাকা সমুড্ডীন করিয়া সহাস্যবদনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, এইরূপ আশার লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে সম্রাট্ সুখস্বপ্ন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; অচিরেই তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বীরচূড়ামণি রাজপুতকুলতিলক রাজসিংহ অলক্ষিতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অচিরেই উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজসিংহের উত্তেজনায় সমুত্তেজিত হইয়া রাজপুত বীরগণ যবনসম্রাটের বিশাল ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাঠোরবীর দুর্গাদাসের জলন্ত বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া ভীমপরাক্রমশালী রাঠোরবীরগণ সম্রাট্ আরঙ্গজেবের প্রতিকূলে প্রধাবিত হইলেন। যে কুলাঙ্গার পিশাচের ন্যায় ঘৃণিত পথের অনুসরণপূর্ব্বক পরমহিতৈষী ধর্ম্মনিষ্ঠ রাঠোররাজকে বিষপ্রয়োগে সংহার করিয়াছে, যে নররাক্ষস রাঠোরবংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যে পাষণ্ডের অসদ্ব্যবহারে রাঠোরবাসিগণের হৃদয়ে শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজি তাহার—সেই যবনকুলাঙ্গার আরঙ্গজেবের হৃদয়শোণিতে সেই জলন্ত শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার অভিপ্রায়ে রাঠোরবীরেরা বীরকেশরী দুর্গাদাসের সহিত মোগলসেনার ব্যূহ অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

আজি সম্রাট্ আরঙ্গজেব মহাসঙ্কটে বিপন্ন। এত দিন যাহাদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিয়া, নৃশংস ব্যবহার করিয়া পদে পদে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় দেখাইয়াছেন, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া যাহাদিগকে কঠোর লৌহদণ্ডাঘাতে মথিত করিয়াছেন, যাঁহাদের সর্ব্বনাশের অভিপ্রায়ে আজি এই প্রচণ্ড সমরাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছেন, আজি সেই হিন্দুগণ—সেই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যবীরগণ

কি সেই সকল দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল না দিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন?---কখনই না। সম্রাটের সেনাদল রাজপুতসেনা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সত্য, অনন্ত যবনসেনাগণের সহিত তুলনায় হিন্দুসৈন্য মুষ্টিমেয় সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, যতক্ষণ একটিমাত্র রাজপুতবীর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ কেহই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না।

যুদ্ধ ক্রমশই ভীষণ অপেক্ষাও ভীষণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। যবনের পক্ষে রণবিশারদ গোলন্দাজগণ আগ্নেয়াস্ত্র (কামান) চালন করিতে লাগিল। সেই সমস্ত অস্ত্রের বিশাল বদন বিবর হইতে ভীমরবে প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি সহ রাশি রাশি জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জ উদ্গীবিত হইতে লাগিল। সেই হৃদয়স্তম্ভন ভীমনাদের সহিত আপনাদিগের বীরনাদ মিশাইয়া রাজপুতবীরেরাও ক্রমে ক্রমে মোগলবাহিনীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধূমপুঞ্জে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। আগ্নেয়াস্ত্র-নিক্ষিপ্ত গোলকের মুখে নিপতিত হইয়া শত শত আর্য্যবীর রণভূমে শয়ন করিতে লাগিলেন; তথাপি আর্য্য বীরগণের হৃদয় নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইল না। তাঁহারা ধূমরাশি ভেদ করিয়া বীরবিক্রমে ক্রমে ক্রমে মোগলব্যূহের নিকটবর্ত্তী হইলেন, সুতীক্ষ্ণ অসির ভীষণ আঘাতে ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ-গণকে রণশায়ী করিয়া ফেলিলেন, কামানের লৌহশৃঙ্খল সকল ছেদন করিয়া দিলেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের গতিপথ পরিষ্কার হইল। অবিলম্বে তাঁহারা বীরবিক্রমে যবনসৈন্যের উপর আপতিত হই-বামাত্র যবনব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন বীরপুঙ্গব রাজপুতগণ ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যবনসৈন্যগণকে বিদলিত, বিতাড়িত ও মথিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের শাণিত তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে মোগলসৈন্যের অধিকাংশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। দুরাচার সম্রাটের হৃদয় তখন বিস্ময়ে, ভয়ে ও ত্রাসে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তিনি ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যের সহিত তিনি রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। যবন-সৈন্যের অসংখ্য অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, ধ্বজপতাকা, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী জেতৃদলের হস্তগত হইল। অনেকগুলি কামানও তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৩৭ সংবতের ফাল্গুন মাসে (১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে) এই লোমহর্ষণ মহাসংগ্রাম সংঘটিত হয়। বীরকেশরী রাণা রাজসিংহ এই মহাসংগ্রামে জয়লাভ করিলেন বটে, বিজয়-বৈজয়ন্তী তাঁহার মস্তকোপরি সমুত্থাপিত হইল বটে, কিন্তু মিবারের ও অন্যান্য রাজ্যের কতিপয় বীরের পতনে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল।

পরাজিত, অবমানিত ও মনোদুঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও সম্রাট্ নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হইলেন না। শত্রুকুলকে প্রতিফল দিবার জন্য তিনি সমুত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সসৈন্যে চিতোর-প্রাকারতলে শিবিরস্থাপনপূর্ব্বক তিনি সুলতান মৌজামকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। মৌজাম তখন মহারাষ্ট্রবীর মহাযোদ্ধা শিবাজীর সহিত যুদ্ধে পরিলিপ্ত ছিলেন। শিবাজীর সহিত যুদ্ধ পরি-ত্যাগ করিয়াও উত্তর প্রদেশের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করা অগ্রে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সম্রাট্ আপন পুত্র মৌজামকে অবিলম্বে আসিতে আদেশ পাঠাইলেন। সম্রাটের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। বীরকেশরী জয়মল্লের বংশধর সুবলদাস কতকগুলি রাজপুতসৈন্য সমভিব্যাহারে চিতোর ও অজমীরের মধ্যভাগে থাকিয়া, উক্ত নগরীদ্বয়ের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক সম্যক্ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বেই মোগল-সেনা আক্রমণপূর্ব্বক বীরবিক্রমে তাহাদিগকে বিদলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বীরত্ব ও সাহস দর্শনে সম্রাটের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার হইল। পরিশেষে আপনার স্বাধীনতা ও জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন দেখিয়া মহাসমর পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি অজমীরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। গমনকালে আজিম ও আক্‌বরের হস্তে এই যুদ্ধভার ন্যস্ত হইল। যে পর্য্যন্ত

অন্ত মোগলসৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগদান না করে, তাবৎ যে প্রণালীতে যুদ্ধ করিতে হইবে, সম্রাট্ পুত্রদ্বয়কে সে উপদেশও প্রদান করিলেন।

যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা সুসিদ্ধ হইল না, সম্রাট্ দারুণ মনোবেদনায় নিপীড়িত হইলেন। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতেছেন, পুনঃ পুনঃ অবমানিত হইতেছেন, পুনঃ পুনঃ লজ্জিত হইতেছেন, তথাপি তিনি নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইতেছেন না; কিছুতেই তাঁহার রণপিপাসা বা জিঘাংসার শান্তি হইতেছে না। তিনি অজমীরে উপস্থিত হইয়া দ্বাদশ সহস্র নূতন সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক পুত্রদ্বয়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। রাঠোরবীর সুবলদাসকে প্রতিফল দিবার জন্য রোহিলা খাঁ নামক সেনাপতিও সেই সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কস্বরূপে প্রেরিত হইলেন। সুদক্ষ সুবলদাস এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র মারবারসৈন্য লইয়া পুরমণ্ডলনামক স্থানে অগ্রসর হইলেন। অচিরেই রোহিলা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুবলদাস বীরবিক্রমে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিয়া দলিত করিতে আরম্ভ করিলে মোগলসৈন্যেরা পলায়নপূর্ব্বক অজমীরে প্রতিগমন করিলেন।

বীরকেশরী রাণা রাজসিংহ, তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য অনুবল বীরপুরুষেরা সমরে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজকুমার ভীমসিংহ সমর-পিপাসা নিবারণ করিতে না পারিয়া সসৈন্যে গুর্জ্জররাজ্য আক্রমণ করিলেন। 'অচিরেই ইদরভূমি তাঁহার অধিকৃত হইল। যবনরাজ হুসেন তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। বীরবর ভীমসিংহ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া বীরনগরের অভ্যন্তর দিয়া পত্তননগরে গমন করিলেন। পত্তন তখন তৎপ্রদেশের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার কর্তৃক সে নগরও লুণ্ঠিত হইল। এই প্রকারে সিদপুর, মোরোসা ও অন্যান্য কয়েকটি নগরও অধিকার করিয়া কুমার ভীমসিংহ মহাবীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার অমানুষিক সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া ঐ সমস্ত নগরের অধিবাসিগণ ভয়ে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। তৎপ্রদেশের প্রজাবৃন্দের এইরূপ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া রাণা রাজসিংহের হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি সেই মুহূর্ত্তে পুত্র ভীমসেনকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিলেন।

বিজিত শত্রুর প্রতি দয়া-প্রদর্শন রাজপুতজাতির সনাতন ধর্ম্ম। পরাজিত শত্রু ক্ষমার যোগ্য, ইহাই সেই বীরহৃদয়গণের একটি বীরমন্ত্র। আজি সেই ধর্ম্ম ও সেই বীরমন্ত্রের অন্যথাচরণ করিয়া বীরজাতিকে পুনরায় মোগল-সম্রাটের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইল। যে রাজপুতরাজের উদারহৃদয়ের করুণাগুণে নিষ্ঠুর আরঙ্গজেব সপুত্র জীবনসঙ্কট বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, সে মহোপকার বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় আবার সেই মহাপুরুষের প্রতিই তিনি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; সুতরাং প্রতিহিংসা না লইয়া কিরূপে রাজপুতগণ নিশ্চিন্তভাবে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন?

দয়ালসা নামে রাণার এক বিচক্ষণ দেওয়ান ছিলেন। কার্য্যদক্ষতায় ও সাহসিকতায় তিনি রাণা রাজসিংহকে বশীভূত করিয়াছিলেন। মোগলসম্রাটের প্রতি দয়ালসার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। কিরূপে দুরাচারের দুরাচরণের প্রতিশোধ দিবেন, বহুদিন হইতে তাঁহার হৃদয় সেই চিন্তায় অধীর রহিয়াছে। এখন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া রাণার আদেশে তিনি এক দল তীব্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মোগলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি নর্ম্মদা ও বেতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত মালব রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহার বাহুবলের সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। ক্রমে ক্রমে

সারঙ্গপুর, দেবাস, সারঙ্গ, মান্দু, উজীন ও চান্দেরীপ্রদেশও অধিকৃত হইল। ঐ সমস্ত নগরে যে সকল যবনসৈন্য ছিল, দয়ালসার বাহুবলে প্রায় সকলেই রণভূমে শয়ন করিল। দয়ালসার ভয়ে তত্তৎনগরবাসিগণ এত দূর ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, পুত্রকলত্রাদির স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়াও অনেকে আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। অনেকে গৃহস্থিত দ্রব্যাদি অগ্নিদগ্ধ করিয়া শূন্যহস্তে নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজপুতজাতি কখনও কাহারও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেবের কঠোরতম অত্যাচারে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া তাঁহারা আজি সেই নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক যবনের ধর্ম্মের প্রতিও হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। নেত্রসম্মুখে কাজী নিপতিত হইবামাত্র আর্য্যবীরগণ তাহাদিগের হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাহাদিগের শ্মশ্রুরাজি মুণ্ডন করিয়া দিলেন এবং কোরাণসমূহ লইয়া সরোবরে, কূপে বা অন্যান্য জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হওয়াতে দয়ালসার হৃদয় এত দূর নিষ্ঠুরভাব ধারণ করিল যে, একটিমাত্র যবনকেও তিনি ক্ষমা করিলেন না। তাঁহার রোষাগ্নিতে যবনাধিকৃত মালবরাজ্য একেবারে ভস্মীভূত হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইল। সেই সমস্ত রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া যে সমস্ত অর্থ সংগৃহীত হইল, প্রভুভক্ত দয়ালসা তৎসমস্ত মিবাররাজকে সমর্পণ করিলেন; তাঁহার প্রভুর কোষাগার অচিরেই অসংখ্য ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া মহাতেজা বীরকেশরী দয়ালসা রাজকুমার জয়সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। কিছুতেই তাঁহার রণপিপাসার নিবৃত্তি বা প্রতিহিংসার শান্তি হইল না। অবিলম্বে তিনি জয়সিংহকে সমভিব্যাহারে লইয়া সম্রাটের পুত্র আজিমের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মাক্ষম ও গঙ্গা শক্তাবৎ, শালুম্ব্রারাজতনয় চন্দাবৎ, সদ্রিপতি ঝালা চন্দসেন, বৈদলার চৌহান স্থবলসিংহ, বিজোল্লীর পুয়ার বেরিশাল এবং খীচিবীরগণ রণাভিনয়-প্রদর্শনের জন্য প্রফুল্লচিত্তে উপস্থিত হইয়া দয়ালসার সহিত মিলিত হইলেন। অবিলম্বেই চিতোরের অনতিদূরে হিন্দুমুসলমানে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল। রাজপুতগণের বাহুবলে যবনসৈন্যগণ নিষ্পেষিত ও বিতাড়িত হইতে লাগিল; অনেকে পদতলে দলিত ও মথিত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিল; কেহ কেহ শাণিত তরবারির সম্মুখে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সম্রাট্-পুত্র আজিম নিরুপায় হইয়া রিন্থম্বর নগরে পলায়ন করিলেন। রাজপুতগণও তাঁহাকে ক্ষমা না করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে অসংখ্য যবনসৈন্যের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন।

যবনাধিকৃত অনেকগুলি নগর উৎসাদিত হইল, অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিল। রাজকুমার আজিম পরাজিত, অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন, তথাপি রাণা রাজসিংহের প্রতিহিংসার শান্তি হইল না। তাঁহার উত্তেজিত হৃদয় কিছুতেই প্রশান্ত-ভাব ধারণ করিল না, মোগলবংশ সমূলে উন্মূলন করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সঙ্কল্পও অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইল। কিছু দিনের জন্য তিনি বিরামদায়িনী শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে শান্তিসুখ উপভোগ করিতে হইল না, অপ্রাপ্তব্যবহার অজিতসিংহের স্বার্থরক্ষার জন্য অচিরেই যবনবিরুদ্ধে পুনরায় তাঁহাকে অসিধারণ করিতে হইল; আবার তাঁহাকে মহাসংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইল।

নরপিশাচ আরঙ্গজেবের আদেশে গুপ্তচর যে দিন ধার্ম্মিকপ্রবর যশোবন্তসিংহের প্রাণহরণ করিল, পিতৃশোকাকুল বালক অজিতসিংহকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে যে দিন দুরাচার সম্রাট্ নানা কৌশল বিস্তার করিল, অজিতের জননী সেই দিন মারবাররাজ্যের শাসনভার আপনার হস্তে

গ্রহণ করিলেন। যেরূপ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত তিনি রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া কেহই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। কতবার কত বিপদে তিনি নিপতিত হইয়াছিলেন, কতবার কত বিঘ্নবাধা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিছুতেই তিনি ভীত বা বিচলিত হন নাই; স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতাবলে সমস্ত বিপদ্—সমস্ত বাধা—সমস্ত বিঘ্নকে পদদলিত করিয়া পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভাগুণে যবনকবল হইতে বিষয়বিভব সুরক্ষিত হইয়াছে। বীরকেশরী বাপ্পার পবিত্র বংশে তাঁহার জন্ম, তিনি বীর-পত্নী, স্বয়ং বীরাঙ্গনা। তাঁহার ন্যায় গুণবতী রমণী তৎকালে রাজবারার মধ্যে দৃষ্ট হইত না স্বীয় সদ্‌গুণের সাহায্যে তিনি এ যাবৎ পুত্রের স্বার্থরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এবার মহাসঙ্কটে পড়িলেন। দুরাচার আরঙ্গজেব যেরূপ কঠোর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাহার প্রতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। ইত্যবসরে রাণা রাজসিংহ মারবার ও মিবারের সৈন্যসহায়ে গদবাররাজ্যের প্রধান নগর গানোরে সম্রাটের প্রতিকূলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজপুত্র ভীমসিংহ সেনাপতিপদে ব্রতী হইয়া বীরবিক্রমে আক্‌বর ও টাইবর খাঁর সম্মুখীন হইলেন। হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজপুতসৈন্যগণের বীরবহ্নি সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে বহুসংখ্য যবনসেনা পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া পড়িল। কিংবদন্তী আছে, একজন সুচতুর রাজপুত-সেনাপতি মোগলদিগের পাঁচ শত উষ্ট্র হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই সমস্ত উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে এক একটি জ্বলন্ত মশাল স্থাপনপূর্ব্বক তিনি আরঙ্গজেবের সৈন্যব্যূহমধ্যে চালনা করিয়া দিলেন। ঘোর তামসী রজনীর ঘোরান্ধকারে সেই সমস্ত মশাল জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মোগলসেনাগণের হৃদয় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। সেনাকটক ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহারা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে রাজপুতবীরগণ বীরবিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অচিরেই মোগলসৈন্য পরাজিত হইল।

বিপুল সহায়, অতুলনীয় বল ও প্রচুর অর্থসম্বল থাকিতেও সম্রাট্ আরঙ্গজেব পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও অপমানিত হইতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। সমস্ত রাজপুত-নরপতি ও সামন্তগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন, পাপিষ্ঠ আরঙ্গজেবকে পদচ্যুত করিয়া তৎপুত্র আক্‌বরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা যাউক। অচিরেই এই গুপ্তসংবাদ আক্‌বরের নিকট প্রেরিত হইল। ধর্ম্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা শাজিহানকে পদচ্যুত করিয়া দুরাচার আরঙ্গজেব জগতের সমক্ষে যে জঘন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপুত্র আক্‌বর যে সেই ঘৃণিত উদাহরণের অনুসরণ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। রাজ্যলিপ্সা আক্‌বরের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপুত-গণের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলেন। অধিকন্তু যাহাতে এই শুভকার্য্য অতি সত্বর সুসম্পন্ন হয়, রাজপুতগণকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

অবিলম্বে রাজপুতবীরগণ আক্‌বরের সহিত মিলিত হইলেন। দৈবজ্ঞ উপস্থিত হইলেন; গণনা দ্বারা অভিষেকের শুভদিন ধার্য্য হইল। ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত; কিন্তু স্বীয় অসাবধানতাদোষে সম্রাট্-কুমার অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিলেন না। তাঁহার এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত আয়োজন সকলই বিফল হইল। কপটী, বিশ্বাসঘাতক দৈবজ্ঞ তাঁহার সুখের পথে কণ্টক রোপণ করিল। অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, সিংহাসনারোহণের উপক্রম হইতেছে, এমন সময় সেই নরাধম দৈবজ্ঞ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার কর্ণ-গোচর করিল। আরঙ্গজেব ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরবে অধোবদনে অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু

নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হইলেন না। একবার সেই সময় তিনি আপনার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেন। শরীররক্ষকগণ ব্যতীত নিকটে আর সহায় নাই; মৌজাম ও আজিম বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছেন; এ দিকে আক্‌বর আগতপ্রায়, অজমীর হইতে পিতাপুত্রে একদিনের ব্যবধান দূরে অবস্থিত। এ সঙ্কটে পুত্রের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে কে? প্রকাশ্য যুদ্ধে আক্‌বরকে পরাজিত করিবে, এরূপ কোন মোগলবীর তাঁহার নিকট উপস্থিত নাই। একদিনের অধিক সময় নাই; এ সঙ্কটে উপায় কি?

বহুক্ষণ চিন্তার পর সম্রাট্ আরঙ্গজেব একটি সুচারু কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। নরহত্যা হইবে না, নরশোণিতে বসুমতী রঞ্জিত হইবে না, অথচ তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারিবেন। আক্‌বরের নামে একখানি পত্র লিখিয়া তিনি বিশ্বস্ত গুপ্তচরের হস্তে দিয়া রাজপুতনায়ক দুর্গাদাসের পটগৃহে গোপনে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আক্‌বরের প্রতি রাজপুতবীর দুর্গাদাসের সন্দেহ উৎপাদন করাই সম্রাটের প্রধান উদ্দেশ্য। গুপ্তচর তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালনার্থ পত্রখানি লইয়া প্রস্থান করিল। পত্রখানিতে লিখিত ছিল, "বৎস! তোমার সুকৌশলের বিষয় অবগত হইয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম, কিন্তু সতর্ক করিয়া দিতেছি. আমাদিগের এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র যেন রাজপুতেরা কোনরূপে বুঝিতে না পারে। যখন তাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ বাধিবে, তুমি সেই সময় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বীরবিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিও।" কূটবুদ্ধি আরঙ্গজেব কূটনীতি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

লুনার নদীর তীরে দ্রুনার নামে একটি প্রদেশ আছে। দুর্গাদাস তথায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। আরঙ্গজেবের কবল হইতে তিনিই কুমার অজিতসিংহকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। স্বদেশের চির-স্বাধীনতা যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, এই অভিপ্রায়ে সেই মহাবীর অনেকবার মোগলের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া মহাবীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। গুপ্তচর সম্রাটের আদেশে তদীয় পটগৃহমধ্যে পত্রিকাখানি নিক্ষেপ করিল। ছলনাময়ী পত্রিকাখানি দুর্গাদাসের হস্তে পড়িল। পত্রখানি উন্মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিবামাত্র তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সুচতুর আরঙ্গজেবের ছলনা তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন না। পত্রখানি যথার্থ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। সেই চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা যবনজাতির কুলব্রত, দুর্গাদাস ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, সেই বিশ্বাসেই কুমার আক্‌বরের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস ও বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল, আক্‌বরের মঙ্গলসাধনে আর প্রবৃত্তি রহিল না, যবনের নামে শত শত অভিশাপ দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দলবল সহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে আক্‌বর বিস্মিত। অকস্মাৎ রাজপুতগণের এরূপ চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কারণ কি, কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তিনি আপনার দুর্ভাগ্যকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরমহিতৈষী বিশ্বাসী টাইবার খাঁর হৃদয়েও দারুণ আঘাত লাগিল। আক্‌বরকে সম্রাট্-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া সুখী হইবেন আশা ছিল, সে আশার মূলে কে কুঠারাঘাত করিল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; আক্‌বরের অভীষ্টসিদ্ধি হইল না, টাইবার তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। নৈরাশ্য তাঁহার অন্তর অধিকার করিল। অতঃপর তিনি মনোদুঃখ মনোমধ্যে নিহিত রাখিয়া, হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তুলিলেন। অভীষ্টসিদ্ধির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি সম্রাট্‌কে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও ফলবতী হইল না; বরং সেই সূত্রে তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। এই সময় মৌজাম ও আজিম

আসিয়া সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আরঙ্গজেবের ভয়াকুল হৃদয় তখন নির্ভীক ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সুচতুর সম্রাট্ আরঙ্গজেব যে ছলনাময়ী পত্রিকা প্রেরণপূর্ব্বক দুর্গাদাসের হৃদয় বিমোহিত করিয়াছিলেন, রাজপুতগণ ক্রমে ক্রমে তাহা অবগত হইলেন। মোআম ও আজিম সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলে আক্‌বরের হৃদয় ভয়বিত্রাসিত হইয়া পড়িল। তিনি রাজপুতগণের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। সম্রাটের কুচক্র প্রকাশ হইয়াছে, আক্‌বর পিতার সহিত কোনরূপ ষড়্‌যন্ত্রেই সংলিপ্ত ছিলেন না, সুতরাং রাজপুতগণ বিনা আপত্তিতে তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলেন। রাজপুতবীরগণের আশ্রয়ে আক্‌বর নির্ব্বিঘ্নে রহিলেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয় কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না। তিনি যেখানে গমন করেন, বোধ হয় যেন. সেই স্থানেই তদীয় পিতার ক্রোধানল তাঁহাকে দগ্ধ করিবার জন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। পিতার কঠোরচরিত্রের বিষয় তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সেই চরিত্রের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আক্‌বরের হৃদয় দ্বিগুণতর ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি অপেক্ষাকৃত দূরদেশে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠাদর্শনে পরমমিত্র দুর্গাদাসের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পালরগড় নামক স্থানে প্রেরণ করিলেন। মিবার ও ডুরাঙ্গপুরের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক পালবগড়ে উপস্থিত হইতে হয়। আক্‌বর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রনায়ক শম্ভুজীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিন পরেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল; সেখানেও থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। একখানি ইংলণ্ডীয় অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া তিনি পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আক্‌বরের পলায়নবৃত্তান্ত সম্রাট্ আরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। আক্‌বরের সহিত রাজপুতগণ মিলিত হইলেন; এ দিকে চিন্তাজ্বরে সম্রাট্ একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজপুতগণের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্ত সম্রাট্ এক একবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বীয় পদমর্য্যাদার বিষয় চিন্তা করিয়া পরক্ষণেই আবার মানসপট হইতে সে সঙ্কল্প দূর করিয়া দিলেন। মোগল সেনাপতি দেলহির খাঁর অধীনে এক জন সুবিচক্ষণ রাজপুত সৈনিক ছিলেন, তিনিই সম্রাট্‌কে চিন্তাজ্বর হইতে পরিত্রাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেনাদলসহ প্রত্যাগমনকালে তিনি রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যথাযোগ্য শিষ্টাচারের সহিত উভয়ে নানারূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে যুদ্ধের কথা উঠিল। দুঃখ প্রকাশ করিয়া রাণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক রাজপুতসৈনিক কহিলেন, "হিন্দুমুসলমানে যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহাতে শত শত নরশোণিতসেকে পৃথিবী অনুরঞ্জিত হইতেছে, ইহা যায়-পর নাই দুঃখের বিষয়। উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপনই যুক্তিযুক্ত। যদিও সম্রাট্ আরঙ্গজেব স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন না, কিন্তু এ সব কথা উত্থাপন করিলে তিনি অগ্রাহ্য করিবেন না।" রাণা কহিলেন, "ভাল, সন্ধিতে আমাদিগের অমত নাই। আপনি তবে আমার হইয়া সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।"

ভট্টকবিগণ এই রাজপুতসৈনিককে বিকানীরপতি শ্যামসিংহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্যামসিংহ সম্রাটের নিকট প্রত্যাগত হইলেন; রাণার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। চতুর আরঙ্গজেবের অভিসন্ধিসিদ্ধির উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল। এই সুযোগে তিনি আজিকালি করিয়া রাণাকে যুদ্ধব্যাপারে নিরস্ত রাখিলেন, এ দিকে গোপনে গোপনে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে বর্ষা সমাগত, কাজেই রাণা ক্ষান্ত থাকিলেন।

বর্ষা অতীত। সম্রাটের সেনাগণ সুসজ্জিত। যুদ্ধের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত। চতুরচূড়ামণি দিল্লীশ্বর রাণার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সন্ধিপত্র লিখিত হইল সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে মুণ্ডকর-সম্বন্ধে কোন কথাই রহিল না। কেবল এইমাত্র লিখিত থাকিল যে, রাণা চিতোরের অন্তর্গত সমস্ত জনপদ পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। যোধপুরের বিষয়ও তন্মধ্যে উল্লিখিত থাকিল। সন্ধিপত্র লিখিত হইল বটে, কিন্তু রাণা রাজসিংহকে সম্রাটের সহিত সেই সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইল না। সন্ধিবন্ধনের আয়োজন হইতেছে, ইত্যবসরে রাণা রাজসিংহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

পৈতৃক-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবধি রাণা রাজসিংহ মোগলসম্রাটের সহিত অবিরত ভীষণ ভীষণ সমরে ব্যাপৃত ছিলেন। বিপক্ষের শত শত অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যের হ্রাস হইতে লাগিল। একে বহুদিন হইতে যন্ত্রণাময়ী চিন্তায় জর্জ্জরীভূত, তাহার উপর ক্ষতস্থানগুলিতে নিদারুণ যাতনা, শরীর দিন দিন অবসন্ন হইয়া আসিল; অচিরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসিপ্রবর প্রতাপসিংহ যে দিন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, সেই দিন শিশোদীয়গণের লীলানিকেতন মিবারভূমি যে নিবিড় বিষাদতিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অমরসিংহ কর্ণ বা জগৎসিংহ কেহই সে ঘোরান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হন নাই। বীরপুঙ্গব রাজসিংহ স্বীয় অলৌকিকী বুদ্ধিমত্তা ও মহাবিক্রমের গুণে সেই নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া স্বদেশপ্রেমিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মিবারের বিনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারে তিনি ভিন্ন আর কেহই সমর্থ হন নাই। রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিয়া দুর্বৃত্ত মোগল-সম্রাটের দর্প, গর্ব্ব ও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া আপনার অতুলনীয় বিক্রম ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। রাণা রাজসিংহ বীরকেশরী প্রতাপসিংহের উপযুক্ত বংশধর। ভারতের ঘোরতর অধঃপতনের সময় যদি রাজসিংহ অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতক্ষেত্রে হিন্দুজাতি ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্বও পরিদৃষ্ট হইত না। রাণা রাজসিংহের চরিত্র যেমন দেবচরিত্রের তুল্য, পাপিষ্ঠ আরঙ্গজেবের চরিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ মহাপাপের পূর্ণাবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুবিশাল আসিয়ামণ্ডলে যত রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই আরঙ্গজেবের তুল্য পাশবী বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। যবনেরা সাধারণতঃ পরের জীবনকে জীবন বলিয়াই গণনা করে না, পরের জীবনের প্রতি তাহাদিগের বিন্দুমাত্রও আস্থা নাই; আরঙ্গজেব সেই ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত গুণ থাকিলে জগতে মানব বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, আরঙ্গজেবের হৃদয়ে তাহার একটিমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। শরণাগত শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা রাজপুতবীরগণের মতে মহাপাপ বলিয়া গণ্য; কিন্তু দুরাচার সম্রাট্ আরঙ্গজেবের কোন শত্রু পদানত হইলেও তিনি পিশাচের ন্যায় তাহাকে অধিকতর পদদলিত করিতেন। গোলকুন্দ-নরপতির প্রতি নিদারুণ উৎপীড়নই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু জগৎ-প্রেমিক রাজপুতের পবিত্র চরিত্র কি প্রশংসনীয়! যে নিষ্ঠুর পাষণ্ড পাষাণে বুক বাঁধিয়া অশেষবিশেষে পদে পদে অনিষ্ট করিতে উদ্যত ছিল, পরমকারুণিক রাণা রাজসিংহ কত শতবার সেই দুর্ব্বৃত্তকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত গুণগ্রাম রাজার অলঙ্কার, রাণা রাজসিংহ তৎসমস্ত গুণেই সমলঙ্কৃত ছিলেন। ইচ্ছা করিলে

সম্রাটের প্রাণবধ করিয়া স্বীয় গৌরবোচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিতে পারিতেন,

কিন্তু তাঁহার স্বজাতীয় প্রজাবৃন্দের ভবিষ্যদ্দুঃখের বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও সে ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। স্বদেশের উপকারের জন্য, স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য, প্রজাবৃন্দের সুখের জন্য, রাজ্যের উন্নতির জন্য, তিনি মহাবীরের ন্যায় যেরূপ প্রচণ্ড বিক্রম ও অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তদেবও তাঁহার সে প্রশংসা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। বিপন্না প্রভাবতীর উদ্ধারের জন্য তিনি যে অসীম বীরত্ব ও মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার সে কীর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মুণ্ডকর হইতে ভারতের প্রজাবৃন্দের পরিত্রাণার্থ সম্রাটের নিকট তিনি যে তেজস্বিনী ভাবময়ী পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অতুল বিদ্যাবত্তার একমাত্র প্রকৃষ্ট পরিচয়। স্থাপত্য বিদ্যাতেও রাণা রাজসিংহের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি যে একজন শিল্পপ্রিয় নরপতি ছিলেন, বিশাল রাজসমুন্দ-হ্রদই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

রাণা রাজসিংহের রাজধানীর সার্দ্ধদ্বাদশ ক্রোশ উত্তরে আরাবল্লীর পাদদেশের এক ক্রোশ দূরে রাজসমুন্দ হ্রদ প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে গোমতী-নাম্নী একটি কুটিলগতি গিরিতরঙ্গিণীর স্রোত প্রবাহিত হইত। একটি বিশাল বাঁধ দ্বারা সেই স্রোতোবেগ প্রতিরুদ্ধ করিয়া সেই স্থানেই ঐ রাজসমুন্দ হ্রদ বিনির্ম্মিত হয়। রাণা আপন নামানুসারে ঐ হ্রদের নাম রাজসমুদ্র (রাজসমুন্দ) রাখিয়াছিলেন। হ্রদের ঈশান ও বায়ুকোণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দিকেই উপরি-উক্ত বাঁধ সুবিস্তৃত। ইহার পরিধি প্রায় তিন যোজন। বাঁধটি শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত, উহার উপরিভাগে হ্রদের গর্ভদেশ পর্য্যন্ত একটি সুবিস্তৃত সোপানশ্রেণী ; উহাও প্রস্তরে সমুৎকীর্ণ। বাঁধের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাময় প্রাচীর। রাণা রাজসিংহের ইচ্ছা ছিল, সেই বিশাল প্রাচীরশিরে শ্যামলপাদপরাজি রোপণ করিবেন, তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই ; দুরন্ত কাল তাঁহাকে ইহলোক হইতে হরণ করিল। সরোবরের (হ্রদের) দক্ষিণভাগে রাজনগর নামে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত বাঁধের উপরিভাগে শ্বেত-মর্ম্মরময় একটি কৃষ্ণমন্দির বিরাজ করিতেছে। মন্দিরগাত্র বিবিধবর্ণের চিত্রে বিচিত্রিত ; স্থানে স্থানে রাণার ধারাবাহিক বংশবিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করিতে রাণার প্রায় ৯৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। সামন্তরাজগণও ইহার ব্যয়সাহায্য করিয়াছিলেন।

মিবার ভূমি রত্নগর্ভা। এই রাজ্য রাজস্থানের নন্দনকানন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পবিত্র রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর প্রকোপ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাণা রাজসিংহের রাজত্বকালে ১৭১৭ সংবতে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) দুর্ভাগ্যবশে মিবাররাজ্য দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রজাবৃন্দ দুর্ভিক্ষ-পীড়নে একান্ত প্রপীড়িত হইলে রাণার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। হতভাগ্য প্রজাবৃন্দের রক্ষণোদ্দেশে তিনি ঐ রাজসমুন্দ-প্রতিষ্ঠারূপ মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। পৌষমাসের অষ্টম দিবসে মঙ্গলবারে হস্তানক্ষত্রে প্রথমপ্রস্তর সংস্থাপিত হয়। সাত বৎসরে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। হ্রদ-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ ও উপসংহারের সময় রাণা দেবগণের উদ্দেশে ষোড়শোপচারে যথাবিধি পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ-সময়ে জগৎপূজ্য রাণা রাজসিংহ কর্ত্তৃক এই সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভীষণ শোকাবহ সঙ্কট-সময়ের কথা স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় শিহরিয়া উঠে।

আষাঢ়মাস অতীত হইল, কিছুমাত্র বারিবর্ষণ হইল না। চতুর্ভুজা-মন্দিরে গিয়া রাণা নানারূপে দেবীর করুণাপ্রার্থনা করিলেন, কোন ফলই হইল না। শ্রাবণ-ভাদ্রও অতীত হইল, তথাপি কিছুমাত্র বৃষ্টি পতিত হইল না। ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রজাবৃন্দ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে

হাহাকার হইতে লাগিল। বৃক্ষপত্র, তৃণগুল্ম, সম্মুখে যাহা উপস্থিত হয়, ক্ষুধার প্রপীড়নে প্রজাগণ তাহাই ভক্ষণ করিতে লাগিল। পিতামাতা পুত্রকে, পতি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া আকুল হৃদয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। জনক-জননী স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়া শিশু-সন্তানকে বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাময়ী ছায়া ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িল, অধিক কি, কীটপতঙ্গেরাও আহারাভাবে পালে পালে মরিয়া স্থানে স্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিল। এই দুর্দ্দিনে অতিকষ্টে একদিনের খাদ্য সংগ্রহ হইলে লোকে তাহার অর্দ্ধেক ভোজন করিয়া অপরার্দ্ধ পরদিনের জন্য রাখিয়া দিত। বিধাতা কেবল এইরূপে দুর্ভিক্ষপীড়নে প্রজাবৃন্দকে প্রপীড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অকস্মাৎ পশ্চিমদিক্ হইতে মারাত্মকবাষ্পপূর্ণ প্রবলবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবাভাগে নভোমণ্ডল মেঘশূন্য, কিন্তু রাত্রি উপস্থিত হইবামাত্র নিবিড় মেঘমালা আসিয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিত, প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইত, ঘন ঘন উল্কাপাত ও বজ্রাঘাত হইত; সঙ্গে সঙ্গে রাশিচক্র ও নানাবিধ নক্ষত্রমালার অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্ট হইত। এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া সকলে একান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। নদনদী, সরোবর, দীর্ঘিকা, পল্বল, নির্ঝরিণী সমস্তই জলশূন্য—বিশুষ্ক। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার রহিত হইল, খাদ্যাখাদ্য বিচার রহিল না, ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া কেবল খাদ্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; জাতিভেদ রহিত হইয়া গেল। বৃক্ষপত্র, বৃক্ষত্বক্, পশুপক্ষীর মাংস, ক্রমে এ সমস্তও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, মানুষে মানুষ খাইতে আরম্ভ করিল। নগর, গ্রাম পল্লী, সমস্ত জীবশূন্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল। ১৭১৭ সংবতে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও রোমহর্ষণ মহামারী উপস্থিত হয়। এই সময়েই দুরাত্মা যবন-কুলাঙ্গার পাপাবতার নরপাংশুল মোগলসম্রাট্ আরঙ্গজেব ভারতে সমরাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাণা জয়সিংহ, তাঁহার যমজ ভ্রাতৃসম্বন্ধে উপন্যাস, সন্ধি, অমরসিংহের বিদ্রোহ, রাণার মৃত্যু, অমরের রাজ্যলাভ, সামরিক ঘটনা, মুণ্ডকর, আরঙ্গজেবের মৃত্যু, বাহাদুর শাহের অভিষেক ও মৃত্যু, ফিরকশিয়রের অভিষেক, ভারতে ব্রিটিসপ্রাধান্য, জাটদিগের স্বাধীনতা, অমরের মৃত্যু।

১৭৩৭ সংবতে (১৬৮১ খৃষ্টাব্দে) বীরকেশরী রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র জয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। জয়সিংহের জন্মকালীন একটি ঘটনা পাঠ করিলে রাজপুতজাতির একটি আচারব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। রাণা রাজসিংহের দুই মহিষী, তন্মধ্যে একের প্রতিই তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। সেই রাণীর গর্ভেই জয়সিংহের জন্ম হয়। জয়সিংহ ভূমিষ্ঠ হইবার অত্যল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁহার বিমাতা একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন; সেই পুত্রের নাম ভীমসিংহ। রাজপুতগণের প্রথা আছে, নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহারা অমরধব নামে একপ্রকার তৃণবলয় শিশুর বাহুতে সংলগ্ন করিয়া দেন। এরূপ তৃণবলয় হস্তে থাকিলে কুমারের স্বাস্থ্যহানির কোনরূপ

আশঙ্কা থাকে না। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে রাণা রাজসিংহও পুত্রের হস্তে অমরধব পরাইয়া দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনুরাগপাত্রী প্রিয়তমা রাণীর গর্ভে কনিষ্ঠপুত্র জয়সিংহের জন্ম, সুতরাং রাণা তৃণবলয় লইয়া তাঁহারই বাহুতে পরাইয়া দিলেন, ভীমের হস্ত বলয়শূন্য রহিল। অপরাপর লোকে রাণার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, ভ্রম বশতঃ রাণা এইরূপ বিপর্য্যয় করিলেন।

ভ্রাতৃযুগল দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন; শৈশবের সুকুমার বয়স অতীত হইয়া তারুণ্যের শোভা দেখা দিল। কনিষ্ঠপুত্রের প্রতি পিতার অধিকতর অনুরাগ, পাছে তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠের হৃদয় ঈর্ষার বশীভূত হয়, পাছে গৃহবিবাদে ভ্রাতৃযুগল উত্তেজিত হইয়া উঠে, রাণার হৃদয় এই আশঙ্কায় অধীর হইল। তিনি ভীমসিংহকে আপনার নিকটে আহ্বান করিলেন, আপনার অসি কোষমুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন; অবশেষে গম্ভীরস্বরে কহিলেন; "যদি ভবিষ্যতে রাজ্যলাভের ইচ্ছা থাকে, রাজ্য যদি ঘোরবিপদে বিপন্ন দেখিতে অভিলাষ না হয়, তাহা হইলে এই উন্মুক্ত অসি লইয়া এই মুহূর্ত্তেই তোমার ভ্রাতার প্রাণবধ কর।"

পিতা যে উভয়সঙ্কটে পড়িয়া মানসিক যন্ত্রণার ভীষণ তাড়নায় এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলেন, মহাতেজা উদারহৃদয় ভীম তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। পিতার মানসিক যন্ত্রণা দূর করা এবং পিতাকে উভয়সঙ্কট হইতে উদ্ধার করাই তখন তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হইল। বিস্মিত বা চঞ্চল না হইয়া তিনি স্থিরভাবে ধীরগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "পিতঃ! আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনার সিংহাসন স্পর্শ করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে আমি সমস্ত স্বত্বের আশা পরিত্যাগ করিলাম অদ্যই আমি এ রাজ্য পর্য্যন্ত ত্যাগ করিব; প্রফুল্লমনে জয়সিংহকে সমস্ত প্রদান করিলাম। আপনার পাদস্পর্শ করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি রাণা রাজসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, অদ্য হইতে তবে আর এই দোবারি-গিরিবর্ত্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র জলপান করিব না।" পিতার চরণে প্রণাম করিয়া, ভক্তিসহকারে তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক তেজস্বী ভীমসিংহ তৎক্ষণাৎ আপনার সৈন্যসামন্তগণকে আহ্বান করিলেন; সেই মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে লইয়া উদয়পুররাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন।

গ্রীষ্মকাল; বেলা দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। দিনমণি মধ্যগগনে থাকিয়া প্রচণ্ড রশ্মিতাপে সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতেছেন। জগৎ-সংসার স্থির। পবনদেব যেন পরিশ্রান্ত হইয়া নিভৃতে লুক্কায়িত হইয়াছেন। একটি বৃক্ষপত্রও কম্পিত হইতেছে না। এমন সময় উদারহৃদয় ভীমসিংহ আপন সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে সেই কূটগিরিবর্ত্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে সকলে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে অভিষিক্ত হইল; অশ্বগুলিও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ না হইয়া ভীমসিংহ সেই স্থানেই বিশ্রাম করিবার অভিলাষ করিলেন। অদূরেই জটাজালমণ্ডিত একটি প্রাচীন বিশাল বটবৃক্ষ ছিল, রাণা তাহার সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবেশন করিলেন; প্রাণ ভরিয়া জন্মশোধ একবার মাতৃভূমির দিকে নেত্রপাত করিলেন। আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন হইতে অলক্ষিতে দুই বিন্দু অশ্রুবারি ভূপতিত হইল—দুইটি বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইয়া হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল। ভবিষ্যতে যে বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড তাঁহার হস্তে অর্পিত হইত, বিধি-বিড়ম্বনায় আজি তিনি সেই প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে ঘূর্ণায়মান হইতে চলিলেন। ভীমসিংহের হৃদয়ের দৃঢ়তা ছিল, বাহুবলেও তিনি বিলক্ষণ বলীয়ান্; মাতৃভূমির বিষয় চিন্তা করিয়া একবার তাঁহার প্রাণে আঘাত

লাগিল বটে, একবারমাত্র তিনি কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্যগুণে হৃদয় দৃঢ়ীভূত করিলেন; কিছুতেই তিনি কাতর বা বিচলিত হইলেন না। ভীমসঙ্কট উপস্থিত হইলেও হৃদয়ের দৃঢ়তাগুণে ও বাহুবলের সাহায্যে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল ছিল।

একে গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত, তাহার উপর পথশ্রম, পিপাসায় ভীমসিংহের কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, একজন ভৃত্য রজতপাত্র পূর্ণ করিয়া সুশীতল প্রস্রবণবারি আনয়ন করিল, ভীমসিংহের হস্তে সেই পাত্র প্রদান করিল। জলপানার্থ ভীম যেমন রজতপাত্রটি উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। জলপান না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত জল ভূতলে ঢালিয়া দিলেন, রজতপাত্রটি নির্ঝরিণী-প্রান্তে প্রক্ষেপ করিলেন; বনদেবীর উদ্দেশে কাতরস্বরে কহিলেন, "বনদেবি! অপরাধ ক্ষমা করুন। ভ্রমান্ধ হইয়া আমি আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, দোবারি-গিরিবর্ত্মের মধ্যে জলপান করিতে আমার অধিকার নাই।" তৎক্ষণাৎ অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া সদলে ভীমসিংহ সেই পর্ব্বতবর্ত্ম হইতে বহির্গত হইলেন।

উদারহৃদয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইয়া ভীমসিংহ মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। দোবারি-গিরিবর্ত্ম অতিক্রমপূর্ব্বক তিনি সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সম্রাটের অন্যতম পুত্র বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাহাদুর যথাযোগ্য সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া এক দল অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্বে বরণ করিলেন। সার্দ্ধ-ত্রিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার অধীনে থাকিল। ঐ সকল সৈন্যসামন্তের ভরণপোষণনির্ব্বাহার্থ দ্বিপঞ্চাশৎটি জনপদ নির্দ্দিষ্ট রহিল। কথিত আছে, ভীম এক জন প্রশংসনীয় অশ্বারোহী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। দ্রুতবেগে চালিত অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে উল্লম্ফনপূর্ব্বক তিনি তরুশাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিতে পারিতেন। ভবিষ্যতে এইরূপ বীরত্ব দেখাইতে গিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মোগলসেনাপতির সহিত তাঁহার মনোবাদ হওয়াতে তিনি বাহাদুরের নিকট হইতে সিন্ধুনদের পরপারে প্রস্থান করিয়াছিলেন; সেই সুদূর কাবুলরাজ্যেই তাঁহার পঞ্চত্বলাভ হয়। প্রৌঢ়াবস্থার প্রাক্কালেই তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

জয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাণা উপাধি গ্রহণ করিলেন। অত্যল্পকাল পরেই সম্রাটের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন হইল। সম্রাটের পুত্র আজিম সেনাপতি দেলহির খাঁর সহিত সন্ধিপত্র লইয়া জয়সিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া রাণা অযুত অশ্বারোহী ও চত্বারিংশৎসংখ্যক পদাতিক সৈন্য সহ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক মিবারের একটি বিশাল ক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে তথায় অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। মিবার-বাসিগণ বহুদিন মাতৃভূমি দর্শন করে নাই, গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পর্ব্বতবাস আশ্রয় করিয়াছিল, আজি তাহারা প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় আসিয়া সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। সম্রাটের সহিত সন্ধিবন্ধন হইবে, সুখে স্বচ্ছন্দে সকলে আপন-আপন গৃহে অবস্থিতি করিবে, এই উৎসাহে, এই আনন্দে আজি প্রজাবৃন্দের বদনমণ্ডল আনন্দপূর্ণ। তাহাদিগের ঘন ঘন জয়নাদে সেই প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রতিনাদিত হইতে থাকিল; অচিরেই সম্রাট-কুমার সদলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। "জয় জয়সিংহের জয়" বলিয়া চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। রাণা উপযুক্ত আদর-সম্ভ্রমের সহিত আজিম ও দেলহির খাঁর অভ্যর্থনা করিলেন। গিরিসঙ্কটে রাণা রাজসিংহের করুণায় দেলহির খাঁ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই কথা তুলিয়া তিনি জয়সিংহের নিকট পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ স্বর্গীয় রাজসিংহের উদ্দেশে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

সম্রাট-কুমারের আগমনসময়ে সেই প্রশস্ত ক্ষেত্রে অসম্ভব জনতা হইয়াছিল। অগণিত রাজপুত বীর সেই সময় সমবেত হইয়াছিলেন। রাণা জয়সিংহের সেই বিপুল সেনাদল দেখিয়া আজিমের হৃদয় কিছু ভীত ও শঙ্কাকুল হইল। সুচতুর দেলহির খাঁ কিন্তু অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হইলেন না। বীরহৃদয় রাজপুতেরা বিশ্বাসঘাতকতা জানেন না, ঔদার্য্য ও উচ্চহৃদয়তা তাঁহাদিগের প্রধান অলভূষণ, দেলহির খাঁ ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। আপন গৃহাভ্যন্তরে পাইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, জয়সিংহের হৃদয়ে এমন নিকৃষ্ট দুষ্প্রবৃত্তি কখনই স্থান প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং সুবিজ্ঞ দেলহির খাঁর হৃদয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের উদয় হইল না।

সন্ধিবন্ধন পরিসমাপ্ত হইল। সম্রাটের বিরুদ্ধে রাণা আকবরের সহায় হইয়াছিলেন, তাহার দণ্ডস্বরূপ তিনটি জনপদের স্বত্ব জয়সিংহ সম্রাটকে প্রদান করিলেন। আর একটি কথা বিধিবদ্ধ হইল যে, অদ্য হইতে আর মিবারের রাণারা লোহিতবর্ণ শিবির ও ছত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না। আজিমের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদনার্থ দেলহির খাঁর পুত্রেরা দেহবন্ধকস্বরূপ রাণার নিকট রক্ষিত হইলেন। সন্ধিবন্ধন শেষ হইলে সম্রাট-তনয় দেলহির খাঁর সহিত সসৈন্যে নিজরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। বিদায়কালে রাণাকে সম্বোধন করিয়া দেলহির খাঁ কহিলেন, "মহারাজ, আপনার সর্দার বীরেরা স্বভাবতঃ কঠোর, আমার পুত্রেরা আপনার কল্যাণার্থ দেহবন্ধকস্বরূপ আপনার নিকট থাকিল। পুত্রগণের প্রাণের বিনিময়েও যদি আমি আপনার রাজ্যের পূর্ণস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহাতেও আলস্য করিব না। আপনার স্বর্গীয় পিতা আমার পরমবন্ধু ছিলেন। আমি আপনাকে বন্ধুপুত্রজ্ঞানে স্নেহের চক্ষে দর্শন করি। আপনার কোন আশঙ্কা নাই, আপনি স্থিরচিত্তে অবস্থিতি করুন।"

দেলহির খাঁর উচ্চহৃদয়ের উদ্দেশ্য মহৎ বটে, কিন্তু সে উদ্দেশ্য তিনি সফল করিতে পারেন নাই। অসিবলের উপরেই রাণাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। রাজ্যলাভের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই রাণাকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। দুর্জ্জয় কামোরীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে তিনি নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। সেই সমস্ত পর্ব্বতনিলয়ের মধ্য হইতে উপযুক্ত উপযুক্ত অবসরে বহির্গত হইয়া রাণা জয়সিংহ বৈরিকুলকে আক্রমণ করিতেন। অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিয়া রাণা ক্রমে ক্রমে অর্থসম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; রাজ্যের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও রাণা যে বহুব্যয়সাধ্য কতকগুলি অনন্তকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় ও বিপুল উদ্যমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; অদ্যাপি সেই সমস্ত কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ দর্শন করিলে মিবারভূমিকে প্রকৃত রত্নগর্ভা বলিয়াই উপলব্ধি হয়।

ভারতের বক্ষে যতগুলি সরোবর আছে, রাণা জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জয়সমুদ্র সরোবর তন্মধ্যে বৃহত্তম। স্বচ্ছসলিলা গিরিনদীর মধ্যস্থলে এই সুবিশাল সরোবর প্রতিষ্ঠিত। এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করিতে রাণাকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। যে স্থানে হ্রদটি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রায় সমস্ত কালেই তথায় ভূরি পরিমাণে জল থাকিত। স্বীয় বুদ্ধিমত্তাবলে সেই সলিলরাশি একত্র করিয়া রাণা তাহার চারিদিকে উচ্চ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহার পরিধি প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ। এই হ্রদটি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তৎপ্রদেশে শস্যের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। সেই সমুচ্চ বাঁধের উপরিভাগে একটি মনোহর অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। রাণা প্রিয়তমা মহিষী কমলা

দেবীর সহিত সেই শোভনীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। প্রাচীন প্রমারবংশে কমলাদেবীর জন্ম। স্বদেশে তিনি রাণী নামে অভিহিত হইতেন।

রাণা জয়সিংহের চরমজীবন অতি শোচনীয়। পারিবারিক অন্তর্বিবাদে বিজড়িত হইয়া তিনি মানসিক সুখশান্তিতে বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। রাণার স্ত্রৈণতাই এই বিবাদের মূলীভূত কারণ। স্ত্রীপরায়ণতাদোষেই তাঁহার মান, সম্ভ্রম, গৌরব সমস্ত বিনষ্ট হইল। এমন কি, পরিশেষে তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারীর নির্ঘণ্ট হইতেও বিচ্ছিন্ন হইলেন। জয়সিংহের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে বুন্দির হাররাজকুমারীই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। ইঁহারই গর্ভে অমরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। গিহ্লোটবংশীয়েরা হারকুল হইতে অনেক সময়ে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার অনেক সময়ে হারকুল হইতে গিহ্লোটকুলের অনিষ্টও ঘটিয়াছিল। মিবারের ভাবী উত্তরাধিকারী অমরসিংহ। অমরের জননী হাররাজকুমারীই রাণার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা মহিষী। ধর্ম্মানুসারে তাঁহার প্রতিই অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করা রাণার কর্ত্তব্য। কিন্তু রাণা তাহা না করিয়া বরং ধর্ম্মপত্নীর প্রতি বিরাগ-প্রদর্শন করিতেন। নবীনা কমলাদেবী কনিষ্ঠা মহিষী, রাণা তাঁহার প্রতিই অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পতির অনুরাগপাত্রী হইয়া কমলাদেবী নিরতিশয় গর্ব্বিতা হইয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠা সপত্নীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মিল, তিনি অমরের জননীকে সর্ব্বদা বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এই বিদ্বেষভাব হইতে পারিবারিক অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হইল। সেই গৃহবিবাদে যেরূপ অনিষ্ট হইল, ঘোরতর প্রচণ্ড সমরে পরাজিত হইলেও সেরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা হইতে পারিত না। বহুবিবাহদোষে ভারতের নৃপতিসমাজে যে কত অনিষ্টসাধন হয়, রাণা জয়সিংহ তাহার জলন্ত উদাহরণ। প্রতিপত্তি ও যশোলাভের আশাতে ভারতীয় রাজন্যকুলের মধ্যে প্রায় অনেকেই দুরিত অবলম্বন করেন, সুতরাং রাজ্যমধ্যে মহা অনর্থ সংঘটিত হয়; কিন্তু বাপ্পারাওয়ের বংশধরেরা কোন কালে সে পথের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদিগের শাসনপদ্ধতি প্রকৃষ্ট নীতির অনুসারিণী। তাঁহারা পুত্রগণের প্রতি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করিতেন না; কাজেই রাজকুমারদিগের হৃদয় উচ্চভাব ধারণ করিত, চরিত্রও দিন দিন উন্নত ও বিমল হইত।

কমলাদেবীর সাপত্ন্যবিদ্বেষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অন্তর্বিবাদ ক্রমশঃ এমন প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল যে, প্রধানা মহিষীর সহিত কমলাদেবী এক বাটীতে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। যে মহাবীর রাণা মোগলসম্রাটের সহিত সংগ্রামে অসীম বীরত্ব ও বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজি তিনি উপস্থিত পারিবারিক সংঘর্ষ প্রশান্ত করিতে সমর্থ না হইয়া অমরসিংহের জননীকে পরিত্যাগ করিলেন; প্রাণতোষিণী কমলাদেবীকে লইয়া জয়সমুদ্রের সমুচ্চ প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অমরসিংহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাঞ্চোলি-মন্ত্রীর হস্তে সমর্পিত হইল।

জয়সমুদ্রের বিজনবাসে প্রিয়তমার সহিত রাণা জয়সিংহ সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। নিরন্তর প্রাণতোষিণীর সন্তোষসাধন, তাঁহার সহিত প্রেমালাপ, তাঁহার ভবিষ্য মঙ্গলচিন্তন, ইহা ভিন্ন রাণার আর কিছুই ভাল লাগিল না। দিন দিন তিনি আলস্যে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন। জয়সমুদ্রের সুখময়ী অট্টালিকায় কমলাদেবীর সহিত বাস করিয়া রাণা যেরূপ আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন, জীবনে আর কখনও কোন সূত্রেই সেরূপ আনন্দ বোধ করেন নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে তাঁহাকে অধিক দিন সে সুখভোগ করিতে হইল না, অচিরেই তাঁহাকে সেই সুখ-নিকেতন জয়সমুদ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুরে প্রত্যাগত হইতে হইল।

বয়োধর্ম্মসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ কুমার অমরসিংহ একটি মত্তহস্তীর বন্ধনমোচনপূর্ব্বক নগরমধ্যে ছাড়িয়া দেন। মত্তমাতঙ্গ হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই হউক অথবা অন্য কোন হেতুতেই হউক, পাঞ্চোলি-মন্ত্রী অমরসিংহকে ভৎ'সনা করেন। অমর ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিবরের অপমান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ জয়সমুদ্রে রাণার কর্ণগোচর হইল। কুমারের প্রগল্ভতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। অমরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিলাষে তিনি নির্জ্জনবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে জননীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া উদ্ধতস্বভাব অমরসিংহ পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না; পিতা অলস, বৃদ্ধবয়সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি অবিলম্বে মাতুল হাররাজের নিকট বুন্দিরাজ্যে গমন করিলেন। তথা হইতে দশ সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য লইয়া অচিরেই তিনি পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। চিতোরের সর্দ্দারেরাও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল।

অন্তর্বিপ্লব ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও সৈনিকেরা বৃদ্ধ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমার অমরসিংহের পাদমূলে আশ্রয়গ্রহণ করিল। রাণা সঙ্কটাপন্ন। এই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লব নিবারণ করিতে না পারিয়া তিনি আরাবল্লী অতিক্রমপূর্ব্বক গদবাররাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং অমরকে প্রকৃতিস্থ করিবার উদ্দেশে গদবারের সামন্ত-নৃপতিকে অমরে নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজ্যের প্রায় সমস্ত সর্দ্দারই অমরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, অমরের হৃদয় সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি পিতার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না; সামন্তরাজের অনুরোধ রক্ষিত হইল না। পিতৃদ্রোহী অমর রাজকোষাগার হস্তগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বেই সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তিনি কমলমীর-দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেপ্রা-সর্দ্দার সেই সময় কমলমীরের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। অমরসিংহ আশু তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। রাজকুমার অধিকতর সহায়সম্পন্ন হইলেও সুবিচক্ষণ মহাযোদ্ধা দেপ্রা-সর্দ্দার অমরসিংহের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে কমলমীর হইতে বিতাড়িত করিলেন। এ দিকে রাঠোরবীরগণ মহাবিক্রমে গদবাররাজ্য হস্তগত করিবার জন্য তৎপ্রদেশ আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন রাণার অনুগত বিজোল্লীর বিহারীশাল, শালুম্ব্রার কুণ্ডলসিংহ, গানোরের গোপীনাথ, দৈশূরী শোলাঙ্কি প্রভৃতি বীরগণও জিলবারা গিরিবর্ত্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে সুসজ্জিত হইল। চারিদিকেই বিদ্রোহানল সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কুমার অমরসিংহ নিতান্ত বিচলিত হইলেন; তাঁহার হৃদয় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। অগত্যা তিনি পিতার সহিত সন্ধিবন্ধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে পিতাপুত্র উভয়ে মিলিত হইলেন, সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইল। সন্ধিপত্রে স্থিরীকৃত হইল, রাণা জয়সমুদ্রবাস পরিত্যাগ করিয়া উদয়পুরে অবস্থিতি করিবেন এবং অমরসিংহ নির্ব্বাসিত হইয়া জয়সমুদ্রে থাকিবেন। যত দিন রাণা জীবিত থাকিবেন, তত দিন তিনি উদয়পুরে আসিতে পাইবেন না।

জয়সিংহ বিংশতিবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুকুমার তরুণবয়সে তিনি যে সকল উচ্চতম গুণগরিমার পরিচয় দিয়াছিলেন, যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেইরূপ পারিতেন, তাহা হইলে তিনি যবনকবল হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রৈণতাই সর্ব্বনাশের কারণ হইল। সেই স্ত্রীপরায়ণতা-দোষেই তিনি অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন; কাজেই বাল্যার্জ্জিত সমস্ত যশোগৌরব ক্রমে ক্রমে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত

হইল। তিনি যদি সেই সুবিশাল জয়সমুদ্রহ্রদ প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র নাম মিবার-ইতিবৃত্তে সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া থাকিত।

রাণা জয়সিংহ ইহলোক হইতে বিদায় হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ (দ্বিতীয়) ১৮৫৬ সংবতে (১৭০০ খৃষ্টাব্দে) তৎসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি অনেক পরিমাণে অমরনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। আপন পূর্ব্বপুরুষ বীরবর অমরসিংহের বীরত্ব ও মহত্ত্বের অনুকরণ করিয়া তিনি জগতে সম্মানভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু ইনি যে পিতার সহিত ঘোরতর সংঘর্ষে সংলিপ্ত হন, তাহাতে ইঁহার ও মিবারভূমির আভ্যন্তরিক বল বহুলপরিমাণে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। যদি সেরূপ না হইত, যদি অমরসিংহ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বরাজ্যের সর্ব্বনাশসাধন না করিতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন-সময়ে মিবারভূমি বোধ হয় আপনার প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু মিবারের সম্পূর্ণ দুরদৃষ্ট; নতুবা বীরকেশরী স্বদেশপ্রেমিক রাজসিংহের পুত্র হইয়া হতভাগ্য জয়সিংহ অনর্থকরী স্ত্রীপরায়ণতার বশীভূত হইবেন কেন? রাণা রাজসিংহ ও জয়সিংহের শাসনবৃত্তান্ত অনুশীলন করিলে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, সামন্তরাজ্যের শাসনকর্ত্তার চরিত্রের উপর তাঁহার রাজ্যের সুখদুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রাজপুতকুলগৌরব স্বদেশপ্রেমিক বীরপুঙ্গব রাজসিংহ আপনার স্বতঃসিদ্ধ বীরত্ব, মহত্ত্ব ও তেজস্বিতার বলে আপনার অনুগত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে জলন্ত স্বদেশানুরাগ ও আত্মোৎসর্গ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; সেই অসীম স্বদেশপ্রেমিকতা ও আত্মোৎসর্গের প্রভাবে যবনসম্রাটের বিপুল সেনাবলের প্রতিকূলে অসিধারণ করিয়া বলগর্ব্বিত সম্রাটকে, তাঁহার পুত্রগণকে ও তাঁহার রণদক্ষ সেনানীদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী মিবারবাসীদের সেই উচ্চ আনুকূল্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াও মিবারভূমিকে এরূপ দীনহীন দারিদ্র্যের অধস্তন কূপে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন যে, আর কেহই সেই দুর্দ্দশার মোচন করিতে সমর্থ হইল না।

মিবারের রাজদণ্ড পরিচালনের ভার লইয়া রাণা অমরসিংহ সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী শা-আলমের সহিত একটি সন্ধিস্থাপন করিলেন। সেই সন্ধিস্থাপনে তাঁহার পরিণামদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, সে সময়ে মোগলসাম্রাজ্য বিষম অন্তর্বিপ্লবে বিজড়িত, আরঙ্গজেবের পুত্রগণ পরস্পরের হৃদয়শোণিতপাত করিয়া সেই প্রজ্বলিত বিপ্লবাগ্নিতে আহুতিদান করিতেছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের উক্তরূপ দুরবস্থা অবলম্বন করিয়াই পরিণামদর্শী রাণা অমর ভাবী সম্রাট্ শা-আলমের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। উক্তরূপ সন্ধি অতি সংগোপনে সংবদ্ধ হইয়াছিল। যখন শা-আলম সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে গমন করেন, মিবারের সহকারী সেনাদল তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য জনৈক শক্তাবৎ-সর্দ্দারের অধিনেতৃত্বে তথায় বিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধি আছে, সেই অবসরে সেই দূরদেশে শা-আলমের সহিত ঐ সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

কালে সকলই ঘটে, কালের গভীর গর্ভে কি নিহিত আছে, কে বলিতে সমর্থ হয়? কালের মহিমায় ভারতে মোগলকুলের অধঃপতন হইল, সুদূরশ্বেতদ্বীপবাসী ব্রিটিশসিংহের প্রভুত্বের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। বলগর্ব্বিত দুরাচার আরঙ্গজেব আপনার বিপুল সহায়বলের বিষম চিন্তা করিয়া পবিত্রচরিত্র রাজপুতগণকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। আত্মবলে অন্ধ হইয়া যদিও তিনি আপনার প্রকৃত অবস্থা আদৌ বুঝিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়

যে, রাজনীতিবিশারদ আক্‌বর যে বিরাট্‌ সাম্রাজ্যের মূলপত্তন করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহারই দুরাচরণে ক্ষয়িতমূল পাদপের ন্যায় আমূল কম্পিত হইতেছিল। নিষ্ঠুর আরঙ্গজেব যদি মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মরাজ্যের বিষয় চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন তত শীঘ্র ঘটিত না। এই সমস্ত বিষয় অনুশীলন করিলে বোধ হয় যে, রাজ্যশাসনে বা রণাভিনয়ে যিনি যতই পারদর্শী হউন না, অথবা যতই বীরত্ব, বল ও বিক্রম অধিকার করুন না, প্রজাবৃন্দের হৃদয়ের অনুরাগ না পাইলে, প্রজাগণ পরিতুষ্ট না থাকিলে কখনই আপনার রাজ্য ও রাজপ্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন না। মহামতি টডের সময়ে ব্রিটিশসাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল, আরঙ্গজেবের সময়ে মোগলসাম্রাজ্য তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ছিল, বিশেষতঃ মোগলের আত্মরক্ষণোপযুক্ত উপকরণাদিও অতুলনীয়রূপে সুদৃঢ় ছিল। অধিকন্তু রাজপুতজাতির সহিত তাঁহার শোণিতসম্পর্ক ছিল বলিতে হইবে। রাজপুতগণকে তিনি উৎপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে আর্য্যবীরেরা কুণ্ঠিত হইতেন না, এমন কি, সিন্ধুনদ পার হইয়া সুদূর কাবুলে গিয়া তাঁহারই জন্য রাজ্যজয় করিতেন। ভারতবাসী চিরদিন রাজভক্ত। সেই জন্য তাঁহারা কঠোরতম উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সম্রাটের জন্য আত্ম-সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেন। ভারতবাসী যে রাজভক্ত, তাহা আক্‌বর, জাঁহাগীর ও শাজিহান বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুরাচার আরঙ্গজেব সে রাজভক্তির মহিমা বুঝিলেন না, কিংবা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না; কেন না, তিনি ভারতসন্তানদিগের রাজভক্তি ও উদারতাকে অন্যতম জঘন্য নামে অভিহিত করিতেন। তিনি বলিতেন যে, ভারতবাসিগণ তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপভয়ে পদলেহন করিত; ইহাই ভারতবাসীদিগের পবিত্র রাজভক্তির শোচনীয় পুরস্কার। আরঙ্গজেব ইচ্ছা করিলে অনায়াসে পিতৃপুরুষদিগের অবলম্বিত পদবীর অনুগামী হইয়া ভারত-সন্তানদিগের রাজভক্তি ও উদারতার উপযুক্ত প্রতিদান করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া সেই রাজভক্ত রাজপুতবৃন্দের উপর পশুবৎ আচরণ করিতেন এবং নিকৃষ্ট ও জঘন্য মুণ্ডকর স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের সেই অতুল রাজভক্তির যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেন। উক্ত জঘন্য "জিজিয়া" (মুণ্ডকর) হইতেই মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। যদি আরঙ্গজেবের বংশধর তৎপ্রদর্শিত জঘন্য পদবীর অনুসরণ করিয়া সেই হেয় মুণ্ডকর স্থাপনপূর্ব্বক ভারতবাসিগণকে কঠোরতম আচরণে উৎপীড়িত না করিতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের তত শীঘ্র অধঃপতন হইত না। দুরাচার আরঙ্গজেব যে সমগ্র হিন্দুজাতিকে বলপূর্ব্বক ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, রাজপুতকেশরী রাজসিংহের প্রচণ্ড প্রতাপের ভয়ে যে দুরভিসন্ধি সাধন করিতে পারেন নাই, আজ তাহাদিগের উপর সেই কঠোর মুণ্ডকর স্থাপন করিয়া তিনি সে দুরভিসন্ধির সার্থকতা সম্পাদন করিলেন।

যদি কোন হিন্দু স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিত, সম্রাট্‌ তাহাকে সাদরে আশ্রয়চ্ছায়াতলে স্থানদান করিতেন। অনেক হিন্দুকুলকলঙ্ক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আপন স্বজাতীয়দিগের রোষাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। সেইরূপ স্বধর্ম্ম-বিদ্বেষী পাষণ্ডদিগের মধ্যে এক জনের অবিমৃষ্যকারিতাদোষেই মোগলরাজ্যের অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। শিশোদীয়বংশের নিম্নতম শাখাকুলে রাও গোপাল নামে একজন রাজপুত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চম্বলনদের তীরবর্ত্তী রামপুর জনপদে সামন্ত-নৃপতি ছিলেন। দক্ষিণাপথের যুদ্ধকালে তাঁহার অধীনস্থ অনেকগুলি রাজপুতসেনানী তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন।

রাও গোপাল যখন দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করেন, তখন তিনি আপন পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র পিতার অনুপস্থিতি-সময়ে রামপুরের সমস্ত রাজস্ব পিতার নিকট প্রেরণ না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল। তাহাতে রাও গোপাল ক্রুদ্ধ হইয়া সকল বৃত্তান্ত সম্রাটের গোচর করেন। তাঁহার মূর্খ পুত্র পিতার বিদ্বেষনয়ন এবং সম্রাটের রোষানল হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। দুরাচার স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। আরঙ্গজেব তখন তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে শুদ্ধ ক্ষমা করিলেন না, এমন কি, রাও গোপালের জন্মভূমিবৃত্তি রামপুরজনপদ তাহারই করে অর্পণ করিলেন। কুলাঙ্গার পুত্রের এই দুরাচরণে রাও গোপালের অন্তরে ঘৃণার উদয় হইল। তিনি মনস্তাপে সন্তপ্ত হইলেন এবং পাষণ্ডকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য সদলে রামপুর অবরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম বিফল হইল। তাহার আপনার স্বাধীনতা ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবার উপক্রম হইল। তখন গোপালসিংহ আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণা অমরের শরণগ্রহণ করিলেন। ক্রূরমতি আরঙ্গজেবের হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না। গোপালকে আশ্রয়দান করাতে রাণা তাঁহার নিকট বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। তখন সম্রাট্ রাণার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য স্বীয় পুত্র আজিমকে মালবরাজ্যে অবস্থিতি করিতে অনুমতি করিলেন। সম্রাটের অনুগত এক রাজপুত আপনার জীবনবৃত্তান্তে আরঙ্গজেবের ঐ দুরাচরণের বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে, "সম্রাট্ আপনার পরমবিশ্বস্ত ও মহোপকারী রাজপুত-প্রজাবৃন্দের প্রতি স্বল্প অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। ইহাতেই তাঁহার পরিচর্য্যায় তাহাদের আগ্রহ মন্দীভূত হয়।"

রাণা অমরসিংহকে সম্রাটের প্রতিকূলে তদ্বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে হইল। তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য মালবরাজ সেই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আজিম তখন নর্ম্মদার পরপারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি যেখানে অবস্থিত ছিলেন, তত্রত্য মহারাষ্ট্রীয়গণ নীমসিন্ধিয়া নামক এক রণকুশল মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির অধিনেতৃত্বে তৎপ্রদেশে ঘোরতর বিপ্লব সমুত্থান করিয়াছিল। ১৭০৬—৭ খৃষ্টাব্দে এই মহারাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয় সেই বিপ্লববহ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য সম্রাট আরঙ্গজেব রাজসিংহকে আজিমের নিকট প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কোন দিকেই কোন ফলোদয় হইল না। তাঁহার কঠোরতম অত্যাচারে তখন ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত; সকলেই তাঁহার চরমবয়সের অশক্তবগতা ও তাঁহার পারিবারিক সংঘর্ষ দর্শনে সুবিধা বুঝিয়া মোগলের দাসত্বশৃঙ্খলচ্ছেদনে সচেষ্ট; সুতরাং সম্রাট্ কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন? কাহাকেই বা দমন করিবেন? একদিকে মহাবল মহারাষ্ট্রীয়গণ বীরকেশরী শিবজীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য উদীয়মান দিনমণির ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল, অন্যদিকে উৎপীড়িত রাজপুত সামন্তগণ মোগলসাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছিল। এই সমস্ত বহির্বিপ্লবে উদ্বেলিত হইয়াও সম্রাট্ অন্তর্বিপ্লব হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার চরমবয়সদর্শনে তদীয় পুত্রগণ ও পৌত্রগণ সাম্রাজ্যলাভার্থ পরস্পরের হৃদয়শোণিতপাত করিতে সমুদ্যত হইল। সেই সমস্ত প্রচণ্ড সংঘর্ষে প্রপীড়িত হইয়া অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী বিভীষিকাময় রাজ্যসম্ভোগের পর মোগলসম্রাট আরঙ্গজেব ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জিকদ দিবসে আরঙ্গাবাদ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সম্রাট আরঙ্গজেব পরলোকে প্রস্থিত হইলেন, এ দিকে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যেও মহা গণ্ডগোল বাধিল। সকলেই সম্রাট-সিংহাসন লাভ করিবার আশায় দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল। আরঙ্গজেবের জন্য কেহই শোক প্রকাশ করিল না। প্রথমতঃ সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র আজিম সম্রাট-পদ অধিকার করিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ মৌজামকে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ধাত ও কোটার রাজপুতগণের সহিত আগ্রানগরীতে উপস্থিত হইলেন। মিবার, মারবার এবং রাজবারার অন্যান্য রাজপুতগণ জ্যেষ্ঠ মৌজামের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মৌজাম সেই সকল রাজপুতের সহিত জাজো নামক স্থানে উপনীত হইলে আজিম সদলে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তিনি অগ্রজের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কোটা ও ধাতনগরীর নৃপতিদ্বয় এবং আপন পুত্র বিদারবক্তের সহিত সেই রণভূমে শয়ন করিলেন। অতঃপর মৌজাম অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়া শাহ আলম বাহাদুর শা নাম ধারণপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। কিছু দিনের জন্য তিনিই সম্রাট্ নামে গৌরব লাভ করিলেন।

মৌজামের গুণে প্রায় সমগ্র রাজপুত-সমিতি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। রাজপুত-রমণীর গর্ভেই মৌজামের জন্ম। যদি তিনি হিন্দুহিতৈষী ধার্ম্মিকপ্রবর শাজিহানের অব্যবহিত পরেই দিল্লীসিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বীরকেশরী তৈমুরের বিশাল বংশতরু তত শীঘ্র ভারতক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত হইত না; হয় ত আজিও তাঁহার বংশধরগণ মণিময় ময়ুরসিংহাসনে আরূঢ় থাকিয়া আসিয়ার মধ্যে একটি প্রবলতর রাজবংশ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন। কিন্তু গৌরব চিরস্থায়ী নহে; নতুবা দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেব সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন প্রজাদিগকে লৌহদণ্ডাঘাতে পীড়ন করিবে কেন?—আরঙ্গজেব বীরপুঙ্গব তৈমুরের অযোগ্য বংশধর; তাঁহার পিতৃপুরুষগণ এই সুন্দর ভারতবর্ষে আপনাদিগের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, বলদর্পিত আরঙ্গজেব সেই সকল নীতির মস্তকে পদাঘাত করিলেন। তিনি ভারতের সম্রাট্, সাগরাম্বরা ও শৈলমেখলা বিশাল ভারতভূমি তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত। তিনি ইচ্ছা করিলে আপন পিতৃপুরুষদিগের উৎকৃষ্ট নীতির অনুসরণপূর্ব্বক বিশ্বস্ত রাজপুরুষগণকে একটি জনপদ বা প্রদেশ দান করিয়া উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিতে পারিতেন। তাঁহার কঠোর হিন্দুবিদ্বেষিতাই সদ্ব্যবহারে বিঘ্নবাধা প্রদান করিয়াছিল। বীরকেশরী বাবর যে হিন্দুদিগকে নিরন্তর সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিতেন, যাহাদিগের মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিলাষে তাঁহার সদাশয় বংশধরগণ সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, আজি আরঙ্গজেব কঠোরতম উৎপীড়নে সেই বীরগণের হৃদয়ে এরূপ যন্ত্রণাবহ ক্ষতনিচয় সমুদ্ভাবন করিয়া দিলেন যে, আর কেহই তাহার প্রশমন করিতে সমর্থ হইল না। সেই সমস্ত ক্ষতের বিকট যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া রাজপুতগণ বিরক্তানে মোগলসাম্রাজ্যের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। রাজপুতপ্রিয় গুণবান্ বাহাদুর স্বীয় স্বল্পকালব্যাপী রাজত্বের মধ্যে তাহা আরোগ্য করিতে পারেন নাই। তিনি সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিও রাজপুতগণের বিশ্বাস ছিল না। দূরদর্শিতাবলে রাজপুতবৃন্দের হৃদয়ে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, মোগলমাত্রই অবিশ্বাসী ও নিষ্ঠুর; সেই মোগলকুলে বাহাদুরের জন্ম, সুতরাং তিনিও যে রাজবারার শোণিতশোষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। উক্তরূপ সংস্কার নিবন্ধন রাজপুতবৃন্দ পরস্পরের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। বাহাদুর শা তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইলেন, তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণের দৃঢ় রাজভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহাদিগকে মোগলের সহিত

পুনঃসম্বন্ধবন্ধন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন সমস্তই নিষ্ফল হইল। তাঁহাদিগের মনে যে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা আর কিছুতেই বিদূরিত হইল না। তাঁহারা স্থির জানিয়াছিলেন যে, অসংখ্য কর্ত্তব্যসাধন করিলে, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলেও কিছুতেই মোগলের কৃতঘ্নতা ও নিষ্ঠুরতা হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারিবেন না। এই জন্য সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা বাহাদুর শাহের কোন অনুরোধই গ্রাহ্য করিলেন না।

রাজপুতগণের আচরণ দর্শনে সম্রাট্ বাহাদুর বুঝিতে পারিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের নিকট তিনি স্বল্পই আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল ঘটনার সমসময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কম্‌বকৃসের সহিত তাঁহার অন্তর্বিপ্লব বাধিল। কম্‌বকৃস দক্ষিণাবর্ত্তে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই জন্য বাহাদুর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাস্তিদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু অচিরেই শিখদিগের বিপ্লব নিবারণ করিবার জন্য তাঁহাকে উত্তরদেশে যাত্রা করিতে হইল। গুরু নানক এই বিক্রান্তজাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহারা তাঁহারই শিষ্য। প্রসিদ্ধি আছে, অক্ষুনদের তীরবর্ত্তী শাকদ্বীপীয় প্রাচীন জিৎকুলে ইঁহাদিগের জন্ম। অভিযানোদ্দেশে আসিয়া ইঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করেন। গুরু নানকের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবার এক শতাব্দী পরে আত্মরক্ষণোপযুক্ত বলবিক্রম অর্জ্জন করিয়া শিখগণ ক্রমে ক্রমে আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজি বাহাদুর শাহের শাসনকালে সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের মধ্যে সেই শিখগণই কেবলমাত্র স্বাধীনজাতি। এক্ষণে তাহাদিগকে স্বাধীন হইতে দেখিয়া সম্রাট্ বাহাদুর সদলে সেই পঞ্চনদপ্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে অম্বর ও মারবারের নৃপতিদ্বয় সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কিছু না বলিয়া এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই শিবির হইতে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাদের ঐরূপ চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কোন কারণই দৃষ্ট হয় না।

যখন ভারতে এইরূপ সার্ব্বজনীন বিবাদবিসংবাদ ঘটিল, পরাক্রান্ত শিখদিগের জ্বলন্ত আদর্শের অনুসরণপূর্ব্বক রাজপুতবৃন্দ সেই সময়ে মোগল-নিগড়চ্ছেদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সম্রাট্ বাহাদুর তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ ও শান্ত করিবার জন্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইলেন না। তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সম্রাট্ অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সকলই বিফল হইল। এ দিকে সম্রাটের অনুমতি না লইয়া রাজ-পুতগণ তদীয় শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুরের রাণা অমরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা সকলে সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। এইরূপে রাজস্থানের তিনটি মহাবল নৃপতি একত্র হইল, পরিত্যক্ত রাঠোর ও কুশাবহ দীর্ঘকালের পর রাজপুতকুলচূড়ামণি পরমপবিত্র শিশোদীয়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে পাইলেন; বৈবাহিকসূত্রেও আবদ্ধ হইলেন। এই সম্মান পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্যই তাঁহারা একীভূত হইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময় মারবার ও অম্বরের নৃপতিদ্বয় আপনাপন ইষ্টদেবতার নামে শপথ করিলেন যে, আর কেহই কখন মোগলসম্রাটের সহিত পারিবারিক বা রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধসূত্রেই সংবদ্ধ হইবেন না। সেই সঙ্গে আরও স্থির হইল, শিশোদীয়কুলের সহিত বৈবাহিক বন্ধনের পর শিশোদীয়-রাজকুমারী-দিগের গর্ভে যে সকল সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা উচ্চসম্মানে সম্মানিত হইবে। পুত্র জন্মিলে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে, কন্যা হইলে সম্ভ্রান্তরাজকুলে সমর্পিত হইবে।

রাঠোর ও কুশাবহ নৃপতিদ্বয় উক্তবিধ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে

তাঁহাদের আর একটি বিষম অনিষ্টের উদয় হইল। ইহাতে তাঁহাদিগের চিরন্তন জ্যেষ্ঠস্বত্বাধিকার-বিধানের ব্যভিচার হইল। যে প্রথা আবহমানকাল অক্ষুন্নভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার আকস্মিক বিপর্য্যয়ে যে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মারবার ও অম্বরের নৃপতিগণ সেই চিরন্তনী প্রথার ব্যভিচারকালে রাজমধ্যে যে বিষম অন্তর্বিচ্ছেদ সমুদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা সহজে প্রশান্ত হয় নাই এই অন্তর্বিচ্ছেদের নিবারণার্থ দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ মধ্যস্থ হইয়া সমুপস্থিত হইল। সেই ত্রিবলাত্মিকা সন্ধি দ্বারা রাজপুতগণ বাবরের বিরাট সিংহাসনকে ভূপাতিত করিলেন বটে, কিন্তু সেই সূত্রে দুর্দ্দান্ত শত্রু মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অচিরেই রাজপুতগণ অধঃপতিত হইলেন।

রাজপুতপতি রাও গোপালের পুত্র কুলাঙ্গার রতনসিংহকে তদীয় পিতার রোষবহ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে দিন হিন্দুবৈরী আরঙ্গজেব আপনার আশ্রয়চ্ছায়াতলে স্থানদান করিলেন, যে দিন হতোদ্যম রাও গোপালসিংহ উদয়পুরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, রাণা অমরসিংহ সেই দিন তাঁহার হস্তচ্যুত ভূমিবৃত্তি উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য উদ্যম করিয়াছিলেন; কিন্তু এত দিন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এক্ষণে রাঠোর ও কুশাবহ নৃপতিদ্বয়ের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া তিনি সেই পূর্ব্বসঙ্কল্প সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে সঙ্কল্প বিফল হইল। রাজা মুসলিম খাঁ * তাঁহাদিগের সমবেত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তাঁহার জয়সংবাদ শ্রবণমাত্র সম্রাট তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। সম্রাট্ আরও শুনিলেন যে, রাণা স্বরাজ্যকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া পর্ব্বত-নিলয়ে প্রস্থান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এতদুভয় সমাচার প্রাপ্ত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার সম্রাটের নিকট সংবাদ আসিল, রাণার সুবলদাস নামক জনৈক কর্ম্মচারী পুরমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ফিরোজ খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ফিরোজ খাঁ বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অজমীরে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু বীরকেশরী জয়মলের উপযুক্ত বংশধর সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁর নিগ্রহবিবরণ অবগত হইয়া সম্রাট্ নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত দুইটি ঘটনাকে তাঁহার সত্য বলিয়া প্রতীত হইল। যে সাহসী ও পরাক্রান্ত দুর্গাদাস পিতৃদ্রোহী আকবরকে শত সহস্র বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া নিরাপদ্ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, আজি মোগলসাম্রাজ্যের এই সার্ব্বজনীন সংঘর্ষসময়ে তিনিই আবার রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে রাজা পোষণ করিতে না পারাতে এক্ষণে তাঁহাকে উদয়পুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। রাণা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহার্থ দৈনিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন। এই সমস্ত রাজপুতবীরের সমবায়ে একটি মহাবল সৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু শা-আলম বাহাদুরের শাসন-সময়ে তাহার কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয় নাই। সেই মহাবলসৃষ্টির প্রাক্কালেই শা আলম বাহাদুর আততায়ী পাষণ্ডের প্রযুক্ত বিষপানে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তিনি একজন সাধু ও সচ্চরিত্র সম্রাট্ ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত পিতার পাপরাশির প্রতিফল কঠোর বজ্ররূপে পরিণত হইয়া অবশেষে তাঁহারই মস্তকে নিপতিত হইল, পিতৃকৃত পাপের প্রতিফল পুণ্যবান্ পুত্রকে ভোগ করিতে হইল। শা-আলমের আশা-ভরসা সমস্তই অনন্ত কালের গর্ভে বিলীন হইল। হিন্দুকুশ হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিশালরাজ্য তাঁহার শাসনসময়ে নানারূপ, বিশৃঙ্খলা দ্বারা

* মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রতনসিংহ মুসলিম খাঁ নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ঘোরতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহাদুর ভাবিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া মোগল সাম্রাজ্যকে সুখ-শান্তির ক্রোড়ে স্থাপন করিবেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। যদি পাষণ্ডের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তিনি আরও কিছু দিন ইহলোকে থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন তত শীঘ্র ঘটিত না। শা আলম এক জন কার্য্যদক্ষ, পরিণামদর্শী ও সচ্চরিত্র নৃপতি। যদি তাঁহার জীবনতরুর মূলে অকালে কুঠারাঘাত না হইত, তাহা হইলে সেই সমস্ত রাজোপযোগী সদ্‌গুণাবলীর সাহায্যে তিনি পতনোন্মুখ মোগলসাম্রাজ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু বিধাতার কঠোর বিধানানুসারে মোগলকুলের ধ্বংস অনিবার্য্য, নতুবা অকালে বাহাদুরের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিবে কেন? উদারবুদ্ধি বীরকেশরীর পুত্র হইয়া তাঁহার বংশধরগণই বা সম্রাট্ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইবেন কেন?

সাধুশীল শা-আলম বাহাদুর শা অকালে অপঘাতে প্রাণ হারাইলেন, মোগল-সিংহাসনও ক্ষয়িত-মূল তরুর ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, মোগলসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণ সেই কম্পান্বিত সিংহাসনে আরোহণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাহা স্থির রাখিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থিত বেরা নামক নগর হইতে হোসেন আলী ও আবদুল্লা খাঁ নামে দুইটি সৈয়দভ্রাতা আসিয়া মোগলসিংহাসনকে পণ্য করিয়া তুলিল। বাবর, আকবর, জাঁহাগীর ও শাজিহানের পবিত্র রত্নসিংহাসন সেই ক্রূরহৃদয় সৈয়দভ্রাতৃ-যুগলের ইচ্ছানুসারে তাহাদিগের মনোনীত পাত্রে সমর্পিত হইতে লাগিল; উত্তরাধিকারিগণের চিরন্তনী বিধির ব্যভিচার ঘটিল। এই সময়ে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পবিত্র মস্তকে পাপ-পদাঘাত হইতে লাগিল। অর্থ ও তোষামোদ দ্বারা যিনি তাহাদিগের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইলেন, তিনি ভারতের সম্রাট্-সিংহাসনে কিছু দিনের জন্য অবস্থিত রহিলেন; কিন্তু তাহার পরেই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিল। রাজস্রষ্টা মহাত্মাদ্বয় আবার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর এক ব্যক্তির হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিল। এইরূপে মোগলের সিংহাসন ও বংশধরগণ সৈয়দ হোসেন আলী ও আবদুল্লা খাঁর হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া রহিল। কিছু দিনের মধ্যেই মোগলকুলের শোচনীয় অধঃপতনকাহিনী জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে লাগিল।

মোগল-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন রাজস্থানের ত্রিবল একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইল, সেই সময়ে রাজস্রষ্টা সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় ফিরকশিয়রকে সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। দীর্ঘকাল কঠোর হইতেও কঠোরতম অত্যাচার সহ্য করিয়াও একমাত্র যে সহিষ্ণুতাগুণে মহাতেজা রাজপুতগণ প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসা সংবরণ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের যথেচ্ছাচার-দর্শনে, ভারত-মাতার শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে আর তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের হৃদয় সহিষ্ণুতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রতিজিঘাংসানলের প্রচণ্ড তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আততায়ী ম্লেচ্ছ হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন করিয়া তদুপরি যে সমস্ত মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আজি রাজপুতবৃন্দ সেই সকল মসজিদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং মোগলদিগের ধর্ম্মযাজক ও দাওয়ানদিগকে নিগৃহীত করিতে আরম্ভ করিলেন। যবনেরা রাজপুতদিগের প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই হরণপূর্ব্বক মোল্লা ও কাজীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল, এক্ষণে রাজপুতগণ—বিশেষতঃ রাঠোরবীরেরা সেই সকল ক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিয়া সেই স্বর্গীয় স্বাধীনতারত্নকে মোগলের নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিলেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুকালাবধি রাঠোরগণ মোগল-কবল হইতে আপনাদিগের

স্বত্বসংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে অজিতসিংহ মারবার হইতে মোগলদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে রাজস্থানের ত্রিবল একীভূত হইয়া প্রসিদ্ধ সম্বর হ্রদের তীরে উপস্থিত হন। সেই হ্রদ মিবার, মারবার ও অম্বরের সাধারণ সীমারূপে স্থিরীকৃত হইল এবং তাহা হইতে যে কোন উপস্বত্ব উদ্ভূত হইল, ত্রিবল সমভাগে তাহা ভাগ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সম্রাট্ রাজপুতগণের কঠোর আচরণ প্রতিরোধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। আমির-উল-ওমরা * অজিতসিংহের দর্প চূর্ণ করিবার অভিলাষে সদলে তদ্বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে অজিত সম্রাটের স্বাক্ষরিত একখানি গুপ্তপত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে সম্রাট্ অজিতকে দর্পী সৈয়দের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সম্রাট আত্মসেনাপতির গতিরোধ করিবার জন্য কেন যে শত্রুর নিকট গুপ্তলিপি প্রেরণ করেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সৈয়দদ্বয় কর্তৃক সম্রাটপদে অভিষিক্ত ও পরিচালিত হইয়া ফিরকশিয়র আপনার অকিঞ্চিৎকরত্ব ও দুর্ভাগ্যের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেরূপ সাম্রাজ্যভোগ তাঁহার নিকট বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইল। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে সম্রাটের মনে অত্যন্ত ভীতিসঞ্চার হয়। তিনি তাহাদিগের প্রতিপত্তি হ্রাস করিবার অভিলাষে অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। সম্রাটের মন ক্রমশই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল; সৈয়দের দর্প চূর্ণ করিবার এবং সেই সকল ভীতি ও সন্দেহের বিমর্দ্দন হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্রাট পরিশেষে অজিতকে সেই গুপ্তপত্র প্রেরণ করিলেন। সম্রাট ফিরকশিয়র যে ভিতরে ভিতরে তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় তখন আদৌ জানিতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহারা সম্রাটের হইয়া অজিতসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং সম্রাটকে নিমন্ত্রিত কর ও আপনার একটি কন্যা দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই কার্য্যের প্রতিদানস্বরূপ অজিত মোগল-সভায় বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

যে দিন সম্রাট্ ফিরকশিয়রের সহিত মারবার-রাজকুমারীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল, সেই দিনেই এই সুদূর সপ্তসিন্ধু প্রদেশে শ্বেতদ্বীপীয় ব্রিটিসসিংহের প্রভুত্বের পথ পরিষ্কৃত হইল। পরিণয়-বন্ধনসম্বন্ধ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে হঠাৎ সম্রাটের পৃষ্ঠদেশে একটি স্ফোটক দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মুসলমান চিকিৎসকগণ কিছুতেই সেই স্ফোটক আরোগ্য করিতে পারিলেন না। ক্রমে সম্রাট যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী, তথাপি কেহই রোগ আরোগ্য করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন অতীত হইল। সম্রাট ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সকলের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল শুভবিবাহের জন্য যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল, তৎসমুদায় বুঝি অন্ত্যেষ্টিবিধানে প্রযুক্ত হয়। ফলতঃ সকলেই অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কাকুল হইয়া পীড়ার উপশমোপযোগী উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সময়ে সুরাটস্থ ব্রিটিশ-বণিক্‌দিগের এক জন দূত সম্রাটের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক জন চিকিৎসক,—বিশেষতঃ ব্রণ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সম্রাট অবশেষে তাঁহার চিকিৎসাধীনে রহিলেন। সেই চিকিৎসকের নাম হামিল্টন। মহাত্মা হামিল্টন অন্তঃপুরমধ্যে নীত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাটের সাংঘাতিক পৃষ্ঠব্রণ আরাম করিয়া দিলেন। তাঁহার সুচারু চিকিৎসার গুণে সম্রাট সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া স্বীয় জীবনতোষিণীকে

* হোসেন আলী আমির-উল-ওমরা এবং তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লা কুতব-উল-মুল্ক নামে অভিহিত।

বিবাহ করিলেন। মহাধুমধামের সহিত পরিণয় সমাপিত হইল। সম্রাট একদা মহাত্মা হামিল্টনকে নিকটে আহ্বান করিয়া স্নেহপূর্ণবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার নিকট কি পুরস্কার প্রার্থনা করেন?" মহানুভব হামিল্টন উত্তর করিলেন, "সম্রাট! ধন, মান, উচ্চতম পদগৌরব কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমরা সুদূরদেশ হইতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি, আপনার এই সাম্রাজ্যে আমাদের পদমাত্র রাখিবার স্থান নাই। আমার এইমাত্র প্রার্থনা, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ স্থানদান করুন এবং যাহাতে বাণিজ্য বিষয়ে আমাদিগের সুবিধা হয়, তদুপযুক্ত কোন স্বত্বপ্রদানে আদেশ হউক।" সম্রাট প্রীত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সেই দিন এই বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে বৃটিশ-প্রভুত্বের যে বীজ রোপিত হইল, কালে তাহা অঙ্কুরিত এবং প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। আজি সে বিশাল স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে অসংখ্য ভারতসন্তান বিশ্রাম করিতেছেন। বিধাতার নিকট প্রার্থনা, সে মহাপাদপ যেন কালভুজঙ্গের আশ্রয়স্থল না হয়। হামিল্টন ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই অতুল ধনের অধিপতি হইতে পারিতেন, নিশ্চয়ই তিনি এক জন ভারতবাসীর সামন্তনৃপতির ন্যায় অতুল বিষয়বিভব ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু যিনি অকিঞ্চিৎকর আত্মস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের যে মহোপকার-সাধন করিয়া গেলেন, সে মহোপকারের প্রকৃত প্রতিদান কোথায়? হামিল্টনের আত্মত্যাগের গুণে আজি এই ভারতরাজ্য ব্রিটিশ-সিংহের করগত, সেই উদারচরিত মহাত্মা স্বদেশীয়ের নিকট কি প্রতিদান প্রাপ্ত হইয়াছেন?—কিছুই না। যে দিন তাঁহার স্বর্গীয় জীবনবিহঙ্গ পবিত্র দেহপিঞ্জর হইতে বিদায়গ্রহণ করিল, যে দিন তাঁহার পূতকলেবর কলিকাতার একটি সামান্য সমাধিমন্দিরে আড়ম্বরশূন্য অন্ত্যেষ্টিবিধানের সহিত ভূগর্ভে নীরবে নিহিত হইল, সেই দিন কোন ব্রিটিশবাসী কি কৃতজ্ঞতার পবিত্ররসে অভিষিঞ্চিত হইয়া তাঁহার সেই পবিত্র সমাধির উপর কোনরূপ স্মারকচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন? সেই শ্মশানক্ষেত্রে সেই ব্রিটিশগৌরবের পবিত্র দেহের অবশেষরাশি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। এই মহানুভব উদারহৃদয় হামিল্টনের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ ও আত্মত্যাগ-দর্শনে সম্রাটের হৃদয় বিস্মিত ও পরিতুষ্ট হইয়াছিল।

রাজপুতগণের মধ্যে অনেকেরই আশা ছিল, মারবার-রাজকুমারীর সহিত বিবাহ হইলে সম্রাট তাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে আশা ফলবতী হইল না; বরং সেই আশালতা হইতে বিপরীত ফল প্রসূত হইল। বিবাহ-ব্যাপার সমাহিত হইবার স্বল্পকাল পরেই সম্রাট সেই জঘন্য জিজিয়াকর পুনঃ স্থাপন করিলেন। দুই সহস্র টাকার প্রতি ১৩ টাকা হারে এই কর নির্দ্ধারিত হইল। হিন্দুশত্রু আরঙ্গজেব যেরূপ কঠোরতার সহিত ইহাকে প্রচারিত করিয়াছিলেন, যদিও সেরূপ কঠোরতা রহিল না, তথাপি ইহার নাম শ্রবণমাত্র হিন্দুগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সম্রাটের প্রতি তাঁহাদিগের বিষম ঘৃণার উদয় হইল। ইতিপূর্ব্বে মোগলের প্রতি যে কিঞ্চিৎ অনুরাগের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল, জিজিয়া-স্থাপনে তাহা একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্বৃত্ত মোগলের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যেমন ধারণা হইয়াছিল, তাহা বিফল হইবার নহে; মোগল কখনই হিন্দুদিগের প্রতি সদয়ব্যবহার করিবে না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অসীম ক্ষমতা হরণ করিবার ইচ্ছায় ক্ষীণহৃদয় সম্রাট ফিরকৃশিয়র আরঙ্গজেবের প্রাচীন মন্ত্রী ইনায়েৎ-উল্লা-খাঁকে দেওয়ানপদে পুনরভিষিক্ত করিলেন। কথিত আছে, মন্ত্রী দেশকাল পাত্র বিচার না করিয়া হিন্দুপ্রজাবর্গের প্রতি কঠোরতম আচরণ করিতে লাগিল এবং তাহারই সহিত সেই কঠোর জিজিয়া পুনঃস্থাপিত হইল। আরঙ্গজেবের সেই জঘন্য জিজিয়া হইতে যদিও এই জিজিয়ার

অনেক প্রভেদ আছে, যদিও ইহা বার্ষিক আয়ের প্রতি অনুহারে প্রযুক্ত হইয়াছিল, যদিও অন্ধ খঞ্জ এবং দীনদরিদ্রগণ ইহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, তথাপি ইহা যে "কাফেরদিগের উপর কর" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল, সেই জন্যই হিন্দুগণ বিদ্বেষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; এ জগতে কে সাধ্যপক্ষে করভারে নিপীড়িত হইতে ইচ্ছা করে? যে ধর্ম্মভীরু আর্য্যসন্তান রাজাকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই আর্য্যসন্তানও করভারে নিপীড়িত হইলে, সেই দেবভাব তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়! জিজিয়ার অনেক পূর্ব্বে তেম্‌ঘা (ষ্ট্যাম্পকর) প্রচারিত হইয়াছিল; সঙ্গের উপর জয়লাভ করিবার কালে বাবর তাহা হিন্দুদিগের প্রতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তেম্‌ঘা জিজিয়ার ন্যায় দুর্ভর না হইলেও হিন্দুদিগের হৃদয়ে বিষম বিদ্বেষভাব উদ্ভাবন করিয়াছিল।

রাজস্থানের মরুময় মারবাররাজ্যে ঐ ঘটনা সংঘটিত হইতেছে দেখিয়া অমরসিংহ অণুমাত্র নিরুৎসাহ বা বিচলিত হইলেন না। অনর্থকরী গৌরব-তৃষা ত্রিবলের সন্ধিপত্র ছিন্ন করিয়া অজিত-সিংহকে রাণার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল বটে, কিন্তু অমরসিংহ তাহাতে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হইলেন না। তুচ্ছ পরকীয় সহায়তায় উপেক্ষা করিয়া তিনি বিক্রম ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিলেন এবং আপনার ও সমগ্র রাজপুতসমিতির স্বাধীনতা পুনর্লাভ করিবার জন্য কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই সঙ্কল্পসাধনের সময় রাণা যে দক্ষতা ও উৎসাহের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, একটি সন্ধিপত্রই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইহার ২য় সূত্রেই জিজিয়া রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ ছিল। সন্ধিপত্রখানিও এই স্থানে পরিগৃহীত হইল।

"১ম। সপ্তসহস্রের মনসব। *

২য়। পাঞ্জাঙ্কিত প্রমাণপত্রে এইরূপ স্থিরীকৃত হইতেছে যে, জিজিয়া রহিত হইবে; ইহা হিন্দুগণের উপর আর কোন কালেই স্থাপিত হইবে না। যে কোন প্রকারেই হউক, কোন নৃপতিই মিবারে ইহা প্রচারিত করিতে পারিবেন না।

৩য়। দক্ষিণাবর্ত্তের জন্য সহকারী এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষিত হইবে।

৪র্থ। হিন্দুগণের ধর্ম্মমন্দির-সকল পুনর্গঠিত হইবে এবং হিন্দুরা স্বাধীনভাবে আপনাপন ধর্ম্মানুশীলন করিতে পাইবে।

৫ম। আমার মাতুল, পিতৃব্য, ভ্রাতা বা সর্দ্দারগণ যদি আপনার (সম্রাটের) নিকট গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোনরূপ আশ্রয় বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন না।

৬ষ্ঠ। দেবল, বাঁশবারা, ডুঙ্গারপুর ও শিরোহীর এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্থানের ভূম্যধিকারিগণের উপর আমি আধিপত্য প্রাপ্ত হইব, তাঁহারা কোন সময়েই আপনার নিকট উপস্থিত হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন না।

৭ম। আমার সর্দ্দারগণই আমার সেনাবল; যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার সেনাবলের আবশ্যক হইবে, আমি নিয়মানুসারে তাহা সংযোজনা করিব; কিন্তু আপনাকে তাহাদিগের সাহায্য দান করিতে হইবে এবং কার্য্য সমাপ্ত হইলেই তাহাদের হিসাব নিকাশ করিতে হইবে।

৮ম। যে সকল জমাদার ও মনসবদার আন্তরিক যত্নের সহিত আপনার সেবা করে, তাহাদিগের নামের একটি তালিকা আমাকে দিতে হইবে। যাহারা আপনার অবাধ্য, আমি

* সপ্তসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হওয়া হিন্দুদিগের পক্ষে উচ্চতম পদ।

তাহাদিগকে দণ্ডদান করিব; কিন্তু এরূপ করিতে গেলে যদি পয়মাল* হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি কোন দোষারোপ করিতে পারিবেন না।

পাঁচ হাজারীর করে যে সকল জিলা অর্পিত ছিল, সেই সকল পুনঃপ্রদত্ত হইবে। যথা—ফুলিয়া, মণ্ডলগড়, বেদনোর, পুর, রাসার, খিয়াশপুর, পুরধর, বাঁশবারা ও ডুঙ্গারপুর। সিংহাসনে আরোহণের সময় পূর্ব্বতন পাঁচ হাজারীর উপর এবং সিন্সিনী যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পাঁচ পাঁচ অশ্বের সহিত আর এক সহস্র বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। †

তিন ক্রোর দেম ‡ পুরস্কারের মধ্যে প্রমাণপত্রের জন্য দুই ক্রোর, দাক্ষিণাত্য-সেনাদলের বেতন-স্বরূপ এক ক্রোর এবং শিরোহীর পরিবর্ত্তে আর দুই ক্রোর। আপনি এই মাত্র প্রদান করিয়াছেন।

যে সকল জনপদ অধুনা বাঞ্ছনীয়, তৎসমুদয়ের নাম,—ইদর, কেক্রী, মণ্ডল, জিহাপুর, মালপুর।"

সন্ধিপত্রখানি পাঠমাত্র রাজপুতপতি অমরসিংহের সম্বন্ধে অবমাননাসূচক চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হয় বটে; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে অনুশীলন করিয়া দেখিলে সে চিন্তা তখনই বিদূরিত হইয়া যায়। রাণার যে ইহাতে কিছুমাত্রই অপকর্ষ সাধিত হয় নাই, অষ্টম সূত্রই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেন না, রাণা তাহাতে সম্রাটের রক্ষকরূপে সূচিত হইয়াছেন। সাত হাজারীর "মনসবদারীর" বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই মহাতেজা প্রথম অমরসিংহকে মনে পড়ে। তিনি রাজ্যধন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বনবাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি কাহারও অধীনতা-স্বীকারে সম্মত হন নাই। তুচ্ছ পদলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই মোগলকে সম্মানের উৎসস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ বাপ্পার বংশধরগণ কখনও ভুলিয়া বামপদাঘাত দ্বারাও সে সম্মানকে স্পর্শ করেন নাই। সেই জন্য তাঁহাদিগের অধঃপতিত অবস্থাতেও তত সম্মান। মোগল-সম্রাট ফিরকৃশিয়রের সহিত সন্ধি-বন্ধন করিয়া রাণা অমরসিংহ যে কিরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহার সত্য পরিচয় উক্ত সন্ধিপত্রের সূত্রেই স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে। ঐ সকল সূত্রের মধ্যে ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা-লাভ, শিশোদীয়কুলের প্রাচীন সন্তানদিগের উপর রাণার আধিপত্যপ্রাপ্তি এবং করচ্যুত বিষয়সমূহের পুনর্লাভ এই তিনটি স্বত্বই সর্ব্বপ্রধান। এই তিনটি স্বত্বের বিষয় অনুশীলন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, মোগলের সৌভাগ্যলক্ষ্মী মোগলকুলকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা অনুশীলন করিলে আমাদিগের এতদুক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারিবে। বিশাল দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজা শাহুর অধিনেতৃত্বে আপনাদিগের কঠোর লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধন করিতেছিল। তাহাদিগের বাহুবলে অনেক রাজ্য পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সেই সমস্ত বিজিতরাজ্যে আপনাদিগের আধিপত্যস্থাপন না করিয়া, সে দিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, তাহারা কঠোরভাবে সকলেরই নিকট "চৌথ" ও "দশমুকী" আদায় করিতেছিল।

যে সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের এরূপ শোচনীয় অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী আর একটি বীরজাতি স্বাধীনতা লাভ করিল। তাহারা জাট নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বেই বলা

* সৈনাদল স্থানান্তরে গমনকালে যে শস্যাদি দ্রব্যসমূহ নষ্ট করিয়া থাকে, তাহাকে পয়মাল বলে

† প্রিয় সৈনিককে অনুগ্রহ প্রকাশের সময় সম্রাট প্রতি পঞ্চ অশ্ব অর্পণ করিতেন।

‡ চল্লিশ দেমে এক টাকা

হইয়াছে, এই জাট প্রাচীন জিতের অন্যতম শাখাকুল। ইহারা চম্বলনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিতি করিত। মোগলের কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও বিক্রান্ত জাটগণ ধীরে ধীরে সহায়বল সংগ্রহ করিতেছিল। এক্ষণে মোগলসাম্রাজ্যের শোচনীয় দশা দর্শনে সুবিধা বুঝিয়া তাহারা সেই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিফল দিতে উদ্যত হইল। ভারতে সর্ব্বত্র তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীনজাতি বলিয়া ঘোষণা করিল। বলিতে কি, প্রাচীন জিতের বীরবংশধরের স্বাধীনতা-ধ্বজা একেবারে দিল্লীর সিংহদ্বারে সমুড্ডীন হইল। সিন্সনীর অবরোধ হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত উক্ত ধ্বজা উড্ডীন রহিল। অবশেষে যে দিন ব্রিটিশসিংহের চতুরতায় ভরতপুর-দুর্গ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, সেই দিন জাটবীরের মস্তক কিরীটশূন্য হইল, তাঁহার স্বাধীনতা-ধ্বজাও উৎপাটিত হইয়া ব্রিটিশসিংহের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

সেই সন্ধিবন্ধনই রাণা অমরসিংহের জীবনের শেষ কার্য্য। সন্ধিবন্ধনের অত্যল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি এক জন সুদক্ষ ও উচ্চহৃদয় নরপতি ছিলেন। ভারতের সার্ব্বজনীন সংঘর্ষের মধ্যেও তিনি স্বীয় রাজ্যের সুখসমৃদ্ধিসাধন করিয়া আত্মপদের সম্মান-গৌরব সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিবাররাজ্যের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য স্মারকস্তম্ভে তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী অঙ্কিত রহিয়াছে। কালের সর্ব্বক্ষয়কর করস্পর্শে যত দিন না সেই স্তম্ভ রসাতলকূপে নিমজ্জিত হইবে, তত দিন কেহই রাণা দ্বিতীয় অমরসিংহের কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। আজিও মিবারের অধিবাসিবৃন্দ প্রাতঃস্মরণীয় নরপতিগণের পবিত্র নামমালার সহিত অমরসিংহের পবিত্র নাম জপ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় অমরসিংহই পবিত্র শিশোদীয়কুলের শেষ গৌরবশালী নৃপতি। অমরসিংহ ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিশোদীয়কুলের উন্নত মস্তক হইতে গৌরবমুকুটও স্খলিত হইয়া পড়িল।

ষোড়শ অধ্যায়

রাণা সংগ্রামসিংহ, মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন, হায়দ্রাবাদ-প্রতিষ্ঠা, ফিরকশিয়রের হত্যা, মুণ্ডকর রহিত, মহম্মদশাহের সিংহাসনলাভ, সৈদতের অযোধ্যা-লাভ, সংগ্রামসিংহের মৃত্যু, দ্বিতীয় জগৎসিংহ, সন্ধি, দিল্লী উৎসাদন, মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ, মিবার আক্রমণ, মধুসিংহ, রাজমহল-যুদ্ধ, ঈশ্বরীসিংহের মৃত্যু ও রাণার প্রাণত্যাগ।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে সংগ্রামসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। যিনি তৈমুরের বীর-বংশধর বীরকেশরী বাবরের প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতেছিলেন, সান্ধ্যপ্রদীপহস্তে যামিনীসতীকে অভ্যর্থনা করিবার সময় রাজপুতরমণীগণ যাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন, গোধূমপেষণ করিবার সময় যন্ত্রপার্শ্বে বসিয়া কুমারীরা একতানে যাঁহার বীরত্বগাথা গান করে, প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় রাজপুতবৃন্দ যাঁহার পবিত্র নাম জপ করিয়া থাকেন, চিতোরের বিজয়স্তম্ভে ও আরাবল্লী-শৈলশিখরে যাঁহার নাম খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, সংগ্রামসিংহ নাম শ্রবণ করিলে বাবরবৈরী

সেই প্রচণ্ড বীর মহারাণা সংগ্রামসিংহকে মনে পড়ে; মিবারের অতীত ঘটনাসমূহ যেন মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হয়; সেই পবিত্র নামামৃতপানে যেন হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে। সেই বীরচরিত মহারাণা সংগ্রামসিংহের পবিত্র সিংহাসনে আজি শিশোদীয়কুলের দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ সমুপবিষ্ট।

দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ যে সময়ে মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, মহম্মদ সেই সময় রাজাসনে বসিয়া সাম্রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। সংগ্রামসিংহের রাজত্বকালেই মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়, বাবরের বিরাট সিংহাসন ভগ্ন ও বিভক্ত হইয়া অল্পে অল্পে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করে। সেই বিচ্ছিন্ন অংশসমূহে অগণ্য বারিবিম্বের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। মোগল, পাঠান, সিয়া বা সুন্নী, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত সেই সমস্ত স্বতন্ত্র রাজ্যে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া কিছু দিনের জন্য রাজ্যসুখ-সম্ভোগ করিল; অবশেষে যখন ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবী নিয়ম পূর্ণ হইবার দিবস উপস্থিত হইল, যে দিন হিমাচল হইতে সুদূর সিংহল পর্য্যন্ত জল, স্থল, ভূধর, কানন সমগ্র প্রদেশ সহসা তাড়িতপ্রভাবে কম্পিত করিয়া এক প্রচণ্ড বিপ্লব সমুত্থান করিল, সেই দিন সপ্তসাগর লঙ্ঘন করিয়া কতিপয় ইংলণ্ডবাসী বজ্রপ্রহারে সেই সমস্ত মুসলমান, মহারাষ্ট্র ও রাজপুতের সিংহাসন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া একটি বিরাট সিংহাসনের সৃষ্টি করিলেন। মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, রাজপুত আজি সেই বিরাট সিংহাসনের সম্মুখে সভয় অন্তরে করযোড়ে দণ্ডায়মান।

হতভাগ্য মোগলসম্রাট্ গুণগৌরব ও প্রভুভক্তির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। তিনি যে কোন সেনাপতি বা প্রতিনিধির উপর যে কোন প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেনাপতি বা প্রতিনিধি কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিদ্রোহিতারূপ কলঙ্কিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সেই প্রদেশ আত্মসাৎ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সেইরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য হস্তগত করিয়াও যদি তাহারা সুনীতি অনুসারে আপন আপন শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যদি রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ প্রজাকুলের প্রতি পুত্রবৎ আচরণ করিয়া তাহাদিগের সুখ-সমৃদ্ধিবর্দ্ধন করিতে পারিত, তাহা হইলে পাপের কঠোর দণ্ড তত শীঘ্র তাহাদিগের মস্তকোপরি আঘাত করিতে পারিত না; তাহা হইলে তাহারা বঙ্গ, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্য রাজ্যের অধর্ম্মার্জ্জিত সিংহাসনে বোধ হয়, আজিও বিরাজ করিতে পারিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ রাজতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের আকস্মিক অভ্যুত্থানের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। কোন্ দৈবশক্তির প্রভাবে হিন্দু চূড়ামণি শিবজী নিরীহ শান্তজীবন ধর্ম্মযাজক ও কৃষকমণ্ডলীকে সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ও রণবিশারদ সৈনিক করিয়া তুলিয়াছিলেন, চিন্তা করিয়াও তাহা নিরূপণ করা কঠিন। সত্য, হিন্দুবিদ্বেষী মোগলসম্রাটের কঠোরতম প্রপীড়নে নিষ্পিষ্ট ও নিপীড়িত হইয়া বার বার শিবজী স্বদেশীয়দিগকে বীরমন্ত্রে দীক্ষিত ও রণাভিনয়ে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ঐ মহাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে কোন্ হিন্দুর হৃদয় মহোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া না উঠে?—কে না মহাত্মা শিবজীকে ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া গৌরবপুষ্পে পূজা করিতে অগ্রসর হয়? কিন্তু ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই বীরবর শিবজীর মহামন্ত্র তাঁহার বংশধরদিগের হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। যদি তাহারা দুর্দ্দম দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত না হইয়া সেই মহামন্ত্রের ব্যভিচার না করিত, তাহা হইলে বীরকেশরী শিবজী আরঙ্গজেবের ভীমকবল হইতে যে সকল রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা তৎসমুদায়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতে পারিত। কিন্তু ভবিতব্যতা অবশ্যম্ভাবী, ভারতের

ভাগ্যগগন সুপ্রসন্ন নহে, তাহারা জয়শীল হইয়াও সে পথের অনুসরণ করে নাই, অন্ত নীতির অনুগামী হইয়াছিল ; কাজেই তাহাদিগের বীরাচরণ দুরাচারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা অসীম বীরত্বের সাহায্যে যে সমস্ত রাজ্য জয় করিত, তাহাতে আপনাদের প্রভুত্বস্থাপন করিত না ; অধিকৃত প্রদেশগুলি লুণ্ঠন ও উৎসাদন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। ধৈর্য্য, উৎসাহ, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর গুণে তাহারা বিভূষিত ছিল, দুর্ভাগ্যবশে সেই সকল গুণ বিলুপ্ত হইল, তাহারা চাতুর্য্য, লুণ্ঠনপ্রিয়তা, দুরাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি জঘন্ত দোষের আস্পদ হইয়া উঠিল। যে দক্ষিণাবর্ত্তপ্রদেশে তাহাদিগের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, রাজনীতির প্রকৃষ্ট অনুশাসনের অনুগামী হইয়া সদ্ব্যবহারের সহিত শাসনদণ্ড পরিচালন করিলে সেই বিশাল প্রদেশ হইতে বীরকেশরী শিবজীর রোপিত বংশতরু কদাচ শীঘ্র সমুন্মূলিত হইত না। তাহাদিগের হৃদয় প্রচণ্ড দুরাকাঙ্ক্ষার আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিল, দুরাকাঙ্ক্ষার পাপমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহারা আত্মহারাপ্রায় হইল, যেমন উত্তরপ্রদেশে আসিয়া উৎপতিত হইতে আরম্ভ করিল, অমনি স্বজাতিবর্গ তাহাদিগের প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে লাগিল ; কাজে কাজেই তাহারা আপনাদিগের উন্নতির মূলে আপনারাই কুঠারাঘাত করিল ; অচিরেই তাহাদিগের অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় উভয়েই হিন্দু, ধর্ম্মসম্বন্ধে ও জাতিসম্বন্ধে উভয়েই সমান, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এতদূর বিভিন্ন যে, রাজপুত ও মুসলমান এই উভয় জাতির মধ্যেও সেরূপ প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। মুসলমানেরা অত্যাচারী বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণের ন্যায় ঘোর অনিষ্টকারী নহে। এই কারণেই মুসলমানের রাজত্বকাল অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয়ের শাসনকালে ভারতের অধিক অনিষ্ট হইয়াছিল। মোগলদিগের অধঃপতনসময়ে ভারতবাসিগণ যদি ধীরে ধীরে জাতীয় বল সংগ্রহ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ মস্তক উন্নত করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতের সৌভাগ্যগগনে সুখসূর্য্য পুনরুদিত হইত। কিন্তু যবনের নিদারুণ অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতেই মহারাষ্ট্রীয়গণ ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, সুতরাং ভারতের অধিবাসিবৃন্দ অন্তঃসারশূন্য ও হীনবল হইয়া পড়িল, আর তাহাদিগকে পুনরায় মস্তক উন্নত করিতে হইল না। কালচক্রের আবর্ত্তনে ভারতসন্তানগণ নিষ্পেষিত ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। যাঁহার ক্রোড়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন ও প্রতাপসিংহ প্রভৃতি মহা মহা বীরগণ নিষ্কণ্টকে পরমসুখে বাস করিয়া গিয়াছেন, সেই মাতৃভূমি—পবিত্র ভারতভূমি কতিপয় শ্বেতদ্বীপবাসী ব্রিটনের চরণমূলে অবনত হইয়া পড়িল।

সম্রাট্ ফিরকৃশিয়র কুক্ষণে সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের অপ্রতিহতপ্রভাব-হরণে উদ্যম করিয়াছিলেন, কুক্ষণে তিনি দুরাচার ইনায়েৎ-উল্লাকে স্বীয় মন্ত্রণাগৃহে স্থানপ্রদান করিয়াছিলেন ; নতুবা তত শীঘ্র তাঁহার আধিপত্য পর্য্যবসিত হইয়া যাইত না। দুর্ব্বৃত্ত ইনায়েৎ-উল্লা হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। আরঙ্গজেবের বৃদ্ধ মন্ত্রী দুরাচার ইনায়েৎ-উল্লাকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্রাট্ হৃদয়ে অনেক আশা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই নিষ্ঠুরহৃদয় মন্ত্রীর ব্যবহারে তাঁহার সমস্ত আশাই বিলুপ্ত হইয়া গেল। দুর্ব্বৃত্ত ইনায়েৎ আরঙ্গজেবের অবলম্বিত দুর্নীতির অনুসরণপূর্ব্বক হিন্দুপ্রজাবৃন্দের প্রতি ঘোরতর উৎপীড়ন করিতে লাগিল ; দারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুসমিতির বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলেই প্রচণ্ডবেগে বৃদ্ধমন্ত্রীর প্রতিকূলে আপন আপন অসি ধারণ করিল। পরিশেষে দুর্জ্জয় সৈয়দভ্রাতৃযুগলের জলন্ত কোপাগ্নিতে পড়িয়া দুরাচার মুসলমানগণকে অচিরেই ভস্মীভূত হইতে হইয়াছিল।

দুর্জ্জয় সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় বলদর্পিত হইয়া ভারতসন্তানগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে

প্রবৃত্ত হইলে সম্রাট্ ফিরকৃশিয়র ইনায়েৎ-উল্লার পরামর্শে তাহাদিগের প্রভুত্বহরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর নিজাম-উল-মুলুককে আপনার নিকট আসিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই নিজামই বিশাল হায়দ্রাবাদ সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের শাসনভার তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত ছিল। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, রণপাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট্ রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে মালবরাজ্য প্রদানে অঙ্গীকার করিলেন। এই সকল সংবাদ সৈয়দদ্বয়ের শ্রবণগোচর হইল। রোষান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা দশসহস্র মহারাষ্ট্রীয় সেনা সজ্জিত করিল এবং অবিলম্বেই সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া সম্রাট্-সভায় উপস্থিত হইল। অত্যল্পকালের মধ্যেই সম্রাট্ মিরকাসিম পদচ্যুত হইলেন। এই ঘোরতর সঙ্কটের সময় প্রায় সকলেই সম্রাট্কে পরিত্যাগ করিল, কিন্তু অম্বর ও বুন্দির নৃপতিদ্বয় অটলভাবে সম্রাটসভায় উপস্থিত থাকিলেন। সম্রাট্কে সুপরামর্শ দিয়া তাঁহারা প্রকাশ্যযুদ্ধে বীরের ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কাপুরুষ সম্রাট্ কিছুতেই তাঁহাদিগের সুপরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদিগের অনুরোধও রক্ষিত হইল না। সুপরামর্শ-দাতা নৃপতিদ্বয়ের সৎপরামর্শ শ্রবণ করিলে অকালে তাঁহাকে লীলাসংবরণ করিতে হইত না। তিনি অন্তঃপুরমধ্যে গিয়া রমণীর বসনাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুগণের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপরই তিনি আত্মজীবন নির্ভর করিলেন। অম্বরপতি ও বুন্দিরাজ তাঁহার এইরূপ কাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হতভাগ্য ফিরকৃশিয়রের আশাভরসা সকলই বিলুপ্ত হইল। শত্রুকুল কখনই অন্তঃপুরবিধিব ব্যভিচার করিবে না, এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বন সম্রাট্ অন্তঃপুরে রমণীকক্ষেই নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অসিত অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ঘোররূপিণী বিভাবরী জগতে আগমন করিল। তাহার নিবিড় তিমিরজাল দর্শনে ভীত হইয়া দিবাসতী পলায়ন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের ভাগ্যতপনও চির-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ, কেহই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। মন্ত্রী ও অজিতসিংহ ভিন্ন আর কেহই দুর্গমধ্যে ছিলেন না। নাগরিকবৃন্দ দারুণ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রসাদাভ্যন্তরে কি ভীষণ কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে, কেহই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে আমির-উল-ওমরা দশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সেনা সমভিব্যাহারে অপেক্ষা করিতেছেন। উৎকণ্ঠাকুলহৃদয়ে নাগরিকবৃন্দ সমস্ত নিশা চিন্তার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। তখন অরুণযোগে পূর্ব্বদিক্ অনুরঞ্জিত হইবামাত্র রাজপ্রাসাদের নহবতে দিবাসতীর আগমনসংবাদ সূচিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য সম্রাটের অধঃপতন-সংবাদ বিঘোষিত হইয়া পড়িল। মিরকাসিমের পদচ্যুতির অব্যবহিত পরেই রুফে-উল দিরাজাৎ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচ্যনৃপতিগণের পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পরক্ষণেই তাঁহাদিগের নিধনসাধন হইয়া থাকে। অভাগ্য মিরকাসিমের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। বন্দিবৃন্দ যখন নবীন ভূপতি রুফে-উল দিরাজাতকে 'দীর্ঘজীবী হউন' বলিয়া আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে, হতভাগ্য মিরকাসিমের কণ্ঠে তখন পর্য্যন্তও ধনুর্গুণ সংলগ্ন ছিল। হতভাগ্য মিরকাসিমের সমস্ত আশা-ভরসাই বিলুপ্ত হইল। দুর্নীতির অনুসরণ করিয়া অকালে তিনি আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তদানীন্তন মুসলমান-প্রথানুসারে শত্রুগণ তাঁহার গলদেশে ধনুর্গুণ উদ্বন্ধনরূপে সংলগ্ন করিয়া প্রাণসংহার করিয়াছিল।

নবীন ভূপতি রুফে-উল দিরাজাৎ দিল্লীর সম্রাট-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। মুণ্ডকর রহিত করা এবং অজিতসিংহ ও অপরাপর রাজপূত-জাতির সহিত মৈত্রীসংস্থাপন, ইহাই নবীন সম্রাটের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যেও পরিণত হইল। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে নবীন সম্রাট্ মুণ্ডকর রহিত করিয়া দিলেন। রাজপুতগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে সুচতুর সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় ইনায়েৎ উল্লাকে পদচ্যুত করিয়া রাজা রতনচাঁদকে দেওয়ানীপদে বরণ করিলেন। নিষ্ঠুরহৃদয় সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের পৈশাচিক অত্যাচারে নবীন ভূপতিকে অধিক দিন রাজ্যসুখসম্ভোগ করিতে হইল না, অচিরেই তিনি কাসরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনমাসকাল রাজত্বের পর তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইল। কতিপয় মাসের মধ্যে আরও দুই জন সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষণস্থায়ী রাজ্যসুখসম্ভোগ করিয়া নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলেন। অতঃপর বাহাদুরশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র রসুন আক্‌তার মহম্মদশাহ নাম ধারণপূর্ব্বক ১৭২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ইনি ত্রিংশদ্বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে; মোগলের বিশাল সাম্রাজ্যতরু ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় এবং রাজ্যমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে। এই সুযোগে মহারাষ্ট্রীয় ও পাশ্চাত্য আফগানেরা ভারতভূমিতে আপতিত হইয়া নগর, গ্রাম, পল্লী প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর অংশ লইয়া বিবাদসূত্রে মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানের মধ্যে ভীষণ বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। একে রাজ্যমধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহার উপর উদ্ধতস্বভাব সৈয়দদ্বয়ের নিষ্ঠুর ব্যবহার, কাজেই সাম্রাজ্যমধ্যে ঘোরতর গণ্ডগোল বাধিল। যাঁহারা সৈয়দদ্বয়ের সহকারী, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; অধিক কি, যিনি নিজ অভিজ্ঞতাবলে মালবের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, সেই নিজামকে পর্য্যন্ত * ত্যক্তবিরক্ত হইতে হইল।

নিজাম যে একজন সুদক্ষ সেনাপতি, সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় তাহা অবগত ছিল। মালব উদ্ধারের সময় এই বীরকেশরী সেনাপতি যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, মালবরাজ্যের উন্নতিসাধনে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঘটনা স্মরণ হওয়াতে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। স্বার্থসাধনসঙ্কল্পে সৈয়দদ্বয় যাহাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ সম্রাট্-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক রাজভক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব নহে জানিয়া নিজাম অনতি-বিলম্বে আশীর ও বুরহানপুর দুর্গাধিকার করিয়া নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ইহা শুনিয়াই সৈয়দদ্বয় অতিশয় ভীত হইল। তদ্দণ্ডেই সৈন্যসামন্ত লইয়া আহুত, কোটা এবং মারবারের অধিনায়কত্রয় স্ব স্ব দলবলের সহিত বিপুলবিক্রমে নিজামকে নর্ম্মদা হইতে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। এই সূত্রেই কোটারাজের প্রাণবিয়োগ হইল। নিজামের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই অযোধ্যাও স্বাধীনরাজ্য হইয়া উঠিল। বিয়ানার সেনানায়ক সঙ্গত খাঁ পাপাত্মা সৈয়দদ্বয়কে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে এক ষড়যন্ত্র করিয়া আমীর-উল-ওমরার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। নিজামকে

* এই সম্বন্ধে রাজা জয়সিংহ রাণার প্রধান মন্ত্রী বিহারীদাসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এই :—

"আপনার পত্রপাঠে অবগত হইলাম যে, আমার প্রভু সৈন্যদলের জন্য টাকা প্রেরণ করিতেছেন,—সে সম্বন্ধে আমি কোন হিসাবপত্র রাখি না। উষ্ট্রপৃষ্ঠে দিয়া সেই সকল টাকা সত্বর পাঠাইবেন। নবাব নিজাম উল-মুলুক সসৈন্যে শীঘ্রই উজ্জয়িনী হইতে আগমন করিতেছেন, জুবীলরামও শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আগ্রা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে' তিনি কালীনদী পার হইয়াছেন। দেওয়ান যেন সসৈন্যে সত্বর যোগদান করেন। বিলম্ব না হয়, অর্থের উপর সকল কার্য্য নির্ভর। ইতি সংবৎ ১৭৭৬, ৪ঠা ভাদ্র।

দমন করিবার জন্য সসৈন্যে সম্রাটের সহিত যুদ্ধযাত্রাকালে হাইদর খাঁ আমীরের পাপহৃদয়ে তীক্ষ্ণধার অসি প্রবেশিত করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। সম্রাট্ নৃশংস আমীর-উল-ওমরার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অবিলম্বে প্রধান মন্ত্রী জ্যেষ্ঠ সৈয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রধান মন্ত্রীও এই সংবাদ শুনিবামাত্র ইব্রাহিমকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিয়া ভ্রাতৃহন্তার যথোচিত দণ্ডবিধানার্থ সৈন্যসমভিব্যাহারে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রতনচাঁদের শিরশ্ছেদ হওয়াতে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রাজপুতগণ নিরপেক্ষভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী জ্যেষ্ঠ সৈয়দকে ধৃত করিয়া ধনুরজ্জুবন্ধনে তাহার প্রাণবিনাশ করা হইল। এই ষড়যন্ত্রের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট সাদরে সঙ্গত খাঁকে "বাহাদুর জঙ্গ" উপাধি এবং অযোধ্যাপ্রদেশের সম্পূর্ণ শাসন-ভার প্রদান করিলেন। রাজপুতগণ বিজয়ী সম্রাটের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সম্রাট্ও হিন্দুজাতির হৃদয় অধিকারকরণাভিলাষে মুণ্ডকর উঠাইয়া দিলেন এবং যুদ্ধকালে অম্বরপতি জয়সিংহ ও যোধপুররাজ অজিতসিংহ নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া পুরস্কারস্বরূপ জয়সিংহকে আগ্রা এবং অজিতসিংহকে গুজরাট ও অজমীরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনপথ রোধ করিবাব জন্য গিরিধারীদাসকে মালবের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করা হইল। সম্রাটের প্রধান মন্ত্রিত্বভার গ্রহণের জন্য হায়দ্রাবাদ হইতে নিজামকে আহ্বান করা হইল।

ভারতসম্রাটের এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনসময়ে মিবারের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। মিবাররাজ তৎকালে নিজ অধীনস্থ প্রজাবর্গের সম্মান পাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিবাদী রাজগণ সময়োচিত রাজনীতির অনুসরণ করত বিশেষ উদ্যম ও দক্ষতার সহিত আপনা-দিগের রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। যে সময়ে অম্বররাজ যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, মারবারপতি অজমীর-দুর্গশিখরে নিজ জয়পতাকা উড্ডীন করেন, গুর্জ্জর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নিজ অধীনস্থ সেনাসাহায্যে বহুদূরস্থিত দ্বারকা পর্য্যন্ত নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া লন, সেই সময়ে মিবারাধিপতি কেবল নিজ অধীনস্থ প্রাচীন আবু, ইদর, দুঙ্গারপুর, বংশবারা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিনায়কদিগকে শাসন করিয়াই গৌরবানুভব করিতে থাকেন। রাণা সংগ্রাম-সিংহ সম্রাটের দুরণীয় নীতি অবলম্বনে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই তাঁহার রাজ্য এইরূপ অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। এই সময়ে মিবারের অধীনস্থ দুইটি প্রধান জাতি গৃহবিবাদসূত্রে রাণার রাজ্য-বিস্তারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। শক্তাবৎ-সর্দ্দার জৈতসিংহ রাঠোরগণের হস্ত হইতে ইদররাজ্য অধিকার করিয়া কলিবারার গিরিপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমি করায়ত্ত করিলেন। ক্রমে অন্যান্য প্রদেশজয়ে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে রাণা তাঁহাকে সংগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুরে প্রত্যাগত হইতে অনুমতি করিলেন; সুতরাং তাঁহার জয় সম্যক্ সম্পূর্ণ হইল না; প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দাবৎ সর্দ্দার বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তদ্বিরুদ্ধে রাণার নিকটে কোন অভিযোগ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই রাণা তাঁহাকে প্রত্যাগমনের আদেশ করেন। এই সমস্ত বিদ্বেষভাব হইতে মিবারের আভ্যন্তরীণ বিক্রম অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মিবারের কোন সামন্তই স্বীয় অধিকারমধ্যে দুর্গনির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না। কারণ, তাঁহারা তখন তিন বর্ষের অধিক পাট্টা পাইতেন না। ভরণপোষণ-নির্ব্বাহার্থ তাঁহারা ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন, স্বদেশীয় পর্ব্বতালয় তাঁহাদের দুর্গস্বরূপে বিরাজ করিত, এবং সীমান্তস্থিত দুর্গসকল বিপক্ষের আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিত। মোগলপ্রভুত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে তাঁহাদিগের আত্মরক্ষিণী প্রথা এক-প্রকার পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু তাহার অত্যল্পকাল পরেই দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানগণ যখন

বীরবিক্রমে মিবারভূমে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন মিবারের সর্দারগণ দুর্গমালার স্বদেশকে শোভিত করিতে সমর্থ হইলেন।

রাণা সংগ্রামসিংহের রাজত্বকালে মিবারের সম্মান-গৌরব অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ ছিল এবং শত্রুকৃত অনেকগুলি রাজ্যও পুনর্লব্ধ হইয়াছিল। রাণা যে বিহারীদাস পাঞ্চোলীকে মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বহুদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিহারীদাসের তুল্য সুদক্ষ ও সুবিশস্ত মন্ত্রী মিবারের মন্ত্রীর পদে আর কখনও উপবেশন করেন নাই। ইহার সত্যতা তাঁহার সমসাময়িক রাজগণের স্বাক্ষরিত পত্র। বিহারী যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, পর্য্যায়ক্রমে তিনটি রাণার শাসনকাল ধরিয়া তাহা অতি সম্মানের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর মিবারে যে ঘোরতর মহারাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল, তাহার প্রবলবেগ প্রতিরোধ করিতে পাঞ্চোলীমন্ত্রিবর কিছুতেই সমর্থ হন নাই।

রাণা সংগ্রামসিংহের চরিত্রসম্বন্ধে অনেকগুলি কিংবদন্তী আছে। তিনি একজন বিজ্ঞ, ন্যায়বান্ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। প্রারব্ধ কার্য্য শেষ না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। কোতারিওর চৌহান মিবারের প্রথমশ্রেণীর সামন্তমধ্যে পরিগণিত। রাজসভায় তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। এক দিন তিনি রাণার রাজসজ্জায় কিছু গুরুত্ব যোজনা করিতে প্রার্থনা করেন। প্রচলিত শিষ্টাচারের অনুরোধে রাণা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হইলেন। কোতারিওর বদন আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। রাণা তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন ভাবিয়া চৌহানসর্দার আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞানে স্বগৃহে গমন করিলেন। এ দিকে রাণা আপন মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শীঘ্র কোতারিওর ভূমিবৃত্তি হইতে দুইখানি গ্রাম পৃথক্ করিয়া লও।" এই সংবাদ কোতারিওর শ্রবণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাণাসমীপে প্রত্যাগত হইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, আমার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন?" ঈষৎ হাস্য করিয়া রাণা কহিলেন, 'কিছুই নয়, রাওজী! তবে আপনি যে আমার রাজসজ্জা বাড়াইতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, ঐ দুইখানি গ্রামের আয় না পাইলে তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আর আমার আয়ের সমস্তই যখন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সজ্জার আড়ম্বর বৃদ্ধি করিয়া আপনার ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে ঐ দুইখানি গ্রামের আয় ভিন্ন আর কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না।" এই কথা শ্রবণে কোতারিও চৌহানসর্দ্দার অধোবদনে অবস্থিত রহিলেন।

যে কোন কারণেই হউক, রাণা একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠিত বিধি অতিক্রম করিয়াছিলেন। কি রন্ধনশালা, কি সজ্জাশালা, কি গুপ্তধনাগার সকল প্রকার ব্যয়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই সকল ভূমি "থুয়া" নামে কথিত হইত। প্রত্যেক থুয়ার ভার এক এক জন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। সেই সমস্ত কর্ম্মচারী "থুয়াদার" নামে অভিহিত। থুয়াদারগণ স্ব স্ব হিসাব প্রধান মন্ত্রীর নিকট দাখিল করিত। রাণা ইহাদের মধ্যে একজন থুয়াদারের একখানি থুয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা তিনি পরে বিস্মৃত হইয়া যান। রাণা একদিন স্বীয় সর্দ্দারগণের সহিত রসোয়া-গৃহে (ভোজনাগারে) ভোজন করিতেছেন, পরিবেশক সমস্ত দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেছে, ক্রমে দধি পরিবেশিত হইল। কেহই কিন্তু শর্করা আনিল না। রাণা কার্য্যাধ্যক্ষকে তজ্জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সে ব্যক্তি করযোড়ে বিনয়নম্রবচনে উত্তর করিল, "মহারাজ! মন্ত্রী

মহাশয় বলিতেছেন, শর্করার জন্য যে গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা মহারাজ স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন।” “যথার্থ বটে,” এইমাত্র বলিয়াই রাণা শর্করা ব্যতিরেকেই দধিভোজন শেষ করিলেন।

সংগ্রামসিংহের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তদীয় জননীই রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপ্রাপ্তব্যবহারকাল উত্তীর্ণ হইলে সংগ্রামসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কোন কারণে এক সময়ে তিনি দেরিয়াবুদ-সর্দ্দারের বিষয়বিভব ক্রোক করেন। রাণার নিকট কখনও নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পায় না, সকলেই ইহা জানিত। দোষীর প্রতি একবার দণ্ডের আদেশ দিয়া তিনি পুনরায় তাহাকে আর শীঘ্র ক্ষমা করিতেন না। এই কারণে কেহই দেরিয়াবুদ-সর্দ্দারের জন্য রাণার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সাহসী হইতে পারেন নাই। বৃত্তিচ্যুত সর্দ্দার কষ্টে দুই বৎসর যাপন করিয়া তৃতীয় বর্ষের প্রারম্ভেই করুণাপ্রার্থনাপূর্ব্বক বন্দারীন্‌দিগের (রাজপুতরমণীদিগের সহচরী) দ্বারা রাজমাতার সমীপে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিল। সেই আবেদনপত্রের মধ্যে দুই লক্ষ টাকার একখানি তমসুক প্রেরিত হইয়াছিল। সহচরীগণকেও সর্দ্দার বহু অর্থ পুরস্কার দিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনের পূর্ব্বে রাণা প্রতিদিন স্বীয় জননীর পাদপদ্ম দর্শন করিতে গমন করিতেন। একদিন তিনি মাতৃ-সমীপে উপস্থিত হইলে জননী বৃত্তিচ্যুত দেরিয়াবুদ-সর্দ্দারের প্রার্থনাপত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া তাহার বিষয়বিভব প্রতিদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কাহাকে কোন ভূসম্পত্তি অর্পণ করিতে হইলে রাণা প্রথমে প্রধান মন্ত্রীর প্রতি অনুমতি প্রদান করিতেন। যে দিন আজ্ঞা প্রদান করিতেন, সেই দিন হইতে অর্থীর হস্তে দানপত্র সমর্পিত হইবার অগ্রে যথানিয়মে অষ্টাহ অতীত হইত। কেন না, সেই আট দিনের মধ্যে সেই দানপত্রে আটটি মোহর মুদ্রিত হইত। মিবারে আট জন মন্ত্রী আছেন। তাঁহারা যথানিয়মে আট দিনে দানপত্রে স্বাক্ষর করিতেন। ইহা মিবারের রাজবংশের চিরন্তনী প্রথা। কিন্তু রাণা সংগ্রামসিংহ সেই দিন সে নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক সর্দ্দারকে সেই মুহূর্ত্তেই দানপত্র প্রদান করিতে মন্ত্রীর প্রতি অনুমতি করিলেন। অবিলম্বেই তাহা রাণার নিকট আনীত হইল। তখন তিনি মাতৃকরে সেই দানপত্র স্থাপন করিয়া বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, “এই দানপত্র সর্দ্দারকে দিয়া তমসুকখানি প্রত্যর্পণ করিবেন।” এই বলিয়া জননীপদে প্রণাম-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ লইয়া রাণা মধ্যাহ্নভোজনার্থ প্রস্থান করিলেন। পরদিন রাণা নিয়মিত সময়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে অন্ন প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন; কিন্তু সে দিন মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সকলেই বিস্মিত হইল। সে দিন অতীত হইল, ক্রমে পরদিন অতীত হইল, রাজমাতা পুত্রের দর্শন পাইলেন না। দিন দিন তাঁহার বিস্ময় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। অতঃপর তিনি রাণার নিকট লোক পাঠাইলেন; বিনয়নম্রবচনে রাণাও উত্তর দিয়া পাঠাইলেন, “আমার অবসর অল্প, কাজেই যাইতে পারিতেছি না।” পুত্রের বিরাগভাবদর্শনে জননীর হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার হইল। তিনি পুত্রের তাদৃশী চিত্তবিকৃতির কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই দানপত্র ব্যতীত অন্য কোন কারণ উপলব্ধি হইল না। রাজমাতা মন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে বলিলেন; কিন্তু মন্ত্রী সাহসী হইলেন না। তখন রাজমাতাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু যে যে উপায় তিনি অবলম্বন করিলেন, সমস্তই বিফল হইল। জননীর মনস্তাপের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ক্রোধেরও উদয় হইল। অকারণে তিনি সহচরী-দিগকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করিলেন; অবশেষে স্বয়ংও আহার ত্যাগ করিলেন। তথাপি সংগ্রাম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। বিয়া রাজজননী পরিশেষে গঙ্গাস্নানে গমন করিতে

ইচ্ছা করিলেন। তীর্থযাত্রার আয়োজন হইল, তাঁহার শরীররক্ষকগণ সুসজ্জিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিদায়কালে পুত্রের বদনপদ্ম দর্শনের জন্য তিনি তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত হইলেন না। অগত্যা রাজমাতাকে বিষণ্ণবদনে তীর্থযাত্রা করিতে হইল। প্রথমে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছায় তিনি মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাহকেরা জয়পুরের পার্শ্ব দিয়া তাঁহার শিবিকা বহন করিয়া চলিল। জয়পুর তাঁহার জামাতৃগৃহ; সুতরাং গমনকালে কন্যা-জামাতাকে দেখিবার জন্য মহিষী বাহকগণকে জয়পুরে প্রবেশ করিতে কহিলেন। সংবাদ পাইয়া মহারাজ জয়সিংহ যথাযোগ্য সম্মানসহকারে শ্বশ্রূর প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জয়পুর নগরে লইয়া গেলেন এবং তৎপ্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবার জন্য তদীয় শিবিকা ক্ষণকালের জন্য নিজের স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। ইহা রাজপুতদিগের একটি চিরপ্রসিদ্ধ নিয়ম। শ্বশ্রূমুখে শ্যালকের চিত্তবিকৃতি-বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া জয়সিংহ তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইলে আমি উদয়পুরে গিয়া রাণাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিব।'

মহিষী প্রস্থান করিলেন। অভীষ্ট তীর্থ দর্শন সমাপন করিয়া জননী অম্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং জামাতাকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বেই উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। রাজপুতগণের মধ্যে অতিথিসৎকারের প্রণালী অতি কঠোর। আতিথেয়তার সামান্যমাত্র ব্যত্যয়কে রাজপুতবীরগণ ঘোরতর অপমানমধ্যে গণনা করেন। অম্বরপতি জয়সিংহ কি অভিসন্ধিতে উদয়পুর নগরে অভ্যাগত, রাণা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতেন যে, ভগিনীপতির অনুরোধ কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনি পূর্ব্ব হইতেই সে বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন। ভগিনীপতিকে অনুরোধ করিবার অবকাশ না দিয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে মাতৃপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। মাতার আচরণে তাঁহার হৃদয় কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, আজি জননীর আশীর্ব্বাদ লইতে যাইবার সময়েও কাহাকে তাহা জানিতে দিলেন না। সকলেই বুঝিল, তিনি জয়সিংহের প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য অনুচর সমভিব্যাহারে রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু রাণা তথায় না গিয়া একেবারে মাতার পটগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জননীসদনে উপস্থিত হইয়া সংগ্রাম তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া জয়সিংহকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। এ সম্বন্ধে রাণার মুখ হইতে কেবল এইমাত্র বাক্য বহির্গত হইয়াছিল, 'পারিবারিক কলহবৃত্তান্ত পরিবার-মধ্যেই গুপ্ত রাখা উচিত, প্রকাশ করা নীতিবিরুদ্ধ।'

একদা মধ্যাহ্নকালে রাণা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, মালবপ্রদেশ-বাসী পাঠানগণ মুন্দিসর জনপদের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম লুণ্ঠন ও উৎসাদন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে বন্দী করিয়াছে; এক্ষণ আবার মিবারভূমিও আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। শ্রবণমাত্র সংগ্রামসিংহ ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে আচমনাদি সমাপনপূর্ব্বক রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নাগরাধ্বনি করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখনই গম্ভীরনির্ঘোষে নাগরা বাদিত হইতে লাগিল। সর্দ্দারগণ জাগরিত হইলেন। আকস্মিক রণঘোষণার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সকলেরই বিস্ময়বোধ হইল। অবিলম্বে তাহারা অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক প্রাসাদের প্রশস্ত চত্বরে দণ্ডায়মান হইল। রাণা স্বয়ং তাহাদিগের সহিত গমনে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলে সমস্বরে বলিল, "মহারাজ! আমরা জীবিত থাকিতে একটা তুচ্ছ শত্রুকে দমন

করিবার জন্ত আপনাকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দিব না। সামান্য যুদ্ধে আপনি গমন করিলে আপনাকে হীনগৌরব হইতে হইবে।" রাণা সর্দ্দারগণের বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। সকলেই রণযাত্রায় বহির্গত হইলেন। ক্ষণকাল পরে কানোড়ের সর্দ্দার রণবেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহ অত্যন্ত রুগ্ন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, নেত্র জ্যোতির্হীন, রাজ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্যই তিনি তাদৃশী অবস্থায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দর্শনে রাণা তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন; কিন্তু সেই সাহসী সর্দ্দারবীর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আমাকে নিবারণ করিবেন না; করে করবাল ধারণ করিবার শক্তি থাকিতে যুদ্ধের সময় কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।" রাণাকে অগত্যা সম্মতিদান করিতে হইল। হিন্দু-মুসলমানে যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় মহাতেজা কানোড়-সর্দ্দার তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। রাজপুতের বীরবিক্রমের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া যবনসৈন্য ছত্রভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। কিন্তু কানোড়সর্দ্দার সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রও সেই সংগ্রামে ঘোরতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া রাজপুতগণ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাণা সেই নিহত কানোড়-সর্দ্দারের আহত পুত্রকে স্বহস্তে বীরা (তাম্বূল) প্রদান করিলেন। এরূপ উচ্চসম্মান প্রাপ্ত হইয়া কানোড়-সর্দ্দারের আহত পুত্র আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলেন এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "মহারাজ! আজ আমি পিতার জীবন-বিনিময়ে এক অমূল্য রত্নের অধিকারী হইলাম।"

একদিন এক চাটুকার রাণার নিকট শালুম্ব্রাসর্দ্দারের প্রতিকূলে তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহ উদ্ভাবিত করিতে চেষ্টা করিল। সুচতুর রাণা বুঝিতে পারিয়া তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিলেন, "ওরূপ সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক, ইহা দ্বারা রাবৎজীর উন্নতহৃদয়ের অবমাননা করা হয়।" শালুম্ব্রাসর্দ্দার রাবতের প্রতি তাঁহার যে কতদূর গাঢ়বিশ্বাস, তাহা সেই কুলাঙ্গার চাটুকারকে দেখাইবার জন্য রাণা সর্দ্দারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মালবরাজ্যে ম্লেচ্ছসৈন্য পরাজয় করিয়া রাবৎশালুম্ব্রা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সসৈন্যে স্বগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। রাত্রি এক প্রহর অতীত। রাবৎ স্বীয় দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া সৈনিকগণকে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে অনুমতি করিলেন এবং স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অন্তঃপুরের দ্বারদেশে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে প্রহরী আসিয়া বিনয়নম্রবচনে কহিল, "রাবৎজি! রাণা আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক এই পত্রখানি দিয়াছেন।" দীপালোকে পত্রপাঠ করিয়া সর্দ্দার অশ্বপালকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। নিকটে প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী ও স্নেহের [illegible] শিশুসন্তানগুলি তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সেই সুকুমার শিশুদিগকে অঙ্কে লইয়া রণশ্রম দূর করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না; সতৃষ্ণনেত্রে একবার প্রণয়প্রতিমা ভার্য্যার ম্রিয়মাণ বদনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই রাজভক্ত রাবৎ অশ্বা-রোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ছয়টিমাত্র অনুচর রহিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীরব ও বায়ুর শন্ শন্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। রাবতের তত্রত্য বাসভবন শূন্য;—দাসদাসী বা অপর কেহই নাই; কে আহারীয়-দ্রব্যাদি আয়োজন করিবে? এই ভাবিয়া রাণা পূর্ব্ব হইতেই খাদ্যাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। নিশীথসময়ে তাঁহার আগমনসংবাদ উদ্‌ঘোষিত হইবামাত্র তাঁহার ও তাঁহার ছয়টি অনুচরের ভোজ্য ও পেয় এবং সাতটি অশ্বের আহারোপযোগী তৃণজল রাজবাটী হইতে রাবতের

বাসগৃহে আনীত হইল। পরদিন প্রভাতে শালুম্ব্রাসর্দ্দার যথানিয়মে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাণা তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া নিয়মিতসম্মাননিদর্শন ভিন্ন তাঁহাকে সে দিন একখানি জমীদারী দান করিলেন। রাজদত্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দার চমৎকৃত হইলেন; অকস্মাৎ এরূপ অনুগ্রহ-প্রদর্শনের কারণ কি, জানিবার অভিলাষে গম্ভীরভাবে তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি যে, এরূপ পুরস্কারের যোগ্য হইলাম? আর যদি কিছু অসাধ্যসাধন করিয়া থাকি, তাহাও আমার কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যসাধন করিয়া এরূপ পুরস্কার কিরূপে গ্রহণ করিব? মিবারের হিন্দুসূর্য্য চণ্ডের বংশধরদিগের মুখ্য কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যপালন করিতে যদি আমাদিগকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলেও এরূপ পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারি না। অতএব মহারাজ! পুরস্কার ফিরাইয়া লইতে আদেশ হউক। চণ্ডের বংশধর কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রভুর নিকট কদাচ কোন পুরস্কারের আশা করে না।" মহাতেজা শালুম্ব্রা সে পুরস্কার গ্রহণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। রাণার আগ্রহাতিশয্যদর্শনে তিনি কহিলেন, "মহারাজ! রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করিলে প্রভুর অবমাননা করা হয়, অতএব ইহার পরিবর্ত্তে আপনি আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব। আজি আমি রাজভবন হইতে যে কয়েকপাত্র আহারীয় উপহার পাইলাম, ভবিষ্যতে আপনি বা আপনার কোন বংশধর আমাকে বা আমার কোন বংশধরকে রজনীযোগে আহ্বান করিলে রাজবাটীর রন্ধনগৃহ হইতে যেন এইরূপ আহারীয়দ্রব্যের সংযোজনা করা হয়।" রাণা প্রীত হইয়া তাঁহার অনুরোধে সম্মতিদান করিলেন। সেই দিন হইতে মহাবীর চণ্ডের বংশধরগণ উক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

সংগ্রামসিংহের মহান্ চরিত্রের এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অষ্টাদশবর্ষকাল রাজত্ব করিয়া আত্মপদের গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক স্বরাজ্যের অনেক প্রকার মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। দেশবৈরীর আক্রমণ হইতে মিবার রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাণা সংগ্রামসিংহকে অষ্টাদশবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। সংগ্রামসিংহের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল সত্য, তথাপি তিনি মিবারের যে উপকারসাধন করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রজাবৃন্দ তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিত। প্রজার মঙ্গলসাধনে ও অভাবমোচনে তিনি নিরন্তর ব্যস্ত ও সতর্ক থাকিতেন। এই জন্য কি স্বদেশ কি বিদেশ সর্ব্বত্রই তিনি সমান সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। বীরকেশরী বাপ্পার পবিত্র বংশের উচ্চসম্মান যে গিহ্লোট-রাজগণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, রাণাই তন্মধ্যে শেষ রাজা। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মিবারে কঠোর মহারাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের সূত্রপাত হয়; ইহাই ভারতের অধঃপতনের মূলকারণ।

রাণা সংগ্রামসিংহের চারিটি পুত্র,—তন্মধ্যে (দ্বিতীয়) জগৎসিংহ ১৭৯০ সংবতে (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজপুতবলত্রয়ের পুনর্মিলন তাঁহার রাজত্বের প্রথম কার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাণা (দ্বিতীয়) অমরসিংহের উৎসাহেই এই বলের সমীকরণ হইয়াছিল। পরে অজিতসিংহের নির্ব্বুদ্ধিতাদোষে সেই ত্রিবলের মূলদেশে কুঠারাঘাত করা হয়। আজি জগৎসিংহ সুধাকুণ্ডের জলসেচনে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তিনটি নরপতিই স্ব স্ব উপাস্য দেবতার নামে শপথ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহারা ভ্রমেও মুসলমানের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধবন্ধনে উদ্যোগী হইবেন না এবং এই যে একতাসূত্র-বন্ধন হইল, কখনও সে একতাসূত্র ছিন্ন করিবেন না। মিবারের অন্তর্গত হুরলা নামক নগরীতে তাঁহারা স্ব স্ব অনুবল সহ উপস্থিত হইয়া উক্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। একতা সুদৃঢ় রাখিতে হইলে একজন উপযুক্ত নায়কের আবশ্যক;

সুতরাং সকলে একবাক্যে রাণাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিলেন ; তাঁহারই হস্তে সমস্ত রাজপুত-সেনার অধিনায়কত্ব সমর্পিত হইল। অতঃপর সেনাবল ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতে লাগিল। সম্মুখে বর্ষার আগমন। সকলে স্থির করিলেন, বর্ষাপগমে রাণা জগৎসিংহ সেই বিশাল রাজপুতসেনা লইয়া মোগলের প্রতিকূলে অবতীর্ণ হইবেন। * যুদ্ধোপযোগী সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত হইয়া থাকিল। দুর্ভাগ্যবশে সে আয়োজন কার্য্যে পরিণত হইল না। আয়োজন সমাপ্ত হইতে না হইতেই সেই সন্ধিসূত্রগ্রন্থি আবার শিথিল হইয়া পড়িল ; আবার সেই ত্রিবল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। রাজপুতের ক্ষমতাপ্রিয়তা একটি প্রকৃষ্ট গুণ বলিয়া গণ্য বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। আজি রাজস্থানের দুর্ভাগ্যবশে ইহা বিষময় ফল উৎপাদন করিল। রাজপুতের একতা পুনরায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। মোগলসাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতনসময়ে অম্বর ও মারবারের রাজগণ অসীম ক্ষমতা অর্জ্জনপূর্ব্বক মিবারের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কনক-সেনের বংশধরগণ রাজবারার অপরাপর রাজপুতগণের উপর অক্ষুণ্ণ প্রাধান্য ভোগ করিয়া আসিতে-ছেন ; কিন্তু তাঁহারা কোন কালে সকলের সমবেত সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই ; এই অভাবই তাঁহাদের একতার প্রধানতম বিঘ্ন ; এই অভাববশতই তাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, এই অভাবই তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রিয়তার বিষময় ফল। উক্ত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্বার্থলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিকূলে অসংখ্য অসংখ্যবার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মিবারের রাজগণ যেমন সকল বিষয়েই শীর্ষস্থানীয়, সেইরূপ যদি তাঁহাদিগকে অগ্রণীস্বরূপ মানিয়া সকলে এক অভিন্ন একতাসূত্রে সংবদ্ধ থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে কদাচ ভারতের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না ; তাহা হইলে বিদেশীয় শত্রু কদাচ ভারতের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ হইত না। রাজন্যসমিতির পরস্পরের বিদ্বেষভাবই ভারতের সর্ব্বনাশের মূল। যে মহদুপকরণে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জিত ও সংরক্ষিত হয়, তাহা নাই বলিয়াই রাজপুতগণের স্বাধীনতা-লিপ্সা ফলবতী হয় নাই ; আজ রাণা (দ্বিতীয়) জগৎসিংহের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্যের শোচনীয় অধঃপতনসময়ে উপযুক্ত সুবিধা থাকিতেও তাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

---

* সন্ধিপত্রে যেরূপ লিখিত ছিল, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা এই স্থলে পরিগৃহীত হইল।

স্বস্তি শ্রী। একতাবদ্ধ রাজগণ নিম্নলিখিত সন্ধিপত্রে সম্মত হইলেন। ইহার কোন বিধির ব্যভিচার হইবে না। সংবৎ ১৭৯১ [খৃষ্টাব্দ ১৭৩৫] ১৩ই শ্রাবণ। হরবা শিবির।

১ম সম্পদে বিপদে সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। সকলেই স্ব স্ব উপাস্য-দেবতার নামে শপথ করিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাসস্থাপন করিবেন। ভবিষ্যতে কেহই এই সূত্র বিচ্ছিন্ন করিবেন না। যে কেহ ইহার ব্যভিচার করিবেন, তিনি সকলেরই বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইবেন। এক ব্যক্তির সম্মানে সকলের সম্মান এবং একের অপমানে সকলের অপমান হইবে।

২য়। যিনি এক ব্যক্তির নিকট বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতীত হইবেন, তিনি সকলের বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইবেন। কাহারও নিকট তিনি আশ্রয় পাইবেন না।

৩য়। বর্ষাপগমে কার্য্য আরম্ভ হইবে ; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধিপতি রামপুরে সসৈন্যে উপস্থিত হইবেন ; কোন কারণে স্বয়ং আসিতে না পারিলে তিনি আপন কুমার বা কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে পাঠাইবেন।

৪র্থ। সেই কুমার অদূরদর্শিতাবশতঃ কোন বিষয়ে ভুল করিলে রাণাই কেবল তাহা সংশোধন করিবেন।

৫ম। যে কোন গুরুতর ব্যাপারে সকলেই একত্র হইয়া সেই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য।

নিজাম উল-মুলুক এক্ষণে অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরের সেনাপতি মোবারিজ খাঁ তাঁহার সেই সুদৃঢ় স্বাধীনতা ব্যর্থ করিতে গিয়া তাঁহার রোষানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইলেন। নিজাম অত্যন্ত চতুর, তিনি কলকৌশল করিয়া প্রথমে মোবারিজের সৈন্যদলের মধ্যে অসদ্ভাব সমুদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী না হওয়াতে অবশেষে তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুচতুর নিজাম সেই হতভাগ্য মোগল সেনাপতির ছিন্নমস্তক সম্রাট-সমীপে প্রেরণপূর্ব্বক কৌশল করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "দুর্ব্বৃত্ত রাজদ্রোহী হইয়াছিল, সেই জন্য মস্তকচ্ছেদন করিয়া আপনার সমীপে প্রেরণ করিলাম।" মহম্মদ শাহ নিজাম উল-মুলুকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার এরূপ ব্যবহারের প্রতিফল প্রদান করিতে পারিলেন না। স্বরাজ্যের অধীনতা দৃঢ়রূপে সংযত করিয়াই নিজাম রাজপুতগণের সহিত একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন এবং মালব ও গুর্জ্জরে মহারাষ্ট্রীয় সেনা চালিত করিতে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। সেই উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় বীর বাজিরাও সদলে সর্ব্বাগ্রে মালব আক্রমণ করিলেন এবং তত্রত্য শাসনকর্ত্তা দয়ারাম বাহাদুরকে * সমরে নিপাতিত করিয়া নিজামের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। অতঃপর অম্বরপতি জয়সিংহের করে মালবরাজ্য সমর্পিত হইল। অম্বররাজ আপনি না রাখিয়া বাজিরাওয়ের করে সেই মালবরাজ্য প্রদান করিলেন। এই প্রকারে মালব দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণের করগত হইল। অবিলম্বেই সুবিশাল গুর্জ্জররাজ্যেরও তদনুরূপ দশা ঘটিল। চঞ্চলমনা মোগলসম্রাট্ ইতিপূর্ব্বে রাঠোরগণকে গুর্জ্জররাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বায়প্রতিজ্ঞা পালন না করাতে অজিতসিংহের পুত্র অভয়সিংহ সেই রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তত্রত্য শাসনকর্ত্তা শিরবুলন্দ খাঁকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। এই অবসরে দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়গণ রাঠোররক্ষিত গুর্জ্জররাজ্য অধিকার করিলেন; রাঠোরপতি অভয়সিংহ সে দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। কেবল তিনি তৎপ্রদেশের উত্তরদিক্‌বর্ত্তী জনপদগুলি স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

রাজবারা প্রদেশে ও দক্ষিণাবর্ত্তে এইরূপ ঘোর সংঘর্ষ চলিতেছে, এ দিকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যারাজ্যে সুজা-উদ্দৌলা ও তাঁহার প্রতিনিধি আলিবর্দ্দি খাঁ অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। অযোধ্যা-রাজ্যের সৈয়দ খাঁর পুত্র সফদরজঙ্গ দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হইলেন। মোগলসম্রাটের প্রসাদে সৈদৎ খাঁ অযোধ্যাসিংহাসন লাভ করিল বটে; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত অচিরে সেই পবিত্র প্রসাদের অতি ঘৃণিত পুরস্কার প্রদান করিল। সৈদৎ খাঁ কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক। সেই দুরাচারই নিষ্ঠুর নাদির শাহকে ভারতে অভ্যর্থনা করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিল।

যে সময়ে মালব ও গুর্জ্জরে মহারাষ্ট্র-প্রভুত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণ অন্যান্য স্থানেও আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে সঙ্কল্প করিল; তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া নর্ম্মদা অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তরপ্রদেশসমূহ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। তাহাদিগের বিক্রমানলের প্রচণ্ড তেজে অনেকগুলি সামান্য সামান্য জাতিও উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগের অসীমবলের পুষ্টিসাধনপূর্ব্বক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। তখন প্রশান্তজীবন নিরীহ কৃষক † হলগোধন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অসি ও অশ্ব অবলম্বন করিল এবং অজপালক ‡ স্বীয় বেত্রযষ্টিকে

* দয়ারাম বাহাদুর মালবের পূর্ব্বশাসনকর্ত্তা গিরিধর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র।

† সিন্ধিয়ার পূর্ব্বপুরুষেরা কৃষক ছিলেন।

‡ হোলকার একজন অজপালক ছিলেন।

শোণিত ভস্মে পরিণত করিল। হুলকার, সিন্ধিয়া ও পুয়ারগণই * ঐ সকল সম্প্রদায়মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। এইরূপে অসীম বললাভ করিয়া দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়গণ হীনবল রাজপুতগণের রাজ্যমধ্যে আপতিত হইতে লাগিল এবং তৎসমস্ত প্রদেশ লুণ্ঠন ও উৎসাদন করিয়া পরিশেষে তাহাতেই অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিল। প্রয়োজনীয় কিংবা সুবিধাবশতঃ যত দিন তাহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একটি পতাকামূলে রণে সংলিপ্ত ছিল, তত দিন কেহই তাহাদের প্রদীপ্ত বিক্রমের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই; কেহই তাহাদের গতিরোধে সমর্থ হয় নাই। বীর-পুঙ্গব প্রথম বাজিরাও মহাশক্তির সাধনাবলে সেই অসীম মহারাষ্ট্রবল স্বীয় করে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে চম্বলনদ অতিক্রমপূর্ব্বক দিল্লীর তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুর্জ্জয় বিক্রমপ্রভাবে সেই মহানগরী কঠোররূপে বিদলিত ও মথিত হইল। অবশেষে ক্ষীণবল সম্রাট্ চৌথ অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার কঠোর উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। সম্রাটের এই প্রকার ভীরুজনোচিত আচার-দর্শনে নিজামের মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মিল। সম্রাটের উপর জয়লাভ করিয়া পাছে দুর্দ্দম মহারাষ্ট্রীয়দল তাঁহার নিজামরাজ্যে আপতিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদিগকে মালবরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, মহারাষ্ট্রগণ মালবপ্রদেশে একবার সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে আর তাহাদিগকে কেহই সহজে তথা হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবে না; তাহা হইলে তাহারা উত্তরপ্রদেশের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। এই বিবেচনায় তিনি মালবরাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং বাজিরাওকে পরাভূত করিয়া পূর্ব্ব আশঙ্কার অঙ্কুশতাড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। বিজয়ী নিজাম পরাভূত মহারাষ্ট্রকে তৎপ্রদেশ হইতে বিদূরিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে সংবাদ আসিল যে, মহাবীর দুর্জ্জয় নাদির শাহ স্বীয় বিজয়িনী সেনাসহ ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছেন। শ্রবণমাত্র নিজামের মনে আর একটি মহা-ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মহারাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজামরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। যে সময়ে দুর্জ্জয় বীর নাদির শাহের প্রচণ্ড তূর্য্যধ্বনি ভারতের পশ্চিমসীমায় শ্রুতিগোচর হইল, তখন মোগলসম্রাটের বিক্রমাগ্নি প্রায় সম্পূর্ণই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নাদিরের সেই ভীষণ ভেরীনাদে সমগ্র ভারত ভূকম্পনের ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইয়া উঠিল, দুর্ভাগ্য মহম্মদ শাহের রত্নকিরীট অকস্মাৎ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; কোথা হইতে বিকট আর্ত্তনাদ অবিরত শ্রুত হইতে লাগিল। এই দারুণ সঙ্কটসময়ে—মোগল সাম্রাজ্যের এই অনিবার্য্য অধঃপতনকালে ভাগ্য-হীন মহম্মদ শাহ রাজপুতগণের বিক্রমের প্রতি মনে আশা বাঁধিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। যে রাজপুতগণের বিক্রমের আনুকূল্যে ভারতবক্ষে মোগল-সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছিল, যাঁহারা মোগলের সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এত দিন অম্লানমুখে হৃদয়-শোণিত দান করিয়া আসিতেছেন, আজি সেই সিংহাসনের সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের উচ্চ-শ্রেণীস্থ এক জন মাত্রও তাঁহার রক্ষার্থ অসিধারণ করিলেন না। সুতরাং কর্ণালের কাল-সমরে মোগলের ময়ূর-সিংহাসন স্খলিত হইয়া গেল; সেই সঙ্গে ভারতের কঠোর ভবিতব্যতা মহম্মদ শাহের ললাটফলকে জ্বলদক্ষরে লিখিত হইল।

* মালবাক্রমণের সময়ে বাজিরাও উদাজি পুয়ার, মুলহররাও হোলকার এবং রণজী সিন্ধিয়ার উপর সেনাচালনের ভার প্রদান করিয়াছিলেন, ইহারা সময়ে স্বপ্রধান হইয়া এক একটি বিখ্যাত বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

কর্ণাল-সমরের শোচনীয় পরিণামদর্শনে নিজাম ও সৈদৎ খাঁর মনে ঘোরতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহারা সেই বিজয়ী বীরকেশরীর ভীষণবল প্রতিরোধ করিবার জন্য মোগল-সেনাপতির সহিত আপনাদিগের উভয় সেনাকে একত্র করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল। আমির উল-ওমরা রণভূমে শয়ন করিলেন এবং মন্ত্রী সহ হতভাগ্য সম্রাট্ বন্দী হইয়া জেতার পদতলে নীত হইলেন। পাষণ্ড মন্ত্রীর কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা বশতই আজি সম্রাটের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিল। হতভাগ্য মহম্মদ সন্ধিবন্ধনের জন্য নিজামকে দূতস্বরূপ নাদির শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। সন্ধিবন্ধন একরূপ ধার্য্য হইয়া গেল। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পাপাত্মা সৈদৎ খাঁ চক্রান্ত করিয়া সমস্তই বিফল করিয়া দিল, পরিশেষে নিজহস্তে আপনারই পদে কুঠারাঘাত করিল। দুরাচার সৈদৎ খাঁ নাদিরের অর্থলিপ্সা বর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট কহিল, "নিজাম আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছে, রাজকোষে তাহা অপেক্ষা অধিক ধন আছে।" পাপিষ্ঠ আরও কহিল যে, নিজাম নিষ্ক্রয়স্বরূপ যে পণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, সে একাকী সেই ধন স্বীয় ধনভাণ্ডার হইতে প্রদান করিতে পারিত।" ক্রূরমতির কথায় নাদিরের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিল; তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠিল। নিজামের সহিত যে সন্ধি ধার্য্য করিয়াছিল, তাহা বিফল হইল; নাদির দিল্লীর কোষাগারের সমস্ত চাবি-কাঠি চাহিল হতভাগ্য মহম্মদের সমস্ত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; অর্থপিশাচ নাদিরের কথায় সন্ধিপত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আর অধিক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না, কিন্তু তাঁহার সকল আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। দুর্ব্বৃত্ত নাদির বিজিত সম্রাটকে মহাদম্ভের সহিত স্বীয় শিবিরশ্রেণীর মধ্য দিয়া লইয়া গেল এবং মহাবীর তৈমুরের সিংহাসনারূঢ় হইয়া ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের অষ্টমদিবসে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করিল। সেই মুদ্রায় এইরূপ লিখিত ছিল—

"সর্ব্বাধিরাজের রাজা এ ভারতমাঝারে।
নাদির রাজার রাজা শাসিবে সবারে॥"

মোগলসাম্রাজ্যের ভীষণ অন্তর্বিপ্লবসময়ে অগণিত অর্থ ব্যয়িত হইলেও এবং প্রতিকূল রাজপুত্রগণ স্বেচ্ছাক্রমে অবিরত পুরস্কাররাশি ঢালিয়া দিলেও রাজভাণ্ডারে যে অতুল অর্থ সংগৃহীত ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইলে নাদিরের দুরাকাঙ্ক্ষাও সুসিদ্ধ হইতে পারিত, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, দুর্দ্দান্ত নাদিরের দুর্দ্দম অর্থলিপ্সা কিছুতেই পরিতৃপ্ত না হইয়া শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। তখন সে চতুর্দ্দিকে ঘোষণা প্রচার করিল যে, "আরও সার্দ্ধ-দ্বি-ক্রোর টাকা না পাইলে আমি ভারত ত্যাগ করিব না, যেরূপে হউক, অচিরেই তাহা আদায় করিতে হইবে। ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র কৃতান্তসদৃশ পারসীকগণ তরবারি-হস্তে নগরের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল এবং ঘোরতর অত্যাচার ও নিদারুণ উৎপীড়নের সহিত নাগরিকগণের ধনরত্ন হরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের পাশব প্রপীড়নে নগরমধ্যে মহা হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। উৎপীড়িত নাগরিকগণ দাবদগ্ধ কুরঙ্গদলের ন্যায় প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় পলায়ন করিবে? কে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবে? কেহই নাই। সকলেরই ভুজবল আজি দানব নাদিরের নিকট অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে;—সকলেই আজি আত্মরক্ষার উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। কেহই সেই সকল পিশাচের উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না, পলায়ন করিয়াও কেহ পরিত্রাণ পাইতেছে না, রাক্ষসগণ, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাদিগের সামান্য সম্বল—পাথেয়মাত্র হরণ করিয়া লইতেছে! তাহাদের জীবনস্বরূপিণী রমণীগণের উপর পাশব উৎপীড়ন করিতেছে। হায়! দিল্লী নগরীতে

আজি নাগরিকবৃন্দের জীবন ও মানমর্য্যাদা শত্রুর পদতলে দলিত হইতেছে। যথাসর্ব্বস্ব লুন্ঠিত হইল। যাঁহারা সম্ভ্রান্ত, যাঁহারা অপমানকে মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা পাষণ্ড উৎপীড়কগণের হস্তে আপনাদিগের মানসম্ভ্রম রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া প্রাণস্বরূপিণী রমণীগণের হৃৎপিণ্ডচ্ছেদন করিয়া পরে সেই শোকাগ্নিতে আত্মপ্রাণ আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ আত্মহত্যা ব্যতীত সেই ভীষণতম অপমান হইতে পরিত্রাণের আর অন্য উপায় রহিল না। এই প্রলয়সময়ে জনরব উঠিল যে, নরপিশাচ নাদির শাহ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই জনশ্রুতি দিল্লীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। দেখিতে দেখিতে অগণ্য নাগরিকগণ উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া নিষ্ঠুর পারসীকগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। প্রাণের প্রতি কাহারও মমতা নাই, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; প্রতিফল দিবার জন্য সকলে পাষণ্ড শত্রুদলের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে পশুবৎ নিধন করিতে লাগিল। সেই সময় উভয়দলে ঘোরতর বিবাদ বাধিল। নাগরিক ও পারসীকগণের শবদেহে দিল্লীর পথঘাট সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল,—শোণিতস্রোতে সমস্ত স্থান পঙ্কিল হইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই বৃত্তান্ত রাক্ষস নাদির শাহের শ্রবণগোচর হইল। দুর্ব্বৃত্ত একটি মসজীদ-শিরে আরূঢ় হইয়া আপনার নিরুৎসাহ সৈন্যগণকে বিপুল উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুলিল এবং নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই বধ করিতে আদেশ প্রদান করিল। এই কঠোরতম অনুমতি প্রচারমাত্র নররাক্ষস নাদিরের পিশাচসদৃশ সৈন্যগণ ভীম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নগরের দ্বারে বিচরণপূর্ব্বক সকলকে পশুবৎ বধ করিতে লাগিল। আর্ত্তনাদে সমগ্র নগরী প্রতিনাদিত হইতে লাগিল। নগরের রথ্যামধ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এ দিকে দুর্ব্বৃত্তগণ নাগরিকবৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিল এবং সেই সকল দহ্যমান গৃহের জ্বলন্ত অগ্নিরাশির উপরিভাগে মৃত, অর্দ্ধমৃত ও জীবিত ব্যক্তিগণকে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। দিল্লী নগরী আজি শ্মশান অপেক্ষাও ভীষণতর বিভীষিকাময় নরককুণ্ডে পরিণত হইল। এই বীভৎস ও শোকোদ্দীপক জঘন্য কাণ্ডের অভিনয়মধ্যে যদি স্বল্পমাত্র প্রীতিকর দৃশ্য হইয়া থাকে, তাহা কেবলমাত্র দুর্ব্বৃত্ত সৈদৎ খাঁর শোচনীয় পরিণাম।

সেই রোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয়সময়ে নাদির শাহ পাষণ্ড সৈদৎ খাঁর মন্ত্রীকে অনুমতি করিল, "তোমার ও সৈদৎ খাঁর যে কিছু বিষয়বিভব আছে, তাহার একটি প্রকৃত তালিকা আমি এখনই দেখিতে চাই; যদি না পাই, এই মুহূর্ত্তেই তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব।" নিজাম যে সার্দ্ধত্রিক্রোর টাকা পণস্বরূপ অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, নাদির একমাত্র মন্ত্রীর নিকট তাহা চাহিল। এই কঠোর আজ্ঞা শ্রবণমাত্র দুরাচার সৈদৎ খাঁ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। তাহার আশাভরসা সমস্ত বিলুপ্ত হইল। মদমত্ত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত যে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, তাহা সে এত দিন উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কিন্তু আজি তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, আজি সে বুঝিতে পারিল যে, নাদিরকে ডাকিয়া সে আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়াছে। শোক, দুঃখ, ভয় ও নৈরাশ্যের বিষদংশনে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইল; যে দিকে দৃষ্টিপাত করিল, সেই দিকেই অসংখ্য বিভীষিকা দেখিতে পাইল। সেই দিক্ হইতেই যেন ভীমমূর্ত্তি যমদূতগণ ভীষণ বৃশ্চিকযষ্টিকরে তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল। এই সমস্ত বিকটযন্ত্রণা অবসান করিবার জন্য হউক কিংবা নাদিরের রোষাগ্নি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই হউক, মন্দভাগ্য সৈদৎ খাঁ বিষপানে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিল। তাহার দেওয়ান রাজা মজলিশ রাও অবলম্বিত কঠোর উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক

নাদিরের কোপাগ্নি হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। এই রোমহর্ষণ নাটকের শেষ অঙ্ক ঐরূপে অভিনীত হইলে পিশাচ নাদিব হতভাগ্য মহম্মদ শাহের প্রদত্ত সন্ধিপত্র গ্রহণ করিল এবং ভারতের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া বসন্তকালে শ্মশানসদৃশ দিল্লী নগরী হইতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। সেই সন্ধিপত্রানুসারে কাবুল, টাট্টা, সিন্ধু ও মূলতান প্রভৃতি পশ্চিমরাজ্যসমূহ নাদিরকরে সমর্পিত এবং পারস্যেব অন্তর্ভুক্ত হইল। ভারতের এই সার্ব্বজনীন সংঘর্ষ ও শোচনীয় সঙ্কটসময়ে ভারতীয়গণেব কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক বাক্যকয়টি পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারিবে ইতিহাসে লিখিত আছে, হিন্দুস্থানের অধিবাসিবৃন্দ এই সময়ে কেবল আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রীতির বিষয়ই ভাবনা করিত। যাহারা যন্ত্রণার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইত, তাহারা আর সে বিষয় চিন্তা করিত না; যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপরতারই সেবা করিত, সে কোন ব্যক্তির সহিত আদৌ সহানুভূতি প্রকাশ কবিত না। স্বার্থপরতা আত্ম ও পবমধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিঘ্ন। এই স্বার্থপরতা নাদিব শাহের অভিযানসময়ে হিন্দুস্থানে সকলেবই আশ্রয়েব স্থান হইয়া উঠিয়াছিল; সেই নৈতিকবলের হীনতাবশতঃ ভাবতবাসী যে ধর্ম্মবল হইতে স্খলিত হইল, পুনরায় আর তাহা লাভ করিতে পারিল না; ক্রমে তাহারা অবনতিব অধস্তনকূপে নিমগ্ন হইতে লাগিল; সুতরাং সুখ ও স্বাধীনতার মধুর আস্বাদনে তাহারা সেই দিন হইতেই বঞ্চিত হইল।

এইরূপ মহাসংঘর্ষের সময়েও আর্য্যবীর রাজপুতগণ স্ব স্ব প্রাচীনরাজ্য হইতে পদভ্রষ্ট হন নাই। আজিও তত্তৎরাজ্যের অধিপতিগণ ব্রিটিশসিংহের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা-সুখ-সম্ভোগ করিতেছেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীব প্রাক্কালে বীবকেশবী দুর্দ্ধর্ষ মহম্মদ গজনন যখন মিবারভূমি আক্রমণ কবিয়াছিলেন, তখন ইহার চতুঃসীমা যতদূব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আজি সপ্তশতাব্দী পরেও ঠিক তদ্রূপ বহিয়াছে। যদিও বুন্দি, আবু, ইদর ও দেবল প্রভৃতি গুটিকতক করদরাজ্য রাণার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রাচীনবাজ্য প্রায় পূর্ণাঙ্গে বিদ্যমান আছে। পশ্চিমে গদবার প্রদেশের উর্ব্বরক্ষেত্রে মিবারের প্রাকৃতিক সীমাবন্ধন আরাবলী গিরিশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক অবনতশিরে রাণার প্রভুত্বকীর্ত্তনে নিরত; সুপ্রশস্ত চম্বলনদ তাহার পূর্ব্বসীমা বিধৌত করিয়া সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কনকসেনেব বংশধবগণের শোচনীয় বর্ত্তমান অধঃপতনকাহিনী সুরধুনী ভাগীরথীকে বিজ্ঞাপন করিতে কলকলনাদে প্রবাহিত, উত্তবে ক্ষীবি নদী অজমীর ও মিবারের মধ্যভাগে অধিষ্ঠিতা এবং দক্ষিণে বিস্তৃত মালবরাজ্য মহারাষ্ট্রপীডনে একান্ত দীনভাবে নিপতিত। এই চতুঃসীমার অন্তর্গত প্রদেশের দ্রাঘিমা এক শত চল্লিশ এবং অঘিমা এক শত ত্রিশ মাইল। ইহাতে দশ সহস্র নগর ও পল্লী সুশোভিত। মিবাবভূমি রত্নগর্ভা; ইহার ক্ষেত্র অতীব উর্ব্বর,—কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে বিশেষ পাবদর্শী এবং বণিকগণ বাণিজ্যব্যবসায়ে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট। সেই সকল কার্য্যদক্ষ প্রজাগণের সাহায্যে মিবারেব প্রতিবর্ষে দশ কোটি টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইত। এ দিকে অতিভক্ত ও অনুরক্ত সামন্তবৃন্দ আত্মহৃদয়ের শোণিতদান করিয়াও মিবারভূমিকে শত্রু-আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিতেন। পূর্ব্ববর্ণিত দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সংঘর্ষের শেষ হইলে স্বাধীনতার লীলাভূমি প্রাচীন মিবাররাজ্যের ঐরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল।

দুষ্টমতি ও কুচক্রী মন্ত্রিবৃন্দের উপর নির্ভব করিয়া যে দিন সম্রাট্ মহম্মদ শাহ মহারাষ্ট্রীয়গণকে আপনার রাজস্বের চতুর্থাংশ পণস্বরূপ প্রদান করিলেন, সেই দিন বিশাল রাজবারাদ্যমে দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রগণের প্রভুত্বের পথ পরিষ্কৃত হইল। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। রাজস্থান মোগল-সম্রাটের অধীন, মহারাষ্ট্রগণ [illegible] সম্রাটের নিকটেই চৌথ গ্রহণ করিল, তখন যে তাহারা

মোগলাধীন সমস্ত রাজ্য হইতেই ঐরূপ পণ আদায় করিতে পারিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা জয়শীল; তাহারা যাঁহার প্রতিকূলে আপনাদের প্রচণ্ড সেনা চালিত করিয়াছে, তিনিই করযোড়ে তাহাদিগের পদতলে চৌথ প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্রীয়সিংহের প্রসাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। ঈদৃশী অবস্থায় বিজিত রাজবৃন্দের নিকট কর আদায় করিবার জন্য বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়-বৃন্দ শুদ্ধ পাশববলকেই একমাত্র সাধন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল কি না, তাহা উপলব্ধি করা দুরূহ, কিন্তু তাহারা যে মহম্মদ শাহের এরূপ করদানকে আপনাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির একটি প্রধান দ্বারস্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রচণ্ডবিক্রমে ধীরে ধীরে জয়লাভ করিতে লাগিল, এ দিকে রাজপুতগণের মনেও মহাভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহারা সেই ভয়ের অঙ্কুশতাড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য পুনরায় সকলে একতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে উক্ত একতাবন্ধন বৈবাহিকসম্বন্ধসূত্র দ্বারা সংবদ্ধ হইল। রাণা জগৎসিংহ মারবারের উত্তরাধিকারী বিজয়সিংহের হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক উক্ত একতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মারবার ও অম্বরের রাজকুলের মধ্যে যে ঘোরতর বিবাদ-বিসংবাদ প্রচলিত ছিল, তাহা দূর করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে একত্র করিয়া দিলেন। উদয়পুরের সভাতলে এই একতা-বন্ধন বিধিবদ্ধ হইল। * কিন্তু সেই একতাবন্ধন হইতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইল না, সেই

* এই সময়ে রাজবারার ভিন্ন ভিন্ন রাজা, রাজপুত্র ও রাজপুরুষেরা রাণাকে যে কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, তৎসমুদায়ের সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

প্রথম পত্র।

(মারবারের রাজপুত্র বিজয়সিংহ শ্রীশ্রীমহারাণা-সমীপে প্রেরণ করেন)

মহারাণা-সকাশে আমার সবিনয় নমস্কার! রাবৎ কিশোরীসিংহ ও বিহারীদাসকে আমার কাছে পাঠাইয়া এবং একটি শুভবিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে আদেশ করিয়া আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনার আজ্ঞা ভবদীয় সন্তানের শিরোধার্য্য। আমি আপনার ভৃত্য। আপনার সকল আজ্ঞাই আমি পালন করিতে বাধ্য। অধুনা আমি আপনার সন্তান এবং যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎ আপনারই থাকিব। আমি যদি প্রকৃত রাজপুত হই, তাহা হইলে আমার মানাপমান ও জীবনমরণ সকলই আপনার উপর নির্ভর করিবে। বিংশতি সহস্র রাঠোর অদ্য আপনার অনুগত ভৃত্য হইল, যদি আমি এ কার্য্যে কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে জগৎপাতা জগদীশ্বর আমাদিগকে শাস্তিদান করিবেন। আমার সহিত যাঁহার শোণিত-সম্বন্ধ আছে, তিনিই আপনার আজ্ঞাপালন করিবেন। এক্ষণে নিবেদন, এই শুভবিবাহের যে ফল উৎপন্ন হইবে, সে রাজসিংহাসন লাভ করিবে; যদি কন্যা হয় এবং সেই কন্যাকে তুর্কীর হস্তে সম্প্রদান করি, তবে আমি প্রকৃত রাজপুত নহি। আপনার পরামর্শানুসারে সে একটি সৎপাত্রে প্রদত্ত হইবে। এমন কি, যদি শ্রীভাণোজি (তাঁহার পিতার উপনাম) কিংবা অন্য কোন সম্মানার্হ ব্যক্তি সেইরূপ করিতে অনুরোধ করেন, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইব না। অপরে সম্মতি দান করুক আর না করুক, আমিই সম্প্রদানকর্ত্তা; ইতি বৃহস্পতি-বার, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, সংবৎ ১৭৯১।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভক্তসিংহের পুত্র কুমার বিজয়সিংহের শুভপরিণয়ের উক্ত অনুষ্ঠানপত্র রাবৎ কেশরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং পাঞ্চোলী লালজী দ্বারা অঙ্কিত।

পরস্পর-বিরোধী বন্ধন দ্বারা চিরন্তন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব পুনরুদ্ভূত হইয়া সেই একতাবন্ধন ছেদন করিয়া ফেলিল! এমন কি, যে সময়ে উক্ত সন্ধির বিষয় লইয়া রাজপুতবৃন্দের মধ্যে আন্দোলন

দ্বিতীয় পত্র।

(বিজয়সিংহের নিকট রাণা জগৎসিংহের সমীপে)

"অত্রত্য মঙ্গল! আপনার অনুগ্রহ ও মিত্রতা চিরদিন সমান রাখিবেন এবং আপনার মঙ্গল-সংবাদ আমাকে জানাইবেন; আপনার অনুগ্রহে আমি রাজপুত হইয়াছি। সাধ্য অনুসারে আপনার সেবা করিতে আমার ক্রটি হইবে না। আপনি কুলপতি, যোগ্যতা দেখিয়া তদনুসারে সকলকে পুরস্কারদান করিয়া থাকেন। আপনি প্রতিবেশিগণের রক্ষক ও পালক, আপনি শত্রুবিনাশন, বিদ্বান্ ও ব্রহ্মার ন্যায় প্রজ্ঞাশীল। ত্রিলোকনাথ আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করুন। ইতি ১৩ই আষাঢ়।""

তৃতীয় পত্র।

(রাজা ভক্তসিংহ রাণা-সমীপে প্রেরণ করেন)

"মহারাণা শ্রীশ্রীজগৎসিংহের নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আপনি আমাকে প্রকৃত রাজপুত করিয়া তুলিয়াছেন। এই প্রকার আচরণ দ্বারাই আপনার সুনাম জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আপনি দেখিবেন, সাধ্যমত কোন কার্য্যই সাধন করিতে আমি কখন ক্রটি করিব না। যে দিন আপনার সাক্ষাৎ পাইব, সে দিন আমার আনন্দের অবধি থাকিবে না। আপনার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য হৃদয় একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে ইতি।"

চতুর্থ পত্র।

(শোবে জয়সিংহ রাণা সমীপে প্রেরণ করেন)

"শোবে জয়সিংহের নমস্কার মহারাণা জানিবেন। শ্রীদেওয়ানের আজ্ঞানুসারে আমি আপনার মারবারের অভয়সিংহের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে সংবদ্ধ হইয়াছি। হিন্দু কিংবা মুসলমান কাহার জন্যই আমি সৌহার্দ্দ হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইব না। এ সংবদ্ধপত্রে ঈশ্বর শ্রীদেওয়ানজী আমাদিগের উভয়ের সাক্ষী। ইতি ৭ই আষাঢ়।"

পঞ্চম পত্র।

"আপনার খাসরোকা প্রাপ্ত হইলাম, উহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। জয়সিংহের ও আমার সংবদ্ধপত্র আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকিবে। আপনার আজ্ঞানুসারে আমি তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছি। চিরদিন এই বন্ধুত্ব আমি রক্ষা করিব; কারণ, আপনি যখন প্রতিভূ-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট, তখন এ বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পরে না। অধুনা আপনি তাঁহার প্রতিভূ-গ্রহণ করুন। পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধু যাহার চক্ষেই আপনি আমায় দেখুন, আমি আপনারই। আপনাকে না পাইলে আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোত্র কিছুতেই আমার আবশ্যক নাই।"

ষষ্ঠ পত্র।

(রাজা অভয়সিংহ রাণার নিকট প্রেরণ করেন)

"মহারাজ অভয়সিংহ মহারাণা জগৎসিংহ-সকাশে সবিনয়ে পত্র প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার মুজরা [উচ্চের প্রতি নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সম্ভ্রম] গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর আমাদিগের কার্য্যের সাক্ষী,

চলিতেছিল, সেই সময় তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন একতাবন্ধনের বিষময় ফল উৎপন্ন হইল; আবার রাজপুত সমাজে অনৈক্যের সূত্রপাত দৃষ্ট হইল।

মহারাষ্ট্রীয়গণ মালব অধিকার করিল, তত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট চৌথ সংগ্রহ করিতে লাগিল, এ দিকে বাজিরাও সসৈন্য মিবাররাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া সমগ্র মিবারভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল।* রাণা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; শালুম্ব্রা

আমাদিগের উভয়ের মধ্যে যে কেহ এই আবদ্ধবন্ধন ছিন্ন করিবেন, তাঁহারই যেন অমঙ্গল ঘটে। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমরা একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছি; একমন হইয়া এই সকল বন্ধন ঠিক রাখিব। স্বার্থপরতা যেন আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন না করে। আপনার সর্দ্দারেরা আমাদিগের সাক্ষী। যিনি প্রকৃত রাজপুত, তিনি কদাচ এই সম্বন্ধবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ইতি ৩রা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।"

---

* মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণসময়ে রাণা জগৎসিংহ স্বীয় মন্ত্রী বিহারীদাস পাঞ্চোলীকে নিম্নলিখিত পত্র কয়খানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রথম পত্র।

"স্বস্তি শ্রী:—মন্ত্রিপ্রবর পাঞ্চোলীজী! আমার জুহর (নিম্নপদস্থের প্রতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্ভাষণ) জানিবেন। আমি সর্ব্বদাই আপনার চিন্তা করি। দাক্ষিণাত্যব্যাপার সম্বন্ধে আপনি উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু যদি পেশোয়ার সহিত যুদ্ধ একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা যেন দেবলজনপদের দূরে হয়। সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দিবেন, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে অর্থের অভাব হইবে না। গতবর্ষের অনুসারে রামপুরের বন্দোবস্ত করিবেন এবং দৌলতসিংহকে জানাইবেন যে, এরূপ সুবিধা আর ঘটিবে না। জননী অধুনা অসুস্থ। গরারো ও গজমাণিক যুদ্ধে বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে এবং সুন্দর গজ সহস্রপ্রকার কৌশল দেখাইয়াছে। আপনার অনুপস্থিতি নিবন্ধন আমি দুঃখিত। অধুনা শোভারামকে কি প্রকারে পাঠাইয়া দিব? ইতি ৬ই আষাঢ়, সংবৎ ১৭৯১ (খৃষ্টাব্দ ১৭৩৫)"

দ্বিতীয় পত্র।

"ইহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিতেছে না; অতএব তাহাদের প্রাপ্য টাকার তালিকা এবং কতকগুলি সাক্ষ্য পাঠাইবেন। বাজিরাও আসিয়াছেন। জমীর দাওয়া ভিন্ন তিনি আমার নিকট হইতে পণ লইয়া আপনার প্রতিপত্তি বাড়াইবেন। আমার রাজ্যের সহিত তিনি গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছেন এবং অপরাপর রাজাপেক্ষা তিনি আমার নিকট বিশগুণ অধিক লইবেন;—যদি নিয়মিত হয়, দিতে সম্মত হইতে পারি। গত বৎসর মূলহর আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে ফল নাই। বাজিরাও তদপেক্ষা বলবান্। ঈশ্বর যদি আমার প্রার্থনায় করুণা করেন, তাহা হইলে তিনি আমার ভূমি লইতে পারিবেন না। আর আর সমস্ত বিষয় দেবীচাঁদের নিকট অবগত হইবেন। ইতি বৃহস্পতিবার, ১৭৯২ সংবৎ।"

তৃতীয় পত্র।

"আপনার তুল্য মহাত্মা রাজা বিদ্যমানে আমি ইহার স্থায়িত্বসম্বন্ধে মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করি না। কিন্তু এ দারিদ্র্যে তামসী ছায়া কি জন্য? হয় ত আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,

সর্দ্দার ও আপনার প্রধান মন্ত্রী বিহারীদাসকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। এ দিকে বাজিরাওকে কিরূপ সম্মানে গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কিরূপ আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় লইয়া রাজসভাতলে মহা বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। নানা তর্কবিতর্কের পর সকলের মতে স্থির হইল যে, তিনি সিংহাসনের সম্মুখভাগে বুনেরা রাজ্যের তুল্য আসনে উপবেশন করিবেন। * বাজিরাও সেইরূপ সম্মানে গৃহীত হইলেন। অবিলম্বেই উভয়পক্ষে একটি সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সেই সন্ধি অনুসারে স্থির হইল যে, রাণা তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক ১৬০০০০ টাকা কর দিবেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ দশবর্ষ পর্য্যন্ত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধি পালনপূর্ব্বক নির্দ্ধারিত কর লইয়াই স্থির ছিল; কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। মিবারের সমস্ত রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে তাহাদিগের ইচ্ছা হইল; অবিলম্বেই তাহারা সেই সন্ধিপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কাজে কাজেই সন্ধিবন্ধন সম্পূর্ণ কার্য্যকর হইল না।

যে সূক্ষ্ম সূচিভেদ্য ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা শনৈঃ শনৈঃ বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল, সে ছিদ্র আর কিছুই নহে, কেবল রাজপুতগণের পরস্পর অনৈক্য। কি প্রকারে যে সেই অনৈক্যের বীজ রাজবারা-প্রদেশে রোপিত হইল, তাহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। রাণা অমরসিংহ অম্বর-রাজকুমার জয়সিংহের হস্তে আপনার কন্যাসম্প্রদানের সময় অম্বরপতিকে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, সেই শুভ সম্মিলন হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহাকে অগ্রজস্বত্ব প্রদান করিতে হইবে। অধুনা সেই বিবাহের ফলস্বরূপ মধুসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাষণ্ড নাদির শাহের সর্ব্বনাশকর অভিযানের দুই বর্ষ পরে মহারাজ শোবে জয়সিংহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরীসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু একটি মহাবল সম্প্রদায় অম্বরপতির পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে রাণার ভাগিনেয় মধুসিংহকে জ্যেষ্ঠত্বে বরণ করিয়া সিহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। চিরন্তন উত্তরাধিকারিত্ব বিধির বিপর্য্যয় করিয়া কনিষ্ঠ মধুসিংহকে

আপনি কি দোষে দোষী যে, সেই জন্য উঠিতে বসিতে আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে? ইহার উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, অর্থই সর্ব্বপ্রধান। উপস্থিত গণ্ডগোল আপনি ব্যতীত আর কাহারও দূর করিবার সাধ্য নাই এবং অন্যরূপ প্রতিজ্ঞাও আবশ্যক দেখি না। আপনি বলিতে পারেন যে, আপনার কাছে কিছুই নাই, তবে কেমন করিয়া আপনি সে সকল গণ্ডগোল নিবারণ করিতে পারিবেন? যদিও আপনি কিছুদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূরে গিয়াছেন, তথাপি প্রায় নিরন্তর বোধ হয় যেন, আপনি আমার কাছেই আছেন; কিন্তু অধুনা যদি আরও নিকটে আসিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়; কারণ, তাহা হইলে আমি টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। আপনার কাছে এ দাসের কিছুই গোপন নাই। সুতরাং আপনার অর্থসঞ্চয় করা বিফল, ইহাতে সন্দেহের উদয় হয়। আপনি বিশ্বস্তপাত্রে অনেকগুলি রত্ন ও তমসুক পাইবেন, আমার কাছে সেগুলি লইয়া আসিবেন। এ সমস্ত গোলযোগ দূর করিবার ইহা ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না। আপনি জ্ঞানী, আপনাকে আর অধিক কি জানাইব? পরিণাম ভাবিয়া দেখিবেন এবং জানিবেন যে, আমি আর দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করিব না।"

* রাজসিংহের পুত্র ভীমের বংশধর। বাজিরাও যে আসন প্রাপ্ত হন, তাহা পরিশেষে ব্রিটিশপ্রতিনিধিগণের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে জয়সিংহের ইচ্ছা ছিল কি না, তাহা নিরূপণ করা কঠিন, তবে মধুসিংহ যে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লালিত হন নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তাহা হইলে তিনি রাণা সংগ্রাম-প্রদত্ত রামপুরজনপদ নিয়মিত সামন্তপ্রথার অনুসারে ভূমিবৃত্তিস্বরূপ ভোগ করিতেন না। কিন্তু এ দিকে অনুজ্ঞাপত্রে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। তথায় তিনি টিমা অর্থাৎ যুবরাজের স্বত্ব লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক এই সমস্ত বিষয় লইয়া কোন প্রকার তর্কবিতর্ক বা গণ্ডগোল উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরীসিংহ পাঁচ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি দুর্জ্জয় দুরাণীদিগের * আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে শতদ্রুর সৈকতভূমে গমন করিয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত অম্বর-ইতিহাসে সঙ্কলিত।

মধুসিংহের স্বার্থসংরক্ষার অভিলাষে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাণা সসৈন্যে ঈশ্বরীসিংহের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অচিরে উভয়দলে মহাযুদ্ধ বাধিল। শিশোদীয়বীরগণ ঈশ্বরীসিংহকে পরাভূত করিতে গিয়া পরিশেষে আপনারাই পরাজিত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের অনুৎসাহিতাই এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ। বোধ হয়, অন্যায় পক্ষ সমর্থন করা সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ, এই জ্ঞানে তাঁহাদের হৃদয় উত্তেজিত হয় নাই। রাণার সৈন্যদল রণে পরাভূত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। এ প্রকার পরাজয়ে রাণা একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাদলের নিরুৎসাহিতাই সেই অবমানকর পরাজয়ের মূলীভূত কারণ, তখন তিনি রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি গিহ্লোটবংশের প্রচণ্ড অসি একটা সামান্য বারাঙ্গনার হস্তে স্থাপনপূর্ব্বক ব্যঙ্গোক্তিচ্ছলে কহিলেন, "এ প্রকার অধঃপতিত দশায় এই অস্ত্র রমণীরই ব্যবহার্য্য।" এই ব্যঙ্গবচন মিবারভূমির দ্রুত অধঃপতনকালের সম্পূর্ণ উপযুক্ত মিবারবাসিগণের হৃদয়ে তাহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। এমন কি, আজিও অনেকে তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

গত যুদ্ধে কোটা ও বুন্দির হারগণ রাণার সহায় হইলেন, সেই জন্য ঈশ্বরীসিংহ তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিবার ইচ্ছায় আপাজি সিন্ধিয়ার সহায়তা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; হারগণ মহাবিক্রমে সে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। সেই সংগ্রামে আপাজি সিন্ধিয়ার একটি হস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই যুদ্ধে যে ফল হয়, তাহাতে উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল, এবং উভয় রাজাই সিন্ধিয়ার উদরপূরণার্থ করদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনস্তাপে সন্তপ্ত হইয়া রাণা প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য মূলহর রাও হোলকারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির করিবার সময় তিনি তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন যে, হোলকার যদি ঈশ্বরীসিংহকে

* কান্দাহার জয়কালে নাদিরশাহ বিজিত খিলিজীগণের সহিত আহম্মদ খাঁ আবদালী নামক একজন আফগানকে বন্দী করিয়াছিল। আফগানস্থানে সাদুজি নামে একটি বংশ আছে, উক্ত বংশ তৎপ্রদেশের অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবদালী, উক্ত বংশের একটি গোত্রমাত্র। উক্ত বংশে মহম্মদ খাঁ আবদালীর জন্ম। নাদির তাহাকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক মুক্তিদান করিয়া তাহাকে একখানি জমীদারী দান করিয়াছিল। নাদির শাহ স্বজাতীয়গণ কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিপাতিত হইলে আহম্মদ খাঁ তদধিকৃত রাজ্য অধিকার করিলেন এবং ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কান্দাহার রাজ্যে স্বাধীনভূপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই আহম্মদ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ঈশ্বরীসিংহ ইঁহারই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে শতদ্রুতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আহম্মদ খাঁ পরিশেষে আপনার আবদালী গোত্রকে দুরাণী নামে পরিবর্ত্তিত করেন।

রাজ্যচ্যুত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি চৌষট্টি লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। যে দিন এই প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষরিত হইল, সেই দিন রাজবারাক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই সংবাদ অবিলম্বেই ঈশ্বরীসিংহের শ্রুতিগোচর হইল। আপনার পদচ্যুতি ও অবমাননা অনিবার্য্য ভাবিয়া দুর্ভাগা ঈশ্বরীসিংহ পরিশেষে বিষপানে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। তৎপরে অম্বরসিংহাসন মধুসিংহের অধিকৃত হইল। চতুর হোলকার আপনার প্রাপ্য পণ প্রাপ্ত হইয়া রাজবারাপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়ের বিজয়কেতন দৃঢ় সংস্থাপন করিলেন। রাজপুতজাতির শোচনীয় অধঃপতনের ইহাই প্রধান কারণ। এই জন্যই শিশোদীয়, রাঠোর ও কুশাবহগণ পূর্ব্ব-গৌরবগরিমা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া দীনহীনভাবে অবস্থিতি করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের অভ্যন্তরে যে কঠোর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহা অচিরে তাঁহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিল। পরিশেষে দুর্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দ তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক রাজবারাকে শ্মশানে পরিণত করিল। সেই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লবে ও কঠোর মহারাষ্ট্রীয় পীড়নে রাজপুতবৃন্দ বহুদিন পর্য্যন্ত নিপীড়িত হইলেন। পরিশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া দয়াশীল বৃটিশসিংহ তাঁহাদিগকে সেই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করেন।

রাণা জগৎসিংহ ১৮১৮ সংবতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ইহলীলা সংবরণ করিলেন। অষ্টাদশবর্ষকাল তিনি রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। তিনি বীরবর বাপ্পার পবিত্র সিংহাসনের এবং শিশোদীয়কুলের যোগ্য নরপতি নহেন। গজযুদ্ধ দেখিয়া তিনি বৃথা আমোদেই দিনপাত করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রচণ্ড পরাক্রম ব্যর্থ করা অপেক্ষা তিনি ঐ প্রকার ক্রীড়াযুদ্ধকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আপন পিতৃপুরুষগণের ন্যায় জগৎসিংহ শিল্পশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনার্থ স্বীয় প্রজাগণকে উৎসাহিত করিতেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র গুণের পরিচয়। তিনি পেশোলার বক্ষোবিহারী দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে বিংশতি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। উপত্যকা-ভূমে যে সকল পল্লী দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন যে সকল আলস্য ও বিলাসব্যঞ্জক উৎসবব্যাপার আজিও উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

(দ্বিতীয়) রাণা প্রতাপ, (দ্বিতীয়) রাণা রাজসিংহ, অরিসিংহ, হোলকার কর্ত্তৃক মিবার আক্রমণ, সিন্ধিয়া-মিবার মিলন, রাণার পরাজয়, সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক উদয়পুররোধ, রাণার মৃত্যু, হামিরের সিংহাসনলাভ, অমরের মৃত্যু।

কালচক্রের আবর্ত্তনে ভবরঙ্গভূমে কখন্ কি অভিনয় হয়, কখন্ কিরূপ দৃশ্য নেত্রগোচর হয়, কখন্ কোন্ ভাবে যবনিকা পতিত হইয়া কোন্ দৃশ্য অন্তরিত করে, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। যে ভারতভূমি চিরদিন বীরপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহার গর্ভে ভীষ্ম-দ্রোণাদি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন আর্য্যবীরগণ অত্যদ্ভুত বীরত্বের নিদর্শন দেখাইয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন,

সেই জন্মভূমি, পবিত্র ভারতভূমি আজি দীনহীন—অন্তঃসারবিহীন, অকর্ম্মণ্য সন্তানসন্ততি ক্রোড়ে করিয়া দিবাযামিনী অশ্রুনীরে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন। যে মিবারবাসী বীরব্রতাবলম্বী রাজপুত-বীরগণের শাণিত তরবারির ঝণৎকার, শরজালের শন্ শন্ শব্দ, হৃদয়ের অন্তস্তলসমুত্থিত জয়নাদ ও ন্যায়মার্গানুসারিণী রাজনীতির প্রশংসা শুনিয়া সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয়ে অনন্ত আনন্দ প্রদান করিত, কালচক্রের আবর্ত্তনে জাতীয় দ্বেষ, অনৈক্য ও বিলাসিতার বশবর্ত্তী হইয়া সেই মিবারবাসী আর্য্য-সন্তানগণ অবনতির অন্ধতমস্তরে আশ্রয়গ্রহণ করিতে চলিলেন।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে (দ্বিতীয়) প্রতাপসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাণা উপাধি গ্রহণ করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহার রাজত্বের পর্য্যবসান হইয়াছিল। ইঁহার নাম শ্রবণ করিলেই (প্রথম) মহারাণা প্রতাপসিংহের পবিত্রনাম স্মৃতিপটে সমুদিত হয়। তাঁহার নামের সহিত (দ্বিতীয়) প্রতাপের নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু গুণের সাদৃশ্য ইঁহাতে কিছুই নাই। মহারাণা (প্রথম) প্রতাপ বীর ব্রতাবলম্বী, বিপুল বিক্রমশালী, ক্লেশসহিষ্ণু ও স্বজাতিবৎসল; এই নবীন রাণা (দ্বিতীয়) প্রতাপসিংহের বীরত্ব, পরাক্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও তাদৃশী স্বজাতিপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। ইনি রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া এরূপ কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই, যাহার দ্বারা ইঁহার চরিত্র সমালোচনযোগ্য হইতে পারে। যে তিন বৎসর ইনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই তিন বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় দস্যু কর্ত্তৃক মিবাররাজ্য উপর্য্যুপরি তিনবার আক্রান্ত হইয়াছিল। এই তিনবারে পর্য্যায়ক্রমে সত্যজী, জানকীজী ও রঘুনাথরাও এই তিন বীর মহারাষ্ট্রীয় দলের নেতা ছিলেন, ইঁহারা মিবারের রাণার নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ করও আদায় করিয়াছিলেন। অম্বরপতি (দ্বিতীয়) জয়সিংহের এক কন্যার সহিত (দ্বিতীয়) রাণা প্রতাপের বিবাহ হইয়াছিল। অম্বর-কুমারীর গর্ভে দ্বিতীয় রাজসিংহ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপের রাজত্বের পর তৎপুত্র (দ্বিতীয়) রাজসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনিও পিতার অনুরূপ পুত্র। দ্বিতীয় প্রতাপ যেমন (প্রথম) মহারাণা প্রতাপসিংহের তুল্য কোন ক্ষমতাই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, রাণা (দ্বিতীয়) রাজসিংহও সেইরূপ (প্রথম) রাণা রাজসিংহের অনুরূপ নাম ধারণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার গুণের বিন্দুমাত্র অনুকরণে সমর্থ হইলেন না। ইনি সাত বৎসরমাত্র পৈতৃকসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সাত বৎসরের মধ্যে উপর্য্যুপরি সাত জন মহারাষ্ট্রনেতা মিবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮১২ সংবতে রাজাবাহাদুর, ১৮১৩ সংবতে মুলহররাও হোলকার ভিটনরাও, সদাশিব রাও, গোবিন্দরাও ও বুনাজী যাদুন এবং ৮১৪ সংবতে রাণাজী বুর্ত্তিয়া মিবার আক্রমণ করেন। ইঁহাদিগের দ্বারা দারুণ অত্যাচার, ঘোরতর উৎপীড়ন ও প্রজাবৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন হইয়াছিল। এই সমস্ত সংঘর্ষণকালে মিবার একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; রাণা অর্থহীন হইয়া, দারিদ্র্যের কঠোরপীড়নে দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এরূপ অর্থহীন হইতে হইয়াছিল যে, বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি এক জন রাজমন্ত্রীর নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঠোররাজকুমারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। সাতবৎসর রাজত্ব করিয়া রাজসিংহ লীলাসংবরণ করিলে তদীয় পিতৃব্য অরিসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

১৮১৮ সংবতে (১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) অরিসিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতি নরপতি ছিলেন। জগৎসিংহের চাঞ্চল্য, দ্বিতীয় প্রতাপের কাপুরুষতা এবং

রাজসিংহের অযোগ্যতা বশতঃ, মিবাররাজ্য এক প্রকার দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহার উপর উগ্রপ্রকৃতি ক্রোধস্বভাব অমরসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের সিংহাসনে উপবেশন করাতে রাজ্যমধ্যে মহা অনর্থের সূত্রপাত হইল। ক্রমে সেই অনর্থ হইতেই মিবারের সর্ব্বনাশ ঘটিল। ইতিপূর্ব্বে পর্য্যায়-ক্রমে কয়বার মহারাষ্ট্রীয় দস্যুরা মিবার আক্রমণ করে, তাহাতে মিবাররাজ্যের আভ্যন্তরিক ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভূমিসম্পত্তির তিলমাত্রও বিচ্ছিন্ন বা অন্যের অধিকৃত হয় নাই। পাঞ্চোলিমন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ও বহুদর্শিতা এবং সেতারা-নৃপতির অচলা ভক্তিবশতঃ এত দিন মিবারভূমির স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু ভীষণ অন্তর্ব্বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া বিলক্ষণ অনিষ্ট-সংঘটন করিল। প্রজাবৃন্দের মধ্যে একতা রহিত হইয়া গেল। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইয়া প্রজাবর্গের অনুকূলে দণ্ডায়মান হইল; সুযোগ বুঝিয়া মিবারবাসিগণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া তাহারা আপনাদিগের অভীষ্টসাধন করিতে লাগিল; সুতরাং রাজ্যের অধঃপতন ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

প্রতাপকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপদে তদীয় পিতৃব্য নাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন মিবারের সর্দ্দারেরা উত্তেজিত হইয়াছিলেন, যখন তাঁহারা রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, দুর্দ্ধর্ষ মূলহর রাও হোলকার সেই সময় আহূত হইয়া মধ্যস্থস্বরূপে দণ্ডায়মান হন। মহারাষ্ট্রীয় নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক চতুর চূড়ামণি হোলকার সেই সময় মিবারের কিয়দংশ আপনার করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এখন উপযুক্ত অবসর দর্শনে—উপযুক্ত সুযোগ দর্শনে আরও অধিক অংশ আত্মসাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভাগিনেয় মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাণা প্রচুর অর্থব্যয়, এমন কি, আত্যন্তিক ত্যাগস্বীকারেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু মধুসিংহ মাতুলকৃত সেই মহোপকার বিস্মৃত হইয়া,—ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ১৮০৮ সংবতে রামপুরজনপদটি মূলহর হোলকারকে প্রদান করিলেন। রামপুরটিই মিবাররাজ্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। রামপুরজনপদটি হোলকারের অধিগত হইল বটে, কিন্তু ইহার কিয়দংশ কতিপয় বর্ষ পর্য্যন্ত মিবারাধীনে রহিল। তদ্ভিন্ন আমুদরাজ্যের চন্দাবৎ-সর্দ্দারের অধীনস্থ করপ্রদেশের অনেক ভূমিও রাণার অধিকারভুক্ত থাকিল। রামপুরজনপদটির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী মধুসিংহ নহেন, মাতুলের অনুগ্রহেই উহা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া—কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া মাতুলরাজ্যের ঐ প্রদেশটি মহারাষ্ট্রহস্তে প্রদান করিলেন। বাজিরাও মিবাররাজের নিকট হইতে যে চৌথ ও দশমুখী গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, মূলহরের হস্তে তৎসংগ্রহের ভার সমর্পিত ছিল। যখন রাণা মধুসিংহকে অম্বরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে মূলহরের সহিত সন্ধিবন্ধন স্থির করেন, তখন তিনি মূলহরকে চতুঃষষ্টি লক্ষ মুদ্রা উক্ত চৌথদান ও মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে মিবারভূমিকে একেবারে অব্যাহতিদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু বলবতী অর্থলিপ্সায় অন্ধ হইয়া মূলহর এই সময়ে পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট চৌথ প্রার্থনা করিলেন। রাণা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সন্ধিপত্রের কথা উত্থাপন করিয়া চৌথ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। যে কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ ও রাজ্যবিস্তার করাই তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বার্থসাধনের জন্য সত্যের অবমাননা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত নহে, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি একপ্রকার তাহাদিগের পদতলে দলিত হইতেছিল বলিলেই হয়, সুতরাং রাণার প্রস্তাবে তাহারা কর্ণপাতও করিল না। ক্রমান্বয়ে কয়খানি পত্র লিখিয়া তাহারা রাণাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অবশেষে চম্বলনদের তীরবর্ত্তী বুদম্ প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশের বাকী কর ও রাজস্ব সংগ্রহের ভানে তাহারা পুনর্ব্বার মিবাররাজ্য আক্রমণ করিল।

মহাবল দুর্দ্দান্ত হোলকার অন্তলাদুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, সংবাদ পাইয়া রাণা অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন। পাছে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় দস্যুরা রাজধানী অধিকারপূর্ব্বক উদয়পুর নগর ছারখার করে, এই আশঙ্কায় রাণার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। অগত্যা রাণা একপঞ্চাশৎ লক্ষ টাকা সহ আপনার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ ও কোরাবারের অর্জ্জনসিংহকে হোলকারের নিকট প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জনসিংহও সদলে অন্তলায় উপস্থিত হইয়া রাণার পক্ষ হইতে ঐ টাকা দিয়া হোলকারের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া লইলেন। হোলকারের দুরাকাঙ্ক্ষার শান্তি হইল। মিবারের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। একে মিবার অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতে হইল, মিবারের ভাগ্যে যায়-পর-নাই দুরবস্থা ঘটিল।

চিরগৌরবান্বিত মিবারের এরূপ দুর্দ্দশা করিয়াও বিধাতা ক্ষান্ত হইলেন না। বিপদের উপর আবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া মিবারের অবশিষ্ট শোণিত শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ ১৮২২ সংবতেই সেই ঘটনা। ঐ ঘোরতর অন্নকষ্টের সময় দ্রব্যসামগ্রী এত মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, সামান্য তুচ্ছদ্রব্যও স্বর্ণমূল্যে ক্রয় করিতে হইত। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবার চারি বৎসর পরে আবার মিবাররাজ্যে এক ঘোরতর অন্তর্ব্বিপ্লব ঘটিল। সেই অনিষ্টকর গৃহবিবাদে মিবারের প্রজাবৃন্দ এত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র-দস্যুগণের আক্রমণ হইতে আপনাদিগের বিষয়বিভব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মিবারবাসিগণ বহুদিন যাবৎ কঠোর দস্যুপীড়ন সহ্য করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দয়াশীল ব্রিটিশসিংহ তাহাদিগের সন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিলেন। তখন মিবারবাসীরা ব্রিটন পাদপের স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল।

সর্দ্দারগণ কেন বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণ অস্পষ্ট। মহাতেজা রাজপুতবৃন্দ আপনাদিগের নৃপতিকে মহারাষ্ট্রীয়গণের উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম দর্শনে বোধ হয় তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, মিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্তসম্প্রদায়গণের ঈর্ষা ও স্বার্থপরতাবশতই ঐরূপ অনর্থের অভ্যুদয় হয়। কথিত আছে, রাণা অরিসিংহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রাজসিংহকে অন্যায় উপায়ে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অনেক কারণে যদিও রাণার চরিত্রবিষয়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি তেমন কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, যদ্দ্বারা সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইতে পারে। মিবারের চিরপ্রচলিত উত্তরাধিকারিত্ববিধির বিপর্য্যয় হইলে তৎপ্রদেশে নানারূপ অনর্থ ও অমঙ্গল ঘটে। আরও মিবারের রাজাসন অধিকার করিবার কোনরূপ ক্ষমতাই অরিসিংহের ছিল না। তিনি বহুদিন যাবৎ শিশোদীয়বংশের ষোড়শ সর্দ্দারগণের নিম্ন আসনে উপবেশন করিতেন এবং শিশোদীয়কুলের রাজকুমার বলিয়া বার্ষিক ত্রিংশৎসহস্র টাকার একখানি ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ সর্দ্দারগণের মধ্যে গণনীয় হইতেন। যে সর্দ্দারেরা দীর্ঘকাল তাঁহার অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, আজি কি তাঁহারা তাঁহার নিকট আপন আপন মস্তক অবনত করিতে পারেন? আজ কি তাঁহাকে নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া রাজোচিত সম্মানসম্ভ্রম প্রদান করিতে পারেন? কখনই না। তাঁহার সেই অবৈধ রাজ্যাধিকারবশতঃ অধিকাংশ সর্দ্দার তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাহারা তাঁহার সহিত বহুকাল একত্র

যাপন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং অরিসিংহের রূঢ় স্বভাব, বিশেষতঃ তাঁহাতে যে রাজোচিত কোন গুণ নাই, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের গূঢ়তম অংশ পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে লাগিলেন এবং অণুমাত্র সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহার উগ্রপ্রকৃতি আশু মিবারের প্রধান সর্দ্দার সদ্রিপতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। * যে উদারহৃদয় ঝালা-সর্দ্দার হল্‌দীঘাটের ভীষণ রণক্ষেত্রে নিঃসহায় প্রতাপের প্রাণরক্ষা করিয়া শিশোদীয় বংশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন, আজি রাজাধম অরিসিংহের অসদ্ব্যবহারে তাঁহাকে সেই শিশোদীয়বংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। এ দিকে দেবগড়পতি যশোবন্ত সিংহের প্রতি মর্ম্মভেদী শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়া রাণা চিরদিনের জন্য তাঁহার বিদ্বেষভাজন হইয়া রহিলেন। যশোবন্তসিংহ মহা বিক্রমশালী চণ্ডের বংশে সমুৎপন্ন, সুতরাং তিনি সেই শ্লেষবাক্যের উপযুক্ত প্রতিফল দিতে ক্ষান্ত থাকিবেন কেন?

ক্রমে ক্রমে অরিসিংহ সকলেরই বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িলেন। সর্দ্দারেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য একটি চক্রান্ত করিলেন। রতনসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহারা রাজসিংহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন। রতনসিংহ রাজসিংহের ঔরসে গোগুণ্ডা-সর্দ্দারের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বলিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। কিন্তু ঐ কথা কতদূর সত্য, অদ্যাবধি তাহার মীমাংসা হয় নাই, হইবে কি না, তাহাও সন্দেহ। যাহা হউক, ক্রোধান্ধ হইয়া সর্দ্দারগণ রতনসিংহকে আপনাদিগের বিবাদের মধ্যবিন্দুস্বরূপ স্থির করিয়া বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মিবারের ষোড়শ শ্রেষ্ঠ সর্দ্দারগণের অধিকাংশই রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। কেবল শালুম্ব্রা, বিজোল্লি, আমৈত, গানোর ও বেদনোরের সর্দ্দার, এই পাঁচ জন রাণার সমর্থন করিয়া রহিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শালুম্ব্রাসর্দ্দার সর্ব্বাগ্রে রতনসিংহের দলে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু সে পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছু দিন পরেই রাণার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যে মহতী রাজভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া চণ্ডের বংশধরগণ শিশোদীয়-বংশের জন্য আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতি আজি

* উক্ত ঝালাপতি রাণার তদানীন্তন মন্ত্রীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই,—

যশোবন্তরাও পাঞ্চোলিসকাশে—

"আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আশৈশব আপনি আমার বন্ধু; আজন্ম সমানভাবে আমাকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন; কেন না, আমি রাণাকুলের ভক্তলোককেই অন্তরের সহিত ভালবাসি। আপনার নিকট আমার কিছুই গোপন নাই; অতএব অদ্য লিখিতেছি যে, কাজ করিতে আর আমার বাসনা নাই। আগামী আষাঢ়মাসে আমি গয়াক্ষেত্রে গমন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। রাণাকে যখন আমি এই কথা বলিলাম, তিনি শ্লেষবাক্যে উত্তর করিলেন, তুমি দ্বারকা * যাইতে পার। আমি থাকিলে রাণা আমার ভূমিসম্পত্তির পল্লীগুলিকে জৈৎজির সময়ের মত পুনরুদ্ধার করিয়া দিবেন। আমার পিতৃপুরুষেরা রাণাদিগের উপযুক্ত পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছেন; আমিও চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স হইতে সেইরূপ করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি অক্ষম। যদ্যপি আমাকে অনুগ্রহ করিতে দরবারের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই উপযুক্ত অবসর।"

* যাহারা ধর্ম্মভীরু ও রণে অসমর্থ, রাজপুতগণের মতে দ্বারকা তাহাদিগেরই তীর্থক্ষেত্র

সেই রাজভক্তির অনুরোধে রাণার পক্ষ আশ্রয় করিলেন না। তাঁহার এইরূপ কার্য্যের বিশেষ কারণ আছে। তিনি প্রভুত্বপ্রিয়,—ভাবিয়াছিলেন, বিদ্রোহিপক্ষ সমর্থন করিলে বিশেষ প্রভুত্বচালন করিতে পাইবেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎগণের সুদক্ষতার বিরুদ্ধে আধিপত্য নিয়ন্ত্রিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য বোধ হওয়াতে পরিশেষে তিনি সে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাণার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভিণ্ডির (শক্তাবৎ) দেবগড়, সদ্রি গোগুণ্ডা, দৈলবারা, বৈদলা, কোতারিও এবং কানোরের সর্দ্দারগণ অপনৃপতির পক্ষস্থ সর্দ্দারগণের মধ্যে বিশেষ পরাক্রান্ত।

দেপ্রাগোত্রে বসন্তপাল নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অপনৃপতির প্রধান মন্ত্রিস্বরূপে নিয়োজিত হইলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উঁহার পূর্ব্বপুরুষ দিল্লী নগরী হইতে বীরকেশরী সমরসিংহের সহিত মিবারে উপস্থিত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি ভারতের শেষ হিন্দুরাজ-চূড়ামণি মহারাজ পৃথ্বীরাজের সভায় একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত সর্দ্দারগণের সহিত "ফিতর" (অপ-নৃপতি) কমলমীর অধিকার করিতে এবং তথায় যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া "মিবারের রাণা" বলিয়া রাজনিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক প্রকৃত মূলতত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া অপনৃপতি সর্দ্দারেরা স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষে ভবিষ্যতে যে জঘন্যোপায় অবলম্বন করিল, তাহাতেই মিবারের অধঃপতন ঘটে। তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে সিন্ধিয়ার আনুকূল্য প্রর্থনা করিল এবং অরিসিংহের পদচ্যুতির পণস্বরূপ এক ক্রোর পঁচিশ লক্ষ টাকা সিন্ধিয়ার করে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল।

মিবারে যখন এই প্রকার ভয়াবহ শোচনীয় অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময় জলিমসিংহ নামে একজন প্রচণ্ড রাজপুতবীর রাজবারার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। জলিমসিংহ রাজপুতনাভূমে, বিশেষতঃ মিবার রাজ্যে যে অদ্ভুত কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে মুক্তকণ্ঠে সেই বীরকেশরীর বীরত্ব, উদারতা, মহত্ব, তেজস্বিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। মিবারভূমেই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞতার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিবারের রঙ্গভূমে তিনি যে সমস্ত মহৎ কার্য্যের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তের সহিত তাঁহার জীবনী এরূপ বিজড়িত যে, সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা এ স্থলে অবশ্য উল্লেখযোগ্য। মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ঈশ্বরী-সিংহের সহিত রাণা জগৎসিংহের ভয়াবহ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; তাহা হইতেই জলিমসিংহের ভাবী মহনীয় চরিত্রের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার পিতা কোটার শাসনদণ্ড পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন, প্রতিশোধ দিবার অভিলাষে ঈশ্বরীসিংহ সিন্ধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া যখন কোটা-রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তখন জলিম তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময় মহারাষ্ট্রীয় সেনা-পতিগণের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ-সম্ভাষণ হয়, সেই আলাপ হইতে তিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের নীতিকৌশল সম্বন্ধে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেই নীতি অনুসারে কার্য্য করিয়াই তাঁহার জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। স্বীয় রাজার অনুগ্রহ হারাইয়া জলিমসিংহ কোটা হইতে বিতাড়িত হইলেন; পরিশেষে আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য রাণার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া রাণা তাঁহাকে আপন সর্দ্দারশ্রেণীর মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন এবং রাজরণ উপাধির সহিত তাঁহাকে ছত্রখৈরীর ভূমিবৃত্তি প্রদান করিলেন। জলিমের পরামর্শেই মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রঘু পৈগওয়ালা এবং দৌলামিয়া স্ব স্ব সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে মিবারে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে রাণা প্রাচীন পাঞ্চোলীকে মন্ত্রিত্বপদ হইতে

বিচ্যুত করিয়া উগ্রজি মেহতা নামক এক ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে (সংবৎ ১৮২৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৬৮) মাধাজি সিন্ধিয়া উজ্জীননগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সাহায্য গ্রহণের অভিলাষে মিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দ্দারগণ তৎপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে রতনসিংহ গমন করেন। তিনি সিন্ধিয়ার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া সিপ্রাতটে শিবির স্থাপন করিলেন। কাজেকাজেই রাণা অরিসিংহের আড়ম্বর বিফল হইয়া গেল।

মাধাজি সিন্ধিয়ার সাহায্যলাভের আশা গেল, অগত্যা রাণা আপনার সেনাদল লইয়াই অপনৃপতির প্রতিকূলে অগ্রসর হইলেন। শালুম্‌ব্রাসর্দ্দার, শাপুর ও বুনেরার রাজদ্বয়, জলিমসিংহ এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল রাণার সেই সৈন্যগণের অধিনেতৃত্বে ও সহায়তায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া মাধাজির সৈন্যগণকে মহাবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। অচিরেই উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। রাণার সৈন্যগণ মহাবীরত্বের সহিত শত্রুসেনা দলিত, মথিত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড সাগর-তরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। মাধাজি ও অপ নৃপতি সে বল প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া পরাজিত, অপমানিত ও নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উজ্জয়িনীর দ্বারভাগে পলায়ন করিলেন। সেখান হইতে আবার নবীন সেনাদল সংগ্রহ করিয়া অত্যল্পকালমধ্যেই তাঁহারা আপনাদের অপমান ও পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার অভিলাষে রাজপুতসেনাকে পুনরায় আক্রমণ করিলেন। বিজয়োন্মত্ত রাজপুতবৃন্দ রণমদে মত্ত, সুতরাং একবার মনে ভাবিয়া দেখিলেন না যে, দুর্দ্ধর্ষ মাধাজি তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়িয়া দিবে না। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্তচিত্তে শত্রুশিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত ছিলেন। এক এক দল এক এক দিকে গমনপূর্ব্বক লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত, ইত্যবসরে মাধাজির রণভেরী ভীমগভীররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রাজপুতগণ চমকিত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে, এবার অরিকুল কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। রাণার সৈন্যগণ সুশৃঙ্খলভাবে উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইতে না হইতেই মাধাজি ভীষণ বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সেই ভীমবল সহ্য করিতে না পারিয়া শালুম্ব্রা, শাপুর ও গুনেরার অধিপতিবৃন্দ সমরভূমে পতিত হইলেন এবং সহকারী দৌলমিয়া, নীরবের পদচ্যুত নৃপতি রাজামান এবং সত্রির উত্তরাধিকারী কল্যাণরাজ ঘোরতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন জলিমসিংহও গুরুতররূপে আহত, তাঁহার অশ্ব রণভূমে পতিত হওয়াতে বাহনাভাবে তিনি পলায়ন করিতে পারিলেন না, সুতরাং শত্রুহস্তে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইল। বন্দী হইলেন বটে, কিন্তু শত্রুকুল তাঁহার প্রতি বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করিলেন না। ত্র্যম্বকজি-নামা এক সদাশয় মহারাষ্ট্রীয় তাঁহাকে পরম যত্ন ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। এই ত্র্যম্বকজিই প্রসিদ্ধ অম্বজির পিতা। পরাজিত ও অবমানিত রাজপুতবৃন্দ পলাইয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে অপ-নৃপতির সৈন্যদল উদয়পুর আক্রমণ এবং রতনকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সিন্ধিয়াকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বিজয়ী মহারাষ্ট্রপতি ক্ষণকাল পরে একটি প্রকাণ্ড সেনাদল লইয়া পর্ব্বতবর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক উদয়পুর অবরোধ করিলেন। রাণা হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি নিঃসহায়—নিঃসম্বল। যে কতিপয় সাহসী বীর তাঁহার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সিপ্রা-তীরে রণভূমে শায়িত হইয়াছেন। এখন উপায় কি? কিরূপে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় বীরের কবল হইতে উদয়পুর ও আপনার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন? শালুম্ব্রার ভীমসিংহ ব্যতীত তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত যোদ্ধা আর নাই। অগত্যা তাঁহারই হস্তে নগররক্ষার ভার অর্পিত হইল। শালুম্ব্রাপতি গত উজ্জয়িনীযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, ভীমসিংহ তাঁহার

পিতৃব্য ও উত্তরাধিকারী, এখন তিনি রাণা কর্ত্তৃক সৈন্যাপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সঙ্কটসময়ে নগর ও রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য বীরবর জয়মল্লের বংশধর রাঠোর বেদলোপতির সহিত ভীষণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সঙ্কটে অমরচাঁদ বারোয়া নামক একটি মহাপুরুষের দৃঢ় উদ্যমে ও কঠোর উদ্যোগে ঈশ্বরকৃপায় সকল দিক্ রক্ষা হইল।

বণিক্‌কুলে এই অমরচাঁদের জন্ম। ইতিপূর্ব্বে ইনি মিবারের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সুদক্ষ ও বহুদর্শী মন্ত্রী জগতে অতি বিরল। স্বর্গীয় রাণার রাজত্বসময়ে মিবারে যে সকল মহা অনর্থ ঘটিয়াছিল, অমরচাঁদ ভিন্ন সেই সমস্ত অনর্থ আর কেহই দূর করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ফল কথা, তাঁহাকে মিবারের একটি স্তম্ভস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অরিসিংহের রাজত্বসময়ে এই ঘোরতর অন্তর্ব্বিবাদকালে অমরচাঁদ স্বীয় পদ হইতে বিচ্যুত হইলেন। যে দিন তিনি পদচ্যুত হইলেন, সেই দিন হইতেই মিবারের অনর্থরাশি ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতেই চারিদিক্ হইতে অসংখ্য বিপদ্‌জাল উপস্থিত হইয়া মিবারকে পরিবেষ্টন করিতে আরম্ভ করিল। সর্দ্দারগণের সহিত বিবাদ, মহারাষ্ট্রীয়ের উৎপীড়ন, তাহার উপর আবার অরিসিংহের তীব্র ও রূঢ় ব্যবহার; এই সমস্ত অনর্থ ক্রমে ক্রমে একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত অনর্থের বৃদ্ধি দর্শনে অমরচাঁদ নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপদপ্রাপ্তির আর সম্ভাবনা নাই, অমরচাঁদ স্বভাবতঃ উগ্র এবং অরিসিংহের ন্যায় উদ্ধতপ্রকৃতি। এই সঙ্কটসময়ের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে মিবাররাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সকল সর্দ্দার অরিসিংহের পক্ষ ত্যাগ করিয়া রতনসিংহের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্থানে বেতনভোগী সৈন্ধব সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্ধব-সৈন্য পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দারগণের হস্তচ্যুত ভূমিসম্পত্তির অধিকারী হইয়া রাজ্যমধ্যে অপ্রীতির বীজ বপন করিয়াছে। এই কারণেই মিবারের বল, বিক্রম, তেজস্বিতা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই অপ্রীতির তামসী ছায়া এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, যে সকল সর্দ্দার রতনসিংহের পক্ষও সমর্থন করেন নাই, তাঁহারাও নিঃসম্পর্কের ন্যায় স্ব স্ব দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই প্রকারে রাণার আশা-ভরসা বহুল পরিমাণে উন্মূলিত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার পক্ষও অতীব হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। মিবারের এইরূপ সঙ্কটসময়ে দৈববশতঃ অমরচাঁদ কার্য্যক্ষেত্রে পুনরাহূত হইলেন। উদয়পুর রক্ষণোপযুক্ত প্রাকার বা পরিখা কিছুই ছিল না। উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে একলিঙ্গগড় নামে একটি উন্নত পর্ব্বতকূট ছিল। বলিতে গেলে উহাই উদয়পুরের দ্বারস্বরূপ। সুতরাং ইহাকে প্রাকারবেষ্টিত ও কামান দ্বারা সজ্জিত করিলে উদয়পুর রক্ষা হইবে বিবেচনায় রাণা তাহাতেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু একলিঙ্গগড় দুরারোহ ও বন্ধুর। রাণার কলকৌশল সফল হইল না। একদিন রাণা তাহা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় অমরচাঁদ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাঁহার অসন্তোষ দূর করিবার অভিলাষে রাণা আপনার ত্রুটি স্বীকার করিলেন; যথাযোগ্য সম্মানে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া মধুরসম্ভাষণে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল অতীত হইলে অরিসিংহ অমরচাঁদের দিকে নেত্রপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বিবেচনায় এই কার্য্য সমাপন করিতে কত টাকা ব্যয় ও কত সময় লাগিতে পারে?" গম্ভীরভাবে অমরচাঁদ উত্তর করিলেন, "কিছু শস্য ব্যয় ও কয়েকটি দিন মাত্র।" রাণা তখন তাঁহার প্রতি সেই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, অমরচাঁদ নিঃসঙ্কোচে কহিলেন, "যাবৎ এই কার্য্যের ভার আমার হস্তে অর্পিত থাকিবে, তাবৎ আমার

আদেশেই এ ব্যাপার সাধিত হইবে; তাবৎ আমার আদেশের উপর আর কেহ আদেশ চালাইতে পারিবেন না। যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি।" রাণা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তখন অমরচাঁদ শ্রমজীবিগণকে একত্র করিয়া একটি পথ প্রস্তুত করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে একলিঙ্গগড়ের শিখরোপরি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র (কামান) প্রয়োগ করিয়া রাণাকে অভিবাদন করিলেন। রাণা বিস্ময়ে চমকিত!

দুর্দ্ধর্ষ মাধাজি সিন্ধিয়া উদয়পুরের উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ অবরোধপূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন। কেবল পশ্চিমদিক্ উন্মুক্ত রহিল। তিনি যে পশ্চিমদিক্ অবরোধ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এই যে, উদয়সাগরের বিস্তৃত জলরাশি এবং তাহার তীরবর্ত্তী দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ও আরণ্য তরুরাজি তাঁহার পক্ষে প্রচণ্ড প্রতিরোধস্বরূপে সংস্থিত ছিল। এই পশ্চিমদিক দিয়াই নাগরিকবৃন্দ প্রয়োজনমত নগর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতে এবং তরণীযোগে উদয়সাগরের বিশাল বক্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক গিহ্লোটবংশের চিরবন্ধু ভীলগণ নাগরিকদিগের খাদ্যাদি সংযোজনা করিয়া দিতে লাগিল। মিবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এখন সৈন্ধবী সেনা ব্যতীত রাণার উপায়ান্তর নাই। সেই সৈন্ধবী সেনার বিশ্বাসের উপর এখন সকল কার্য্য নির্ভর করিতেছে; কিন্তু রাণার দুর্ভাগ্যবশে অকস্মাৎ তাহারাও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল এবং আপনাদের প্রাপ্য বেতনের জন্য তাহারা মহা গোলযোগ উত্থাপন করিল। তাহাদের চক্ষের উপর রাজ্যের অনর্থ দিন দিন বাড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও মূর্খগণের হৃদয়ে অণুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না। কেবল বেতনের গণ্ডগোল করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত রহিল না; অবশেষে রাণার গাত্রস্পর্শ করিয়া ঘোরতর অপমান করিল। একদিন রাণা রাজভবনে প্রবেশ করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই পাষণ্ড সৈন্ধবী সেনারা হস্তদ্বারা তাঁহার গাত্রাবরণী আকর্ষণ করিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রাণা সবলে সেই গাত্রবস্ত্র টানিয়া লইলেন। বস্ত্র ছিন্ন হইয়া গেল; সেই ছিন্ন বস্ত্র লইয়া তিনি অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। স্বীয় ঔদ্ধত্য নিবন্ধন রাণাকে এই দারুণ অপমান সহ্য করিতে হইল। তাঁহার দুর্দ্দশা ক্রমে ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল, আশা ভরসা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। যে সৈন্ধবীগণকে এক সময়ে তিনি একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেন, আজি তাহারাও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। তবে এখন উপায় কি? তিনি চতুর্দ্দিকেই বিপদের ভীষণ ভ্রূকুটি দর্শন করিতে লাগিলেন। রাণার এক "ধাই-ভাই" ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুদেব। তিনি ঝালাসর্দ্দারের উত্তরাধিকারী হইয়া মন্ত্রণাগৃহের কার্য্য সমাপন করিতেছিলেন। এই মহাসঙ্কটসময়ে তিনি রাণাকে পরামর্শ দিলেন, "আপনি উদয়সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক মণ্ডলগড়ে পলায়ন করুন্।" এরূপ পরামর্শে রঘুদেবের ভীরুতা ও অকর্ম্মণ্যতার স্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইল। রাণা তাঁহার সে পরামর্শে অবহেলা করিয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শালুম্ব্রাসর্দ্দার ম্লানমুখে উত্তর করিলেন, "এ বিপদে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারিবে, তাহা আমি নিরূপণ করিতে অক্ষম। আপনি অমরচাঁদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন্।" অমর আহূত হইলেন এবং সেই ভয়াবহ বিপদে দ্বারের দুরূহভার তাঁহার করে অর্পিত হইল। তিনি বলিলেন, "এ দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণে স্বভাবতই কেহ ইচ্ছা করেন না; বলিতে কি, আমারও ইহাতে অভিলাষ নাই। মহারাজ! আপনি জানেন, ইতিপূর্ব্বে মিবাররাজ্যে কত ভীষণ ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সেই সময়ে এই দাস কি প্রকার উপায়ে সেই সকল অনর্থ দূর করিয়াছিল। এখন তদপেক্ষা ঘোরতর অনর্থরাশি উপস্থিত। এরূপ অবস্থায় আমাকে আবার সেই সকল উপায় অবলম্বন

করিয়া উপস্থিত সঙ্কট দূরীকরণে তৎপর হইতে হইবে।" কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া অমর পুনর্ব্বার কহিলেন, "আরও আমার চরিত্রে একটি দোষ আছে, তাহাও হয় ত আপনি জ্ঞাত আছেন, সে দোষ আর কিছুই নহে, আমার হৃদয় কোন শাসন মানিতে ইচ্ছা করে না। আমি যে স্থানে থাকি, সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকি; যাহা করি, তাহার উপর কেহ বুদ্ধিচালনা করে, তাহা আমি ভালবাসি না; কোন গুপ্ত মন্ত্রী কিংবা পরামর্শদাতাকেও আমি গ্রাহ্য করি না। আপনার কোষাগার শূন্য, সৈন্যদল বিদ্রোহী, খাদ্যসামগ্রীর অভাব, এরূপ অবস্থায় যদি আপনি আমার প্রতি নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শপথ করিয়া বলুন যে, আমি যাহা আদেশ করিব, তাহাতে কেহ ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারিবে না; তাহা হইলে সাধ্যানুসারে যতদূর পারি, করিব। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ন্যায়পর অমর এখন অন্যায়পর হইবে এবং আপন পূর্ব্বচরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করিবে।" রাণা তৎক্ষণাৎ ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া কহিলেন, "আপনার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে। আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই পালিত হইবে; যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। এমন কি, যদি আপনি রাণীর রত্নহার ও অন্যান্য অলঙ্কার চাহিয়া পাঠান, তাহাও আপনাকে দিব।" রাণার ধাই-ভাই রঘুদেবের কাপুরুষোচিত মন্ত্রণা শুনিয়া অমরের হৃদয়ে অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছিল, এখন তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধাবেগ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "তোমার যেমন অবস্থা ও বিদ্যাবুদ্ধি, সেইরূপ পরামর্শই দিয়াছিলে। ভাল, রাণা যদি উদয়পুর হইতে মণ্ডলগড়ে পলায়ন করিতেন, কে তাঁহাকে তথায় রক্ষা করিতে পারিত? তোমারই বা কি গুপ্ত উপায় আছে যে, তদ্দ্বারা তুমি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে? পলায়ন তোমারই উপযুক্ত বটে; রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা অপেক্ষা তুমি এখন স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহিষচারণ কর, দুগ্ধ বিক্রয় কর, সুখে থাকিবে। সে বৃত্তি তোমার কুলধর্ম্ম ও বুদ্ধির পক্ষে সম্যক্ যোগ্য। তুমি তো কোন্ ছার, এখন সমস্ত কর্ম্ম তোমার প্রভুকেও শিখিতে হইবে।" অমরের তেজস্বিতা দেখিয়া রাণা ও তাঁহার সর্দ্দারগণ অবনতশিরে অবস্থান করিলেন। অতঃপর প্রাঙ্গণতলে অবতীর্ণ হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্ধবী সেনাগণকে তেজোব্যঞ্জকস্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আইস, আমার অনুগামী হও, আমি তোমাদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিব; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, যদি তোমরা কৃতকার্য্য হইতে না পার, তাহা হইলে সমস্ত দোষ আমারই স্কন্ধে পড়িবে।" যে বিদ্রোহী সৈনিকেরা ইতিপূর্ব্বে রাণাকে অবমাননা করিয়াছিল, নির্ব্বাক্ ও কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাহারা অমরের অনুসরণ করিল। অমরচাঁদ তাহাদিগের প্রাপ্য বেতনের হিসাব করিয়া পরদিন পরিশোধ করিতে চাহিলেন। তৎপরে তিনি প্রতিহারিগণের নিকট কোষাগারের চাবি চাহিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চাবি না দিয়াই ভয়ে পলায়ন করিল। তখন অমর সেই সকল কোষাগারের দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, স্বর্ণ-রজতাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই টাকা করিয়া লইলেন এবং মণিরত্নাদি সমস্ত বন্ধক দিলেন। যে অর্থ সংগৃহীত হইল, তদ্দ্বারা তিনি সৈনিকগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিলেন। বারুদ, গোলা-গুলী ও অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইল। এই প্রকারে নববল সৃষ্টি করিয়া তিনি মনে মনে যার পর-নাই আনন্দ লাভ করিলেন। সেই সকল সৈন্যের সাহায্যে তিনি ছয়মাস পর্য্যন্ত বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন।

রত্নসিংহ রাণার অধিকাংশ খাস জমী করগত করিয়া উদয়পুরের উপত্যকাদেশ পর্য্যন্ত আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়াকে প্রতিজ্ঞানুরূপ অর্থ প্রদান করিতে না পারাতে পরিশেষে তিনি মহাবিপদে পতিত হন। সুচতুর মহারাষ্ট্রীয়েরা সময়কে অমূল্য রত্ন

বলিয়া জ্ঞান করে। বৃথা সময় নষ্ট করিতে না পারিয়া সিন্ধিয়া অমরচাঁদের সহিত সন্ধি-সংস্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে সত্তর লক্ষ টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রতনসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন। অমর তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধিবন্ধনের উদ্‌যোগ করিলেন। সন্ধিপত্র লিখিত হইল। উভয়ে তাহাতে স্বাক্ষর করিবামাত্র সিন্ধিয়া শ্রবণ করিলেন যে, আশু কোন আক্রমণ হইতে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সিন্ধিয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল, অমরকে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া পাঠাইলেন, "আরও বিশ লক্ষ টাকা না দিলে সন্ধি সফল হইবে না।" এই কথা শুনিয়া অমরের হৃদয় বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সেই সন্ধিপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক সেই ছিন্নখণ্ডগুলি বিশ্বাসঘাতক মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। সঙ্কটবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহস ও তেজস্বিতা বাড়িতে লাগিল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি সাহস ও তেজস্বিতাগুণে তাহাদিগের হৃদয়ও মহা উৎসাহে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। সৈন্ধবী সেনা এবং বিশ্বস্ত রাজপুত-সর্দ্দার ও সেনানী-গণকে একত্র করিয়া তিনি তাহাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একজন সদ্বক্তা বলিয়া প্রশংসনীয়। যে বাগ্মিতা হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, অমর তাহাতে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন; সুতরাং অতুল উৎসাহের সময় তাঁহার সেই বাগ্মিতা আগ্নেয়-পর্ব্বতে ধাতুনিস্রাবের ন্যায় মহাবেগে সৈনিক ও সামন্তবৃন্দের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তাঁহাদের উৎসাহাগ্নিতে উপযুক্ত আহুতি প্রদান করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে বিবিধ রত্নমণ্ডিত বিভূষণ ও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী পুরস্কার দিলেন; সেই সকল দ্রব্য রাজভাণ্ডারে কেবল অনর্থক পড়িয়াছিল। রাজনীতিবিশারদ অমরচাঁদ তৎসমস্তের সদ্ব্যবহার করিয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। নগর ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামসমূহে গৃহস্থ কিংবা ব্যবসায়ী লোকের যত শস্য ছিল, সমস্তই ক্রীত হইয়া প্রকাশ্য হাটবাজারে প্রেরিত হইল এবং ঢক্কাধ্বনি দ্বারা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা প্রচার করা হইল যে, প্রত্যেক যোদ্ধা আবেদন করিলে ছয়মাসের খাদ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শস্য টাকায় অর্দ্ধসের করিয়া বিক্রীত হইতেছিল, অকস্মাৎ অমরচাঁদ যে কোথা হইতে একেবারে রাশি রাশি শস্য সংগ্রহ করিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া সকলে, বিশেষতঃ বিপক্ষগণ অত্যন্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। সৈন্ধবী-সেনাদলের অসন্তোষের কারণ দূরীভূত হইল; পূর্ণ সন্তোষ আসিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিল। তাহারা অমরের তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকাশ্য সভাস্থলে রাণার সমীপে আপনাদিগের বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিবার জন্য সমবেত হইয়া গমন করিল। রাজসভাতলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অগ্রনায়ক আদিল বেগ বিনয়বচনে কহিলেন, "মহারাজ! আমরা বহুদিন আপনার নিমক খাইয়াছি। আপনার পবিত্র রাজ-পরিবার হইতে অনেক সময় অনেক প্রকার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি; এখন আপনার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। আজি উদয়পুরই আমাদিগের মাতৃভূমি, উদয়পুরের সঙ্গেই আমরা আমাদের আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিব। আমাদের আর বেতনের অভিলাষ নাই, আমাদের খাদ্যসামগ্রী যখন নিঃশেষ হইবে, তখন আমরা পশুমাংস খাইয়াও প্রাণধারণ করিব। যদি তাহাও ফুরাইয়া যায়, দস্যু দাক্ষিণীদিগের দলোপরি পতিত হইয়া তরবারি-হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করিব।" মহাতেজা অমরচাঁদ সৈন্ধবী সেনাগণের হৃদয়ে যে তেজস্বিতা ঢালিয়া দিয়াছেন, আজি তাহার

জলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইল। তাহাদিগের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া রাণার নেত্রপ্রান্ত হইতে আনন্দাশ্রু-বারি বিগলিত হইল। আজি পাষাণ দ্রবীভূত হইল, বজ্রে শৈত্য অনুভূত হইল, তাঁহাকে অশ্রুত্যাগ করিতে দেখিয়া সৈন্ধবী সেনা ও রাজপুতবৃন্দ উন্মত্তের ন্যায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাজপুত-বীরত্বের এই প্রচণ্ড বিস্ফুরণ আশু সুদূর-প্রবাহিত হইল,—তাহাদিগের প্রচণ্ড জয়ধ্বনি ভীমরবে প্রতিধ্বনিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত সিন্ধিয়ার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল। এ দিকে সমুৎসাহিত রাজপুতবৃন্দ সিন্ধিয়ার পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের উপর জ্বলন্ত গোলক নিক্ষেপপূর্ব্বক আপনাদিগের উৎসাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুতের বীর্য্যাগ্নির এই আকস্মিক ভীষণ বিস্ফুরণ দর্শনে সিন্ধিয়ার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। আত্মরক্ষার্থ তিনি অবশেষে সেই সন্ধিবন্ধন পুনরায় বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এইবার অমরের জয়পতাকা উত্তোলনের উপযুক্ত অবসর। তিনি চতুরচূড়ামণি মহারাষ্ট্রীয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, ছয়মাস অবরোধজনিত কষ্ট সহ্য করাতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকথিত চুক্তির টাকা হইতে কাটিয়া লইব। ইহাতে যদি মত হয়, সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি, নচেৎ যুদ্ধই করিব।" চতুর হইয়াও সিন্ধিয়া আজি রাজপুতের চাতুর্য্যজালে বিজড়িত হইলেন। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সাড়ে তেষট্টি লক্ষ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক অমরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন।

সর্দারদিগকে নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি ও রত্নালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া রাণা তেত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন, সিন্ধিয়াকে তাহা দিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিবার জন্য ভূসম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগিলেন, এই জন্যই যোদ, জীরণ, নিমচ ও মরওয়ান প্রভৃতি কয়েকটি জনপদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। এই প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল যে, উভয় রাজ্যের কর্ম্মচারী উক্ত কতিপয় জনপদ পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং বৎসরে একবার করিয়া তাহাদিগের হিসাব নিকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। সন্ধিবন্ধন শেষ হইল। ১৮২৫ সংবৎ হইতে ১৮৩৯ সংবৎ পর্য্যন্ত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধিসমূহ যথানিয়মে প্রতিপালিত হইল। কিন্তু শেষবর্ষে সিন্ধিয়া রাণার কর্ম্মচারিগণকে আর কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে না দিয়া তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন এবং আর কোন প্রকার বন্দোবস্তও করিতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতরাং উক্ত জনপদগুলি মিবারের করচ্যুত হইল। ১৮৫১ সংবতে বিধাতার ইচ্ছায় সিন্ধিয়ার ভাগ্যগগন মেঘাবৃত হইলে, রাণা তৎসমস্ত জনপদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু সে অধিকার বহুদিন স্থায়ী হইল না, আবার তাঁহাকে তৎসমস্তের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে হইল। ১৮৩১ সংবতে প্রচণ্ড মহারাষ্ট্রীয়সমিতির পৃষ্ঠ-পূরকগণ পেশোয়ার অধীনতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের জন্য উপরিলিখিত জনপদগুলি রাখিয়া একমাত্র মরওয়ান হোলকারের করে সমর্পণ করিলেন। মিবারের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই রাজ্যক্ষয়ের অল্পক্ষণ পরেই নিমচহেরী নামক জনপদও রাণার হস্তচ্যুত হইল। দুর্দ্দান্ত হোলকার সিন্ধিয়াব সমীপে মরওয়ান পাইয়া এক বৎসর পূরেই রাণার নিকট হইতে উক্ত নিমচহেরী প্রার্থনা করিলেন এবং ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি রাণা তাঁহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ না করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতৃদস্যু সিন্ধিয়ার অবলম্বিত পথের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার ন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইবেন। রাণার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, নচেৎ বীরকেশরী মহারাজ বাপ্পার বংশধর হইয়া তাঁহাকে আজি মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর ভ্রূকুটিনিক্ষেপে ভীত হইতে হইবে কেন? মহাগৌরবান্বিত হইয়া আজি কেন তিনি অত্যাচারী হোলকারের অন্যায় আজ্ঞা মস্তকে বহন করিবেন?

১৮২৬ অব্দে দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধিয়ার আক্রমণ হইতে এই প্রকারে উদয়পুররাজ্য অব্যাহতি লাভ করিল। মিবাররাজ্যের অন্তর্গত অনেকগুলি উর্ব্বরভূমি রাণার করচ্যুত হইল। কিন্তু ঐ সকল জনপদ বিক্রীত কিংবা চিরদিনের জন্য মিবারের অধিকাবচ্যুত হয় নাই, কেবল বন্ধক রাখা হইয়াছিল। ইহাতেও মিবারের অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছিল। সেই অনিষ্ট হইতেই উক্ত রাজ্যের অধঃপতন তত শীঘ্র হইতে আরম্ভ হয়। যদিও মিবারের শোচনীয় দশাবশতঃ রাণাগণ ঐ সমস্ত জনপদ আর পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি তাঁহাবা কখনও তাহাব স্বত্বত্যাগ করেন নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়াবী দিবসে ব্রিটিশসিংহের সহিত রাণা ভীমসিংহের যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাতে রাণার দূতগণ ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশসিংহ উহার কিছু নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই।

বীরকেশরী মহাতেজা অমরচাঁদের প্রচণ্ড বল সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর মহারাষ্ট্রীয়বীর যে দিন উদয়পুর পরিত্যাগপূর্ব্বক সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন, সে দিন হতভাগ্য অপ-নৃপতি রতনসিংহের আশালতাব মূলে কুঠারাঘাত হইল। ইহার পূর্ব্বে তিনি কতকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং উদয়পুরের উপত্যকাভূমে একপ্রকার দৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টগগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। পরের সাহায্যে তিনি যে কয়েকটি নগর, দুর্গ ও পল্লী অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ক্রমে ক্রমে তাঁহার করচ্যুত হইতে লাগিল। রাজনগর, রায়পুর ও অন্তলা ক্রমে ক্রমে রাণার হস্তগত হইল। রতনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেকগুলি সর্দ্দার উদয়পুরে আসিয়া রাণার অনুগ্রহ লাভ করিল, তাহারা স্ব স্ব ভূমিবৃত্তিও পুনঃপ্রাপ্ত হইল। রতনসিংহ ক্রমে ক্রমে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। একমাত্র দেপ্রামন্ত্রী এবং মিবারের ষোড়শ শ্রেষ্ঠ সর্দ্দারের মধ্যে যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দেবগড়, ভীণ্ডির ও আমৈতের সর্দ্দার ব্যতীত আর কেহই তাঁহার পক্ষে থাকিল না। এই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ আশু প্রশমিত হয় নাই। অবশেষে ১৮৩১ অব্দে উক্ত তিন সর্দ্দারও মিবারের কিরীটস্বরূপ উর্ব্বর গদবাররাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া রাণার পক্ষ পুনরবলম্বন করিলেন। এই সমৃদ্ধিশালী গদবারপ্রদেশ মিবারের অপরাপর অধিকৃত জনপদ অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর ও মূল্যবান্, ইহার সীমাবন্ধনীর মধ্যে যে সকল সামন্ত অবস্থিতি করেন, অন্যান্য সামন্ত অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর রাজভক্ত ও রাজার প্রতি অনুরক্ত। রণবৎ, রাঠোর ও শোলাঙ্কি বহুদিন ধরিয়া রাজভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। গদবারের প্রায় অধিকাংশ ভূমিসম্পত্তিই ঐ সকল সর্দ্দারগণ ভোগ করিতেন। তাঁহারা তিন সহস্র অশ্ব এবং অসংখ্য পদাতি সেনা সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ভূমিভাগ ভোগ করিতেন। যোধপুর-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সম্মানসূচক রাণা উপাধির সহিত ঐ গদবার জনপদ মন্দরের পুরীহররাজের নিকট হইতে অর্জ্জিত হইয়াছিল। রাঠোরবীর যোধের রাজত্বসময়ে শিশোদীয় চণ্ডের প্রিয়তম পুত্রের হৃদয়শোণিতে যেরূপ ইহার উত্তরসীমা নির্দ্ধারণ হয়, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অপ নৃপতি রতনসিংহ যখন কমলমীরে বাস করেন, রাণা অমরসিংহ তখন যোধপুরপতি রাজা বিজয়সিংহের করে গদবারের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন কারণ ছিল। কমলমীর গদবারের নিকটবর্ত্তী। রাণা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রতনসিংহ সুবিধা পাইলে তাহা আচ্ছিন্ন করিয়া লইবেন। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া তিনি বিজয়সিংহের করে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যে চুক্তিপত্র বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, অত্যাপি তাহা বিদ্যমান আছে। সেই

চুক্তিপত্র অনুসারে মারবার-রাজকুমার রাণার সাহায্যার্থ উক্ত প্রদেশের উৎপন্ন রাজস্ব হইতে তিন সহস্র সৈনিকের ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আততায়ীর নিষ্ঠুরাচরণে অমরসিংহ যদি অকালে ইহলীলা সংবরণ না করিতেন, তাহা হইলে গদবাররাজ্য নিশ্চয়ই তাঁহার অধিকারভুক্ত হইত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজপুতগণের মধ্যে আহেরিয়া একটি চিরপ্রচলিত মহোৎসব। কিন্তু এই মহোৎসবব্যাপার মিবারের পক্ষে অনেকবার অনেক অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে। মিবারের তিন জন রাজা ইতিপূর্ব্বে এই আহেরিয়া উৎসব উপলক্ষে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছেন। সেই জন্য এক রাজপুতসতী সহমরণার্থ জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আহেরিয়ার মৃগয়াকালে রাণা ও রাও একত্র আসিলে উভয়ের মধ্যে একজনকে অবশ্যই মৃত্যুকবলে পতিত হইতে হইবে।" সেই পতিব্রতার ভবিষ্যদ্বাণী অবহেলা করিয়া অরিসিংহ মৃগয়াব্যাপারে লিপ্ত হন। মৃগয়া সমাপন-পূর্ব্বক রাণা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে হাব-রাজপুত্র অজিত হঠাৎ স্বীয় অশ্বকে রাণার দিকে উন্মত্তের ন্যায় চালিত করিয়া হস্তস্থ তীক্ষ্ণ ভল্লাঘাতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাণা শরবিদ্ধ মৃগেন্দ্রের ন্যায় আততায়ী অজিতের দিকে নেত্রপাত করিলেন এবং কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রে হার! তুই কি করিলি।" বলিতে বলিতে রাণা নিঃসংজ্ঞ হইয়া অশ্ব হইতে পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে ইন্দ্রগড়ের পাষণ্ড সর্দ্দার স্বীয় অসিপ্রহারে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। পাষণ্ড অজিতের পিতা পুত্রের ঐরূপ পৈশাচিক ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই দিন হইতে আর তাহার পাপমুখ দর্শন করেন নাই। প্রসিদ্ধি আছে, সমগ্র হার-সমিতি সেই দুর্ব্বৃত্ত অজিতের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছিল। সেই ভীষণ হত্যাকালে একজন রক্ষক ব্যতীত আর কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। রাণার সর্দ্দার ও সামন্তগণের কর্ণে ঐ রোমহর্ষণ হত্যাবিবরণ প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহারা আপনা-দিগের শিবির ও দ্রব্যসামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পরিবার ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন।

কিংবদন্তী আছে, মিবারের সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াই বুন্দিরাজকুমার ঐরূপ নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। সর্দ্দারগণ যে অরিসিংহের প্রতি একান্ত বিরক্ত, অরিসিংহের প্রতি যে তাঁহাদের আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল না, ইতিপূর্ব্বেই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। রাণা তাহা বুঝিতে পারিয়াও প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় ছিলেন। যে শালুম্ব্রাসর্দ্দারের পিতা রাণার স্বার্থসংরক্ষণ করিবার জন্য উজ্জীনযুদ্ধে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন, রাণা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া একদিন নিকটে আহ্বান করিলেন এবং বিদায়সূচক পান তাঁহার হস্তে দিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে অনুমতি করিলেন। শালুম্ব্রাসর্দ্দারের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। রাণার আকস্মিক অপ্রীতির এবং সেই কঠোর আজ্ঞার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বিনয়নম্রবচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাণা কিছুতেই শান্ত হইলেন না, বরং চন্দাবৎ-সর্দ্দারকে পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি যদি আমার আজ্ঞা পালন না কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" অগত্যা শালুম্ব্রাপতি ক্রোধান্ধ রাণার অনুমতিপালনে বাধ্য হইলেন এবং গমনসময়ে বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া গেলেন, "আমি নির্ব্বাসিত হইতে স্বীকৃত হইলাম বটে; কিন্তু ইহাতে আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের বিশেষ ক্ষতি হইবে।" অবমানিত চন্দাবৎ-সর্দ্দার যে অভিশাপ দিলেন, তাহা সত্বরেই ফলবান্ হইল। কিন্তু রাণার হত্যাসম্বন্ধে আর একটি

জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে, মিবারের সীমান্ত-প্রদেশে বিলৈত নামে একখানি ক্ষুদ্র পল্লী আছে, ঐ পল্লী মিবারের অন্তর্ভূত; কিন্তু বুন্দিরাজ তাহা আপনার বলিয়া সবলে অধিকার করেন। ইহাতেই সেই বিবাদের সূত্রপাত হয়। এ কথা কত দূর সত্য, বলা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠুর বুন্দিরাজকুমার রাণাকে গুপ্তহত্যা করিয়া কেবল কাপুরুষতা ও পশুভাবের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিল।

প্রাণভয়ে কাপুরুষ সর্দ্দার ও সৈনিকবৃন্দ অরিসিংহের শবদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাণার একমাত্র উপপত্নী সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনিই উপপতির অন্ত্যেষ্টিবিধান করিলেন। উৎকৃষ্ট চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা একটি বৃহৎ চিতা প্রস্তুত হইল। রাশীকৃত চন্দনসার এবং ঘৃত, শণযষ্টি, সর্জ্জরস ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী আনীত হইল। উপপতির শবদেহ অঙ্কে লইয়া তিনি সেই প্রচণ্ড চিতায় আরোহণ করিলেন। সম্মুখে একটি বটবৃক্ষ ছিল। সহমরণোৎসুকা সতী তরুরাজকে সাক্ষ্য রাখিয়া পতিহন্তার উদ্দেশে অভিশাপ প্রদান করিলেন;—"বনস্পতি! তুমিই সাক্ষী; যদি স্বার্থসাধনের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার প্রাণপতিকে বধ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও, দুই মাসের মধ্যে সেই দুরাচারের সর্ব্বাঙ্গ খসিয়া খসিয়া পড়িবে;—বিশ্বাসঘাতক ও রাজঘাতীর জলন্ত আদর্শ হইয়া সে সংসারে চিরদিনের জন্য ঘৃণার আস্পদ হইয়া থাকিবে। কিন্তু যদি বিবাদ-বিসংবাদ কিংবা পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবার অভিলাষে এরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে অভিশাপ ফলিবে না। দেখিও তরুরাজ! তুমিই সাক্ষী। যদি মহারাজ অরিসিংহ ব্যতীত অপর কাহাকেও আমি হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এই বাক্য নিশ্চয়ই সফল হইবে।" সতীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সেই তরুবরের একটি প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল, অমনি চিতা প্রজ্বলিত হইল, প্রচণ্ড অগ্নিশিখা দ্বারা ঊর্দ্ধগগন স্পর্শ করিল। অরিসিংহের শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া রাজপুতকুমারী প্রফুল্লবদনে সেই জলন্ত চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

অরিসিংহের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম হামির, দ্বিতীয়ের নাম ভীমসিংহ। ১৮১৮ সংবতে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) হামির মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হামির গিহ্লোটবংশের একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম ধারণপূর্ব্বক সংসাররঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু মিবারের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহা দ্বারা সেই পবিত্র নামের কিছুই সার্থকতা সংসাধিত হইল না। হামিরের বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশ বর্ষ; সুতরাং তাঁহার মাতাই রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মিবারের অসংখ্য অনর্থ একত্র পুঞ্জীকৃত হইল। একে মিবারের শোচনীয় দুর্দ্দশা, মহারাষ্ট্রীয় উৎপীড়ন, তাহাতে বালকের রাজত্ব ও নারীর রাজ্যশাসন;—সে রমণী আবার দারুণ দুরাকাক্ষার বশবর্ত্তিনী, সুতরাং আজ মহাকবি চাঁদভট্টের বচনানুসারে মিবারের অধঃপতন অনিবার্য্য। এই অনর্থকর সঙ্কটসময়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়া অনিষ্টের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করিল। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ পরস্পরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজি মিবারের এই দুরবস্থা দর্শনে আপন আপন প্রাধান্যলাভের জন্য তাঁহারা পরস্পরের হৃদয়শোণিতপাত করিতে সমুত্থিত হইলেন। শক্তাবৎসর্দ্দার রাজজননীর নীতি অবলম্বন করিলেন। এ দিকে অপমানিত শালুম্ব্রাসর্দ্দার অরিসিংহকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বর্গীয় রাণার বিধবা রাণীর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। এই ঘোরতর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইতে যে মহাগ্নি উৎপন্ন হইল, তাহাতে মিবারভূমি দগ্ধমরুশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত। সুযোগ পাইয়া অতি সামান্য দস্যুও মিবারের ধনরত্নলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। মিবারের শান্তজীবন কৃষকগণের উপর তাহারা পাশব অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। আজি মিবারের শোচনীয় সঙ্কটদশা উপস্থিত; পথ, ঘাট, প্রাঙ্গণ সমস্তই মানব-শোণিতে

পড়িল; রাজবারার নন্দনকানন সদৃশ মিবারভূমি চিতাভস্মময় শ্মশানের ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। মিবারের বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

বীরপুঙ্গব অমরের উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া যে সৈন্ধবী সেনাগণ ইতিপূর্ব্বে অটলা রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইয়াছিল, আজি অরিসিংহের পরলোকপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং সবলে রাজধানী অধিকারপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রাপ্য বেতনের জন্য শালুম্ব্রাসর্দ্দারকে নানারূপ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। রাজধানীরক্ষাভার শালুম্ব্রাপতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিতে অসমর্থ জানিয়া, দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাকে তপ্ত লৌহপাত্রে স্থাপন করিতে উদ্যত হইতেছিল, ইত্যবসরে অমরচাঁদ বুন্দি হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পাপিষ্ঠ সৈন্ধবীগণ অমরচাঁদকে দর্শনমাত্র শালুম্ব্রাপতিকে অব্যাহতি দান করিল। অমরচাঁদ প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ হইতে রাজকুমার হামিরের স্বত্ব দৃঢ়রূপে রক্ষণার্থ স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মানব-চরিত্র বিশেষ বিদিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, মন্ত্রিপদ অনেকের অভীপ্সিত এবং তাঁহাকে সেই পদে সমারূঢ় দেখিয়া অনেকেরই ঈর্ষাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। আব তিনি যে বাজপুত্রের স্বত্ব দৃঢ় বাখিতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তজ্জন্য অনেকে স্বল্পমাত্র ছিদ্র পাইলেই স্বার্থপর ও আত্মম্ভরী বলিয়া তাঁহার বৃথা অপবাদ ঘোষণা করিবে। অতএব যাহাতে কেহ সামান্য বিষয়েও তাঁহার কোনরূপ ছিদ্র না পায়, সেই জন্য উদারহৃদয় অমরচাঁদ স্বীয় ধনসম্পত্তির একখানি তালিকা করিয়া সমস্ত দ্রব্যই রাজজননীব নিকট প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণ, মুক্তা, মণিবত্ন প্রভৃতি, এমন কি, তোষাখানার বস্ত্রসমূহও এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক রাজজননীর নিকট প্রেরিত হইল। অমরচাঁদেব এই উদার ব্যবহার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। যাহাদের মনে তদ্বিরুদ্ধে সন্দেহ ও হিংসা জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। রাজজননী তাঁহাকে সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অমর সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কেবল যে বস্ত্রগুলি একবার ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেইগুলি প্রতিগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

রাজজননীর দুরাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি বুদ্ধিমতী রমণী বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, রামপিয়ারী নামে একটা দুঃশীলা সহচরী তাঁহার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিল। সেই পাপীয়সীর পরামর্শেই তিনি সকল কার্য্য করিতেন; এমন কি, তাহাব পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্যে পদমাত্র অগ্রসর হইতেন না। সেই দুষ্টার বুদ্ধিবৃত্তি আবার একটা সামান্য যুবক কর্ম্মচারী দ্বারা চালিত হইত; সুতরাং পরোক্ষভাবে সেই ব্যক্তিই রাজজননীব নিয়ন্তা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে আপন গৃহে বসিয়া যে চক্রচালনা করিত, তদ্দ্বারা হামিরমাতার সমস্ত কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত হইত। স্বার্থহীন অমরচাঁদকে অধিক দিন ইহলোকে থাকিতে হয় নাই। সেই সমস্ত পাষণ্ড কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ক্রূরচরিত্রা রাজজননী ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ অমরচাঁদের প্রত্যেক কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অমর যে তাঁহার পুত্রের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য তত গুরুতর ত্যাগস্বীকার করিলেন, তাহা রাজজননী নিমিষের জন্যও ভাবিয়া দেখিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার এত দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিয়াছিল যে, তিনি চন্দাবৎগণের সাহায্য-গ্রহণপূর্ব্বক ন্যায়নিষ্ঠ অমরের সকল কার্য্যেই প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ অমর তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বীয় অনুগত সৈন্ধবী সেনার সাহায্যে স্বীয় পদে দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণকে নগরে প্রবেশ করিতে না দিয়া রাজকীয় ভূমিগুলিকে নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু

তাঁহার দেহ রক্তমাংসে গঠিত ; সুতরাং ক্রূরগণের বিষেষবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি আর কত দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন ? যাহাদের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, তাহারা পরিশেষে তৎকৃত অসীম মহোপকার ভুলিয়া, বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্রোড়ে করিয়া, পিশাচী ও রাক্ষসীর ন্যায় ঘৃণিত মার্গে পদক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নানারূপে অপমান করিতে লাগিল। ইহাতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? অমর স্বভাবতঃ তেজস্বী ; কিঞ্চিন্মাত্র অপমানও তাঁহার হৃদয়ে সহ্য হইত না। কিন্তু তিনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেক প্রকার অপমান অম্লানমুখে সহ্য করিয়াছেন। কেন সহ্য করিয়াছেন ? কেবল শিশু রাজপুত্র হামিরের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে। আজি সেই হামিরের মাতাকে আপনার শত্রু হইতে দেখিয়া দারুণ ক্রোধ, অভিমান ও ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তথাপি কর্ত্তব্যপরায়ণ অমর নিজ কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ হইলেন না। একদিন তিনি আপন কার্য্যালয়ে উপবিষ্ট আছেন, সহচরী দুশ্চারিণী রামপিয়ারী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজজননীর নাম দিয়া কোন বিষয়ের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিল। মহাতেজা অমরের হৃদয় দারুণ রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাপীয়সীকে গালি দিয়া আপনার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন। রামপিয়ারীর মর্ম্মে আঘাত লাগিল, রোদন করিতে করিতে সে রাজজননীর নিকট উপস্থিত হইয়া নানারঙ্গে অনুরঞ্জিত করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রামপিয়ারীর অপমানে রাজমাতা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন। তৎক্ষণাৎ একখানি শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক শালুম্ব্রাসর্দ্দারের নিকট গমন করিলেন। চতুরচূড়ামণি অমর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহাতে একটি বিষম গণ্ডগোল বাধিবে, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে রাণীর সম্মুখীন হইলেন এবং বাহক ও অনুচরবর্গকে তখনই প্রাসাদমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, কাহার সাধ্য ? শিবিকা অন্তঃপুর দ্বারে আনীত হইল। অমর রাজজননীকে প্রণাম করিয়া ধীরগম্ভীরভাবে কহিলেন, "দেবি! অন্তঃপুর হইতে রাজমার্গে বহির্গত হইয়া আপনি কি ভাল কাজ করিয়াছেন ? ইহাতে কি আপনার জগৎপূজ্য স্বর্গীয় স্বামীর অপমান করা হয় নাই ? পতির মৃত্যুর পর সামান্যা কুম্ভকাররমণীও অন্ততঃ ছয়মাস অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হয় না ; আপনি শিশোদীয়বংশের রাজমহিষী হইয়া, আপনার স্বর্গীয় পতির মৃত্যুজনিত অশৌচকাল অতীত হইতে না হইতেই অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। আপনি বুদ্ধিমতী ; আপনাকে অধিক বলা আমার উচিত নহে,— অমরচাঁদকে আপনার বন্ধু ভিন্ন শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। অমর কৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক নহে যে, মহারাজ অরিসিংহের শিশুপুত্রের কোন প্রকার অনিষ্ট করিবে। আমার নিবেদন, আমি সম্প্রতি একটি গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনের উপক্রম করিতেছি ; ইহাতে আপনার ও আপনার কুমারগণের মঙ্গল ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না। সুতরাং আমার প্রতিকূলতাচরণ করা অপেক্ষা এ অবস্থায় সাহায্য করা আপনার কর্ত্তব্য। আপনি আমার নিবেদন গ্রাহ্য করুন ; আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, যখন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছি, তখন শত সহস্র বিঘ্ন প্রতিরোধ উপস্থিত হইলেও আমি কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইব না।" অমরের এই সমস্ত সারগর্ভ বাক্য ক্রূরমতি বাইজিরাজের (রাজজননীর) কর্ণে স্থানপ্রাপ্ত হইল না ; যত দিন অমর জীবিত রহিলেন, তত দিন তাঁহাকে বিষচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে যে দিন সেই ন্যায়নিষ্ঠ ধার্ম্মিকপ্রবর অমাত্য-শিরোমণি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যে দিন তাঁহার পূতত‌নু ভস্মাবশেষে পরিণত হইল, সেই দিন তিনি এই জগতের বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা ও কৃতঘ্নতা হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিত্যসুখধাম অমরসদনে গমন

করিলেন। অনেকে বলেন, পাপীয়সী বাইজিরাজ বিষপ্রয়োগে অমরের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। রাজজননী দুরাকাঙ্ক্ষিণী, নির্দ্দয়া ও ক্রূরমতি, তাহাতে এ কথা একেবারে অসত্য বলিয়াও বোধ হয় না। হায়! মনুষ্যজাতি কি কৃতঘ্ন! অনিত্য সংসার কেবল ভীষণ নরকযন্ত্রণার অন্ধকূপ! উদারপ্রকৃতি ধর্ম্মনিষ্ঠ অমরচাঁদ মাতৃভূমির উপকারার্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, যে অর্থের লোভে জগতে অসংখ্য অসংখ্য অনর্থ ঘটিতেছে, অযাচিত হইয়াই তিনি সেই বিপুল অর্থরাশি পরোপকারে বিনিয়োগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার এই গুণের পুরস্কার কি হইল? পদে পদে স্বজাতি ও আত্মীয়স্বজনের বিদ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অবশেষে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ অমরচাঁদ নিমেষের জন্য কখনও কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ হন নাই। কিন্তু যাহার জন্য তিনি তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা ও সেইরূপ আত্মত্যাগ স্বীকার করিলেন, সেই রাজমাতা পিশাচীর ন্যায় ঘৃণিত পথের অনুসরণ করিয়া বিষপ্রয়োগে স্বহস্তে সেই মহাত্মার জীবনবৃন্ত ছিন্ন করিয়া দিলেন। হায়! যে মহাপুরুষ স্বদেশের জন্য জীবনধারণ করিয়া স্বদেশীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, তিনি অনায়াসে ইচ্ছা করিলে যে কোন দেশের গৌরবস্বরূপ অধীশ্বর হইতে পারিতেন। হায়। হায়! মিবারের অযোগ্য অধীশ্বরী এমন মহাপুরুষের গুণমাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন না। জগতের আরও দুই চারি জন অমাত্য উচ্চতম গুণগৌরবে অলঙ্কৃত হইয়াছেন বটে; কিন্তু অমরের তুল্য কেহই শোচনীয় দীনদশায় নিপতিত হন নাই। অমরচাঁদ একটি বিশাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এরূপ নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের জন্য নাগরিকগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। অমরের উচ্চতম গুণরাশি দর্শন করিয়া রাজপুতগণ তাঁহাকে "অমরচাঁদ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অদ্যাপি রাজপুতবৃন্দের হৃদয় অমরের কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

হতভাগিনী রাজজননী মনে করিয়াছিলেন, অমরকে হত্যা করিলে আর কেহই তাঁহার শাসনের প্রতিকূলতাচরণ করিবে না, কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার সে মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। ১৮৩১ সংবতে (খৃঃ ১৭৭৫) বৈগু সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তৎকর্তৃক রাজমাতার শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। বৈগু একজন মেঘাবৎ-সামন্ত। মেঘাবৎ চন্দাবৎ গোত্রের একটি বিশাল শাখা। দুর্ম্মতি রাজজননী এই মেঘাবৎ-সামন্তের বীরবিক্রম প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। চতুরচূড়ামণি মহারাষ্ট্রীয়বীর সুবিধা পাইয়া সদলে বৈগুসর্দ্দারকে আক্রমণ করিলেন এবং বৈগু রাণার যে সমস্ত খাস জমী ইতিপূর্ব্বে সবলে অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার বিদ্রোহাচরণের প্রতিফলস্বরূপ তৎপ্রতি দ্বাদশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু মন্দভাগিনী রাজজননী তাঁহাকে যে আশায় আনয়ন করিয়াছিলেন, স্বার্থপরায়ণ মহারাষ্ট্রীয়পতি সে আশা পূরণ না করিয়া সেই সকল ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন। তিনি শিশু হাম্মিরের হস্তে তৎসমস্ত অর্পণ না করিয়া আপন জামাতা বীরজি তাপকে রতনগড়, খৈরী ও সিঙ্গোলি জনপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবশিষ্ট ইরনিয়া, জোথ, বীচোর ও নোদোয়ী প্রভৃতি কতিপয় জনপদ হোলকারকে প্রদান করিলেন। এই সকল জনপদের সমগ্র বার্ষিক আয় অন্যূন ছয় লক্ষ টাকা হইবে। দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ মিবারের পূর্ব্বোক্ত ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইল না, আবার (১৮৩০-৩১ অব্দের মধ্যে এবং ১৮৩৬ অব্দে) আরও তিনটি যুদ্ধপণ দাবী করিল। এই বিপুল পণ না পাওয়াতে তাহারা মিবারের আরও বহুসংখ্যক ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইল। এই প্রকারে দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রচণ্ড পীড়নে উৎপীড়িত ও দারুণ অন্তর্বিপ্লবে উত্তেজিত

হইয়া হামির রাজপুতসম্মত পূর্ণবয়সে (১৮ বর্ষ বয়ঃক্রমে) পদার্পণ করিতে না করিতেই ১৮৩৪ সংবতে (খৃঃ ১৭৭৮) দেহত্যাগ করিলেন।

যে দিন মহারাষ্ট্রীয়েরা মিবারভূমি সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করে, সেই দিন হইতে হামিরের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক চত্বারিংশ বৎসর হইবে ; এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে সকল নিষ্ঠুর মহারাষ্ট্রীয় পাশবী বৃত্তিতে প্রণোদিত হইয়া মিবারের ভূমি ও অর্থসম্পত্তি হরণ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এই চল্লিশ বর্ষের মধ্যে দুরন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের পাশব উৎপীড়ন হইতে মিবারের যে নিদারুণ শোচনীয় অধঃপতন হইল, তাহা হইতে মিবারভূমি আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না। সত্য বটে, মোগলরাজগণ স্বার্থপর ও প্রজাপীড়ক, তাহারা হিন্দুর সুখ-দুঃখের বিষয় ভাবিয়া দেখিত না, ইহাও সত্য, কিন্তু তাহাদিগের রাজ্য ছিল, তাহারা ভারতবাসি-গণকে আপনাদিগের প্রজা বলিয়া বিবেচনা করিত; হিন্দুর প্রতি নিদারুণ কঠোরতম অত্যাচার করিতে পারিত না ; ইহাতে সময়ে সময়ে তাহাদিগের উৎপীড়ন মন্দীভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা সেরূপ নহে, তাহারা ভারতবাসী সত্য, কিন্তু ভারতের জন্য তাহারা কিছুমাত্র চিন্তা করিত না। মহাবীর শিবজী তাহাদিগকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, যদি তাহারা সুনীতি অনুসারে সেই মন্ত্র পালন করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা মাতৃভূমির অসীম দুঃখ দূর করিতে অবশ্যই সমর্থ হইত। কিন্তু ভারতের কঠোর ভবিতব্যতা লঙ্ঘন করে কে ?—সেই জন্যই তাহারা মহাত্মা শিবজীর মহামন্ত্রে অবহেলা করিল এবং ভারতশ্মশানে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়া ইহার বীভৎসভাব আরও সহস্রগুণে বাড়াইয়া দিল। দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়েরা শোণিত-পিপাসু রাক্ষসকুলের ন্যায় দলে দলে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং যেখানে কিঞ্চিন্মাত্র লুণ্ঠনের গন্ধ পাইত, সেই স্থানেই আপতিত হইয়া তত্রত্য সমস্ত শোণিত শোষণ করিয়া ফেলিত। যাহা হউক, স্বার্থপরতা, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতেই মিবারের গৌরব-গরিমা অন্তর্হিত হইল ; চিতোর শ্মশানে পরিণত হইল ; চিরদিনের জন্য পবিত্র মিবারভূমি অনন্ত দুঃখসাগরের গভীর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া পড়িল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাণা ভীম;—সোমাজি মন্ত্রীর হত্যা; বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক চিতোরাধিকার; চিতোর আক্রমণ; জলিমের জিহাজপুর-প্রাপ্তি, হোলকার কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ; নাথদ্বারের পুরোহিতদিগকে বন্দীকরণ; কোতারিও-সর্দ্দারের বিক্রম প্রকাশ; লাকুবার মৃত্যু; মার্হাট্টা সেনানীদিগের প্রতি রাণার আক্রমণ; সিন্ধিয়া আক্রমণ; কৃষ্ণকুমারীর করলাভার্থ রাজপুতগণের মধ্যে বিবাদ, কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগ— মির-খাঁ ও অজিতসিংহ; উদয়পুরস্থ সিন্ধিয়ার রাজসভায় ব্রিটিশদূতের আগমন; মিবার উৎসাদন; ব্রিটিশের সহিত রাণার সন্ধিবন্ধন।

১৮৩৪ সংবতে (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে) ভীমসিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি রাণা হামিরের কনিষ্ঠ সহোদর।

চল্লিশ বৎসরের মধ্যে চারি জন অপ্রাপ্তব্যবহার রাজপুত্রের হস্তে মিবারের শাসনদণ্ড অর্পিত হইল। ভীমসিংহ তন্মধ্যে চতুর্থ। ইনি যে সময় ভ্রাতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন, তখন ইঁহার বয়স আট বৎসর। ভীমসিংহ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে মিবারে যে কত অনর্থরাশি ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিধাতা বীরকেশরী বাপ্পার বংশকে অধঃপাতিত করিবার অভিলাষেই যেন অলক্ষ্যে বসিয়া শিশোদীয়বংশের কঠোর ভবিতব্যতা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অপ্রাপ্তব্যবহারকাল উত্তীর্ণ হইলেও ভীমসিংহ অনেক দিন পর্য্যন্ত আপন জননীর শাসনাধীনে রহিলেন। এই অধীনতা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যচরিত্র নিয়ন্ত্রিত হইল। তিনি স্বভাবতঃ তেজোহীন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; বিশেষতঃ দুর্ভাগ্যের কঠোর তাড়নায় তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির বিন্দুমাত্রও তীক্ষ্ণতা রহিল না; স্বকীয় সামর্থ্য ও বিচারক্ষমতা হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। সুতরাং তিনি কতকগুলি কুচক্রী ব্যক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইতে লাগিলেন। অপ-নৃপতি দুর্ব্বুদ্ধি রতনসিংহের দলবল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ভীমসিংহ স্বীয় অকর্ম্মণ্যতাবশতঃ শেষে এত নিঃসহায় হইয় পড়িয়াছিলেন যে, কোন ভট্টগ্রন্থেই তাঁহার আর কোন বিবরণ বর্ণিত হয় নাই।

অনর্থক গৃহবিপ্লবই ভারতের সর্ব্বনাশের মূলকারণ। তাহার অন্তর্দাহী ভীষণ বহ্নিপ্রভাবে ভারতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। উচ্চক্ষমতাপ্রাপ্তি মানুষ মাত্রেরই অভীপ্সিত সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে হইবে, বিবেককে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে না, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, রাজপুতগণের মধ্যে এরূপ অনর্থকরী ক্ষমতাপ্রিয়তার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চন্দাবৎগণ রাণার নিকট উচ্চক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৪০ সংবতে (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে) তাহারা আপনাদিগের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎগণের শোণিতপাতে প্রতিশোধ-পিপাসার শান্তিবিধান করিয়া সেই রাজদত্ত ক্ষমতার

অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কোরাবারের অর্জ্জুনসিংহ * এবং আমৈতের প্রতাপসিংহ † ইঁহারা উভয়ে শালুম্ব্রাসর্দ্দারের প্রধান কুটুম্ব। চন্দাবৎসর্দ্দার ঐ দুই রাজপুতের সহিত মন্ত্রভবন অধিকার করিলেন এবং সমগ্র সৈন্ধবী সেনা, তাহার সেনাপতিদ্বয় চন্দন ও সেদিকে করগত করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করিতে উদ্যত হইলেন। এতদিন তিনি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় ছিলেন, সম্প্রতি উপযুক্ত অবসর পাইয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দার স্বীয় প্রতিদ্বন্দী শক্তাবৎসর্দ্দার মাক্ষমের ভাণ্ডীরদুর্গ অবরোধ করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়া রহিলেন।

শক্তাবৎ গোত্রের একটি নিম্নশাখাকুলে সংগ্রামসিংহ নামক একটি বীরপুরুষের জন্ম হয়। তদ্দারা মিবাররাজ্যে ভবিষ্যতে অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল। তিনি শনৈঃ শনৈঃ আপনার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছিলেন। ভীণ্ডীরাবরোধের কিছু দিন পূর্ব্বে সংগ্রাম-সিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দী পুরাবৎ-সর্দ্দারের সহিত একটি ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত থাকেন। পুরাবৎ-সর্দ্দারের লাওয়া নামে একটি দুর্গ ছিল; সংগ্রাম সেই দুর্গ অধিকার করেন। কিছু দিন পরে উভয়ের বিবাদ প্রশমিত হইয়া গেল। বিজয়ী সংগ্রামসিংহ সম্মানার্হ কুলপতি শক্তাবৎ-সর্দ্দারের উপকার করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভীণ্ডীর-দুর্গ চন্দাবৎগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। তখন তিনি কোরাবারপতি অর্জ্জুনের ভূমিবৃত্তি আক্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য গবাদি পশুগণকে করগত করিয়া লইলেন। তিনি সেই পশুগণকে তাড়িত করিয়া আনিতেছেন, ইত্যবসরে পথিমধ্যে অর্জ্জুনসিংহের পুত্র মোগলসিংহ তাঁহার পথ অবরোধপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সেই স্থানে উভয় পক্ষে ক্ষণকাল যুদ্ধ হইল। সংগ্রামের বিক্রমের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সেলিম তদীয় বর্শাঘাতে জীবনবিসর্জ্জন করিলেন। এই সমাচার আশু অর্জ্জুনের শ্রবণগোচর হইল। বিষম রোষ ও জিঘাংসায় তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। সবেগে শিরস্ত্রাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যতক্ষণ প্রতিফল দিতে না পারিতেছি, তাবৎ এই উষ্ণীষ ধারণ করিতেছি না।" স্বীয় সেনাগণের সহিত কোন প্রকার অকুশলের ভাণ করিয়া তিনি সেই অবরোধ-কারী সৈন্যদল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং দ্রুতগতি কোরাবারের অভিমুখে যাত্রা করিয়া সহসা শিবগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। সংগ্রামের বৃদ্ধ পিতা লালজী উক্ত শিবগড়ে বাস করিতেছিলেন। ভীলজনপদ চপ্পনের বক্ষশোভী গগনভেদী পর্ব্বতরাজি ও নিবিড় মহারণ্যের মধ্যভাগে উক্ত শিবগড় সংস্থিত। শিবগড় অতীব দুর্গম ও দুরারোহ বলিয়া সংগ্রাম ভাবিয়াছিলেন যে, বৈরিকুল কখনই তাহা সহসা করগত করিতে পারিবে না। তিনি নির্ভয়ে তন্মধ্যে স্বীয় পুত্রকলত্র ও পরিবারবৃন্দকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজি প্রতিজিঘাংসু অর্জ্জুনের জ্বলন্ত ক্রোধাগ্নি সেই বিজন গিরিগহনমধ্যস্থ দুর্গম শিবগড়দুর্গের প্রতি প্রচণ্ড দাবাগ্নিতেজে প্রবাহিত হইল। তিনি সসৈন্যে সেই দুর্গের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, দুর্গে রক্ষক নাই। তখন রোষোন্মত্ত অর্জ্জুন ভীমনাদে স্বীয় রণভেরী নিনাদিত করিয়া মেঘগম্ভীরস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই হৃদয়স্তম্ভন গর্জ্জনে দুর্গবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা সকলে দাবদগ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। শিবগড় রক্ষকহীন। একমাত্র বৃদ্ধ লালজী ব্যতীত আর কোন রণবীর তথায় উপস্থিত ছিলেন না। লালজীর বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষ। সপ্ততিনিদাঘের প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁহার কেশশ্মশ্রু ধূম্রবর্ণ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাঁহার গাত্রচর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি তিনি মহা উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া

* ইহার ভ্রাতা অজিতসিংহই বিজয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন।
† প্রতাপসিংহ মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন

তরুণবীরের ন্যায় তরবারি-হস্তে শত্রুসকাশে উপস্থিত হইলেন। আশু উভয়দলে ভীষণ যুদ্ধের উপক্রম হইল। সেই সংঘর্ষে বিকট অগ্নির দিগ্দাহী তেজ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া বৃদ্ধবীর যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। তাঁহার দুর্গ বিপক্ষের হস্তে পতিত হইল, বিজয়ী অর্জ্জুন পুত্রহন্তা সংগ্রামের শিশুসন্তানকে পশুভাবে বিনাশ করিয়া দুঃসহ পুত্রশোকানল নির্ব্বাণ করিলেন। সেই রোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয়সময়ে সংগ্রামের বৃদ্ধা মাতা প্রাণপতির মৃতদেহ বক্ষে লইয়া জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

কোরাবাররাজ অর্জ্জুনসিংহের এই কঠোর নিষ্ঠুরাচরণে প্রতিদ্বন্দ্বি-সম্প্রদায়মধ্যে যে ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল, কেহই তাহা নির্ব্বাণে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহা দাবাগ্নিরূপে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া মিবারভূমিকে দগ্ধশ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইহার উপর আবার অপ্রাপ্তব্যবহার ভীমের অকর্ম্মণ্যত্ব এবং নরপিশাচ মহারাষ্ট্রীয়দিগের মর্দ্দনশীল উৎপীড়ন হইতে রাজ্যের যে শোচনীয় দশা ঘটিল, তাহা হইতে আর কেহই পবিত্র মিবারকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না। সমর, সংগ্রাম, প্রতাপ ও রাজসিংহের সাধনভূমি, স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র রাজবারার নন্দনকানন মিবার শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত অনর্থের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণের পরস্পর শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চন্দাবৎগণ রাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদিগের সর্দ্দার ভীমসিংহের করে অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ভীমসিংহ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উচ্চপদের অবমাননা করিলেন। চিতোর ও উদয়পুরের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় ভূমিই তিনি আপনার অধীনস্থ সৈন্ধবী সেনার মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্যবহারে বোধ হয় যে, রাণার সহিত তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না; কারণ, ঐ সময়ে তাঁহার অধিপতি অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন, এ দিকে তিনি স্বীয় আত্মীয়স্বজনকে লইয়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদে বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। এমন কি, রাণা ভীম ইদরে নিজ বিবাহক্রিয়া সমাপন করিবার জন্য, টাকা ধার করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু এই কৃতঘ্ন সামন্ত স্বীয় কন্যার বিবাহোৎসবে প্রায় দশ লক্ষ টাকা প্রফুল্লমুখে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। চন্দাবৎ-সর্দ্দারের ঐরূপ ব্যবহারদর্শনে রাজজননী তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। চন্দাবৎগণের কর হইতে শাসনভার আচ্ছিন্ন করিয়া তিনি শক্তাবৎবর্গকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং ভীণ্ডীর ও লাওয়ার সামন্তদিগকে বিপুল সম্মান ও ক্ষমতা প্রদান করিলেন। শক্তাবতেরা রাণা-প্রদত্ত ক্ষমতা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ সেনাবল নাই, যদ্দ্বারা তাঁহারা শত্রুপরাজয় অথবা তাঁহাদিগের বিক্রম প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন। সুতরাং তাঁহারা চতুর্দ্দিকে সহায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং কোটাপতি জলিমসিংহের আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। চন্দাবৎগণের প্রতি জলিমসিংহের দারুণ বৈরভাব বদ্ধমূল ছিল, এ দিকে শক্তাবৎগণ তাঁহার অতি আত্মীয়, কারণ, তাঁহাদিগের সহিত তিনি বৈবাহিকসম্বন্ধে সংবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তিনি শক্তাবৎগণের মন্তব্য বিদিত হইবামাত্র তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু লালজী বল্লালের সমভিব্যাহারে অযুতসংখ্য সৈন্য লইয়া কুটুম্বগণের সহিত সমবেত হইলেন। শক্তাবৎগণ দুইটি কর্ত্তব্য স্থির করিল,—বিদ্রোহী চন্দাবৎগণের দমন আর অপ-নৃপতি রতনসিংহকে কমলমীর হইতে দূরীকরণ। চন্দাবতেরা সৈন্ধবীগণের সহিত চিতোরের প্রাচীন দুর্গে থাকিয়া রাণার প্রতিকূলে নানারূপ কুচক্র সৃষ্টি করিতেছিল। ইহাদিগকে দমন করাই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল, সুতরাং শক্তাবৎগণ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

মিবারে যখন এই ঘটনা ঘটে, সেই সময় দুর্দ্ধর্ষ মাধাজি সিন্ধিয়ার প্রচণ্ড প্রভুত্ব সহসা মারবার ও জয়পুরের একীভূত বিক্রমপ্রভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল এবং লালসন্তক্ষেত্রে বিজয়ী রাজপুত-বৃন্দের জয়লিপি বিজিত মহারাষ্ট্রীয়বীরের ললাটফলকে সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান হইল; দুর্দ্ধর্ষ গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। রাজপুতবৃন্দ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আপনাদের প্রণষ্ট ভূমিসম্পত্তি মহারাষ্ট্রীয়-কবল হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে রাঠোর ও কচ্ছবাহগণের আদর্শের অনুসরণপূর্ব্বক শিশোদীয়রাজও সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক হৃত রাজ্যসমূহ পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হইলেন। এই সময় গিহ্লোটবীরবৃন্দের পূর্ব্ববীর্য্যবত্তা একবার ক্ষণকালের জন্য বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল। রাণার দেওয়ান মালদাস মেহতা ও তদীয় সহকারী মৌজি-রাম এই দুই জন বিপুল সাহসী ও বুদ্ধিমান্। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে নিমবেহৈরা ও তন্নিকটবর্ত্তী মহারাষ্ট্র-দুর্গগুলি অধিকার করিলেন। তদ্দর্শনে পরাজিত ও বিতাড়িত মহারাষ্ট্রগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগের বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে লইয়া জোদ নামক স্থানে সমবেত হইলেন, সে উদ্যমও বিফল হইয়া গেল। রাজপুতবীরগণ আশু সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহাদিগকে তথা হইতেও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। জোদের শাসনকর্ত্তা শিবজিনানা বিজয়ী রাজপুতগণের আদেশে নির্ব্বিঘ্নে আপন আত্মীয়-স্বজন ও দ্রব্যসামগ্রী লইয়া দুর্গ হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে বৈগুসর্দ্দার মেঘসিংহের * পুত্রেরা সমবেত দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রগণকে বৈগু, সিঙ্গোলি এবং প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জনপদ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। সুবিধা পাইয়া চন্দাবৎগণও স্ব স্ব ভূমিবৃত্তি রামপুর জনপদ উদ্ধার করিয়া লইলেন। এই প্রকারে অল্পকালের মধ্যেই মিবারের করচ্যুত সমস্ত রাজ্যই কিছু দিনের জন্য জয়পতাকায় শোভিত হইয়া উঠিল;—মিবারের নিবিড় বিষাদান্ধকার কিছু দিনের জন্য অন্তরিত হইয়া গেল। বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি আর একবার হাস্যমুখী হইয়া শোভা পাইল; মিবারের অধিবাসিগণ দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কঠোর নিগড় হইতে অব্যাহতি পাইয়া সানন্দহৃদয়ে উচ্চকণ্ঠে শিশোদীয়বংশের জয়গান করিতে লাগিল।

রাজপুতগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মিবার ও মারবারের মধ্যপথ-বাহিনী বিরকিয়া নাম্নী নদীর তীরবর্ত্তী চর্দ্দী নামক স্থানে সমবেত হইয়া আপনাদিগের বিজয়িনী সেনা মিবারের অপরাপর স্থানে চালিত করিবার উদ্যম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনবধানতাদোষে সমস্ত উদ্যমই বিফল হইয়া গেল। জয়মদে মত্ত হইয়া তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না; ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়াই যথা তথা তরবারিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ সন্ধিপত্রের অবমাননা করিয়া অযথারূপে যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, যদি রাজপুতগণ তখন সেই সমস্ত উদ্ধার করিতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সবল চেষ্টাই ফলবতী হইত। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমান্ধ হইয়া মনে করিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়-গণ যখন একবার পরাজিত হইয়াছে, তখন তাহারা আর মস্তকোত্তোলনে সমর্থ হইবে না। এই ধারণাবশতঃ তাঁহারা মহারাষ্ট্রগণের ন্যায়লব্ধ জনপদগুলিও হরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীররমণী অহল্যা-বাইয়ের প্রচণ্ড ভুজবলে তাঁহাদিগের সকল উদ্যম নিষ্ফল হইয়া গেল। অহল্যাবাই হোলকাররাজ্যের রাজমহিষী। রাজপুতগণকে নিমবেহৈরা করগত করিতে দেখিয়া

* মেঘসিংহ বৈগু-জনপদের অধীশ্বর। চন্দাবৎ গোত্রে তাঁহার জন্ম। তাঁহার সন্তানসন্ততিরা মেঘাবৎ নামে অভিহিত। মেঘসিংহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, এই হেতু "কালমেঘ" নামে অভিহিত হইলেন।

তিনি সিন্ধিয়ার দলভুক্ত সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় টুজি সিন্ধিয়া ও শ্রীভাই পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিজিত শিবনানাকে আনুকূল্য করিতে মুন্দিসর অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। শিবনানা তখন মুন্দিসরে থাকিয়া অবরোধকারী রাজপুত সৈনিকবৃন্দকে প্রচণ্ড ভুজবলের সহিত দলিত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সহযোগী মহারাষ্ট্রীয়গণ সসৈন্যে সেই নগরের নিকটবর্ত্তী হইল এবং রাণার সেনাদলকে অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করিল। ১৮৪৪ সংবতের মাঘমাসের চতুর্থ দিবসে মঙ্গলবারে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। রাজপুতবৃন্দ অসতর্ক ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভীষণ বল প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না, অতএব তাঁহারা অবিলম্বেই পরাজিত হইলেন। রাণার মন্ত্রী অনেকগুলি সৈন্যসামন্তসহ রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন এবং কানোর ও সদ্রিপতি স্ব স্ব সেনাদলের সহিত দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সদ্রিপতির আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়াতে তিনি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না; কাজেই শত্রুহস্তে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইল। মাধাজি সিন্ধিয়ার পরাজয়বশতঃ রাজপুতবৃন্দ ইতিপূর্ব্বে যে সকল জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন, একমাত্র জোদ ব্যতীত তৎসমস্তই আবার মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকৃত হইল। একমাত্র বীর দীপচাঁদের অদ্ভুত বিক্রমকৌশলে জোদ রক্ষিত হইয়াছিল। দীপচাঁদ ক্রমাগত একমাস ধরিয়া মহাবীরত্বের সহিত জোদ রক্ষা করিয়া পরিশেষে স্বীয় কামান, বন্দুক ও সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে শত্রুর সেনাব্যূহ ভেদপূর্ব্বক মঙ্গলগড় দুর্গে গমন করিলেন। এই প্রকারে মন্দভাগ্য রাজপুতগণের দুঃখযামিনীর অবসান হইতে না হইতেই আবার বিপদের ঘোর অন্ধকার আসিয়া তাঁহাদিগকে আবরণ করিল; তাঁহারা যে যে চেষ্টা ও যে যে উদ্যম করিলেন, সমস্তই বিফল হইয়া গেল।

এই ভয়াবহ বিপ্লবের সময় একমাত্র চন্দাবৎ ভিন্ন মিবারের আর যাবতীয় সর্দ্দার ও সামন্তগণ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। চন্দাবৎদিগের আন্তরিক দুরভিসন্ধি স্বতই প্রকাশ পাইল। তাহারা ক্রমে ক্রমে এত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল যে, রাজজননী ও রাণার নবীন মন্ত্রী সোমজী রাজ-পুত্রের স্বার্থ দৃঢ় রাখিবার জন্য তাহাদিগের সহিত তুমুল বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহাদিগকে বিনীত করিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন এবং মধ্যস্থস্বরূপ রামপিয়ারীকে শালুম্ব্রাসর্দ্দারের নিকট প্রেরণ করিলেন। শালুম্ব্রাসর্দ্দার শান্তভাব ধারণ করিলেন এবং রাজপুত্রের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিবার জন্য উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। উদয়পুরে উপস্থিত হইয়াই তিনি ছলনাবাক্যে কহিলেন, "আমি মন্ত্রী সোমজীর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।" এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু সোমজীকে কৌশল-জালে জড়িত করিয়া আপন কার্য্যসিদ্ধি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সোমজী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। সোমজীর দ্বারাই শালুম্ব্রাসর্দ্দারের লালিত দুরাকাঙ্ক্ষার পথে দারুণ প্রতিরোধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহাকে নিপাত করিয়া সেই সকল প্রতিরোধ দূর করিবার জন্যই শালুম্ব্রাপতি এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একদিন সোমজী স্বীয় মন্ত্রণাগারে রাজকার্য্যে সংলিপ্ত আছেন, ইত্যবসরে কোয়াবারের অর্জ্জুনসিংহ এবং ভাদেশ্বরের সর্দ্দারসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন। সোমজীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই সর্দ্দারসিংহ তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ সাহসে আমার ভূমিবৃত্তি পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন?" এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই স্বীয় উন্মুক্ত ছুরিকা মন্ত্রীর হৃদয়ে প্রবেশিত করিলেন। এই লোমহর্ষণকর হত্যানিবন্ধন রাজ্যমধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। রাজকর্ম্মচারীরা দুর্ব্বৃত্ত চন্দাবৎগণের ভয়ে ইতস্ততঃ সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। রাণা সেই

সময়ে সুহেলিয়া বাড়ী (অপ্সর-কানন) নামক উদ্যানবাটিকায় বেদনোরের জৈৎসিংহ এবং অপরাপর সর্দ্দারগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত ছিলেন। হতভাগ্য সোমজীর ভ্রাতৃদ্বয় "রক্ষা করুন! রক্ষা করুন্!" বলিয়া চাৎকার করিতে করিতে সেই প্রমোদ-বাটিকায় উপস্থিত হইলেন। দুর্দ্দান্ত অর্জ্জুনসিংহ তাঁহাদিগের অনুসরণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেই গৃহমধ্যেই প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার দক্ষিণকর তখনও সোমজীর হৃদয়শোণিতে অনুরঞ্জিত। তাঁহার দুঃসাহসিকতা দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রাণা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিয়া নির্ব্বাসিত হইতে অনুমতি করিলেন। অতঃপর এই বীভৎস ও নিষ্ঠুর কাণ্ডের অভিনেতৃগণ স্ব স্ব সেনাপতি শালুম্ব্রাসর্দ্দারের সহিত চিতোরনগরে প্রস্থান করিলেন। সোমজীর ভ্রাতৃদ্বয় শিবদাস ও সতীদাস মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং শক্তাবৎগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহী চন্দাবৎগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ইঁহারা যে কয়েকটি সংগ্রামের অভিনয় করেন, তন্মধ্যে আকোলাক্ষেত্রের যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন স্থানেই জয়লাভ করিতে পারেন নাই। ঐ যুদ্ধে কোরাবারের অর্জ্জুনসিংহ চন্দাবৎদিগের সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইহার স্বল্পকাল পরেই ক্ষীরোদাক্ষেত্রে শক্তাবৎগণ আবার পরাভূত হইলেন। এই ভয়াবহ সংঘর্ষসময়ে রাজ্যমধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল হইতে লাগিল যে, সকলেরই হৃদয় আশঙ্কায় আকুলিত হইয়া উঠিল। যেন ভয়ঙ্করী অরাজকতা ভীমবেশ পরিগ্রহ করিয়া মিবারের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল। যে পক্ষে জয়লাভ হইতে লাগিল, তাহাদেরই নিষ্ঠুর ব্যবহারে হতভাগ্য প্রজাবৃন্দের ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। কৃষক প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া যে শস্য উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা ভোগ করিতে পাইল না; স্বর্ণকার, লোহকার ও চর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পিগণ হৃদয়ের শোণিতদানে যে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার ফলভোগে বঞ্চিত হইল; বণিক্ সর্ব্বস্ব-বিনিময়ের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলেও বিক্রয় করিতে পারিল না;—পাষণ্ড দস্যুগণ সমস্তই লুণ্ঠন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে মিবারে দস্যুতস্করের নামমাত্র শ্রুত হইত না, আজি দুর্দ্ধর্ষ চন্দাবৎগণের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সেই মিবারের গৃহে গৃহে দস্যুতস্করেরা প্রবেশ করিতে লাগিল। ধনসম্পত্তি দূরে থাকুক, প্রজাবৃন্দের জীবন ও মানমর্য্যাদা বিপন্ন হইয়া উঠিল। সুতরাং সকলে নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এই অনর্থকরী দস্যুতা ও অরাজকতার অভিনয়ে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই রত্নভূমি মিবার অর্দ্ধেক প্রজা হারাইল। ভূম্যধিকারীর শস্যক্ষেত্র, কৃষকের হল, গোধন, তন্তুবায়ের বসনবয়ন এবং বণিকের বাণিজ্যগৃহ সমস্তই শূন্য হইয়া রহিল। যে সমস্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ হর্ম্ম্যরাজির অভ্যন্তরদেশ রমণীকুলের অমিয়-হাস্যে কিংবা বিমল নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহা যেন শূন্য-শ্মশান বলিয়া অনুমিত হইল; হিংস্র শ্বাপদকুল নিবিড় অরণ্যবাস পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মিবারের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না।

সেই সার্ব্বজনীন সংঘর্ষের সময় রাজায় প্রজায় ও ধনীতে নির্ধনে কিছুই পার্থক্য রহিল না। সে সময়ে যাহার বল ছিল, সেই ব্যক্তিই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল; সেই ব্যক্তিই সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল; নতুবা সকলেই পাষণ্ড দস্যুগণের দ্বারা সমানরূপে উৎপীড়িত হইল। বস্তুতঃ রাজ্যের অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িল; রাণাও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইলেন। কোথায় তিনি বিপন্ন প্রজাকুলকে আশ্রয়দান করিবেন, তাহা না হইয়া তিনি নিজে আশ্রয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সহিত প্রজাবৃন্দের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা ছিন্ন

হইয়া গেল এবং সকলেই আত্মরক্ষার্থ সাধ্যানুসারে আত্মবল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। রাণার এই প্রকার অকর্ম্মণ্যতাবশতঃ রাজ্যমধ্যে আরও কতকগুলি মহান্ অনর্থের উদ্ভব হইল। যে সকল কৃষক মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল না, তাহারা স্ব স্ব স্বার্থসংরক্ষার্থ অন্য কোন এক যোদ্ধার আনুকূল্য গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহার আনুকূল্যের প্রতিদানস্বরূপ তাহাকে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট অর্থদানে স্বীকৃত হইল। লোকের স্বার্থরক্ষণলিপ্সা যতই বলবতী হইতে লাগিল; ততই রক্ষকের প্রয়োজনবৃদ্ধি হইল। এই হেতু যে রাজপুত অশ্বারোহণে ও ভল্লচালনে দক্ষ, সেই ব্যক্তিই একজন বীরমধ্যে গণনীয় হইল এবং তাহারই তরবারি-সাহায্য অনেকেরই প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। এই সকল অশ্বারোহী নানারূপ কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। কৃষকগণের নিকট হইতে তাহারা আপনাদিগের প্রদত্ত সাহায্যের পণ হইতে আরম্ভ করিয়া বণিক্‌দিগের পণ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে লাগিল, তাহাদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায়ও করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের এই নিষ্ঠুর আচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন বণিক্‌ই তাহাদিগকে শুল্ক দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিল না। এইরূপ শুল্কসংগ্রহণ ক্রমে সেই সমস্ত রাজপুতের বৃত্তিরূপে পরিণত হইল। এমন কি, উক্ত নিষ্ঠুরাচরণ দূরীকৃত হইলেও তাহারা বহুদিন যাবৎ ঐ বৃত্তি দাবী করিয়াছিল। ঐ সকল দাবীদাওয়ার মীমাংসা করা ক্রমে অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক, ঐ সমস্ত ভীষণ অন্তর্বিপ্লব হইতেই রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহার উপর আবার দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ দলে দলে মিবারভূমে উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন মিবারের দুর্দ্দশা দ্বিগুণতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

চন্দাবৎগণের বিদ্রোহিতা নিবন্ধন রাজ্যমধ্যে এইরূপ অনর্থের উদ্ভব দর্শনে রাণা ও তাঁহার অমাত্যবর্গ বিদ্রোহীদিগকে চিতোর হইতে বিতাড়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। যে পাষণ্ড সিন্ধিয়া অপ-নৃপতি রতনসিংহের সাহায্যে অবতীর্ণ হইয়া পিশাচের ন্যায় মিবারের অর্দ্ধেক শোণিত শোষণ করিয়াছে, আজি বিধিবিড়ম্বিত মন্দভাগ্য রাণা তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন, তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং নিতান্ত কাপুরুষ; নচেৎ যে ব্যক্তি মিবারের সর্ব্বনাশ করিল, আবার তাহাকেই বন্ধুভাবে আহ্বান করিবেন কেন? কিংবদন্তী আছে, এই কার্য্যে জলিমসিংহ রাণাকে প্রণোদিত করেন। ১৮৪৭ সংবতে (১৭৯১ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হয়। সিন্ধিয়া তখন পুষ্করহ্রদের পবিত্র তীরে সুবিমল শান্তি-সুখসম্ভোগ করিতেছিলেন। লালসন্তক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া অবধি তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসীবীর দিবোয়ের করে আপন সেনাদলের সংস্কারসাধনের ভার দেন। সেই ইউরোপীয় বীরের সুচারুশিক্ষার গুণে মহারাষ্ট্রীয় সেনা পূর্ব্ববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। ক্রমে মৈরতা ও পত্তনক্ষেত্রে সেই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের বিক্রমানলের জলন্ত তেজ বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল। রাঠোরগণ অসীম বীরত্ব প্রকাশ ও ভূরিপরিমাণে আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াও সে বিক্রমাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইলেন না; তাঁহাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। রাজবারা-প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় সিন্ধিয়ার প্রণষ্ট প্রতিষ্ঠা আবার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল; তাঁহার গৌরব আবার দিব্যতেজে উদ্‌ভাসিত হইল। রাণার আজ্ঞায় জলিমসিংহ মিবারের প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। জলিমসিংহের মুখে রাণার অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া সিন্ধিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং সানন্দচিত্তে তাঁহাদিগের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। এই ঘটনাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজবারার রাজনৈতিক রঙ্গভূমে যে সকল মহানুভববৃন্দ অবতীর্ণ হইলেন,

তাঁহাদের অসীম বীরানুষ্ঠান রাজপুতানার ইতিবৃত্তে একটি নূতন যুগের অবতারণা করিল। এরূপ বীরত্বের পরিচয় অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে জলিমসিংহ কোটার প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উচ্চপদে আরোহণ করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ শত্রুকুল দমনে রাখা যদিও সামান্য কার্য্য নহে, তথাপি তিনি তাহাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে যে এক উচ্চ অভিলাষ শনৈঃ শনৈঃ গুপ্তভাবে প্রসারিত হইতেছিল, তাহার সন্তোষের পক্ষে কোটার প্রধিনিধিত্ব অতি তুচ্ছ। সেই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ রাজনৈতিক ভূমে বিচরণ করিলে তাঁহার সেই উচ্চ বাসনা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবে না। সেই উচ্চ বাসনা কি?—মিবাররাজ্যে চির-আধিপত্যপ্রাপ্তি। জলিমসিংহ যেমন রাজনীতি-বিশারদ, সেইরূপ মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতম ভাবসংগ্রহেও সুদক্ষ। এইরূপ পারদর্শিতাবলেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কাপুরুষ রাণা তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ বিঘ্নবাধা দিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা হইলেই তিনি মিবারের সহিত হারাবতীর রাজস্ব একত্র করিয়া সমস্ত রাজবারার অধিনায়ক হইয়া উঠিতে পারিবেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, জয়পুররাজ ও মারবারের অধিপতি মিলিত হইলেও তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। জলিম জয়পুরের রাজাকে নারীজ্ঞানে ঘৃণা করিতেন; কারণ, তিনি একমাত্র কোটার সেনাদলের সাহায্যেই কুশাবহরাজের মহতী সেনাকে সবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এ দিকে মারবারের শ্রেষ্ঠ সামন্তবৃন্দ তৎপ্রতি যে প্রকার অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাঁহার নিশ্চয় ধারণা ছিল যে, তাঁহারা কদাচ তৎপ্রতিকূলে অসিধারণ করিবেন না। রাজনীতিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিশারদ জলিমসিংহের পণ উচ্চতর, আশাপূর্ণা ভগবতী বরদামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সিদ্ধিকরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু একমাত্র সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না না হওয়াতে তিনি অমূল্য বরলাভে বঞ্চিত হইলেন। মনোরথ পূর্ণ হইলে তাঁহার সহিত ভারতের ভাগ্যচক্র অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইত; ভারতের ভাগ্যাকাশে আবার স্বাধীনতাসূর্য্য দর্শন দিত; আবার দুঃখযামিনী প্রভাত হইত। কিন্তু বিধাতা মন্দভাগিনী ভারতভূমির ললাটফলকে স্বাধীনতা লিপিবদ্ধ করেন নাই, কাজেই জলিমসিংহ সেই অমূল্য বরলাভে বঞ্চিত হইলেন। আপনার মহামন্ত্রসাধনার্থ তিনি যে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার পদস্খলন হইল। সেই পদস্খলন হইতে উদ্যোগী পুরুষপ্রবর বীর জলিমসিংহ আর উত্থিত হইতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে না পারিয়া একমাত্র রাজবারার নেষ্টর * বলিয়া গণনীয় হইলেন।

রাজনীতিবিশারদ সুবুদ্ধি জলিমসিংহ বহুদিন হইতে যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেই আশা ফলবতী হইবার উদ্যোগ হইল। রাণা স্বীয় বল দৃঢ়ীকরণের ভার জলিমের করে অর্পণ করিলেন। সেই গুরুতর কার্য্যসম্পাদনচ্ছলে জলিম আপনার অভীষ্টসিদ্ধির উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। যদি তাঁহার সেই সকল কৌশল সফল হইত, যদি তিনি স্বীয় অভিসন্ধি সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের যে কি মহোপকার সাধিত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। রাণা যে গুরুতর ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, তাহা যথাবিধি সংসাধন করিতে অতুল অর্থের আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে চিতোর আচ্ছিন্ন

---

* গ্রীসীয় পুরাণের মতে নেষ্টর একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁহার পিতার নাম নিলিয়স। প্রসিদ্ধি আছে. নিলিয়স? বরুণদেবের পুত্র। নেষ্টর অতি বুদ্ধিমান্, রাজনীতিবিশারদ ও রণদক্ষ রাজা ছিলেন।

করিতেও বহুল অর্থব্যয় হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ অর্থ ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হইতে পারে না; কাজেই অর্থের আবশ্যক। কিন্তু কিরূপে সেই বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, জলিম এই চিন্তায় আকুল হইলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, বিদ্রোহিগণই যখন মিবারের ঐ অর্থপ্রয়োজনের প্রধান কারণ, তখন তাহাদিগের নিকট হইতেই উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। রাজপরিবারসংক্রান্ত যে সকল ক্ষেত্র চন্দাবৎগণেরা অধিকার করিয়াছে, তৎসমুদয় এবং তদ্ভিন্ন আরও চৌষট্টি লক্ষ টাকা তাহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই চৌষট্টি লক্ষ টাকা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার তিন অংশ সিন্ধিয়ার হস্তে অর্পিত হইবে, অবশিষ্ট টাকা রাণার অর্থাভাবপূরণার্থে ব্যয়িত হইবে। এই প্রকার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া জলিমসিংহ একটি মহাবল সেনাদল লইয়া অবিলম্বেই চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অম্বজি ইঙ্গলিয়ার হস্তে ঐ সেনাদলের পরিচালনের ভার প্রদত্ত হইল। এ দিকে সিন্ধিয়া মারবাররাজের নিকট হইতে পণগ্রহণ করিবার জন্য তৎপ্রদেশের প্রান্তভাগ হইয়া সদলে যাত্রা করিলেন। জলিম ও অম্বজি সসৈন্যে চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; শত শত শ্যামল শস্যপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্র তাঁহাদিগের দুর্জ্জয় সৈনিকগণের পদদলনে ছারখার হইয়া গেল; কত সুরম্য গ্রাম ও পল্লী উৎপীড়িত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যে সমস্ত গ্রাম বা নগর জলিমের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল, তাহার আর দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। জলিম তত্রত্য শাসনকর্ত্তা বা গ্রামীনগণের নিকট হইতে যথেচ্ছ পণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ধীরাজসিংহ নামক এক ব্যক্তি চন্দাবৎসর্দ্দার ভীমসিংহের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও সাহসী। এই মহাসংঘর্ষের সময় ধীরাজ হামিরগড়ের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাকে বিদ্রোহিদলের অন্তর্ভুক্ত জানিয়া জলিমসিংহ অবিলম্বেই হামিরগড় অবরোধ করিলেন। ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু কোন পক্ষেই জয়পরাজয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। ছয় সপ্তাহের পর বিধাতার কঠোর নিয়মানুসারে ধীরাজসিংহের সৌভাগ্যগগন মেঘাবৃত হইয়া পড়িল। হামিরগড়ের কূপসমূহের উৎসগুলি জলিমসিংহের কামানশ্রেণীর সংঘর্ষণে ভগ্ন ও প্রণষ্ট হইলে জলাভাবে ভীষণ যন্ত্রণা পাইয়া নাগরিকবৃন্দ অবশেষে দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। অবিলম্বে জলিমসিংহ হামিরগড় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই প্রকারে আরও দুই এক স্থান করগত করিয়া রাজকীয় সেনাদল ধীরে ধীরে চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে বসী নামক আর একটি স্থান তাহাদিগের নেত্রপথে পড়িল। তাহারা তৎক্ষণাৎ সে স্থানও অবরোধ করিল। বসী চন্দাবৎ ভূমিবৃত্তি; কিন্তু সুদক্ষ জলিম অবশেষে তাহাও করগত করিয়া লইলেন এবং বিজয়মদে উন্মত্ত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই চিতোর নগরে উপস্থিত হইলেন। চিতোরের সমুচ্চ প্রাকারাবলীর মূলদেশে সেনাদল শিবির স্থাপন করিল। ক্ষণকালের মধ্যে সিন্ধিয়া ও তদধীন বিশাল সেনা আসিয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থ যোগদান করিল।

প্রায়ই দেখা যায়, একটু উচ্চপদ পাইলেই অহঙ্কার ও গর্ব্ব আসিয়া হৃদয় বিমোহিত করে। যে রাণার দর্শন পাইলে স্বয়ং পেশোয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন, আজি মাধাজি সিন্ধিয়া চিতোরের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন। সিন্ধিয়ার এই প্রকার ন্যায়বিরুদ্ধ বাসনা দেখিয়া জলিমসিংহ ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু কি করিবেন? পরিশেষে তিনি গর্ব্বিত মাধাজির উচ্চ অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য উদয়পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! যে রাণার পূর্ব্বপুরুষগণকে দেখিবার জন্য নানা উপহার লইয়া ভারতের নানা স্থান হইতে

উচ্চবংশীয় রাজবৃন্দ শিশোদীয়গণের রাজসভায় উপস্থিত হইতেন, আজি তাঁহাকে একজন মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজসিংহাসন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক রাজপথে বহির্গত হইতে হইল। রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রমেরুর পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে রাণা ও সিন্ধিয়া পরস্পরে সাক্ষাৎ হইল। সিন্ধিয়া রাণাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া অবরোধকারী সেনাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। এ সমস্ত ব্যাপার অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সমাপিত হইল। কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে যে অসামান্য ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহাতে সুতীক্ষমতি জলিমের অভীষ্টসিদ্ধির পথে মহাবিঘ্ন স্থাপিত হইল, তাঁহার ভাগ্যাকাশ তিমিরমেঘজালে সমাবৃত হইয়া পড়িল। যখন সিন্ধিয়া ও জলিম রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চিতোর হইতে গমন করেন, তখন একমাত্র অম্বজি সসৈন্যে চিতোরে অবস্থিত থাকিলেন। জলিমের অন্তরে যে সমস্ত নবীন আশালতা গোপনে গোপনে শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, অম্বজি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জলিম আপনার অভিসন্ধি যদিও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই, তথাপি তিনি সুচতুর মহারাষ্ট্রীয় বীর অম্বজির তীক্ষনেত্রের সম্মুখে তাহা গোপন রাখিতে পারেন নাই। তিনি যত গোপন করিতে প্রয়াস পাইতেন, অম্বজির অন্তর ততই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিত; ততই মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহার মনোভাব বুঝিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইতেন। অম্বজি বুঝিতে পারিলেন যে, জলিম একটি উচ্চতম মনোরথসিদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, জলিমের সেই উচ্চতম অভিসন্ধি সিদ্ধ হইলে তাঁহার সকল আশা বিফল হইয়া যাইবে, তাঁহাকে জলিমের অনুগত হইয়া শুদ্ধ একটি সহকারী সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এই প্রকার ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে তিনি জলিমের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিতে উদ্যত হইলেন। এত দিনের পর উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। আজি জলিমকে স্থানান্তরিত দেখিয়া তাঁহার বিক্রম-প্রভুত্ব বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বিদ্রোহী চন্দাবৎ সর্দ্দারের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। জলিম অম্বজিকে বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি যদিও আপনার অভিসন্ধি অম্বজির নিকটে প্রকাশ করেন নাই, তথাপি অম্বজির প্রতি তাঁহার বিশ্বাসের হ্রাস হয় নাই। তিনি জানিতেন যে, অম্বজি তাঁহার কোন প্রকার অপকার করিবেন না। এই ধারণাবশতই জলিমের কৌশলজাল ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহার সৌভাগ্য-গগনে ঘোর মেঘপুঞ্জ দেখা দিল। নীচাশয়তাতে জলিম যদি স্বীয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হইতেন, তাহা হইলে তিনি অম্বজির চাতুর্য্যজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আপন স্বাভাবিক তীক্ষবুদ্ধিবলে স্বীয় অদৃষ্টের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেন। তিনি যখন আপনার অধঃপতন অনিবার্য্য বুঝিতে পারিলেন, তখন ইচ্ছা করিলে যে কোনরূপে হউক, পুনরুত্থিত হইতে পারিতেন, কিন্তু কোন অন্যায় উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক উদ্ধারের চেষ্টা করা অপেক্ষা অধঃপতনই শ্রেয়ঃ বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সুতরাং তাঁহার সকল কল্পনাই বিফল হইয়া গেল। যে সমস্ত কল্পনার কার্য্যকারিতাপ্রভাবে তিনি বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধিনায়ক হইয়া কোটি কোটি ভারত-সন্তানের ভাগ্যচক্র নিয়মন করিতে পারিতেন, সে সমস্তই আজি ছিন্ন-ভিন্ন হওয়াতে জলিম কেবল কতিপয় রাজপুতের উপর প্রভুত্বলাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

অম্বজির সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দার ভীমসিংহ পরিশেষে স্থির করিলেন, জলিমসিংহ যদি কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায়গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিংশতি লক্ষ টাকা দিয়া রাণার নিকট অবনত হই। চন্দাবৎ-সর্দ্দারের এই প্রস্তাবে কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রবণমাত্র সকলেরই ধারণা হয় যে, তিনি জলিমসিংহের উপর

বৈরভাব প্রদর্শন করিয়াই এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কূটবুদ্ধি অম্বজি স্বীয় স্বার্থসাধনাভিলাষে তাঁহাকে সেইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে প্রণোদিত করেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে আবার সিন্ধিয়া পুনানগরে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল বিদ্রোহিগণের কোন প্রকার মীমাংসা হয় নাই বলিয়াই তিনি এত দিন গমন করিতে পারেন নাই; অধুনা তাঁহাদিগের ঐরূপ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি আপন মনোরথ-সিদ্ধির পন্থা পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুক্তকণ্ঠে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এত দিন জলিমসিংহ অম্বজিকে পরমবন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। এরূপ বন্ধুতায় তাঁহার হৃদয়ের পবিত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। উক্তসময়ে মহারাষ্ট্রবীর ত্র্যম্বকজি তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া ও স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যে উপকার করিয়াছিলেন, জলিম যদিও তাহার উপযুক্ত প্রতিদান করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি তিনি সে জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে ত্রুটি করেন নাই। সেই কৃতজ্ঞহৃদয়ের প্ররোচনানুসারে তিনি অম্বজিকে বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। যেখানে দুই জনের স্বার্থ পরস্পরের সংঘর্ষে না আসিয়াছে, সেই স্থলেই তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব দৃঢ় ও অটলভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আজি উভয়ের স্বার্থের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ ঘটিল। এ সংঘর্ষ আশু নিবারিত হইবার সম্ভব নাই। ইহা হইতে যে ভীষণ অগ্নি সমুদ্ভূত হইবে, তাহাতে একদিক্ অবশ্যই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। যাহা হউক, রাণার সহিত জলিম চিতোর সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইলে অম্বজি কল্পিত দুঃখের সহিত কহিলেন, "বিদ্রোহী ভীমসিংহ অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক বটে, কিন্তু এই কথা বলে যে, জলিম এখানে থাকিলে আমরা কোনরূপে রাণার অধীন হইব না; অতএব এ বিষয়ে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহা আপনারা স্থির করুন।" পাছে সে প্রস্তাবে অসম্মত হইলে কেহ তাঁহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই জন্য জলিম সকলের সমক্ষেই উত্তর করিলেন, "যদি ইহাই তাহাদিগের আপত্তি হয়, যদি আমাকেই তাহারা বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সানন্দে এখনই এ স্থান হইতে বিদায়গ্রহণ করিতেছি। বিশেষতঃ আমি এখানে অবস্থান করিলে অনেক অর্থব্যয় হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং রাণা অভিলাষ করিলে আমি একেবারে আমার কোটাতেই প্রস্থান করি।" সুচতুর জলিম আজি মহারাষ্ট্রীয়ের চতুরতাজালে বিজড়িত হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার অভিসন্ধি কেহই অবগত হইতে পারেন নাই। কিন্তু কূটবুদ্ধি অম্বজির তীক্ষ্ণদৃষ্টি যে তাঁহার অন্তরের অধস্তন প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। জলিমের মহান্ চরিত্র একটি বিশেষ উপকরণে সংগঠিত। সেই উপকরণের অনুবলেই তিনি যৌবনাবস্থায় সকলের অস্পৃশ্য ও অধর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে উপকরণ কি?—গর্ব্ব। গর্ব্ব অন্যের পক্ষে দোষের হেতু বটে; কিন্তু জলিমের চরিত্রে উহা গুণ বলিয়া গণনীয়। ইহা হইতেই তাঁহার হৃদয় উচ্চদিকে উঠিয়াছিল। এই গর্ব্বের প্রভাবেই তাঁহার সম্মানসম্ভ্রম শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। তিনি দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন সত্য, কিন্তু এই সমস্ত প্রকৃষ্ট গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঘোরতর অবমাননায় অবমানিত হইতে হয় নাই। সুদীর্ঘ জীবিতকালের মধ্যে তিনি সমস্ত গুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই গর্ব্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ইহা তাঁহার জীবনের চিরসহচর হইয়াছিল। চতুর অম্বজি জলিমের চরিত্র সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, জলিমের সম্বন্ধে শালুম্ব্রাসর্দ্দারের সেই প্রস্তাব যদি উত্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশে সমর্থ হইবেন না, জলিম যখন ঐ প্রকার প্রত্যুত্তর করিলেন,

তখন অম্বজি সুমিষ্ট শ্লেষবাক্যে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, ইহা একটি সুন্দর উপন্যাস বটে; কিন্তু যাহারা আপনাকে পরিজ্ঞাত নহে, তাহাদের সমীপে এ কথা বলিলে সম্ভব হইত, তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত।" এই সুমিষ্ট-শ্লেষবাক্য শুনিয়া গর্ব্বিত জলিমসিংহ আত্মবাক্য-সমর্থনের জন্য আরও দৃঢ়তর শপথ করিলেন। তখন অম্বজি বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি সত্য সত্যই গমনে সঙ্কল্প করিয়াছেন?" "সত্য সত্যই," গম্ভীরস্বরে এই উত্তর প্রদান করিয়া জলিম স্থির ও অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মস্তকের একগাছিমাত্র কেশও বিকম্পিত হইল না। সুচতুর অম্বজির মনে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল বটে, কিন্তু সে আনন্দবেগ অন্তরেই নিহিত রাখিয়া তিনি কল্পিত গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিলেন, "তবে কতিপয় মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" জলিমকে আর চিন্তা করিতে অবসর না দিয়াই কূটবুদ্ধি মহারাষ্ট্রীয় স্বীয় অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সিন্ধিয়ার শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

অনবধানতাবশে সুচতুর জলিমকেও আজি মহারাষ্ট্রীয়ের চাতুর্য্যজালে জড়িত হইতে হইল। তাঁহার সকল দিক্ নষ্ট হইল। অম্বজি প্রস্থান করিলে পর তাঁহার হৃদয়ে আত্মবিষয়িণী চিন্তা সমুদিত হইয়া তাঁহাকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া ফেলিল। কি করিবেন, কোন্ পথে যাইতে হইবে, তাহা কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তিনি যে আশাকে চিরদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কি হইল? সে আশা ফলবতী হইবার সময়েই কপটীর কুঠারাঘাতে তাহা ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহা যার পর-নাই পরিতাপের বিষয় হইলেও তিনি সে আশাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, সিন্ধিয়া কদাচ অম্বজির প্রস্তাবে সম্মতিদান করিবেন না। যদিও সম্মতি দেন, তাহা হইলে রাণা তাহার প্রতিবাদ করিবেন। কারণ, জলিমের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, রাণার উপর তাঁহার বিলক্ষণ বিক্রম আছে। তিনি যে সিন্ধিয়ার উপর আশাস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ হেতু আছে। সিন্ধিয়া জলিমের নিকট গোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, মিবারের পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তাঁহাকে অনেকগুলি সৈন্যসাহায্য করিবেন। তদ্ব্যতীত আর একটি দৃঢ়তর কারণ এই যে, জলিম ভাবিয়াছিলেন, তিনি আনুকূল্য না করিলে সিন্ধিয়া কদাচ রাণার নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য পণ (প্রতিশ্রুতিমত ২০ লক্ষ টাকা) আদায় করিতে সমর্থ হইবেন না। চতুর অম্বজি এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া তদুপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া যে সময় সেই প্রাপ্য মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি আপনি তাহা স্ব-ইচ্ছায় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। অম্বজির প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া সিন্ধিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অম্বজির সমীপে সমস্ত অর্থ প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পুনানগরে যাত্রা করিলেন। সেই দিন হইতেই রাণা ও জলিমের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যাত্রাকালে সিন্ধিয়া অম্বজিকে স্বীয় প্রতিনিধিপদে স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে তিনি সেই সকল টাকা যথাসময়ে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করিবার জন্য এক দল সৈন্যও স্থাপন করিলেন। সিন্ধিয়ার নিকট স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়া সুদক্ষ অম্বজি রাণার মন্ত্রী শিবদাস ও সতীদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের মনোরথসাধনের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিতে ও রাণার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই এই সমস্ত ব্যাপার সুসম্পাদন করিয়া ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি আশু জলিমের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং হৃদয়ের আনন্দবেগ গোপন

রাখিয়া ধীরগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আপনার অভীষ্ট পূরণ করিতে সকলেই স্বীকৃত হইয়াছেন।" এই সমস্ত ব্যাপার তিনি এরূপ সুচারু কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি জলিমকে ঐ কথা জানাইলেন, ঠিক সেই সময়েই রাণার প্রতিহারী আসিয়া বিনয়বাক্যে বিজ্ঞাপন করিল, "আপনার বিদায়োপহার প্রস্তুত।" জলিমের পূর্ব্ব-আশা ব্যর্থ হইয়া গেল; কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা বা দুঃখ প্রকাশ না করিয়াই আশু চিতোর হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শালুম্ব্রাসর্দ্দার চিতোরদুর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাণার পাদস্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অম্বজির অভীষ্টসিদ্ধি হইল। তিনি মিবারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

আট বর্ষ অতীত। এই আট বর্ষকাল অম্বজি মিবারে থাকিয়া উচ্চতম প্রভুত্ব পরিচালন করিলেন। এই আট বর্ষের মধ্যে রাজ্যে রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়া তিনি এত অর্থ সংগ্রহ করিলেন যে, সেই বিপুল ধনরাশির সাহায্যে তিনি পরিশেষে ভারতের অগ্রনায়ক বলিয়া গণনীয় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার তুল্য ধনশালী অতি বিরল ছিল। তিনি মিবারের অর্থরাশি শোষণ করিয়া প্রায় দ্বাদশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শালুম্ব্রা হইতে ৩ লক্ষ, দেবগড় হইতে ৩ লক্ষ, শিঙ্গিরাগরি গোসাই হইতে ২ লক্ষ, কোশীতুল হইতে ১ লক্ষ, আমৈত হইতে ২ লক্ষ এবং কোরাবার হইতে ১ লক্ষ সংগৃহীত হইয়াছিল; এই বিপুল অর্থ তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহা হইতে যে মিবারে অনর্থকর অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ প্রশান্ত হইয়াছিল, তাঁহা হইতে যে রাজ্যের মঙ্গলসাধন হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে শান্তি মিবাররাজ্য হইতে দীর্ঘকাল হইল বিদায়গ্রহণ করিয়াছিল, অম্বজির শাসনগুণে তাহা পুনরায় আসিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের হৃদয়জ্বালা প্রশমিত করিয়া দিল। বহুদিনের পর মিবারবাসিগণ সেই শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে অম্বজিকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। অম্বজির প্রতি এই কয়েকটি পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছিল যে, রাণার আধিপত্যের পুনঃস্থাপন, বিদ্রোহী সামন্ত ও বেতনভোগী সৈন্ধবীগণের নিকট হইতে রাজ্যক্ষেত্রসমূহের উদ্ধারসাধন, অপ-নৃপতি রতনসিংহকে কমলমীর হইতে দূরীকরণ, মারবাররাজার কর হইতে গদবার-জনপদের পুনরুদ্ধার এবং রাণা অমরসিংহের হত্যাবশতঃ বুন্দিরাজের সহিত বিবাদঘটনার নিবারণ, এই কয়েকটি কার্য্য তাঁহাকে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইবে।

যে বিংশতি লক্ষ টাকা সিন্ধিয়াকে প্রদান করা হইয়াছিল, কোন্ কোন্ জনপদ হইতে কিরূপ প্রণালীতে সংগ্রহ করিতে হইবে, অম্বজি তাহার একখানি তালিকা প্রস্তুত করিলেন এবং তদনুসারে কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দাবৎগণের ভূমিবৃত্তি হইতে দ্বাদশ লক্ষ এবং শক্তাবৎগণের নিকট হইতে অবশিষ্ট আট লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। এতদ্ব্যতীত রাণা পণ করিলেন যে, অপরাপর কার্য্যগুলি সংসাধিত হইলে তিনি অম্বজির সেনাদলে নির্দ্দিষ্ট ব্যয় প্রদান করিয়াও তাঁহাকে আরও ৬০ লক্ষ টাকা পারিতোষিক অর্পণ করিবেন। দুই বর্ষের মধ্যে অপ-নৃপতি রতনসিংহ কমলমীর হইতে বিতাড়িত হইলেন; বিদ্রোহী রণবৎসর্দ্দারের নিকট হইতে জিহাজপুর এবং অপরাপর সর্দ্দারগণের নিকট হইতে রাণার রাজভূমি সমস্ত পুনরুদ্ধার হইল। তন্মধ্যে সৈন্ধবীদিগের নিকট হইতে রায়পুর রাজনগর, পুয়াবৎদিগের নিকট হইতে গুরলা ও গদরমালা, সর্দ্দারসিংহের নিকট হইতে হাম্বিরগড় এবং শালুম্ব্রাসর্দ্দারের নিকট হইতে কুরজ কোবারিও পুনরুদ্ধার হয়। এই কয়েকটি কার্য্য সুসম্পাদিত হওয়াতে মিবারের মহোপকার সাধিত হইল বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা

আরও যে কয়েকটি গুরুতর কর্তব্য আছে, অম্বজি সে বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না কেন? মিবাররাজ্যের মুকুটস্বরূপ উর্ব্বর গদবারজনপদের পুনরুদ্ধার, বুন্দি ও মিবারের অন্তর্বিপ্লব নিবারণ এবং মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক হৃত ভূমিসম্পত্তিসমূহের উদ্ধারসাধন; অম্বজি এই তিনটি গুরুতর কর্ত্তব্যের বিষয় বিস্মৃত হইলেন কেন? প্রথমতঃ তিনি যে প্রকার উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত মিবাররাজ্যের হিতসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে অধিবাসিবৃন্দের অন্তরে অনেক আশা জন্মিয়াছিল, কিন্তু প্রভুত্বের মধুর আস্বাদন পাইবামাত্রই তিনি নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িলেন, এবং পূর্ব্বকথিত তিনটি গুরুতর কর্ত্তব্যসাধন না করিয়াই "মিবারের সুবাদার" উপাধি ধারণ করিলেন। ক্রূরমতি ভুজঙ্গম আর কত দিন পরহিতসাধনে দীক্ষিত থাকিবে? কিছু দিন অতীত হইলেই স্বার্থপর মহারাষ্ট্রীয় নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তদানীন্তন ক্রূরনীতিক সম্প্রদায়বর্গের সহিত একপ্রাণ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু রাজপুত অকৃতজ্ঞ নহেন। সুচতুর স্বার্থপরায়ণ অম্বজি যদিও সন্ধিপত্রের মূলাবধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, যদিও তিনি মিবারের অতুল অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহা দ্বারা যে সামান্যমাত্র উপকার হইয়াছিল, রাজপুতবৃন্দ তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি যত দিন মিবারের হিতসাধনে ব্রতী ছিলেন, মিবারবাসীরা তত দিন তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দাবৎসর্দ্দারেরা রাজসভায় আপনাদিগের পূর্ব্বক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়াতে রাজসচিব শিবদাস ও সতীদাসের আশঙ্কার সীমাপরিসীমা রহিল না। ভ্রাতা সোমজির শোচনীয় হত্যাবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক তাঁহারা প্রতিক্ষণেই নানারূপ ভয়ের বিষদংশনে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বোধ হইতে লাগিল যেন, চন্দাবৎগণ তাঁহাদিগের প্রতিকূলে নানারূপ ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন, যেন তাঁহাদিগকে মন্দভাগ্য সোমজির ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে বধ করিবার উদ্যম করিতেছেন। এই সমস্ত ভীতিগর্ভ ভাবনা তাঁহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকাতে হীনসাহস শিবদাস ও সতীদাস অম্বজির সেনাসাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং যাহাতে মিবারে একটি সহকারী সেনাদল সংস্থিত থাকে, তজ্জন্য সবিনয় অনুরোধও করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, অম্বজির আনুকূল্য ভিন্ন রাণার ও আপনাদের স্বার্থরক্ষায় কখনই সমর্থ হইতে পারিবেন না। সেই জন্য তাঁহারা সেই মহারাষ্ট্রীয়ের অনুগ্রহলাভার্থ তত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। অম্বজি তাঁহাদিগের প্রার্থনামত যথাযথ বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণের ভরণপোষণ-নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক আট লক্ষ টাকা আয়ের কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজ্যে বিবাদ-বিসংবাদ বা বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহার আর কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই। হতভাগ্য রাণা স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে অনেক প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি এক দিক্ রক্ষা করিতে অগ্রসর হন, অন্যদিকে ভীষণ অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়; এক বিপদের স্রোতে আলিবন্ধন করিতে যান, অন্যদিক্ ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ মিবারের আর কোনরূপ মঙ্গলের আশা নাই। চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ, বিরক্তি ও বিষাদের শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। রাজ্যের উপস্বত্ব কোন্ দিক্ দিয়া কিরূপে উড়িয়া যাইতে লাগিল, তাহা কিছুই স্থির হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়া পড়িল। রাণা ক্রমে ক্রমে এরূপ অর্থহীন হইয়া পড়িলেন যে, ১৮৫১ সংবতে জয়পুররাজকুমারের সহিত আপন ভগিনীর পরিণয়সম্পাদনার্থ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির নিকট তাঁহাকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণ করিতে হইল। এই দুই বৎসরের পরবর্ষে মিবারে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল;—রাজজননীর মৃত্যু, রাণার নবকুমারলাভ এবং উদয়সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস। শেষোক্ত ঘটনা হইতে মিবার যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাতে মন্দভাগিনী

মিবারভূমির দুর্দ্দশা আরও পাঁচগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই বিশাল সরোবরের উদ্বেলিত বারিরাশির ভীষণপ্লাবনে নগর ও নাগরিকবৃন্দের এক তৃতীয়াংশ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। কিংবদন্তী আছে, রাণা হররমণী ভগবতী গৌরীর একটি নূতন উৎসব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভাদ্রমাসে এই উৎসব আরম্ভ হয়। নূতন উৎসবদর্শনে ভগবতী অসন্তুষ্ট হন। দেবীর আক্রোশেই রাজ্যমধ্যে ঐ প্রকার অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ যাহাই হউক, ইহা দ্বারা যে মন্দভাগ্য মিবারবাসিগণ নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অম্বজির অদৃষ্ট ক্রমে ক্রমে আরও উন্নত হইয়া উঠিল। ১৮৫১ সংবতে ঐ দুর্বৎসরের সময় সিন্ধিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানে আপন প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিলেন। অম্বজি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র গণেশপন্থনামা একজন মহারাষ্ট্রীয়কে মিবারে আপন প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া তথা হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। শোবে ও শ্রীজি মেহতা নামে রাণার দুই জন কর্ম্মচারী ছিল। তাহারা ঐ গণেশপন্থের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। এই তিন জন আপনাদিগের অল্পদিন-স্থায়ী প্রভুত্বের মধ্যে এ প্রকার নিষ্ঠুরভাবে মিবারের শোণিতশোষণ করিতে আরম্ভ করিল যে, অম্বজি তাহাদিগের প্রধান গণেশপন্থকে পদভ্রষ্ট করিয়া তৎপদে প্রসিদ্ধ রায়চাঁদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রায়চাঁদ অম্বজির প্রতিনিধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না; কেহই তাঁহাকে প্রতিনিধি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিল না; সুতরাং রাজ্যমধ্যে আবার দারুণ অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইল। আবার নাগরিকবৃন্দের ধন, মান ও গৌরব বিপন্ন হইয়া পড়িল। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিল, দারুণ অত্যাচার হইতে লাগিল। সেই সকল পৈশাচিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও স্বার্থসাধন হইতে মিবারভূমি ক্রমে হৃদয়বিদারক শ্মশান-রূপে পরিণত হইল। সুবিধা পাইয়া মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ, অসভ্য রোহিলাগণ এবং অসীম সাহসসম্পন্ন ফিরিঙ্গিগণ নিষ্কণ্টকে মিবারভূমিতে আপতিত হইয়া মন্দভাগ্য রাজপুতবৃন্দের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দান্ত চন্দাবৎগণ আপনাদিগের গোত্রপতি বীরবর চন্দের পবিত্র-মন্ত্রে অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অত্যাচারী সৈন্ধবীগণের আনুকূল্যে সেই সর্ব্বলুণ্ঠনকর পাপমন্ত্রের সাধনায় উন্মত্ত হইল। সেই পৈশাচিক দুর্ব্ব্যবহার হইতে নিবর্ত্তিত করিবার অন্য উপায় না দখিয়া রাণা তাহাদিগের ভূমিবৃত্তি সকল আচ্ছন্ন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে রাজকীয় সেনাদল তৎক্ষণাৎ কোরাবার করগত করিয়া লইল এবং শালুম্ব্রাদুর্গের সম্মুখে কামানশ্রেণী সজ্জিত করিয়া রাখিল। পাষণ্ড সৈন্ধবীগণ তাহা দেখিয়া শালুম্ব্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবগড়ে প্রস্থান করিল। দুর্দ্ধর্ষ চন্দাবৎগণ তখন মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় না দেখিয়া তাহাদিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ অজিতসিংহকে অম্বজি সকাশে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার আনুকূল্য-লাভার্থে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। অর্থলিপ্সু মহারাষ্ট্রীয়ের অর্থলিপ্সা ক্রমে আরও বলবতী হইয়া উঠিল। দশলক্ষ টাকার জন্য তিনি আপন প্রতিনিধি রায়চাঁদকে মিবার হইতে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন; শিবদাস ও সতীদাসকে মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন ও চন্দাবৎগণকে সাহায্যদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮৫৩ সংবতে (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা সংঘটিত হয়। শালুম্ব্রাসর্দ্দার রাজসভায় পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন এবং অগ্রজি মেহতাকে * মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎগণকে আক্রমণ করিলেন। আবার উভয়

* যে সময়ে মিবারভূমি ভীষণ অন্তর্ব্বিপ্লবে ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়, তৎকাল হইতে

সম্প্রদায়ের ভীষণ বিগ্রহ উপস্থিত হইল। কিন্তু দুর্জ্জয় চন্দাবতেরা অম্বজির সাহায্য পাইয়া শক্তাবৎ-দিগকে পরাভূত করিলেন এবং তাহাদিগের ভূমিবৃত্তি ও হিতা-সৈমারী নামক অপর দুইটি সম্পত্তি হইতে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া অর্থলিপ্সু অম্বজির পদতলে উপহার প্রদান করিলেন।

পাঞ্চোলিগণ মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। বিবদমান সর্দ্দারসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা জয়ী হইতে লাগিল, তাহারা আপন মনোনীত ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে মেহতা, দেপ্রা বা ধাই-ভাইগণ বিশেষ বিখ্যাত। ত্রিকালবিৎ ভগবান্ মনু রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ যে সকল লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন রাজাই মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখিলেন না; সুতরাং মিবারের দুর্ভাগ্য শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। পাঞ্চোলিগণের পত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশই রাণা ও অগ্রজি মেহতার প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সকল পত্রেই স্বদেশানুরাগের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত পত্র পাঠ করিলে মিবারের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। ১৮৫৩ সংবতে (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) অমৃতরাও নামক একজন পাঞ্চোলি স্বদেশের অনর্থ দূর করিবার ইচ্ছায় একটি কৌশল অবলম্বন করেন। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণকে রাণার মন্ত্রণা-গৃহ হইতে বিচ্যুত রাখিয়া তিনি রাজ্যের দেওয়ানী কার্য্য মিবারের শাসনবহির্ভূত সর্দ্দারগণের করে প্রদান করিতে প্রস্তাব করেন। তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

প্রথম পত্র।

হিংসা, দ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা এই কয়েকটি কারণ হইতে দেশে রোগবৃদ্ধি হইয়াছে। তুর্কি-গণের সহিত মিবারের রোগের অভ্যুদয় হয়; কিন্তু তৎকালীন রাজা, মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণের হৃদয় একতারে সংবদ্ধ ছিল; সুতরাং ঔষধের সাহায্যে রোগ প্রশমিত হইয়াছিল। রাণা জয়সিংহের শাসনসময়ে আবার সেই রোগের আক্রোশ দৃষ্ট হইল, কিন্তু তৎপুত্র অমর আশু তাহা প্রশমিত করিলেন। বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া তিনি রাজ্যের শাসনকার্য্যে সুশৃঙ্খলাবিধান করিলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলের প্রশংসার পাত্র হইলেন। কিন্তু মহারাণা সংগ্রামসিংহ স্বীয় পক্ষপংক্তির নিয়তল হইতে চন্দাবতের রামপুরজনপদকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এই প্রকারে মিবারের একটি প্রধান পক্ষপুট ছিন্ন হইয়া পড়িল। মন্ত্রী বিহারী-দাসের পুত্র আত্মঘাতী হইলেন এবং বিহারীদাসের দুর্ভাগ্য ও বিপদ্ একীভূত হইয়া বর্দ্ধনশালী বিপদ্রাশিকে আরও দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিল। তাহার উপর আবার বাজিরাওয়ের সহিত দাক্ষিণী-দিগের সংঘর্ষ উপস্থিত, জয়পুরকাণ্ড অর্থাৎ মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য বিপ্লব এবং রাজমহলের পরাজয় ও সেই হেতু বিপুল ব্যয়, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা আরও বাড়াইয়া দিল। ইহার উপর আবার জগৎসিংহের সময়ে পাঞ্চোলিগণের প্রতি ধাইভাইগণ যে বিরুদ্ধাচরণ করিল, তাহাতে কি স্বদেশ কি বিদেশ, সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের সম্মানসম্ভ্রম হ্রাস হইয়া গেল। তৎকাল হইতে সকল ব্যক্তিই আপনাকে শাসনকার্য্যের যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিতেছে। তদবধি রাজ্যে কেহই সুখলাভ করিতে পারে নাই। জগৎসিংহের পুত্র প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হইলেন, তাঁহার দুর্ব্যবহারে শ্যাম শোলাঙ্কি ও অপরাপর অনেক সর্দ্দার বিনষ্ট হইলেন; রাণার তাহাতে ক্লেশের অবধি রহিল না। তৎকাল হইতে সর্দ্দারেরা রাজভক্তিশূন্য হইল। আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অবশেষে প্রতাপের অভিষেকসময়ে মহারাজা নাথজি দুরাকাঙ্ক্ষার পাপমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে অশেষকষ্টে নিপাতিত করিলেন। তাহাতে শত্রুতা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা চতুর্দ্দিক্ হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অমরচাঁদের আচরণ, পাঞ্চোলিগণের পরস্পরের বিবাদ এবং দেপ্রাগণের প্রতি তাহাদিগের শত্রুতাচরণ একত্র হইয়া মিবারের সর্ব্বনাশ করিতে

ক্রমে কালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে মাধাজির সকল বাসনা ফুরাইল। যাঁহার বাহুবলে সমগ্র রাজস্থান কম্পিত হইয়াছিল, চতুরচূড়ামণি ক্রূরনীতিবিশারদ সেই মাধাজি সিন্ধিয়া কালের অনতিক্রম্য

আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে কাহারও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না; কেহ বিবাদ করিতেও নিরস্ত হইল না; সেই বিবাদই পূর্ব্বোক্ত পীড়াকে চূড়ান্তসীমায় তুলিয়া দিল। হীথার অধিকার লইয়া আবার কোমানসিংহ ও শক্তাবৎগণের মধ্যে যে কলহ ঘটিল, তাহাই সেই পীড়া বাড়াইয়া তুলিল। মহারাজ নাথজির ভীষণ হত্যা এবং সেই হেতু দেবগড়পতি যশোবন্তসিংহের বিদ্বেষভাব, অপনৃপতি রত্নসিংহের অভ্যুদয়, ঝালা রঘুদেবের কঠোর উদ্যম এবং অমরচাঁদের সৈন্ধবী সেনাপালন এই সকল অনর্থ পূর্ব্বোক্ত পীড়াকে বাড়াইয়া দিয়া মিবারকে একটি মহা সঙ্কটসাগরে নিমজ্জিত করিল। ইহার উপর রাণার বিলাসজনিত অমনোযোগিতা এবং রাণা অরিসিংহের ধাইভাইগণের ষড়্‌যন্ত্র রাজ্যমধ্যে এরূপ অনর্থ উৎপাদন করিল যে, সেই বিপদ্ হইতে মিবারকে কেহই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না। ১৮২৯ অব্দে আততায়ী বুন্দিরাজের বিশ্বাসঘাতকতায় রাণা ইহলোক ত্যাগ করিলে রাজ্যের সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে লাগিল, শিশু হামিরকে কেহই গ্রাহ্য করিল না। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে রাজ্যমধ্যে শাসননীতির বিন্দুমাত্রও ছায়া রহিল না। অধুনা আপনি (রাণা ভীমসিংহের প্রতি) শালুম্ব্রাসর্দ্দার ভীমসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুনের পরামর্শে বিদেশীয় সৈন্যগণকে বেতন দিয়া নিয়োজিত করিতেছেন; ইহাতে কি পূর্ব্বতন সমস্ত ভ্রম ও অনর্থই দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে না? আপনি স্বয়ং এবং শ্রীবাইজিরাজ (রাজজননী) বিদেশী ও দাক্ষিণীদিগের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক পীড়াকে সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রাজকর্ম্মে আপনার আর মন নাই। অতএব কি করা যাইতে পারে? এখনও ঔষধ পাইবার উপায় আছে। আসুন, আমরা একমত হইয়া মন্ত্রীর কর্ত্তব্যনিচয় উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হই। ইহাতে হয় জয়ী হইব, নতুবা সেই প্রবর্দ্ধমান অনর্থরাশির গতিরোধে সমর্থ হইব। কিন্তু যদি এখন আর মনোযোগ করা না হয়, তাহা হইলে ইহার আরোগ্যবিধান মানবশক্তির অসাধ্য হইয়া পড়িবে। দাক্ষিণীগণই মহৎ ক্ষতস্বরূপ। আসুন, তাহাদিগের হিসাব নিকাশ করি এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সংস্পর্শ হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে সচেষ্ট হই, নচেৎ আমরা জন্মভূমি হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইব। এ সময়ে রাজ্যের সর্ব্বত্রই সন্ধিবন্ধনাদির উদ্‌যোগ হইতেছে। আমি সকল বিষয়ই স্পর্শ করিয়াছি। যদি কোন অযৌক্তিক কথা লিখিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন। আসুন, আমরা ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া থাকি। সর্দ্দার, সামন্ত, মন্ত্রী, সভাসদ সকলেই একপ্রাণ হউক; রাজ্যের কল্যাণ হইবে এবং সেই কল্যাণের সহিত সকল বিষয়েই শ্রেয়ঃসাধন হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিবেন, এ রোগ সামান্য নহে, যদি ইহার শান্তি না হয়, আমাদিগের সকলকেই অধঃপতিত হইতে হইবে।"

দ্বিতীয় পত্র।

"দেশে যে পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকে সবিরাম রোগ জ্ঞানে তদনুযায়ী চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অমরসিংহ ইহার আরোগ্যবিধান করিয়া পূর্ণশাসন ও ন্যায়ের প্রকরণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সংগ্রামের রাজত্বকালে ইহা আর একবার প্রাদুর্ভূত হয়; জগৎসিংহের সময়ে উহার বীজ ক্ষেত্রে উপ্ত হয়, প্রতাপের সময় অঙ্কুরিত হয়, রাজসিংহের সময়ে ফল প্রসূত হয় এবং রাণা অরিসিংহের সময়ে যে ফল পরিপক্ক হইয়া উঠে, হামিরের সময়ে সেই ফল বিতরিত হয়

বিধিপালন করিবার জন্য সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। যে দুরাকাঙ্ক্ষা এত দিন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় নাই, আজি সেই আকাঙ্ক্ষা কালের অনন্তগর্ভে অন্তর্হিত হইল। বিপুল অর্থ পাইয়া যাহার তৃপ্তির শান্তি হয় নাই, আজি সেই ব্যক্তি কতিপয়মাত্র অসার ছিন্ন বস্ত্র লইয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিল। যে মস্তক একদিন কাহারও কাছে অবনত হয় নাই, আজি তাহা শৃগাল-কুকুরের চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে চলিল। ইহা দেখিয়াও মোহান্ধ স্বার্থপর মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। ইহা শুনিয়াও পরহিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা করিতে মানব সঙ্কুচিত হয় না। মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর, অনন্ত কালসমুদ্রের বক্ষে নরজীবন ক্ষণস্থায়ী জলবিম্বতুল্য। মাধাজি সিন্ধিয়া সৌভাগ্যবশে অসীম ধন, অতুল শক্তি এবং বিশাল রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মাতৃভূমির কি হিতসাধন করিতে পারিলেন? যদি তিনি সেই ধন ও সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের দুঃখযামিনী প্রভাতা হইয়া সুখসূর্য্যের উদয় হইত; তাহা হইলে আজি তাঁহার নাম স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মগণের পবিত্র নামাবলীর ন্যায় ভারতসন্তানদিগের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিত। কিন্তু তিনি মোহবশে আত্মহারাপ্রায় হইয়াছিলেন, বৃথা গর্ব্বে মুগ্ধ হইয়া আপনার অনন্তগৌরবের পথে স্বহস্তে কণ্টকতরু রোপণ করিয়াছিলেন, কাজেই মন্দভাগিনী মাতৃভূমিকে শোচনীয় দুর্দ্দশার অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন। তিনি যে স্বার্থসাধনোদ্দেশে অসংখ্য ভারতসন্তানকে ছারেখারে দিলেন, তাহাতে কি ফল হইল? পদে পদে ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাজন হইয়া চিরজীবন যাপন করিলেন; পরিশেষে যে দিন সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন, সে দিন তাঁহার আত্মীয়-পরিজন ব্যতীত আর কাহারও চক্ষু হইতে বিন্দুমাত্র অশ্রুনীর নিপতিত হইল না। সে দিন অনন্তকালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি অনেক ভারতসন্তান

এবং সকলেই তাহার এক এক অংশ লাভ করিয়াছে। আর আপনি (ভীমসিংহ) প্রচুর পরিমাণে তাহা ভক্ষণ করিয়াছেন। আপনি ইহার দোষ, গুণ, আস্বাদ ও গন্ধ সকলই অবগত আছেন। দেশও ঠিক সেইরূপ; এ সময়ে যদি আপনি ঔষধ সেবন না করেন, আপনাকে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সমূহ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে এবং দেশে বিদেশে সকলেই আপনাকে ঘৃণা করিবে। উপেক্ষা করিলে আপনার ধর্ম্ম ও রাজ্য সমস্তই করচ্যুত হইবে।"

তৃতীয় পত্র।

"দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে ক্ষতি নাই। যাহার বুদ্ধি আছে, সে সেই দধি হইতে নবনীত উদ্ধার করিতে পারে। নবনীত তুলিয়া তক্র ফেলিয়া দিলে ক্ষতি কি? কিন্তু দুধ জমিয়া কালো হইলে তাহাকে পুনরায় বিশুদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ বিজ্ঞতার আবশ্যক। সেই বিজ্ঞতা অধুনা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। মিবাররূপ ঘনীভূত দুগ্ধপাত্রের উপর বিদেশীয়গণ কালিমারেখা-স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সে সকল কালিমাকলঙ্ক দূর করিবেন। উহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করিলে দেশ ছারেখারে যাইবে। কৌমুদীর সুবিমল হাস্যের নিকট 'চন্দ্রজ্যোৎ' * লইয়া কি লাভ হইবে? পঙ্ক হইতে পারাবত সৃষ্টি করিতে পারিব বলিয়া যিনি ঘোষণা প্রচার করেন, তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

* রাজপুতেরা এক প্রকার নীল আলোককে চন্দ্রজ্যোৎ বলেন।

তাঁহার নামে শতসহস্র অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাঁহার দৌরাত্ম্য, উৎপীড়ন ও প্রচণ্ড অর্থলিপ্সার জলন্ত প্রমাণক্ষেত্র বিশাল রাজবারাভূমি আজি শ্মশানভূমে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

মাধাজি সিন্ধিয়া ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাও সবলে তদীয় সিংহাসন অধিকার করেন। তখন সিন্ধিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন। সিংহাসন অধিকার করিতে দৌলতকে অধিক আয়াসস্বীকার করিতে হয় নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নীগণের সহিত ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শৈনবী ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিয়া চিরদিনের জন্য মহাপাপে কলঙ্কিত হইয়া রহিলেন।* এ সকল কাণ্ড প্রায় এক সময়েই ঘটিয়াছিল। এই সকল ঘটনার উপরেই মিবারের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিল, কারণ, সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি অম্বজির করে তখন মিবারের অদৃষ্টচক্র সমর্পিত ছিল। রাজপুত্র সিন্ধিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক; সুতরাং অম্বজি অভীষ্টসাধনের অনেক সুযোগ পাইলেন। কিন্তু তিনি সহজে অভীষ্টসাধনে সমর্থ হন নাই; কারণ, অসংখ্য পরাক্রমশালী ব্যক্তি তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নীগণ, লাকুবা, খীচিরাজ, দুর্জ্জনশাল এবং ধাতনগরীর রাজাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সকলেই অনাথা রাজমহিষীদিগের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে মিবার হইতে অম্বজির আধিপত্য বিলুপ্ত করিবার অভিলাষে লাকুবা মিবারপতিকে একখানি গুপ্তপত্র প্রেরণ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যেন তিনি অম্বজির অধীনতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিনিধিকে মিবার হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে যে শৈনবী বিপ্রসম্প্রদায়ের নাম নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই লাকুবার পৃষ্ঠপোষক। মিবারের অভ্যন্তরে তাঁহাদিগের অনেকেরই কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি ছিল। লাকুবার বিরুদ্ধাচরণ অবগত হইবামাত্র অম্বজি স্বীয় প্রতিনিধিকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি শৈনবী বিপ্রগণের সমস্ত ভূমি কাড়িয়া লন। পত্র পাইয়া অম্বজির প্রতিনিধি গণেশপন্থ রাণার মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিয়া তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই গণেশপন্থের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটি ষড়্‌যন্ত্র-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা শৈনবী বিপ্রবর্গকে গোপনে পত্র দ্বারা সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনারা সসৈন্যে আসিয়া গণেশকে আক্রমণ করিবেন, আমরা সাধ্যমত আপনাদিগের সাহায্য করিব।" রাণার মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণের এই পত্র পাইবামাত্র শৈনবীগণ সদলে যাত্রা করিলেন। এ দিকে গণেশপন্থ তাঁহাদিগের আক্রমণ বিফল করিবার অভিসন্ধিতে বিপুল সৈন্যসামন্তসহ নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। শাবা নামক স্থানে উভয়দলের সাক্ষাৎ হইল। অবিলম্বে একটি তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। গণেশপন্থ সে সংগ্রামে পরাভূত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তাঁহার অনেকগুলি কামান ও বন্দুক বিজয়ী শৈনবীদিগের করগত হইল। এই যুদ্ধে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতি হইল। তিনি চিতোরের দিকে পলায়ন করিলেন। চন্দাবৎগণ সাহায্যদানের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে আবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহাদিগের আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া মন্দভাগ্য রাণা স্বীয় বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে পুনরায় একত্র করিলেন এবং তরবারি-সাহায্যে অনিবার্য্য অদৃষ্টতরঙ্গের গতি

---

* মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; শৈনবী, পূর্ব্ব ও মাইত শৈনবীগোত্রের অনেকগুলি ব্রাহ্মণ মিবারের বহ্নকীভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন।

পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য পুনরায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ; চন্দাবৎগণের উপর যে আশা স্থাপন করিয়াছিলেন, সে আশা সমূলে বিনষ্ট হইল। কূটনীতিজ্ঞ চন্দাবৎগণ তাঁহাকে কিছুমাত্র আনুকূল্য দান করিলেন না ; সাহায্যদান দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; সুতরাং গণেশপন্থ পরাস্ত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে হামিরগড়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন চন্দাবৎগণ তাঁহার বিপক্ষগণের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যের সহিত উক্ত হামিরগড় অবরোধ করিলেন। সেই ভীষণ অবরোধে আত্মরক্ষার জন্য মহাতেজা গণেশ অদ্ভুত বিক্রম ও সাহসের সহিত উপর্য্যুপরি নয়টি রণকাণ্ডের অভিনয় করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। হামিরগড়ের অধিপতি ধীরাজসিংহের দুইটি পুত্র সেই সংগ্রামে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

অম্বজির সাহায্যে সেই হামিরগড়ের মহাসঙ্কট হইতে গণেশপন্থ আশু মুক্তিলাভ করিলেন। সুবাদার তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত শুনিয়া গোলাপরাও কদম নামক একজন সেনাপতির সহিত কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেই সমস্ত সৈনিকের সাহায্যে পরিত্রাণ পাইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত অজমীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর মুসা-মুসি নামক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র আবার তিনি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। উভয়দলে পুনরায় ঘোর যুদ্ধ বাধিল। চন্দাবৎগণ বলমদে মত্ত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অসীম বাহুবলের প্রভাবে গণেশের সেনাগণ ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। বিজয়লক্ষ্মী স্বর্ণমুকুট লইয়া তাঁহাদিগের শিরোপরি স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে শত্রুপক্ষের একটি সৈনিক একটি পলায়মানা তুরঙ্গীকে করগত করিবার অভিপ্রায়ে "ভাগা! ভাগা!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে ঘোটকী ধৃত হইল। তখন সকলে "মিল গিয়া! মিল গিয়া!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই সমস্ত শব্দ চন্দাবৎগণের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহাদিগের মনে এক বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। "মিল গিয়া" শব্দ শুনিবামাত্র তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদিগের সহকারী সৈন্যগণ হয় ত শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ভ্রান্তিমূলক ধারণা হৃদয়ে সমুদিত হইবামাত্র চন্দাবৎসৈন্য যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে পলায়নে ব্যতিব্যস্ত দর্শনে শত্রুগণ তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিল এবং সম্মুখে যাহাকে দেখিল, তাহাকেই বধ করিতে লাগিল। এই প্রকারে সৈন্ধবী সেনার অধিনায়ক চন্দলনগুলি সৈন্যসহ যুদ্ধে নিহত হইলেন। দেবগড়পতি * সেই সকল পলায়মান সৈন্যদিগকে লইয়া শাপুরের অন্তর্ভাগে লুক্কায়িত হইলেন। মুসা-মুসি-রণভূমে চন্দাবৎ ঘোরতররূপে পরাভূত হইল, এ দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎসম্প্রদায়ের ভট্টকবিরা তদুপলক্ষে সানন্দচিত্তে সেই পরাজয়কাহিনী বর্ণন করিতে লাগিলেন। অম্বজির প্রতিনিধি এই প্রকারে রণে জয়লাভ করিলেও সেই ভীষণ সাম্প্রদায়িক বিপ্লবসময়ে অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইলেন না। তজ্জন্য রাজপুত-সর্দ্দারগণ তাঁহার চক্ষের উপর স্ব স্ব প্রাচীন ভূমিসম্পত্তি উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং রাণাও সেই অবসরে মিবারের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলেন।

যে দিন গণেশপন্থ মুসামুসি যুদ্ধে স্বীয় বিজয়পতাকা সমুড্ডীন করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধিত্ব পাইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অম্বজি ও লাকুবার মধ্যে বিষম বিগ্রহ সমুৎপন্ন

---

* এই রাজপুত ঊর্দ্ধে সাড়ে ছয় ফিট এবং বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি বলিষ্ঠ ও কঠিন ছিল। তাঁহার পিতা আবার তাঁহা অপেক্ষা আধ ফুট অধিক উচ্চ ছিলেন।

হইল। মিবারভূমি সেই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিনয়ভূমি হইয়া পড়িল। যে মহারাষ্ট্রবীর মত্তকরীর ন্যায় বীরবিক্রমে মিবারের হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়াছে, লাকুবা তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং মিবারের সর্দ্দারেরা তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তৎপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা সকলে বুঝিলেন যে, গণেশ পন্থের সহকারী সেনাদল তখনও হামিরগড়ে বিদ্যমান আছে। তখন লাকুবা পুনর্ব্বার সেই নগর অবরোধ করিলেন এবং দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিবার জন্য অবিরত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই সহস্র গোলাঘাতের পর দুর্গপ্রাকারের একপার্শ্ব ভগ্ন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে লাকুবা উৎসাহিত হইয়া সসৈন্যে সেই ছিদ্রপথে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন, ইত্যবসরে বলরাও ইঙ্গলিয়া, বাপু সিন্ধিয়া এবং ঈশ্বরবন্ত রাও সিন্ধিয়া স্ব স্ব সেনাদল লইয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির সাহায্য করিবার জন্য হামিরগড়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন। কোটার জালিমসিংহও সেই উদ্দেশে আপনার অধীনস্থ গোলন্দাজ সেনাদল পাঠাইয়াছিলেন। অম্বজির পুত্র সেই সকল সহকারী সৈনিক ও সেনাপতির অধিনেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই নবীন সেনাদলের আগমন-বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া লাকুবা স্বীয় অবরোধকারী সৈন্যগণকে উঠাইয়া লইলেন এবং সহকারী সৈন্যদিগের সহিত চিতোরের প্রাকারমূলে অবস্থিতি করিলেন। এ দিকে গণেশ সেই অরক্ষণীয় হামিরগড় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোস্থন্দ নগরে নবীন সেনাদলের সহিত একত্র হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদ্বয় ক্ষীণাঙ্গিনী বিরিস নদীর উভয়তটে স্ব স্ব কামানশ্রেণী সুসজ্জিত করিয়া সমরপ্রতীক্ষায় সসৈন্যে অবস্থান করিলেন। উভয় পক্ষেই ভীষণ সমরের আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময় সৈন্যগণের বেতন লইয়া গণেশ ও বলরাওয়ের মধ্যে একটি গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে সেই সকল উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে নানা বিঘ্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই বিবাদ কিছুতেই মীমাংসিত হইল না। পরিশেষে গণেশ পন্থ তৎপ্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙ্গনার নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই অন্তর্বিপ্লবের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে হঠাৎ মনে হয় যে, বুঝি মহারাষ্ট্রীয়দল ছিন্নভিন্ন হইয়া পরস্পরের উপর পতিত হইল এবং রাজপুতবৃন্দ সেই সূত্রে তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাহা নহে, ইতিহাস তখনই ভীমগম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিবে, ইহারা মহারাষ্ট্রীয়; ইহাদের রাজনীতি এ প্রকার নহে যে, ইহারা সামান্য বিবাদে বিচ্ছিন্ন হইয়া বৈরীর চরণতলে অবনত হইয়া পড়িবে।

গণেশ সসৈন্যে বিচ্ছিন্ন হইলে উভয়দল পরস্পরের সমকক্ষ হইয়া উঠিল; কিন্তু সুচতুর বলরাও কদাচ সমরের পক্ষপাতী নহেন; সুতরাং এবারেও তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন না। গোগুল-চাপরার বিগ্রহসময়ে লাকুবা বলরাওয়ের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। সংপ্রতি মহা-রাষ্ট্রীয় সেনানী সেই পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় উপকারী লাকুবার সহিত সংগ্রাম করিতে ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার রণে নিরস্ত হইবার অন্য একটি কারণও অনুমিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে, তৎকালে বলরাওয়ের অত্যন্ত অর্থাভাব হয়; কিন্তু লাকুবা সেই অর্থাভাব পূরণ করিতে স্বীকৃত হইলে উভয়ের মধ্যে একটি দৃঢ় সন্ধিবন্ধন সংবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে সানন্দে সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। যাহা হউক, আবলম্বে যুদ্ধব্যাপার স্থগিত হইয়া গেল; সেই সঙ্গে লাকুবা আপনাকে নিরাপদ্ জ্ঞানে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তৎপরে উভয় পক্ষ কিছুদিনের জন্য শান্তি সম্ভোগ করিল; কিন্তু অম্বজি আশু তাঁহাদের সেই শান্তিভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। গণেশকে সাহায্যপ্রদানার্থ তিনি সিদালও নামক একজন ইংরাজ-বীরকে কতকগুলি সৈন্যদলের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হওয়াতে

জর্জ টমাস নামক অন্য একজন অধিকতর প্রসিদ্ধ রণবিশারদ ইংরাজ-সেনাপতির আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সেই শেষোক্ত ইংরাজবীরের সাহায্য পাইয়া অম্বজির প্রতিনিধি এবং লাকুবা পরস্পর সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে বুনাসনদের দক্ষিণ-তটে * স্ব স্ব সেনাদল সজ্জিত করিয়া কষ্টকর বর্ষাকালে ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ রণপ্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। ইতঃপূর্ব্বে রাণা এবং তাঁহার সর্দ্দার ও প্রজাবৃন্দ একমাত্র লাকুবার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা তাঁহারা উভয়দল কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে সম্মানিত হইয়া সুবিধানুসারে উভয়ের পক্ষই সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহাতে গণেশ পন্থ নবীন সেনাদলের আনুকূল্য প্রাপ্ত না হন, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য খীচিরাজ দুর্জ্জনশাল মিবারের সর্দ্দারগণ ও পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া গণেশের সৈন্যকটকের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু বীরবর টমাস দুর্জ্জনের সমস্ত উদ্যম বিফল করিয়া শাপুর হইতে নূতন সৈন্যদলসহ গণেশের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই লাকুবাকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি প্রধান সেনাকটক পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার গোলন্দাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে বুনাস নদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ হইল। লাকুবার সহিত সমরের উদ্যম হইয়াছে, এমন সময়ে এক প্রচণ্ড ঝটিকা উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টির প্রভাবে টমাসের সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহার আশ্রয়স্থল শাপুর-দুর্গ একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। ১৮৫৬ সংবতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এই অবসরে লাকুবা মিবারের সর্দ্দারবৃন্দের সাহায্যে সেই সকল বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে কঠোররূপে বিদলিত করিলেন এবং পঞ্চদশটি কামান ও অপরাপর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র করগত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শাপুররাজ ইতঃপূর্ব্বে গণেশকে সৈন্য ও আহারীয় দ্রব্যাদি সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি বিধাতার দারুণ আক্রোশ এবং আত্মীয়স্বজনগণের বিকট তাড়নার ভয়ে আর তাহাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন গণেশ পন্থ উপায়ান্তর না দেখিয়া সঙ্গনার নগরে পলায়ন করিলেন। মিবারের সর্দ্দারবৃন্দ তাঁহার প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী লাকুবার পক্ষসমর্থনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বন করিয়া ফেলিল, ইহাতে তিনি তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত ব্যাপার যতই অনুশীলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সুযোগ পাইলেই সেই প্রতিকূল সর্দ্দারগণকে যথাসাধ্য শাস্তিবিধান করিয়া দারুণ প্রতিশোধপিপাসার শান্তি করিবেন। প্রতিশোধ দিবার অবসর আসিয়াও উপস্থিত হইল।

বর্ষাকাল অতীত। শরতের প্রখর আতপতাপে পথঘাট পরিশুষ্ক হইলে গণেশ অম্বজির নিকট হইতে সৈন্যসাহায্য প্রাপ্ত হইয়া লাকুবার প্রতিকূলে ভীষণ প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে প্রচণ্ড প্রতিজিঘাংসানল মহাতেজে তাঁহার প্রতি লোমকূপে বিস্ফুরিত হইতেছিল, তাহার শান্তি-বিধানপূর্ব্বক স্বীয় কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য তিনি নরহত্যা, লুণ্ঠন, উৎসাদন প্রভৃতি রোমহর্ষণ বীভৎসকাণ্ডের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আরাবল্লী গিরিমালার পাদপ্রান্তে চন্দাবৎগণের যে সমস্ত ভূমিসম্পত্তি ছিল, তৎসমস্তের উপর আপতিত হইয়া ক্রোধান্ধ গণেশ তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে পৈশাচিক যাতনায় প্রপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণে কত শত গৃহ একেবারে

* শাপুরের দশ মাইল দক্ষিণে আমলি নগর। তথায় লাকুবার সেনাকটক স্থাপিত হইয়াছিল। শাপুর ও আমলির মধ্যবর্ত্তী দৈরা নামক স্থানে গণেশ পন্থ শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন।

ভস্মীভূত হইয়া পড়িল ; কত শত নরনারী পশুর ন্যায় নিহত ও নিপীড়িত হইল ; কত শত গৃহস্থের ধন-রত্নরাশি অপহৃত হইতে লাগিল ; কিন্তু ইহাতেও পরিত্রাণ নাই। যাহারা সেই নৃশংস মহারাষ্ট্র-সেনানীর পাশব আচরণ হইতে জীবনরক্ষা করিতে পারিল, তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও তাঁহার ক্রোধাগ্নি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইল না। গণেশপন্থ তাহাদিগের উপর দুর্ব্বহ করভার স্থাপনপূর্ব্বক হতভাগ্যগণের হৃদয়ের সামান্য শোণিতবিন্দু পর্য্যন্তও শোষণ করিয়া লইল। এ দিকে টমাস দেবগড় ও আমৈত অবরোধপূর্ব্বক তত্রত্য অধিপতিদ্বয়কে করদানে বাধ্য করিলেন ; ক্রমে কোশীতুল ও লুশানী নামক আরও দুইটি নগর অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু লুশানীর নাগরিকবৃন্দ আত্মরক্ষার্থ ঘোরতর বীরত্ব প্রদর্শন করাতে বিজয়ী টমাস সেই নগরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। জয়ের উপর জয়লাভ করিয়া নিষ্ঠুরাচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে করিতে গণেশ শনৈঃ শনৈঃ শোণিতহ্রদে সন্তরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বিধাতার ভীমদণ্ড অম্বজির শিরোপরি পতিত হইয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানের শাসনকর্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া দিল এবং তৎপদে লাকুবাকে স্থাপন করিল। বল্লভ তানশিয়া ও বকসু নারায়ণ এই সময়ে সিন্ধিয়ার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহারা দুই জনই শৈনবীগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন ; সুতরাং ইঁহারা স্বজাতীয় লাকুবার অভীষ্টসাধনে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। অম্বজির সকল আশাভরসা সমূলে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া যে শৈনবী বিপ্রবৃন্দের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজি বিধাতা তাঁহাদিগের দ্বারাই তাঁহাকে অধঃপাতিত করিলেন। অম্বজির অধঃপতন হইলে তাঁহার প্রতিনিধি গণেশ পন্থ মিবারের অন্তর্ভূত স্বাধিকৃত যাবতীয় নগর ও দুর্গই প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই প্রকারে দুইটি হিন্দুবীরের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু ইহাতে মিবারের কোন উপকারই হইল না, বরং অনর্থরাশি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা মিবারের একটি বিষম সঙ্কটকাল ; এই সময় হইতে দুর্জ্জয় সিন্ধিয়া মিবারকে স্বীয় অধীন করদরাজ্য বলিয়া গণনা করিতে লাগিলেন।

নবীন প্রতিনিধি লাকুবা সিন্ধিয়ার আদেশে কতকগুলি সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মিবারে প্রবেশ করিলেন। সিন্ধিয়া যে কি উদ্দেশে তাঁহাকে মিবারে পাঠাইলেন, তাহা কেহই বুঝিতে সমর্থ হইল না ; কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধিকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া মিবারবাসিবৃন্দের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অগ্রজি মেহতা রাণার মন্ত্রিপদে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং তৎসঙ্গে চন্দাবৎগণও আপনাদের সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় লাকুবা শাপুর-রাজকে জিহাজপুর হইতে বঞ্চিত করিয়া তদন্তর্ভূত ছত্রিশটি নগর বন্ধক দিলেন। বিচক্ষণ জলিম-সিংহের লালসা বহুদিন হইতে উক্ত জিহাজপুরের প্রতি পতিত হইয়াছিল। এত দিন তাহা করায়ত্ত করিবার জন্য তিনি অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন উপায়ই সিদ্ধ হয় নাই ; তথাপি তিনি জিহাজপুর-প্রাপ্তির আশা বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই। আশার সোহাগে অন্ধ হইয়া এত দিন তাহা সফল করিবার জন্য তিনি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অধুনা সেই অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি কি আর স্থির থাকিতে সমর্থ হন? মহারাষ্ট্রীয় বীর-কেশরী লাকুবা আজি অর্থের জন্য জিহাজপুর বন্ধক দিতে সমুদ্যত, বন্ধক রাখিলে ক্রমে তাহা করগত হইবার সম্ভাবনা ; সুতরাং এরূপ সুবিধা জলিম কিরূপে ত্যাগ করিবেন ? হুণ্ডি দ্বারা লাকুবার যাচিত মুদ্রা পরিশোধ করিয়া তিনি স্বীয় চিরসাধনের বস্তু জিহাজপুর এবং তদন্তর্ভূত গ্রাম ও পল্লী সমস্তই প্রাপ্ত হইলেন ; ছয় লক্ষ টাকা পাইয়া অর্থগৃধ্নু লাকুবার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না, তিনি আরও

চতুর্বিংশতি লক্ষ টাকা স্বরূপ যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু রাণা কর্তৃক সে প্রার্থনা ফলবতী হইবে না দেখিয়া স্বয়ং সবলে তাহা সংগ্রহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বেই কৃতান্ত সদৃশ মহারাষ্ট্র-সৈন্যবৃন্দ মিবারের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বিচরণপূর্ব্বক সেই অতুল অর্থ সংগ্রহ করিল। লাকুবা প্রীত হইলেন, তাঁহার অর্থলিপ্সা কিছুদিনের জন্য প্রশান্ত হইল। তিনি যশোবন্ত রাওভাও নামক একজন মহারাষ্ট্রীয়কে স্বীয় সহকারী কর্ম্মচারিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে ভারতভূমে ইউরোপীয়গণের শনৈঃ শনৈঃ প্রাদুর্ভাব বশতঃ পাশ্চাত্য রণনীতি প্রায় সমস্ত ভারতীয় রাজবৃন্দের অনুসরণীয় হইয়া উঠে। উক্ত যুদ্ধনীতির সাফল্য দেখিয়া রাজমন্ত্রী অগ্রজীর সহকারী প্রতিনিধি মৌজিরাম তাহা অবলম্বন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন কিন্তু বেতনভোগী বিদেশীয় সৈন্য এবং গোলন্দাজ সেনা রাখিতে হইলে অতুল অর্থের আবশ্যক। রাজস্বের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তদ্দ্বারা সেই ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং সর্দ্দারগণের নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইবার ইচ্ছায় তিনি তাঁহাদিগের নিকট ঘোষণাপত্র পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সর্দ্দারবৃন্দ এমনই অনুগত যে, সেই ঘোষণাপত্র পাইবামাত্র উক্ত মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বদেশহিতৈষিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। সতীদাস স্বীয় পূর্ব্বক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। চন্দাবৎগণের ভীষণ উৎপীড়নভয়ে তাঁহার ভ্রাতা শিবদাস কোটা-রাজ্যে বাস করিতেছিলেন; সংপ্রতি তিনিও পুনরাহূত হইয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ চন্দাবৎগণ পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজপরিবারভুক্ত ভূমিসম্পত্তির অধিকাংশই নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে লাগিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের সুপ্রশস্ত যুদ্ধভূমিতে মহারাষ্ট্ররাজ্যের শাসন-সম্বন্ধে স্ব স্ব ভাগ্যপরীক্ষা করিবার জন্য যে একলক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাতে হোলকারের শিরোদেশ হইতে তদীয় রাজমুকুট খসিয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার রাজধানী এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি হয়, হস্তী ও কামান-বন্দুক প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী বিপক্ষদলের করগত হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া মিবার-রাজ্যে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না। বিজয়ী সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ বিজয়মদে উল্লাসিত হইয়া উঠিল; সদাশিব ও বলরাও কর্তৃক চালিত হইয়া তাহারা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। হোলকার যখন মিবারাভিমুখে পলায়ন করেন, সেই সময় তিনি পথিমধ্যস্থ রাতলাম-দুর্গ লুণ্ঠন করিলেন এবং শক্তাবৎ-সম্প্রদায়ের প্রধান বাসভবন ভীণ্ডীরদুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট বিপুল পণ প্রার্থনা করিলেন। শক্তাবৎবৃন্দ একান্ত ভীত হইয়া পড়িল। কি উপায়ে দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়ের হস্ত হইতে তাহাদিগের উদ্ধার হইবে, তদ্বিষয়ে তাহারা নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে এই সংবাদ রাণার শ্রুতিগোচর হইল। ভীণ্ডীর ত্যাগপূর্ব্বক দুর্দ্দান্ত সিন্ধিয়া অবিলম্বেই উদয়পুরে আপতিত হইতে পারে, কে উদয়পুরকে তাহার জ্বলন্ত দুরাকাঙ্ক্ষাগ্নি হইতে পরিত্রাণ করিবে, এই চিন্তায় রাণার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ চিন্তার বিষদংশনে যন্ত্রণাভোগ করিতে হইল না। সিন্ধিয়ার অনুধাবমান সৈনিকবৃন্দ ত্বরিতগতিতে হোলকারের সমীপবর্ত্তী হওয়াতে তিনি ভীণ্ডীর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; সুতরাং তাঁহার আক্রোশ হইতে ঐ নগরী আশু মুক্তিলাভ করিল। অভীষ্ট সম্পূর্ণ বিফল হইল দেখিয়া হতাশহৃদয় হোলকার পবিত্রক্ষেত্র নাথদ্বারে * উপস্থিত হইলেন। তিনি পরাভূত

* উদয়পুরের প্রায় ১২ ক্রোশ উত্তরে নাথদ্বার।

হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি একান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন তাহার মর্ম্মপীড়ার কোন চিহ্নই কেহ নেত্রগোচর করে নাই; কারণ, তিনি বীরোচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাবলে সেই ধূমায়মান অন্তর্বহ্নিকে প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আর রাখিতে পারিলেন না। সেই অন্তনিগূহীত দুঃখাগ্নি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার ভীষণ যন্ত্রণায় হোলকার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। নাথদ্বারের পবিত্র মন্দিরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি-সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া ভগ্নহৃদয় হোলকার দেবমূর্ত্তিকে শত শত অভিশাপ প্রদান করিলেন; পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের নামে গালিবর্ষণ করিলেন; পরিশেষে স্বীয় ক্রূরমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নাথদ্বারের পুরোহিত ও অধিবাসীদিগের নিকট বলপূর্ব্বক তিনলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন। যাহারা তাঁহার পাশবী লালসার পরিতৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ না হইল, তাহাদিগকে তিনি অশেষ যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হোলকার তাহাদিগকে বন্দী করিয়া স্বীয় শিবিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং যাবৎ তাহাদিগের নিকট অর্থসংগ্রহ না হইল, তাবৎ তাহাদিগকে নানারূপ কঠোর-যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হোলকার হিন্দু হইয়া হিন্দুর দেবতা এবং দেবমন্দিরের প্রতি এতদূর দৌরাত্ম্য করিবেন, নাথদ্বারের প্রধান পুরোহিত দামোদরজি তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। অধুনা তিনি দেখিলেন যে, নাথদ্বারের বিপদ্ অনিবার্য্য, ইচ্ছা হইলেই দুর্ব্বৃত্তগণ তদুপরি পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার অবমাননা এবং পুরোহিত ও যাত্রিবৃন্দের উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিবে; সুতরাং দেবমূর্ত্তিকে কোন নিরাপদ্ স্থানে রাখাই একান্ত কর্ত্তব্য। দামোদরজি নাথদ্বারের অধিপতি কোতারিও সর্দ্দারের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। উদয়পুরই নিরাপদ্ স্থান বলিয়া স্থির হইল। তৎপরে দামোদরজি দেবভোগ্য যাবতীয় দ্রব্যাদির সহিত দেবমূর্ত্তিকে উদয়পুরে রাখিতে প্রস্থান করিলেন। কোতারিও সর্দ্দার বিংশতি অশ্বারোহী সেনা লইয়া অতি দুর্ভেদ্য ও নিবিড় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার রাজধানীতে রাখিয়া আসিলেন। স্বনগরের সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইত্যবসরে দুর্দ্ধর্ষ হোলকারের কতকগুলি সেনা তাঁহাদিগের গতিরোধপূর্ব্বক কর্কশস্বরে কহিল, "তোমাদিগের অশ্ব আমাদিগকে প্রদান কর; নচেৎ যথোচিত দণ্ড পাইবে।" মহাবীর চৌহান-পৃথ্বীরাজের বংশধর আজি কি কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর ভ্রূকুটিদর্শনে ভীত হইবেন? সিংহের মহোচ্চতম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি তাঁহাকে জম্বুকের পদানত হইতে হইবে? হোলকারের সৈন্যবৃন্দের সেই অপমানব্যঞ্জক কথা শুনিয়া চৌহান কোতারিও সর্দ্দার দারুণ ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, "প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি দুরাচারগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া কদাচ অবমাননা স্বীকার করিবেন না।" বীরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি সে প্রতিজ্ঞা কার্য্যেও পরিণত করিলেন; স্বীয় অশ্ব হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কোতারিও অশ্বের অগ্রপদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন এবং স্বীয় সৈনিকগণকেও তদনুরূপ করিতে অনুমতি দিয়া উন্মুক্ত তরবারিহস্তে বিপক্ষ-সম্মুখে সবেগে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ আশু তাঁহার পাদদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বিংশতিজনমাত্র সৈনিক লইয়া বীর কোতারিও নির্ভীক-হৃদয়ে শত্রুর বিপুল সেনার সম্মুখীন হইলেন এবং অদ্ভুত যুদ্ধনৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনার বীর্য্যবান সৈনিকগণের সহিত রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। মিবারে এই দুর্ঘটনাপূর্ণ সময়ে কোতারিওর চৌহান-রাজপুতগণের এরূপ বীরত্ব ও নির্ভীকতার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, কোতারিও সর্দ্দারের পতনে নাথদ্বার

সম্পূর্ণ অরক্ষিত হইয়া পড়িল। হিন্দুকুলাঙ্গার হোলকার সেই অরক্ষিত পুণ্যভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক দেবমন্দিরের সমস্ত সামগ্রী হরণ করিল। দুর্ব্বৃত্ত এমনই লুণ্ঠনপ্রিয় যে, দেবসম্পত্তি ভাবিয়া তাহার কঠোরহৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ধর্ম্মানুরাগের উদয় হইল না। তাহার পিশাচোচিত দৌরাত্ম্যবশতঃ নাগরিকবৃন্দ নাথদ্বার প বত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, সুতরাং সেই হাস্যময়ী পবিত্রভূমি শোচনীয় শ্মশানভূমে পরিণত হইয়া রহিল। বিষ্ণুভক্ত বিশুদ্ধমতি যাত্রিদলের অবিরত সমাগমে যে স্থান পরমরমণীয়তা ধারণ করিত, দিবাযামিনী যাহার চতুর্দ্দিকে গীতিপ্রিয় বৈষ্ণবগণের সুমধুর হরিনাম-সংকীর্ত্তন শ্রুত হইত, আজি তাহা জনহীন, শোকোদ্দীপক মরুভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িল।

উদয়পুরে গমন করিয়াও প্রধান পুরোহিত দামোদর নিশ্চিন্তভাবে দেবোপাসনা করিতে পারিলেন না; অকর্ম্মণ্য রাণার রাজপুরীমধ্যেও তদ্বিষয়ে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। ছয়মাস পরেই তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রমূর্ত্তি লইয়া গাসিয়ার নামক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন এবং তথায় একটি মন্দির স্থাপন করিয়া সমুন্নত প্রাকার দ্বারা দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই স্থানেই তিনি নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে ক্রমে ধারণা জন্মিল যে, ব্রহ্মতেজের প্রভাবে আর কিছুতেই তিনি আপন ইষ্টদেবকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ধারণা অন্তরে ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হওয়াতে পুরোহিত দামোদরজি তরবারিবল অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং নিজে বর্ম্মচর্ম্মে সুসজ্জিত হইয়া অসি-হস্তে সেই পবিত্র তীর্থস্থানকে দস্যুকবল হইতে রক্ষা করিতে উদ্যম করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই চারিশত অশ্বারোহী বীর ধার্ম্মিকবর দামোদরজির দলভুক্ত হইয়া উঠিল। সেই সকল হরিভক্ত ধর্ম্মবীরগণকে লইয়া তিনি প্রায়ই গাসিয়ার পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে অবতীর্ণ হইতেন এবং সময়ে সময়ে আপনার অধিগত সমস্ত বিষ্ণুপীঠের তত্ত্বাবধারণ করিতে যাইতেন।

দুরন্ত হোলকার সিন্ধিয়ার ভয়ে কোন স্থানেই পরিত্রাণ পাইলেন না। নাথদ্বারের সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক তিনি বুনেরা ও শাপুরের মধ্য দিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে অজমীরে উপস্থিত হইলেন। অজমীরে মহম্মদ খাজাপীরের ভজনালয় ছিল। হোলকার স্বীয় লুণ্ঠিত অর্থরাশির কিয়দংশ সেই ভজনালয়ের যাজকগণকে অর্পণ করিলেন এবং সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া জয়পুরে গমন করিলেন। সিন্ধিয়ার সেনাবৃন্দ মিবারে উপস্থিত হইয়া যখন হোলকারকে দেখিতে পাইল না, তখন তাহারা তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইয়া রাণার হৃদয়শোণিত শোষণ করিবার জন্য তৎসকাশে তিন লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিল। ভাণ্ডারে তখন এমন টাকা ছিল না যে, দুর্ব্বৃত্তগণের সে প্রার্থনা পূরিত হইবে; এ দিকে টাকা না দিলেও পরিত্রাণ নাই। অনন্যোপায় হইয়া হতভাগ্য রাণা ভীমসিংহ স্বীয় পরিবারস্থ দ্রব্যসামগ্রী এবং অন্তঃপুরচারিণী রমণীকুলের মণিরত্ন বিক্রয় করিয়া অর্থলিপ্স মহারাষ্ট্রীয়ের বলবতী অর্থপিপাসার কিঞ্চিৎ শান্তিবিধান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়ের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলেন না। সিন্ধিয়া তিন লক্ষ টাকা পাইয়া নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু মিবারের সুবাদার যশোবন্ত রাওভাও একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তদ্ভুক্ত অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য স্বীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ তানসিয়ার করে তাহা অর্পণ করিলেন, অর্থসংগ্রহের মহাধুম পড়িয়া গেল। রাজ্যের সর্দ্দার ও সামন্ত, কৃষক ও বণিক্ দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়ের পিশাচতুল্য অনুচরবৃন্দের প্রচণ্ড লগুড়তাড়নে একান্ত নিপীড়িত হইয়া আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিল। ধনহীন, নিরন্ন, মন্দভাগ্য কৃষকবৃন্দের হলগোধন ও ধেনুপাল সবলে অপহৃত হইল; কিন্তু তাহাতেও তাহাদের অব্যাহতি নাই। পরিশেষে অর্থের জন্য রাক্ষস সেই

শান্তজীবন কৃষকগণকে বন্দী করিয়া তাহাদিগের নিকট মুক্তিপণ চাহিল। যাহারা পণদানে অক্ষম হইল না, পিশাচ মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দ তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। ১৫৫৯ সংবতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপীড়নে এই প্রকারে মিবারভূমি প্রপীড়িত হইয়াছিল।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ লাকুবা স্বীয় অধিপতি কর্ত্তৃক দারুণ অবমাননায় অবমানিত হইয়া অসহ্য মর্ম্মবেদনায় শালুম্‌ব্রার আশ্রয়চ্ছায়াতলে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই অম্বজির ভ্রাতা বলরাও পুনরায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বক্ষমতা অধিকার করিল। সেই সঙ্গে শক্তাবৎগণ ও মন্ত্রী সতীদাস মিলিত হইয়া চন্দাবৎগণকে মন্ত্রগৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। জলিমসিংহ চন্দাবৎগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; সুতরাং তাহারা পদভ্রষ্ট ও বিতাড়িত হওয়াতে তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই অবসরে তিনি আপন অভিসন্ধি-সাধনে যত্নবান্ হইলেন এবং শক্তাবৎগণের সহিত মিলিত হইয়া রাণার মন্ত্রী দেবীচাঁদকে কারারুদ্ধ করিলেন। দেবীচাঁদ চন্দাবৎগণ কর্ত্তৃক মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজি জলিমসিংহের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। নববলে গর্ব্বিত বলরাও প্রতিযোগী চন্দাবৎ সম্প্রদায়ের ভূমিসম্পত্তি আক্রমণপূর্ব্বক কঠোরতম নৃশংসাচরণের সহিত নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুরাচরণে কত চন্দাবতের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত হইল এবং কত মন্দভাগ্যের আবাসভবনসমূহ ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। বলরাওয়ের প্রচণ্ড অত্যাচারে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া চন্দাবৎবৃন্দ আত্মোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য সকলে একত্র সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। এদিকে দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়সৈন্য রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রির কার্য্যাধ্যক্ষ মৌজিরামকে দেখিতে চাহিল। কিন্তু রাণা কিছুতেই তাঁহাকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, মৌজিরামকে কিছুতেই অরিহস্তে প্রদান করিবেন না। দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্র মিনতি করিল, ভয়প্রদর্শন করিল, তথাপি রাণা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। অবশেষে দুরাচার বলরাও স্বীয় সৈন্যবৃন্দকে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুমতি প্রদান করিল; কিন্তু তাহাদের কোন দুরভিসন্ধিই সিদ্ধ হইল না। কারণ, মহাতেজা সচিব দুর্দ্ধর্ষ দস্যুগণের গতিরোধপূর্ব্বক তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। নানা গণেশ পন্থ, জুম্লকর ও উদাকুয়ার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি পাইল। উদাকুয়ার অতি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড। সেই হেতু তাহার গলদেশে গজাশান প্রদত্ত হইল এবং দুষ্টবুদ্ধি বলরাও একটি স্নানাগারমধ্যে রুদ্ধ হইয়া রহিল। মহারাষ্ট্রসেনার সেনানীরা উক্তরূপ শৃঙ্খলিত হইলে চন্দাবৎগণ মহাবলে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাদিগের উপত্যকাস্থিত শিবিরশ্রেণীর উপর আপতিত হইলেন এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই অধিকার করিয়া লইলেন। হিগ্নার্সে নামক এক জন ইংরাজসেনানী তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য সসৈন্যে সমাগত হইলেন; কিন্তু তিনি স্বকার্য্যসাধন না করিয়াই ভয়চকিতমনে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় অধিগত কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে একটি শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণ ব্যূহ রচনা করিয়া অবিলম্বে গরমালা নামক নগরে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইলেন।

মন্দভাগ্য বলরাওয়ের দুরবস্থাবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক জলিম মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। বলরাও তাঁহার বন্ধু; আজি তিনি শত্রুসকাশে বন্দী; সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত না করিয়া বন্ধুবৎসল জলিম কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি বন্ধুকে বিপন্মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভীণ্ডার ও লাওয়ার শক্তাবৎ-সর্দ্দারগণের সহিত রাজধানীর সম্মুখস্থ চৈজ্জানামক পর্ব্বত-মুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। রাণা যদি এই বিদ্রোহী দুর্ব্বৃত্ত সর্দ্দারগণকে সেই মুহূর্ত্তেই বধ করিতে পারিতেন,

তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গললাভের আশা ছিল। সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়-সমিতির ক্রোধাগ্নি বজ্রাগ্নিরূপে তৎপ্রতি ধাবিত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে রাণার বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট ঘটিত না। দুর্ভাগ্যবশে তিনি সে বিষয়ে নিমিষের জন্যও চিন্তা না করিয়া সৈন্ধবী, আরব ও গোসাই প্রভৃতি নানাজাতির নানা সম্প্রদায় হইতে ছয় সহস্র সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মহাবীর জয়সিংহ এবং তাঁহার মহাবল বীচিবীর-গণের সমভিব্যাহারে বিদ্রোহী সেনাদলের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। রাণা সসৈন্যে সেই চৈজাগিরিমার্গ অবরোধপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। উভয়দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। পর্য্যায়ক্রমে পাঁচদিন যুদ্ধ চলিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ আকাশভেদী জলন্ত অসংখ্য গোলা বর্ষণ করিয়াও সেই পাঁচ দিনের মধ্যে রাণার সেনাগণকে পদমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। ষষ্ঠদিবসে রাজপুত পতি পরাভূত হইয়া বলরাওকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইলেন। এই উপলক্ষে যে সন্ধিস্থাপন হইল। তদনুসারে বিজয়ী জালিম সমগ্র জিহাজপুর জনপদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও পরিত্রাণ নাই। ক্রূরমতি মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দের কুটিল রণনীতির অনুসারে পরাভূত রাণা আবার বিপুল যুদ্ধপণ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই যুদ্ধপণ কঠোরতম উৎপীড়নের সহিত সংগ্রহ করিল এবং মিবারের ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষতপূর্ণ-শরীরে আরও গভীরতম ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।

১৮৬০ সংবতে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) ভগ্নহৃদয় হোলকার স্বীয় পূর্ব্ববল পুনরুপচয় করিয়া জলন্ত প্রতিশোধতৃষ্ণা শান্ত করিবার জন্য দক্ষিণরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। যে ভীণ্ডিনগরে সর্দ্দার তাঁহার কামনা পূরণ করেন নাই, সংপ্রতি তাঁহার প্রতি প্রচণ্ড মহারাষ্ট্রবীরের জলন্ত ক্রোধাগ্নি তাড়িতাগ্নিরূপে প্রপতিত হইল। তিনি সসৈন্যে যাইয়া সেই ভীণ্ডীর-দুর্গ আক্রমণ করিলেন; কেহই তাঁহার ভীষণ আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। দুর্গ অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে সমূলে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। তখন ভীণ্ডীরের শক্তাবৎ-সর্দ্দার দুর্গরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া দুই লক্ষ টাকা অর্পণপূর্ব্বক হোলকারের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ভীণ্ডীর সর্দ্দারের হৃদয়-শোণিতপানে সন্তুষ্ট না হইয়া নরপিশাচ মহারাষ্ট্রবীর উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন বিবরণ বিদিত হইয়া রাণা সন্ধিস্থাপনার্থ অজিৎসিংহ নামক এক জন রাজপুতকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। হোলকার উদয়পুরে প্রবিষ্ট হইতেছেন, এমন সময়ে অজিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অজিত তাঁহাকে রাণার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহাতে দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয় উত্তর করিলেন, চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইলে তিনি উদয়পুর পরিত্যাগ করিবেন। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাণার কর্ণগোচর হইল। তাঁহার হৃদয় ভয়ে বিকম্পিত হইতে লাগিল। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই অতুল পণদানে বাধ্য হইলেন। কি আশ্চর্য্য! রাণা ভীমসিংহ কি এতই কাপুরুষ? গিহ্লোটবংশের উপযোগী সামান্যমাত্র গুণও কি তাঁহার শরীরে বিদ্যমান ছিল না? তিনি বীরকেশরী প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া কিরূপে পরিচয় প্রদান করেন? কেন তিনি সেই জগৎপূজ্য পবিত্র গিহ্লোটবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? যদি স্বদেশশত্রুর প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরাজ্য রক্ষা করিতে না পারিবেন, তবে কেন সেই বীরকেশরী প্রতাপসিংহের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন? দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্র-দস্যুগণের নিদারুণ উৎপীড়নে স্বর্ণময়ী মিবারভূমি আজি দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত হইল;—প্রজাবৃন্দের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল; আজি রাণা আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের পদলেহনে নিরত। যে অনিত্য জীবনের জন্য তিনি অসংখ্য প্রজা-বৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না, সে জীবনে ধিক্! বিপন্ন, লাঞ্ছিত, 'অবমানিত, পদদলিত প্রজাবৃন্দের উদ্ধারসাধনে যে জীবন ব্যয়িত না হইল, যাহা চিরদিন পাষণ্ড শত্রুকুলের

পদলেহনে অতিবাহিত হইল, সেই কলঙ্কিত, ঘৃণিত, অকিঞ্চিৎকর ছারজীবনে কি প্রয়োজন ? ইহাতে তাঁহার নামে যে কি গভীর কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল, ইহজন্মে আর সে কালিমা বিমোচিত হইবে না।

দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়দস্যু সন্ধির পণস্বরূপ চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবী করিল। মিবারের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহাতে তত অর্থসংগ্রহ করা রাণার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। তিনি দারুণ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অর্থপ্রদান করিতে না পারিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। অগত্যা রাণা রাজপরিবারের সমস্ত স্বর্ণনির্ম্মিত দ্রব্যজাত মোহরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন এবং অন্তঃপুরকামিনীগণের বসনভূষণ ও ভোজনপাত্রগুলি পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে লাগিলেন। নাগরিকগণও সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্য করিল। সর্ব্বশুদ্ধ বারলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। তাহাতেই বা কি হইবে ? চল্লিশলক্ষ টাকা চাই, দ্বাদশলক্ষ তাহার এক-তৃতীয়াংশও নহে। অবশিষ্ট টাকার প্রতিভূস্বরূপ রাজপরিবারস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত নাগরিক দেহবন্ধনরূপে মহারাষ্ট্র-শিবিরে প্রেরিত হইলেন। এই প্রকারে অর্থ-প্রাপ্তিবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া নির্দ্দয় হোলকার রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এদিকে তাঁহার আদেশে মহারাষ্ট্র-সেনাদল লাওয়া ও বেদনোর জনপদ আক্রমণ করিল। অত্যল্পকালমধ্যেই ঐ জনপদদ্বয় তাহাদের অধিকৃত হইল। পরিশেষে মুক্তিপণস্বরূপ অতুল অর্থ পাইয়া তাহারা উভয় জনপদ প্রত্যর্পণ করিল। ইহাতেও দুর্ব্বৃত্তের ধনলিপ্সা প্রশমিত হইল না। আশু দেবগড় দুর্গ অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয়বীর একেবারে সার্দ্ধ চারিলক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইল। এইপ্রকারে ক্রমাগত আটমাসকাল মিবারের সমস্ত শোণিত শোষণ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত হোলকার উত্তরপ্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাণার প্রতিভূস্বরূপ অজিতসিংহকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে হইল। অবশিষ্ট প্রাপ্যপণ সংগ্রহ করিবার জন্য বলরাম শেঠ নামক এক ব্যক্তি মিবারে অবস্থিত রহিলেন। জগৎপিতা যখনই হউক, পাপীর পাপের দণ্ডবিধান না করিয়া নিরস্ত থাকেন না। যে প্রবল-পরাক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দ পাশবী প্রবৃত্তি ও জঘন্য নৃশংসতার পাপমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিস্তেজ রাজপুতগণের উপর উৎপীড়ন করিতেছিল, বিধাতার নিরপেক্ষ নিয়মানুসারে তাহাদের সেই নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্তবিধান করিবার জন্য সপ্তসাগর পার হইয়া সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে বলিষ্ঠ ব্রিটিশসিংহ ভারতে আগমন করিলেন। তাঁহার বিকট ভ্রূকুটি দর্শনে কুটিল মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, তাহাদিগের সিংহাসন বাত্যাবিতাড়িত কদলীতরুর ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ভারতে ব্রিটিশকেশরীর ক্রমিক গৌরবোন্নতি দেখিয়া তাঁহারা নানারূপ আশঙ্কায় সমাকুল হইয়া উঠিলেন এবং সেই আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ-প্রাপ্তির জন্য ব্রিটিশ শাসনের মূলদেশে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। স্বজাতির স্বার্থসংরক্ষণ অধুনা সমগ্র মহারাষ্ট্রীয়-সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অভীষ্ট সাধনার্থ তাঁহারা পরস্পরের বিদ্বেষভাব বিস্মৃত হইয়া এক অভিন্ন সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত হইলেন। হোলকার ও সিন্ধিয়ার মধ্যে বিবাদবিসংবাদ দূরীভূত হইল। যে হোলকার ইতিপূর্ব্বে স্বীয় ভীষণ প্রতিযোগী সিন্ধিয়ার জ্বলন্ত রোষানলভয়ে রাজ্যত্যাগ-পূর্ব্বক ভারতে নগরে নগরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন; আজি সাধারণের সঙ্কটসময়ে তিনি সমস্ত অপমান ভুলিয়া সেই প্রবলবৈরি সিন্ধিয়াকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং ইংরাজগণকে ভারতভূমি হইতে বিদূরিত করিবার অভিলাষে কৃতসংকল্প হইলেন। হোলকার মিবার লুণ্ঠনপূর্ব্বক শাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন, ইত্যবসরে সিন্ধিয়ার বিশালবাহিনীর ভীমগর্জ্জনে মিবারের প্রান্তভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালমধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। ইংরাজসম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তার

পর তাঁহারা উভয়েই ব্রিটিশগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উপক্রম করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কুক্ষণে ব্রিটিশসিংহের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের সমস্ত উদ্যমই ব্যর্থ হইয়াছিল; অবশেষে তাঁহাদিগকে ইংরাজের পদতলে অবনত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল; তাঁহারা নিরুপায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। * রাজস্থানের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাঁহাদিগের পরাজয়বশতঃ যে বিষম অনিষ্ট হয়, মন্দভাগ্য রাজপুতগণকেই তাহা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ব্রিটিশ কেশরীর প্রচণ্ড বিক্রম-প্রভাবে দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়গণের বিষদন্ত ভগ্ন হইল। সিন্ধিয়া ও হোলকার প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় নববল সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের উপায় ও অবলম্বন সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তথাপি তাঁহারা নিমিষের জন্যও জিঘাংসাকে হৃদয় হইতে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই প্রতিজিঘাংসা ক্রমে ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল বটে; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ সাহস হইল না যে, প্রকাশ্যরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাহার শাস্তিবিধান করিবেন। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে হোলকার ও সিন্ধিয়া বেদনোরের বিশালক্ষেত্রে স্ব স্ব সৈন্যশিবির সন্নিবেশিত করিয়া সংগ্রামসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইংরাজগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাই সেই পরামর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য। দস্যুতা ও নিষ্ঠুরতার কলুষিত মন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দ ভারতে যে বিপুলবল সংগ্রহ করিয়াছিল, আজি তাহা হইতে তাহারা স্খলিত হইয়াছে; নর্ম্মদার দক্ষিণোত্তরতটবর্ত্তী যে সর্ব্বোত্তম জনপদ একদিন অমিতপরিমাণে স্বর্ণফল প্রসব করিয়া তাহাদের কোষগৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছিল, আজি তাহা তাহাদিগের করভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; যে সকল প্রচণ্ড সৈন্যের আনুকূল্যে এতদিন ভারতভূমে বিপুল ক্ষমতা পরিচালন করিতেছিল, তাহারাও বেতন না পাইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে আবার ঘোরতর পরাজয়ে একান্ত অবমানিত ও ক্ষুব্ধমনা হওয়াতে তাহারা একেবারে পিশাচ ও রাক্ষসের ন্যায় নিষ্ঠুর হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও প্রতি ভক্তি নাই, মমতা নাই, সম্মান

* মহাবল মহারাষ্ট্রীয়গণকে বিনমিত করিতে ইংরাজের বহুল অর্থ, বিপুল শোণিত এবং প্রভূত সময় ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহারা একদিনে এক বৎসরে কিংবা একটিমাত্র আক্রমণে সেই বীরকুলের বিপুল বিক্রম ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিবসে বেসিনক্ষেত্রে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তদ্দারাই মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজের মধ্যে শত্রুভাব উদ্দীপিত হয়। যে দিন সেই সন্ধিবন্ধন শেষ হইল, সেই দিন হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগকে প্রবল বৈরীভাবে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ভাগ্যহীন পেশোয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তিনি আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। মহাতেজা সিন্ধিয়া ব্যথিতহৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "এই সন্ধিবন্ধনে আমার রাজমুকুট মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল।" সেই দিন যে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইল, সে বিবাদ অল্পে পর্য্যবসিত হইল না। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল, অপরাপর রাজ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়-শোণিতে ভারতবক্ষ অভিষিক্ত হইল, তথাপি সেই বিবাদের শান্তি হইল না। কখনও ইংরাজ বিজয়পতাকা তুলিয়া সদর্পে মহারাষ্ট্রীয়গণকে চতুর্দ্দিকে তাড়িত করিতেছেন, আবার কখনও বা মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক দলিত ও নিপীড়িত হইয়া ক্ষতস্বীকারপূর্ব্বক অতিকষ্টে নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইতেছেন। এই প্রকারে অনেকদিন অতীত হইল। আশাই, আলিগড়, আরগাও, দিল্লী, লাশবারী প্রভৃতি রণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দ আপনাদিগের বীরবিক্রমে কখনও ইংরাজদিগকে কম্পিত করিলেন; আবার কোন সময়ে ইংরাজের বিস্ময়কর যুদ্ধকৌশলে বিভ্রান্ত ও অধঃকৃত হইয়া পড়িলেন। এই সমস্ত যুদ্ধের পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল মন্‌সন্ মহারাষ্ট্রীয়ের বীরদর্পে বিমূঢ় হইয়া অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করেন। সেই পরাজয়ে ইংরাজদিগের যেরূপ ক্ষতি ও দারুণ অবমাননা হইয়াছিল, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বেলীর পরাজয়ের পর সেরূপ আর হয় নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণের সেই জয়লাভই তাহাদিগের পরাজয়ের অবতরণিকাস্বরূপ হইল।

নাই। মদমত্ত বারণকুলের ন্যায় সকলে বীভৎসবেশে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের গতিরোধ করিবে কাহার সাধ্য?—কে সেই পাষণ্ডগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিবে?—কেহই নাই, কেহই অগ্রসর হইল না। সেই লোমহর্ষণ পৈশাচিক দৌরাত্ম্য শান্ত করিতে কেহই সাহস করিল না। বীরপ্রধান রাজবারাভূমি আজি বীরশূন্য; আজি রাক্ষসসদৃশ মহারাষ্ট্রদস্যুদিগের চরণতলে কঠোররূপে বিদলিত!—স্বর্ণময়ী হইয়া রাজবারাভূমি আজি শোচনীয় শ্মশানে পরিণত! দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রসৈনিকগণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল, তাহাতে যদি তাহাদিগের অধিপতিদ্বয় তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিতে যত্নবান হইতেন, তাঁহারাও সফলকাম হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, নিবর্ত্তিত করিতে যত্নবান্ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা তাহাদিগকে সেই নিষ্ঠুরাচরণে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুতরাং আর কে তাহাদিগকে প্রশান্ত করিতে সমর্থ হইবে? তাহারা নিরঙ্কুশ মদমত্ত হস্তীযূথের ন্যায় মহাবলে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল এবং জনপদ ও নাগরিকবৃন্দের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা তাহাদিগকে অর্থপ্রদানে সমর্থ হইল, তাহারাই নিষ্কৃতি পাইল, নচেৎ অসমর্থ ব্যক্তিরা তাহাদের রোষানলে পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনরোলে মিবারভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নরশোণিতে পথ ঘাট সমস্ত অনুরঞ্জিত হইয়া পড়িল; নৃশংস মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ পৈশাচিক অত্যাচারে ভারতের মধ্যপ্রদেশকে একান্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সেই পাশব-অত্যাচারে রাজবারার যে ভয়ানক শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। চতুর্দ্দিকে ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপীকৃত; কোন স্থানে অর্দ্ধদগ্ধ পল্লীর হৃদয়স্তম্ভন কৃষ্ণমূর্ত্তি;—কোন স্থানে ভস্মীভূত নগর ও গ্রামবাটিকাসমূহের বীভৎস দৃশ্য! আজি সমগ্র রাজবারাভূমি মহাশ্মশানে পরিণত! যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির হৃদয়স্তম্ভন ভীষণমূর্ত্তি নেত্রগোচর হয়। যে দিকে কর্ণপাত করা যায়, সেই দিক্ হইতেই অসংখ্য নরনারীর মর্ম্মভেদী, আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। বীরপ্রসবিনী রাজবারাভূমির এরূপ শোচনীয় দশা আর কখনও সংঘটিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। মুসলমান-রাজত্বের বহুকালব্যাপী অত্যাচারের পরেও রাজপুতজাতির প্রাচীন বীর্য্যবহ্নির যে যৎকিঞ্চিৎ স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল, তাহা এই পিশাচ মহারাষ্ট্রগণের পৈশাচিক উৎপীড়নপ্রভাবে একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই মহাশ্মশানভূমে রাক্ষসের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আর কেহই নাই যে, তাহাদিগের অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল দান করেন। সুতরাং রাজবারাভূমি সেই শোচনীয়-মূর্ত্তিতেই শোকসাগরে নিমগ্ন রহিল।

রাজস্থানের এইরূপ অধঃপতনের সময়ে সেই পিশাচ-প্রপীড়িত মহাশ্মশানক্ষেত্রে কতিপয় ব্রিটন শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশপূর্ব্বক সেই মহারাষ্ট্রগণকে সবলে বিতাড়িত করিয়া সুকৌশলে সমগ্র দেশকে ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। ভারতে ব্রিটিশ-প্রভুত্বের প্রথম পরিস্থাপনসময়ে যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন. আজি তাঁহারা বলহীন নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বন হইয়া শোচনীয়রূপে অধঃপতিত হইলেন, কেহ তাঁহাদিগের উদ্ধারে ভ্রমেও একবার করপ্রসারণ করিল না। এমন কি, যে ইংরাজগণের হইয়া সেই মন্দভাগ্য হিন্দুপতিগণ বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একবার তাঁহাদিগের মুখ চাহিয়া দেখা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদিগকে

পতিত হইতে দেখিয়া সেই ইংরাজগণ সুকৌশলে তাঁহাদিগের রাজ্য করগত করিয়া লইতে লাগিলেন।

ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়ের ভীমযুদ্ধ কিছুদিনের জন্ম নিরস্ত হইল। কিন্তু তাহার পুনরভিনয় আশঙ্কা করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা স্ব স্ব পরিবারবর্গ ও ধনরত্নাদি মিবারের দুর্গাভ্যন্তরে লুকায়িত রাখিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের শিবির পরস্পরের বন্ধু ও সৈন্তগণের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। চন্দাবৎগণের মুখপাত্র সর্দ্দারসিংহ সিন্ধিয়ার সভাস্থলে রাণার প্রতিনিধিস্বরূপে রহিলেন। অম্বজি পুনরায় সিন্ধিয়ার মন্ত্রগৃহে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন। মিবাররাজ ইত্যগ্রে অম্বজির প্রতিদ্বন্দী লাকুবার সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা অম্বজি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রাণার সেই আচরণ মহারাষ্ট্রমন্ত্রীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল, তাহা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। এত দিন তাহা ধীরে ধীরে প্রশমিত হইতেছিল, কিন্তু অধুনা প্রচণ্ডবেগে আবার জ্বলিয়া উঠিল। সেই অন্তর্নিগূহিত বিদ্বেষানলের দারুণ যন্ত্রণায় একান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্ম উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং প্রধান প্রধান মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণের মধ্যে মিবারভূমি বিভাগ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে উপক্রম কার্য্যে পরিণত হইল না। তাঁহাকে উক্ত পাপমন্ত্রে প্রণোদিত দর্শনে শক্তাবৎ-সর্দ্দার হোলকারের সহিত মিলিত হইয়া আপন উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংগ্রাম অপেক্ষা আর একটি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষমতাবতী বীরাঙ্গনা দুর্ব্বৃত্ত অম্বজির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সেই নিষ্ঠুরের প্রভুপত্নী বাইজি বাই। বাইজি বাই রাজপুতশত্রু সিন্ধিয়ার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতজাতির সম্মান ও গৌরবগরিমা বিস্মৃত হন নাই। রাজস্থানের সমস্ত প্রদেশ—বিশেষতঃ মিবারভূমিকে তিনি ভক্তির সহিত পূজা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, সেই মিবারভূমিই হিন্দু-স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র এবং শিরোমণি গিহ্লোটবীরগণের চিরবাসস্থান। প্রসিদ্ধ ক্রূরনীতিক শূরজিরাও তাঁহার পিতা। সেই দুর্ব্বৃত্ত পিতার ঔরসে জন্ম বটে, কিন্তু বাইজি বাই নারীকুলের শিরোমণি বলিয়া গণনীয়া। দুর্ব্বৃত্ত অম্বজির দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহা ব্যর্থ করিবার অভিলাষে সমগ্র রাজপুতবৃন্দকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ পরস্পর পরস্পরের চিরবৈরী, আজ মিবারের সৌভাগ্যবশে তাঁহারা সে শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া এক অভিন্ন সহানুভূতিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং নিষ্ঠুর অম্বজির দুরভিসন্ধি বিফল করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহবংশের লীলাভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী; মিবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও শত্রুকুলের হস্তগত হইবে, প্রাণ থাকিতে তাঁহারা ইহা সহ্য করিতে পারিবেন না। চন্দাবৎ সর্দ্দারসিংহ ইতিপূর্ব্বে সিন্ধিয়ার সভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু মন্ত্রীর পূর্ব্বোক্তরূপ দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন প্রতিদ্বন্দী সংগ্রামসিংহের সহিত মিলিত হইলেন এবং দুষ্ট অম্বজির দুরভিসন্ধির প্রতি বাধা দিবার জন্ম উপযুক্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। আজ শক্তাবৎ-চন্দাবতে বহুদিনের পর পুনর্মিলন হইল, জ্যেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দী কনিষ্ঠকে দীর্ঘকালের পর হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা পাঞ্চোলি কিষণদাসের সহিত একত্র হইয়া হোলকারের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সগর্ব্বস্বরে কহিলেন, "মহারাষ্ট্ররাজ! আপনি কি দুর্দ্দান্ত অম্বাজকে মিবার বিক্রয় করিতে বলিয়াছেন?" এই কথা শুনিয়া হোলকার অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে সমস্ত মিবারভূমি এবং মিবাররাজ রাণার শোচনীয় দুরবস্থার কথা তাঁহার অন্তরে সমুদিত হওয়াতে তাঁহার মর্ম্মবেদনা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

গম্ভীরস্বরে শপথ করিয়া তিনি কহিলেন, "না, তাহা কখনই হইতে দিব না। আমি আপনাদিগের সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি, মিবারের ভাগ্যে সেরূপ দুর্দ্দশা কখনই হইবে না। আপনারা সকলে একতাসূত্রে বদ্ধ হউন, আজি বহুদিনের শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করুন এবং একসঙ্গে অহিফেন সেবনপূর্ব্বক একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করুন।" হোলকারের এই কথা শুনিয়া সকলের হৃদয়ই আশ্বস্ত হইল, তখন সকলে একত্র অহিফেন সেবনপূর্ব্বক একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিলেন। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণকে শুদ্ধ মৌখিক আশ্বাসদান করিয়াই হোলকার নিশ্চিত রহিলেন না, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং কথা-প্রসঙ্গে রাণার উচ্চবংশের পবিত্রতা ও গৌরবগরিমার বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, কিরূপ উচ্চবংশে রাণার জন্ম, তাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন। আমাদিগের যিনি প্রভু, বিবেচনা করিয়া দেখিলে রাণা তাঁহার প্রভুরও পূজনীয়।* তবে তাঁহার প্রতিকূলে শত্রুতাচরণ করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য? এরূপ ঘোরসঙ্কটে তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনে ব্রতী হওয়া আমাদিগের উপযুক্ত নহে। মিবারের যে সকল বন্ধকী ভূসম্পত্তি আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা বহুদিন হইতে অন্যায়রূপে ভোগ করিয়া আসিতেছেন, কোথায় আমরা আজি তাহা রাণাকে প্রত্যর্পণ করিব, তাহা না করিয়া নৃশংসের ন্যায় তাঁহার রাজ্য আমাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে উদ্যত হইতেছি? আমাদিগের রাজ্যে ধিক্! আপনার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করুন, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রাণার পক্ষ কদাচ ত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধপক্ষে দণ্ডায়মান হইব না। বিশ্বাস না হয়, দেখুন, আমি এই সর্ব্বসমক্ষে আমার অধিকৃত নীমবেহেরা প্রদেশ রাণাকে প্রত্যর্পণ করিলাম।" হোলকারের এই তেজোগর্ভ গম্ভীরবাক্য শুনিয়া সিন্ধিয়া নীরবে রহিলেন। হোলকারের বাক্য তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল, চতুর হোলকার তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং আপনার বাক্য অধিকতর তেজোময় করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় কহিলেন, "আরও আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ সময়ে রাণাকে যদি আমাদিগের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করি, তাহা হইলে যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। ফিরিঙ্গিগণের সহিত যদি আবার সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের পরিবারবর্গ ও ধনরত্নাদি কোথায় রাখিব? রাণার সহিত একপ্রাণ না হইলে তাঁহার দুর্গগুলি আমাদের উপকারে আসিবে না। ভাবিয়া দেখুন, তাহা হইলে আমরা কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িব।" হোলকারের তেজোগর্ভ বাক্য সিন্ধিয়ার মনোরাজ্য অধিকার করিল; তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। বদনমণ্ডলে যেন আনন্দের রেখা বিকাশিত হইল। তিনি হোলকারের কথাগুলি মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞান করিয়া তৎপালনে সর্ব্বথা প্রযত্নপর হইলেন এবং রাণার দূতগণকে স্বীয় শিবিরমধ্যে স্থানদান করিলেন।

হোলকার শিবির হইতে সিন্ধিয়া শিবির দশক্রোশ দূরবর্ত্তী; ইচ্ছামত পরস্পর সাক্ষাৎ করা সহজ নহে; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা কথোপকথন ঘটিয়া উঠিত না। ইহার উপর আবার কয়েকদিন অহোরাত্র মুষলধারে জলবর্ষণ, কাজেই আলাপ-সম্ভাষণের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িল। বর্ষার সেই ভীষণ প্রাদুর্ভাবসময়ে হোলকার আপনার শিবিরাভ্যন্তরে সমাসীন আছেন, সহসা প্রতিহারী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র প্রদান করিল। হোলকার আগ্রহের

---

* অর্থাৎ যে বংশ হইতে সেতারা-রাজগণ সম্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের মন্ত্রী পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও হোলকারকে সামন্তরাজা গণনা করেন, রাণা তাঁহাদেরও পূজার পাত্র।

সহিত সেই সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়দংশ পাঠ করিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ-পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন এবং অবনতবদনে থাকিয়া ঘন ঘন অধরদংশন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার নেত্রপ্রান্ত হইতে যেন বহ্নিকণা নির্গত হইতেছিল। ক্ষণকাল পরে হোলকার আপন অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ করিলেন, "রাণার দূতগণকে এখনই আহ্বান কর।" হোলকারের এইরূপ আকস্মিক মনোবিকারের কারণ কি,—সেই সংবাদপত্রে তিনি অবগত হইলেন যে, রাণার ভীরুবক্স নামক একটি দূত মহারাষ্ট্রীয়গণকে মিবার হইতে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত ব্রিটিশ-সেনাপতি লর্ড লেকের সহিত ষড়্যন্ত্র করিতেছেন।

কিষণদাস ও মিবারের অন্যান্য দূতবৃন্দ হোলকারের শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ক্রোধান্ধ মহারাষ্ট্রীয়বীর সেই সংবাদপত্রখানি কিষণদাসের প্রতি সতেজে ফেলিয়া দিয়া রোষকষায়িতনেত্রে কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! মিবারবাসিগণ কি অবশেষে আমার সহিত এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিল? তোমরা কি সকলের সহিত এই প্রকারেই বিশ্বাস রক্ষা করিয়া থাক? ভাবিয়া দেখ, তোমার প্রভুর জন্য আমি আমার আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিলাম। সিন্ধিয়ার ক্রোধ বা জিঘাংসার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম না। আজি ফিরিঙ্গিগণের সহিত ভীষণ সংগ্রামসময়ে কোথায় সমগ্র হিন্দুজাতি এক অভিন্ন ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবে; তাহা না হউন, তোমার প্রভু সকলকে ত্যাগ করিয়া সেই ফিরিঙ্গিদলের সহিত সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইলেন? 'দিল্লীসিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করি না' বলিয়া তিনি যে গর্ব্ব করিতেন, এই কি তাহার পরিণাম? এইরূপ প্রতিদান পাইব বলিয়াই কি আমি অম্বজিকে তোমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম?" কিষণদাস হোলকারকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু হোলকারের মন্ত্রী আলিকুল তানসিয়া কিষণদাসকে বাধা দিয়া আপনার প্রভুকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি এই রঙ্গরাদিগের * আচরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন; ইহারা আপনার সহিত সিন্ধিয়ার কলহ বাধাইয়া দিয়া উভয়কেই নিপাত করিবে, ইহাই উদ্দেশ্য। আপনি উহাদের পক্ষ ত্যাগ করুন, সিন্ধিয়ার সহিত পুনর্ম্মিলিত হউন, শূরজিরাওকে বিতাড়িত করুন এবং অম্বজি যাহাতে মিবারের সুবাদার থাকেন, তাহাই করুন্। নচেৎ আজি আপনাকে ত্যাগ করিয়া সিন্ধিয়াকে মালবে লইয়া যাইব।" একমাত্র ভাও ভাস্কর ব্যতীত আর সকল মন্ত্রীই আলিকুল তানসিয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। হোলকার তাঁহাদেরই পরামর্শ অনুসারে শূরজিরাওকে বিদায় দিলেন এবং ব্রিটিশসেনার সম্মুখীন হইবার জন্য উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার সহায়বল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল, কিছুতেই তিনি ইংরাজের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে রণবীর লর্ড লেক সদলে তাঁহার পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিলেন। হোলকারের মনের আশা মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। সিন্ধুনদের শাখা বিপাশার তীরে বীরপুঙ্গব আলেকজন্দরের সাধনক্ষেত্রে ব্রিটিশ-সেনাপতির সহিত মহারাষ্ট্রবীরের সন্ধিবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইল।

মিবারের প্রতি হোলকারের ক্রোধসঞ্চার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি রাণার কোনরূপ অনিষ্ট-সাধন করেন নাই; বরং মিবার-পরিত্যাগকালে রাণাকে ও মিবারভূমিকে নিষ্কণ্টক রাখিবার জন্য সিন্ধিয়াকে অনুরোধ করিয়া গেলেন;—বলিলেন, "আমি রাণাকে অম্বজির আক্রমণ হইতে রক্ষা

---

* মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুতগণকে রঙ্গরা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

করিতে প্রতিশ্রুত। দেখিবেন, যেন আমার এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না হয়। যদি আমার এই অনুরোধ রক্ষিত না হয়, তবে আপনাকেই ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে।” ভয়ে হউক, অনুরাগে হউক্ কিংবা যে কোন কারণেই হউক্, সিন্ধিয়া হোলকারের অনুরোধ কিছুদিন রক্ষা করিলেন। অবশেষে হোলকারকে বিপন্ন দেখিয়া আর তাহা পালন করিতে পারিলেন না। অচিরে ষোড়শ লক্ষ টাকা মিবার হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি সদাশিবরাওকে প্রেরণ করিলেন। রাক্ষসের ন্যায় ঘৃণিত পথে পদক্ষেপ করিয়া মিবারের ক্ষতবিক্ষতহৃদয়ের শোণিত পান করিবার জন্য দুষ্টমতি সদাশিবরাও জিন-ব্যপটিষ্টির গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মিবারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে ঐ সেনাদল মিবারের প্রতিকূলে যাত্রা করিল। দুইটি অভিসন্ধি-সাধনের উদ্দেশ্যে সিন্ধিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে মিবার-বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথম—পূর্ব্বোক্ত অর্থসংগ্রহ, দ্বিতীয়—জয়পুর-পতির সৈন্যদলকে উদয়পুর হইতে দূরীকরণ। রাণার কন্যার সহিত জয়পুরপতির বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হওয়াতে উভয়পক্ষের সংবাদ ও যৌতুকাদি বহন করিবার জন্য কচ্ছাবহ রাজকুমারের সৈন্যগণ সেই সময়ে মিবারে অবস্থিতি করিতেছিল, কিন্তু তাহাদিগকে অধিকদিন আর মিবারে অবস্থিতি করিতে হইল না।

অদৃষ্টচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে রাণা ভীমসিংহ দুর্ভাগ্যের নিম্নতমকূপে নিপতিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একপ্রকার সুখে-দুঃখে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষগণের জ্বলন্ত গৌরবগরিমা কালগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই সৌভাগ্যের প্রদীপ্ত আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে; তথাপি তিনি আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক এক প্রকারে জীবনযাপন করিতেছিলেন; কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন। রাণার কোন উপায় নাই, কোনরূপ অবলম্বন নাই; তথাপি তিনি যে একমাত্র রাজসম্মানে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দ-রূপিণী কন্যা কৃষ্ণকুমারীর মুখ চাহিয়া দিনযাপন করিতেছিলেন, নির্দ্দয় বিধি তাহাতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। তাঁহার সেই পিতৃপুরুষদের পূর্ব্বগৌরবের প্রণষ্টাবশেষ রাজসম্মানের মূলেও কুঠারাঘাত পড়িল। কষ্টের উপর কষ্ট, যাতনার উপর যাতনা, বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা, দুর্ভাগ্যের উপর আরও অসহনীয় দুর্ভাগ্যের দারুণ কশাঘাত! সর্ব্বস্ব গিয়াছে, সকল সুখে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, একমাত্র স্নেহের পুত্তলী কৃষ্ণকুমারীর বদনপদ্ম দেখিয়া তিনি কোনরূপে জীবনধারণ করিতেছিলেন; পরিশেষে তাহাকে লইয়াই তাঁহার শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিল; তাহাকে লইয়াই তিনি মহাসঙ্কটে পড়িলেন।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জয়পুরপতির সহিত কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং সেই শুভসম্বন্ধকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য জয়পুর হইতে সৈন্যদল উদয়পুরে আসিয়াছিল। প্রায় তিন সহস্র বীর সেই সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা রাজধানীর অনতিদূরে শিবিরস্থাপন-পূর্ব্বক উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়াছিল। রাণা সেই সমস্ত উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রত্যুপ-হার পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু মানসিংহ সেই সম্বন্ধ-বন্ধনে অবিলম্বেই বিষম প্রতিবন্ধ উৎপাদন করিলেন। জয়সিংহের উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য মহারাজ মানসিংহ একেবারে তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারও আন্তরিক ইচ্ছা, কৃষ্ণকুমারী তাঁহার গলে বরমাল্য প্রদানপূর্ব্বক অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া সুখী করেন। আপনার পক্ষসমর্থনের জন্য মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজকুমারী কৃষ্ণার সহিত মারবারের নৃপতির সম্বন্ধ হইয়াছিল, তবে তিনি মারবারের বর্ত্তমান রাজার হস্তে কেন সমর্পিতা না হইবেন? আত্মমতসমর্থনের জন্য মানসিংহ যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা

অতি অদ্ভুত। তিনি রাণার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধ মারবারপতির সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছিল, মারবাররাজ্যে যিনিই অধিপতি থাকুন না কেন, তাহা বিচার করা অনাবশ্যক। সেই সিংহাসন পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তদ্রূপ রহিয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণা তাঁহাকে বরণ করিবেন না কেন? পরিশেষে তিনি ভয় দেখাইয়া আরও বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি রাণা বাসনা পূরণ না করেন, যদি জগৎসিংহের হস্তে সুন্দরী কৃষ্ণকুমারী অর্পিতা হন, তাহা হইলে সে বিবাহ কদাচ সমাপন করিতে দিব না, সাধ্যানুসারে তৎপ্রতিকূলে বিঘ্ন করিতে ক্রটি করিব না।" অনেকে বলেন, মানসিংহের সর্দ্দারেরা তাঁহাকে এই সমস্ত অনুপরামর্শ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে চন্দাবৎগণ রাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন। দুষ্ট রাঠোর-সর্দ্দারগণ স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির সহায়তা পাইবার ইচ্ছায় তাঁহাদিগের মুখপাত্র অজিতসিংহকে উৎকোচপ্রদান করিলেন এবং যাহাতে রাণা স্বীয় দুহিতা কৃষ্ণকুমারীকে জগৎসিংহের করে সম্প্রদান না করেন, তাহাই করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

লোকললামভূতা হেলেনার * অলোকসামান্য রূপলাবণ্য যেমন তাঁহার পতি ও তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিগণকে অনন্তকালের জন্য সংহার করিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর সৌন্দর্য্যও সেইরূপ তাঁহার পিতা ও প্রণয়ার্থিগণকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিল। পরিশেষে সুকুমারী আপনিই আপনার সংহারসাধন করিলেন। তাঁহার আপনার রূপই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া মানসিংহ অম্বররাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। আশু তুমুল-বিগ্রহ উপস্থিত হইল। ক্রূরমতি মহারাষ্ট্রদস্যুগণও স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত অনর্থরাশি শতগুণে বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিল। সিন্ধিয়া ইত্যগ্রে জগৎসিংহের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু জগৎসিংহ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ না করাতে তিনি তদ্বিরুদ্ধে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যাহাতে অম্বরপতি কৃষ্ণকুমারীকে প্রাপ্ত হইতে না পারেন, তাহার উপায় করিবার জন্য মহাবীর সিন্ধিয়া মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মানসিংহের সাহায্যার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি আশু জয়পুরের সৈন্যগণকে মিবার হইতে বিদায়প্রদান করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রাণা তাঁহার অনুরোধ কদাচ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সে বিশ্বাস এখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। রাণা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। অতঃপর সিন্ধিয়া রাণার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার অভিলাষে আপনার গোলন্দাজ সৈন্যগণকে মিবারের বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য রাজা জগৎসিংহের সৈন্যবল সমভিব্যাহারে রাণা আরাবল্লীর প্রবেশপথে দণ্ডায়মান হইলেন। তথায় উভয়দলে ক্ষণকাল যুদ্ধ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশে রাণা ভীমসিংহই পরাভূত হইলেন। অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য তিনি সদলে নগরমধ্যে পলায়ন করিলেন। বিজয়ী সিন্ধিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক আট সহস্র সৈন্য লইয়া উদয়পুরের উপত্যকা

* জুপিটের ঔরসে এবং স্পার্টামহিষী ও লিডার গর্ভে হেলেনার জন্ম। কেষ্টর ও পোলাক্স নামে ইহার দুইটি ভ্রাতা ছিলেন, যৌবনাবস্থাতেই এথেনীয় মহাবীর থিসিয়স হেলেনাকে হরণ করেন। কিন্তু তাহার ভ্রাতৃদ্বয় কেষ্টর ও পোলাক্স তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হেলেনার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া অসংখ্য নরপতি তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া তদীয় পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে মিনিলাস নামক এক নৃপতির সহিত হেলেনার বিবাহ হইল, বিবাহের কিছুদিন পরেই হেলেনাকে ট্রয়ের প্রসিদ্ধ রাজকুমার প্যারিস হরণ করিয়া লইলেন। কেহ কেহ বলেন, হেলেনা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সহিত গিয়াছিলেন। এই সূত্র হইতেই ট্রোযানযুদ্ধ ঘটে। ট্রোজানযুদ্ধ শেষ হইলে হেলেনা আপনার পূর্ব্বপতি হতভাগ্য মিনিলাসের নিকট প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাজধানীর অদূরেই সেনানিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন, রাণা ভীমসিংহ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। কিরূপে সেই বিপদ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে স্থিরচিত্তে আপন সর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা তর্ক-বিতর্কের পর পরিশেষে স্থির হইল যে, জয়পুরপতি জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তৎপরে তিনি জয়পুরের সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন এবং নিরুপায় হইয়া সিন্ধিয়ার বলবতী অর্থলিপ্সা পরিতৃপ্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্ধিয়া একমাস পর্য্যন্ত উদয়পুরের উপত্যকা প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। তৎকালে ভগবান্ একলিঙ্গের পবিত্র মন্দিরমধ্যে রাণার সহিত তাঁহার দরবার হইল।*

মিবার হইতে দূতগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া জয়পুররাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি যে রমণীরত্নের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিবার জন্য অন্তরে তত আশা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহার কি হইল? রাণা স্বহস্তে সে আশালতা ছেদন করিয়া দিলেন। রাণার আচরণ যতই অন্তরে উদিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার হৃদয় অভিতপ্ত হইতে থাকিল; ততই তিনি রাণার সেই দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইতে লাগিলেন। ক্রমেই প্রতিহিংসা তাহার হৃদয় অধীর করিয়া তুলিল। প্রতিশোধ না দিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। পরিশেষে একটি সুবিশাল সৈন্যদল সজ্জিত করিয়া মিবারের প্রতিকূলে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই উপলক্ষে যে সেনাদল সজ্জিত হইল, জগৎসিংহের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভকাল হইতে সেরূপ সেনাদল আর কোন কালেই সজ্জিত হয় নাই। এদিকে মারবারপতি মানসিংহ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচণ্ড রণোদ্যমের কথা শুনিয়া তদ্বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সংকল্প করিলেন এবং স্বীয় অধিগত সমস্ত সৈন্য লইয়া ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তদায় রাজ্যমধ্যে ঘোর অন্তর্বিপ্লব উদ্ভূত হইয়া তাঁহার মনোরথসিদ্ধির বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। রাজসিংহাসন লইয়াই উক্ত অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। রাজ্যলিপ্সু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ মারবারের সামন্ত সমিতিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, সে অন্তর্বিপ্লব অল্পে প্রশান্ত হয় নাই; তাহাতে বহু অর্থ ও বহু শোণিতপাত হইয়াছিল; এমন কি, দুর্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণও তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরিক বলের ভূরিপরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষই রাজ্যের অনর্থের মূল কারণ সন্দেহ নাই। মারবার বহুদিন হইতে সেই অনর্থের রঙ্গভূমি হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কদাচ কাহারও অদৃষ্টে সুফলজনক হইয়াছে, আবার কাহারও বা সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মানসিংহ তৎসাহায্যে মারবারের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ

*সিন্ধিয়া এই উপলক্ষে স্বীয় গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য ব্রিটিশদূত ও তাঁহার দলবলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সভাতলে সূর্য্যবংশীয় বাপ্পারাওয়ের বংশধর ও তৎপুত্রদিগের রাজোচিত লক্ষণাদির সহিত কৃষককুলজাত মহারাষ্ট্রীয়ের অস্বাভাবিক রাজলক্ষণের সমূহ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়াছিল। সিন্ধিয়ার পূর্ব্বপুরুষেরা কৃষকের কার্য্য করিত; এক্ষণে তিনি পিতৃপিতামহগণের আশীর্ব্বাদে ভারতে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই। কৃষককুমার জন্মিয়া তিনি সূর্য্যবংশীয় রাজগণের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিতেন। এই উপলক্ষে উদয়পুরের মনোহর প্রাসাদাবলী, দ্বীপপুঞ্জ ও উদ্যানবাটিকা সকল দেখিয়া সেই দুরাকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। অনেকে অনুমান করেন, জয়পুরপতি সিন্ধিয়াকে করদানে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন নাই। জগৎসিংহের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ আছে, দুর্বৃত্ত সিন্ধিয়া কৃষ্ণকুমারীর করগ্রহণে ইচ্ছা করিয়াছিলেন.

হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দলাদলি উপস্থিত না হইলে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না; সেই জন্যই তিনি সেই পরস্পরবিদ্বেষী সৈনিক ও সামন্তগণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হন নাই।

মানসিংহ জগৎসিংহের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। এতদিন যাহাদিগকে তিনি উৎপীড়ন করিয়াছেন, তাহারা এক্ষণে অবসর পাইয়া তাঁহার বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল এবং মিবারের দুর্নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক এক জন অপ-নৃপতিকে আপনাদের মস্তকোপরি স্থাপন পূর্ব্বক অভীষ্ট-সাধনে অগ্রসর হইল। সেই অপ-নৃপতির পতাকা জয়পুর-রাজার বিশাল অনীকিনীর মধ্যভাগে সমুড্ডীন হইল। জয়পুর-পতি জগৎসিংহ ১২০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে মানসিংহ তাঁহার অর্দ্ধপরিমাণ সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মারবার ও অম্বরের প্রান্তদেশবর্ত্তী পুরবৎসর নামক স্থানে উভয়দলে সাক্ষাৎ হইল। উভয়দলই মহাবিক্রমে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তাদৃশ ভীষণযুদ্ধের পরেই মানসিংহের অধিকাংশ সর্দ্দারেরা অপ-নৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিল। মানসিংহের আশা ভরসা বিলুপ্ত। তিনি যে সর্দ্দারগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারাই পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ভগ্নহৃদয় হইয়া মানসিংহ আপনার অসিদ্বারা আপনার কণ্ঠদেশ ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে তাঁহার পক্ষীয় কতিপয় সর্দ্দার দ্রুতগতি তাঁহার হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইলেন এবং যুদ্ধস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাহাতেও কিন্তু তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহার বৈরিগণ পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক একেবারে তাঁহার রাজধানীর তোরণদ্বারে উপস্থিত হইল। মানসিংহের সামন্তেরা নগরদ্বার অবরোধপূর্ব্বক শত্রুগণকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন; তাহারা যোধপুর অবরোধ করিল। ছয় মাস পর্য্যন্ত উভয়দল ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল। নাগরিকবৃন্দ এই ছয়মাস কাল মহাবীরত্বের সহিত অবরোধকারিগণের সমস্ত উদ্যম বিফল করিতে লাগিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের তেজ ও বলের হ্রাস হইয়া আসিল; সুতরাং যোধপুর বিপক্ষের অধিকৃত হইল শত্রুগণ তাহা করগত করিয়া তন্মধ্যস্থ যাবতীয় দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইল। কিন্তু আবার তাহাদের দলমধ্যে সাম্প্রদায়িকভাব সমুদিত হইয়া উঠিল; সুতরাং তাহাদের সকল পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব কচ্ছবাহ-সৈন্যগণের মধ্যে এরূপ তীব্রবেগে সংক্রামিত হইয়া পড়িল যে, অত্যল্পকালমধ্যেই ছত্রভঙ্গের ন্যায় এক একটি দল এক এক দিকে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। এ দিকে রাঠোর-বীরেরা উপযুক্ত অবসর পাইয়া সেই বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল, তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল, সুতরাং তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল।

চারিদিকে বিপদের ভীষণমূর্ত্তি। মহারাজ জগৎসিংহ প্রাণভয়ে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার তত বিক্রম তত বাহ্বাস্ফোটন, তত আস্ফালন সকলই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আপনার সঙ্কট অনিবার্য্য ভাবিয়া অবশেষে তিনি পুরবৎসর ও যোধপুরের লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী স্বনগরে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত সামগ্রী জয়পুরে বাহিত হইবার অগ্রে রাঠোরসর্দ্দারগণ পথিমধ্যে সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। ইত্যগ্রে তাঁহাদের দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা রাঠোররাজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি তাঁহাদের ভক্তি বা অনুরাগের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সম্প্রতি স্বদেশের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদেরই কাপুরুষতা-দোষে মারবার-রাজ্যের দুর্দ্দশা

ঘটিয়াছে। যদি তাঁহারা অম্বরপতির পক্ষ অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে কুশাবহগণ রাঠোরদুর্গ লুণ্ঠন করিতে কদাচ সমর্থ হইত না। সুতরাং কুশাবহ-লুণ্ঠিত যাবতীয় বস্তু, তাঁহাদের সেই ঘৃণিত কাপুরুষতার প্রধান নিদর্শন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই পাপ নিদর্শন যে আবার জয়পুরে বাহিত হইবে, তাহা তাঁহার জীবন থাকিতে সহ্য করিতে পারিবেন না সুতরাং যে কুশাবহ-সৈন্যগণ সেই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক মারবারের যাবতীয় দ্রব্যই উদ্ধার করিয়া লইলেন।

কালচক্রের আবর্ত্তনে জগৎসিংহ সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার সমস্ত উপায় ও অবলম্বন নষ্ট হইয়া গেল। যে আশা-ভরসা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত শূন্যে বিলীন হইল। যে সুবিশাল সেনাদলকে সজ্জিত করিয়া তিনি মিবারভূমি আক্রমণ করিতে আসিলেন, তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে মারবারের মধ্য দিয়া প্রাণ লইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আপনার ও সেই সকল সেনাদলের দুরবস্থার আর সীমাপরিসীমা রহিল না। কুক্ষণে তিনি কৃষ্ণকুমারীকে অঙ্কলক্ষ্মী করিতে চাহিয়াছিলেন, কুক্ষণে তিনি তাঁহার প্রণয়পাত্র হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কুক্ষণে তিনি মানসিংহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। যেরূপ কর্ম্ম, তাহার উপযুক্ত ফল হইল। আপনার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এমনই দুর্ভাগ্য যে, স্বনগরে উপস্থিত হইয়াও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। পরাজয়বশতঃ দারুণ মনঃকষ্ট ও যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া তাঁহার সৈন্যদল একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর বহুদিনের বেতন না পাওয়াতে তাহারা সামান্যমাত্র সংস্থানেও বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই সকল দীনহীন সৈন্যগণ বেতনের প্রতীক্ষায় বহুদিন ধরিয়া জয়পুরে থাকিয়া যে কত কষ্টভোগ করিয়াছিল, তাহার আর পরিসীমা নাই। তাহাদিগের চিতাভস্ম ও তাহাদিগের তুরঙ্গগুলির অস্থি-মালা বহুদিন ধরিয়া জয়পুরের প্রাকারতলে পতিত ছিল;—মনোরমদৃশ্য জয়পুর বহুদিনের জন্য বীভৎস শ্মশানভূমে পরিণত হইয়াছিল। জয়পুর শোচনীয় দুর্দ্দশার ক্রোড়ে বহুকাল ধরিয়া অবস্থিত ছিল।

অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে কখন্ কোন্ দিকে স্খলিত হইয়া পতিত হইতে হয়, কে বলিতে পারে? যে মানসিংহ আপনার সামন্ত ও সর্দ্দারগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একেবারে অধঃপতিত হইয়া যাইতেছিলেন, আবার তিনি সমস্ত বিঘ্ন, বিপদ ও সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজকার্য্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবল বৈরিদল পরাহত হইল এবং তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব পুনরায় ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিল। আমীর খাঁ নামক এক জন দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের সাহায্যে তিনি ঐ সমস্ত পুনরুদ্ধার করিলেন। যে সকল দুরাচার মুসলমান আসিয়া অপবিত্রপদে ভারতবর্ষকে অপবিত্র করিয়াছে, যাহাদের পাপনামাবলী অতীতসাক্ষী ইতিহাসের পবিত্র পত্র কলঙ্কিত করিয়া রহিয়াছে, দুরাচার আমীর খাঁ তাহাদের মধ্যে একজন। আমীর খাঁ ইতিপূর্ব্বে মানসিংহের প্রবল শত্রুমধ্যে পরিগণিত ছিল। যে অপ-নৃপতি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এত দিন দুরাচার আমীর তাঁহার পক্ষই অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু পাপ অর্থলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া পিশাচ সেই অপ-নৃপতির পক্ষত্যাগ করিয়া মানসিংহের পক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দুর্ব্বৃত্ত এমনই নিষ্ঠুর যে, যিনি তাহাকে এতদিন সসম্মানে ও সগৌরবে আশ্রয় দিলেন অবশেষে তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল; অপ-নৃপতি ও তাঁহার অনুচরবর্গকে নিপাত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। এ দিকে রাক্ষস আমীর খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে একটি

মস্‌জীদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; অপ নৃপতিও তথায় উপস্থিত হইলেন। দুর্বৃত্ত তাঁহার সহিত সখ্যভাব স্থাপন পূর্ব্বক তৎপক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত হইল। তাহার দুরভিসন্ধি যে কপটতায় পরিপূর্ণ, তাহা হতভাগ্য অপ-নৃপতি আদৌ বুঝিতে পারিলেন না; কপট-বন্ধুত্বকে ঈশ্বরানুগ্রহ জ্ঞানে আপনাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি আপনার শিবিরাভ্যন্তরে নৃত্যগীতের অনুমতি করিলেন। অবিলম্বে কোকিলকণ্ঠী সুন্দরী গায়িকাগণ বিশুদ্ধতানলয়ে গীতিসুধা বর্ষণ করিতে লাগিল সকলেই নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময়ে নররাক্ষস আমীর খাঁ সদলে তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক শিবিরশ্রেণীর রজ্জুসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগের সকলকেই সেই ছিন্ন পটসমূহে জড়িত করিয়া গুলীর আঘাতে পশুর ন্যায় বধ করিল। বন্ধুত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন।

রাজবারার রঙ্গভূমে অপূর্ব্ব অভিনয় হইল। রাজপুতজাতির সর্ব্বনাশকর একটি ঘৃণিত চক্রান্ত পর্য্যবসিত হইল। এই সর্ব্বনাশকর অভিনয়ের পরে যে আর একটি লোমহর্ষণ কাণ্ড অভিনীত হইল, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠে এবং সংসার কেবল মায়ার মোহকরী রঙ্গভূমি বলিয়া অনুমিত হয়। শিশোদীয়বংশের লক্ষ্মীস্বরূপিণী রাজস্থানের প্রফুল্লকমলিনী শ্রীমতী কৃষ্ণ-কুমারীকে নিষ্ঠুর আততায়ী ও বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডদিগের পরিতৃপ্তির জন্য অকালে আপনার অমূল্য পবিত্রজীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল। মারবার ও অম্বরের মধ্যে তুমুলসংগ্রাম এক প্রকার নিরস্ত হইল বটে; কিন্তু যে সুন্দরীর জন্য তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার আশা কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই সুতরাং উভয়ের মনোমালিন্য ও অনৈক্য সমভাবেই রহিল। অবশেষে সেই মনোমালিন্যজনিত ঘোরতর অনৈক্য হইতে যে মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হয় নাই; তাহা নির্ব্বাণ করিতে সেই সুকুমারী সুন্দরীর কোমল হৃদয়ের পবিত্রশোণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে নররাক্ষস আমীর খাঁ কর্ত্তৃক রাঠোর অপ-নৃপতির সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, এই লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক কাণ্ড তাহারই উত্তেজনায় অভিনীত হয়, স্বর্গীয় সরলাসুন্দরীর পবিত্র জীবন-প্রদীপ তাহারই প্ররোচনায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। মন্দভাগ্য রাণা ভীমসিংহ তাহার হস্তে কল-চালিত কাষ্ঠপুত্তলিকাস্বরূপ; তাঁহার স্বকীয় ক্ষমতা, বীরত্ব ও সাহস বিন্দুমাত্রও ছিল না। জগৎপূজ্য পবিত্র শিশোদীয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি অতি ঘৃণিত ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নচেৎ কোন্ প্রাণে তিনি সেই নিরপরাধিনী অবলা কৃষ্ণকুমারীর প্রাণবধের অনুমতি প্রদান করিলেন? নচেৎ প্রজাবৃন্দের সুখদুঃখের বিষয় না ভাবিয়া মিবারের আনন্দরূপিণী দেবোপমা কৃষ্ণাকে বধ করিতে কেমন করিয়া অনুমোদন করিলেন? তিনি শিশোদীয় বংশের অযোগ্য নরপতি, বাপ্পার অযোগ্য বংশধর, রাজপুতবংশের এক প্রকার কুসন্তান। আহা! সেই অমরসুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর কথা স্মরণ হইলে আজিও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আহা! তাহার হতভাগিনী জননীর হৃদয়বিদারক রোদনের কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে ইচ্ছা হয়, তাঁহার পবিত্র কুমারীর জন্য রোদন করিয়া হৃদয়ের দুঃখভার লাঘব করি।

পরমাসুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ। যৌবনের সহিত সমস্ত সৌন্দর্য্যই তাঁহার স্বর্গীয় দেহকে অধিকার করিয়াছে। তিনি পিতৃ-অংশে যেমন উচ্চতম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মাতৃ-অংশেও সেইরূপ উচ্চতম কুলগৌরবে গৌরবিণী। যে প্রাচীন সৌর-রাজগণ বহুকাল ধরিয়া আনহলবারাপত্তনে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কৃষ্ণার মাতা সেই প্রাচীন ও পবিত্রবংশের দুহিতা। কৃষ্ণকুমারী যেমন উচ্চবংশে জন্মিয়াছিলেন, সেইরূপ উচ্চতর গুণগৌরবেও অলঙ্কৃতা ছিলেন। সেই

জন্য তিনি "রাজস্থানের কমলিনী" বলিয়া কীর্ত্তিত। ভারতের দুর্ভাগ্যবশে সেই দেব-ললনার অলোকসামান্য লাবণ্যরাশি দেখিয়া কেহ নয়ন সার্থক করিতে পারিল না; সেই কমলিনীর সুস্নিগ্ধ স্বর্গীয়সৌরভের আঘ্রাণ লইয়া কেহ নাসাপুটের সার্থকতা-সম্পাদনে সমর্থ হইল না, সৌন্দর্য্য-বিকাশের অঙ্কুর দৃষ্ট হইতে না হইতেই সেই অনাঘ্রাত বিমলবিকচ পদ্মিনী বৃন্তচ্যুত হইয়া অকালে অনন্তকালের গর্ভে অন্তর্হিত হইল। কৃষ্ণকুমারীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অভাগিনী কুমারী জগতে অতি বিরল। উচ্চতম রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেরূপ দুঃসহ যাতনা কয়জন ভোগ করিয়াছেন? মাতৃভূমির জন্য সেরূপ অসহনীয় যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া জগতে কয়জন রমণী আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন? কয়জন রমণী আততায়ী বিশ্বাসঘাতকের চক্রে পড়িয়া সেরূপ কঠোর-ভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছে? কৃষ্ণার অমূল্য জীবন বিফলে অন্তর্হিত হইয়াছে। রোমীয় রমণী বর্জ্জিনিয়াও নিরবলম্বন জনকের শাণিত ছুরিকামুখে আপনার হৃদয় পাতিয়া দিয়াছিলেন; গ্রীসীয় রমণী ইফিজিনিয়াও * যূপকাষ্ঠে স্বীয় অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল; কিন্তু ইঁহাদিগের মন্দভাগ্য আত্মীয়স্বজনগণ ইঁহাদিগের পবিত্রজীবনের বিনিময়ে অনেক প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে যদিও পবিত্রহৃদয়া সরলা আর্য্যকুমারী কৃষ্ণার সমতুল্যা কামিনী পাশ্চাত্য দেশে দৃষ্ট হয় না, তথাপি বিশেষ মিলাইয়া দেখিলে ইঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য, অনুপম গুণরাশি এবং কঠোর দুর্ভাগ্যের সহিত ইউরোপের উক্ত দুই কামিনীর কোন কোন অংশে তুলনা হইতে পারে। কৃষ্ণকুমারীর সেই শোচনীয় আত্মোৎসর্গের বিবরণ অবগত হইলে কোন্ পাষণ্ড অশ্রুসংবরণ করিতে পারে? কত কাল হইল, সেই নারীকুলমণি দেবোপমা ললনা সতী আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ রাখিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন, কবে তাঁহার পবিত্র জীবন অনন্ত কালসাগরের অন্তস্তরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি মিবারবাসিগণ আজিও তাঁহার সেই হৃদয়বিদারক মৃত্যুবিবরণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; তথাপি কাহারও হৃদয় কৃষ্ণার স্মৃতিকে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই; তাঁহার সেই শোচনীয় আত্মোৎসর্গ মিবারবাসিগণের হৃদয়ে যেরূপ দারুণ শোকশেল বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ অদ্যাপি তাঁহাদিগের ম্রিয়মাণ বদনমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হয়; আজিও কৃষ্ণার কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে তাঁহারা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অজস্র অশ্রুসেকে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করেন।

হতভাগ্য রাঠোর অপ-নৃপতি ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। শোণিতপিপাসু পাষণ্ড আমীর খাঁ তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইল। দুরাচার যে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিল, তাহাতে তাহার নামে যে কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইয়াছে, যতদিন জগতে ইতিবৃত্ত বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সে কলঙ্কের অপনয়ন হইবে না; ততদিন সে নিষ্ঠুর ও

* শ্রীমতী বার্জ্জিনিয়া রোমের প্রসিদ্ধ মহারথ লিউসিয়স বার্জ্জিনিয়সের কন্যা। এপিয়স ক্লডিয়স নামক এক দুষ্টমতি ব্যক্তি বার্জ্জিনিয়াকে তাঁহার জনক-জননীর সকাশ হইতে সবলে হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। লিউসিয়স স্বীয় প্রাণসমা কন্যার সতীত্ব ও সম্মানরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে প্রকাশ্য ফোরাম ক্ষেত্রে স্বকরে তাঁহাকে বধ করেন। খ্রীষ্টজন্মের ৪৪৯ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। ইফিজিনিয়া বিখ্যাত গ্রীসীয় মহাবীর এগেমেমনের কন্যা। আলিস নামক দ্বীপে গ্রীসের যুদ্ধপোতের গতি প্রতিরুদ্ধ হইলে ডিয়ানা দেবীর প্রসাদলাভ করিবার জন্য এগেমেমন আপন কন্যাকে তৎসমক্ষে বলি দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীসীয় পুরাণপাঠে জানা যায়, দেবী ডিয়ানা ইফিজিনিয়াকে বলি দিতে না দিয়া আপনি হরণ করিয়া লইয়া যান।

বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে। তাহার পাপনাম শ্রবণ করিয়াই লোকে ঘৃণা ও বিদ্বেষে আপন আপন কর্ণ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, চন্দাবৎগণের প্রধান সর্দ্দার অজিতসিংহ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; অজিত স্বভাবতঃ শান্ত, সুশীল ও শিষ্ট, তাঁহার বাহ্য আড়ম্বর কিছুই ছিল না; তিনি গুণীর গুণ বুঝিতেন, মানীর মান বুঝিতেন, মর্য্যাদা-শীলের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। উচ্চপদ-গৌরবলাভে তাঁহার একান্ত স্পৃহা ছিল; ধর্ম্মানুরাগও তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। ধর্ম্মভাব হৃদয়ে প্রবল থাকিলে স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, দুরাকাঙ্ক্ষা সে হৃদয়ে স্থান পায় না বটে; কিন্তু অজিতসিংহ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে দুরাকাঙ্ক্ষা শনৈঃ শনৈঃ প্রবর্দ্ধিত হইতেছিল, সেই ধর্ম্মভাব প্রবর্দ্ধমান দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিসাধনের পথে কোনরূপ বাধা বা প্রতিরোধ স্থাপন করে নাই; করিলেও সেই তেজস্বিনী দুরাকাঙ্ক্ষার সমক্ষে তাহা তিষ্ঠিতে পারে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। সেই বলবতী দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিসাধনোদ্দেশে অজিত সমস্ত জগৎসংসারকে সংহার করিতে পারিতেন। তবে ধর্ম্মভাব তাহার উন্মূলনসাধন করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইতে পারে? অজিতের ধর্ম্মভাব অতি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। পরের সর্ব্বনাশ করিতে যে ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক না হয়, তাহা কিরূপ ধর্ম্ম, মনুষ্যবুদ্ধির অধিগম্য নহে। অজিত দুরাচার আমীর খাঁকে পরম যত্ন ও আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া রাজকুমারীর বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত পাঠান স্পষ্টই বলিল, "রাজকন্যা হয় মানসিংহকে পতিত্বে বরণ করুন; নচেৎ ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে গেলেই রাণা মহাবিপদে পতিত হইবেন।" সমস্ত সংবাদই রাণা ভীমসিংহের নিকট পৌঁছিল। তাঁহার হৃদয়সাগর চিন্তার তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। প্রাণস্বরূপিণী কন্যার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মানসম্ভ্রম ও জীবনরক্ষা হইবে, তাহা তিনি কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, দুর্বৃত্ত আমীর খাঁর কথা রক্ষা না করিলে উদয়পুর ছারখার হইয়া যাইবে। এক দিকে স্বর্গীয় সুকুমার অপত্যস্নেহ তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুধাধারা সিঞ্চন করিতে লাগিল, অন্যদিকে আমীর খাঁর কঠোর অনুশাসন মিবাররক্ষার ভবিষ্যৎ চিত্র সম্মুখে ধারণ করিয়া সেই কোমল হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিতে লাগিল। যুগপৎ কোমল ও কঠোর দুইটি বৃত্তিদ্বারা আলোড়িত হওয়াতে রাণার হৃদয় পৈশাচিক যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সেই সুকুমার অপত্যস্নেহ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তরিত হইল; তাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠোর হইয়া দাঁড়াইল; মিবাররক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া স্নেহমমতা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি কৃষ্ণকুমারীকে আত্মোৎসর্গ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

আহা! লোকললামভূতা কৃষ্ণকুমারী স্বর্গের স্বর্ণপদ্মিনী। স্বর্ণনলিনী আজি নিত্য স্বর্গধামে গমন করিবেন; মিবারের রক্ষার জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিবেন; আত্মবলি দিয়া পিতাকে ঘোর-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবেন। কে তাঁহাকে উৎসর্গ করিবে? জগতে এমন পাষাণহৃদয় কে আছে, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এমন কোন্ রাক্ষস আছে যে, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া আপন হস্তে সেই সুকুমারীর শিরিষকোমল কুমারহৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিবে? কোন্ পাষণ্ড নির্ম্মম হইয়া শান্ত বিকচনলিনীকে নখাঘাতে ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করে? তবে উপায় কি? কে এমন নিষ্ঠুর হইয়া—কে এমন দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া জঘন্য পাপানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া চিরদিনের জন্য কলঙ্ক-কালিমায়

আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিবে? এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য রাণা অন্তঃপুর মধ্যে কতিপয় সর্দ্দার ও আত্মীয়স্বজনকে আহ্বান করিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে স্থির হইল, সেই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয়ের জন্য অগ্রে পুরুষকে নিযুক্ত করা হউক, যদি সে না পারে, তাহা হইলে কোন রমণীকে নিযুক্ত করা যাইবে। প্রাচ্যদেশীয় রাজগণের অন্তঃপুর এক একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের তুল্য। কারণ, তাহার সহিত বহির্জগতের প্রায় কোন সম্পর্কই দৃষ্ট হয় না এই অন্তঃপুরবাটিকার নিবিড় বিজন প্রদেশে কত কত হতভাগ্যের অদৃষ্টগ্রন্থি যে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য। প্রজাকুলের সুখ দুঃখের বীজ তন্মধ্যেই শনৈঃ শনৈঃ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। যাহাদিগের হস্তে সেই বীজের লালনভার সমর্পিত থাকে, তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা নেত্রগোচর করিতে পায় না, অন্য কেহ জানিতেও পারে না। আজি মিবারের দুর্ভাগ্য-বশতঃ রাণার সুপ্রশস্ত অন্তঃপুরের একপার্শ্ববর্ত্তী একটি নিভৃতকক্ষমধ্যে হতভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর অদৃষ্টলিখন লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয়ের জন্য প্রথমে পুরুষের প্রয়োজন। মহারাজ দৌলত সিংহ নামে শিশোদীয় বংশের এক জন সামন্ত সেই অন্তঃপুরমধ্যে উপস্থিত ছিলেন; তিনি রাণার অতি আত্মীয়; সকলের অনুমোদনে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই নৃশংস-কাণ্ডের অভিনেতা নির্ব্বাচিত হইলেন। সরলহৃদয়া কৃষ্ণকুমারীর হৃদয় শোণিতে উদয়পুরের সম্মান-রক্ষা করিবার জন্য তিনিই অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু সেই কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার হৃদয় যুগপৎ ভয়, বিস্ময় ও ঘৃণায় এক বিচিত্রভাব ধারণ করিল। তিনি চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যে রসনা এই নৃশংসকার্য্য অনুমোদন করিয়াছে, তাহাতে শত ধিক্! মহারাজ! আমি যে এই কথা বলিলাম, ইহাতে রাজভক্তির হ্রাস হইল, ইহা বিবেচনা করিবেন না। কিন্তু এরূপ পৈশাচিক অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তবে সেই রাজভক্তি অতল জলগর্ভে নিমজ্জিত হউক।" মহারাজ দৌলতসিংহ ছুরিকা গ্রহণ করিলেন না। তদ্দর্শনে মহারাজ যৌয়ানদাসের প্রতি সেই নিষ্ঠুরকার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। ভীমসিংহের স্বর্গীয় পিতার অন্যতমা উপ-পত্নীর গর্ভে যৌয়ানদাসের জন্ম। বেশ্যাগর্ভজাত বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহার হৃদয় স্বভাবতই পাষাণে গঠিত। সেই কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাহার সেই পাষাণ হৃদয় ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক, মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হইল না। সে সহাস্যমুখে সেই লোমহর্ষণ হৃদয়স্তম্ভন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যখন সেই সুরসুন্দরীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাহার নেত্রগোচর হইল, যখন সেই স্বভাবতঃ সরলতাময়ী সরলা ফুল্লারবিন্দবিনিন্দিত বদন ঈষৎ নত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন যৌয়ানদাসের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ শাণিত ছুরিকা তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। শোক, আত্মদ্রোহিতা প্রভৃতি যুগপৎ উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি সে গৃহ হইতে প্রস্থান করি-লেন। ক্রমে সেই পৈশাচিক কাণ্ডের কথা অন্তঃপুরের চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজ-মহিষীও এই নিদারুণ শোকের কথা শ্রবণ করিলেন। এই হৃদয়বিদারক দুরভিসন্ধির বিবরণ অবগত হইবামাত্র রাজ্ঞী নিদারুণ শোকে, দুঃখে ও নৈরাশ্যে একান্ত কাতর হইয়া "হায়! কি হইল" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরিচারিকাগণের শুশ্রূষায় তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু তিনি একেবারে শোকোন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই "হা কৃষ্ণা, হা কৃষ্ণা" প্রভৃতি হৃদয়বিদারক চীৎকার সহকারে আপনার প্রাণকুমারীকে হৃদয়ে লুক্কায়িত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সেই নৃশংস ঘাতকগণকে শতসহস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন

তাহাদিগকে কঠোরবাক্যে গালি দেন, কখন তাহাদিগের পদতলে পতিত হইয়া আপনার প্রাণনন্দিনীর প্রাণ ভিক্ষা চাহেন, আবার কখন বা প্রাণের কুমারীকে লইয়া সদম্ভে কক্ষান্তরে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাইবেন কোথায়?—কোথায় পরিত্রাণের আশ্রয় আছে? কৃষ্ণকুমারীর প্রাণরক্ষা হয়, এমন নিরাপদ্ স্থান কোথায়? মহারাণা ভীমসিংহ যখন আপন নন্দিনীর অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতে অনুমতি করিয়াছেন, তখন মহিষী কিরূপে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন?

কৃষ্ণকুমারীকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। জীবনধরূপিণী নন্দিনীর জীবনরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া মহিষী হতাশ হইয়া পড়িলেন। নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী চীৎকারে অন্তঃপুর প্রতি-নাদিত হইতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শিরে করাঘাত পূর্ব্বক অশ্রুনীরে বক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; আজি বিধাতার কঠোর লিপি অনুসারে অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর কাল পূর্ণ হইবে। আজি তাঁহাকে রক্ষা করে, এমন লোক সংসারে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহার স্বর্গীয় প্রাণবায়ু শাণিত ছুরিকার আঘাতে বহির্গত হইবে? তাহা বলিয়া কি সেই কোমলকমলিনী লৌহাস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হইবে?—কখনই না, কখনই না। যে লৌহাস্ত্রের আঘাতে দুর্ভেদ্য পাষাণও শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, আজি তাহা সুকোমল কুমারীহৃদয় বিদ্ধ করিতে পারিল না। সেই স্বর্গীয় জীবনদীপ নির্ব্বাণ করিবার জন্য বিষম কালকূটের আবশ্যক হইল। একটি রাজ অন্তঃপুরবাসিনী রমণী সেই গরল প্রস্তুত করিয়া রাণার নামে কৃষ্ণকুমারীর করে প্রদান করিল। সরলা কৃষ্ণা তৎক্ষণাৎ অকম্পিত-হস্তে সেই বিষপাত্র গ্রহণ করিলেন; তাঁহার মস্তকের একগাছি কেশমাত্রও কম্পিত হইল না; একটিও দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বহির্গত হইল না। জগৎপিতার নিকট পিতার দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া তিনি অবিকৃত হৃদয়ে সেই বিষম কালকূট পান করিলেন। এ দিকে মহিষী প্রকৃত উন্মাদিনীর ন্যায় রাণার প্রতি শত সহস্র অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন; নিদারুণ শোক, দুঃখ ও অভিমান আসিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সরলা সুকুমারী কৃষ্ণার আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নকমলে বিন্দুমাত্রও অশ্রুনীর দৃষ্ট হইল না। তিনি বসনাঞ্চলে মাতার অশ্রুনীর মোচন করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "জননি! কেন কাঁদিতেছ? কাঁদিবার ত কারণ দেখি না। অনিত্য মানবজীবন যন্ত্রণার আস্পদ, আজি আমি সেই কঠোর যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি, তবে তোমার শোকের কারণ কি? মা! মরণে ত আমার ভয় নাই, কি জন্যই বা ভয় করিব? তোমার গর্ভে ত আমার জন্ম! আমি ত সামান্য রমণীর উদরে জন্মগ্রহণ করি নাই। তোমার ন্যায় বীরপ্রসবিনীর গর্ভে জন্মিয়া আমি কি মৃত্যুকে ভয় করিব? মা! যখন আমি রাজপুতকুলের কুমারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ত একদিন অপঘাতমৃত্যুর করালহস্তে পতিত হইতেই হইবে।"* অভাগিনী রাজপুতকুমারী যে মুহূর্ত্তে জননীর জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। তবে যে এতদিনও জীবিত আছি, সে জন্য আমার পিতাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" প্রাণনাশক কালকূট আজি কৃষ্ণকুমারীর প্রাণবিনাশ করিতে পারিল না। ততখানি গরল পান করিয়াও তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট হইল না; সুতরাং আশু আর একপাত্র বিষ প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণা অম্লানবদনে তাহাও পান করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহাতেও কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। অবশেষে সহিষ্ণুতার চরমসীমা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবার জন্য তৃতীয়বার গরল প্রস্তুত

* রাজপুতগণের মধ্যে শিশুহত্যারূপ জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহারই আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

করা হইল। কোমলাঙ্গী মন্দভাগিনী পুনরায় তৃতীয়বারও অম্লানবদনে বিষপান করিলেন; মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল না, তাঁহার আকর্ণবিশ্রাম নয়নপ্রান্তে সামান্য অশ্রুবিন্দুও দৃষ্ট হইল না। সেবারেও প্রকৃতিসতী সেই নিষ্ঠুর পাষণ্ডগণের পৈশাচিক অভিপ্রায় সাধনের সহায়তা করিলেন না। তৃতীয়বারের উদ্যমও বিফল হইল দেখিয়া সকলের হৃদয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সকলেরই মনে ধারণা হইল যে, যে মোহিনী মায়া বীরবর বাপ্পার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আজি কৃষ্ণকুমারীর কোমলাঙ্গে তাহাই বুঝি সংক্রামিত হইয়াছে। অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। কেহই কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সেই শোণিতপিপাসু নারকীদ্বয় আমীর ও অজিত কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। যাবৎ তাহাদিগের পৈশাচিক উদ্দেশ্য সাধিত না হইল, যাবৎ তাহাদের পাশবী প্রবৃত্তির তৃপ্তিবিধান করিবার জন্য সরলা কুমারী অনন্তশয্যায় শয়ন না করিলেন, তাবৎ তাহাদের হৃদয় কিছুতেই শান্তিভোগ করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ তিনবার পরাজয়ের পর তাহাদের নিষ্ঠুরভাব যেন কঠোরতম হইয়া উঠিল। অবশেষে অহিফেন ও কুসুমরস একত্র করিয়া একপ্রকার অত্যুৎকট হলাহল প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণকুমারী বুঝিলেন, এই শেষবার। এইবার তাঁহার জীবন অনন্তকালের অনন্ত গর্ভে লুক্কায়িত হইবে। এইবার তাঁহাকে সংসারধাম হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইবে। তখন শান্তি ও ঈষৎ হাস্যবিকাশে তাঁহার বিম্বাধর অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। লোহিত গণ্ডস্থল ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি জগৎপিতার নিকট মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই বিকট হলাহল পান করিলেন। নিষ্ঠুর পাষণ্ড ও পিশাচগণের নিষ্ঠুর দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অচিরে স্বর্ণপ্রতিমার বিসর্জ্জন হইল। হতভাগ্য ভীমসিংহের সৌভাগ্য-নাট্যরঙ্গে শেষ যবনিকা পতিত হইল; কৃষ্ণকুমারী অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন! হায়! কৃষ্ণকুমারীর সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না, আর তিনি জাগরিত হইলেন না। অনন্তনিদ্রার আবেশভরে তাঁহার ভ্রমরবিনিন্দিত নয়নযুগল নিমীলিত হইল, আর তাহা উন্মীলিত হইল না। কৃষ্ণা আর সে শয্যা ত্যাগ করিলেন না। নারকীয় পৈশাচিক আচরণে উল্লাসময় যৌবনের প্রাক্কালেই তিনি এ পাপ জগৎসংসার পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজবারার বিকচনলিনী আজি অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া অনন্তকালসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল।

অভাগিনী কৃষ্ণকুমারী নাই! হায়! প্রাণনন্দিনীর শোকে মহিষী প্রকৃতই উন্মাদিনী। অভাগিনী জননী প্রাণপ্রতিমা দুহিতার শোকানলে দেহত্যাগ করিয়া এ যন্ত্রণাময় সংসারধাম হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। যে দিন সেই অমূল্য দুহিতৃরত্ন অঙ্কচ্যুত হইয়া পড়িল, সেই দিন তিনি জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা জলাঞ্জলি দিয়া সমস্ত সুখবিলাস পরিত্যাগ করিলেন এবং আহার-নিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়া নির্জ্জনকক্ষে কেবল শোকের সহিত তুমুলযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রায়োপবেশনে থাকিতে থাকিতে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই পাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণকুমারীর সহিত অনন্তসুখের ধামে মিলিত হইলেন।

কিংবদন্তী আছে, নিষ্ঠুর অজিতসিংহই এই অনর্থের মূলীভূত কারণ। সেই পাপাত্মা পাঠান আমীর খাঁকে ঐ পাশব প্রস্তাব করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। আমীর খাঁর হৃদয় পাষাণময় বটে, কিন্তু সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় পরিসমাপ্ত হইলে যখন সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল, তখন সে সেই স্বদেশদ্রোহী দুরাত্মা অজিতকে শত সহস্র ধিক্কার দিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "বিশ্বাসঘাতক! তুই কি রাজপুতের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছিস্? দূর হ! আমার

সম্মুখ হইতে এখনই চলিয়া যা! তোর মুখাবলোকন করিলেও পাপ হয়।” আমীরের নিকট বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড অজিত যেরূপ তিরস্কৃত হইল, আপনার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎ সর্দ্দার সংগ্রামসিংহের নিকট তাহাকে তদপেক্ষাও কঠোরতর তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছিল। সংগ্রাম যেরূপ বীর, সেইরূপ তেজস্বী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন; সত্যপথই তাঁহার কেবলমাত্র অবলম্বন ছিল; সুতরাং আপনার রাজার ভ্রূকুটিও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না; প্রচণ্ড শক্রর শাণিত তরবারির দিকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। সেই লোমহর্ষণ বীভৎসকাণ্ডের অভিনয়ের চারি দিন পরে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত শিষ্টাচারের সহিত আপনার আগমন-বৃত্তান্ত না জানাইয়াই দ্রুতগতি রাণার সম্মুখে আসিয়া অতি কঠোরস্বরে বলিতে লাগিলেন, “কাপুরুষ! পবিত্র শিশোদীয়বংশের পবিত্র মস্তকে কে ধূলিপ্রক্ষেপ করিল? যে শিশোদীয়বংশের পবিত্র শোণিত শতসহস্রবর্ষ ধরিয়া অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিল, আজি কোন্ পাষণ্ড তাহা দূষিত করিয়া দিল? সরলা কুমারীকে বিনা দোষে হত্যা করাতে আজি শিশোদীয়কুল যে ঘোরপাপে কলঙ্কিত হইল, সেই পাপের ফলেই এই বংশ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; আর কেহই ইহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। আজি মিবারের ইতিহাসে বীরবর বাপ্পার পবিত্র বংশে যে গভীর কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল, তাহা কেহই মোচন করিতে পারিবে না। হায়! এখন বুঝিলাম, বিধাতা ক্ষত্রিয়-কুল নির্ম্মূল করিবার জন্যই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, ক্ষত্রিয়ের অধঃপতন অদূরবর্ত্তী; বাপ্পারাওয়ের বংশও নিশ্চয় বিলুপ্ত হইল।” রাণা ভীমসিংহ নিরুত্তর। লজ্জা, ঘৃণা, শোক ও বিষাদভরে তিনি করপুটে আপনার বদন লুক্কায়িত করিয়া দীনভাবে অশ্রুনীরে বক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। অনুতাপাগ্নি তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিয়া পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে মৌনভঙ্গ করিয়া সংগ্রামসিংহ পাষণ্ড অজিতের দিকে মুখ ফিরাইয়া, বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন, “রে শিশোদীয়কুলের কলঙ্ক! তুই রাজপুতশোণিতের অযোগ্য। তুই যেমন আমাদিগকে কলঙ্ককালিমায় কলুষিত করিয়াছিস্, সেইরূপ তোর মস্তকে ধূলিরাশি নিপতিত হউক! যেন তোকে নিঃসন্তান হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। যেন তোর পাপনাম তোর পাপ জীবনের সহিত ইহলোক হইতে তিরোহিত হয়। এত শীঘ্র এরূপ সর্ব্বনাশকর কাণ্ডের অভিনয় কেন? পাঠান কি রাজধানী দলিত বা মথিত করিয়াছিল? তাহারা কি অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল? যদিও তাহা করিত, তাহা হইলে কি পিতৃপুরুষগণের ন্যায়, প্রকৃত রাজপুত-বীরের ন্যায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিতে না? এই প্রকার কার্য্য করিয়াই কি তোমার পিতৃপুরুষেরা যশোগৌরব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন? এই প্রকারেই কি আমাদিগের বংশ জগতে গৌরবান্বিত হইয়াছে? এই প্রকারেই কি পূর্ব্বতন পুরুষেরা নরপতিকুলের বিক্রম প্রতিরোধ করিতেন? তুমি চিতোরের শকের * কথা বিস্মৃত হইয়াছ? কিন্তু আমি কাহাকে সম্বোধন করিতেছি? —ইহারা কি রাজপুত? যদি তোমাদের অন্তঃপুরবাসিনীগণের সম্মানমর্য্যাদা বিপন্ন হইত, যদি তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া উন্মুক্ত তরবারিহস্তে শত্রুগণের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতে, তাহা হইলে বরং তোমাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত, তাহা হইলে বরং সর্ব্বশক্তিমান্ পরম-পিতা পরমেশ্বর বাপ্পার বংশকে অনন্তবিনাশ হইতে উদ্ধার করিতেন। হায়! জঘন্য কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়া এখনও বাঁচিতে সাধ আছে? ধিক্! আশঙ্কিত বিপদের আক্রমণকাল পর্য্যন্তও তুমি

* চিতোরধ্বংসকে রাজপুতগণ শক নামে অভিহিত করেন।

অপেক্ষা কর নাই। ভীরুতা ও কাপুরুষতাই তোমার উপযুক্ত; রাজপুতোচিত কোন গুণই তোমাতে দৃষ্ট হয় না। রাজপুত হইলে তুমি শ্রীজীব * শোণিতপাত করিবে কেন? যদি প্রতারণার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে ঘৃণা বোধ না করিতে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সামান্য বলি উৎসর্গ করিতে পারিতে। নিশ্চয় জানিও, রাজপুতকুলের অনন্তবিনাশ অদূরবর্ত্তী।"

পাষণ্ড অজিত নিরুত্তর। তেজস্বী সংগ্রামসিংহের কঠোর তিরস্কার শুনিয়া বিশ্বাসঘাতক অজিত উত্তর প্রদান করিতে সাহসী হইল না। সেই মহাতেজা সাহসী সংগ্রামসিংহ বহুদিন হইল ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মিবারের ভবিষ্য ভাগ্যগগনের দিকে চাহিয়া যে অমোঘবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কালে তাহা যথার্থ ফলবান্ হইয়াছিল। রাণা সর্ব্বসমেত পঞ্চনবতিটি পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন; একমাত্র কৃষ্ণার সোদরভ্রাতা ব্যতীত আর সকলেই মহাতেজা সংগ্রামসিংহের সেই ভবিষ্যবাণী ফলবতী করিবার জন্য ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণার অপর দুটি ভগিনীও জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যশল্মীর-রাজকুমার একটিকে এবং বিকানীরের রাজকুমার অপরটিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের গর্ভে যে কয়েকটি পুত্র জন্মিয়াছিল, ভারতের চিরন্তনী প্রথার অনুসারে তাহারা মাতামহের সিংহাসন অধিকার করিতে পারে নাই। রাণার সেই পঞ্চোনশত সন্তানের মধ্যে অবশিষ্ট পুত্রের নাম যুবনসিংহ। † সেই যুবনসিংহ রাণা ভীমসিংহের বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন, তিনি ভিন্ন রাণার দগ্ধহৃদয়মরুর শান্তিচ্ছায়াকুঞ্জ আর নাই। সেই যুবনসিংহের মুখ দেখিয়াই তিনি সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মনে ছিল, তিনি পুত্রবান্ হইয়া বিপুল গিহ্লোটবংশের নামরক্ষা করিবেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা এক গণ্ডূষ জল প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে যুবনসিংহ পুত্রসন্তানে বঞ্চিত হইলেন।

সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যবাণী ফলবতী হইল। মর্ম্মপীড়িত হইয়া তিনি স্বদেশদ্রোহী পাষণ্ড অজিতের প্রতি যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ফলবান্ হইয়াছিল। সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর এক মাস অতীত হইতে না হইতেই অজিতের জীবনতোষিণী ভার্য্যা এবং হৃদয়ের প্রীতিপ্রস্রবণ পুত্রদ্বয় কালের ক্রোড়ে শয়ন করিল। তাঁহার সাংসারিক সুখের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল; সুধানির্ঝরিণী শুষ্ক হইয়া দগ্ধমরুভূমিতে পরিণত হইল। নিরুপায় ও নিরবলম্বন হইয়া পাষণ্ড সংসারের প্রতি মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিল। হায়! পাশবী দুষ্প্রবৃত্তির ক্রীতদাস হইয়া অজিত আজি সংসারবিরাগী উদাসীন। আজি বার্দ্ধক্যের সঙ্কীর্ণসীমায় পদার্পণ করিয়া অজিত আত্মান্বেষণ ও আত্মপাপমোচনে উদ্যত হইল। যে কুটিলতাপূর্ণ কটাক্ষে অহর্নিশি কপটতা ও বঞ্চনা প্রচ্ছন্ন থাকিত, আজি তাহা সরলতা ও অমায়িকতায় পরিপূর্ণ হইল। যে পাপজিহ্বা অনুক্ষণ

* রাণার সম্ভ্রমসূচক উপনাম।

† "যুবনসিংহ বিসূচিকারোগে মৃতকল্প হইয়াছিলেন, উদয়পুরে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উক্তরোগে আক্রান্ত হন। যখন রাজকুমারের রোগ প্রবল হইয়া উঠে, সে সময়ে মহাত্মা টড তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহামতি টড বলেন, "কিয়ৎকাল নিদ্রার পর যুবনসিংহ জাগরিত হইয়া আনন্দোৎফুল্লনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। যুবনসিংহ সেই কঠোর রোগের হস্তে পরিত্রাণ পাইলে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীজী বেহতা সেই রোগে আক্রান্ত হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীজী বেহতা ষড়যন্ত্ররচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন, বাস্তবে গেলে তিনিই অবজির বিদ্যালয়ে শিক্ষিত।" মহাত্মা টড বলেন, "এ প্রকার চরিত্রের লোক মিবার হইতে দূর না হইলে রাজ্যের মঙ্গল নাই।"

পরগ্লানি, পরনিন্দা ও পরহিংসার পাপমন্ত্র জপ করিত, আজি তাহা সর্ব্বক্ষণ রামগুণগান করিতে লাগিল এবং যে হস্ত অসংখ্য পাপাভিসন্ধিসাধনে কলুষিত থাকিত, আজি তাহা কেবল পবিত্রজপমালা গণনা করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেই বা ফল কি? তাহার হৃদয় আজিও পবিত্রতার আস্পদ হইতে পারে নাই। যে হৃদয় একদিন হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধতম নরকস্বরূপ ছিল, আজি সেই হৃদয় নারকীভাব হইতে এখনও সম্যক্ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। অজিত আত্মপাপবিমোচনার্থে দেবতার মন্দিরে মন্দিরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল এবং দুঃসহ তপশ্চরণ করিয়া দীনদরিদ্র ও নিরন্ন ব্যক্তিগণকে ধনরত্ন দান করিতে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু সেই পাশবী দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয় পরিত্যাগ করিতে পারিল না। তেজস্বী সংগ্রামসিংহ বলিয়াছিলেন, "তোর মস্তকে ধূলিরাশি নিপতিত হউক।" সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সফল হইল। দুরাচার অজিত পাপমোহে অন্ধ হইয়া যে সমস্ত ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা হইতে সম্যক্ মুক্তিলাভ করা দুরূহ। বিনা দোষে সরলা সুকুমারী কৃষ্ণার প্রাণসংহার করাতে তাহার দেহে যে পাপকলঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে, সপ্তসাগরের সলিলরাশি ঢালিয়া দিলেও তাহা ধৌত হইবার সম্ভব নাই।

কিছুদিন অতীত হইল। অজিতের সহতীর্থ দুরাচার আমীর খাঁ ভারতের রাজন্যবর্গের সহিত মৈত্রী ও একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইল। সে যে সকল নিদারুণ পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, চরমজীবনে দান ধ্যান ও হিতচিকীর্ষা প্রভৃতি সদনুষ্ঠান থাকিলেও সেই অগাধ পাপরাশি মোচন করিতে সমর্থ হয় নাই। আমার দস্যুতস্করতা ও পরস্বলুণ্ঠনের সাহায্যে যেরূপ পাশবী স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার নাম লোকের ঘৃণা ও অভিসম্পাতের বিষয়ীভূত হইয়াছিল; তাহার উপর আবার বিশ্বাসঘাতকতা মিলিত হওয়াতে আমীর খাঁর অপবিত্র নাম অতি পাষণ্ড ও নররাক্ষসের আদর্শস্থল হইয়া রহিল। সেই বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে যে সৌভাগ্যের সমুচ্চশৃঙ্গে আরোহিত করিয়াছিল, তরবারির সাহায্যে সে স্বয়ং তদুপরি কদাচ উঠিতে সমর্থ হইত না। হায় হায়! এ বিশ্বসংসার স্বার্থপরায়ণতা ও বিশ্বাসঘাতকতারেই সাধনভূমি; নচেৎ পাপাচারী পাষণ্ড শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে কেন? কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলীভূত কারণ কে? কে তাহার সেই প্রজ্বলিত স্বার্থপরতানলে ইন্ধন প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সেই বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল? আমীর খাঁ ক্রূরমতি, স্বার্থপরায়ণ ও বিশ্বাসঘাতক সত্য, কিন্তু ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া যদি তাহাকে প্রলোভিত না করিতেন, তাহা হইলে আমীর খাঁ বোধ হয়, তাদৃশী বিশ্বাসঘাকতাচরণে অগ্রসর হইত না। আমীর খাঁ হোলকারের বিদেশীয় প্রসিদ্ধ সামন্তদলের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া সম্পত্তিভোগ করিতেছিল, কিন্তু ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট সুহৃদ্ভেদকরী নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দিয়া আপন অধিগত সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে আরও অতুল সম্পত্তি ও ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং তিনি হোলকারের অধীনে যে সকল জনপদ জায়গীরস্বরূপ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার স্বাধীনাধিকারে থাকিবে। আমীর খাঁ তাহাতে সম্মত হইল এবং ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড হেষ্টিংসের নিকট হইতে স্বীয় প্রভুর রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইল। তখন আমীর খাঁ শিরোঞ্জ, টঙ্করামপুর ও নিমবেহেরা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জনপদের অধিপতি হইয়া ব্রিটিশসিংহের আশ্রয়তরুমূলে নবাব আমীর খাঁ নামে এক জন সামন্তরাজরূপে অবস্থিতি করিল। পাঠক! সিংহ আমীর খাঁকে মহারাষ্ট্রীয় নৃপতির পক্ষ হইতে ঐরূপে পৃথক্ করিয়া ব্রিটিশসিংহ রাজপুতনার সমস্ত হৃদয়ে

শান্তিসলিল সেচন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভারতের পক্ষে একটি সুমঙ্গল ঘটনা সন্দেহ নাই।

স্বর্ণভূমি মিবার শোচনীয় দশায় অবসন্ন। পাষণ্ডগণের ভীষণ অত্যাচারে রাজবারার নন্দনকানন-সদৃশ মিবারভূমির যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু তাহাতেও মন্দভাগিনী মিবারভূমি অব্যাহতি পাইল না। কাপট্যের উপর কাপট্য, উৎপীড়নের উপর উৎপীড়ন এবং অত্যাচারের উপর অত্যাচারের প্রচণ্ড প্রপীড়নে মিবারের সর্ব্বাঙ্গে অগণিত ক্ষত সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার তাহাকে আরও একটি কঠোর আঘাত সহ্য করিতে হইল। মিবার অস্থিকঙ্কালসার হইয়াছিল, সে আঘাতে অস্থিপঞ্জরও চূর্ণ হইয়া গেল। হাস্যমুখী মিবারভূমি শোকোদ্দীপক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। অবশেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাণার সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক মিবারের সেই সন্তপ্তহৃদয়ে শান্তিসলিল সেচন করিলে মিবারভূমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তঋতু সমাগত। সুখময় বসন্তকালে ইংরাজদূত মিবাররূপ শ্মশানক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মিবারের শোচনীয় দুরবস্থার চিত্র তাঁহার নয়নমুকুরে ততই প্রতিফলিত হইতে লাগিল। যে মিবার একসময়ে রাজবারার নন্দনকানন বলিয়া প্রথিত ছিল, যাহার ক্ষেত্রসমূহে নানারূপ শস্যের নয়নস্নিগ্ধকর মনোহর দৃশ্য অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইত, যে মিবারের নগর, গ্রাম ও পল্লীসমূহের গৃহে গৃহে পবিত্র হাস্যজ্যোতি অহর্নিশি বিস্ফুরিত হইত, আজি তাহার চারিদিকে অগণিত ভগ্নস্তূপ ও ভস্মাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির মর্ম্মভেদী শোচনীয় বিষাদমূর্ত্তি নেত্রগোচর হইতে থাকে। কোন কোন স্থানে দুই চারিটি পল্লী একত্র স্তূপীকৃত ভস্মে পরিণত, কোন স্থানে এক একটি নগর জনশূন্য ;—গৃহ গৃহিশূন্য, বিপণি পণ্যবিক্রেতাশূন্য, ক্ষেত্র কৃষকশূন্য—শস্য-বিহীন। দুরাচার মহারাষ্ট্রীয়গণ যে স্থানে একবার প্রবেশ করিত, সে স্থানের দুর্দ্দশার সীমাপরিসীমা থাকিত না, তাহারা একদিনের মধ্যেই অতিশোভনীয় ক্ষেত্রও বিষাদময় মরুভূমে পরিণত করিয়া ফেলিত। পরের অনিষ্টসাধন, নগর-গ্রাম লুণ্ঠন ও সর্ব্বস্থান ছারখার করাই দুরাচার মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ কুলধর্ম্ম। তাহারা যেখানে একবার গমন করিয়াছে, সেইখানেই এই পাশবধর্ম্মের জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছে। অবশেষে বিধাতা সমস্ত পাষণ্ড নররাক্ষসকেই আপনাদিগের কঠোর পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নররাক্ষসেরা অবশেষে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছিল। অম্বজি মিবারের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি তৎসমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা হইতে মিবারের যে অসীম ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল তিনি আপনিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সিন্ধিয়া হইতে তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত হয়, তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করিয়া—তাঁহাকেই সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া তিনি গোয়ালিয়রে স্বীয় স্বাধীনতা স্থাপন করিলেন। এই কারণে সিন্ধিয়ার বিদ্বেষভাব ঘোরতররূপে উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। তিনি অম্বজিকে শাস্তিদান করিবার জন্য অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদা তাঁহাকে একটি সামান্য পটগৃহমধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা তাঁহার হস্তপদ, দগ্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। চক্ষের সমক্ষে সমস্ত ধনসম্পত্তি অপহৃত হয়, অর্থলিপ্সু অম্বজি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র বিলাতী ছুরিকা ছিল, মন্দভাগ্য মহারাষ্ট্রীয় তাহার সাহায্যে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। ইংরাজদূতের সহচর শল্যচিকিৎসক সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্ষতস্থানটি সীবন করিয়া দিলেন। অতঃপর অম্বজি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়া সিন্ধিয়ার অনুগ্রহলাভ করিলেন। আর একবার মিবারভূমি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন আর তাহা ভোগ করিতে হইল না। শোকে দুঃখে ও দারুণ মর্ম্মবেদনায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া মন্দভাগ্য অম্বজি একদিনের মধ্যেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি তাঁহার প্রাচীন বন্ধু জলিমসিংহ অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ১৮৫৮ সংবতের ভীষণ চক্রান্তের একটি আনন্দময় ফল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সতীদাস রাণার একতম মন্ত্রী। তিনি সত্তর হাজার টাকা দিয়া যশোবন্তরাও ভাওয়ের নিকট হইতে কমলমীর গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিপুল অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য সেই জনপদের মধ্য হইতে কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি নূতন নূতন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে লাগিলেন। দুরাচার আমীর খাঁ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আপনার মহাবিক্রমশালী সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে উপস্থিত হইল এবং রাণার নিকট একাদশ লক্ষ টাকা চাহিয়া ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল যে, যদি তিনি প্রার্থিত টাকা না প্রদান করেন, তাহা হইলে ভগবান্ একলিঙ্গদেবের মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিব। মিবারের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে রাণা তত টাকা পণ দিয়া কিরূপে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন? না দিলেও অব্যাহতি নাই। অনেক কষ্টে, অনেক বিনয় করিয়া রাণা নয় লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। পরন্তু তাহা সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠিল। এ দিকে পাষণ্ড আমীর খাঁ রাণার দূতদিগকে যৎপরোনাস্তি অপমান ও উৎপীড়ন করিতে লাগিল। সেই উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিতে গিয়া মন্ত্রী কিষণদাস আহত হইলেন।* অনন্তর পাষণ্ড পাঠান উদয়পুরের পর্ব্বতবর্ত্মনিচয়ের মধ্যে সবলে প্রবেশ করিল। এ দিকে তাহার জামাতা দুরাচার জামসিদ চিরাওয়া পর্ব্বতপথ দিয়া প্রবিষ্ট হইল; অন্যদিকে সে স্বয়ং দোবারিপথে স্বীয় বিজয়িনী সেনা চালিত করিল। তাহাদিগের প্রচণ্ডগতি-রোধে কেহই সমর্থ হইলেন না। দুর্জ্জয় পাঠানেরা নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাণা তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে একান্ত অপমানিত করিয়া তাহারা নাগরিকবৃন্দের প্রতি নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কত দুর্ভাগ্যের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, কত মনোহর অট্টালিকা ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, কত রাজপুত সম্মানমর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়া অতি হীনদশায় নিপতিত হইল। দুর্ব্বৃত্তগণের পৈশাচিক দৌরাত্ম্য দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তিই পুত্রকলত্রাদি লইয়া সুখে অসুখে অবস্থিতি করিতে পারিত না; তাহাদিগের অত্যাচারের ভয়ে কোন রমণীই অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিতে সমর্থা হইত না; কোন ব্যক্তিই ভদ্রোচিত বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সম্মুখ দিয়া যাইতে পারিত না। এমন কি, একটি সুদৃশ্য উষ্ণীষ বা অঙ্গরাখা দেখিলেই দুর্ব্বৃত্তগণ তাহা আচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইত। নররাক্ষস পাঠানদিগের সেই দারুণ অত্যাচারের নিদর্শন অদ্যাপি উদয়পুরের ভগ্নাবশেষ-রাশির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আজও প্রকৃতি সতী

* কিষণদাস সেই সময় সর্ব্বদা মহামতি টড সাহেবের নিকট অবস্থিতি করিতেন। রাণার সহিত টডের কথোপকথন-সময়ে কিষণদাসই দ্বিভাষীর কার্য্য করিতেন। যদিও চন্দাবৎগণের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র ছিল, তথাপি তিনি প্রভুভক্ত। টডসাহেব স্বচক্ষে তাঁহার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিষণদাসের মরণ দর্শনে তাঁহার ও ইংরাজ চিকিৎসকের মনে দারুণ সন্দেহ জন্মে। তাঁহাদের মনে এই প্রকার সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, কোন পাষণ্ড ব্যক্তি দুর্ভাগ্য কিষণদাসকে বিষপ্রয়োগে বধ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকেই কাতর হইয়াছিলেন।

সেই ভগ্নাবশেষরাশির মধ্য হইতে করুণ-কণ্ঠে দুরাচারগণের পাশব দৌরাত্ম্যের কাহিনী ঘোষণা করেন।

দুর্ভাগ্যবশে মিবারকে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল, তথাপি মিবার অব্যাহতি পাইল না। ইহাতেও দুর্ব্বৃত্তেরা মিবারভূমি পরিত্যাগ করিল না। স্বর্ণময়ী মিবারভূমি আজি শ্মশানে পরিণত হইল; নাগরিক ও জানপদবৃন্দ অর্থাভাবে ও পরপীড়নে মুমূর্ষুপ্রায়—রাজপুতের জাতি ও জীবন এক প্রকার বিনষ্ট। তথাপি রাক্ষসেরা সেই কঙ্কালমালিনী মিবারভূমির শোণিত শোষণ করিতে নিরস্ত হইল না। ১৮৬৭ সংবতে (১৮১১ খৃষ্টাব্দে) ক্রূরচরিত বাপু সিন্ধিয়া সুবাদার উপাধি ধারণপূর্ব্বক সদলে উদয়পুরের উপত্যকামধ্যে উপস্থিত হইল। এদিকে পাষণ্ড আমীর-খাঁর পাঠান সেনাদল রাজধানীর অপর পার্শ্বে প্রবেশপূর্ব্বক লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া মিবাররূপ শ্মশানভূমে বিকটপ্রেতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে আবার উভয়পক্ষের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ঘোরতর বিবাদ বাধিতে লাগিল। এই প্রকারে দুইটি পরস্পর-বিসংবাদী অরিদলের মধ্যভাগে পতিত হইয়া মিবারভূমি পদে পদে যে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে। দুর্ব্বৃত্ত পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের পৈশাচিক উৎপীড়ন এবং তাহাদিগের পরস্পর বিবাদজনিত অত্যাচার হইতে মিবারভূমিকে রক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণা পরিশেষে শোণিত-পিপাসু দস্যুগণের মধ্যে আপনার প্রাণাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি ভাগ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই বিষয় স্থির করিবার জন্য ধলমুগরা, (ধবলমেরু) নামক স্থানে একটি সভার * অধিষ্ঠান হইল; রাণার প্রতিনিধিস্বরূপে কয়েক ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত হইলে আশু সভার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত ও সাধিত হইল। পিশাচদ্বয়ের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। মিবারের ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে ভীষণ ক্ষতসংঘ সঞ্জাত হইল। আজি শ্মশান লইয়া প্রেত ও নররাক্ষসের আনন্দ;—শব লইয়া শৃগাল-কুক্কুরের মহোৎসব! মিবারের হীনতেজ অধিবাসিগণ আজি শবতুল্য। তাহাদিগের উত্তেজনা নাই, চেতনা নাই, সাহস নাই, উৎসাহও নাই। যে হৃদয়ে এক সময়ে শত্রুর সামান্য উৎপীড়নেও নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসার উদয় হইত, আজি তাহা নির্জ্জীব। পদাঘাতের উপর পদাঘাত এবং পীড়নের উপর প্রচণ্ড প্রপীড়নেও আজি তাহা অসাড় হইয়া রহিয়াছে। বিধাতা মিবারভূমির প্রতি একান্ত বাম সন্দেহ নাই, নচেৎ সুবর্ণ-প্রতিমা কৃষ্ণকুমারী বিনাদোষে বিসর্জ্জিত হইবেন কেন?—বাপ্পার বংশধর হইয়া ভীমসিংহই বা কাপুরুষ হইয়া পড়িবেন কেন? আজি মিবারের সে শ্রী বা সে শোভা নাই। যে শ্রীর ও যে শোভার প্রভাবে মিবারভূমি এক সময়ে রাজস্থানের নন্দনকানন-সদৃশ বলিয়া গণনীয় ছিল, আজি মিবারের সে শ্রী কোথায়? সে শোভাই বা কোথায়? অগস্ত আত্মোৎসর্গপ্রভাবে মিবারভূমি এক সময়ে সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, জগতের মধ্যে বীরপ্রসবিনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; সে সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক বীরকেশরী আজি অনন্তশয্যায় নিদ্রিত।—তাঁহারা আর কি জাগরিত হইবেন? আর কি তাঁহারা দেশবৈরী দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন? যে জন্মভূমির কিঞ্চিন্মাত্র অপমান হইলেও ক্রোধ ও জিঘাংসায় তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন, তাঁহাদের "স্বর্গাদপি গরীয়সী" সেই মাতৃভূমি আজি অবিশ্রান্ত শত্রুকর্ত্তৃক নিদারুণরূপে মথিত হইতেছে; ইহা দেখিয়া কি তাঁহারা আবার সেই শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিয়া বীরনামে জগৎ

---

* এই সভার সতীদাস, কিষণদাস, ও রূপরাম এই তিন জন উপস্থিত ছিলেন।

মাতাইয়া তুলিবেন? হায়! আজি কোথায় প্রতাপসিংহ! যিনি শত্রুকুলদুর্দ্দম, যবনদর্পহারী আর্য্যকুলের গৌরব-রবি বীরকেশরী বলিয়া পরিচিত, সেই প্রতাপসিংহ আজি কোথায়? হা প্রতাপ! পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিয়া, রাজপুত্র হইয়া তাপসের ন্যায় সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া যে মাতৃভূমিকে তুমি প্রচণ্ড যবনকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, আজি সেই জননীরূপিণী ভক্তিপাত্রী মিবারভূমি অনাথা, নিরাশ্রয়া, নিঃসহায়ার ন্যায় পিশাচকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতেছে। আজি তোমার পঞ্চবিংশতিবৎসরের সাধনার ফল বিপক্ষের চরণতলে দলিত হইতেছে; একবার আইস, একবার আসিয়া স্বচক্ষে তাহার দুর্দ্দশা দর্শন কর। একবার আসিয়া অলৌকিক আত্মত্যাগ ও কঠোর সন্ন্যাসব্রতের জলন্ত চিত্র এই নির্জ্জীব রাজপুতদিগের সমক্ষে ধারণ কর। তাহা হইলেই তাহারা আবার তোমার বীরত্বে, মহত্বে ও স্বদেশ-প্রেমিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে।

মিবারের আর বীরসন্তান নাই। বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি আজি শূন্য হইয়া রসাতলের অধস্তন কূপে নিমজ্জিত। স্বর্ণপুরী মিবারভূমি আজি শোচনীয় শ্মশানভূমে পরিণত! মিবারের আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই, মিবারের সে সাহস, সে সত্যতা, সে উৎসাহ, সে তেজস্বিতা ও সে বীর্য্যবত্তা নাই। মিবার আজি শূন্যময় মরুভূমি; মিবার আজি দগ্ধ চিতাভস্মময় মরুশ্মশান। ইহার সমস্ত ক্ষেত্র জনমানবপরিত্যক্ত,—নগর গ্রাম বিধ্বস্ত—গৃহবাস গৃহিশূন্য। ইহার অধিবাসিবৃন্দ পলায়িত; সামন্তবৃন্দ ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রভৃতি দুর্নীতিকলঙ্কে কলঙ্কিত;—রাজা ও রাজপরিবারবর্গ নিরুপায়, নিঃসহায় ও নিস্তেজ। মহারাজা বাপ্পার বীরবংশকে এই শোচনীয় অধঃপতন হইতে উদ্ধার করে, এমন মহাপুরুষ রাজবংশে একটিও নাই। আর কোন দেবোপম পুরুষ নাই যে, সঞ্জীবনমন্ত্রবলে মিবারের স্তূপাকৃত চিতাভস্ম হইতে নূতন নূতন বীরের উৎপাদন করিবে। স্বর্ণময়ী মিবারভূমি আজি চিতাভস্মময় দগ্ধমরুশ্মশানে পরিণত। এই শ্মশানক্ষেত্রের হৃদয়বিদারক বীভৎসভাব শতগুণে বৰ্দ্ধিত করিয়া নররাক্ষস পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়গণ দীনদরিদ্র মিবারবাসিগণের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলমুষ্টিও হরণ করিতে লাগিল, তাহাদিগের ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পর্য্যন্ত আছিন্ন করিয়া লইতে লাগিল। রাজস্থানের রাজমহিষী মিবারভূমি আজি পথের ভিখারিণী—হীনা—দীনা—পরমুখপ্রত্যাশিনী অভাগিনী। তথাপি দুরাচার * নিষ্ঠুর বাপু সিন্ধিয়া মিবারের অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি হরণপূর্ব্বক সর্দ্দার-সামন্ত, বণিক্ ও কৃষকগণকে বন্দীভাবে অজমীরে লইয়া গেল। সেই অজমীরের অন্ধকারময় কারাগারমধ্যে মিবারবাসিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় দিনপাত করিতে লাগিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাহারা প্রাণধারণ করিতে পারিল, তাহারা সন্ধিপত্র অনুসারে মুক্তিলাভ করিয়া অস্থিকঙ্কালসার দেহ লইয়া কারাগার হইতে বহির্গত হইল। মুক্তিপণ দিতে না পারিয়া অধিকাংশ ব্যক্তিই সেই অন্ধতম কারামধ্যে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল।

* যখন ইংরাজের সহিত রাণার সন্ধিবন্ধন হয়, তখন বাপু সিন্ধিয়া অজমীর হইতে বিতাড়িত হয়, তখন সে মিবারের অভ্যন্তর দিয়া আপনার ভবিষ্যৎ আবাসগৃহে প্রতিগমন করে, মিবারবাসীরা তাহার প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিল যে, গমনকালে অনেকে তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ এবং তাহার প্রতি নানারূপ গালি বর্ষণ করিয়াছিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

লুণ্ঠনপ্রথার দমন, রাজপুতরাজগণের সহিত ইংরাজের মৈত্রী, রাণা কর্ত্তৃক ইংরাজদূতের অভ্যর্থনা, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি, নির্ব্বাসিতদিগকে পুনরাহ্বান, ভীলবারা-স্থাপন, স্বত্বপত্রদৃঢ়ীকরণ, বেদনোর, ভেদেশর ও আমৈত, মিবারের ভূমি-ভুক্তিপ্রথা, পল্লী-বিধান, 'বাপোতা' ও 'ভূমিয়া' 'পেটেল'—তাহার উৎপত্তি ও অবস্থা, ভূমিস্বের নিয়ম-নির্দ্ধারণ এবং সাধারণ ফলাফল।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন দ্বিসহস্র বর্ষের মধ্যে ভারতের বক্ষে যে সকল ভীষণ ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই কীর্ত্তিত হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কনকসেনের রোপিত বংশতরুর উদ্ভব, পরিপুষ্টি; পরিশেষে তাহার অধঃপতন পর্য্যন্ত পরিবর্ণিত হইল। পারদ, ভীল, তুর্কি, তাতার ইত্যাদি কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মিবারবক্ষে পদাঘাত করিয়া এই প্রকাণ্ড বংশতরুকে সমূলে উন্মূলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে; কত প্রচণ্ড সংঘর্ষ-ঝটিকা ইহার শাখা-প্রশাখা ভগ্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে; কিন্তু মহারাজ শিলাদিত্যের বংশধর বীরগণের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অলৌকিক বীরবিক্রম এবং বিস্ময়কর স্বদেশানুরাগের প্রতিকূলে সে সমস্ত প্রয়াস ও সে সমস্ত উপক্রম সফল হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচণ্ড উৎপীড়নে ও ভীষণ ভীষণ নিগ্রহে মিবারের হৃদয়শোণিত অজস্রধারে প্রবাহিত হইয়াছে, বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি অনাথা, বীরশূন্যা ও নিঃসহায়া হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে স্বজাতিদ্রোহী দুর্জ্জন মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দ মিবারের সেই ক্ষতবিক্ষতদেহে গুরুতর আঘাত করিয়া মিবারকে দুরবস্থার অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত করিয়াছে। তাহাদিগের রাক্ষসসদৃশ উৎপীড়নে সমগ্র রাজবারা প্রদেশের যে কিরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। পাষাণহৃদয় মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানগণের অত্যাচাররূপ দুঃসহ অঙ্কুশতাড়ন সহ্য করিয়া রাজপুতবৃন্দ ক্রমে ক্রমে একান্ত অবসন্ন ও হতসংজ্ঞপ্রায় হইয়া পড়িতেছিলেন। ইত্যবসরে করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদের ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে শান্তিসলিল সেচনপূর্ব্বক মৃতকল্প রাজপুত-সমিতির হৃদয়ে নবীনবল প্রয়োগ করিলেন। দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানবীরেরা স্বদেশতাড়িত ও স্বশ্রেণীচ্যুত পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ প্রভৃতি দস্যুগণের সহায়তায় স্থানে স্থানে যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দস্যুসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তৎসমস্তের আনুকূল্যেই ভারতবর্ষের সমূহ অনর্থ সংসাধিত হয়। দগ্ধহৃদয়ে সুস্নিগ্ধ শান্তিসলিল সেচন করিতে সঙ্কল্প করিয়া উদারহৃদয় ইংরাজগণ সর্ব্বাগ্রে সেই প্রকাণ্ড দস্যুদিগকে প্রতিফল দিতে উদ্যত হইলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লর্ড হেষ্টিংসের দূরদর্শিতাগুণে পাষণ্ড দস্যুগণের সকল উদ্যম বিফল হইয়া গেল,—তাহাদিগের দলবল ইতস্ততঃ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই সকল পাষণ্ডের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া যে দিন ভারতবাসী বহুদিনের পর শান্তিসুখের আস্বাদন পাইল, সেই দিন এই সুদূরসপ্তসিন্ধুবদেশে শ্বেতদ্বীপবাসী বণিক্‌বেশী ব্রিটিশসিংহের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল

ইংরাজশাসনকর্ত্তা সুবিচক্ষণ হেষ্টিংস সুদক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শালী। তাঁহার কঠোর উদ্যমে ভারতের শান্তিনাশক পাষণ্ড দস্যুগণের বিষদন্ত ভগ্ন হইল; দুর্বৃত্তেরা অগত্যা চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু যাহাতে তাহারা পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজন্য-সমিতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও রাজনীতিসিদ্ধ বলিয়া স্থির হইল। তদনুসারে ইংরাজশাসনকর্ত্তা রাজপুত রাজন্যবৃন্দের নিকট মন্তব্যপত্র প্রেরণপূর্ব্বক সকলকে এক অভিন্ন একতা ও সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। একমাত্র জয়পুররাজ ব্যতীত অপরাপর রাজপুতই প্রফুল্লচিত্তে ইংরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দিল্লী সেই মহতী সাধনার উপযুক্ত স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। অল্পদিনের মধ্যেই দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দূতবৃন্দ দিল্লী নগরীতে সমাগত হইতে লাগিলেন, কতিপয় সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র রাজপুত-সমিতির ভাগ্যসূত্র ইংরাজের সহিত সংবদ্ধ হইল। সন্ধিপত্রে স্থির হইল যে, রাজপুতবৃন্দ ভিতরে ভিতরে রাজনৈতিকী স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের রাজস্বের কিয়দংশ পণস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। *

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত রাণা ভীমসিংহের যে সন্ধিপত্র সংবদ্ধ হইয়াছিল, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত হইল ;—

১ম। এই দুইটি রাজকুলের মধ্যে বংশপরম্পরানুক্রমে চিরদিনের জন্য মৈত্রী, সমবেদনা ও একতাসূত্র সংবদ্ধ হইবে, একজনের মিত্র ও শত্রু অপরের মিত্র ও শত্রুরূপে গণনীয় হইবে।

২য়। উদয়পুররাজকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট যত্নপর থাকিবেন।

৩য়। উদয়পুরের মহারাণা সর্ব্বদা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সহযোগিতা কার্য্য করিবেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন। অপরাপর নরপতি বা রাজকুলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবে না।

৪র্থ। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়া উদয়পুরের মহারাণা কোন রাজা বা রাজবংশের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবন্ধন করিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সহিত যেরূপ সুহৃৎ সমালাপ চলিয়া থাকে, তাহাই থাকিবে।

৫ম। উদয়পুরের মহারাণা কাহারও প্রতি কোন প্রকার উৎপীড়ন করিতে পারিবেন না; যদি হঠাৎ কাহারও সহিত তাঁহার কোনরূপ কলহ ঘটে, তাহা হইলে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের করে তাহার মীমাংসার ও বিচারভার অর্পিত হইবে।

৬ষ্ঠ। উদয়পুরের প্রকৃত প্রাদেশিক বিভাগ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে, তাহার একচতুর্থাংশ পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে করস্বরূপ প্রদত্ত হইবে। তাহার পর ছয় আনা হিসাবে রাণা চিরদিনের জন্য তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবেন। করদান সম্বন্ধে আর কোন ব্যক্তির সহিত রাণার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। যদি কেহ করের জন্য কোন প্রকার দাবীদাওয়া করে, গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর দানে প্রস্তুত রহিলেন।

৭ম। অধুনা মহারাণা জানাইতেছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি উদয়পুরের অধীন অনেকগুলি জনপদ অযথারূপে করগত করিয়া লইয়াছে এবং অধুনা তিনি সেই সমস্ত অপহৃত ভূসম্পত্তির পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণের অভাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অসমর্থ হইলেও উদয়পুররাজ্যের উন্নতিসাধনে কোন ত্রুটি করিবেন না এবং

বিদ্রোহী পাষণ্ড দস্যুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য, দেশীয় রাজন্যসমিতি ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র রাণা সন্ধিবন্ধনের যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, অন্য কোন নৃপতি সেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। সেই সন্ধিবন্ধনের পর হইতে রাণা যেরূপ শান্তিভোগ করিয়াছিলেন, অন্য কেহ সেরূপ শান্তি উপভোগ করেন নাই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী দিবসে রাণা সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তৎপরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসেই সেই নবসংবদ্ধ সন্ধিসূত্রলিখিত নিয়মগুলি রক্ষা করিবার জন্য একটি দূত নির্ব্বাচিত হইলেন। অচিরে সেই দূত উদয়পুরে রাণার সভায় আগমন করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধিয়ার সেনারা রাণার যে সকল ভূমিসম্পত্তি অযথা অধিকার করিয়াছিল, তাহার উদ্ধার এবং বৈপ্লবিক সর্দ্দার ও সামন্তগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশাল অনীকিনী সজ্জিত হইয়া আশু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। রায়পুর, রাজনগর প্রভৃতি যে সকল দুর্গ জনস্থানভূভাগে সংস্থিত ছিল, তৎসমস্তই সেই বিদ্রোহি-সর্দ্দারগণের অধিকৃত ছিল। কিন্তু অধুনা সেই সকল দুর্গ সহজে পুনরধিগত হইল। সেই সঙ্গে ভাগ্যশীল চতুরচূড়ামণি ইংরাজ একটি বিশাল দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন। কমলমীরে যে রাজকীয় সেনা রক্ষিত ছিল, তাহারা অনেকদিন হইতে বেতন পায় নাই, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রাপ্যবেতন পরিশোধ করিয়া সেই দুর্গ আপনাদের অধিগত করিয়া লইলেন।

জিহাজপুর কমলমীরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইংরাজদূত জিহাজপুর হইতে উদয়পুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ স্থান উদয়পুর হইতে প্রায় ৭০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই সুপ্রশস্ত প্রদেশের বিশাল দ্রাঘিমার মধ্যে কেবল দুইটিমাত্র নগর দূতের নেত্রপথে নিপতিত হইল। নগর দুটিতে অত্যল্পমাত্র লোকের বাস। তদ্ব্যতীত সেই বিশাল প্রদেশের সমস্তই নির্জ্জন, পরিত্যক্ত ও নীরব। লোকের গমনাগমন নাই, সুতরাং পথসকল অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এখন পথনির্দ্দেশ করা সুকঠিন। যে সকল রথ্যার উপর দিয়া লোকজন সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, আজি তাহা বাবলা, নল ও অন্যান্য বনজবৃক্ষ এবং তৃণগুল্মাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, তন্মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বন্যবরাহাদি হিংস্র জন্তুগণ পরম সুখে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, সেই নির্জ্জন প্রদেশের যে

প্রত্যেক বিষয়ের উপযুক্ত তথ্য অন্বেষণপূর্ব্বক যোগ্যতানুসারে সেই উদ্দেশ্য-সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মহারাণা এই প্রকার সমস্ত ভূসম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, তৎসমস্তের রাজস্ব হইতে ছয় আনা হিসাবে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিতে রাণা বাধ্য থাকিবেন।

৮ম। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনানুসারে উদয়পুরের রাজকীয় সেনা-সংযোজনা করিতে হইবে।

৯ম। উদয়পুরের মহারাণা স্বীয় রাজ্যমধ্যে একচ্ছত্রী অধিপতি থাকিবেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে ব্রিটিশ-প্রভুত্ব প্রচারিত হইবে না।

১০ম। দশ সূত্র সংবলিত এই সন্ধিপত্রখানি দিল্লীনগরীতে সংবদ্ধ এবং মেঃ চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ ও ঠাকুর অজিতসিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইল। অদ্য হইতে একমাসের মধ্যে মহামান্য মহানুভব গবর্ণর জেনারল এবং মহারাণা ভীমসিংহ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইবে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ত্রয়োদশ তারিখে দিল্লীনগরীতে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল।

দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদলের উৎপীড়নের জলন্ত চিত্র নেত্রপথে পতিত হইতে থাকে, সেই দিকেই ভগ্ন অট্টালিকার রাশি রাশি স্তূপ দর্শনে দর্শকের হৃদয় করুণরসে অভিষিক্ত হয়। অধিক কি, যে ভীলবারা পূর্ব্বে রাজবারার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যবন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, দশবর্ষ পূর্ব্বে যেখানে ছয় সহস্র গৃহীর একত্রবাস দৃষ্ট হইত, আজি তাহা শূন্য ও জনমানববর্জ্জিত। আজি সেই বিশালবাণিজ্যবন্দরে জনমানবের সমাগম নাই। অসংখ্য অসংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও হয়শকটাদির সমাগমে যাহার রথ্যাসকল পথিকগণের পক্ষে দুর্গম বলিয়া বোধ হইত, আজি সেখানে জীবজন্তুর নামমাত্রও শ্রুত হয় না। দূতরাজ দেখিলেন, কেবল একটিমাত্র কুক্কুর সেই পথপার্শ্বস্থিত ভগ্নমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া সভয়ে দ্রুতবেগে অন্যদিকে পলায়ন করিল।

বৃটিশদূত আসিতেছেন, রাণা পূর্ব্বেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ তিনি একজন রাজপুতদূতকে প্রেরণ করিলেন। প্রসিদ্ধ নাথদ্বারে সৈন্যকটক স্থাপন করিয়া ইংরাজগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজপুতদূত সগণে তথায় উপস্থিত হইয়া বৃটিশ-এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সন্ধিসূচক কথাবার্ত্তার পর তিনি উদয়পুরে এজেন্টকে গ্রহণোপযোগী আয়োজন করিবার জন্য প্রত্যাগত হইলেন। এই অবসরে কমলমীর দুর্গ ইংরাজ-এজেন্টের করগত হইল। এ দিকে রাণার পুত্র যুবনসিংহ কতকগুলি সামন্ত, সেনানী, সৈন্য ও অনুচরের সহিত যথাযোগ্য রাজবেশে সুসজ্জিত হইয়া ব্রিটিশ-এজেন্টের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। নগরের একক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি বিস্তৃত সুপরিচ্ছন্ন তালবনের মধ্যে একটি রমণীয় সভা সজ্জিত হইল। যুবনসিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এজেন্টকে গ্রহণ করিলেন। রাজপুত্রের শিষ্টাচার ও চিত্তরঞ্জন মোহনীয় মূর্ত্তিদর্শনে ব্রিটিশ এজেন্টের হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। এক সময়ে তিনি জাঁহাগীরের ন্যায় বলিয়াছিলেন, "তিনি যে উচ্চবংশে জন্মিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ তদীয় বদনপদ্মে প্রতিভাত হইতেছিল।"

যুবনসিংহ শিষ্টাচারের সহিত এজেন্টকে লইয়া উদয়পুরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। উদয়পুর নিকটবর্ত্তী। সূর্য্যতোরণদ্বার দিয়া যুবনসিংহ এজেন্টের সহিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকবৃন্দ রথ্যার উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া "জয়! জয়! ফিরিঙ্গিকা জয়!" বলিয়া সমুচ্চরবে ইংরাজের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। বাবদূক ও বন্দিগণ নানাছন্দের স্তোত্র রচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কতকগুলি রাজপুত-মহিলা আপন আপন শিরোদেশে পূর্ণকুম্ভ ধারণপূর্ব্বক আগমনী গীত গান করিয়া ইংরাজ-এজেন্টকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। আনন্দধ্বনিতে নগরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে সানন্দে প্রাসাদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাসাদের প্রথমদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র এজেন্ট সাহেব দেখিলেন, কতকগুলি সৈন্ধবী-সেনা সেই দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলে এজেন্ট সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। স্তুতিপাঠকেরা আগমনীগীতগানে প্রবৃত্ত হইল এবং সভাপাল পৃথিবীপতিকে উচ্চকণ্ঠে নিবেদন করিল যে, ইংরাজ এজেন্ট সভাস্থলে আগমন করিতেছেন। রাণা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক সম্মুখে কতিপয় পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সর্দ্দার, সামন্ত ও সভাসদ্‌বর্গেরা দণ্ডায়মান হইলেন। এজেন্টকে সসম্মানে গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ছিল। রাজসিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী যে আসনে পেশোবা উপবেশন করিতেন, আজি ইংরাজ-এজেন্ট সেই আসন অলঙ্কৃত করিলেন। মিবারের সর্দ্দারেরা স্ব স্ব পদানুসারে যথানিয়মে রাণার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ইঁহাদিগের ঠিক নিম্নে

রাজকুমার অমর ও যুবনসিংহ আসনগ্রহণ করিলেন এবং নিম্নপদস্থ সর্দারেরা তাঁহাদিগের পশ্চাতে উপবিষ্ট হইলেন। রাণার দেওয়ান ও অমাত্যগণ তাঁহার সম্মুখে সমাসীন হইলেন। ভাণ্ডারী, তাম্বূল-ধারী, বেশরক্ষক এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও নিম্নশ্রেণীস্থ সর্দারেরা একশ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিস্তৃত গালিচার অন্তঃসীমায় দণ্ডায়মান রহিল। রাণা অতি সরলতাপূর্ণ ভাবগর্ভবাক্যে স্বীয় মনোগত অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিলেন, "ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট আমাকে এই মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া যে মহোপকার করিয়াছেন, আমি জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমি চিরদিন যন্ত্রণাময় দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছিলাম, আজি আমার মস্তক হইতে যেন সে ভার অপসারিত হইল। এ যাবৎ একদিনের জন্যও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি নাই, অদ্য সুখে নিদ্রা যাইতে পারিব।"

যথাসময়ে সভাভঙ্গ হইল। রাণা একটি সুসজ্জিত হস্তী, একটি অশ্ব, একছড়া মহামূল্য মুক্তাহার, একখানি শাল ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য এজেণ্টকে প্রদান করিলেন। ব্রিটিশ-এজেণ্ট তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। ইহার ক্ষণকাল পরেই রাণা স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র এবং কতিপয় নির্ব্বাচিত সর্দ্দার সমভিব্যাহারে ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বিশ্রামভবনে উপস্থিত হইলেন। এজেণ্ট সাহেব কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বিহিত সম্মানসম্ভ্রম সহকারে রাণাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। অর্দ্ধঘণ্টা উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। ব্রিটিশ এজেণ্ট রাণা, তাঁহার পুত্রদ্বয় ও সর্দ্দারগণকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিলে রাণা সগণে বিদায়গ্রহণ করিলেন। পরস্পরের সাক্ষাৎ সমালাপের পর কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল। রাণা মিবাররাজ্যের সংস্কারসাধনে এবং আত্মক্ষমতার পরিস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন।

রাণা যেরূপ সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদার অধিকারী, তাঁহার চরিত্র কিন্তু সেরূপ উপযুক্ত ছিল না। রাজ্যশাসনোপযোগী অনেক গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন সেই সকল গুণ একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল। বৃথা চাকচিক্য ও জাঁকজমক, সামান্য আমোদ-প্রমোদ এবং অনিয়ন্ত্রিত উদারতা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। যে সময় এই সকল প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিত এবং যাবৎ তিনি সেই সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ না হইতেন, তাবৎ তাঁহার মন রাজকার্য্যের প্রতি অভিনিবিষ্ট হইত না; তাবৎ তিনি স্বীয় ন্যায্য প্রভুত্ব পরিস্থাপন ও রাজ্যের সংস্কারসাধনের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। রাণা অব্যবস্থিত-চিত্ত নরপতি ছিলেন। তিনি চিরজীবন অশান্তির কণ্টকশয্যায় পালিত; সুতরাং একমাত্র শান্তিই যে তাঁহার একান্ত অভিলষিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বহুকালব্যাপিনী অশান্তির কঠোর অঙ্কুশতাড়নের পর যখন তিনি প্রথম শান্তির সুখপ্রদ অঙ্কে স্থান প্রাপ্ত হইলেন, যখন জীবনের সর্ব্বাগ্রে বিরামদায়িনী নিদ্রার প্রাণতোষিণী আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি রাজকার্য্যের অশান্তিময় পথে বিচরণ করিয়া সেই শান্তিসম্ভোগের একমাত্র সুযোগ উপেক্ষা করিতে কিছুতেই ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার তুল্য মন্ত্রণাদক্ষ রাজা সে সময়ে রাজস্থানে আর দ্বিতীয় ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কচিৎ আত্মসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতেন। তাঁহার মন্ত্রভবনে কেবল কিষণদাস নামে একটিমাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। কিষণদাস বহুদিন ধরিয়া রাণার দূতপদে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের গুণে মিবার ও মিবাররাজের অনেক উপকার হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যেই রাজনীতিকুশল উদ্যমশীল মহাপুরুষ কিষণদাস অকালে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

যাহাতে মিবাররাজ্যের সংস্কারসাধন হয়, ব্রিটিশ-এজেণ্ট সর্ব্বপ্রথমে তদ্বিষয়েই উদ্যোগী হইলেন। তিনি মিবারের বৈপ্লবিক সর্দ্দার ও সামন্তগণকে রাণার প্রভুত্বস্বীকারে বাধ্য করিতে উদ্যম করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদিগকে রাজসভায় আনয়ন করিতে পারিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যে সমস্ত সর্দ্দারকে নির্দ্দেশ করিয়া এরূপ বলা হইল, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই রাজসভায় উপস্থিত হইত না; এমন কি, অনেকে রাজসভা কিরূপ, জীবনে তাহা চক্ষেও দেখে নাই। যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতেই সময়ে সময়ে উপস্থিত হইত; যাবৎ স্বার্থসিদ্ধি না হইত তাবৎ সভায় থাকিত, তাহার পর একেবারেই অদৃশ্য হইত; প্রস্থানের সময় রাণার মুখের দিকে একেবার দৃষ্টিপাতও করিত না। সুতরাং সেই সকল বিদ্রোহী সর্দ্দারকে শাসন করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। কিন্তু মিবারবাসীরা দেখিল যে, কতিপয় সপ্তাহের মধ্যেই দেশের যাবতীয় সর্দ্দার ও সামন্তগণ রাণার সভাতলে উপস্থিত হইলেন। মিবাররাজ্যে এ প্রকার মনোহর দৃশ্য অর্দ্ধশতাব্দী নেত্রগোচর হয় নাই। আজি বহুদিনের পর শিশোদীয়বংশের রাজসভাকে সৈন্যসামন্তে সমাকীর্ণ দর্শনে নাগরিক ও জানপদ বিচ্ছিন্নভাবে দিনপাত করিতেছিল, আজি যে তাহারা কোন্ দৈবশক্তির বলে পুনরায় একত্র সমবেত হইল, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই হৃদয় একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। কোন সর্দ্দারই রাজসভায় উপস্থিত হইতে অসম্মত হইল না। এমন কি, যে বৈপ্লবিক দুর্জ্জয় হামির কিছু দিন পূর্ব্বে হার-মহিষীর বিবাহপণ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং যে সঙ্গাবৎ সর্দ্দার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমি নারীজাতির কাছে মস্তক অবনত করিতে পারিব, তথাপি রাণার নিকট পারিব না,' তাঁহারা উভয়েই ভাদেশর ও দেবগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ-আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রাণার সভায় আগমন করিলেন। এই প্রকারে কতিপয় সপ্তাহের মধ্যেই মিবারের সমস্ত সামন্তই রাজধানীতে আসিয়া একত্র হইলেন। আজি সকলেরই বদনকমল আশা, আনন্দ ও উৎসাহে প্রফুল্ল; সকলেরই মুখে আনন্দের হাস্য সুশোভিত। স্বদেশের দুর্দ্দশা দর্শন ও আপনাদিগের দুর্ব্যবহারের বিষয় অনুধাবন করিয়া সকলেই মনে মনে একান্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলেন; কিন্তু সেই অপ্রতিভ ও লজ্জিতভাবজনিত হৃদয়ে যে কিঞ্চিৎ বিষাদের ছায়া পড়িল, আনন্দের উচ্ছ্বাসে পরক্ষণেই তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মিবারের সর্দ্দারগণ সমবেত হইলেন। এদিকে আবার একটি গুরুতর কার্য্যসাধনের প্রয়োজন হইল। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রগণের পৈশাচিক অত্যাচারে যে সকল নাগরিক ও জানপদবর্গ মাতৃভূমি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার মিবারভূমে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া রাণা তদুপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করা সহজ নহে; কারণ, সঙ্কটসময়ে যাঁহারা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সেই সকল বিবাসিত মিবারবাসিগণ নানারূপ বাধ্যবাধকতা ও সম্বন্ধসূত্রে সংবদ্ধ হইয়াছে। সেই বাধ্যবাধকতা ও সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা সামান্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যে স্থানে মিবারের একটিমাত্র অধিবাসীও বাস করিতেছিল, সেইখানেই তাহার নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা হইল। সেই ঘোষণাপত্র প্রাপ্তমাত্র সে ব্যক্তি রাণাকে প্রীতিকর আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। সেই সমস্ত আশ্বাসবাণীর অভ্যন্তরে যে সকল গভীর ও হৃদয়োত্তেজক ভাব নিহিত ছিল, তাহা বিদিত হইলে স্বদেশদ্রোহী অতি পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং যাহাদিগের মনে মনে এরূপ সংস্কার আছে যে, রাজপুতবৃন্দ স্বদেশ-প্রেমিক নহেন, তাহাদেরও

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, স্বদেশপ্রেমিকতায় আর্য্যসন্তান চিরদিন অভ্যস্ত। ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন মিবারবাসী অজ্ঞাতবাসে দিনপাত করিতেছিল, সেই ঘোষণাপত্র পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আনন্দোৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, 'শত্রুর উৎপীড়ন কিংবা স্বদেশদ্রোহী পাষণ্ডগণের উৎপীড়ন গ্রাহ্য করিব না; কেহই কিছুতেই আমাদিগকে আমাদিগের বাপোতা * হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না।' যদিও সে সময় অতীত হইয়াছে, যদিও রাজপুতগণের সে বীরত্ব, সে মহত্ব, সে তেজ, সে উৎসাহ এবং সে গৌরবগরিমা কালসাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, তথাপি জন্মভূমির প্রতি মিবারের কৃষকগণের যে অচলা ভক্তি ছিল, তাহার দশাংশের একাংশও লেখনী দ্বারা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। যাহারা দারিদ্র্যের বিশালচক্রে কখনও নিষ্পেষিত হয় নাই, তাহাদিগের পক্ষে এ সমস্ত বিবরণ একপ্রকার উপন্যাস বলিয়া বোধ হইবে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি এই প্রপীড়িত আর্য্যসন্তানদিগের মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, দুরাচার মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর পৈশাচিক অত্যাচারে রাজস্থানের এক এক প্রদেশ একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে; কতদিন কত নগর ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কত প্রশান্তজীবন কৃষকের শস্যক্ষেত্র মথিত ও মহারাষ্ট্রীয়দস্যুর অশ্বসমূহের কঠোর দশনে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কত গৃহীর গৃহজাত দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠিত হইয়াছে, ভারে ভারে রাশি রাশি লুণ্ঠিত দ্রব্য দস্যুশিবিরে নীত হইয়াছে এবং নাগরিক ও জানপদবৃন্দ নিরীহ মেষপালের ন্যায় ধৃত ও বন্দী হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছে;—তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারিবেন যে, বহুদিনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া মিবারবাসিগণ কিরূপ আনন্দবোধ করিয়াছিল। যে দিন তাহাদিগের বন্ধনমোচন হইল, যে দিন তাহারা বহুদিনব্যাপী অরণ্যবাসক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিদেশ হইতে আসিয়া স্বদেশের ক্রোড়ে আশ্রয়গ্রহণ করিল, যে দিন মাতৃভূমির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাগত হইয়া পিতা পুত্রে, ভ্রাতা-ভগিনীতে, বন্ধুবান্ধবে বহুদিনের পর মিলিত হইল, যে দিন পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দনীরে অভিষিক্ত করিতে লাগিল;—শান্তির সুস্নিগ্ধ স্থান, সংসার মরুভূমির সুশীতল ছায়াকুঞ্জ, হৃদয়ের আশাতৃষ্ণার কেন্দ্রস্থল যে আবাসগৃহ হইতে এতকাল নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, যে শুভদিনে আবার সকলে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন তাহাদের হৃদয়-মন্দিরে যে আনন্দের শান্তমূর্ত্তি প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সে প্রতিমা তাহারা জীবনে হৃদয় হইতে অপসারিত করে নাই। শ্রাবণমাসের তৃতীয় দিবসে এই সুখময়ী ঘটনা সংঘটিত হয়। সেই দিন মিবারের একটি সুখময় দিন,—শিশোদীয়বংশের আনন্দের একটি মহাযোগ। সেই দিন মিবারের ছিন্নভিন্ন অত্যাচারপীড়িত প্রজাগণ বহুদিনের পর সমবেত হইয়া শান্তিসুধা পান করিয়াছিল। সেই দিন প্রায় তিনশত লোক স্ব স্ব শকট ও কর্ষণোপযোগী যন্ত্রাদি লইয়া উন্নতপতাকাকরে নৃত্যগীত করিতে করিতে কূপাসনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অতঃপর সকলে বহুদিনের পরিত্যক্ত গৃহসমূহে পুনঃ প্রবেশ করিয়া আবাসভবন পরিষ্কার করিল এবং পূর্ব্ববৎ আপনাপন দ্বারচূড়ে ভগবান্ গণেশের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক আনন্দে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সেই দিন এবং ব্রিটনের সহিত সন্ধিস্থাপনের আটমাসমধ্যেই মিবারের তিনশত নগর ও গ্রাম একবারে লোকজনে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। সকলেই পিতৃপুরুষদিগের আবাসভূমিতে প্রত্যাগমন

---

* রাজপুতগণের পিতৃপিতামহগণের আবাসভূমি বাপোতা নামে অভিহিত।

পূর্ব্বক দুই হাত তুলিয়া ব্রিটিশকেশরীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। যে সমস্ত শস্যক্ষেত্রে বহুদিন পর্য্যন্ত হলস্পর্শ হয় নাই, আবার সেই সমস্ত অনন্তরত্নের আকর মিবারের শস্যক্ষেত্র বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক অনন্ত শস্যরাশি উৎপাদন করিতে লাগিল। যাহারা কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, বুঝি কোন দৈবশক্তির বলে মিবারের ভাগ্যতরঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইল। নচেৎ যে সমস্ত আবাসগৃহ শৃগাল-কুক্কুরের আশ্রয়কুহরে পরিণত হইয়াছিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই সকল আবার পরিষ্কৃত ও অধ্যুষিত হইল কেন? যে সকল শস্যভূমি আরণ্য তৃণগুল্মাদি কণ্টকীবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যেখানে হিংস্র শ্বাপদকুল আশ্রয়গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছিল, কোন্ দৈবশক্তির প্রভাবে যে সে সকল ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়া আবার স্বর্ণফল প্রসব করিতে লাগিল, কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। যাহা হউক, ইহা ব্রিটিশসিংহের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে, তাঁহার অসীম উদ্যোগ ও করুণায় নিপীড়িত, নিগৃহীত ও নির্ব্বাসিত রাজপুতবৃন্দ গভীর ধ্বংসকূপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুনর্ব্বার শ্রীবৃদ্ধির উন্নতসোপানে আরোহণ করিলেন। যতদিন জগতে রাজপুতনাম বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন সভ্যতা, গৌরব ও স্বাধীনতার আদিভূমি এই ভারতবর্ষের গৌরব ও অধঃপতন-কীর্ত্তন করিবার জন্য একজনমাত্র ঐতিহাসিক জীবিত থাকিবেন, ততদিন ব্রিটিশকেশরীর এই মহত্ত্ব ও এই গৌরবকীর্ত্তি কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। কিন্তু হঠাৎ একটি যন্ত্রণাময়ী চিন্তা হৃদয়ে সমুত্থিত হইলে চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বলিয়া বোধ হয়; ভয়ে অন্তর শিহরিত হইয়া উঠে। যে ব্রিটন করুণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজহস্তে ভারতসন্তানগণকে ধ্বংসের অন্ধকূপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, আবার কি তিনিই স্বহস্তে তাহাদিগকে ধ্বংসকূপে পুনঃপাতিত করিবেন?—এ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয় কেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে; প্রথমে জলসেকে বর্দ্ধিত করিয়া বর্দ্ধমান বিষবৃক্ষকে ছেদন করিতেও বিচক্ষণ বুদ্ধিমানেরা ইচ্ছা প্রকাশ করেন না।

এখন কিরূপে মিবারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আশু তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল উপায় অবলম্বিত হইল, তাহা ততদূর ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; তদ্দ্বারা কখনও প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নাগরিক ও জানপদবৃন্দ দূরপ্রবাস-ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের এমন সংস্থান ছিল না যে, তাহার সাহায্যে তাহারা দেশে শিল্প বা বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। যে সকল বিদেশীয় বণিক্, পণ্যবিক্রেতা ও শ্রেষ্ঠিগণ মিবারে বাস করিতেছিল, মহারাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের সময়েই তাহারা তদ্দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিয়াছিল; মিবার যাহাদের জন্মভূমি, যাহারা সে প্রচণ্ড প্রপীড়ন সহ্য করিয়াও জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহারা অপরাপর মিবারবাসীর ন্যায় দারিদ্র্যের পীড়নে প্রপীড়িত হইয়াছিল। এ দিকে রাজকোষ শূন্য—প্রজাবৃন্দ নিঃস্ব ও দরিদ্র। যাহারা তত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও বক্ষ পাতিয়া আপনাদিগের সঞ্চিত অর্থরাশি রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, রাণা তাহাদিগের নিকট টাকা গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহারা শতকরা ছত্রিশ টাকা হারে সুদ প্রার্থনা করিতে লাগিল। অগত্যা রাণাকে তাহাতেই স্বীকৃত হইতে হইল। সুতরাং রাণা দিন দিন দুর্ভর ঋণদায়ে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে এই মহা-ঋণসঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভ হইবে, তাহার উপায় না দেখিয়া রাণা বিদেশীয় বণিক্ ও শ্রেষ্ঠীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মিবারের দুর্দ্দশাবশতঃ মিবাররাজের প্রতি পাছে কোন অপরিচিত বণিকের অনাস্থা বা অবিশ্বাস জন্মে, এই আশঙ্কা করিয়া ব্রিটিশ-এজেণ্ট ভারতের প্রধান

প্রধান নগরের বণিক্‌গণের নিকট রাণার ও আপনার এক একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এজেণ্ট মহোদয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই সংঘটিত হইল। ভারতবাসী বণিক্‌বৃন্দ মিবারের সমস্ত নগরেই শাখা-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিল, কিন্তু কোন স্থানেই একটি মূল কার্য্যালয় স্থাপন করিতে সাহসী হইল না। সেই সকল শাখাকার্য্যালয়ে তাহাদের এক একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্রবিবেচনায় স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিল। যে সমস্ত দুর্নিয়ম হইতে বহির্বাণিজ্যের দ্রব্যাদিবহনের জন্য শুল্ক সংগ্রহ করিবার অভিলাষে দেশের স্থানে স্থানে যে বহু ব্যয়সাপেক্ষ নানারূপ কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অনুরূপ সুচারু বন্দোবস্ত হইল। মিবারভূমি ধীরে ধীরে পুনরায় উন্নতিসোপানে আরূঢ়া হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহারাষ্ট্র দস্যুরা মিবারের অন্তর্গত ভীলবারা নগরটি একেবারে উৎসাদিত করিয়াছিল। এমন কি, দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ প্রসিদ্ধ বাণিজ্যবন্দরটি শ্বাপদকুলের আশ্রয়কুহর হইয়া গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। তথায় প্রায়ই জনমানবের সমাগম দৃষ্ট হইত না। ব্রিটিশ-এজেণ্টের সুচারু বন্দোবস্তে ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে সেই নগরটি মস্তকোত্তোলন করিয়া আবার সমুজ্জ্বলকান্তি ধারণ করিল। সেই স্তূপীকৃত ধ্বংসরাশি বিদূরিত হইয়া গেল. দেখিতে দেখিতে অসংখ্য বণিক্ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। এইরূপে কতিপয় মাসের মধ্যেই ভীলবারা দ্বাদশশত বিপণিতে সুশোভিত হইল। কতিপয় বিদেশীয় বণিকেরাই নগরের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল। নগরের যে সমস্ত রথ্যা ইতিপূর্ব্বে আরণ্য লতাগুল্মে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তৎসমুদায় পরিস্কৃত ও সুপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। যেখানে একটিমাত্র মনুষ্যমূর্ত্তিও নেত্রগোচর হইত না. আজি তথায় দূরতম দেশের পণ্যজাত লইয়া শত সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইতে লাগিল, শকটে শকটে পথ সকল দুর্গম হইয়া পড়িল। স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ার্থ নগরমধ্যে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসিতে লাগিল এবং পণ্যবিক্রেতাগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ ইতস্ততঃ এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে, "যাহারা ভীলবারার হাটে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইবে, তাহাদের নিকট প্রথম এক বৎসর কোনরূপ শুল্কই গৃহীত হইবে না।" যাহাতে নগরের শান্তি সুচারুরূপে সংরক্ষিত হয়, যাহাতে বণিক্‌বৃন্দের বাণিজ্যবিষয়ে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে, তজ্জন্য রাণা বিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং যাহাতে নাগরিকবৃন্দ স্বেচ্ছামত স্ব স্ব শান্তিরক্ষক ও করসংস্থাপকগণকে মনোনীত করিয়া লইতে পারে, সেই সম্বন্ধে তদুপযুক্ত আরও কতকগুলি সুনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিলেন। নিয়মগুলি যথাবিধি পরিচালিত হইতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কার্য্যকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল সুনিয়মের বন্দোবস্ত হওয়াতে ভীলবারার যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এমন কি, ভীলবারার পুনঃস্থাপনের দুই চারি বৎসর পরেই তথায় প্রায় তিন সহস্র অট্টালিকা মোহনমূর্ত্তিতে লোকের নয়নরঞ্জন করিতে লাগিল। সেই অট্টালিকার অধিকাংশই বণিক্, শ্রেষ্ঠী ও শিল্পিগণকর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত নগরের মধ্যভাগে একটি নূতন রথ্যা নির্ম্মিত হইল। আদত্ত শুল্ক হইতেই সেই রথ্যানির্ম্মাণের ব্যয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

ভীলবারা নগর উন্নতিসোপানে আরূঢ়। অধিবাসিবৃন্দ শান্তির সুখময় ক্রোড়ে সংস্থিত। কিন্তু কালচক্রে অকস্মাৎ একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিল। নগরপ্রবাসী বিদেশীয় বণিক্‌গণের সহিত নগরবাসিগণের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কোথায় তাহারা আত্মোন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইয়া

পরস্পর পরস্পরকে সৌহার্দ্দবন্ধনে সংবদ্ধ করিবে, তাহা না করিয়া তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল; পরস্পরের উন্নতিস্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য উভয়পক্ষ যত্নবান্ হইয়া উঠিল। সকলেই স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া এক একটি পণ্যদ্রব্য একেবারে একচেটিয়া করিয়া লইবার উদযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সে সমস্ত উদ্যম আশু বিফল হইয়া গেল। এই ব্যবসায়গত বৈষম্য নিবারিত হইলে রাণা মনে করিলেন যে, ভীলবারার শান্তি এখন চিরস্থায়িনী হইল; কিন্তু তাঁহার সে আশাও ফলবতী হইল না। সেই ব্যবসায়গত অনৈক্য মন্দীভূত হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্মগত অনৈক্য লইয়া আবার উভয়দলে ঘোরতর বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ভীলবারার হিন্দু বণিক্ ও ব্যবসায়িবৃন্দের মধ্যে প্রায়ই দুইটি তন্ত্র দৃষ্ট হয়; একটি বৈষ্ণব, দ্বিতীয়টি জৈন। এই দুইটি পরস্পরবিসংবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি এরূপ প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইল যে, তাহার শান্তিবিধানার্থ তাহাদিগকে পরিশেষে ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল। কেন না, সুবিধা পাইয়া বিচারালয়ের কোটগণ তাহাদিগের সকলেরই নিকট কৌশলে অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে ভীলবারার উন্নতিপথ বিষম সঙ্কটময় হইয়া পড়িল। রাণা ভাবিয়াছিলেন, ভীলবারাকে মধ্যভারতের প্রধান বাণিজ্যবন্দর করিয়া তুলিবেন; তাঁহার সকল আশাই ফুরাইল।

মিবারের উন্নতিবিধান ও শান্তি সংস্থাপনার্থ রাণা সামন্তপ্রথার সংস্কারসাধন এবং কৃষক ও বণিক্‌গণকে উৎসাহ-প্রদান এই দুইটি কার্য্যই আশু কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সামন্তপ্রথার সংস্কারসাধন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কৃষক ও বণিক্‌গণকে উৎসাহ ও আশ্রয়দান করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেই উৎসাহ ও আশ্রয়লাভে সমুত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া তাহারা আপনাদিগের ও স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিবে। সে পরিশ্রম যত কেন কষ্টপ্রদ হউক না, তাহাদিগের প্রতি অল্প পরিমাণে কর ধার্য্য করিলেই তাহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবে; কিন্তু সামন্ত-সমিতির সংস্কারসাধন করিতে হইলে অনেককে যে পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, সে ত্যাগস্বীকারের উপযুক্ত প্রতিদান হইতে পারে, এমন কিছু দৃষ্ট হয় না। পরন্তু তাহা বলিয়া যে সকল সামন্তকেই কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন, যাঁহারা এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান্ হইবেন। কোতারিও সর্দ্দারই ইহার দৃষ্টান্ত। কোতারিও যেমন সুসম্পন্ন, তাহাতে তাঁহাকে কিছুমাত্র ক্ষতিস্বীকার করিতে হয় নাই। কিন্তু দেবগড়, শালুম্ব্রা বা বেদনোরের ন্যায় যাঁহারা বিদেশীয় সাহায্য, চক্রান্ত, কূটপন্থা কিংবা তরবারিবলে আপনাদিগের প্রভুত্ব নির্ব্বিঘ্নে রক্ষণার্থ সদাসর্ব্বদা যত্নবান্, তাঁহাদিগের মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মিল যে, হয় ত এই কারণে তাঁহাদিগকে বিস্তর ক্ষতিস্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা স্বার্থসাধনোদ্দেশে যে নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, রাজ্যে তাদৃশ সুশৃঙ্খলা সাধিত হইলে, তাঁহাদিগের সে স্বেচ্ছাচারিতার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। অর্দ্ধশতাব্দীর অরাজকতায় তাঁহারা যে অদম্য স্বেচ্ছাচারিতার তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগকে তাহার হিসাব-নিকাশ করিতে হইবে; আজি তাঁহাদিগকে ভূমিবৃত্তিসকলের পাট্টা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে; এই সমস্ত চিন্তা তাঁহাদিগের হৃদয়ে উদিত হওয়াতে তাঁহারা নানা আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিলেন। এতদ্ভিন্ন সর্দ্দারগণের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ভাব বিদ্যমান ছিল, তাহার দূরীকরণ এবং পরস্পর পরস্পরের যে সকল ভূমিসম্পত্তি হরণ করিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ, এই দুইটিও প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে গণনীয় হইল। এই দুইটি কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রথমটির বিষয় ভাবিয়া রাণা একান্ত

ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন যে, বরং ব্যাঘ্র ও মেষশিশুক এক পাত্রে জলপান করাইতে পারা যায়, তথাপি রাজার ও রাজ্যের কল্যাণার্থ চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণকে একত্র কার্য্য করিতে বাধ্য করা সুকঠিন। ফলতঃ রাজ্যের সকলেই মিবারের সংস্কারসাধনের কৃতকার্য্যতায় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সকলেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, কেহই মিবারভূমির উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইবে না। এমন কি, শক্তাবৎসর্দ্দার জোরাবরসিংহ নিরাশ হইয়া বলিলেন, "যদি স্বয়ং জগৎপাতা অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তিনিও মিবারের সংস্কারসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।"

অনেক বিবেচনার পর রাণার আদেশে একটি সভা-সমিতি আহূত হইল। সভায় অনেক তর্কবিতর্ক হইল, কিন্তু তাহাতেও কর্ত্তব্যসাধনের কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণকে কিছুতেই একত্র করিতে পারা গেল না; বরং সেই সমস্ত কার্য্যে তাহাদিগের পরস্পরের বিসংবাদ আরও দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি সংবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সকলকেই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর কোন্ কোন্ বিষয়ে রাজার ও সামন্তগণের স্বত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহা স্থির করিয়া একখানি স্বত্বপত্রিকা লিখিত হইল। প্রকাশ্যসভায় সেই পত্রিকায় স্বাক্ষর করিবার জন্য রাণা একটি দিন ধার্য্য করিলেন। সকলের অনুমোদনে মে মাসের প্রথম দিবস ধার্য্য হইল। এপ্রেল মাস অতীত হইলে ক্রমে গ্রীষ্মের সূর্য্যদেবকে মস্তকে ধরিয়া মে মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। সামন্তবৃন্দ আপনাদিগের ভাগ্যলিপি পরীক্ষার জন্য একত্র সমবেত হইলেন। ক্রমে সেই স্বত্বপত্রিকা পাঠ করা হইল; সকলেই তাহার প্রত্যেক সূত্র লইয়া নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিন কিছুই স্থির হইল না। অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াও যখন কোন বিষয়ের মীমাংসা হইল না, তখন দেবগড়ের গোপালদাস সকলের মুখপত্রস্বরূপ দাঁড়াইয়া সবিনয়ে রাণাকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আজ কিছুই হইল না, সকলেরই অভিলাষ যে, একবার আমার বাটীতে ইঁহারা সকলে একত্র হইয়া এ বিষয়ে পরামর্শ স্থির করেন; ইহাতে মহারাজের মত কি?" রাণা তাহাতে অসম্মত হইলেন না। এই প্রকারে আর দুই দিন অতীত হইল। সকলেই সেই দুরূহসমস্যার মীমাংসার্থ উৎকণ্ঠিত হইল। অবশেষে চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে উদয়পুরের সুপ্রশস্ত সভাপ্রাঙ্গণ বহুলোক সমাকীর্ণ হইল। সকলশ্রেণীর সর্দ্দার, সেনানী ও সৈনিক সমবেত হইলেন। যাঁহারা অস্বাস্থ্য বা অন্য কোন কারণে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিনিধিকে প্রেরণ করিলেন। রাণা স্বীয় কুমারগণের সহিত উচ্চমঞ্চের উপরিভাগে আসন-গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সে দিন সহজে সে বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই। সমস্ত দিন অতীত হইল; দিনমণি পরিশ্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে বিশ্রামগৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন, তথাপি কিছুই মীমাংসা হইল না। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত। নিশীথকাল দেখা দিল, তথাপি কিছুই স্থির হইল না। পরিশেষে ঊষার রক্তিমরাগে পূর্ব্বগগন অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল; তখন ৫ই মে দিবসের প্রাতঃকালে তিন ঘটিকার সময় সর্দ্দারেরা সেই স্বত্বপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই পঞ্চদশ ঘণ্টাব্যাপী সময়ের মধ্যে রাণা যেরূপ সুবিচার ও মতদার্ঢ্যের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই বিশ্বাস জন্মিল যে, তৎকর্ত্তৃক মিবার উন্নতিমার্গে সমুত্থাপিত হইবে। এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া সকলেই স্বত্বসূত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

স্বত্বপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এখন সন্ধির সমস্ত সূত্রই পালন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সকলে

স্থির করিলেন, আশু না হউক, ক্রমে যথাবিধি সেই সমস্ত সূত্র পালন করিতেই হইবে। কতিপয় মাসের মধ্যেই লিখিত সন্ধিপত্রবিধি যথানিয়মে অনুপালিত হইতে লাগিল। যেমন শান্তি ও ভদ্রতার সহিত সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল, সেইরূপ শান্তি ও ভদ্রতার সহিত সন্ধির নিয়মগুলি পালিত হইতে লাগিল; ইহাতে কেহই কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল না; কাহাকেও একবারমাত্র অস্ত্রধারণ করিতে হইল না,—এমন কি, উদয়পুরের একশত মাইল স্থানের মধ্যে এক জন ব্রিটিশ সেনারও প্রয়োজন হইল না, সুখশান্তির সহিত সকলেই সন্ধিপত্রলিখিত নিয়ম পরিচালন করিতে লাগিলেন।

ব্রিটিশ-এজেন্ট মহামতি টড সাহেবের চেষ্টায় ও যত্নে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর হইল, সুচারুরূপ সুবন্দোবস্তের সহিত কার্য্য সাধিত হইতে লাগিল। নির্ব্বাসিত মিবারগণ পুনরাহূত হইল, বৈপ্লবিক সর্দ্দারদিগের দমন হইল, ব্যবসায়বাণিজ্যেরও উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহী ও অত্যাচারী সর্দ্দারেরা মিবারের যে সকল ভূসম্পত্তি অযথারূপে হরণ করিয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া বোধ হইল। কারণ, সেই প্রণষ্ট ভূমিসম্পত্তি উদ্ধার করিতে গেলেই অপহারী সর্দ্দারগণের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ বাধিবার সম্ভব। তাহারা কদাচ সহজে সেই সকল সম্পত্তি প্রতিদান করিবে না। কেহ চারিপুরুষের স্বত্বাধিকার দেখাইবে, কেহ বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। ফলতঃ ঐ কার্য্য একরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বহুদিন ধরিয়া এই সকল বিষয় লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল, কিন্তু আশু কোন ফলোদয় হইল না। রাণা সর্দ্দারগণকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক নানারূপ মধুরবচনে সকলের হৃদয় হরণ করিতে লাগিলেন এবং অতীত ঘটনার চিত্র তাঁহাদিগের নেত্রসম্মুখে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নানারূপে প্রতিবোধিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। মিবারের সেই স্বর্ণযুগে—গিহ্লোটবংশের স্বাধীনতার গৌরবসময়ে সেই সর্দ্দারগণের পিতৃপুরুষেরা মিবারের স্বাধীনতা, মিবারের গৌরবগরিমা ও মিবারের সুখশান্তি রক্ষা করিবার জন্ম কেমন বীরের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, আর ইঁহারা কি না সেই বীরকেশরিগণের বংশধর হইয়া রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিবেন? তবে কি ইঁহারা সেই স্বদেশপ্রেমিক সর্দ্দারগণের বংশধর নহেন?—তবে কি মিবারে ইঁহাদের জন্ম হয় নাই। সেই স্বাধীনতার লীলাভূমি মিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষগণের পবিত্র শোণিতে পরিপুষ্ট হইয়া মিবারের সর্দ্দারেরা পাশবী প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধনার্থ কি সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির দিকে দৃক্পাত করিবেন না? অতীতের জ্বলন্ত চিত্রের সহিত বর্ত্তমান সময়ের বিষাদময়ী ঘটনার তুলনায় সমালোচনা করিয়া রাণা সর্দ্দারগণকে ঐ প্রকারে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সুখের বিষয়, তাঁহার চেষ্টা ক্রমে ক্রমে ফলবতী হইতে লাগিল। তাঁহার ভাবগর্ভ মধুরবাণী শুনিয়া সর্দ্দারগণের কঠোরহৃদয় ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইতে লাগিল, তাঁহাদের গর্ব্বিত ও উদ্ধতপ্রকৃতি শনৈঃ শনৈঃ শান্তভাব ধারণ করিতে লাগিল; তাঁহাদিগের জ্ঞানচক্ষু ক্রমে ক্রমে উন্মীলিত হইল। ক্রমে যতই দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, ততই সেই সকল চিত্র তাঁহাদিগের অন্তরে গভীরতররূপে অঙ্কিত হইয়া পড়িল; যেন কি অচিন্তনীয় দৈবশক্তির প্রভাবে সর্দ্দারগণের পূর্ব্বভাব তিরোভাব পাইতে আরম্ভ হইল। আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, মাতৃভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহারা পরিশেষে রাণার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং যাঁহাদের পিতৃপুরুষেরা অযথারূপে মিবারের ভূমিসম্পত্তি হরণ করিয়াছিল, তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই প্রকারে ছয়মাসের মধ্যেই সেই দুরূহ ব্যাপার সুসিদ্ধ হইল, রাণার উদ্দেশ্য সফল হইল।

মিবারে যখন সংস্কারসাধন লইয়া এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই সময়ে অনেক রাজপুতের বীরচরিত্র উন্মেষিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর্জ্জা নামক একটি দুর্গ মিবারের অন্তর্গত। পূর্ব্বে উহা রাণার খাসজমির অন্তর্ভূত ছিল। পুরাবৎ-গোত্রীয় সর্দ্দারেরা উহা বলপূর্ব্বক অধিকৃত করেন; তৎপরে প্রায় পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইল, শক্তাবৎগণ পুরাবৎদিগের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লন এবং রাণাকে দশসহস্র টাকা দিয়া উহার স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হন। শক্তাবতেরা আর্জ্জাদুর্গকে আপনাদিগের একটি প্রধান জয়নিদর্শন জ্ঞান করিতেন। মিবারের সংস্কারসাধন লইয়া যখন পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হয়, ভীণ্ডীরপতি শক্তাবৎ-সর্দ্দারের মধ্যম ভ্রাতা ফতেসিংহ তখন ঐ নগর শাসন করিতেছিলেন। অতঃপর আর্জ্জার পুনরুদ্ধার অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে রাণা ফতেসিংহকে সেই বিষয় জানাইলেন। শক্তাবতের হৃদয় দুঃখ ও অভিমানে নিপীড়িত হইল। তিনি সন্তপ্তহৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'আর্জ্জা আমাদিগের হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ, হৃদয়ের শোণিত-বিনিময়ে আর্জ্জা হস্তগত করিয়াছি; আজি উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইলে আমাদিগকে সম্মানমর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।" এই ঘটনা ক্রমে ক্রমে সমগ্র শক্তাবতের কর্ণগোচর হইল। তচ্ছ্রবণে তাঁহাদিগের হৃদয় যে পরিমাণে আলোড়িত হইল, শক্তাবৎ-সর্দ্দারের ত্রিচত্বারিংশৎ নগর ও পল্লী অপহৃত হইলেও সে পরিমাণে আলোড়িত হইত না। রাণা চিন্তাকুল হইলেন। শক্তাবৎগণ মিবারের একটি প্রধান বল; তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে মিবারভূমি আবার একেবারে রসাতলে নিমগ্ন হইবে. সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মান-রক্ষাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আর্জ্জা পুরাবৎগণের করে পুনরর্পিত না হইয়া রাজকোষেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর কোন গোলযোগ রহিল না। তখন ফতেসিংহ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্তুষ্ট হইয়া সরলহৃদয়ে রাণাকে আর্জ্জার স্বত্ব প্রত্যর্পণ করিলেন।

মিবারের সংস্কারসাধনের সময় মে মাসের চতুর্থ দিবসে যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল, তাহার সংসাধনপথে অনেকগুলি সর্দ্দার প্রতিরোধী হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে বেদনোর ও আমৈতের সর্দ্দার প্রধান। উভয়েই উচ্চশ্রেণীর সর্দ্দার এবং উভয়েরই পিতৃপুরুষেরা মিবারের পূর্ব্বগৌরবরক্ষার জন্য হৃদয়শোণিতদানেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা পিতৃপুরুষগণের উদারহৃদয়তার অনুগামী না হইয়া আপনাদিগের পবিত্রবংশকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বেদনোর-সর্দ্দারের নাম জয়ৎসিংহ। প্রসিদ্ধ সাহসিক মৈরতা-গোত্রে ইঁহার জন্ম। রাণা কুম্ভের জীবনতোষিণী মহিষী মিরা-বাইয়ের সহিত জগৎসিংহের পিতৃপুরুষেরা মারবারের মরুপ্রান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক মিবারে আগমন করিয়াছিলেন। যে জয়মল্লের অমানুষিক বীরত্ব অদ্যাপি রাজপুতবৃন্দের শ্লাঘার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার অবর্ণনীয় শৌর্য্য বীর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া প্রবলবৈরী আকবর আপন রাজধানীর তোরণদ্বারে তাঁহার পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, পবিত্র মৈরতা-গোত্রেই সেই বীরকেশরী মহাত্মা জয়মল্লের জন্ম। বীরপুঙ্গব জয়মল্লের বংশধরগণ আপনাদিগের উচ্চপদের সম্মান ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; এখন যদি তাঁহাদের বংশধর জয়ৎসিংহ সেই সকল সম্মানমর্য্যাদা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া রাজপুত-কুলাঙ্গার সর্দ্দারদিগের সহিত তুল্যপদে সমানীত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অপমানের পরিসীমা থাকিবে না। রাণা ভাবিয়াছিলেন যে রাঠোর-সর্দ্দার জয়ৎসিংহ তাঁহার পদতলে অবনত হইয়া পড়িবেন; কিন্তু তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। তিনি জয়ৎসিংহের চিরন্তন সম্মান বিলোপ করিতে উদ্যত হইতেছেন, আর তিনি তাহা সহ্য করিয়া কি তাঁহার পদলেহন করিবেন?—ইহা নিতান্তই অসম্ভব। জয়ৎসিংহের সহিত রাণা যেরূপ ব্যবহার

করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে রাঠোরসর্দ্দার বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার ক্ষমতা আচ্ছিন্ন হইতে চলিল; সুতরাং তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি সন্তপ্তহৃদয়ে রাণার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আমার ভূমিবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মিবারভূমি হইতে প্রস্থান করি।" এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ জয়ৎসিংহ প্রাসাদের প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে তাঁহাকে নানারূপ মিনতি করিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে রাণা উপায়ান্তর না দেখিয়া পলিটিকাল এজেণ্ট মহাত্মা টড্ সাহেবের করে এই বিষয়ের মীমাংসাভার সমর্পণ করিলেন।

গিহ্লোটবংশের একটি চিরন্তন নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কোন সর্দ্দারই ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংসাধনের জন্য কদাচ রাণার নিকট স্বয়ং প্রার্থনা করিতে পারিবে না। কারণ, ইহাতে রাজ-সম্মানের ব্যতিক্রম ঘটে। তদনুসারে অমাত্যগণের দ্বারা প্রার্থী সর্দ্দারদিগের অভিপ্রায় রাণার নিকট বিজ্ঞাপিত হইত। জয়ৎসিংহ মিবারের মন্ত্রিগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিতেন। মহাতেজা জয়ৎ সেরূপ কার্য্যকে অপমানকর ও ভীরুস্বভাব-সুলভ বলিয়া বিবেচনা করিতেন; বিশেষতঃ রাণার মন্ত্রিসভার মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রবলবৈরী ছিলেন। তিনি যে সেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল তিনি বেদনোর জনপদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা; উক্ত জনপদের অন্তর্গত তিন শত যাইটটি নগর ও পল্লী তাঁহার করে অর্পিত ছিল। সামন্ত-প্রথার নিয়মে তিনি সেই সকল নগর ও পল্লী স্বীয় অধীনস্থ সর্দ্দারদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ ছিল যে, তিনি স্বীয় ক্ষমতার অতিরেকে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেন এবং যে সকল বিষয়ে একমাত্র রাণা ব্যতীত আর কাহারও হস্তার্পণ করিবার অধিকার নাই, তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইতেন। কাজেই রাজতন্ত্রের অবমাননা করা হইত। যাহা-দিগের হস্তে ঐ সকল নগর ও পল্লীর শাসনভার সমর্পিত ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই তৃতীয়-শ্রেণীর সামন্ত এবং মিবারে গোল নামে পরিচিত। যে সময়ে মিবারে বেতনভোগী সৈন্যনিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল না, সেই সময়ে এই গোল সামন্তেরাই মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরবরক্ষার জন্য রণভূমে অবতীর্ণ হইত। তখন ইহাদের বীরত্ব রাণাগণের প্রভুত্বরক্ষার একটি প্রধান সম্বল ছিল। যাহা হউক, রাজপুত-সুহৃৎ রাজনীতিবিশারদ মহামতি টড্ সাহেব সেই ক্ষুব্ধ রাঠোরসর্দ্দা-রের নিকট গমন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "সর্দ্দারচূড়ামণি! আপনি যে বীরসিংহ জয়মল্লের পবিত্রবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহার উপযুক্ত বংশধর বলিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করেন, একবার তাঁহার অমানুষিক বীরত্ব ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের বিষয় চিন্তা করুন। ভাবিয়া দেখুন, তিনি মোগলসম্রাট্ আক্‌বরের প্রবল আক্রমণ হইতে পবিত্র চিতোরপুরীকে রক্ষা করিতে গিয়া জগতে আত্মোৎসর্গের কি জলন্ত চিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপনি কি করিতেছেন? আপনি সেই বীরকেশরীর বংশধর হইয়া সেই আত্মোৎসর্গ ও সেই অপূর্ব্ব রাজভক্তি প্রদর্শনে বিমুখ হইতেছেন কেন?" মহানুভব টড সাহেবের এই সকল বাক্য যেন কোন অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিকী ক্ষমতার ন্যায় রাঠোরসর্দ্দার জয়ৎসিংহের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; তাঁহার কঠোরহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া পড়িল; নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুনীর বিগলিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি হস্তস্থিত দানপত্র-খানি এজেণ্টের করে প্রদান করিলেন। এ কার্য্য সুসম্পাদন করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা জয়ৎসিংহের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। "যে সময়ে তাঁহার (রাণার)

আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন আমি প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। বিগ্রহসময়ে সমস্ত সামন্ত ও সৈনিক তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও আমরা চারিজনে তাঁহার জন্য হৃদয়-শোণিত-দানেও সঙ্কুচিত হই নাই। কিন্তু আজি জয়মল্লের বংশধরের সে সমস্ত কার্য্য তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন; এখন এক জন দস্যু তাঁহার প্রিয় পারিষদ্ * সে পারিষদ্ নীচকুলজাত হইলেও আজি রাণার কৃপায় আমার অপেক্ষা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত।" বীরকেশরী জয়মল্লের বীরবংশধর জয়ৎসিংহের বাক্যে রাণা পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মানসম্ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বেদনোরে পাঠাইয়া দিলেন। ভাদেশরের সর্দ্দারের মনস্তাপের পরিসীমা থাকিল না; তিনি অবনতশিরে আপন নগরে প্রস্থান করিলেন।

ভাদেশর-সর্দ্দার হামির নামে পরিচিত। চন্দাবৎগোত্রে তাঁহার জন্ম। তিনি মিবারের দ্বিতীয়শ্রেণী-সর্দ্দারের অন্তর্গত। ইঁহারই পিতা সর্দ্দারসিংহ † হতভাগ্য মন্ত্রিবর সোমজিকে সংহার করিয়াছিলেন। পিতার সমস্ত সম্পত্তির সহিত পুত্র হামির তদীয় ঔদ্ধত্য ও কঠোরতারও অধিকারী হইয়াছিলেন। হামির বৈপ্লবিক দলের অধিনায়ক; সমগ্র রাজবারাবাসীরা তাঁহাকে দৌরাবাৎ ‡ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। আপনার পদানুসারে যদিও তিনি বার্ষিক ত্রিংশৎ সহস্র টাকার অধিক মূল্যের বিষয় ভোগ করিতে পাইতেন না, তথাপি স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে অশীতি সহস্র টাকা আদায় করিতেছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ কপটী ও চতুর। তিনি সর্ব্বদা রাজসভায় থাকিতেন এবং কপট রাজভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজার মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইতেন। লাবার শক্তাবৎ-সর্দ্দার তাঁহার একটি প্রধান বিশ্বস্ত বন্ধু। ক্ষীরোদাদুর্গ সে সময় লাবার অধিকারে ছিল। ইঁহারা উভয়েই তুল্যপ্রকৃতির লোক; যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্যের বন্ধুত্বমিলন হইয়াছিল। উভয়েই এরূপ কৌশলের সহিত রাজার চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন যে, ইঁহাদিগের উচ্চপদস্থ সর্দ্দারগণ স্ব স্ব ভূমিবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও ইঁহারা স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের ভূসম্পত্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়দ্দিন অতীত হইল। মন্ত্রী পরিশেষে লাবা সর্দ্দারের প্রতি রাণার আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, "যাবৎ আপনি ক্ষীরোদা-দুর্গ ও অপহৃত অপরাপর ভূসম্পত্তি প্রত্যর্পণ না করিতেছেন, তাবৎ রাজসভায় আসিতে পাইবেন না।" এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র দুর্ব্বৃত্ত হামিরের হৃদয়

* ভাদেশর-সর্দ্দার হামির রাণীর বিবাহ-যৌতুক হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এখানে অন্য নামে অভিহিত হইলেন।

† সর্দ্দারসিংহ এই নিষ্ঠুর আচরণের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছিলেন। সেই কঠোর মহারাষ্ট্র-বিপ্লবসময়ে নিষ্ঠুর আমীর খাঁর জামাতা ও প্রতিনিধি জামসিদ উদয়পুরে স্বীয় সেনাকটক স্থাপন পূর্ব্বক নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ লুণ্ঠন করিতেছিল। সর্দ্দারসিংহ তখন বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। জামসিদ একদিন তাঁহাকে ধৃত করিয়া ত্রিশ হাজার টাকার জন্য নিজ শিবিরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। সর্দ্দারসিংহ অর্থ দিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সোমজির ভ্রাতৃদ্বয় টাকা দিয়া সর্দ্দারকে ক্রয় করিয়া লইল। এই সংবাদ সর্দ্দারসিংহের সৈন্যসামন্তগণের শ্রুতিগোচর হইবামাত্র তাহারা তাঁহাকে উদ্ধার করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল। প্রতিজিঘাংসামত্ত শিবদাস ও সতীদাস সেই অবসরে হতভাগ্য সর্দ্দারসিংহের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক আপনাদিগের পাশবী প্রতিহিংসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার ছিন্নমুণ্ড রামপিয়ারীর প্রাসাদের তোরণদ্বারে স্থাপন করিল। এই নিষ্ঠুর ও বীভৎসকাণ্ডের অভিনয় করিয়া শিবদাস ও সতীদাস পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই। ছুরিকার তীক্ষ্ণস্পর্শে তাহাদিগের পাপজীবন ধ্বংস হইয়াছিল।

‡ দৌরাবাৎ-শব্দে দ্রুতধাবক বুঝায়।

ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি সগর্ব্বে আপন গুম্ফমর্দ্দন করিতে করিতে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রীকে কহিলেন, "আপনার পূর্ব্বপুরুষ সোমজির দুরবস্থার কথা স্মরণ করিবেন।"

উগ্রতেজা হামিরের উগ্রপ্রকৃতি দিন দিন আরও উগ্রতর হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষভাবের অনুকরণে কেহ সাহসী হইল না বটে, কিন্তু অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার সগোত্রীয় ব্যক্তিগণের আহ্লাদের সীমা-পরিসীম থাকিল না। তাহারা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগের সর্দ্দারের ও চন্দাবৎ গোত্রের গুণ-গৌরবগানে প্রবৃত্ত হইল। হামিরের নিষ্ঠুরাচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার দমনে রাণাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখিয়া সকলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, তিনি ভয়ে কিংবা অনুগ্রহে তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। সুতরাং এ বিষয়ে এজেণ্টের হস্তার্পণ আবশ্যক হইল। এজেণ্ট সাহেব সেই কার্য্য সম্পাদনের ভারগ্রহণপূর্ব্বক সুযোগ ও সুবিধা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে আপনা হইতেই উপযুক্ত অবসর আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সকল রাজকর্ম্মচারী পূর্ব্ব-কথিত দুর্গ অধিকার করিতে গমন করিয়াছিল, দুর্গাধ্যক্ষ তাহাদিগকে অবমাননা করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেয় নাই। তাহারা অবমাননা সহ্য করিয়া অবনতশিরে উদয়পুরে প্রতিগমন করিল। রাজাদেশের এইরূপ অযথা অবমাননায় এজেণ্ট সাহেব যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন। অবমানকর্ত্তার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল না দিয়া তিনি আর নিমেষকাল বিশ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না। যখন ঐ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, রাণা তখন পাত্রমিত্র ও সর্দ্দারগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যতোরণদ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। অপরাপর সর্দ্দারের ন্যায় দুর্জ্জয় হামিরও তন্মধ্যে সমাসীন ছিলেন। এজেণ্ট সাহেব সেইখানে গমনপূর্ব্বক প্রতীহারী দ্বারা রাণার নিকট স্বীয় আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং সসম্মানে আহূত হইয়া উপযুক্ত শিষ্টাচারের পর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিয়ানো প্রদেশ অধিকার করা হইয়াছে কি?" সভাসদ্‌গণের বিষণ্ণ ভাব দর্শনে এজেণ্ট সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বকথিত বিবরণ উদয়পুরের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি রাণার সহিত এরূপ ভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, যেন রাণা সেই অবমাননার বিষয় কিছুই বিদিত নহেন। অন্যান্য দুই চারিটি কথার পর তিনি ভীমসিংহকে কহিলেন, "আপনার আজ্ঞার এ প্রকার অবমাননা হইতেছে, এখন যদি আমি উদয়পুরে অবস্থিতি করি, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। সুতরাং আপনার অবমানকর্ত্তার উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হইতে হইবে।" ইংরাজ-এজেণ্টের এই প্রকার সাহসব্যঞ্জক কথা শুনিয়া রাণার হৃদয় সমুৎসাহিত হইল। তিনি আত্মসম্মানসম্ভ্রম সুরক্ষিত রাখিবার অভিলাষে গম্ভীর ও তেজস্বিনী বাণীতে বলিয়া উঠিলেন, "সর্দ্দার ও সেনাপতিগণ! আপনাদিগের প্রতি কোনপ্রকার কঠোর বা অন্যায় আচরণ করি, আমার সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা বিবেচনা করিবেন না যে, আমার সম্মান ও মর্য্যাদার উপযুক্ত কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকিব।" অতঃপর রাণার আদেশে বীরা আনীত হইল। তখন হামিরের প্রতি কুটিল দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কঠোরস্বরে রাণা বলিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর এবং এক ঘণ্টার মধ্যে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপসৃত হও।" রাণা এরূপ রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, এজেণ্ট সাহেব যদি তাঁহাকে নিবর্ত্তিত না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হামিরকে দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হইত। সেই সঙ্গে এই আজ্ঞাও প্রচারিত হইত যে, যাবৎ হামির অপহৃত ভূমিসম্পত্তি পুনঃপ্রদান না করিবেন, তাবৎ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধ থাকিবে। হামিরের আশাভরসা সকলই বিলুপ্ত হইল। তিনি যাহা

মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। নিদারুণ মর্ম্মাহত হইয়া তিনি সেই রাত্রিতেই উদয়পুর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্বনগরে উপস্থিত হইয়া তিনি যে কেবল আপনার অপহৃত ভূমিসম্পত্তিগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন, তাহা নহে, এমন কি, যাহা মহাত্মা টডের হৃদয়ে আদৌ উদিত হয় নাই, রাণা যাহা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই, তাহাই সংঘটিত হইল, হামির স্বীয় ভাদেশর-দুর্গের স্বত্ব পর্য্যন্তও রাণার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং শিশোদীয়বংশের লোহিতবৈজয়ন্তী ভাদেশর-দুর্গের চূড়ায় সমুড্ডীন হইল।

আমৈত-সর্দ্দারের কাহিনীও এখানে উল্লেখযোগ্য। আমলিদুর্গ, তদন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি সপ্তবিংশ বৎসর যাবৎ আমৈত-সর্দ্দারের হস্তে সমর্পিত ছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে তাঁহাদিগের অধিকার চলিয়া আসিতেছিল। জগবৎকুলে আমৈতের সর্দ্দারগণের জন্ম। তাঁহারা মিবারের ষোড়শ প্রধান সর্দ্দারের অন্তর্গত। জগবৎকুলের বর্ত্তমান প্রতিনিধি ফতেসিংহ এক জন সাধুশীল মহাপুরুষ। আমৈত-সর্দ্দার বেদনোর-সর্দ্দারের নিম্নতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে জগবৎবংশে বীরবালক পুত্তের জন্ম হইয়াছিল, সেই বংশেই আমৈত সর্দ্দার জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র বীরবালক পুত্তের অমানুষিক বীরত্ব ও অদ্ভুত আত্মত্যাগকে জগবৎবংশের রাজপরায়ণতার জলন্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাই জগবৎবংশের রাজানুরাগের একমাত্র প্রমাণ নহে। বিগত মহারাষ্ট্রীয়-বিপ্লবের সময় ফতেসিংহের পিতা প্রতাপসিংহ দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র-কবল হইতে মিবারভূমি রক্ষা করিতে গিয়া সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সেই আত্মত্যাগের পারিতোষিকস্বরূপ আমলি-দুর্গ তদীয় হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। ফতেসিংহ একটি চতুর আত্মীয়ের চাতুর্য্যজালে বিজড়িত হইয়া চন্দাবৎগণের কোন একটি বিশেষ স্বার্থসাধনে প্রণোদিত হন। কিন্তু তিনি স্বতই অল্পবুদ্ধি ও উদ্ধত ছিলেন; সুতরাং তিনি সে কার্য্যের কিছুমাত্র উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। ফতেসিংহের হৃদয়ে সরল ক্রোধের উদয় হইলে কদাচ সে ক্রোধ লুক্কায়িত রাখিতে পারিতেন না, লুক্কায়িত করিতে প্রয়াসও পাইতেন না। একদিন এজেণ্ট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইলে তাঁহার অন্তর্নিহিত রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন তিনি যদিও কোন কথা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার ঘূর্ণিতনেত্রে অন্তরস্থ রোষের পূর্ণচিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। যাহা হউক, রাণা তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র মীমাংসা করিতে না পারিয়া এজেণ্টের করে সেই গুরুতর ভার সমর্পণ করিলেন। এজেণ্ট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। একটি সুপ্রশস্ত সভাগৃহে ব্রিটিশ-এজেণ্টকে আসন প্রদান করা হইল। গৃহটি সুপ্রশস্ত, চারিদিকে ভিত্তিগাত্রে ফতেসিংহের পিতৃপিতামহদিগের এক একখানি সুদৃশ্য প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। এজেণ্ট টড সাহেব স্বীয় পারিষদ্‌বর্গের সঙ্গে সেই গৃহমধ্যে আসনগ্রহণ করিলেন। আশু ফতেসিংহও স্বগণে সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুগত ভৃত্য ও রক্ষকেরা সভাগৃহের মধ্যে যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। তিনি টড সাহেবের সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু অভ্যাগত ইংরাজ এজেণ্টকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। আপন করস্থিত ঢাল জানুযুগলের উপরিদেশে ঋজুভাবে স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি করদ্বয় ও মস্তক বিন্যাস করিয়া তিনি নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। ইংরাজ এজেণ্ট অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন; যাঁহার বাটীতে অভ্যাগত, তিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না, ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। কিন্তু তিনি পরাস্ত হইবার লোক নহেন। সম্মুখে ফতেসিংহের পিতার একখানি চিত্র ছিল। সেইখানি মৌনব্রতধারী ফতেসিংহের সম্মুখে ধরিয়া এজেণ্ট সাহেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন,

"আপনার ন্যায় ব্যবহার করিয়া এই সর্দার সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন নাই।" এই কথা শুনিয়া ফতেসিংহের হৃদয়ে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল। তাঁহার নেত্রযুগল এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করিল; মুখমণ্ডলে মৃদু হাস্যরেখা দৃষ্ট হইল। তিনি এজেণ্ট সাহেবের দিকে নেত্রপাতপূর্ব্বক সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! আপনি এ চিত্র কোথায় পাইলেন? এ চিত্রখানি আপনার এত মনোরঞ্জন করিল কেন?" বলিতে বলিতে ফতেসিংহের বদনমণ্ডল গভীর বিষাদমণ্ডিত ভাব ধারণ করিল; আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রুনীর দেখা দিল। সবিষাদে তিনি বলিলেন, "ইনি আমার স্বর্গীয় পিতা!" এজেণ্ট সাহেব কহিলেন, "হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি, ইনি মহাবীর রাজভক্ত প্রতাপসিংহ। এই মূর্ত্তিতেই ইনি সেই শেষ দিন স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আহা! সে দিন কবে অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম আজিও জীবিত রহিয়াছে; আজিও এক জন বিদেশীয় তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছে এবং আন্তরিক অনুরাগভরে তাঁহার যশোগান করিতেছে।" এজেণ্ট সাহেবের এই কথা শুনিবামাত্র ফতেসিংহের বদন-মণ্ডলের ভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার হৃদয়স্থ প্রবল চিন্তাতরঙ্গের প্রতিমা প্রতিফলিত করিতেছিল। সাহেবের কথা পরিসমাপ্ত হইতে না হইতে তিনি ত্বরিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আম্‌লি গ্রহণ করুন—আম্‌লি গ্রহণ করুন; কিন্তু দেখিবেন, আত্মোৎসর্গের মহিমা বিস্মৃত হইবেন না।" ফতেসিংহের এই উদ্বেল হৃদয়োচ্ছ্বাসদর্শনে চতুরচূড়ামণি ইংরাজ এজেণ্ট আর বিলম্ব করিতে সমর্থ হইলেন না; তৎক্ষণাৎ তিন ছাড় চিঠি আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ তৎক্ষণাৎ রক্ষিত হইল। এই সমস্ত বন্দোবস্তের ফল কিরূপ হইল, তদ্বর্ণন-প্রসঙ্গে নিরীহ কৃষকদিগের অবস্থা এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইল।

মিবারের কৃষকেরা শান্তিপ্রিয়, নিরীহ ও সমধিক শ্রমসহিষ্ণু। মিবার-রাজ্যে কৃষকই ভূমির অধিকারী। মিবারের ভূমিতে কৃষকের যে স্বত্ব আছে, কৃষকেরা তাহাকে স্বদেশোৎপন্ন অমরধবের * সহিত তুলনা করিয়া থাকে। অমরতৃণের ন্যায় ভূমির স্বত্বও দৃঢ় ও অমর; ভাগ্যচক্রের প্রভূত পরিবর্ত্তনেও সেই স্বত্ব বিলুপ্ত হয় না। আপনার ভূমিকে কৃষক বাপোতা নামে সম্বোধন করে। পৈতৃকস্বত্ব বুঝাইবার জন্য এই বাপোতা ব্যতীত তাহার মাতৃভাষায় অতি পরিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ অন্য প্রাচীন শব্দ আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। যদি কোন স্বার্থপর রাজা তাহার চিরন্তনস্বত্ব বিলোপ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে কৃষক ভগবান্ মনুর অমৃতময়ী বাণী উচ্চারণপূর্ব্বক গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠে, "যাহারা বনজঙ্গল কাটিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার ও কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভূমির প্রকৃত অধিকারী।" † যত দিন বিশ্বপ্রেমিক ব্যবস্থাপকদিগের মস্তকোপরি ভগবান্ মনুর নাম বিরাজ করিবে, ততদিন তৎপ্রণীত বিধির একটি সূত্রও জগতে পরিচালিত হইবে, ততদিন শতসহস্র বিগ্রহ-বিসংবাদ হইলেও হিন্দুজাতির এই চিরন্তনী প্রথার বিপর্য্যয় হইবে না। এই চিরন্তনী বিধি অনুসারেই মিবারের—শুদ্ধ মিবার কেন—রাজবারার অধিবাসিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বলিয়া আসিতেছেন, 'ভোগরা ধন্নী রাজ হো; ভূমরা ধন্নী মা চো" অর্থাৎ রাজা রাজস্বের অধিকারী,

* অমরধব এক প্রকার তৃণ। সকল ঋতুতেই ইহা সমভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রচণ্ড আতপতাপেও ইহা পৃথক্ হয় না। ভূমির সহিত এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বশতঃ রাজপুত কৃষক ইহার সহিত স্বীয় ভূমি স্বত্বের তুলনা করে।

† ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বনজঙ্গল কাটিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করে, সে ক্ষেত্র তাহারই অধিকৃত।

কিন্তু ভূমির অধিকারী আমি। ভগবান্ মনুর রাজত্বকাল হইতে এই ধারণাই হিন্দুজাতির অস্থি-মজ্জাতে সম্পৃক্ত হইয়া রহিয়াছে; বোধ হয়, যতদিন জগৎসংসার বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন এ ধারণা অন্তর্হিত হইবে না। যে দিন সেই ত্রিকালবিৎ বিধানকর্ত্তা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই ভারতসংসারে কত বিষয়ের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত বিদেশীয় বিধর্ম্মী অত্যাচারী কৃতান্তসম অবতীর্ণ হইয়া ভারত শাসন করিয়া গিয়াছে; ভাষা, বর্ণ ও রীতিনীতির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু এই ধারণা সমভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ইহার বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কি কর্ণাট, কি রাজবারার যে কোন প্রদেশের হিন্দুজাতির ব্যবস্থাগ্রন্থ উদ্ঘাটন করা যায়, তাহাতেই দৃষ্ট হয়, "বনজঙ্গল কাটিয়া যে পরিষ্কার করে, সেই ব্যক্তিই ভূমির প্রকৃত অধিকারী।"

সুপ্রথিত কার্টিয়স এরিয়িয়ান ও ডিওডোরস প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য সুধীগণ যে সময়ের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ের বিবরণ লইয়া অনুশীলন করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক নাগরিকতন্ত্র একটি রাজ্যান্তর্ভূত রাজ্যবৎ অধিষ্ঠিত। তাহাদিগের শাসনপ্রণালী রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পৃথক্। কেবল তিনি দেশকে শত্রুবল হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া তাহাদিগের নিকট নিয়মিত করস্বরূপ একাংশ প্রাপ্ত হইতেন। সেই প্রকার রাজস্থানের প্রত্যেক রাজ্যে লক্ষ লক্ষ পল্লীসমিতির চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের সেই সমস্ত স্বতন্ত্র পল্লীসমাজের সহিত কোন সম্বন্ধই দৃষ্ট হয় না। সেই সমস্ত পল্লীসমিতির অধ্যক্ষেরা স্ব স্ব শাসনাধীন সমাজের মধ্যে হর্ত্তাকর্ত্তা। তাঁহারা সার্ব্বভৌমিক অধিপতিকে শস্য বা ধন হইতে নিয়মিত অংশ প্রদান করেন বটে, কিন্তু নরপতি তাঁহাদিগের জন্য বিধিব্যবস্থাবিধান বা তাঁহাদিগের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিবার জন্য রক্ষক স্থাপন করেন না। উদারাশয় টড সাহেব বলেন যে, "এই সার্ব্বভৌমিক শাসনপ্রণালীর অভাব বশতঃ গ্রামীনবৃন্দ আপনারাই গ্রামের শান্তিরক্ষা, বিচার ও শাসনভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা হইতেই পঞ্চায়ৎ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।"

পিতৃপিতামহগণের অধিকৃত ভূমি রাজপুত কৃষক বাপোতা নামে অভিহিত করেন, কিন্তু সেই বাপোতার স্বত্বাধিকারী যুদ্ধজীবী হইলে তাঁহাকে ভূমিয়া বলা যায়। দিল্লীর যবনসম্রাট্গণ আপনাদিগের গৌরবের মধ্যাহ্নসময়ে করদ হিন্দু-রাজগণের উপর জমিদার সংজ্ঞা অর্পণ করিতেন। যাঁহারা সে সময়ে ভূমির প্রকৃত অধিকারী ছিলেন, তাঁহারাই তখন জমিদার নামে পরিচিত হইতেন।

কৃষকের অবস্থা সম্যক্রূপে অনুশীলন করিলে ভূমিতে তাহার চিরন্তন স্বত্বাধিকারের বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই অধিকারের উপর নির্ভর করিয়া ভূমিয়া স্বেচ্ছানুসারে স্বীয় ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহার ভূমির উপর কেহই কোন কালে মানযষ্টি পাতিত করিতে পারিবে না, তাহার উপর করনির্দ্ধারণ করিতেও কেহ অধিকার পাইবে না। তবে তিনি যে সার্ব্বভৌম নৃপতির অধীন, তৎপ্রযুক্ত করদ্বারাই কেবল তাহা সপ্রমাণ হয়। রাণা পরোক্ষে ভূমিয়া কৃষকগণের আনুকূল্য পাইয়া থাকেন; কিন্তু ব্রিটিশ-প্রভুত্বস্থাপনকালে যখন মিবারভূমি একবার বহুদিন ধরিয়া শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিল, যে সময় তদধীন পল্লীসমূহে আর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হইল না, রাণা তখন হইতে সেই কর উঠাইয়া দিয়া ভূমিয়াগণকে দেশের শান্তিরক্ষক বা সৈনিকপদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তাহারা সামান্যবেতনে ঐ সকল পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কয়েকটি প্রাচীনকথার উল্লেখ করিলেই বাপোতার উপর রাজপুত কৃষকের স্বত্ব-সম্বন্ধে দৃঢ়তার বিষয় সকলে বুঝিতে পারিবেন। যে সময়ে মুন্দর মারবারের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল, সেই সময়ে একটি গিহ্লোটরাজকুমার একদিন কোন মারবাররাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে গমন করেন। বিবাহরাত্রে জামাতা শ্বশুরের নিকট যৌতুকস্বরূপ যাহা প্রার্থনা করিবেন, শ্বশুরকে তাহা প্রদান করিতেই হইবে; ইহা রাজপুতগণের চিরন্তনী প্রথা। সেই প্রথা হইতে রাজবারাভূমে যে কত মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সেই প্রথা অনুসারে গিহ্লোটরাজকুমারও শ্বশুরের নিকট দশসহস্র জাট কৃষক প্রার্থনা করিলেন। ঐ সকল কৃষককে মিবারে স্থাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। স্বীয় মন্ত্রীর পরামর্শেই রাজকুমার ঐরূপ যৌতুক প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রার্থনা শুনিয়া মারবারপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কিন্তু জামাতার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিতে হইবে; অগত্যা তিনি সেই জাটগণের সমীপে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে দশসহস্র ব্যক্তিকে স্বদেশ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই নিদারুণ আজ্ঞা শ্রবণমাত্র জাটকৃষকেরা একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা সে আজ্ঞা পালন করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। অবশেষে নরপতি একান্ত পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "যাহা আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদির সম্পত্তি, আমরা কি আমাদের সেই বাপোতা পরিত্যাগ করিয়া এক অপরিচিত লোকের জন্য পরিশ্রম করিতে তাঁহার সহিত প্রবাসী হইতে যাইব? মহারাজ! আপনার ইচ্ছা হইলে আমাদিগকে বধ করিতে পারেন, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা কিছুতেই আমাদিগের জীবনের জীবনস্বরূপ বাপোতা ত্যাগ করিতে পারিব না।" মুন্দরাজ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জাট প্রজাগণ এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিবে। এখন তাঁহার সে অনুমান যাথার্থ্যে পরিণত হইল। জাটগণ অস্বীকার করাতে নৃপতির প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু তিনি সে জন্য চিন্তিত বা অপ্রতিভ হইলেন না, কারণ, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ততগুলি প্রজাক্ষয় হইতে আপনাকে মুক্ত হইতে হইল, তখন তিনি অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু বিধাতা বাম হইয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিলেন। রাণা জাটদিগকে মিবারের অনেকগুলি ভূমিসম্পত্তিতে একেবারে চিরদিনের জন্য স্বত্বাধিকার প্রদানে স্বীকার করিলেন, তখন জাটকৃষকেরা তাঁহার সহিত না আসিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিল না। কারণ, তাহারা মারবারভূমির পরিবর্ত্তে রাজপুতানার নন্দনকানন তুল্য মিবারের উর্ব্বরক্ষেত্রে তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হইল। সেই সমস্ত জাটের বংশধরেরা অদ্যাপি বেরিশ ও বুনাশ নদের সলিল-বিধৌত বিমলক্ষেত্রে পরমসুখে অবস্থিতি করিতেছে।

যে সমস্ত জনপদের ভূমিসংক্রান্ত প্রণালী বিধিবদ্ধ করিতে রাজা অসমর্থ হন, সেই সমস্ত জনপদে প্রজার দখলীস্বত্ব সম্যক্ প্রবল দৃষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত জিহাজপুর জনপদ। জহাজপুর একটি সুপ্রশস্ত জনপদ; ইহার মধ্যে একশত ছয়টি পল্লীসমিতি প্রতিষ্ঠিত। এই বিস্তৃত জনপদের মধ্যে কেবল দুই খণ্ড খাসজমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোটার জলিমসিংহের অধিকারসময়ে ঐ দুই খণ্ড ভূমি জলিম সবলে আচ্ছিন্ন করিয়া রাজসম্পত্তির অন্তর্ভূত করিয়াছিল। কিংবদন্তী আছে, তৎকালে বাকী খাজানার দায়ে ভূমি দুইখানি নীলাম হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে রাণার রাজস্বমন্ত্রী তাহা রাজসম্পত্তিস্বরূপ ক্রয় করেন। এই প্রকারে লোহারিও ও ইতুণ্ডা নামক দুইটি পুষ্করিণী এবং তাহার তীরবর্ত্তী ভূমিও রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত হইল। যে ভূমি এক সময়ে ভূমিয়া মীনগণের বিশাল বাপোতা জিহাজপুরের অন্তর্ভূত ছিল, তাহা আজ রাণার ভূমি বলিয়া প্রথিত। হায়! সংসারে

কিছুই চিরদিন সমভাবে বিদ্যমান থাকে না। জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। ভূমি কিরূপে কৃষক-দিগের করচ্যুত হইয়া রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তও এ স্থানে উল্লেখযোগ্য।

ভগবান্ মনু যে পল্লী-সমিতির নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, মিবারের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। প্রাচীনকালে যেমন পাঁচসাতখানি পল্লী লইয়া এক এক জন গ্রামীন থাকিতেন, মিবারেও তদ্রূপ পঞ্চগ্রামপতি বা সপ্তগ্রামপতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিবারে ইহাদিগকে পেটেল কহে। এই পেটেল হইতে কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকারভুক্ত ভূমিকে কর হইতে মুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগকে একটি ত্রৈবার্ষিক কর ও দুইটি যুদ্ধকর-মাত্র রাজসরকারে প্রদান করিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, শাস্ত্রোক্ত গ্রামীনের কর্ত্তব্য হইতে মিবারের পেটেলের কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র; সেই হেতু পেটেল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, সংস্কৃত পতি শব্দ হইতেই পেটেল শব্দের উৎপত্তি। ফলতঃ মিবারবাসীরা সত্য সত্যই এইরূপ অর্থেই ইহাকে ব্যবহার করে। প্রাচীনকালে মিবারী পেটেলের নির্ব্বাচন ব্যতীত অন্য কিছুই কর্ত্তব্য ছিল না। তিনি স্বগ্রাম-বাসিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি সমগ্র পল্লীসমাজের একমাত্র প্রতিনিধি হইতেন এবং তাঁহাকেই কৃষক ও নৃপতির মধ্যে মধ্যস্থ হইতে হইত। পল্লীসমাজ ও রাজতন্ত্রের মধ্যস্থ ছিলেন বলিয়াই তিনি উভয়সমিতির সম্মানপাত্র হইতেন এবং সময়ে সময়ে উপকারও প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার স্বীয় বাপোতা থাকে এবং কৃষক যে শস্য উৎপাদন করে, তিনি তাহার চত্বারিংশ অংশের একাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত নৃপতির নিকট হইতে তিনি একটি অনুগ্রহও প্রাপ্ত হন। স্বীয় বাপোতা ভিন্ন তিনি যে অতিরিক্ত ভূমিকর্ষণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, রাজার অনুমতিতে তাহার নির্দ্দিষ্ট করের এক-তৃতীয়াংশ তাঁহাকে দিতে হয় না। মিবারভূমির পেটেলের কর্ত্তব্য এইরূপ। পেটেল কৃষক ও নৃপতির মধ্যগত বন্ধনস্বরূপ। তিনি শান্তজীবন কৃষকগণের একমাত্র প্রতিনিধি এবং পল্লীসমিতির একমাত্র অগ্রনায়ক. নরপতি তাঁহারই মুখে মূর্খ কৃষকগণের অবস্থা অবগত হন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের উৎপীড়নে মিবাররাজ্যের ভাগ্যস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র মধ্যভারতভূমে পেটেলগণের এইরূপ কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্তগণের ঘৃণিত লুণ্ঠনপ্রথা দিন দিন যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মিবারবাসী পেটেলের ক্ষমতাও তত বাড়িয়া উঠিল। তিনি পল্লীসমিতির কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। নিষ্ঠুর দস্যুরা কৃষকগণের উপর যে সকল কর ধার্য্য করিত, পেটেল সেই সকলের প্রতিভূ হইতেন এবং দেহবন্ধকরূপে দস্যু-শিবিরে প্রায়ই নীত হইতেন। দুরাশয় মহারাষ্ট্রীয়েরা যত দিন সেই পণ প্রাপ্ত না হইত, তত দিন তাঁহার বন্ধন-মোচন করিত না। দস্যুগণ পুনঃ পুনঃ মিবারভূমে উপস্থিত হইয়া মিবারীগণের নিকট যতবার পণ প্রার্থনা করিত, পেটেল ততবারই প্রফুল্লচিত্তে উহা সমর্পণ করিতেন। মুখে তিনি কৃষকগণের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতেন, কিন্তু সুযোগ পাইলে সেই শান্তজীবন ব্যক্তিদিগের সর্ব্বনাশ করিতে নিরস্ত হইতেন না। অজ্ঞানান্ধ অগণিত ব্যক্তি তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তমনে দিনপাত করিত; স্বার্থপরায়ণ পেটেল সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগেরই সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আত্মসাৎ করিতেন। পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বার্থসাধনের উপযোগী সুযোগ উপস্থিত হইত। তিনি সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন এবং কৃষকের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মস্বার্থ অবিপন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক কৃষকের দেয় অংশের

একটি তালিকা প্রস্তত হইত। তিনি তাহাদিগের নিকট সেই সকল অর্থাংশ সংগ্রহ করিয়াও যদি তাহাতে নির্দ্দিষ্ট অর্থ সংগৃহীত না হইত, তাহা হইলে তাহাদের ভূমিসম্পত্তি, অবশেষে তাহাদিগের তৈজসপত্রও বন্ধক রাখিতেন। এই প্রকারে যাবৎ তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি না হইত, তাবৎ তিনি প্রশান্ত নিঃসহায় মূর্খ কৃষকগণের হৃদয়শোণিত পান করিতেন। হতভাগ্য কৃষকেরা তাহা না বুঝিত এমত নহে, তাহারা বুঝিত যে, পেটেল দস্যুদিগের ছদ্মবেশী গুপ্তচর। তাহারা পেটেলের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে সাহসী হইত না। নিরীহ কৃষকেরা জানিয়া শুনিয়া সেই ছদ্মবেশী সর্ব্বনাশক শত্রুর নিকট বক্ষ পাতিয়া দিত; সে ইচ্ছামত তাহাদিগের শোণিত পান করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিত! হা হতভাগ্য কৃষক! এ ভারতক্ষেত্রে তোমাদের সুখশান্তি নাই। তোমরা যাহাদিগকে পরমহিতৈষী জ্ঞানে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি কর, একবার আপনাদের অবস্থা না ভাবিয়া যাহাদিগের সুতীক্ষ্ণ বিষদশনের উপর বক্ষ পাতিয়া দিয়া তৃপ্তিলাভ কর, তাহারাই যখন তোমাদিগের সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে, তখন তোমরা কিরূপে সুখশান্তির মুখ দর্শন করিবে? আর কত কাল তোমরা এরূপ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিয়া দুঃসহ যাতনা প্রাপ্ত হইবে? আর কত কাল তোমরা চিরন্তন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিবে? হায় হায়! প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া যাহাদিগকে তোমরা অনশন-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতেছ, তোমরা যাহাদিগের বিলাসদ্রব্যের সংযোজন করিয়া দিতেছ, তোমাদের মুখের দিকে ভ্রমেও তাহারা একবার নেত্রপাত করে না।

ক্রমে ক্রমে স্বার্থপর পেটেল মিবারবাসী কৃষকের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রায় অনেকেই বিলাসী হয় এবং অত্যাচারী হইয়া উঠে, মিবারের পেটেলও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ হইলেন। এত দিন তিনি কৃষকগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, তাহাদিগের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু আর সে ভাব রহিল না; এখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি তাহাদিগের প্রকাশ্যশত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন; নানারূপে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে প্রায়ই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের সুখদুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, আত্মসুখের চিন্তাতেই দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকেন; কাজেই সে সম্প্রদায়ের মধ্যে আশু নানারূপ অনর্থ ঘটে; অবশেষে তাহা সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দুরাকাঙ্ক্ষ পেটেল স্বীয় পাশবী স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রথমে যথেচ্ছাক্রমে কৃষকগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে; কিন্তু কৃষকেরা সামান্য ব্যক্তি, তাহারা যে অনবরত তাঁহার সর্ব্বগ্রাসকরী দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিসাধন করিবে, সে ক্ষমতা তাহাদের কোথায়? সুতরাং কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা নিঃসম্বল হইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে পেটেলেরও সুখের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া গেল। এখন আর কাহার শোণিত পান করিয়া তিনি উদরপূরণ করিবেন?—যাহাদের শোণিতপান করিতেন, সেই শান্তিপ্রিয় কৃষকেরা শোণিতহীন,—দুর্ব্বল, শক্তিহীন। তাহাদিগকে একপ্রকার মৃতকল্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের কঠোর আক্রমণে মিবারবাসী কৃষকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিত; মিবারের অনেক ক্ষেত্র শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, সেই সময়ে পাপাত্মা পেটেলের স্বার্থসাধনের সমূহ বিঘ্ন ঘটিয়া উঠিত। কিন্তু তাহা কিছু অধিক দিনের জন্য নহে। আবার দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইত, আবার বিবাসিত কৃষকেরা স্বদেশে আসিয়া সেই সমস্ত ক্ষেত্রে স্বর্ণফল উৎপাদন করিত, আবার নির্দ্দয় পেটেলের স্বার্থসাধনের উপযুক্ত অবসর দেখা দিত। তিনি অজ্ঞানান্ধ শান্তপ্রকৃতি কৃষকগণের উপর সেই পূর্ব্বপ্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বীয় পাশবী স্বার্থপরতার তৃপ্তিবিধান করিতেন। সুতরাং হতভাগ্য কৃষকগণ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেও

শান্তিলাভে সমর্থ হইত না। সেই নর-রাক্ষসের পশুবৎ উৎপীড়নে আবার তাহাদের সোনার সংসার ছারখারে যাইত, অজস্র পৈশাচিক ব্যবহারের উৎপীড়নে মিবারের কৃষকেরা এইরূপে নিঃস্ব ও নির্ম্মূলপ্রায় হইয়া পড়িল; মিবারের সুখশান্তি একেবারে অন্তর্হিত হইল। নররাক্ষস পেটেল যে প্রজাবর্গের ছদ্মবেশী প্রবল বৈরিস্বরূপ, তিনি যে মিবারের সুখসূর্য্যের প্রচ্ছন্ন দুর্দ্দান্ত রাহু, ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিল। সে শত্রুকে পরাহত না করিলে দেশের মঙ্গল নাই, সকলেরই হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল। সকলে স্থির করিল যে, সেই পাপাত্মা মধ্যস্থকে তাহার পূর্ব্ব অবস্থায় পাতিত করিতে না পারিলে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু তাহাও সহজসাধ্য নহে। কারণ, অনেকগুলি ক্ষমতাবান্ রাজকর্ম্মচারী গোপনে পেটেলের পৃষ্ঠপূরক ছিল, তাহাকে পদভ্রষ্ট করিতে গেলে সেই সকল ছদ্মবেশী নিষ্ঠুরদিগের স্বার্থের বিঘ্ন ঘটিবে, তখন তাহারা সেই উদ্দেশ্যসাধনের পথে বিষম বাধা দিতে উদ্যত হইবে, তাহা হইলে রাজ্যমধ্যে আর একটি বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভব।

স্বার্থপরায়ণ দুর্ব্বৃত্ত পেটেলের ঐরূপ রাক্ষসিক উৎপীড়নের সংবাদ পাইয়া ভারতবন্ধু মহামতি টড সাহেব শান্তজীবন কৃষকগণের মঙ্গলার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পেটেলের পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান অবস্থা এবং কর্ত্তব্যের অবধারণ করিয়া তিনি স্বীয় অভীষ্টব্রত সম্পাদন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মিবারের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোড়নপূর্ব্বক তিনি জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে গ্রামীনেরাই পেটেল নির্ব্বাচন করিত। তাহারা একমত হইয়া যাহাকে মনোনীত করিত, নরপতি তাহাকেই পেটেল সংজ্ঞা অর্পণপূর্ব্বক সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। সেই প্রণালী অনুসারে মিবারে সেই প্রথাই অবলম্বিত হইল। মিবারবাসীরা একত্র পরামর্শ করিয়া সকলের ঐক্যমতে যাহাকে নির্ব্বাচিত করিল, রাণা তাহাকেই পেটেল স্থির করিলেন, তাহারই মস্তকে তিনি উষ্ণীষবন্ধনপূর্ব্বক উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নির্ব্বাচিত নূতন পেটেল রাজসমক্ষে নজর প্রদানপূর্ব্বক নূতন আসনে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বে এই পেটেল পদ বিক্রীত হইত। নৃপতি নির্দ্দিষ্ট অর্থগ্রহণপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাহাতে যে রাজ্যে বিস্তর অমঙ্গল ঘটিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন হইতে সে প্রথার পরিবর্ত্তন হইল। মহামতি টড সাহেব সে প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। রাণাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূত্রে গ্রথিত করিলেন যে, পেটেলের নির্ব্বাচনসম্বন্ধে তিনি কোন কালেই আর হস্তার্পণ করিতে পারিবেন না, পেটেলের সহিত গোপনে কোন পরামর্শেও লিপ্ত হইতে পারিবেন না।

যে উপায়ে মিবারের রাজস্ব আদায় হইত, তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। মিবারে দুইটি প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই প্রথানুসারে সকল প্রকার শস্যের উপর রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ঐ দুইটি প্রথার নাম কঙ্কুট ও ভুট্টাই। সর্ষপ, ইক্ষু, তামাক, পাট, তুলা, পোস্ত, নীল ও উদ্যানজাত পুষ্পের উপর প্রতি বিঘায় দুই হইতে ছয় টাকা পর্য্যন্ত কর ধার্য্য হইয়া থাকে। ক্ষেত্র যখন শস্যপূর্ণ থাকে, তখন ক্ষেত্রপতি, পেটেল, পাটোয়ারী ও রাজকর্ম্মচারীরা সেই শস্যের উপর আনুমানিক যে কর ধার্য্য করেন, তাহার নাম কঙ্কুট। কঙ্কুট প্রায়ই ন্যায্যমতে ধার্য্য হইয়া থাকে। ক্ষেত্রস্বামীর বিবেচনায় যদি তাহা অতিরিক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি ভুট্টাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। শস্য কর্ত্তিত ও নিষ্পেষিত হইবার পর তাহা মাপ করিয়া যে অংশ করা হয়, তাহাকেই ভুট্টাই বলে। ভুট্টাই প্রাচীন প্রথা। ইহাতে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হয়। ভুট্টাই প্রথানুসারে রাজা সমস্ত যব, গোধুম ও অপরাপর বাসন্তিক শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা দ্বিপঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হন; কখনও কখনও হৈমন্তিক

শস্যের অর্দ্ধাংশও তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। কঙ্কুট ও ভুট্টাই প্রথার অনুসারে প্রচলিত বাজারদর মতে বিভক্ত শস্যের মূল্য ধার্য্য করা হয়। কঙ্কুট ও ভুট্টাইয়ের মধ্যে প্রথমকথিত প্রথাতেই সচরাচর ন্যায়ের অপব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, কৃষক স্বার্থসাধনোদ্দেশে সংগ্রাহককে উৎকোচ প্রদান করে। সেই প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া সংগ্রাহক সমস্ত শস্যের পরিমাণ অল্প করিয়া বলে। এই প্রকারে সে ব্যক্তি যখন উৎকোচগ্রহণে আত্মোদর পূর্ণ করিয়া প্রস্থান করে, তখন প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হয়। মন্দভাগ্য কৃষক সেই প্রহরীর পূজা করিতেও বাধ্য হয়। নচেৎ সে মিথ্যা করিয়া পাটোয়ারীর কাছে কৃষকের নামে নানারূপে অভিযোগ করিবে। কাজেই প্রহরীর মনস্তুষ্টি অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল দিকেই কৃষকের বিপদ্; প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যভাবে রাজকর্ম্মচারীদিগের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া দরিদ্র ধনে প্রাণে মারা যায়। হঠাৎ বোধ হয় যে, কৃষকই এই অনর্থের কারণ। কেন না, সে স্বীয় স্বার্থসাধনোদ্দেশে রাজকর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ প্রদান করে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে এরূপ সংস্কারকে ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া অনুমিত হইবে। কারণ, অধিকাংশ কৃষকই মূর্খ, সুতরাং তাহারা রাজ্যের বিধিব্যবস্থার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না। রাজকর্ম্মচারীরা স্বার্থসাধনোদ্দেশে তাহাদিগকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের প্রতি নানারূপ উৎপীড়ন করিতে থাকেন; যে পেটেল তাহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বিদ্যমান, তিনিও আত্মোদরপূরণে ব্যগ্র হইয়া তাহাদিগের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন না। ইহাতে শান্তজীবন কৃষকেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণের দায়ে সেই সব রাক্ষস কর্ম্মচারীদিগের উপাসনা করিতে বাধ্য হয়। ফল কথা, কৃষকগণের ভাগ্যে কিছুতেই সুখ নাই। যত দিন তাহাদের হৃদয়ে বিদ্যার জ্যোতিঃ স্পর্শ না করিবে, ততদিন তাহাদের কিছুতেই মঙ্গলসাধিত হইবে না। হায়! ভারতের ভাগ্যে সে দিন আর হইবে না, ভারতবাসীর মূর্খ সন্তানগণ [illegible] কৃষকসন্তানেরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপনাদিগের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিবে। ভারতের তাদৃশ সৌভাগ্য কোথায়? ভারতের জমীদার প্রজার মধ্যে যে ঘোর বৈষম্য দৃষ্ট হয়, কবে যে সেই বৈষম্য দূরীভূত হইয়া রাজা-প্রজা একত্র সাম্যসুখ অনুভব করিবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর।

ভারতহিতৈষী ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট মিবারের দণ্ডদণ্ডে শান্তিস্থাপন [illegible] পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞ মিবারের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মিবারের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত মিবারের যে শাসনবিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মিবার পূর্ব্বাবস্থা হইতে অনেক পরিমাণে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কি প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া মিবার ঐরূপ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৮১? খৃষ্টাব্দের শেষে পুরে, বরক ও কুপাশন মিবারের এই তিনটি মহাজনপদের লোকসংখ্যা গণনা করা হইল। অন্য অন্য অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল সহরবিভাগকে গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই সহরবিভাগের অন্তর্গত ষড়্বিংশতি পল্লীর মধ্যে কেবল ছয়টিতে লোকজনের বসতি দৃষ্ট হয়। সেই ছয়টি গ্রামে সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত উনষষ্টি জন গৃহস্থ [illegible] অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব্বকথিত ষড়্বিংশতি পল্লীতেই লোকের বসবাস হইল এবং সেই সকল পল্লীর মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ নয়শত ষড়্বিংশতি গৃহস্থ দৃষ্ট হইল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, শুদ্ধ তিন বর্ষের মধ্যে সহরবিভাগের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্পাদিও বিলক্ষণ উন্নীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে পরিমাণে হলকর্ষণ ও যতগুলি ক্ষেত্র কর্ষিত

হইত, ঐ সময় তাহার চতুর্গুণ দৃষ্ট হইল। সহরবিভাগের কথা পরিত্যাগ করিয়া খাসবিভাগের উন্নতির বিষয় অনুশীলন করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঠিক এই পরিমাণে ঐ সময়ের মধ্যে এই বিভাগের বেশী উন্নতি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়কবল হইতে কমলমীব, রায়পুর, রাজনগর ও সন্ত্রি কুনেরো; কোটাহস্ত হইতে জিহাজপুর ও সর্দ্দারদিগের হস্ত হইতে অপহৃত ভূসম্পত্তির পুনরুদ্ধারে এবং পার্ব্বত্যগণের হস্ত হইতে মৈরবারা জনপদের জয়ে অল্পকালের মধ্যেই একসহস্র নগর ও গ্রাম মিবারের অন্তর্গত হইল। এই সকল নগর ও গ্রাম চতুর্ব্বিংশতি জনপদের মধ্যে পূর্ব্বপ্রথার অনুসারে বিভক্ত হইয়া দশ-গ্রামীন বা শত-গ্রামীনের করে সমর্পিত হইল। এই প্রকার সুবন্দোবস্ত হইতে মিবারের বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হইল; মিবারভূমি ধীরে ধীরে আবার উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। যে রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল, মিবারপতি তৎসাহায্যে আত্ম-পদের সম্মানমর্য্যাদা সর্ব্বথা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিছু দিনের জন্য তিনি শান্তিলাভ করিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিবারের যে বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাসন্তিক শস্য হইতে মিবারের বাষিক রাজস্ব ৪০,০০০৲ টাকা, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৪,৫২,২৮১৲ টাকা, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ৭,৫৯,১০০৲ টাকা, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ১০,১৮,৪৭৮৲ টাকা এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ৯,৩৬,৬৭০৲ টাকা উদ্ভূত হয়। শেষোক্ত দুই বর্ষে ব্রিটিশ-এজেণ্ট বিশেষরূপ তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই, তথাপি মিবারে ঐরূপ বিপুল আয় হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বর্ষে যে বাণিজ্য শুল্ক আদায় হয়, তন্মধ্যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য-শুল্ক যৎ-সামান্য আদায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৯৬,৬৮৩৲ টাকা, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১,৬৫,১০৮৲ টাকা, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ২,২০,০০০৲ টাকা এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২,১৭,০০০৲ টাকা বাণিজ্য-শুল্ক আদায় হইয়াছিল। এই আয়ের সহিত মিবারের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৃটিশ-এজেণ্টের সাহচর্য্যে রাণা স্বরাজ্যের উন্নতিসাধনে সর্ব্বদা সক্ষম হইয়াছিলেন। মিবারভূমি রত্নগর্ভা ও স্বর্ণপ্রসবিনী। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহার গভীর গর্ভের অন্ধতমস্তরে যে অসংখ্য ধাতুর আকর বিরাজ করিতেছে, তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিলে মিবার অত্যল্পদিনের মধ্যেই আবার পুনর্ব্বার রাজবারার নন্দনকানন-সদৃশ হইয়া উঠিতে পারে। অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে জবুরা ও দুবিরার* টিনখনি হইতে প্রতিবৎসরে তিন লক্ষ টাকা আয় হইত। এতদ্ব্যতীত মিবারের অনেক অনেক স্থানে তাম্রখনিও দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত রত্নখনি হইতে মিবারের যে প্রচুর আয় হইত, ইহা বিচিত্র নহে। মিবারের দুরদৃষ্টবশতঃ সেই সকল আকরের খনকেরা ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। এখন আর সে সমস্ত রত্নভাণ্ডারের কথা কেহ ভ্রমেও একবার চিন্তা করে না; রাণারও আর পূর্ব্ববৎ উৎসাহ নাই। কাজেই সেই সকল খনি এখনও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, দুর্গম ও লোক-পরিশূন্য হইয়া রহিয়াছে। হায়! যে সকল আকরকে মিবারবাসীরা কমলার লীলাভূমি বলিয়া পূজা করিত, অহর্নিশি যেখানে অসংখ্য খনক রত্নোদ্ধারে ব্যস্ত থাকিত, আজি সেই সমস্ত স্থান অগাধজলরাশিতে পরিপূর্ণ, সেই সলিলরাশি সিঞ্চন পূর্ব্বক রত্নোদ্ধার করিতে আর কেহই চেষ্টা করে না। অনেকের বিশ্বাস, সেই সকল আকরের জীর্ণোদ্ধার

* সংবৎ ১৬১৬ অব্দে জবুরার টিনখনি হইতে ২২২০০০৲ টাকা এবং দুবিরা হইতে ৮০০০০৲ টাকা আয় হইয়াছিল। টিনের সহিত কিঞ্চিৎ রৌপ্যও পাওয়া গিয়াছিল।

সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। কিন্তু তাহাদিগের সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। ব্রিটিশসিংহের কৃপায় যে বিজ্ঞানবলে আজি সংসারে অমানুষিক কঠোরতম কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, সামান্য কয়েকটা আকরের জলসিঞ্চন ও জীর্ণোদ্ধার যদি মানবের অসাধ্য বোধ হয়, তবে সে বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতা আর কোন্ কার্য্য সুসিদ্ধ করিবে? যত্ন করিলে—চেষ্টা করিলে—উৎসাহ থাকিলে রাণা অবশ্যই এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন।

রাজবারার পুণ্যভূমি মিবারের বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ ইতিবৃত্তরঙ্গমঞ্চে এইখানেই যবনিকা পতিত হইল। জগৎপূজ্য গিহ্লোটবংশের অভিনয় এইখানেই পরিসমাপ্ত। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত শিশোদীয় বংশের ঘটনাচিত্র সকলের নয়নসমক্ষে ধারণ করিবার সাধ ছিল, কিন্তু সে সাধ মিটিল না; মনের সাধ মনেই রহিল। সূক্ষ্ম ঘটনাবলী লইয়া ভীমসিংহের অধস্তন রাজগণের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে অল্পে পরিসমাপ্ত হইতে পারে না।

বিংশ অধ্যায়

মিবারের ধর্ম্মপ্রণালী, পর্ব্ব ও আচার-ব্যবহার

পৌরাণিক ইতিবৃত্তের ফল, মিবারে শিবোপাসনা, একলিঙ্গের মন্দির, শৈব, গোস্বামী ও জৈনসমিতি, নাথদ্বারে শ্রীকৃষ্ণমন্দির ও পূজাপদ্ধতি, রাজপুত-সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের উপকারিতা।

জগতে এমন কোন বিষয় দৃষ্ট হয় না, যাহা আমাদিগের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সুগভীর গর্ভে বিরাজিত নাই। পুরাতন আর্য্যমহাত্মগণের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব অথবা অন্যান্য যে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তৎসমস্তই ইতিবৃত্তের অন্তর্ভূত। যে সমস্ত জগৎপূজ্য আর্য্যমনীষী ও বীরবৃন্দের নামে আমরা পুলকিত হইয়া উঠি, যে সকল মহাপুরুষ আমাদিগের পিতৃপুরুষ বলিয়া পরিচিত, যাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া আমরা শ্লাঘা প্রকাশ করি, যাঁহাদিগের অমানুষিক চিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিস্ময় প্রকাশ করেন, যাঁহাদিগের রচিত বিজ্ঞান-তর্কাদি শাস্ত্র লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের হৃদয় নব নব জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পবিত্র জীবনী ও সাধুতার একমাত্র নিদর্শনস্বরূপ পবিত্র চরিত্রমালাও পৌরাণিক ইতিবৃত্তের জটিল ও নিবিড় আবরণে সমাবৃত জগতের সমগ্র দেশেরই আদিম ঘটনাবলী পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভ্যন্তরে গ্রথিত। কিন্তু যাঁহারা সেই ইতিবৃত্তকে অলীক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের হৃদয় যে আত্মাভিমানিতাস্বরূপ অন্ধকারে সমাবৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ইংলণ্ডভূমি আজি জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চসম্মানে সম্মানিত, তাহার প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দের আচার-ব্যবহারও পুরাণের জটিল বর্ণনায় এরূপ বিজড়িত যে, তন্মধ্য হইতেও সত্যের আবিষ্কার করা একান্ত কঠিন। ফল কথা, জগতের কোন প্রাচীনজাতির আচার-ব্যবহার অনুসন্ধান করিতে হইলে পুরাণসাগর মন্থন ব্যতীত কৃতকার্য্য হইবার উপায় নাই; সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিয়া

দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাণই জগতের প্রথম অবস্থার একমাত্র ইতিবৃত্ত। সেই পুরাণোক্ত ব্যক্তিবর্গের কুসংস্কারের গাঢ় আচ্ছাদনে যে অসংখ্য অমূল্য সত্য ঐতিহাসিক সমাবৃত রহিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ক্লার্ক নামক এক জন বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য পরিব্রাজক বলিয়াছিলেন, "যে সকল প্রাচীন কুসংস্কারে লোকে সমাচ্ছন্ন আছে, সেই সমস্ত কুসংস্কারের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে আমরা যেমন সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের প্রাচীন রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্যক্ উদ্ধার করিতে সমর্থ হই, তাহাদিগের ভাষা অনুশীলন করিলে সেরূপ সফলকাম হইতে পারি না। কারণ, কুসংস্কারসমূহ তাহাদিগের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।" পরিব্রাজকের এই সারগর্ভ কথায় চমৎকৃত হইয়া মহামতি টড সাহেব মিবারের পূর্ব্বোৎসব ও কুসংস্কাররাশির অনুশীলনার্থ উহাকেই স্বীয় মানদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি নিজ কঠোরব্রতসাধনে সম্যক্ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পৌরাণিক ইতিবৃত্তই সকল শাস্ত্রের মূলভিত্তিস্বরূপ। রাজনীতি, বিজ্ঞান, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, যে কোন শাস্ত্র হউক না কেন, যাহার মূলে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নাই, তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণীয় নহে। পৌরাণিকী কাহিনী বর্ণনার মধ্যে যাঁহার চক্ষে কেবল তেজস্বিনী কল্পনার আতিশয্য পতিত হয়, বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের বিন্দুমাত্রও তাঁহার হৃদয় অধিকার করে নাই।

ভারতের পক্ষে পৌরাণিক ইতিবৃত্তই যে বিশেষ ফলপ্রদ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ভারতই যে সভ্যতার আদিম আবাসভূমি, সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করেন। সুতরাং ভারতের ন্যায় অন্যান্য রাজ্যের পক্ষেও যে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বিশেষ ফলপ্রদ, এ কথা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে। পুরাণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান বিধান-গ্রন্থ। হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞানমূলক; বিজ্ঞান স্বভাবতই নীরস ও কঠোর। কিন্তু পুরাণ সেই নীরস ও কঠোর-শাস্ত্রকে এরূপ মোহকর আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, কোটি বর্ষের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনেও সে আবরণ উন্মোচিত হইল না। হিন্দুগণের মতে পুরাণ দেবতার ন্যায় পবিত্র। সেই পুরাণোক্ত মহাপুরুষেরা দেবভাবে বর্ণিত; অদ্যাপি তাঁহারা দেবভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন; পৌরাণিক শিব ও বিষ্ণু অদ্যাপি এই সুবিশাল ভারতভূমির অধিবাসিগণের প্রধান উপাস্য। ভারতের অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা রাজবারাক্ষেত্রেই পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকতর সমাদর দৃষ্ট হয়। পুরাণোক্ত ধর্ম্মই রাজপুতজীবনের মূলমন্ত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিল, পরপীড়নে রাজপুতানার বক্ষঃস্থল চূর্ণবিচূর্ণ হইল, জগতে কত প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্ব রহিল না, কত স্থানে কত অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল, তথাপি কিন্তু রাজপুতজাতি সেই মূলমন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। আজিও তাঁহারা ভক্তিসহকারে সেই পবিত্র পুরাণোক্ত ধর্ম্মকে সমভাবে পূজা করিয়া আসিতেছেন। জানি না, এই সনাতন ধর্ম্মের অভ্যন্তরে কি মোহকরী মায়া সংগুপ্ত রহিয়াছে। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যখন ইহার অভ্যন্তরে সুন্দর বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, যখন শতসহস্র বর্ষের কঠোর অত্যাচারের মধ্যেও পতিত আর্য্যক্ষেত্রে হিন্দুরা সর্ব্ববিক্রমে আপনাদের হিন্দুত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন, তখন এই ধর্ম্মই যে জগতের মধ্যে সারাৎসার, তাহা বিজ্ঞমাত্রেরই স্বীকার্য্য। হয় ত এমন দিন উপস্থিত হইতে পারে যে, সমগ্র ভারতবাসী ইহার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানের গূঢ়মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া দীনা, হীনা, অধঃপতিতা জন্মভূমিকে আবার সুখশান্তির উন্নতশৃঙ্গে উত্থাপন করিতে সমর্থ হইবে; হয় ত সেই দিন ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটি সন্তান একমত হইয়া এই হিন্দুধর্ম্মকেই একমাত্র অনুসরণীয় মুখ্যধর্ম্ম

বলিয়া জ্ঞান করিবে। হয় ত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র কঠোর বর্ণ-বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া আবার ভারতের নগরে নগরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিবে।

পুরাণ রাজপুতগণের নিকট বেদের ন্যায় পরম পবিত্র। তাঁহারা ইহাকে পরমারাধ্য পিতৃ-পুরুষগণের মহতী কীর্ত্তি-লীলায় একমাত্র সাক্ষী বলিয়া বিবেচনা করেন। দেবদেব মহাদেব তাঁহাদিগের বিশেষ ভক্তির পাত্র এবং একমাত্র আরাধ্য। এই দেবতাই বীরত্ব, মহত্ব ও সন্ন্যাসধর্ম্মের জলন্ত আদর্শস্বরূপ। রাজপুতগণের—বিশেষতঃ মিবারবাসী রাজপুতবৃন্দের নিকট মহাদেব প্রধান উপাস্যদেবতা। গঙ্গাযমুনাতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে নানারূপ পুত্তলিকা-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। সেই হেতু যদিও রাজস্থানের অন্যান্য স্থানে ভগবান্ শূলপাণির অর্চ্চনার কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, বীরত্ব ও স্বাধীনতার লালাভূমি মিবারের দেবদেব ব্যোমকেশ আজিও পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। গিহ্লোটবংশীয় রাজারা শিবকে পূর্ণ ও লিঙ্গ, উভয় মূর্ত্তিতেই অর্চ্চনা করেন। তথায় তিনি সাধারণতঃ একলিঙ্গ * নামে প্রসিদ্ধ। মিবারে অনেকগুলি একলিঙ্গদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সমস্ত মন্দিরেই দেববিগ্রহের পুরোভাগে তাঁহার প্রিয়তম বাহন বৃষভের ধাতুময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত।

মিবারে যতগুলি শিবমন্দির আছে, তন্মধ্যে একটি মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যগত দেব-মূর্ত্তিই গিহ্লোটকুলের প্রধান উপাস্য দেবতা। উক্ত মন্দির উদয়পুরের তিন ক্রোশ উত্তরে একটি পর্ব্বতবর্ত্মের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার চারিদিক্ সমুচ্চশৈল ও বনতরুরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। শৈলরাজি পরম সুদৃশ্য। ওষধিসমূহের নয়নস্নিগ্ধকর হরিদ্দৃশ্যে মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কতকগুলি কলনাদিনী ক্ষীণতরঙ্গিণী কলকলনাদে তথায় প্রবাহিত হওয়াতে সেই পবিত্রতায় সহিত রমণীয়তাও যেন বর্দ্ধিত হইয়াছে।

একলিঙ্গদেবের পুরোহিতগণ দারপরিগ্রহ করেন না; তাঁহারা চিরজীবন কৌমারাবস্থায় অতিবাহিত করেন। অন্তিমকালে পালিত শিষ্যের হস্তে মন্দিরের সমস্ত ভার অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; ইঁহারা গোস্বামী উপাধিধারী ইঁহাদের ললাটে চন্দনাঙ্কিত অর্দ্ধ-চিহ্ন বিরাজিত। শিরোপরি গুচ্ছাকারে জটাজুট জড়িত, তন্মধ্যে এক একটি বিল্বপত্র ও পদ্মবীজমালা একত্র গ্রথিত থাকে। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষিত, পরিধান কৌষেয় বসন। তাঁহাদিগের শবদেহ অগ্নিদগ্ধ হয় না, বদ্ধপদ্মাসনভাবে সমাধি-নিহিত হইয়া থাকে এবং সেই সমাধির উপরিভাগে একটি মৃৎস্তূপ স্থাপিত হয়। সেই সকল মৃতস্তূপ চূড়াকারে বিনির্ম্মিত। কোন কারণে পুরোহিত অনুপস্থিত থাকিলে শুদ্ধাচারিণী যোগিনীরা দেবকার্য্য সমাধা করেন। মিবারে এরূপ অনেক গোস্বামী বাস করেন, যাঁহারা আজীবনকাল দারপরিগ্রহ করেন না, অথচ শিল্প, বাণিজ্য ও যুদ্ধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বণিক্‌গোস্বামীরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়। এরূপ সম্প্রদায় মিবারে অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের প্রতি রাণার বিশেষ অনুগ্রহ আছে। অস্ত্রধারী গোস্বামীরা মিবারের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন মঠে বা আশ্রমে অবস্থিতি করেন। তাঁহাদিগের কিছু কিছু ভূমি-সম্পত্তি আছে; আবার কখন বা

* সৌরাষ্ট্রে ও সিন্ধুনদের পূর্ব্বমোহানায় সহস্রলিঙ্গ ও কোটিলিঙ্গ নামে দুইটি লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। গ্রীস ও মিশর দেশে বেকসয়ের যে সমস্ত লিঙ্গমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাদের সহিত এই সমস্ত মূর্ত্তির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহাদিগকে ভিক্ষা, কখন পরচর্য্যা করিতেও দেখা যায়। এই সকল গোস্বামী আপনাদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে এক প্রকার শঙ্খবলয় ধারণ করেন। সেই শঙ্খবলয় তাঁহাদিগের নিকট রণভেরী সদৃশ বিবেচিত হয়। ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং গুর্জ্জরগণ এই সম্প্রদায়ে অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে।

মিবারের অধিপতিরা একলিঙ্গকা দেওয়ান (একলিঙ্গের প্রতিনিধি) উপাধি ধারণ করেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যখন তাঁহারা একলিঙ্গদেবের মন্দিরে উপস্থিত হন, তখন পূজা-বিধির আড়ম্বরে পুরোহিতকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

মিবারে জৈনসম্প্রদায় অনেক দৃষ্ট হয়। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জৈনগণের অতুলনীয় ক্ষমতা ও সম্প্রদায়সংখ্যার বিষয় বিশেষ বিদিত নহেন। তাঁহাদের মনে এই প্রকার ধারণাই আছে যে, জগতে জৈনের সংখ্যা অতি অল্প; যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও এক স্থানে নাই, চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। জৈনগণের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের বিষয় এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, একমাত্র ক্ষত্রগাছা † শাখার প্রধান পুরোহিতের ‡ একাদশ সহস্র দীক্ষিত শিষ্য ভারতের নানা স্থানে বাস করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, অসি নামে তাঁহাদিগের যে একটি শাখা-সমিতি আছে, তদন্তর্ভূত এক লক্ষ পরিবার রাজবারাভূমে বাস করিতেছে। ভারতের বাণিজ্য হইতে যে অর্থলাভ হয়, তাহার একার্দ্ধের অধিকও জৈনশ্রাবকের হস্ত হইয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। জৈন বা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়স্থান রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রপ্রদেশ। জৈনমতে যে পঞ্চপর্ব্বত পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে অবু, পালিথান ও গির্ণা, এই তিনটি পর্ব্বতই তাঁহাদের ধর্ম্মযুদ্ধের প্রধান রঙ্গভূমি। জৈনশ্রাবকবংশেই মিবারের মন্ত্রিসভা ও রাজস্ববিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারীর জন্ম। পঞ্চনদ-প্রদেশ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত নগরই জৈনশ্রেষ্ঠ দ্বারা সুশোভিত। উদয়পুরে এবং রাজবারার অন্যান্য নগরে শান্তিরক্ষক ও করসংগ্রাহকগণও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। অহিংসাই জৈনদিগের পরমধর্ম্ম। জ্ঞাতসারে কদাচ তাঁহারা প্রাণিহত্যা করেন না; এই কারণে যাহারা দাওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারী, তাহারা ফৌজদারী বিভাগের ধর্ম্মাবলম্বী কর্ম্মচারী অপেক্ষা অধিক কার্য্যদক্ষ। জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে এই সুদৃঢ় নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকাতে তাঁহারা রাজনৈতিকক্ষেত্রে অল্প পরিমাণেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। আনহলবারাপত্তনের শেষ রাজা কুমারপাল জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বর্ষাকালে স্বভাবজাত কীট-পতঙ্গ ও মহীলতাদি পদদলিত হইয়া পাছে প্রাণত্যাগ করে, এই জন্য তিনি এ ঋতুতে কদাচ যুদ্ধের আয়োজন করিতেন না, প্রাবৃটকালেই জৈনগণ জীবহত্যার অধিক আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমন কি, পাছে পতঙ্গগণ

* শৈবগণ জৈনগণকে বিস্থাবান্ বলিয়া পরিহাস করেন। প্রসিদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ এক-জন বিখ্যাত জৈন ছিলেন। তিনি অলৌকিকী ক্ষমতাপ্রভাবে অমাবস্যা-রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ সম্ভাবিত করিয়াছিলেন।

† খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আনহলবারাপত্তনের জৈন নরপতি সিদ্ধরাজের রাজত্বকালে তদীয় রাজধানীতে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটি মহাতর্ক উপস্থিত হয়। সেই তর্কের সময় তিনি জৈন-সম্প্রদায়ের একটি শাখাকে ক্ষত্রগাছা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; ক্ষত্র শব্দের অর্থ সত্য। হেমচন্দ্র আচার্য্য এই ক্ষত্রগাছা-সমিতির গুরু ছিলেন। হেমচন্দ্রের এক শিষ্যের নিকট হইতে মহাত্মা টড সাহেব রাজস্থানের উপকরণসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‡ টড সাহেব বলেন, ইনি প্রাচীন শিলালিপিসমূহের অতি দুর্জ্ঞেয় ভাষাও বুঝিতে পারিতেন। ইনি রাণা ভীমসিংহের বিশেষ সম্মানপাত্র ছিলেন।

অগ্নিতে পতিত হইয়া মিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় জৈনগণ একটি প্রদীপ পর্য্যন্ত প্রজ্বালিত রাখিয়া কুত্রাপি গমন করেন না।

বৌদ্ধে বৈষ্ণবে এবং শৈবে শাক্তে ঘোর বৈষম্য ও বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হওয়াতে হিন্দুস্থানে বিষম অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল, ভগবান শঙ্করাচার্য্য হইতে সেই অনৈক্যের হ্রাস হয়। তিনি অলৌকিকী শক্তিবলে সেই বৈষম্য দূর করিয়া ধর্ম্মের সমীকরণ পূর্ব্বক জগতে স্বদেশপ্রেমিকতার জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আর এখন বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত ইঁহারা পরস্পর পূর্ব্ববৎ বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করেন না। সকলেই সেই কঠোর বিদ্বেষভাব বিস্মৃত হইয়া অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মনৈতিক সাম্য অবলম্বন করিয়াছেন। যখন জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, যখন প্রতিদিন অসংখ্য জৈন বা ব্রাহ্মণ সেই সংঘর্ষোত্থ অগ্নিতে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতেন, সেই সময়ে অনেক দলিত ও নিপীড়িত জৈন মিবারে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিবার জৈনগণের একটি প্রধান আশ্রয়স্থল। প্রাচীন কাল হইতেই এইস্থানে জৈনধর্ম্মের অনুশীলন হইয়া আসিতেছে। মিবারের কচিৎ দুই এক জন রাণা শৈবধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জৈনধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই জৈনধর্ম্মকে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। গিহ্লোটবংশের আদিপুরুষ বল্লভীপতিরা জৈনধর্ম্মকেই মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। বোধ হয়, সেই জন্যই গিহ্লোটরাজগণ পিতৃপুরুষোচিত ধর্ম্মের প্রতি অধিক উৎসাহ ও অনুরোধ প্রকাশ করেন। চিতোরে পার্শ্বনাথের সমুচ্চ স্মারকস্তম্ভই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সেই স্তম্ভটির উচ্চতা প্রায় ৪৭ হস্ত। মধ্য, পাশ্চাত্য ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দুস্থাপত্যের যে সমস্ত কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, হিন্দুগণ এক সময়ে স্থপতিবিদ্যায় যার-পর নাই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। জৈনগণ কর্ত্তৃক ভারতের একটি অমূল্যরত্ন অনন্তধ্বংস হইতে রক্ষিত হইয়াছে। ভীষণ যবনদৌরাত্ম্যের দিগ্দাহী তেজে যখন ভারতের অনন্তরত্নভাণ্ডার ভারতীয় গ্রন্থাবলী দগ্ধীভূত হয়, আপন আপন বক্ষ পাতিয়া সেই সময়ে জৈনগণ তৎসমস্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অদ্যাপি সেই সকল রত্নের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। মরুভূমিমধ্যগত যশল্মীর, প্রাচীন আনহলবারা পত্তন এবং অন্যান্য জৈন পীঠের গুপ্তকাগার সকল অদ্যাপি অসংখ্য অমূল্যরত্নে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কঠোরতম শাসনপ্রণালী, রাক্ষসিক উৎপীড়ন ও শোকোদ্দীপক অত্যাচার সহ্য করিয়াও ধর্ম্মশীল জৈনসম্প্রদায় ঐ সকল অমূল্যরত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মানুরাগ প্রদর্শন করাতে তাঁহারা জগতে সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্মই মিবাররাজ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। মিবারে ধর্ম্মশীল রাজারা যে কেবল জৈন ও শৈবধর্ম্মের প্রতিই অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, এমন নহে, বৈষ্ণবধর্ম্মের রক্ষা ও উন্নতিসাধনেও তাঁহারা বদ্ধপরিকর ছিলেন। মিবাররাজ্যের নাথদ্বারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের যে পবিত্র মন্দির বিরাজিত আছে, তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুবিদ্বেষী দুরাচার আরঙ্গজেবের পাশব অত্যাচারে বৈষ্ণবমণ্ডলী পবিত্র ব্রজধাম হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপাস্য দেবতার রক্ষণার্থ কুত্রাপি আশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই। অবশেষে উদয়পুরের মহারাণা আপনার বক্ষ পাতিয়া দুর্বৃত্ত মোগলের সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও ভগবান্ ব্রজনাথের পবিত্র বিগ্রহকে স্বীয় রাজ্যমধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। উদয়পুরের ২২ মাইল পূর্ব্বোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের সেই পবিত্র মন্দির বিরাজিত। মন্দিরের সোপানাবলী মর্ম্মরপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত। সেই সোপানশ্রেণীর শ্বেতগাত্র বিধৌত করিয়া বুনাসনদ কলকলরবে প্রবাহিত হইতেছে। নাথদ্বার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের

একটি প্রধান তীর্থ; দেবমূর্ত্তি ব্যতীত তথায় দর্শনযোগ্য অন্য কোন বস্তু নাই। কৃষ্ণমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যেও স্থাপত্যবিদ্যার কোনরূপ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বচ্ছসলিলা পূতকারিণী যমুনার পবিত্র সৈকতভূমে কৃষ্ণের যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অনেকে বলেন সেই বিগ্রহই নাথদ্বারে আনীত ও সংস্থাপিত হয়। গয়ার পর্ব্বতকন্দরে দ্বারকার সুদূর উপকূলে এবং হৃদয়রঞ্জন বৃন্দাবনধামে যে সকল চিত্তবিনোদন চিত্র দৃষ্ট হয়, নাথদ্বারে সে সকল দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য; তথাপি প্রতিবর্ষে ভারতের নানা দিগ্দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া এই পবিত্রস্থান অলঙ্কৃত করে।

দুরাত্মা আরঙ্গজেব ব্রজধাম ছারখার করিতে ত্রুটি করে নাই। তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া যে পবিত্রস্থান বৈষ্ণবগণের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল, হিন্দুবিদ্বেষী দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সেই ব্রজধাম একেবারে শূন্য হইয়া পড়ে। সেই পাষণ্ড নররাক্ষসের রাক্ষসিক অত্যাচারে বৈষ্ণবেরা সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবমূর্ত্তি-রক্ষণার্থ ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। গজনীর মহম্মদের দারুণ অত্যাচারে ভগবান্ কৃষ্ণের কমলাসন বিকম্পিত হইয়াছিল সত্য, শ্রীহরিভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রভুর সম্মানরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভগবান্ ব্রজপতি স্বীয় প্রাচীন লীলাভূমি হইতে একেবারে বিতাড়িত হন নাই। হিন্দুরঞ্জন উদারমতি নীতিবিশারদ আকবর, জাঁহাগীর ও শাজিহান তাঁহাকে সেই পুরাতন মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, তাঁহারা সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বৈষ্ণবধর্ম্মের গুণগৌরবে বিমুগ্ধ হইয়া আপনাদের কৌলিকধর্ম্মের সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক একটি নূতন ধর্ম্ম উৎপাদনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলে, তাঁহাদের ধর্ম্মান্ধ স্বজাতীয়গণ সেই মহতী শিক্ষার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলে বীরকেশরী বাবরের বিশাল বংশপাদপ তত শীঘ্র পবিত্র ভারতভূমি হইতে সমুৎপাটিত হইত না; তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান একটি অভিনব জাতিতে সংবদ্ধ হইয়া ভারতকে শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিত। বোধ হয়, সেই নবজাতজাতি ভারতবাসীর দেহে যে প্রচণ্ড তেজ ঢালিয়া দিত, সপ্তসাগরের জলরাশির সাহায্যেও সে তেজ নির্ব্বাণ করিতে কেহ সমর্থ হইত না। ভারতমাতার দুরদৃষ্টবশে তাঁহাদের সে মহদুদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই।

নীতিবিশারদ মহামতি জাঁহাগীর মাতৃ-অংশে অর্দ্ধরাজপুত বলিয়া গণনীয়। এই কারণেই হিন্দুর প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি স্বীয় উদারনীতিক পিতার ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তৎপুত্র ধর্ম্মশীল শাজিহান পিতৃপদবীর অনুসরণ করেন নাই। তিনি শৈবধর্ম্মে একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সিদ্ধরূপনামা এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই কারণেই শাজিহানের রাজত্বকালে ভারতে শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। শৈবগণ রাজার বিশেষ অনুগ্রহপাত্র হইয়া বৈষ্ণবদিগের উপর নানারূপ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের উৎপীড়ন অসহনীয় হওয়াতে বৈষ্ণবগণ ভগবান্ হরির দেবমূর্ত্তি লইয়া ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাস্থানে প্রস্থান করেন। অবশেষে উদয়পুরের এক রাজকন্যার বিশেষ যত্নে ভগবান্ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অধিকদিন প্রভুকে নিজ আসনে স্থির থাকিতে হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই দুরাচার পাষাণহৃদয় আরঙ্গজেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে একেবারে চিরদিনের জন্য সেই পবিত্র কালিন্দীসৈকত হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। সেই সময় হইতেই হিন্দুগণ হিন্দুবিদ্বেষী নররাক্ষস আরঙ্গজেবকে কালযবন বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ব্রজবক্ষে দুরাত্মা আরঙ্গজেব কর্তৃক কত গোহত্যা ও কত ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দুর্ব্বৃত্ত যবনকুলাঙ্গার প্রভুকে বিতাড়িত করিয়া গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা দ্বারা ব্রজধাম ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির কলুষিত করিল। তাঁহার সেই পাশব ব্যবহার দর্শনে শিশোদীয়বীর রাণা রাজসিংহ দারুণ রোষে ও জিঘাংসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যবনসম্রাটের প্রতিকূলে আপনার তীক্ষ্ণ অসি সমুত্থিত করিলেন। রাণার জলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাজপুতবীরবৃন্দ দেবমূর্ত্তিকে যবনকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে আপনাদিগের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই সমস্ত আত্মত্যাগের প্রভাবে দুরাচার যবন হিন্দুদেবতার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। রাজপুতগণ ভগবান্‌কে কোটার মধ্য দিয়া রামপুর হইয়া মিবারে আনয়ন করিলেন। রাণার ইচ্ছা ছিল, তিনি প্রভুকে একেবারে উদয়পুরেই আনয়ন করেন; কিন্তু আগমনসময়ে অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইল না। মিবারের অন্তর্গত শিয়ার নামক পল্লীর ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথ চালিত হইতেছে, ইত্যবসরে রথচক্র ভূগর্ভে এরূপ গভীরতররূপে প্রোথিত হইল যে, কিছুতেই কেহ তাহার উদ্ধারে সমর্থ হইল না। তখন একজন শাকুনশাস্ত্রবিশারদ দৈবজ্ঞ উপস্থিত হইয়া কহিল, 'এইখানে থাকিতেই প্রভুর বাসনা হইয়াছে, নচেৎ তাঁহার রথচক্রের গতি প্রতিরুদ্ধ হইবে কেন?' দৈবজ্ঞের কথায় রাণার বিশ্বাস জন্মিল। তদনুসারে তিনি সেইখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। শিয়ারগ্রাম মিবারের ষোড়শ সর্দ্দারের অন্যতম দৈলবারা-সর্দ্দারের ভূমিবৃত্তির অন্তর্গত। দৈলবারা সর্দ্দার এই দেবানুগ্রহবার্ত্তা শ্রবণমাত্র আশু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একটি মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেব-সেবার জন্য সেই গ্রাম ও ভূমি-সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রাণা তাঁহার পাট্টা গ্রাহ্য করিলেন। তৎপরে ভগবান্ নাথজি যথাবিধানে রথ হইতে অবতারিত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন। সেই দিন হইতে শিয়ারগ্রাম নাথদ্বার নামে পরিচিত হইল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই একটি নগরমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।

নাথদ্বারের মনোহারিণী মূর্ত্তি সকলেরই চিত্তরঞ্জিনী। ইহার পূর্ব্বদিক্ সমুন্নত, পর্ব্বতপ্রাকারে সংরুদ্ধ; পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরপ্রান্ত বিধৌত করিয়া বুনাস নদ কল কল নাদে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদবলয়িত ও পর্ব্বতরক্ষিত প্রদেশের মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরির পবিত্র মন্দির বিরাজিত। এই স্থান পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। রাজপুতগণের বিশ্বাস, এই স্থানে একবার পদার্পণ করিলে ঘোরতর পাপাচারীও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে স্বর্গধামে গমন করিতে পারে। এ প্রদেশের সীমাবন্ধনীর মধ্যে রাজদণ্ডের আশঙ্কা নাই। ঘোরতর অপরাধী ব্যক্তিও নাথদ্বারের আশ্রয়গ্রহণ করিলে রাজা তাহাকে আর দণ্ড প্রদান করিতে পারেন না; তাহাকে দণ্ডপ্রদানে রাজা অধিকারী নহেন। এই স্থানে চিরশান্তি বিরাজমান। বিবাদ-বিসংবাদ, কলহ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন বৈষম্য এ স্থানে নয়নগোচর হয় না; সকলেই আনন্দময়- সকলের হৃদয়ই আধ্যাত্মিকভাবে আনন্দিত। নাথদ্বার একটি ক্ষুদ্র পল্লী বটে, কিন্তু ইহার চতুঃসীমার মধ্যে অসংখ্য লোক অবস্থিতি করিতে পারে। যাত্রিদলের বিশ্রামার্থ এই পল্লীর স্থানে স্থানে তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ আপন আপন উন্নতমস্তক দ্বারা গগন স্পর্শ করিয়া বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণবগণ সেই সকল স্নিগ্ধচ্ছায় তরুরাজির মূলদেশে বসিয়া নৈদাঘ মধ্যাহ্নের প্রখর তাপ হইতে শান্তিলাভ করে। কেহ সঙ্গীত, কেহ বাদ্য, কেহ বা নৃত্য, কেহ অমৃতময়ী জয়দেবপদাবলী পাঠ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে তন্ময়

করিয়া বুঝাইয়া দেয়। সংসারবিরাগীর পক্ষে এই স্থান যার-পর-নাই শান্তিপ্রদ, উদাসীনের শান্তির একমাত্র আস্পদ এবং হতাশ ব্যক্তির আশানিকুঞ্জ। যাহাকে সমস্ত জগৎ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, জগতে যাহার সুখের আশা-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, ভাগ্যদোষে যে ব্যক্তি পথের ভিখারী, সংসারে যাহার সুখের প্রস্রবণ চিরদিনের জন্য শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এই নাথদ্বার তাহার পক্ষেই একমাত্র বিরামপ্রদ আশ্রয়স্থল। অনেক মহাপুরুষ প্রীতিকরী কন্যা, ভগিনী, প্রেমময়ী ভার্য্যা এবং প্রাণস্বরূপ তনয়গণের স্নেহমমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই শান্তিনিলয়ে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে এই ধারণা, এই সংস্কার, এই বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে যে, এই স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিলে অন্তিমে প্রভু তাঁহাদিগকে আপন পাদপদ্মে স্থান প্রদান করিবেন। তাঁহা-দিগকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

মহাত্মা টড সাহেব বলেন, রাজপুতগণ যদি মহাদেবের বিকটধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শান্তিময় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচরণ করে, তাহা হইলে রাজপুতসমাজের অশেষ উপকার হইতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম্ম পরম শান্তিময়, কিন্তু শৈবধর্ম্ম মহাতেজে পরিপূর্ণ। রাজপুতবৃন্দের রাজনৈতিক উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে গেলে বৈষ্ণবধর্ম্মই শৈবধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। শান্তি সংসারের অভিলষিত বটে, কিন্তু যে শান্তি হইতে নরহৃদয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যাহা মানবের আলস্য ও জড়তার একমাত্র কারণ, সে শান্তি কদাচ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আজি রাজপুতগণ জড় ও নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর যদি তাহাদের শান্তিপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে রাজপুত নাম জগতে আর অধিকদিন স্থায়ী হইবে না; আজিও তাহাদের হৃদয়গহ্বরে যে বীর্য্যাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ গুপ্ত রহিয়াছে, চিরদিনের জন্য তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগৎকে শান্তি শিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু যাহা প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম, যাহা মানব সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে জগতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিময় বলা যায় না। বিষ্ণু জগৎপালক; যেখানে পালন, সেইখানেই নিধন। একদিকে যেমন পালন, অন্যদিকে তদ্রূপ নিধন। যে স্থলে দুই জনে স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তথায় এক জনকে নিধন না করিলে অন্যের পরিত্রাণের সম্ভব নাই। শান্তিস্থাপন করিতে হইলে অশান্তির বিনাশ অগ্রে আবশ্যক। ইহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে। এইরূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বিত হইলেই তাঁহাদের—শুদ্ধ তাঁহাদের কেন, জগতের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

একবিংশ অধ্যায়

বসন্তপঞ্চমী, ভানুসপ্তমী, শিবরাত্রি, আহেরিয়া, ফাগোৎসব, শীতলাষষ্ঠী, রাণার জন্মতিথি, ফুলদোল, অন্নপূর্ণা, অশোকাষ্টমী, রামনবমী, মদন-ত্রয়োদশী, নবগৌরী-পূজা, সাবিত্রী-ব্রত, রম্ভাতৃতীয়া, অরণ্যষষ্ঠী, রথযাত্রা, পার্ব্বতী-তৃতীয়া, নাগপঞ্চমী, রাখী-পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, পিতৃদেবতা, খড়্গপূজা, দশহরা, গণেশপূজা, লক্ষ্মীপূজা, দেয়ালী, অন্নকূট, ঝুলনযাত্রা, মকরসংক্রান্তি, মিত্রসপ্তমী।

মিবারে যে সকল পর্ব্বোৎসব প্রচলিত আছে এবং তথায় যেরূপ আচার-ব্যবহারাদি দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত অবগত হইলে মিবারবাসিগণের ধর্ম্মপরায়ণতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নে মিবারের কতিপয় পর্ব্ব ও আচার-ব্যবহারাদির বিষয় লিখিত হইল।

বসন্তপঞ্চমী।—যে মধুময় বসন্তকালে জীবকুলের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে, কোকিলের কলকণ্ঠ যখন জীবগণের হৃদয়-মন মাতাইয়া তুলে, সেই সময়েই মিবারে বসন্তপঞ্চমী নামক মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীই এই উৎসবের দিন। বঙ্গদেশে যে দিন বিদ্যা-দায়িনী বাগ্‌বাদিনীর পূজা হয়, সেই দিনই বাসন্তীপঞ্চমীর প্রশস্ত তিথি। এই উৎসবে রাজপুতগণ অশ্লীল ও জঘন্য ব্যবহার অবলম্বন পূর্ব্বক উন্মত্তভাবে নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়। সে দিন ইতরে ভদ্রে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। ইতর ব্যক্তিরা সিদ্ধিধুতুরা, গাঁজা, মদ, অহিফেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনপূর্ব্বক অশ্লীলভাষায় সঙ্গীত করিতে করিতে দলে দলে নগরের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অন্যসময়ে একটিমাত্র অপ্রিয়বাক্য উচ্চারণ করিতেও লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারা সম্মান-সম্ভ্রম ও লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সেই সকল ইতর লোকের সহিত অম্লানবদনে মিশ্রিত হন এবং তাহাদের সহিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইয়া পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজস্থানের চতুর্দ্দিকে এরূপ সার্ব্বজনীন আনন্দবেগ উচ্ছ্বলিত হইতে দেখা যায় যে, অসভ্য ভীলগণও আপনাদিগের নির্জ্জনবাস পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতবৃন্দের সহিত যোগদান করে। তাহাদের সেই প্রকার সহযোগে রাজপুতবৃন্দ আপন আপন হৃদয়ে পরম আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন।

ভানুসপ্তমী।—বাসন্তী পঞ্চমীর দুই দিন পরেই ভানুসপ্তমী নামক পর্ব্বোৎসব। প্রসিদ্ধি আছে, ঐ দিন ভগবান্ দিনমণির জন্মাহ। সূর্য্যবংশীয় রাণাগণ যে আপনাদিগের পবিত্র কুলের আদিপুরুষের জন্মদিন নানারূপ আনন্দোৎসবে অতিবাহন করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এই কল্যাণকর দিনে রাণা সৈন্যসামন্ত, সর্দ্দার ও পারিষদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া চৌগাঁ নামক একটি পবিত্রপ্রদেশে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা ভগবান্ সূর্য্যের অর্চ্চনা করেন। এই দিন জয়পুরে সূর্য্যপূজার কিছু বিশেষ আড়ম্বর হইয়া থাকে। কুশাবহরাজ এই দিবস সূর্য্যমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবতার অষ্টাশ্ব-যোজিত পবিত্র রথ বহির্ভাগে আনয়ন করেন। নাগরিক ও জানপদবৃন্দ সেই রথ চালিত করিয়া নগরের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না।

শিবরাত্রি।—মাঘ মাসের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে শিবরাত্রি কহে। হিন্দুমাত্রেই, বিশেষতঃ রাণা এই তিথিকে পরম পবিত্র জ্ঞান করেন। ঘোর পাপাত্মা ব্যাধ সুন্দরসেন যে দিন স্বীয় অজ্ঞানকৃত শিবার্চ্চনাফলে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কৈলাসধামে প্রস্থান করিয়াছিল, সেই দিন হিন্দুর যে অতি পবিত্র, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। রাণা ভারতে শিবের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত; সুতরাং সে দিবসে তাঁহার শিবার্চ্চনার বিশেষ আড়ম্বর দৃষ্ট হয়। রাজপুতবৃন্দ সেই দিন নিরম্বু উপবাসে অতিবাহিত করেন। শৈবমাত্রেই সেই পবিত্র দিনে কোনরূপ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হন না এবং সমস্ত রজনী জাগ্রদবস্থায় শিবপূজা দ্বারাই অতিবাহিত করেন।

আহেরিয়া।—বাসন্তিক মৃগয়াব্যাপারের সহিত ফাল্গুন মাসের প্রথমেই এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বদিন রাণা স্বীয় সর্দ্দার ও পরিচারকবৃন্দকে হরিদ্বর্ণের এক একটি অঙ্গরাখা প্রদান করেন। সেই রাজদত্ত সজ্জা পরিধান পূর্ব্বক তাঁহারা পরদিন দৈবজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট শুভলগ্নে রাণার সহিত বরাহশীকারার্থ নগর হইতে বহির্গত হন। সেই বন্যবরাহ হরজায়া ভগবতী গৌরীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হয়। জ্যোতিষিগণনার অনুসারে মৃগয়ালগ্ন নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া আহেরিয়ার অন্যতর নাম "মাহুরৎকা শীকার।" এই মহান্ মৃগয়াব্যাপারে রাজপুতবৃন্দ আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করেন। সে দিন যাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে, সে বর্ষে তাঁহার কিছুতেই মঙ্গল নাই; সে বৎসর তাঁহাকে নানা কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইবে। সেই জন্য কেহ শক্তিসত্ত্বে লক্ষ্যীভূত মৃগকে ত্যাগ করেন না; কেহ কেহ চরদ্বারা বরাহসমূহের বিজন বাসস্থান পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। পরন্তু মৃগ দৃষ্ট হইবামাত্র সকলেই তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পান। মিবারের সর্দ্দারেরা স্ব স্ব নির্ব্বাচিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক রাজা ও রাজপুত্রগণের সহিত সেই কঠোর মৃগয়ায় বহির্গত হন। প্রত্যেকেরই হৃদয়ে জিগীষাবৃত্তি সংবেগে বলবতী হইয়া উঠে। উদয়পুরের বিশাল উপত্যকাপ্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতগহ্বরে কিংবা বিজনবনের মধ্যে প্রায়ই মৃগগণ বিশ্রাম করিয়া থাকে। মৃগয়ার্থীরা প্রথম সেই গহন বন কিংবা পর্ব্বত কন্দরের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ঘোররবে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের গগনভেদী গর্জ্জনে, অস্ত্রের ঝণৎকার শব্দে এবং মদমত্ত অশ্বগণের হ্রেষারবে ভীত হইয়া বরাহকুল বিজনবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। তাহাদের সেইরূপ চেষ্টা প্রায়ই তাহাদিগের জীবননাশে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যদি একটি জন্তু প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে শীকারীরা তৎক্ষণাৎ তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করেন। তখন শীকারীরা একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন; স্ব স্ব প্রাণের দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না, আত্মীয়-স্বজনের মায়ামমতা বিস্মৃত হইয়া যান, উন্মুক্ত তরবারী কিংবা উদ্যত ভল্লহস্তে দ্রুতবেগে সেই পলায়মান বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহারা ধাবিত হন। তখন বন, উপবন, বৃক্ষ, শিলাস্তূপ কিংবা গিরিনদী কিছুই তাঁহাদিগের প্রচণ্ডগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা প্রাণপণে সেই হতভাগ্য জীবের পশ্চাদনুসরণ এবং ক্ষণকালের মধ্যেই তাহার উষ্ণ শোণিতে স্ব স্ব হস্তস্থ তরবারির বলবতী পিপাসা প্রশমিত করিতে সক্ষম হন। সেই শোণিতে প্রায়ই অশ্ব ও নরশোণিত মিশ্রিত হয়। মৃগয়াযাত্রাসময়ে রাজকীয় পাচক শীকারীদিগের অনুবর্ত্তী হয়। ভগবতী পার্ব্বতীর চিরশত্রু বরাহের মুণ্ড রাজপুতবীরের শাণিত অসি দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইবামাত্র পাচক তৎক্ষণাৎ নানা বেশবার মিশ্রিত করিয়া উহা রন্ধন করে। রন্ধন সমাপ্ত হইলে রাণা সেই মৃগয়া-সহচরগণের সহিত একত্র তাহা ভক্ষণ করিতে উপবিষ্ট হন। সেই আনন্দভোজনের সঙ্গে মানোয়ার-পিয়ালাও পরিত্যক্ত হয় না।

ফাগোৎসব।-ফাল্গুনমাস যত অতীত হইতে থাকে, মিবারবাসিগণের উৎকট আমোদ-প্রমোদও তত বৃদ্ধি হয়। নাগরিক ও জানপদবৃন্দ আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চারিদিকে ফাগ লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। আবীরের ছড়াছড়ি এবং পিচকারীর অবিরাম উচ্ছ্বাসে পথঘাট ও গৃহ-প্রাঙ্গণ যেন পঙ্কিল হইয়া উঠে। কাহারও দেহে একখানিও শ্বেত বা বিমল বস্ত্র দৃষ্ট হয় না। সকলেই যেন শোণিত-স্নাত, যেন কি ভয়াবহ শোণিতপাত-ব্যাপারে পরিলিপ্ত! শিরোদেশে কেশগুচ্ছ হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গই আবীর-লেপিত। যেন নরকুল নির্ম্মূল করিয়া জগতের কি এক একটি অদ্ভুত জীব তাণ্ডব-নৃত্য ও বীভৎস আমোদ-প্রমোদ করিয়া পৃথিবীকে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। আবালবৃদ্ধ সকলেই আবীর-লুণ্ঠিত; সকলেই কুঙ্কুম ও পিচকারী লইয়া দলে দলে পথে ঘাটে সানন্দে ভ্রমণ করিতেছে; এমন কি, যাহারা কখনও অন্তঃপুর পরিত্যাগ করে না, ভগবান্ সূর্য্যদেবও অন্য সময়ে যাহাদের মুখপদ্ম দেখিতে পান না, তাহারাও এই দিন অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া এই অদ্ভুত ফাগোৎসবে যোগদান করে।

মিবারবাসীরা সেই উৎসবকে ফাগোৎসব বলে। রাণা এই দিন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহিষী ও তৎসহচরীগণের সহিত আবীর-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হন। তখন কাহারও বিন্দুমাত্র লজ্জা থাকে না;—কাহারও বদনমণ্ডলে তিলমাত্রও বিষাদের ছায়া দৃষ্ট হয় না। সেই কমলিনীরূপিণী কামিনী-কুলে পরিবেষ্টিত হইয়া রাণা হোলী-ক্রীড়ায় অপার আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তুরগারোহণে হোলী-লীলাই অতি চমৎকারিণী। সর্দ্দার ও সামন্তগণ স্ব স্ব অশ্বে আরূঢ় হইয়া কুঙ্কুম ও আবীর লইয়া প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ফাগক্রীড়ায় মত্ত হন। কেহ অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় তুরঙ্গ চালিত করিয়া কুঙ্কুমরূপ শস্ত্র করে অপরকে আক্রমণ করিতেছে; সেই আক্রান্ত ব্যক্তিও আক্রমক অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত স্বীয় অশ্ব তাড়িত করিয়া তাঁহার আক্রমণ বিফল করিতেছেন; কোন স্থানে এক জনকে পাঁচ জন একত্রে আক্রমণ করিতেছেন, কোন স্থানে এক জন বলিষ্ঠ ও সুদক্ষ আরোহী অপর পাঁচ জনের প্রতিকূলে কুঙ্কুমপ্রক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুত-গতি ধাবিত হইতেছেন। আবার কোন স্থানে বা একত্র দশবিশ জন মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছেন। পিচকারী প্রোক্ষিপ্ত আবীর-সেকে কিংবা কুঙ্কুমপূত ফাগস্পর্শে সর্দ্দারেরা সবাহনে লোহিতবর্ণে সংলিপ্ত; যে দিন এই বীভৎস হোলী-লীলা সমাপ্ত হয়, সেই দিন দুর্গের ত্রিতল প্রাঙ্গণের উপরিদেশ হইতে অবিরাম নাগরাবাদ্য হইতে থাকে। সেই গম্ভীর ঢক্কাধ্বনি শ্রবণমাত্র সর্দ্দারেরা স্ব স্ব সৈন্য ও সামন্তবর্গের সহিত রাণার নিকট উপস্থিত হন। তখন রাণা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রসিদ্ধ চৌগাঁ-প্রাসাদে যাত্রা করেন। চৌগাঁ রাজপুতবৃন্দের একটি প্রধানতম রঙ্গভূমি। লীলাযুদ্ধ কিংবা কোন নূতন কৌশলের অভিনয় প্রদর্শনার্থ রাজপুতবৃন্দ ইহার মধ্যভাগে একত্র হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ।—প্রাঙ্গণ ছাদবিশিষ্ট। বিশাল স্তম্ভের উপরিভাগে সেই বিরাট ছাদ ধৃত।—চৌগাঁয়ের চতুর্দ্দিকে কোন প্রকার প্রাচীর নাই, সুতরাং উন্মুক্ত। রাণা সর্দ্দার ও পারিষদ্‌গণ সমভিব্যাহারে ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হইলে সর্দ্দারগণ তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলাকারে উপবেশন করেন। অতঃপর হরি-নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নানারূপ বাদ্যের সহিত তাঁহারা সমস্বরে হরিগুণগান করিতে থাকেন। ফলতঃ সেই সময় চারিদিকে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। কেহ সঙ্গীত, কেহ বাদ্য কেহ বা তালে তালে মাথা ঘুরাইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। আবার কেহ বা বিকটস্বরে আদিরসপূর্ণ অশ্লীল শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই আনন্দোল্লাসের প্রচণ্ড

উচ্ছ্বাসসময়ে রাজা, সর্দ্দার, সৈনিক কিছুই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কেহই সেই মহোৎসব-ব্যাপারে যোগ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। চৌগাঁর অভ্যন্তরে যেমন গীত-বাদ্য হইতে থাকে, অমনি তৎসঙ্গে হোলী-লীলা প্রচণ্ডভাবে সমারব্ধ হয়। অবশেষে সকলে এক একটি অদ্ভুত জীবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হন। তখন যাহারা তাঁহাদিগের সমক্ষে নিপতিত হয়, তাহাদিগকেই আবার আবীরে প্লাবিত করিয়া দেন। ভিন্নদেশীয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কেহ সেই কঠোর ব্যবহার হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না। ফাল্গুনমাসের শেষ পর্য্যন্ত এই উৎসব চলিতে থাকে। শেষ দিন রাণা স্বীয় সর্দ্দারগণকে খাণ্ডা-নারিকেল (খড়্গ ও নারিকেল) প্রদান করেন। সেই সকল খড়্গ সচরাচর কাগজ বা সূক্ষ্ম কাষ্ঠফলকে বিনির্ম্মিত।

ইহার পর চাঁচরপর্ব্ব।—চাঁচরে নগরের চতুর্দ্দিকে অগ্নিক্রীড়া হয়। দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা আবীরে পরিলিপ্তাঙ্গ হইয়া সেই সকল অগ্নি-কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে পিশাচবৎ নৃত্য করিতে থাকে। সমস্ত রাত্রি এই প্রকার বীভৎসলীলায় অতিবাহিত হয়। অতঃপর যতক্ষণ চৈত্রের প্রথম দিন সমাগত না হয়, তাবৎ তাহারা সেই আনন্দোৎসব হইতে বিরত হয় না। তাহার পর ভগবান্ দিনমণি মীনরাশিতে পদার্পণ করিলে রাজপুতবৃন্দ সেই লগ্নে স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব গাত্র-বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন। সেই দিন পরিচারকেরা স্ব স্ব প্রভুকে নানারূপ দ্রব্য উপহার প্রদানপূর্ব্বক পরমানন্দে অবস্থিতি করে।

শীতলা ষষ্ঠী।—এই উৎসবের দিন চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী। রাজপুতমতে শীতলাদেবী শিশু-সন্তানগণের রক্ষয়িত্রী। রাজপুত-মহিলারা স্ব স্ব সন্তানের কল্যাণকামনায় ঐ দিন শীতলাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হন। উদয়পুরের উপত্যকাপ্রদেশে একটি বিচ্ছিন্ন গিরিকূটের উপরিভাগে শীতলা-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। রাজপুতরমণীরা সেই মন্দিরে গমনপূর্ব্বক নানা উপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া অভীষ্ট-বরলাভান্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই শুক্লা ষষ্ঠী রাণা ভীমসিংহের জন্মতিথি। রাজপুতবৃন্দ স্ব স্ব জন্মদিনে এক একটি উৎসব করিয়া থাকেন। ইউরোপেও জন্মতিথিমহোৎসব প্রচলিত আছে। যে দিন অনন্ত কালসাগরে একটি নূতন তরঙ্গের উত্থান হইয়া থাকে, যে দিন দশমাসের কঠোর যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জগতের বক্ষঃস্থলে উপনীত হওয়া যায়, সে দিন যে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিবস, তাহা জগতের সমস্ত সভ্যজাতিরই স্বীকার্য্য। দেবতার সমীপে রাণার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া মিবারের অধিবাসিবৃন্দ নানা উপহার লইয়া উদয়পুরের রাজভবনে উপস্থিত হয়। এই উৎসব অন্তঃপুরমধ্যে আচরিত হইয়া থাকে; সুতরাং অন্য লোকে তাহা নেত্রগোচর করিতে পায় না। সেই দিন রাণা নব-বসনভূষণে সমলঙ্কৃত হইয়া নানারূপ উপাদেয় ভক্ষ্য ও পেয়দ্রব্য সেবন করেন। রাজপুরীর সমস্তাৎ নৃত্যগীতে আনন্দময় হয়। অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা মঙ্গলগীত গান করিয়া ঈশ্বরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতে থাকেন।

ফুলদোল।—যে সময় হিন্দুরাজচূড়ামণি বিক্রমাদিত্যের চান্দ্রসৌর বর্ষারম্ভ হয়, মিবারেও সেই সময় ফুলদোল আরম্ভ হইয়া থাকে। আশ্বিনের নবরাত্রিপর্ব্বে যে সকল আনুষ্ঠানিক বিধি সমাপিত হয়, ফুলদোলে তাহার অধিকাংশই দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বের প্রথম অনুষ্ঠান খড়্গ-পূজা। রাণার রাজভবনে এই পূজাবিধি শেষ হয়; কিন্তু ভগবতী বাসন্তীর অর্চ্চনার্থ যে সমস্ত উৎসব সমাচরিত হয়, খড়্গার্চ্চনা তাহার নিকট অতি সামান্য বলিয়া অনুমিত হইবে। মধুময় বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয়ে নিখিল জগৎ মধুময় বলিয়া অনুমিত হয়। গগনমার্গে চন্দ্রমা মধুময় কিরণজাল বর্ষণ করিতে

থাকেন, অন্তরীক্ষে বায়ু মধু বহন করিতে থাকেন, মর্ত্ত্যে কুসুমকুন্তলা বনদেবী মধু বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ এই সময় সমস্তই মধুময়। এই মাসে রাজপুতগণের গৃহে গৃহে আনন্দের উৎস উঠিতে থাকে; কমলারূপিণী রাজপুত-মহিলারা এবং মদনবিজয়ী পুরুষগণ কুসুমালঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়া কুসুমোদ্যানে কিংবা প্রমোদকাননে গমন করেন। তথায় অসংখ্য পুষ্পবতী লতিকা ও কুসুমিত তরুরাজির সুরভিত স্নিগ্ধচ্ছায় কুঞ্জের অভ্যন্তরে বসিয়া সকলে আনন্দগীত গান করেন। তখন তাঁহাদিগকেও এক একটি কুসুমসদৃশ বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহাদের শিরোদেশে কুসুম-মুকুট, গলদেশে কুসুমহার, সর্ব্বাঙ্গে কুসুমের আভরণ। রমণী ও পুরুষগণ স্ব স্ব শ্রেণীর অন্তর্লীন হইয়া সানন্দে নানারূপ আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হন। কেহ কেহ উচ্চ বৃক্ষশাখায় কুসুমমণ্ডিত দোলা বন্ধন পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া দুলিতে থাকেন, কোন মহিলা আপনার কোন সহচরীকে রাধা সাজাইয়া স্বয়ং রাধামোহন নন্দনন্দন কৃষ্ণ-সাজে সজ্জিত হন এবং অপরা সখীরা হাত ধরাধরি করিয়া সেই অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত করিতে করিতে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। অদূরে মোহনমূর্ত্তি পুরুষগণও আপনাদের শ্রেণীর মধ্যে ঠিক ঐরূপ লীলার অভিনয় করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ রাধা, কেহ মুরলীবদন, কেহ বা বৃন্দা বা চন্দ্রাবলীর সাজে সজ্জিত হইয়া নৃত্যগীত-সহকারে দোলমঞ্চে দুলিতে আরম্ভ করেন। কেহ বা সুললিত তানে অমৃতময়ী জয়দেব পদাবলী গান করিয়া সেই দোলমঞ্চকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন। পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা দোলমঞ্চ সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাঁহারা বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদের দুলিবার সাধ মিটাইয়া থাকেন।

অন্নপূর্ণা।—ভগবান্ মরীচিমালী মেষরাশিতে পদার্পণ করিলে রাজপুতগণের মধ্যে ভগবতী অন্নপূর্ণার উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদিগের দেশের ধনধান্যপ্রদায়িনী অন্নপূর্ণার যে প্রকার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, রাজস্থানেও ঠিক তদ্রূপ ভাবে গঠিত হইয়া থাকে। সিংহাসনোপরি আদ্যাশক্তি দ্বিভুজা অন্নদামূর্ত্তি—বামহস্তে অন্নপূরিত স্বর্ণপাত্র,—দক্ষিণে রৌপ্যময়ী দর্ব্বী, সম্মুখে মঙ্গলময় যোগীশ্বর সদাশিব অন্নভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। আদ্যাশক্তি প্রকৃতির পুরোভাগে জগতের কল্যাণকামনা করিয়া পুরুষপ্রবর স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজিত। সেই যুগলমূর্ত্তি নেত্রগোচর করিলে ভক্তি ও আনন্দে হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া যুগলমূর্ত্তির চরণকমলে আশ্রয় লইতে অভিলাষ হয়।

হরপার্ব্বতীর এই প্রকার প্রতিমা গঠিত হইলে রাজপুতগণ তৎসম্মুখে একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যববীজ বপন করেন। কৃত্রিমতাপের সাহায্যে সেই সমস্ত উপ্ত বীজ হইতে একদিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। তখন রাজপুতমহিলারা পরস্পরের হাত ধরিয়া কলকণ্ঠরবে ভগবতী গৌরীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে করিতে মণ্ডলাকারে সেই প্রতিমা ও যবক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তাঁহারা সেই সকল যবাঙ্কুর লইয়া স্ব স্ব আত্মীয়স্বজনগণকে প্রদান করেন। যাঁহাদিগকে প্রদান করেন, তাঁহারা উহা স্ব স্ব উষ্ণীষে ধারণ করিয়া থাকেন। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে দেবীর পূজা করেন।

গৌরীদেবীর পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে স্নাপিত করিবার জন্য পেশোলা-সরোবরে লইয়া যাইতে হয়। তৎপূর্ব্বে রাজপুতবরাঙ্গনারা দেবীকে একবার বরণ করিয়া থাকেন। সরোবর-যাত্রার উদ্যোগ হইতে থাকিলেই এ দিকে বরণেরও আয়োজন হইতে থাকে। হরিণনয়না কোকিল-কণ্ঠী রাজপুতবালাগণ বরণডালা করে লইয়া মোহন সঙ্গীত সহকারে প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিতে

থাকেন। বয়ণ শেষ হইলে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া নাগরা-বাদ্য হইতে আরম্ভ হয়। সকলেই তখন বুঝিতে পারেন যে, দেবীর নৌকাযাত্রার উদ্যোগ হইতেছে। সেই সমুচ্চ বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইবামাত্র একলিঙ্গের উপরিভাগে গম্ভীররবে কামান গর্জ্জিয়া উঠে। সেই ঘোরনিঃস্বন শ্রবণমাত্র নাগরিকবৃন্দ নানারূপ মোহনবেশ পরিগ্রহ করিয়া ত্বরিতপদে পেশোলার তটে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন।

এই দিন পেশোলাহ্রদের সৌন্দর্য্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ তটবর্ত্তী সমুচ্চ চত্বরের শিরোদেশে রাণা স্বীয় সর্দ্দারগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীর আগমন-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন। ঢাক, ঢোল, নাগরা প্রভৃতি নানারূপ বাদ্যের সহিত দেবমূর্ত্তি সেই স্থলে আনীত হয়। তখন নাগরিকগণ দেবীর নৌকারোহণ দর্শন করিবার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে সরোবরতটে দণ্ডায়মান থাকেন। পূর্ব্বকথিত চত্বরের সম্মুখেই বিস্তৃত ঘাট,—ঘাটের সোপানাবলী সুদৃশ্য শ্বেতমর্ম্মরে গঠিত। সোপানপংক্তির যে স্থলে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই স্থানেই রূপবতী রমণীমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নেত্রগোচর হয় না। সেই সকল রাজপুতকামিনীর পরিধানে নানাবর্ণের সুরঞ্জিত বস্ত্র; সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণরত্নবিভূষণ, ভ্রমরবিনিন্দিত কুন্তলজালে কুসুমমালা বিরাজিত। তাঁহাদের মুখশশী প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ মৃদুহাস্যে বিশোভিত। পেশোলার ঘাট এইরূপ লাবণ্যবতী রমণীমণ্ডলীতে পরিশোভিত। বিস্ময়ের বিষয়, সেই রমণীমণ্ডলের মধ্যে একটিমাত্র পুরুষও নেত্রগোচর হয় না। এই শুভদিনে পেশোলার তটভূমি যে কি মোহনবেশ ধারণ করে, তাহা বর্ণন করিয়া নির্দ্দেশ করা দুরূহ; কল্পনাপথেও সে চিত্র আনয়ন করিতে পারা যায় না। নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই যথাসাধ্য বসন-ভূষণ ধারণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া থাকে। তাহাদের সকলেরই অধরে মৃদু হাস্য, নেত্রপদ্মে আনন্দবিভা, বদনে অমৃতময়ী আনন্দগীতি। বসন্তকালীন গগনমণ্ডল পরিষ্কার;—মেঘের চিহ্নমাত্রও নেত্রগোচর হয় না; পেশোলাও বিমল, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। তাহার হৃদয়ে—স্বচ্ছবক্ষে বিমলগগনের এবং তীরবর্ত্তী অগণ্য লোক, তরুরাজি ও অট্টালিকাসমূহের ছায়া প্রতিবিম্বিত হওয়াতে মনোহারিণী শোভা সম্পাদিত হয়। আহা! তাৎকালিকী শোভা দর্শনে বোধ হয় যেন, স্বচ্ছ জলরাশির অভ্যন্তরে একটি নূতন রাজ্য সৃষ্ট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে লোকের জনতা বৃদ্ধি হয়। এত জনতা, তথাপি কোনরূপ বিশৃঙ্খলা, গণ্ডগোল বা বিবাদ-বিসংবাদ থাকে না। সকলেই শান্ত, স্থির ও গম্ভীর। সকলেই সোৎসুকচিত্তে ভগবতী পার্ব্বতীর আগমনপ্রতীক্ষা করিয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে গভীর বাদ্যধ্বনি সমুত্থিত হয় ও সেই সঙ্গে সেই চত্বরের নিম্নদেশে একটি প্রকাণ্ড জনতাও দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তাহার মধ্যদেশে দেবীমূর্ত্তি বিরাজিত। দেবীর পরিধান পীতবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ কাঞ্চন-মৌক্তিকভূষণে ভূষিত। প্রতিমার দুই পার্শ্বে দুইটি সুরসুন্দরী চামরব্যজন করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে অসংখ্য রূপবতী কামিনী রৌপ্যদণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে অমৃতময়ী সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। দেবী-প্রতিমা উপস্থিত হইবামাত্র রাণা সদলে দণ্ডায়মান হন। অতঃপর বাহকগণ প্রতিমাকে সরোবরের তীরস্থিত নির্দ্দিষ্ট রত্নাসনে স্থাপন করে। তখন উপস্থিত সকলে সাষ্টাঙ্গে দেবীপদে প্রণাম করিলে রাণা স্বীয় পারিষদগণের সঙ্গে তরণীসমূহের উপরিভাগে আসনগ্রহণ করেন। রাজপুতমহিলারা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া তানলয়শুদ্ধ মধুর স্বরে গান ও তালে তালে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের সেই নয়নরঞ্জন নৃত্য দর্শন এবং শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দর্শকগণ সহস্র সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। রাজপুতমহিলারাও মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদের সাধুবাদ গ্রহণ করেন।

সেই দিব্যাঙ্গনাগণের মধ্যে একটিমাত্রও পুরুষ নেত্রগোচর হয় না। সেই রমণীমণ্ডলীর মধ্যে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। কেহ সেই পবিত্রাচারের ব্যভিচার করিলে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়।

দেবীর স্নানের আয়োজন হইলে শুভলগ্ন দেখিয়া কাষ্ঠমঞ্চ হইতে তাঁহাকে অবতারণপূর্ব্বক পবিত্র বারিতে সুচারুরূপে স্নাপিত করিতে হয়। যতক্ষণ দেবী সেই সরোবরকূলে অবস্থিত থাকেন, তাবৎ তাঁহাকে স্নান করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর স্নানশেষ হইলে পূর্ব্ববৎ সমারোহের সহিত দেবী পুনরায় প্রাসাদে নীত হন। তখন রাণা স্বীয় সর্দ্দারগণের সহিত মিলিত হইয়া সরোবরের ধারে তরণীযোগে ভ্রমণপূর্ব্বক অন্যান্য ঘাটে দেবীর স্নান দর্শন করেন। সে দিন পেশোলার চারিদিকেই অসংখ্য দেবী-প্রতিমা ঐ প্রকারে স্নাপিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে দিবাভাগ অতীত হয়। রাণা সরোবরের চতুর্দ্দিকে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া দিবা অতিবাহিত করেন। ক্রমে সন্ধ্যার তামসী ছায়া পেশোলার নীলজলে পতিত হইয়া নিবিড়তর করিলে শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রমাকলা গগনপ্রান্তে দর্শন প্রদান করে। তখন রাণা সগণে রাজভবনে প্রত্যাগমন করেন। তিন দিন পর্য্যন্ত দেবীর পূজা হয়; চতুর্থ দিবসে অগ্নিক্রীড়ার সহিত উৎসব পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

অশোকাষ্টমী।—এই তিথি শোকনাশিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দিন ভগবতী বিশ্বমাতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। রাণা এই দিন স্বীয় সর্দ্দার, সামন্ত ও পারিষদ্‌বর্গের সহিত চৌগাঁ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক রাজপুতই এই দিন স্ব স্ব কুলদেবতা শোকনাশিনী ভগবতী শাকম্ভরীর অর্চ্চনায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

রামনবমী।—অশোকাষ্টমীর পরদিন রামনবমী তিথি। এই শুভদিনে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে সূর্য্যবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মরধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বংশধরেরা যে এই দিনকে পরমপবিত্র জ্ঞান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। রামনবমীতে যুদ্ধাস্ত্র ও গজাশ্বের পূজা হইয়া থাকে। রাণা এই দিন চৌগাঁপ্রাসাদে মহা সমারোহের সহিত উপস্থিত হন। সেখানে নানারূপ আমোদপ্রমোদ হয়। এই দিন ভগবান্ রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে যাহা কিছু করিতে পারে, তাহাতেই তাহার মহা পুণ্যলাভ হয়। বিশেষতঃ উপবাসী থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিলে এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মদনত্রয়োদশী।—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয়া ত্রয়োদশীকে মদনত্রয়োদশী কহে। এই দিন হিন্দুগণ মদনের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশীতে পূজার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু রাজপুতগণের মতে এই দিনই বিশেষ প্রশস্ত। মধুময় মধুমাস বিদায় লইয়াছে, গ্রীষ্মের প্রখর আতপতাপের সহিত সন্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পুষ্পাভরণা বনদেবীর কুন্তলগুচ্ছ হইতে সুগন্ধি পুষ্পকুল এক একটি করিয়া বৃন্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু ফুলেশ্বরী চামেলী প্রকৃতির অঙ্গে সমভাবে বিরাজ করিতেছে। এমন সময় রমণীকুল চামেলীপুষ্পের মাল্যদাম গ্রহণ করিয়া আপনাদের ভ্রমরবিনিন্দিত চিকুরজালে পরিধানপূর্ব্বক মীনকেতনের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন। মহামতি টড সাহেব স্বচক্ষে এই উৎসব দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজপুতমহিলারা যেরূপ ভক্তি সহকারে কন্দর্পের আরাধনা করেন, ভারতবর্ষে অন্য কোন প্রদেশের কামিনীগণকে সেরূপ ভক্তিসহকারে মদনের পূজা করিতে দেখা যায় না। মিবারকামিনীগণ পূজান্তে ভক্তিসহকারে কন্দর্পদেবের স্তব পাঠ করিয়া থাকেন।*

* হিন্দুগণের সংস্কার এই যে, স্তবস্তুতি সহ মদনের পূজা করিলে সে বর্ষে আধিব্যাধিভয় দূর হয়।

নবগৌরীপূজা।—হিন্দুগণের মতে বৈশাখমাস পরম পবিত্র। এই মাস ভগবান্ কৃষ্ণের অতি প্রিয়। এই মাসে যিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিতে পারেন, তিনি অন্তে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজপুতগণের মধ্যে এই পবিত্র মাসে একটিমাত্র উৎসব হয়; তাহাও আবার তত সমারোহপূর্ণ নহে। ইহাকে নবগৌরীপূজা বলে। এই পূজা সমারব্ধ হইবার অগ্রে মিবারের ষোড়শ প্রধান সর্দ্দার স্ব স্ব অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মহাসমারোহসহকারে রাণার সঙ্গে পেশোলাতীরবর্ত্তী প্রশস্ত চত্বরে উপস্থিত হন। রাণার এই যাত্রাকে 'নাগরা কা আসোয়ার' কহে। এই দিন যথাবিধি ভগবতী গৌরীকে স্থাপিত করিয়া সকলে পূর্ব্ববৎ আমোদ করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বটি সম্পূর্ণ নূতন। রাণা ভীমসিংহ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই পর্ব্বের প্রতিষ্ঠা করেন। মিবারীগণ এই নবোৎসবকে হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই প্রকাশ আছে যে, যে বৎসর এই উৎসব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর পেশোলার জলরাশি সহসা মহাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সেই আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে মিবারের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল; তাহাতে নগরের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী বিনষ্ট হয় এবং বিস্তর ধনরত্ন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। উক্ত বিপ্লবের দিন হঠাৎ রাণার একটি পুত্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু নাগরিকবৃন্দ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই নব প্রতিষ্ঠিত উৎসবের প্রতি দোষারোপ করেন। রাণা তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনি উৎসবের দিন স্বীয় সর্দ্দারগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তরণীযোগে পেশোলার বিশাল বক্ষে প্রফুল্লচিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সর্দ্দারগণ দ্বারাই তরণী চালিত হয়। নৌকাখানি মহাবেগে চালিত হইয়া পেশোলার নিবিড় নীল জলরাশি আলোড়ন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। এই প্রকারে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমোদ-প্রমোদ করিয়া রাণা ও তাঁহার সর্দ্দারেরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করেন। এই নব উৎসব উপলক্ষে বাসন্তী অন্নপূর্ণার ন্যায় ভগবতী পার্ব্বতী দেবীর অর্চ্চনা সমাপিত হয়।

সাবিত্রী-ব্রত।—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রীব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত রমণী এই পর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া সতীশিরোমণি সাবিত্রীর পুণ্যকথা শ্রবণ ও তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কদাচ বৈধব্যযন্ত্রণার দারুণ কষ্ট প্রাপ্ত হন না। মিবারের রাজপুতমহিলারা উক্ত দিবসে একটি নির্দ্দিষ্ট বটমূলে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে যথোপচারে সাবিত্রীর পূজা ও তাঁহার পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া থাকেন।

রম্ভা-তৃতীয়া।—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। রম্ভা ভগবতী পার্ব্বতীর মূর্ত্তিভেদ। তিনি যে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ মূর্ত্তিতে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, ইহা তাহারই অন্যতম। রাজপুতমহিলারা ধন ও সৌভাগ্যলাভের কামনায় শতপত্রী-পুষ্প দ্বারা এই দিন দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

অরণ্যষষ্ঠী।—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে দেবসেনা ভগবতী ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনা হয়; ইহারই নাম অরণ্যষষ্ঠী। এই পর্ব্বোপলক্ষে পুত্রার্থিনী বা পুত্রমঙ্গলার্থিনী হিন্দুনারীরা বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বট বা অশ্বত্থমূলে দেবীর অর্চ্চনা করেন। বঙ্গদেশে এই উৎসবে যেরূপ আড়ম্বর হয়, মিবারে সেরূপ আড়ম্বর দৃষ্ট হয় না।

রথযাত্রা।—বৈশাখে চান্দন, জ্যৈষ্ঠে স্নান, আষাঢ়ে রথারোহণ, শ্রাবণে শয়ন, ভাদ্রে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, আশ্বিনে বামপার্শ্বপরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকে উত্থান, অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, পৌষে পুষ্যস্নান, মাঘে শাল্যোদন, ফাল্গুনে দোলারোহণ এবং চৈত্রে মদনভঞ্জিকা-যাত্রা; পুরাণে ভগবান্ বিষ্ণুর এই দ্বাদশ যাত্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আষাঢ়মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান্ বিষ্ণুর রথযাত্রোৎসব হয়।

এই উৎসবে রাজপুতগণ দোল বা ঝুলনযাত্রার ন্যায় বিশেষ আড়ম্বর করেন না; ঝুলন ও দোলযাত্রার ন্যায় ইহাতে অপরিমিত ব্যয় করিতেও দেখা যায় না।

পার্ব্বতী-তৃতীয়া।—শ্রাবণমাসের শুক্লা তৃতীয়াকে পার্ব্বতী-তৃতীয়া কহে। কিংবদন্তী আছে, এই দিন গিরিরাজনন্দিনী ভগবতী গৌরী ভগবান্ আশুতোষের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন। রাজপুতবৃন্দ এই পর্ব্বকে পরম পবিত্র ও অবশ্যপালনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, এই দিবসে নারীগণ ভক্তিসহকারে গৌরীর অর্চ্চনা করিলে দেবী তাঁহার সর্ব্বকাম পূরণ করিয়া তাঁহাকে চরমে স্বীয় সহচরী করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজপুত-মহিলারা ভক্তিসহকারে ঐ দিন দেবীর অর্চ্চনা করেন. রাজপুতপুরুষগণও এ ব্রত পালন করেন; তাঁহাদের মতে এই পর্ব্ব যার-পর-নাই পবিত্র। ভূমি অধিকার কিংবা পরিত্যক্ত গৃহে পুনরাগমনবিষয়ে তাঁহাদের মতে ইহা একটি অতি শুভ পবিত্র দিন। যখন বৃটিশ-শাসনের সহিত মিবারের মৈত্রীবন্ধন হয়, তখন নির্ব্বাসিত মিবার-বাসীরা এই পুণ্য তিথিতে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই দিন প্রত্যেক রাজপুতই রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। জয়পুরের রাজা এই উৎসব উপলক্ষে স্বীয় সর্দ্দারদিগকে রক্তবর্ণের এক একটি পরিচ্ছদ প্রদান করেন। উদয়পুর অপেক্ষা জয়পুরে এই ব্রত উপলক্ষে অধিক সমারোহ দৃষ্ট হয়। জয়পুরবাসিনী রাজপুতবালারা ভগবতী গৌরীর একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত ও তাহাকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া মধুরসঙ্গীত সহকারে তাহা আপনাদিগের স্কন্ধে বহন করেন। রাণা সর্দ্দারগণ সমভিব্যাহারে সেই রমণীকুলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। এই উৎসব উপলক্ষে সকল রাজপুতই আপন আপন কন্যাকে এক একটি লোহিতবর্ণ সজ্জা প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সে দিনের সজ্জা দর্শন করিলে দর্শকগণকে বিমোহিত, বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাগপঞ্চমী।—শ্রাবণমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। এই তিথিতে নাগজননী ভগবতী মনসার অর্চ্চনা হয়। অবিরাম জলবর্ষণে মাঠ-ঘাট পরিপূর্ণ হইলে সর্পকুল গ্রামের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং এই সময়ে নাগগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। ভগবতী মনসা নাগেশ্বরী ও বিষহরী। উক্ত পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে পারিলে লোকের নাগভয় বিদূরিত হয়। এই জন্য হিন্দুমাত্রেই যথাবিধানে জগদ্গৌরী মনসার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। উদয়পুরে মনসা-পূজার বিশেষ আড়ম্বর নাই।

রাখীপূর্ণিমা।—শ্রাবণমাসের পূর্ণিমাকে রাখীপূর্ণিমা বলে। এই তিথিতে মিবারবাসীরা মহোৎসব করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দুর্ব্বাসা ঋষির উপদেশানুসারে শ্রবণা বিঘ্ন-বিপদ্ দূরীকরণার্থ আপন প্রকোষ্ঠে একগাছি বলয় ধারণ করিয়াছিলেন। উহাকেই রাজপুতগণ রাখীবলয় কহেন। রাজপুতজাতির মতে কেবল ধর্ম্মযাজক ও স্ত্রীজাতিই এই বলয়বিতরণে অধিকারী, তদ্ব্যতীত আর কেহ দিলে উহা বিধিসিদ্ধ হয় না। রাজপুত রমণীরা যাঁহাকে ভ্রাতৃবন্ধনে সংবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, আপনাদিগের সহচরী বা কুলপুরোহিতদিগের দ্বারা তৎসমীপে ঐ রাখীবলয় প্রেরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ সম্মানলাভ করেন, তাঁহারাও যথানিয়মে ইহার প্রতিদান-প্রদানে ত্রুটি করেন না। মিবার-ইতিবৃত্তে রাখী-বন্ধনবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যেমন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভগিনীরা ভ্রাতৃগণকে নব-বস্ত্র প্রদান করেন, রাজপুত-মহিলারাও সেইরূপ উক্ত রাখীপূর্ণিমা তিথিতে আপনাপন ভ্রাতাকে নব-বস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া থাকেন।

জন্মাষ্টমী।—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐ তিথির নাম জন্মাষ্টমী। হিন্দুমতে এই তিথি পরম পবিত্র। রাণা ঐ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সর্দ্দার ও পারিষদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া চৌগাঁ-প্রাসাদে গমন করেন। তৃতীয়া হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত ক্রমাগত ছয় দিবস তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তথায় নানা উপচারে পূজা করিয়া থাকেন। অষ্টমীর প্রাতঃকাল হইতে উদয়পুরের প্রত্যেক গৃহ উৎসবে পরিপূর্ণ হয়। সকলেরই গাত্রবস্ত্র হরিদ্রাসিক্ত, মুখে সকলেরই হরিনাম-সংকীর্ত্তন; এই দিন মিবাররাজ্য গীতবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই সময়ে রাণা আপনার পিতৃদেবতাগণের উদ্দেশে এক পক্ষ তর্পণ করিয়া থাকেন। আরানামক নগরে রাণার পিতৃপুরুষদিগের এক একটি সমাধিমন্দির আছে, রাণা এই সময়ে তথায় গমনপূর্ব্বক ধূপ, দীপ, পুষ্পমাল্য ও নৈবেদ্যাদি দিয়া তাঁহাদের পূজা করেন এবং পুষ্পমাল্য দ্বারা সেই সকল মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ সজ্জিত করিয়া দেন। রাণা ব্যতীত মিবারের অন্যান্য সর্দ্দারেরাও এই সময় পিতৃদেবতাগণের উদ্দেশে পূজা করিয়া থাকেন।

খড়্গপূজা।—এই উৎসব রণদেবতার উদ্দেশে আচরিত হয়। খড়্গের পূজা করাই উৎসবের উদ্দেশ্য। ইহার নাম নবরাত্রি। আশ্বিন মাসের প্রথম দিবস হইতে এই পূজা প্রারব্ধ হয়। সেই দিন রাণাকে উপবাসী থাকিতে হয়। প্রভাতে স্নানানন্তর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া খড়্গ-পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। গিহ্লোটবংশের প্রসিদ্ধ দ্বিধার অসি এই সময়ে অস্ত্রাগার হইতে বহির্ভাগে আনয়নপূর্ব্বক তাহার পূজা করা হয়। অতঃপর রাণা স্বীয় সর্দ্দারবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সেই পবিত্র অসিকে কিষণগোল নামক একটি প্রসিদ্ধ তোরণদ্বারে আনয়ন করেন। সেই তোরণদ্বারের পার্শ্বদেশেই ভগবতী অষ্টভুজাদেবীর পবিত্র মন্দির বিরাজিত। রাজস্থানে রাজযোগী নামে এক যোগিসম্প্রদায় আছেন; আবশ্যকমত তাঁহারা সমরে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই মন্দিরের দ্বারদেশে ঐ সম্প্রদায়ের রাজযোগী স্বীয় অনুগত মহান্ত ও অপরাপর যোগিবৃন্দের সহিত উপস্থিত হইয়া রাণার হস্ত হইতে সেই অসি গ্রহণ করেন এবং দেবীর পুরোভাগে স্থাপনপূর্ব্বক অতি সতর্কতার সহিত তাহার রক্ষাবিধান করেন। সেই দিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় নগরের ত্রিদ্বারমঞ্চ হইতে নাগরাধ্বনি হইতে আরম্ভ হয়। ঐ ধ্বনি দ্বারা এক প্রকার সঙ্কেত প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সঙ্কেতশব্দ শ্রবণমাত্র রাণা স্বীয় সর্দ্দার ও সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহিষশালার দিকে গমন করেন এবং তন্মধ্য হইতে একটি মহিষ বাহির করিয়া যুদ্ধাশ্বের উদ্দেশে বলিপ্রদান করেন। অতঃপর তিনি সদলে সেই চতুর্ভুজাদেবীর মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং রাজযোগীর পার্শ্বেই আসনগ্রহণ করিয়া তাঁহার হস্তে দুইটি রৌপ্যমুদ্রা ও একটি নারিকেল অর্পণ করেন এবং যথাবিধানে সেই অসির পূজা করিয়া আপনার আবাসভবনে পুনঃপ্রস্থিত হন।

দ্বিতীয় দিন প্রথম দিবসের ন্যায় রাণা সদলে চৌগাঁ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া একটি মহিষ উৎসর্গ করেন। উদয়পুরের তোরণপাল নামক তোরণদ্বারসম্মুখে সেই দিবস আরও একটি মহিষ বলিদান করা হয়। সায়ংকালে রাণা দেবীমন্দিরে গমন করেন। তথায় অনেকগুলি ছাগ ও মহিষ উৎসর্গীকৃত হয়।

তৃতীয় দিন দিবার প্রথমভাগে রাণা চৌগাঁ-প্রাসাদে গমনপূর্ব্বক একটি মহিষ বলিদান করিয়া বৈকালে ভগবতী হর্ষদা মাতার পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় পাঁচটি মহিষ বলি প্রদত্ত হয়। চতুর্থ দিন পূর্ব্ববৎ রাণা চৌগাঁ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া একটি মহিষ উৎসর্গ করেন। তৎপরে সদলে চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে গিয়া দেবীপূজাসমাপনান্তে রাজযোগীকে শর্করা ও কুসুমমালা উপহার প্রদান করেন। সেই মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড যূপকাষ্ঠে একটি মহিষ নিবদ্ধ থাকে; রাণা সেই

যজ্ঞীয় পশুকে স্বহস্তে বধ করেন। এই বলিদানকার্য্যে রাণার বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ পায়। মন্দিরের অনতিদূরে সেই মহিষ যূপবদ্ধ থাকে। রাণা বাহকগণের স্কন্ধস্থিত একখানি সিংহাসনের উপরিভাগে বসিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক অব্যর্থ সন্ধানে সেই পশুকে সংহার করিয়া ফেলেন।

পঞ্চম দিনে চৌগাঁ-প্রাসাদে যথাবিধি বলিদানের পর রাণার আজ্ঞায় তথায় গজযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৎপর তিনি সদলে ভগবতী আশাপূর্ণার মন্দিরে গমন করেন। তথায় একটি মহিষ ও একটি মেষ বলি প্রদত্ত হয়। অতঃপর রাণা চৌহানকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ দিন রাণা যথাবিধি চৌগাঁ-প্রাসাদে উপস্থিত হন বটে, কিন্তু সে দিন তথায় কোন প্রকার বলির আয়োজন হয় না। অপরাহ্নে চতুর্ভুজা দেবীর পূজাসমাপনান্তে তিনি কানফোড়া যোগীদিগের মহান্ত ভিখারীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সপ্তম দিবস চৌগাঁ-প্রাসাদের দৈনিক কর্ত্তব্যসাধনের পর রাণা প্রধান অশ্বপালের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলে সে ব্যক্তি প্রভুর আদেশে সমস্ত ঘোটকগুলিকে সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া পেশোলাহ্রদে স্নাপিত করিয়া আনে। সেই দিন রাত্রিকালে চৌগাঁ-প্রাসাদে হোমের ধুম পড়িয়া যায়। একটি মেষ ও একটি মহিষ সেই সময়ে দেবীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হয়। সেই দিন রাণা কর্ণবিদ্ধ যোগিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া থাকেন।

অষ্টম দিবসে মহাধুমধামের সহিত প্রাসাদে হোমের অনুষ্ঠান হয়। এই দিন অপরাহ্নে রাণা কতিপয় নির্ব্বাচিত সর্দ্দারের সহিত নগরের বহির্ভাগস্থ শামীনা নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য একটি গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নবম দিবসে প্রভাতে চৌগাঁ-প্রাসাদে বা অন্য কোন স্থানে গমন করিতে হয় না। রাণার আদেশে অশ্বপালগণ অশ্বশালা হইতে অশ্বগুলিকে উন্মোচিত করিয়া স্নাপিত করিবার জন্য পেশোলাহ্রদে লইয়া যায়; ঘোটকগুলিকে স্নানান্তে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া প্রাসাদে আনয়ন করে। সর্দ্দার ও সামন্তবৃন্দ তৎকালে সেই অশ্বগুলিকে অর্চ্চনা করেন এবং অশ্বপালগণ রাণার নিকট নানাপ্রকার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেই দিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় উপর্য্যুপরি তিনবার নাগরাবাদ্য হইতে থাকে। সেই শব্দ শ্রবণমাত্র রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার, সামন্ত ও সৈনিকবৃন্দ মাতাচলনামক পর্ব্বতকূটে গিয়া সেই প্রসিদ্ধ দ্বিধার অসি আনয়ন করে, তাহারা প্রাসাদে পুনরাগত হইলে রাণা আসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাযোগ্য বন্দনার সহিত রাজযোগীর হস্ত হইতে সেই অসি গ্রহণ করেন। তৎপরে সেই যোগিরাজ রাণার সমীপে একটি উপহার প্রাপ্ত হন। যে মহান্ত ক্রমাগত নয় দিন উপবাসী থাকিয়া অসির অর্চ্চনা করিয়াছেন, রাণা করকপূর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে রজত ও স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সেই দিন সমস্ত যোগীই উত্তমরূপ ভোজ্যদ্বারা পরিসেবিত হইয়া থাকেন। এই দিন রাজপুতকুমারগণ স্ব স্ব পিতাকে অর্চ্চনা করেন। এই তিথিতে রাজপুতবৃন্দ প্রায় সকলেই কন্দমূলফল ভক্ষণপূর্ব্বক জীবনধারণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ রামচন্দ্র জানকীকে উদ্ধার করিবার জন্য দশমীতে দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাপতির প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজপুতবৃন্দ এই দিনকে সামরিক ব্যাপারের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দিন প্রভাতে রাণা স্বীয় দীক্ষা-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ দিকে চৌগাঁ মাতাচল পর্ব্বতকূটে নানাপ্রকার আসন বিস্তারিত হইতে থাকে। তথায় সমস্ত গোলন্দাজ সেনা সসজ্জ অবস্থায় অবস্থিতি করে। সায়ংকালে রাণা স্বীয় সর্দ্দার ও সামন্তবৃন্দের সহিত তথায় গিয়া সর্ব্বাগ্রে

কৈজরী নামক একটি বৃক্ষের পূজা করেন, তৎপরে পিঞ্জরাবদ্ধ নীলকণ্ঠ পক্ষীকে উদ্ধার করিয়া দিয়া গগনভেদী কামানগর্জ্জন শুনিতে শুনিতে স্বভবনে উপস্থিত হন।

একাদশ দিবসে যুদ্ধব্যাপারের কিছু অধিকতর আয়োজন দৃষ্ট হয়। এই দিন প্রভাতে রাণা সেনাদলে পরিবেষ্টিত হইয়া মাতাচল পর্ব্বতকূটের অভিমুখে গমন করেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যবৃন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাগরা বাদিত হইতে থাকে। যথাসময়ে সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে উপস্থিত হইলে রাজপুতবীরগণ আপনাদের রাজাকে নানারূপ রণকৌশল প্রদর্শন করেন। কেহ আগ্নেয়াস্ত্র-প্রয়োগের সন্ধান, কেহ অশ্বচালন এবং কেহ কেহ শূল বা ভল্লপ্রক্ষেপ দ্বারা প্রভুর চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। এ দৃশ্য অতি চমৎকার। যদিও শিশোদীয় বংশের অধঃপতনের সহিত এই সমস্ত উৎসবব্যাপার অনেকপরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ইহার চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র হ্রাস দৃষ্ট হয় না। যুদ্ধাশ্বগুলির মনোহর সজ্জা ও নৃত্য, সর্দ্দারবৃন্দের হাস্যোৎফুল্ল মুখমণ্ডল, মনোরম বেশভূষা, অশ্ব ও অস্ত্রচালন এবং আস্ফালন দেখিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয় উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। আবার যে সময় শারদীয় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব তাঁহাদের উজ্জ্বল সজিন, উন্মুক্ত অসি ও ভল্লফলকে প্রতিফলিত হইয়া জলন্তজ্যোতিতে নৃত্য করিতে থাকেন, তখন বোধ হয় যেন, সমরাঙ্গনে শতসূর্য্য সমুদিত হইয়া সূর্য্যবংশীয় রাণার লীলাভিনয় দর্শন করিতেছেন। রঙ্গভূমের এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মিবারের সেই জলন্ত পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। অমনি বীরসিংহ, সংগ্রাম ও প্রতাপসিংহের মহাবীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ জীবন্তভাবে চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইয়া হৃদয়কে মিবারের বর্ত্তমান নির্জীব অবস্থা হইতে সেই অতীতগৌরব-রাজ্যে বহন করে। কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের জন্য; পরক্ষণেই স্মৃতি উদিত হইয়া মিবারের বর্ত্তমান শোচনীয় চিত্র মানসক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

এই মহোৎসবের দিন উদয়পুরে প্রত্যেক পণ্যবিক্রেতা স্ব স্ব পণ্যশালাকে আম্রশাখা ও পুষ্পমাল্যদামে সজ্জিত করে। সেই সকল পণ্যবীথিকার সম্মুখভাগে মহামূল্য বস্ত্রের একখানি আবরণী আলম্বিত করিয়া দেওয়া হয়। শিবিরের সম্মুখে একটি তোরণদ্বার নির্ম্মিত হইয়া নানাবিধ পুষ্পদাম ও সুদৃশ্য বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া থাকে। রাণা পর্ব্বতকূট হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই তোরণ স্পর্শ করিয়া উহা প্রদক্ষিণ করেন। সেই উৎসবসময়ে সে স্থলে যে সমস্ত রাজপুত উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা রাণাকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করেন। তখন অবিরল অনর্গল কামানধ্বনি হইতে থাকে এবং ভট্টগণ মিবারের পূর্ব্বতন বীরবৃন্দের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কীর্ত্তনপূর্ব্বক রাণার স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করেন।

সেই দিন অনেকগুলি নবক্রীত অশ্ব সেই রঙ্গভূমে আনীত হয়। রাণা সদলে যেমন সেই পর্ব্বতকূট হইতে অবতরণ করিতে উপক্রম করেন, অমনি অশ্বপালগণ সেই সকল নবীনতুরঙ্গের নামকীর্ত্তন করিতে থাকে। কোনটির নাম মাণিক, কোনটির বাজিরাজ, কোনটির বা বাজ। এইরূপ নূতন নূতন নাম শ্রবণ করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাণা সর্দ্দারগণকে যথাযোগ্য পারিতোষিক বিতরণ করেন। সেই দিন তিনি যে সজ্জা পরিধান করেন, উৎসবসমাপনান্তে কোতারিও চৌহানসর্দ্দার তাহা প্রাপ্ত হন। যে দিন দুর্বৃত্ত বনবীরের নিষ্ঠুরাচরণে উদয়সিংহের জীবন বিপন্ন হয়, যে দিন পরমবিশ্বস্ত ধাত্রী পান্না স্বীয় হৃদয়কুমারের শোণিতদানে সেই রাক্ষসের শোণিতপিপাসা নিবারণ করিয়া অনাথ রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা করেন, সেই দিন যে চৌহান-সর্দ্দার তাঁহাকে আপনার গৃহে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই পূর্ব্বকথিত কোতারিও-সর্দ্দারের পিতৃপুরুষ। এই পুরস্কার তাঁহার সেই অকপট রাজভক্তির পবিত্র কৃতজ্ঞতাচিহ্ন।

গণেশ-পূজা। — সিদ্ধিদাতা ভগবান্ গণপতির পূজা হিন্দুরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহার পবিত্র নাম অগ্রে স্মরণ করিয়া যে রাজপুতগণ মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। রাজবারা-প্রদেশে যোদ্ধাগণ গণেশের নিকট জয় প্রার্থনা করেন, বণিক্ আপনার হিসাবপত্রের উপরিদেশে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা গৃহ অথবা চৈত্যাদি প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার প্রতিমা ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। যাহার দ্বারদেশে বা কবাটগাত্রে গণেশের প্রতিমূর্ত্তি নাই, রাজস্থানে এরূপ গৃহ দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে এমন কোন হিন্দুনগরী নাই, যাহার একটি দ্বার গণেশপোল নামে কথিত হইয়া না থাকে। উদয়পুরে গণেশদ্বার নামে একটি তোরণ-দ্বার বিরাজিত আছে। রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেক পবিত্র পর্ব্বতকূটে উঠিবার দ্বারদেশে গণেশের এক একটি পবিত্র মন্দির দৃষ্ট হয়। মিবারের অভ্যন্তরস্থ একটি পর্ব্বতশিখর গণেশ-গিরি নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ রাজস্থানের প্রত্যেক হিন্দু অধিবাসীই বিঘ্ননাশন সিদ্ধেশ্বর গণপতির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রিয়বাহন মূষিকরাজও রাজপুতবৃন্দের পূজ্য।

এ স্থলে আর একটি বিষয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে দেবীদত্ত দ্বিধার খড়্গের কথা বলা হইয়াছে, উহার সম্বন্ধে রাজপুতগণের মধ্যে নানারূপ গূঢ় ও অদ্ভুত বিবরণ শ্রুতিগোচর হয়। তাঁহাদের সংস্কার যে, চতুর্ভুজা দেবী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা ঐ খড়্গ প্রস্তুত করিয়া বাপ্পারাওকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে গিহ্লোটরাজপুত্রগণ বহুদিন অবধি সেই দেবকৃপাণ অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ভোগ করেন। অবশেষে যে দিন দুর্দ্দান্ত তাতারবীর আলাউদ্দীন কৃতান্তের ন্যায় চিতোরপুরী আক্রমণ করিল, সে দিন চিতোরের দ্বাদশবীর জন্মভূমিকে যবনকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণভূমে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, যে দিন সতী শিরোমণি পদ্মিনী চিতোরের কমলা-স্বরূপিণী অগণ্য রমণীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, সেই দিন সেই পবিত্র কৃপাণ গিহ্লোটবংশের অধিকার হইতে কিছুকালের জন্য বিচ্যুত হইল। মিবারের ইতিবৃত্তে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, আলাউদ্দীন চিতোর জয় করিয়াই মালদেবনামা এক জন শোণিগুরু সর্দ্দারের করে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন। মহাবীর হামির সেই মালদেবের বিধবা কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে মনে ধারণা ছিল যে, যে ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় গহ্বরে চিতোরের সতীমহিলারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল গহ্বরে অবশ্যই কোন না কোন অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি সেই ভয়াবহ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশের সঙ্কল্প করিলেন। লোকে সেই ভীষণ সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কেহ বলিল, এক ভীষণ কালসর্প তন্মধ্যে রক্ষকরূপে অবস্থিত আছে; কেহ বলিল, বিকটরূপিণী প্রেতিনী সেই সুড়ঙ্গের ইতস্ততঃ অনুক্ষণ পরিভ্রমণ করিতেছে; কেহ বলিল, সেই সঙ্কটময় গহ্বরগর্ভে যে একবার প্রবেশ করে, তাহাকে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। এই প্রকার নানা লোকের নানাপ্রকার ভীতিপ্রদ কথা শুনিয়াও মালদেব কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ব্ববৎ অটল রহিল। দুর্দ্দম কৌতূহল দ্বারা চালিত হইয়া তিনি সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই সুড়ঙ্গ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।—সেই সূচিভেদ্য বিভীষিকাময় অন্ধকাররাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাহসিক মালদেবের বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রতিক্ষণে শ্বাসবায়ু রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। প্রতিক্ষণে তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা হইতে লাগিল, তথাপি তিনি ভীত বা বিচলিত হইলেন না। স্বীয় পদশব্দের প্রতিধ্বনিতে তিনি আপনি চমকিত হইতে লাগিলেন; সাহসে ভর করিয়া কেবল অনুমানের সাহায্যে তিনি স্খলিত-পদে এক দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র সুড়ঙ্গমধ্যে একপ্রকার নিবিড় নীললোহিত আলোক দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন মালদেবের সাহস দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই বিকট আলোক কোথা হইতে নির্গত হইতেছে, তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না, দ্বিগুণতর সাহসে —নির্ভীকহৃদয়ে সেই নির্দ্দিষ্ট আলোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি সহসা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, একটি বৃহৎ চুল্লীর উপর একখানি প্রকাণ্ড কটাহ স্থাপিত। সেই বিশালচুল্লী-গর্ভে একপ্রকার নীলরক্ত অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। সেই জ্বলন্ত অগ্নির আলোকেই সুড়ঙ্গের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি বীভৎসবেশধারিণী নাগিনী সেই প্রকাণ্ড কটাহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক গম্ভীর-স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। মালদেব সেই লোমহর্ষণ বীভৎসকাণ্ড দেখিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিতে হইবে, কি করিলে বিপদে পতিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পদশব্দে সেই গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ ও নর্ত্তনশব্দ বিলীন হইয়া গেল। নাগিনীবৃন্দ নৃত্যে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহাদের সেই অনলোদ্গারী বিকট চক্ষু ও বিকট মুখভঙ্গীদর্শনে মালদেবের হৃদয় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল; কিন্তু তাঁহার বদনে ভয়ের কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তিনি অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই ভীমরূপিণী নাগকন্যারা তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শোণিগুরু-সর্দ্দার ধীরগম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "নাগিনী, রাক্ষস, কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী আপনারা যাহাই হউন, আপনাদের পাদপদ্মে নমস্কার। আপনাদিগের বিরামদায়িনী শান্তিভঙ্গ কিংবা আপনাদের আবাসগৃহের রহস্য উদ্ভেদ করিতে আমি এখানে উপস্থিত হই নাই। গিহ্লোটবংশের অধীশ্বর বীরকেশরী বাপ্পাকে ভগবতী চতুর্ভুজাদেবী একখানি দৈব অসি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অসি এতকাল চিতোরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু বিগত মুসলমানবিপ্লবে চিতোর বিধ্বস্ত হইলে তাহা যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা অবগত নহি। অতএব আপনাদের পাদপদ্মে নিবেদন, যদি আপনাদিগের নিকট তাহা থাকে, তবে আমাকে প্রত্যর্পণ করুন্।" নাগিনীগণ কোন উত্তর না দিয়া মৌনভাবে রহিলেন। মালদেবের নির্ভীকতা পরীক্ষা করিতে তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইল। তাঁহারা সেই কটাহের মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন। সেই কটাহমধ্যে এক প্রকার বীভৎস দৃশ্য! মালদেব দেখিলেন, তন্মধ্যে নানারূপ জন্তুর নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ডবিখণ্ড অবস্থায় একত্র রহিয়াছে। সেই সকল জীবশরীরের মধ্যে একটি শিশুর কোমল বাহুও বিদ্যমান। মালদেব চমকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত! তিনি ভাবিলেন, এ শিশু কে? ক্ষণকাল পরেই নাগিনীগণ শোণিতমাংস-বসামিশ্রিত সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মালদেবের সম্মুখে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে তৎসমুদয় ভোজন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। পিশাচভোগ্য সেই সকল দুর্গন্ধপূর্ণ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে মালদেব কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ সমুদায় উদরসাৎ করিয়া শূন্যপাত্রখানি তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই অমানুষিক সাহস ও নির্ভীকতার লক্ষণ দর্শনে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, মালদেব সেই দেবদত্ত অসি-ব্যবহার করিবার উপযুক্ত পাত্র। তখন নাগিনীরা প্রীত হইয়া দৈবখড়্গ মালদেবকরে প্রত্যর্পণ করিলেন। শোণিগুরুপতি তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক সগর্ব্বে আপনার বিজয়চিহ্ন সহকারে সেই বিকটগহ্বর হইতে প্রস্থানক্রান্ত হইলেন।

শোণিগুরু-সর্দ্দারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যে দিন হামির চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত

হন, সেই দিন এই অসি উদ্ধার করিয়াছিলেন। কোন ভট্টকবির গ্রন্থান্তরে বর্ণিত আছে যে, রাণা হামিরই ভগবতী চারণীদেবীর উপাসনা করিয়া এই অসি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মীপূজা।—কার্ত্তিকমাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় রাজপুতেরা লক্ষ্মীপূজা করেন। ঐ দিন লক্ষ্মীর অর্চনা করিলে সৌভাগ্যলাভ হয়। বঙ্গদেশে এই পূজায় যেমন আড়ম্বর হয়, মিবারেও ঠিক সেইরূপ সমারোহ ও আড়ম্বরের সহিত কমলার উপাসনা হইয়া থাকে।

দেয়ালী।—কোজাগরী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অমাবস্যা দিবসে মিবারের দেয়ালী (দীপদান পর্ব্ব) উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই দিন রজনীযোগে সমগ্র রাজস্থান হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হয়। রাজবারার প্রত্যেক নগর গ্রাম, ও সেনানিবেশ আলোকমালায় সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। মিবারের রাণা হইতে পর্ণকুটীরবাসী ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব সাধ্যানুসারে স্ব স্ব গৃহ দীপশ্রেণীতে সুসজ্জিত করে। এই দিন মিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নানা উপচারে নৈবেদ্য সজ্জিত করিয়া কমলা-মন্দিরে উপস্থিত হয়। এই দিন রাণা স্বীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে বসিয়া ভোজন করেন। মন্ত্রী সেই সময় রাণার হস্তধৃত একটি বৃহৎ মৃন্ময়দীপবৃক্ষের উপরিভাগে অনবরত তৈলনিষেক করিতে থাকেন। রাণার আত্মীয়-স্বজনেরাও এইরূপ প্রথার অনুকরণ করেন। যে অক্ষক্রীড়া ত্রিকালবিৎ ভগবান্ মনুকর্ত্তৃক অতি অনিষ্টকর বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, রাজপুতবৃন্দ দেয়ালী-উৎসবে সেই ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সেই দিন এই ক্রীড়ায় যে জয়ী হয়, সংবৎসর তাহার মঙ্গল হইয়া থাকে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।—দেয়ালীর পরবর্ত্তী শুক্লদ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে, সূর্য্যনন্দিনী ঐ দিন আপন ভ্রাতা যমকে স্বগৃহে ভোজন করাইয়াছিলেন। সেই জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ করিবার পক্ষে প্রশস্ত দিন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়। আর্য্যমনীষিগণের শাসন-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যে কোন কামিনী ঐ দিনে আপনার ভ্রাতাকে চন্দনতাম্বূলাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন করাইলে কদাচ তাঁহাকে বৈধব্যযন্ত্রণার কঠোর ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং তাঁহার ভ্রাতাও দীর্ঘজীবন সম্ভোগ করিয়া চরমে কৃতান্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন রাজপুতবৃন্দ গোপার্ব্বণের অনুষ্ঠান করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিজালে দিগ্‌দেশ সমাচ্ছন্ন করিতে করিতে ধেনুগণ যে সময় স্ব স্ব বিশ্রামগৃহে প্রত্যাগমন করে, সেই পবিত্র সময়ে রাজপুতগণ ভক্তিসহকারে তাহাদিগের পূজা করেন।

অন্নকূট।—কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রাজবারা প্রদেশে যতগুলি উৎসব আচরিত হয়, অন্নকূট তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। নাথদ্বারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের সময় মহাসমারোহ হইয়া থাকে। ভারতের নানাস্থান হইতে অসংখ্য বৈষ্ণবমণ্ডলী উক্ত পুণ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া এই মহাপর্ব্বে যোগদান করেন। রাজবারার ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভগবান্ কৃষ্ণের যে সপ্তমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এই উৎসব উপলক্ষে তৎসমস্তই নাথদ্বারে আনীত ও যথোপচারে আর্চ্চত হইয়া থাকে। [illegible] নাথদ্বারের পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণ অন্নব্যঞ্জন স্তূপীকৃত হইয়া [illegible] তাঁহার ভক্তবৃন্দ সেই রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জন সেবন করেন। রাজপুতজাতির অভ্যুদয়সময় এই অন্নকূট-মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত। যখন মহানিষ্টকর যুদ্ধবিগ্রহের দিগ্‌দাহী জলন্তবাহ্নস্পর্শে রাজবারার অন্তর্দ্দেশ ভস্মে পরিণত হয় নাই, যখন বিষ্ণুভক্ত রাজপুতবৃন্দ স্ব স্ব অধিপতিগণের উন্নতগৌরবে গৌরবান্বিত

হইয়া প্রফুল্লচিত্তে জগদীশপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে পাইতেন; রাজস্থানের সেই সৌভাগ্যের দিনে অন্নকূট পর্ব্বোপলক্ষে এক সময়ে চারিটি প্রধান রাজপুতরাজ নাথদ্বারের পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হইতেন এবং বহুমূল্য মণিরত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক রাজপুত-গৌরবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মিবার-পতি রাণা অরিসিংহ, মারবারপতি বিজয়সিংহ, বিকানীররাজ রাজসিংহ এবং কিষণগড়ের অধিপতি বাহাদুরসিংহ,—এই চারি নরপতি স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে এক একখানি রত্নভূষণ প্রদান পূর্ব্বক দেব-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। রাজপুতগণের কথা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত অবস্থার রাজপুতরমণীগণের দাক্ষিণ্যের বিষয় শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়। প্রসিদ্ধি আছে, পূর্ব্বকথিত রাজচতুষ্টয় যখন নাথদ্বারে উপস্থিত হইয়া মণিরত্নাদি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় সুরাটের একটি বিধবা রমণী সপ্ততিসহস্র মুদ্রা সেই মন্দিরে অর্পণ করিয়াছিলেন। এখন রাজবারার শোচনীয় দুর্দ্দশার সময় এরূপ বর্ণন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু রাজস্থানের উন্নতিসময়ে রাজপুতগণ যে দেবসেবায় এরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক ধনসম্পত্তি উৎসর্গ করিতেন, মিবারের অনেক স্থলে তাহার শত শত নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে সপ্তমূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করা গেল, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বল্লভাচার্য্য ঐ সপ্তমূর্ত্তিকে একত্র করিয়া অন্নকূটোৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সপ্তমূর্ত্তি বহুকাল অবধি একটি মন্দিরে রক্ষিত ছিল, বল্লভের পৌত্র গিরিধারী শেষ স্বীয় পুত্রের মধ্যে ঐ সপ্তমূর্ত্তি বিভাগ করিয়া দেন। গিরিধারীর সেই সপ্তপুত্রের বংশধরেরা আজিও প্রধান পুরোহিতরূপে সেই সপ্ত দেববিগ্রহের পবিত্র মন্দিরে বাস করিতেছেন। সেই সপ্তমূর্ত্তির নাম, আধুনিক স্থিতিস্থান ও অন্যান্য বিবরণও এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

নাথজী	... ...	নাথদ্বার *
১।	নোনীত বা ননান্দদেব	নাথদ্বার।
২।	মথুরানাথ	কোটা।
৩।	দ্বারকানাথ	কাঙ্কারাওলি।
৪।	গোকুলনাথ বা গোকুলচন্দ্রমা	জয়পুর।
৫।	যদুনাথ	সুরাট।
৬।	বেতালনাথ	কোটা।
৭।	মদনমোহন	জয়পুর।

নোনীত।—ইঁহার মন্দির নাথজীর অনতিদূরে স্থাপিত। ইঁহাকে বালমুকুন্দও বলে। ইনি বালকমূর্ত্তি,—দক্ষিণকরে মোদক (পেঁড়া) ধরিয়া রহিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে ইনি গৃহদেবতার মধ্যে পরিগণিত। মুসলমানেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ভগ্ন করে, সেই সময় হইতে বালমুকুন্দ বহুদিন পর্য্যন্ত যমুনাজলে নিমগ্ন ছিলেন। অবশেষে একদিন বল্লভাচার্য্য স্নান করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। বল্লভ স্বীয় আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক গৃহদেবতার মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ভক্তিসহকারে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। সেই দিন ভগবান্ নোনীত বল্লভের কুলদেবতা-স্বরূপ গৃহীত হইয়া যে পূজা-সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, সে সম্মান হইতে আর তিনি বঞ্চিত হইলেন না। অদ্যাপি সেই প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যের বংশধরেরা ভগবান্ বালমুকুন্দকে পরম ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিতেছেন।

---

* নাথজী সর্ব্বপ্রধান, সুতরাং সপ্তমূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট হইল না।

মথুরানাথ :—ইহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ইনি মিবারের অন্তর্গত কামনার নগরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে সেই স্থান হইতে অন্তরিত হইয়া কোটারাজ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

দ্বারকানাথ।—বল্লভাচার্য্যের তৃতীয় প্রপৌত্র বালকৃষ্ণ এই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। কিংবদন্তী আছে, সত্যযুগে অমরিক নামে রাজা সূর্য্যবংশে অবতীর্ণ হইয়া এক বিষ্ণুমূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এই দ্বারকানাথ সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিরূপ।

গোকুলনাথ।—ইঁহার সম্বন্ধেও ঐরূপ বিচিত্র বিবরণ শ্রুতিগোচর হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে," বল্লভাচার্য্য ইঁহাকে যমুনাতীরবর্ত্তী কোন একটি বিলমধ্যে পাইয়া আপনার শ্যালককে প্রদান করেন তৎপরে গোকুলচন্দ্রমা গোপজীবন গোকুলপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হন। এখন ইনি জয়পুরে অধিষ্ঠিত আছেন সত্য, তথাপি গোকুলবাসীরা ইঁহার পূর্ব্ববৎ পবিত্রমন্দিরে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করেন।

যদুনাথ —ইনি মথুরার অনতিদূরবর্ত্তী মহাবন নামক স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্দ্দান্ত মহম্মদ গজনন কর্তৃক মথুরাপুরী ধ্বংস হইলে যদুনাথ সুরাট নগরে নীত হন। তদবধিই তিনি সুরাটে অবস্থিতি করিতেছেন।

বেতালনাথ।—ইঁহার অপর নাম পাণ্ডুরঙ্গ সংবৎ ১৫৭২ অব্দে বারাণসীর গঙ্গাগর্ভে ইঁহাকে পাওয়া গিয়াছিল।

মদনমোহন।—একটি চারণী ইঁহার অর্চ্চনা করেন।

অন্নকূটের দিন রাণা নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন। উদয়পুরের প্রধান রঙ্গস্থল চৌগাঁ-প্রাসাদে গমন পূর্ব্বক তিনি সেই দিন তৎসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ঘোড়দৌড় ও গজযুদ্ধ প্রভৃতি দর্শন করেন। সেই দিন সায়ংসময়ে নানারূপ বিস্ময়করী অগ্নিক্রীড়ার সহিত অন্নকূট উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

মকরসংক্রান্তি :—কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তিতে এই উৎসব হয়। এই দিন রাণা স্বীয় সর্দ্দার ও সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া চৌগাঁ-প্রাসাদে উপস্থিত হন। তিনি সর্দ্দারগণের সহিত সেই স্থানে অশ্বারোহণে গোলকক্রীড়া করিয়া থাকেন।

মিত্রসপ্তমী :—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা-সপ্তমীতে রাজপুতগণ সামান্যরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এই দিনে সূর্য্যদেব অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাণা সূর্য্যবংশীয়, সুতরাং সূর্য্যের জন্মাহ উপলক্ষে তিনি যে উৎসব করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এতদ্ব্যতীত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অন্য কোন পর্ব্বাহ দৃষ্ট হয় না।

বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি হিন্দুগৌরবের আদর্শস্থল। বীরত্ব, মহত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, উদারতা, স্বদেশপ্রেমিকতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, আচার ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয় তুলনা করা যায়, পবিত্র ভারতবর্ষের মধ্যে বসুগর্ভা মিবারের সহিত অন্য কোন রাজ্যই সম্মান-গৌরব অধিকার করিতে পারে না। সমরকেশরী স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসিপ্রবর বাপ্পার অমানুষিক বীরত্বের সহিত কোন্ রাজ্যের কোন্ মহাবীরের তুলনা হইতে পারে? প্রতাপসিংহ যেরূপ অনন্ত আত্মত্যাগের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, কোন্ মহাপুরুষ তাদৃশ আত্মোৎসর্গের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? নির্ভীকহৃদয় রাজসিংহের তেজস্বিতা, আর্য্যবীর অমরসিংহের রণকৌশল, মহাপুরুষ সংগ্রামসিংহের মহানুভাবকতা, এই সমস্ত স্মরণ করিলে কোন সহৃদয়ের হৃদয় বিস্মিত ও চমকিত না হয়?

ইঁহাদের সেই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ গুণাবলীর সহিত কোন্ ব্যক্তি কাহার তুলনা করিতে অগ্রসর হইতে পারে? হায়! যাঁহাদিগের সভ্যতা, তেজস্বিতা, বীর্য্যবত্তা, আত্মোৎসর্গ ও নির্ভীকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া লেখনী আপনার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল, পরিশেষে সেই সকল গিহ্লোটবংশীয় মহাপুরুষেরা ভীরুতা, কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা, অধিক কি, তাঁহাদিগের শোচনীয় অধঃপতন পর্য্যন্তও লেখনীকে লিপিবদ্ধ করিতে হইল। এক সময়ে যাঁহাদিগের তেজস্বিতা ও বীর্য্যবত্তা ভারতের সমগ্রস্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, যাঁহারা সমগ্র সভ্যজগতের একমাত্র আদর্শস্বরূপ ছিলেন, আজি সেই গিহ্লোটবংশের বংশধরেরা নিস্তেজ, হীনপ্রভ, নিস্পন্দ, নীরব ও জড়প্রায় হইয়া দীনহীনের ন্যায় কালযাপন করিতেছেন। এক সময়ে যাঁহাদিগের অভ্রস্পর্শিনী গৌরবচূড়া মিবারের উন্নত মস্তকে সমুচ্চান ছিল, আজি তাঁহাদের সেই গৌরবচূড়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। হায়! অশ্রুমসী লইয়া লেখনীতে এই শোচনীয় দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া মিবার-ইতিবৃত্ত পরিসমাপ্ত করিতে হইল! কে আশা করিতে পারে যে, শোচনীয় অধঃপতন হইতে মিবার আবার ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিবে? কে আশা করিতে পারে যে, মিবার শ্মশানের ভস্মস্তূপ হইতে আবার নূতন নূতন মহাপুরুষের উদ্ভব হইবে? কে আশা করিতে পারে, দৈবশক্তিবলে—সঞ্জীবনীমন্ত্রবলে কেহ আসিয়া মিবারের ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে আবার পূর্ব্বের ন্যায় মহাপুরুষগণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে? আশা কুহকিনী সত্য, আশা মায়াবিনী সত্য, আশার মোহিনীমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মানবহৃদয় ভবিষ্যতের গভীরগর্ভনিহিত কুহক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না সত্য, কিন্তু মিবারের পুনরুদ্ধার, মিবারের পুনরুন্নতি এবং মিবারের পুনর্গৌরবলাভের আশা নাই।

মারবার

প্রথম অধ্যায়

মারবার শব্দের ব্যুৎপত্তি, পুরাতন ইতিবৃত্ত-সম্বন্ধে প্রমাণ, নয়নপাল, জয়চাঁদ, কনোজের বিস্তৃতি রাজসূয়যজ্ঞ, শাহাবুদ্দিন কর্তৃক ভারত আক্রমণ, চৌহান-নৃপতির পরাজয়, কনোজ-আক্রমণ ও জয়চাঁদের মৃত্যু।

রাঠোরবংশীয় রাজপুতগণ যে স্থানে বাস করেন, সেই প্রদেশই মারবার নামে পরিচিত। যে সময়ের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইতেছে, তৎকালে শতদ্রুনদ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র মরুপ্রান্তরই মারবাররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভট্টকবিগণের কাব্যগ্রন্থের অনেক স্থলেই মারবার মরধর নামে অভিহিত হইয়াছে; ছন্দের অনুরোধে কোন কোন কবিগণ মরু শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। মারবার মরুবার শব্দের অপভ্রংশমাত্র। শুদ্ধকথায় যাহাকে মরুস্থান বা মরুস্থলী বলা যায়, তাহারই নাম মরুবার মরুস্থানকে মরুদেশও বলা যাইতে পারে। এই মরুদেশ শব্দ গ্রহণ করিয়াই যাবনিক ইতিবৃত্ত-লেখকরা এ দেশকে মরুদেশ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মিবারের অন্তর্গত নাদোল নগরের প্রায় ১০ মাইল পশ্চিমে নদালয় নামে একটি প্রাচীন নগর আছে। তত্রত্য দেবমন্দির হইতে জৈন পুরোহিত একখানি কুলতালিকাগ্রন্থ আনয়ন করিয়া মহামতি টড সাহেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। এইখানি ও অপর একখানি বংশতালিকাগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া টড সাহেব মারবারের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়খানি ভট্টগ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমোক্ত দুইখানির সাহায্যেই তিনি বিশেষ বিশেষ বিবরণ অবগত হন। নাদোলের দেবমন্দির হইতে যে কুলতালিকাখানি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় চতুস্ত্রিংশ হস্ত। তাহাতে লিখিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের মেরুদণ্ড হইতে যুবনাশ্বনামে একটি মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি রাঠোরবংশের প্রথমপুরুষ। রাঠোরগণ বলেন, উত্তরদেশান্তর্গত পারলিপুর নগর যুবনাশ্বের রাজধানী ছিল। কান্যকুব্জের প্রতিষ্ঠা, কামধ্বজের উদ্ভব, রাঠোরবংশের ত্রয়োদশ শাখা ও তৎসমুদায়ের গোত্রাচার, যথাক্রমে এই সমস্ত বিবরণ ঐ বিস্তৃত বংশপত্রিকাখানিতে বর্ণিত আছে। এতদ্ব্যতীত আরও একখানি বংশ-পত্রিকাপাঠে রাঠোরবংশের কতকগুলি পুরাতন বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি নামমালা ইহাতে বর্ণিত আছে। কিন্তু তন্মধ্যে স্থূল স্থূল ঘটনার বিবরণ অতি অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়। রাঠোরদিগের বিশ্বাসে এই কুলাখ্যানপত্র পরম পবিত্র।

এই কুলাখ্যানপত্রে লিখিত আছে, ৫২৬ সংবতে নয়নপাল নামে একটি বীরকেশরী কনোজ আক্রমণ পূর্ব্বক অজপালকে বিনাশ করিয়া তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করেন। তদবধিই

নয়নপালের বংশধরেরা কনোজিয়া রাঠোর নাম ধারণ করেন। নয়নপাল হইতে আরম্ভ করিয়া মারবারের শেষ রাজা মহাতেজা যশোবন্তের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ ঐ কুলাখ্যানপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রাঠোরবংশের দুইটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ভিন্ন উক্ত তালিকায় আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সেই দুইটি ঘটনার মধ্যে প্রথম,—হিন্দুনরপতি কুলাঙ্গার রাঠোর জয়চাঁদের অধঃপতনের সহিত কনোজ হইতে রাঠোরবংশতরুর উৎপাটন; দ্বিতীয়,—মুষ্টিমেয় রাঠোরবীরের সাহায্যে রাজবারার বিশাল মরুস্থলীতে জয়চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর শিবজী কর্তৃক আপনার বংশতরুরোপণ। এই দুইটি ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময় অল্পমাত্র ব্যবধান হইলেও ইহা রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া গণনীয়।

১৭৩৫ সংবতে (১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে) রাঠোরকুলচূড়ামণি মহারাজ যশোবন্তসিংহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। নয়নপাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজ যশোবন্তের পরলোকগমন পর্য্যন্ত রাঠোরবংশের যত শাখা যে দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, ঐ কুলতালিকাগ্রন্থে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরিলিখিত দুইখানি বংশপত্রিকা ভিন্ন আরও কয়খানি ভট্টগ্রন্থে মারবারের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে 'বিজয়বিলাস', 'সূর্য্যপ্রকাশ' ও 'রাজরূপকাখ্যাত' এই তিনখানি প্রধান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য।

সূর্য্যপ্রকাশগ্রন্থে ৭৫০০ সংখ্যক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। ভট্টকবি কর্ণিধন ইহার প্রণেতা। মারবারের অন্যতম রাঠোররাজ অভয়সিংহের আধিপত্যকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়। রাজার আদেশেই গ্রন্থকার উহা রচনা করেন। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নরপতি সুমিত্রের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে রাজবংশের বিবরণ ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তৎপরে নয়নপাল পর্য্যন্ত অন্য কোন রাজার বা রাজকুলের বিবরণ দৃষ্ট হয় না। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নরপতি নয়নপাল কনোজ জয় করিয়া—তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করিলে তদবধি তিনি কামধ্বজ উপাধিতে অভিহিত হইতেন। রাজকীয় বিবরণ-সমূহ লইয়া এই গ্রন্থের উপকরণ-সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছিল। নদালয়ের দেবমন্দির হইতে যে বংশপত্রিকাখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সূর্য্যপ্রকাশলিখিত বিবরণের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণিত। কনোজের রঙ্গস্থলে রাঠোরবীরেরা কিরূপ বীরত্ব বা মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সূর্য্যপ্রকাশগ্রন্থে তাহার কোন বর্ণনা নাই; অধিক কি, কনোজপতি জয়চাঁদের সংহারবৃত্তান্তও উহাতে দৃষ্ট হয় না।

রাজরূপকাখ্যাত গ্রন্থেও কোন বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয় না। উহার প্রারম্ভেই সূর্য্যবংশের কতিপয় বিবরণ বর্ণিত আছে। যে সময়ে ইক্ষ্বাকুর বংশধরেরা আপনাদের পুরাতননগরী অযোধ্যাপুরীতে রাজত্ব করিতেন, এই গ্রন্থে সেই সময়েরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত আছে। এই সকল বিবরণের পর গ্রন্থকার একেবারে স্বদেশবিসর্জ্জন সম্বন্ধে ঘটনাবলী বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে দিন রাঠোরবীরকেশরী শিবজী অত্যল্পমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে রাজবারার বিশাল মরুস্থলীতে পুনর্ব্বার রাঠোরবংশপাদপ রোপণ করেন, তদীয় দৃঢ় অধ্যবসায়ে যে দিন দগ্ধমরুশ্মশানক্ষেত্রে আবার রাজপ্রাসাদ বিরাজিত হয়, সেই দিন হইতে নরপতি যশোবন্তসিংহের পরলোকগমন পর্য্যন্ত রাঠোরবংশের ভাগ্যচক্র কোন্ কোন্ দিকে বিঘূর্ণিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণী পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ সবিস্তার প্রকটিত আছে। যশোবন্তসিংহ অন্যায়রূপে নিহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার শিশুকুমার অজিতসিংহের ভাগ্যে কি কি ঘটনা উপস্থিত হয়, কিরূপে তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিরূপেই বা তিনি রাজ্যশাসন করেন, রাজরূপকাখ্যাত

গ্রন্থে তাহাও সবিস্তার বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থখানিকে ১৭৩৫ সংবত হইতে ১৭৮৭ সংবৎ পর্য্যন্ত সময়ের একখানি ইতিহাস বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অজিতসিংহ ও তদীয় কুমার অভয়সিংহের রাজত্বকাল হইতে গুর্জ্জরপ্রদেশের প্রতিনিধি শরবুন্দল খাঁর সহিত সংগ্রামের শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজয়বিলাস নামেও একখানি ভট্টগ্রন্থ আছে। তাহাতে এবং "খ্যাত" নামক আর একখানি গ্রন্থেও মারবারের কিছু কিছু প্রাচীন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজয়বিলাসে এক লক্ষ শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। ভক্তসিংহের পুত্র বিজয়সিংহের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। "খ্যাত" নামক গ্রন্থখানিতে মারবার-ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ মহামতি টড সাহেবের হস্তগত হয় নাই। যে অংশ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল রাঠোর-নৃপতি উদয়সিংহ, তৎপুত্র জগৎসিংহ ও পৌত্র যশোবন্তসিংহের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

যেরূপে রাঠোরদিগের উৎপত্তি হয়, ইতিপূর্ব্বেই তাহা লিখিত হইয়াছে। উত্তর-প্রদেশবর্ত্তী পারলিপুর নগর হইতে কিরূপে রাঠোরবংশতরুর উৎপাটন হয়, কিরূপে গঙ্গার দক্ষিণ-পুলিনে সেই বংশতরু রোপিত হয়, কোন ইতিবৃত্ত গ্রন্থেই তদ্বিবরণ দৃষ্ট হয় না। আমাদিগের অনুমান হয়, রাজনৈতিক জগতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইবার পূর্ব্বে রাঠোরেরা পারলিপুর পরিত্যাগ করিয়া সুরধুনীর দক্ষিণ-সৈকতভূমে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

৫২৬ সংবতে (৪৭০ খৃষ্টাব্দে) মহাবীর রাঠোররাজ নয়নপাল কনোজরাজ্য অধিকার করেন। তদবধিই রাঠোরবংশ কামধ্বজ উপাধি ধারণ করিয়াছে। নয়নপালের একমাত্র পুত্র পদারত। যতিপ্রদত্ত বংশতালিকায় পদারতের পরিবর্ত্তে ভ্রমবশে ভারত নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদারতের পুত্র পুঞ্জ। পদারত হইতে ত্রয়োদশটি রাজবংশের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা সকলেই কামধ্বজ উপাধিধারী। সেই ত্রয়োদশটি পুত্র যথাক্রমে ধর্ম্মভূম্ব, ভানুদ, বীরচন্দ্র, অমরবিজয়, সুজন, বিনোদ, পদ্ম, ঐহর, বরদেব, উগ্রপ্রভু, ভরত, অলঙ্কুল ও চাঁদ নামে অভিহিত।

ধর্ম্মভূম্বের বংশধরেরা দানেশ্বর-কামধ্বজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ভানুদ অভয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া তাঁহার বংশধরেরা অভয়পুরী-কামধ্বজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আফগানদিগের সহিত কাঙ্গাড়া নামক স্থানে ভানুদের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল।

বীরচন্দ্রের বংশধরেরা কুপলীয়-কামধ্বজ নামে পরিচিত। বীরচন্দ্রের চতুর্দ্দশ পুত্র। আনহল-বারাপত্তনের চৌহানরাজ হামিরের কন্যার গর্ভে বীরচন্দ্রের ঔরসে চতুর্দ্দশ পুত্রের জন্ম হয়। এই চতুর্দ্দশ পুত্র কালক্রমে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে গিয়া স্বতন্ত্র উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

অমরবিজয় রাজ্যলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া শ্বশুরবংশের ১৬০০০ প্রমারের প্রাণবিনাশ করিয়া কোরাগড় হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরাই কোরাকামধ্বজ নামে পরিচিত। কোরা-গড়ের প্রমাররাজের কন্যার সহিত অমরবিজয়ের বিবাহ হয়। সুদৃশ্য সমৃদ্ধিশালী কোরাগড় নগর সুরধুনীতীরে সংস্থিত।

পদারতের পঞ্চম পুত্র সুজনবিনোদের বংশধরগণ জিরখৈরা কামধ্বজ নামে পরিচিত।

পদ্ম বোগিলান-প্রদেশ ও উড়িষ্যা এই দুটি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। বোগিলান সেই সময় যদুবংশীয় রাজা তেজোমানের অধিকারে ছিল।

ঐহরের বংশধরেরা ঐহর কামধ্বজ নামে প্রথিত। বঙ্গদেশ যখন যদুবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, ঐহর তখন তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

বরদেবের সন্তানসন্ততিগণ পারুক-কামধ্বজ নামে পরিচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহাকেই বারাণসী রাজ্য ও তৎসহ ৮৪খানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু বরদেবের হৃদয় তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। তিনি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পারুকপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই পারুকপুর নগর যে কোন্ স্থানে অবস্থিত, অত্যাপি তাহার নিরূপণ হয় নাই। যাহা হউক, পারুকপুর প্রতিষ্ঠা করাতেই তদীয় বংশধরেরা যে পারুক-কামধ্বজ নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উগ্রপ্রভু হইতেই চাঁদেল কামধ্বজগণের উৎপত্তি হইয়াছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, উগ্রপ্রভু মেকরাণ-উপকূলবর্ত্তী হিঙ্গলাজ চণ্ডালনামক দেবমন্দিরে গিয়া দুশ্চর তপস্যাচরণ করিয়া দেব-প্রসাদে একখানি তরবারি প্রাপ্ত হন। মন্দিরের সম্মুখস্থ কুণ্ডগর্ভ হইতে সেই তরবারি উত্থিত হইয়াছিল। সেই তরবারির সাহায্যে তিনি সাগরোপকূলবর্ত্তী সমস্ত দক্ষিণপ্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, নয়নপালের বংশধরেরা ভারতের চতুর্দ্দিকেই বিস্তৃত হইয়াছিলেন।

মুক্তমানের বংশধরেরা বীরকামধ্বজ নামে পরিচিত। ইনি তুয়ারবংশীয় ভানুরাজকে পরাভূত করিয়া উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

উত্তরপ্রদেশে গিরিমালার পাদপ্রস্থে কনকশির নামে একটি জনপদ আছে। বীরগুজরবংশীয় রুদ্রসেন তথায় রাজত্ব করিতেন। পদারতের একাদশ পুত্র ভরত তাঁহাকে পরাভূত করিয়া সেই প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা ভূরো-কামধ্বজ নামে পরিচিত।

অলঙ্কুলের বংশধরেরা ক্ষীরোদীয়-কামধ্বজ নামে পরিচিত। অলঙ্কুল একজন মহাবীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সিন্ধুকূলবর্ত্তী আটক নামক স্থানে যবনসৈন্যের সহিত ইঁহার তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। অলঙ্কুল ক্ষীরোদানাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ক্ষীরোদীয়-কামধ্বজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

পদারতের ত্রয়োদশ পুত্র চাঁদ উত্তরপ্রদেশান্তর্গত তারাপুর নগরে রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ তাহিরা নগরের চৌহান-রাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তৎপরে ভার্য্যাসহ ইনি কাশীধামে গিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

৪৭০ খৃষ্টাব্দে রাঠোররাজ বীরকেশরী নয়নপাল কান্যকুব্জ অধিকার করেন। তাহার কিয়দ্দিন পরে তদীয় ত্রয়োদশ পৌত্র উপরিলিখিত মহাপুরুষেরা ভারতের চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া স্ব স্ব বিজয়বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে প্রায় সপ্ত শতাব্দী পর্য্যন্ত রাঠোরবীরগণের কোন বিশেষ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে একবিংশতিজন নরপতি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কেবল এইমাত্র বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, উদয়চাঁদ, কনকসেন, সহস্রকাল, মেঘসেন, বীরভদ্র, দেবসেন, বিমলসেন, দানসেন, মুকুন্দ, ভুদ্দু, রাজসেন, ত্রিপাল, শ্রীপুঞ্জ, বিজয়চাঁদ বা বিজয়পাল ও তৎপুত্র জয়চাঁদ এই কয়টি রাও-উপাধিক নৃপতির পূর্ব্বে রাও-উপাধিক একবিংশতিজন রাজা রাঠোরবংশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ রাজা যে সর্ব্বপ্রথম এ উপাধি ধারণ করেন, আর কয়জন নরপতিই যে রাজা উপাধিধারী ছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এ দিকে আবার যতিদত্ত যে কুলপত্রিকাখানির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে যে সকল নাম লিখিত আছে, সূর্য্যপ্রকাশে তাহার একটি নামও পরিদৃষ্ট হয় না: সুতরাং এরূপ গোলযোগের মীমাংসা করা

দুরূহ। যতিদত্ত কুলতালিকায় যে কয়টি অতিরিক্ত নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রঙ্গতধ্বজ একতম। দিল্লীর তুয়াররাজ যশোরাজের সহিত এক সময়ে রঙ্গতধ্বজের যুদ্ধ হইয়াছিল, দিল্লীশ্বর সেই যুদ্ধে পরাজিত হন। যতিদত্ত বংশপত্রিকায় রঙ্গতধ্বজ এবং তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী রাজগণের নামাবলী এরূপ নিবিড়তর জটিলভাবে সন্নিবেশিত যে, তদৃষ্টে কিছুই মীমাংসা করা যায় না; বিশেষতঃ সূর্য্যপ্রকাশগ্রন্থের বর্ণনার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই।

নয়নপালের বংশধরেরা রাঠোরনামের যোগ্য বীরপুরুষ ছিলেন। যে সকল গুণ ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার, তাঁহারা তৎসমস্ত গুণেই সমলঙ্কৃত ছিলেন। বংশের সম্মান-গৌরব তাঁহাদিগের নিকট কোন কালেই বিপন্ন বা ব্যাহত হয় নাই। এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের গৌরবপতাকা সমুড্ডীন হইয়াছিল; ভট্টকবি ও চারণবৃন্দ এক সময়ে ভারতের নগরে নগরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের কীর্ত্তিগীতি গান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে ভারতমাতা সেই সকল গৌরবশালী বীরসন্তান হারাইয়া দীনহীনাভাবে শোচনীয়দশায় পতিত হইয়া রহিয়াছেন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতি শব্দ কিছুতেই সুফল প্রসব করে না। অতিদর্পে লঙ্কাপতি রাবণ সবংশে ধ্বংস হইয়াছিলেন; অত্যধিক দানশীলতার পরিচয় দিতে গিয়া বলিরাজ চিরদিনের জন্য পাতালতলে বন্দী হইয়া রহিয়াছেন; অতিমানবশেই কৌরবকুলের নিপাত হইয়াছিল। সেইরূপ অতিগৌরবের উচ্চশিরে পদার্পণ করিয়াই সুবিশাল কনোজরাজ্য অধঃপতিত হইয়াছে। যেরূপ গৌরবগরিমায় কনোজরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, অধঃপতনের পূর্ব্বে তদপেক্ষাও চতুর্গুণ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। হায়! দুরাচার কুলাঙ্গার জয়চাঁদই কনোজের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। সেই স্বজাতিদ্রোহী পাপাত্মা হইতেই স্বর্ণধাম কনোজ শ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।

যে সময়ে বীরকেশরী রাঠোর-চূড়ামণি নয়নপাল কৌশিকবংশের লীলাক্ষেত্র কান্যকুব্জে স্বীয় বিজয়পতাকা সমুড্ডীন করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ রাজ্যের পরিধি পঞ্চদশক্রোশব্যাপী ছিল। সেই সময় রাঠোরবংশের প্রচণ্ড অনীকিনী দলপাঙ্গলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই সময় জগতে এমন কোন বলবতী সেনাচমূ দৃষ্ট হয় নাই, রাঠোরবাহিনী যাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে না পারে। রাঠোরনৃপতি যে সময় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন, সেই সময় অশীতিসহস্র কবচধারী বীর, পাখুর—(একপ্রকার তুলাপূর্ণ বর্ম্ম) পরিহিত ত্রিংশৎসহস্র সাদী (অশ্বারোহী), ত্রিলক্ষ পদাতি এবং দুই লক্ষ ধানুষ্ক ও পরশুধারী এবং অগণিত রণমাতঙ্গ তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইত। এই বিশাল সৈন্যদলের পদভরে ধরিত্রীসতী ঘন ঘন বিকম্পিতা হইতে থাকিতেন। এক সময়ে এই বিশালবাহিনী লইয়া রাঠোরপতি মুসলমানের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সিন্ধুনদের দূরবর্ত্তী প্রদেশে সেই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যে দিন সিন্ধুনদ পার হইয়া গর ও ইরাণের মুসলমানপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন, রণবিজয়ী মহাবীর জয়সিংহ সেই দিন তাঁহার প্রচণ্ডবিক্রম প্রতিরোধ করিবার জন্য যবনরাজের সম্মুখীন হইলেন। হিন্দুমুসলমানে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। উভয়পক্ষেরই অসংখ্য অসংখ্য সেনা রণভূমে শয়ন করিতে লাগিল; মানবশোণিতে সিন্ধুনদের নীলসলিল লোহিতাভা ধারণ করিল। অবশেষে হাবশীরাজ এবং তদীয় ফ্রাঙ্কসৈন্যগণ বীরকেশরী মহাবল কনোজরাজের নিকট পরাভূত হইলেন। অচিরেই কনোজপতির বিজয়-বৈজয়ন্তী সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে সমুড্ডীন হইল।

চৌহানেরা রাঠোরদিগের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু রাঠোরবীরগণের মহাবীরত্ব দর্শনে চৌহান ভট্টকবিরাও তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। নয়নপালের বংশধরকে তাঁহারা

মাণ্ডলিক আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা আপন আপন কাব্যগ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন, জয়সিংহ উত্তরপ্রদেশস্থ যবন নৃপতিকে পরাভূত করিয়া তাঁহার আটটি সামন্তরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন। অনেকগুলি হিন্দুরাজও জয়সিংহের বিক্রমবহ্নির প্রদীপ্ত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আপন সম্মান-গৌরবের সহিত পতঙ্গবৎ তাহাতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন।

জয়সিংহের রাজত্বকালে শোলান্‌কি সিদ্ধরাজ আনহলবারাপত্তনের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। মহাবীর জয়সিংহ তাঁহাকেও দুইবার সংগ্রামে পরাজয় করেন। রাঠোরনৃপতির প্রভুত্ব নর্ম্মদার দক্ষিণকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কেবল যে পৃথিবীবাসীর নিকটেই রাঠোররাজ সম্মান-সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, এমন নহে, রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের নিকট সম্মান লাভ করিতেও তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই মহাযজ্ঞের আয়োজন, আড়ম্বর ও গৌরব যেরূপ, তাহা চিন্তা করিলে কোন্ ভারতসন্তানের হৃদয় উৎফুল্ল না হয়? ধর্ম্মরাজ পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির যে দিন কৃষ্ণা ও অনুজগণের সহিত মহাপ্রস্থানের উপক্রম করেন, সেই দিন হইতেই ভারতে এই মহাযজ্ঞের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কোন নৃপতিই আর ইহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। অধিক কি, হিন্দুকুলের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া যিনি ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ, যাঁহার সুবিচার ও শাসনপদ্ধতি দর্শনে দেবগণও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন, যাঁহার প্রতিষ্ঠিত শকাব্দ আজিও' প্রতিষ্ঠাতার গুণগৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেই তুয়ারকুলতিলক রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যও এরূপ সম্মানলাভের অধিকারী হইতে পারেন নাই। সৌভাগ্যবশেই কনোজরাজ সেই কঠোরযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের সমস্ত রাজন্যসমিতির নিকট নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল। এই বিশালযজ্ঞের আয়োজন-সংবাদ পাইয়া সকলেরই হৃদয় স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া পড়িল। দশদিকে সকলের মুখেই জয়চাঁদের সাধুবাদ ভিন্ন অন্য কিছু শ্রুতিগোচর হইল না। নিমন্ত্রণপত্রে আর একটি কথা প্রকাশিত ছিল। মহাযজ্ঞের সঙ্গে পরমলাবণ্যবতী রাজকুমারী সংযুক্তা স্বয়ংবরা হইবেন; তিনি রাজন্যসমিতির মধ্য হইতে আপন পতি মনোনীত করিয়া লইবেন।

যজ্ঞের দিন সমাগত। যজ্ঞসভা যথানিয়মে সুসজ্জিত। নানা দিগ্দেশ হইতে একে একে নরপতিগণ আপন আপন অনুচরবর্গ ও সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কনোজনগরী অমরাবতী সদৃশ শোভা ধারণ করিল। মহাকবি চাঁদভট্টের কাব্যগ্রন্থে এই সভার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের মধ্যে যেখানে যেখানে হিন্দুনরপতি ছিলেন, কি বৃদ্ধ, কি প্রৌঢ়, কি যুবা সকলেই সেই সভায় আসিয়া যোগদান করিলেন। কিন্তু চৌহানপতি পৃথ্বীরাজ ও গিহ্লোটকুলতিলক সমরসিংহ উপস্থিত হইলেন না; তাঁহাদের বিবেচনায় জয়সিংহ রাজসূয়যজ্ঞের উপযুক্ত সম্মানপাত্র নহেন। অগত্যা জয়চাঁদ ঐ দুই নরপতির দুইটি স্বর্ণ-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সেই দুটিকে অতি নীচকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। পৃথ্বীরাজকে অবমানিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার হৈমপ্রতিমূর্ত্তিকে প্রতিহারিরূপে দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। আশু পৃথ্বীরাজের নিকট এ সংবাদ পৌছিল; যুগপৎ জিঘাংসা ও ক্রোধ সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। একান্ত উত্তেজিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যেরূপে পারি, প্রতিশোধ লইব; দুর্ব্বৃত্তের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া তাহার কন্যাকে হরণ করিয়া আনিব।"

পৃথ্বীরাজের প্রতিজ্ঞা কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সূত্রে রাঠোরের সহিত চৌহানগণের যে ঘোরতর সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শীঘ্র প্রশমিত হয় নাই। সেই সংঘর্ষ

নিবন্ধন অসংখ্য রাজপুতসৈন্য রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিল। পৃথ্বীরাজ যে সময় সংযুক্তাকে হরণ করেন, তখন যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, ক্রমাগত পাঁচ দিন সেই যুদ্ধ অবিরাম প্রচণ্ডবেগে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। এই গৃহবিবাদই ভারতের অধঃপতনের মূলকারণ। এই গৃহবিবাদে উভয়পক্ষেরই অসংখ্য অসংখ্য সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এ দিকে চতুরচূড়ামণি ঘোরী সুলতানও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সেই প্রচণ্ডবিক্রম ব্যর্থ করিবার অভিলাষে দৃষদ্বতীতীরে অগণিত রাজপুতবীর সমবেত হইলেন। অচিরে হিন্দুমুসলমানে মহাসংগ্রাম বাধিল। এই মহাযুদ্ধই ভারতের সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই। এই মহাযুদ্ধ ভারতমাতার পদে চিরদিনের জন্য দুশ্ছেদ্য দাসত্ব নিগড় বন্ধন করিয়া দিল।

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, ভারতবর্ষ তখন চারিটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল;—দিল্লী, কনোজ, মিবার ও আনহলবারা। তন্মধ্যে দিল্লী তুয়ার ও চৌহানগণের, কনোজ রাঠোরদিগের, মিবার গিহ্লোটদিগের এবং আনহলবারা সৌর ও শোলাঙ্কিদিগের অধীনে ছিল। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে অনেকগুলি সামন্তনৃপতিও বাস করিতেন। সামন্তপ্রথার নিয়মানুসারে স্ব স্ব অধিপতির আজ্ঞাপালন এবং সংগ্রামসময়ে তাঁহার অধীনে উপস্থিত হওয়াই তাঁহাদিগের কার্য্য। দিল্লী ও কনোজ এই দুইটি রাজ্য স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিসংবাদী সত্য, কিন্তু রাজ্যদুটি পরস্পর অনতিদূরবর্ত্তী। উভয়রাজ্যের মধ্যভাগে কালীনাম্নী একটি ক্ষুদ্রনদী প্রবাহিত হইতেছে। একদিকে কালীনদী হইতে সিন্ধুনদের পশ্চিমকূল পর্য্যন্ত এবং অন্যদিকে হিমাচলের পাদপ্রস্থ হইতে দূরবর্ত্তী মরুস্থলী ও আরাবল্লী-পর্ব্বতপ্রাকার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তুয়ার অনঙ্গপাল এই বিশালসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। চৌহান পৃথ্বীরাজ এই রাজ্য অধিকার করিয়া যখন ইহার শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, অষ্টাধিক-শত সামন্তনৃপতি তখন তাঁহার শাসনাধীনে ছিলেন। কনোজসাম্রাজ্যের উত্তরে হিমাচল, পূর্ব্বদিকে বারাণসী এবং চম্বল পার হইয়া বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, দক্ষিণে মিবারের উত্তরসীমা। ভট্টকবিগণ তাঁহাদিগের কাব্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত রাজা প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন, পরস্পর পরস্পরের শোণিতপাত করিয়া জিঘাংসার শান্তিবিধান করিতেন। যখন হইতে এই কয়টি রাজ্যের রাজনৈতিক জীবন আরব্ধ হয়, তখন হইতেই গিহ্লোট ও চৌহানে সখ্যভাব এবং রাঠোর ও তুয়ারে প্রচণ্ডভাব সংবদ্ধ হইতে দেখা যায়। রাঠোর ও তুয়ারগণের শত্রুভাবই ভারতের অধঃপতনের একটি প্রধানতম কারণ সন্দেহ নাই।

দৃষদ্বতীতীরে যে দিন হিন্দুমুসলমানে মহাসংগ্রাম ঘটে, দৃষদ্বতীর লালজল যে দিন নরশোণিতে লোহিতাভা ধারণ করে, নরশোণিতের সহিত ভারতের গৌরবসূর্য্য যে দিন দৃষদ্বতীসলিলে নিমজ্জিত হয়, যবনবীর শাহাবুদ্দীন সেই দিন পাণ্ডবচূড়ামণি যুধিষ্ঠিরের পবিত্ররাজধানী অধিকার করিয়া তাহার সমুচ্চশিখরে বিজয়বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন করিয়া দিলেন। কেবল তাহাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না, জয়লিপ্সা হৃদয়ে বলবতী হওয়াতে তৎক্ষণাৎ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মহাবিক্রমে তিনি জয়চাঁদকে আক্রমণ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে পৃথ্বীরাজের সহিত মহাযুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতে জয়চাঁদের সেনাবল অনেক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ মুসলমানের আক্রমণদর্শনে তিনি একান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও অতুল উৎসাহের সহিত তিনি সেনাবল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরেই কতকগুলি বীরসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি যবনসেনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।" অবিলম্বেই

হিন্দু-মুসলমানে ঘোরযুদ্ধ সংঘটিত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রাজপুতবীরগণ মুসলমানের প্রচণ্ড-বল প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। জয়চাঁদ তরণীযোগে গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, সহসা নৌকাখানি অতল সলিলগর্ভে নিমগ্ন হইল। জয়চাঁদের আশা-ভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল। সদলে তিনি সুরধুনীর পবিত্রক্রোড়ে চিরদিনের জন্য প্রসুপ্ত হইলেন। ১২৪৯ সংবতে (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

জয়চাঁদ চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে শেষবিদায় গ্রহণ করিলেন, কনোজের বিশালক্ষেত্র হইতে নয়নপালের বংশতরুও চিরদিনের জন্য সমুৎপাটিত হইল। সামন্ত-নৃপতিগণ বিষণ্ণবদনে আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। নয়নপালের যে কতিপয় বংশধর জীবিত ছিলেন, ভারতের মরুপ্রান্তরে আসিয়া তাঁহারা উপনিবেশস্থাপন করিলেন। সেই বালুকাময় মরুক্ষেত্রেই তাঁহাদিগের বংশতরুর বীজ হইতে ধীরে ধীরে অঙ্কুরোদ্গম হইতে লাগিল; ক্রমে সেই অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে শাখাপ্রশাখা বহির্গত হইয়া আবার ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবজী ও সত্যরামের অভিযান, সত্যরামের মৃত্যু, শিবজীর বিবাহ, শিবজীর মৃত্যু, অশ্বত্থামার অভিষেক, শোনিঙ্গ, অজমল, অশ্বত্থামার মৃত্যু, রায়পাল, রাও কনহল, রাও বিরামদেব, রাও চেদো ও বিদো, রাও শিলুক, রাও বিরামদেব, রাও চন্দ, রাও রণমল্ল, অজমীরজয়, রণমল্লনিধন, সামন্ততালিকা

স্বদেশদ্রোহী জয়চাঁদ সুরধুনীসলিলে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। অতঃপর অষ্টাদশ বৎসর পরে ১২৬৮ সংবতে তাঁহার পৌত্র শিবজী ও সত্যরাম জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুপ্রান্তরে প্রস্থান করিলেন। দুইশতমাত্র সহচর তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিলেন, তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, পবিত্র-তীর্থ দ্বারকাদর্শনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কোন কোন ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা সৌভাগ্যের সুপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজপুতবংশে শিবজীর জন্ম। তিনি গৌরবগর্ব্বিত রাঠোরবংশের সুযোগ্য বংশধর। পিতৃ-পুরুষগণের প্রণষ্টগৌরবের কথা যে নিরন্তর তাঁহার স্মৃতিপটে সমুদিত থাকিবে, সেই পূর্ব্বগৌরব উদ্ধার করিতে তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা বিচিত্র নহে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মুষ্টিমেয় অনুচর সমভিব্যাহারে মরুভূমিতে যাত্রা করিলেন। উত্তপ্ত বালুকাময়ী যন্ত্রণাদায়িনী মরুভূমিতে বিচরণ করিয়াও দৃঢ় অধ্যবসায় হইতে তিনি বিচলিত হইলেন

না।। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় গমন করিলে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসাদ পাইতে পারিবেন, কিছুই তিনি স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না; অবশেষে শরীরপাত কিংবা কার্য্যসাধন এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও অটল উদ্যমের সহিত ঐ মন্ত্রসাধন করাতে অল্পকালমধ্যেই তিনি বিশালসাম্রাজ্যের অধিপতি হইতে পারিয়াছিলেন। সেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক যমুনা, সিন্ধু ও গারানদী এবং আরাবল্লীর গগনস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণী এই চতুঃসংখ্য বিভাগরেখা দ্বারা সংবদ্ধ।

ঐ সময়ে এই বিশালপ্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাস ছিল। কচ্ছবাহগণ তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে পারেন নাই। ইঁহাদের পূর্ব্বতন পুরুষ রাও পুজন ইতিপূর্ব্বে কনোজযুদ্ধে মুসলমানের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তৎপুত্র মিলাইসিংহ কুশাবহবংশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। শম্বর, অজমীর ও অপরাপর চৌহানরাজ্য যবনের অধিকৃত, কিন্তু আরাবল্লীর অন্তর্গত কতকগুলি দুর্গ তখনও রাজপুতগণের অধিকারে ছিল; নাদোলনগরও যবনের অধিকৃত হয় নাই; বিশালদেবের এক বংশধর তথায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। মুন্দরনগরের দুর্গচূড়ায় তখন পুরীহরবংশের গৌরবপতাকা সমুড্ডীন ছিল। মানসিংহ তত্রত্য শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। পুরীহরবংশের অন্যতম শাখা ইয়েন্দ-গোত্রে ইঁহার জন্ম। মুন্দরের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ভূমিয়া-সামন্ত বাস করিতেন, তাঁহাদিগের নিকট মানসিংহ পূজা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। সামন্তগণ তাঁহাকেই আপনাদের প্রধান ভূপতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এখন ভারতে যাহাদিগের নামমাত্রও শ্রুত হয় না, সেই মোহিলগণ তখন উত্তরদিকে নগরকোটের নিকট বাস করিত। ইহারা তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ঔরীন্তনগর তখন মোহিলদিগের প্রধান রাজপাট ছিল। ১৪৪টি পল্লী তখন মোহিলগণের অধীনে ছিল। এখন যে স্থান বিকানীর রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই স্থান হইতে ভাইটনর পর্য্যন্ত সমগ্র স্থল তখন জিৎসম্প্রদায়ের অধীনে ছিল; এই সমস্ত স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিভক্ত হইয়া সাধারণতন্ত্র অনুসারে শাসিত হইত। এই স্থান হইতে গারানদীর পুলিনপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে কতকগুলি অসভ্যজাতি বাস করিত। তাহারা জোহিয়', দেয়া ও লঙ্গহা নামে প্রথিত। এই সকল জাতির মধ্যে অনেকে যবনহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, অনেকে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপন আপন প্রাচীন নাম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, জারিজাগণ সিন্ধু ও কচ্ছদেশে, ভট্টিগণ যশল্মীরে এবং সোদারা তাহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল। ইহাদের এবং আবু ও চন্দাবতীর প্রমারগণের মধ্যভাগে শোলাঙ্কিগণ অধিবসতি করিতেন। এতদ্ব্যতীত গোহিল, শোণিগুরু, দেব প্রভৃতি অনেকগুলি জাতি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাস্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদিগের মধ্যে রাঠোরবীরগণের হস্তে অনেকেই নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলে ভূমিয়া-সামন্তরূপে দিনপাত করিতেছে।

যে জন্মভূমির জন্য রাজপুতগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে, অধিক কি, জীবন-বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হন না, জীবনের জীবনস্বরূপিণী স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া শিবজী কতিপয়-মাত্র রাজপুতবীর অনুচর সমভিব্যাহারে মরুভূমিতে গমন করিলেন।

রাঠোরবংশের বংশধর হইয়া, রাজসিংহাসনের উপযুক্ত হইয়া আজি শিবজীকে নিঃসহায় ও নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভারতের দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে হইল।. নানাচিন্তায় তাঁহার উদারহৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। দৃঢ় অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা সহকারে তিনি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করিয়া হৃদয় দৃঢ়ীভূত করিলেন। বিপদে সহিষ্ণুতাই যে বুদ্ধিমানের অবলম্বনীয়, মহানুভব

শিবজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ মরুস্থলীতে উপস্থিত হইয়া তিনি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে কলুমদ নামক প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান বিকানীর নগরের ২০ মাইল পশ্চিমে কলুমদ সংস্থিত। তৎকালে ঐ স্থান শোলান্‌কিরাজের অধিকারে ছিল। শিবজী উপস্থিত হইবামাত্র শোলান্‌কিরাজ সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শিবজী অকৃতজ্ঞ নহেন। শোলান্‌কির সাদর ব্যবহারে তিনি যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন এবং তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঐ সময়ে লাক্ষফুলান নামক এক দুর্ব্বৃত্ত রাজপুত কলুমদে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মরুভূমির অন্তর্গত ফুলারা নামক দুর্গে অবস্থিতি করিয়া লাক্ষফুলান আপন শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন; তাঁহার সেই দুর্গ শক্রগণের দুর্জ্জয় ও দুর্ভেদ্য। জারিজাকুলে ঐ দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতের জন্ম। শতদ্রুতীর হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের অধিবাসীরা দুর্দ্ধর্ষ লাক্ষফুলানের নাম শ্রবণমাত্র বিকম্পিত হইত। তিনি দুর্দ্দান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বল বা নিরাশ্রয়ের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করিতেন না; সদনুষ্ঠানে ও দানাদিতেও তিনি কিছু কিছু অর্থব্যয় করিতেন। লুনী হইতে সিন্ধুনদের মোহানা পর্য্যন্ত সমগ্রদেশবাসী লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসাসূচক সঙ্গীত শ্রুত হইত। রাজস্থানের অন্তর্গত কশপগড়, সূর্য্যপুর, বশকগড়, অন্ধানীগড়, জগরুপুর ও ফুলগড় (ফুলারা) এই ছয়টি নগর লাক্ষের অধিকৃত ছিল। লাক্ষের প্রশংসাকারীরা একটি শ্লোক কীর্ত্তন করিত, ঐ ছয়টি নগরে যে লাক্ষের আধিপত্য আছে, তাহারই মর্ম্ম শ্লোকাকারে গ্রথিত। শ্লোকটি এই,—

"কশপগড়া সুরজপুরা, বশকগড়া তাকো। অন্ধানীগড়া জগরুপুরা, যো ফুলগড়িই লাখো॥"

অর্থাৎ কশপগড়, সূর্য্যপুর, বশকগড়, অন্ধানীগড়, জগরুপুর ও ফুলারাদুর্গ (ফুলগড়) তাকো (তক্ষক) লাক্ষার (লাক্ষের) অধিকৃত ছিল।

শোলান্‌কিরাজের অনুরোধে বীরকেশরী শিবজীকে সেই দুর্দ্ধর্ষ লাক্ষের প্রতিকূলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। শোলান্‌কিরা শিবজীকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। শিবজীর ভ্রাতা সত্যরাম এবং রাঠোরবীরেরা সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অবিলম্বে উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ঘোরযুদ্ধের পর মহাবীর শিবজীর নিকট দুর্দ্ধর্ষ লাক্ষফুলান পরাজিত হইলেন। দুঃখের বিষয়, অনেকগুলি রাঠোরবীরের সহিত সত্যরাম সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিজয়ের সংবাদ পাইয়া কলুমদপতির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। আনন্দে রাঠোররাজকুমার শিবজীকে তিনি আলিঙ্গন করিলেন এবং স্বীয় ভগিনীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদানপূর্ব্বক তৎসহ সুদৃঢ় সম্বন্ধ সংস্থাপন করিলেন।

অতঃপর জয়লব্ধ পুরস্কার সমভিব্যাহারে শিবজী তীর্থপর্য্যটনার্থ দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে আনহলবারাপত্তন তাঁহার নেত্রগোচর হইল। শ্রান্তিদূর করিবার অভিলাষে তিনি সেই নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া আনহলবারার অধিপতি প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ ও যথাযোগ্য আতিথ্যবিধানে সম্মানিত করিলেন। আনহলবারাতেই কিছু দিন অতীত হইল।

এদিকে দুর্দ্ধর্ষ লাক্ষফুলান আনহলবারা অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সেই নগর আক্রমণ করিলেন। পত্তনরাজের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। শিবজী

তাঁহাকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং লাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে লাক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রিয়ভ্রাতা সত্যরাম নিহত হইয়াছেন, শিবজীর হৃদয়ে তদবধিই ভ্রাতৃশোকশেল বিদ্ধ রহিয়াছে; লাক্ষ যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং বীরকেশরী ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ প্রদান করিতে পারেন নাই। আজি ভ্রাতৃশোকের সহিত বলবতী জিঘাংসা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। আজি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভ্রাতৃহন্তার হৃদয়শোণিতে ভ্রাতৃশোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন। অচিরেই তুমুলযুদ্ধ সংঘটিত হইল। উভয়পক্ষের সৈন্যগণ অদূরে দণ্ডায়মান রহিল দুর্দ্ধর্ষ লাক্ষ ও বীরকেশরী শিবজী উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের বাহ্বাস্ফোটনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল উভয়ের তীক্ষ্ণতরবারির সংঘর্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্বৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া রণভূমি সমুদ্ভাসিত করিতে লাগিল, উভয়ের পদভরে ধরণীদেবী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। কুক্ষণে আজি দুর্দ্ধর্ষ লাক্ষ রণযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন, কুক্ষণে তিনি আনহলবারা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কুক্ষণে শিবজীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ক্রমে তিনি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর শিবজীর হস্তে আর তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, অবিলম্বেই তাঁহার ছিন্নমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইয়া সৈন্যবৃন্দের বিস্ময়োৎপাদন করিল। পত্তনসৈন্যগণের জয়নাদে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শতদ্রু হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত প্রদেশবাসী লোকের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; বীরকেশরী শিবজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলেই একান্তমনে পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিল।

বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া বীরসিংহ শিবজী পত্তন হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিন লুনীনদীর তীরদেশে অবস্থিতি করিলেন। এই ক্ষুদ্রনদী আজমীরের নিকটবর্ত্তী বিশাল তালাও নামক হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া মহানদ সিন্ধুর বদ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী সলিলগর্ভে নিপতিত হইয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম সাগরমতী। লুনী গোবিন্দগড় নামক স্থানে সরস্বতী-নাম্নী অন্য একটি নদীর সহিত সঙ্গত হইয়াছে। লুনীনদীর তীরে যে স্থানে শিবজী অবস্থিতি করিলেন, তথায় মিবো নামে একটি নগর ছিল। রাজবারার ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের অন্তর্ভূত দেবীগণ তথায় অবস্থিতি করিতেন। শিবজী তাঁহাদিগকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া মিবোনগর হস্তগত করিয়া লইলেন। উপর্য্যুপরি জয়লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয় আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল; বলবতী জিগীষা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তিনি ক্ষীরধরের গোহিলগণকে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বেই তাঁহার হস্তে গোহিলকুল নির্ম্মূলপ্রায় হইয়া গেল। সেই স্থানে তিনি বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসাদে অচিরেই তত্রত্য শাসনকর্ত্তা মহেশদাস তাঁহার হস্তে বন্দী হইলেন। হতাবশিষ্ট গোহিলেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; বীরপুঙ্গব শিবজী লুনীনদীর তীরবর্ত্তী সৈকতপ্রদেশে প্রাচীন ক্ষীরনাথের লীলাক্ষেত্রে রাঠোরবংশের বিজয়-কেতন সমুড্ডীন করিয়া দিলেন। এই স্থানেই কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইল।

আশু শিবজীর উন্নতিলাভের আর একটি পন্থা উপস্থিত হইল। সেই সময়ে ঐ প্রদেশের অদূরবর্ত্তী পল্লী নামক নগরের প্রান্তসীমায় কতকগুলি ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁহারা তত্রত্য অনেকগুলি ভূমিসম্পত্তির স্বত্ব উপভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু পার্ব্বত্য মৈর ও মীনগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক নানারূপে উৎপীড়ন করিত। নিরীহ ব্রাহ্মণগণ সেই দুর্ব্বৃত্তগণের কঠোর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি শিবজীর অদ্ভুত অবদান-পরম্পরার কথা তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল। শিবজীর শরণ গ্রহণ করিবার

অভিলাষে তাঁহারা তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক আপনাদিগের দুরবস্থার বিষয় বর্ণন করিলেন। শিবজী তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া নিরীহ বিপ্রকুলের আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাতেও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শিবজী পল্লীনগরী হইতে প্রস্থান করিলেই দুর্ব্বৃত্ত পর্ব্বতবাসী মৈর ও মীনগণ পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে। অগত্যা তাঁহারা শিবজীকে আপনাদিগের নিকটে রাখিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন। সাদরে সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া শিবজী পল্লীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই পল্লীবাসেই শোলান্‌কি-কন্যার গর্ভে শিবজীর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কুলাচার্য্য ডাকিয়া জাতকর্ম্মাদি সমাপনপূর্ব্বক শিবজী নবকুমারের অশ্বত্থামা নামকরণ করিলেন।

শিবজী নিরীহ ব্রাহ্মণগণের শান্তিপূর্ণ আবাসে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই প্রশান্ত হইল না। পল্লীনগরীর সমস্ত ভূসম্পত্তির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কিরূপে ঐ বাসনা ফলবতী হইবে, অনেক চিন্তা করিয়াও তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণগণকে বধ করিলে মনোরথ পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণহত্যারূপ মহাপাপে নিমগ্ন হইতে হয়। সামান্য ভূমির জন্য সেরূপ মহাপাপে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত কুলাঙ্গারের কার্য্য। দুঃখের বিষয়, রাঠোরবীরের হৃদয় ক্রমে ক্রমে দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়িল। তিনি মহাপাপের বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না, যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল, আজি তিনি পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া, কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাদিগকেই বধ করিতে উদ্যত হইলেন। জনরব এইরূপ, তাঁহার শোলান্‌কিনী ভার্য্যাই তাঁহাকে ঐরূপ মহাপাপের পথে পদার্পণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। যাহা হউক, শিবজী সেই অনর্থকরী দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কল্পসিদ্ধির উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন অতীত হইয়া ক্রমে হোলী-পর্ব্বোৎসব উপস্থিত হইল। এই উৎসবসময়ে হিন্দুগণ সকল প্রকার বৈষয়িক চিন্তা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আবীর-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া উঠেন। শিবজী সেই সুযোগে পল্লীর ব্রাহ্মণগণকে বধ করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিয়া লইলেন। এই গর্হিত মহাপাপের অনুষ্ঠান করাতে শিবজীর নামে যে কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল, কিছুতেই তাহার অপনয়ন হইল না। সেই দুষ্কর্ম্মের পর তাঁহাকে আর অনেক দিন সুখভোগ করিতে হইল না। ব্রহ্মহত্যার ও বিশ্বাসঘাতকতার পাপপঙ্কে হস্ত কলুষিত করিয়া তিনি ব্রহ্মসম্পত্তি হরণ করিলেন বটে, কিন্তু এক বৎসরের অধিককাল তাহা ভোগ করিতে পাইলেন না। অচিরেই তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইল।

শিবজীর তিন পুত্র ;—অশ্বত্থামা, শোনিঙ্গ ও অজমল। শিবজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বত্থামাই গোহিলগণের হস্ত হইতে ক্ষীরধর আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। প্রায়ই দেখা যায়, পিতার দোষগুণ ঔরসজাত পুত্রে অনেক পরিমাণে সংক্রামিত হয়। অশ্বত্থামাও সেইরূপ পিতার ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা ও অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। নানারূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি অনেকগুলি ভূমিসম্পত্তি হস্তগত করিলেন। সেই সমস্ত ভূমিসম্পত্তি হইতে স্বায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোনিঙ্গকে ইদর-জনপদের আধিপত্যে স্থাপন করিলেন।

ইদর গুর্জ্জরের সীমান্তভাগে অবস্থিত। তৎকালে দেবী-বংশীয় এক নরপতি তত্রত্য শাসনদণ্ড

পরিচালন করিতেছিলেন। তত্রত্য নরপতির চরমা'বস্থায় চতুর-চূড়ামণি অশ্বত্থামা চতুরতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা অবলম্বনপূর্ব্বক সেই জনপদ অধিকার করেন। শোকবিহ্বল নাগরিকবৃন্দ রাঠোররাজ-কুমারের এই প্রকার জঘন্য কদাচরণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। শোনিজের বংশধরেরা হাত-ন্দির রাঠোর নামে পরিচিত। শিবজীর কনিষ্ঠ পুত্র অজমলও ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দারুণ জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সৌরাষ্ট্রের অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার প্রচণ্ড তরবারি চালিত করিতে-ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের পশ্চিমপ্রান্তে ওকমণ্ডল নামে একটি নগরী ছিল। প্রাচীন সৌরবংশীয় বিকমসি (বিক্রমসিংহ) নামে এক রাজা তৎকালে তাহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। অজমল তাঁহাকে বধ করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তদবধি অজমলের বংশধরেরা "বধেল" নামে পরিচিত। এই অদ্ভুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রাঠোরবীর অজমলের উত্তরাধিকারীরা অদ্যাপি দ্বারকায় ও তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন।

অশ্বত্থামার আট পুত্র ;—দুহর, জপসি, খিম্পসৌ, ভোপসু, ধণ্ডল, জৈতমল, বন্দুর ও উহর। ইহারা আটভ্রাতাই স্ব স্ব নামে এক একটি গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। সেই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে দুহর, ধণ্ডল, জৈতমল ও উহরের গোষ্ঠী এখনও বিদ্যমান আছে, অবশিষ্টগুলির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। অশ্বত্থামার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুহর পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। অপ্রসিদ্ধ স্বল্পরাজ্যের অধিপতি হইয়া তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইল না। আর একটি উচ্চবাসনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। কনোজ-রাজ্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের লীলাভূমি। দুহর বাল্যকাল হইতেই কনোজরাজ্য উদ্ধার করিবার বাসনা হৃদয়ক্ষেত্রে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তিনি সেই বাসনা ফলবতী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। কনোজোদ্ধারে সমর্থ না হইয়া তিনি পুরীহরগণের হস্ত হইতে মুন্দর নগর আচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার সে প্রয়াসও বিফল হইল ; অধিকন্তু তিনি ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। পুরীহর নৃপতির শোণিতপাত করিতে গিয়া তাঁহাকে আত্মশোণিত দান করিতে হইল।

দুহরের সাত পুত্র ;—রায়পাল, কীরতপাল, বিহার, পিটল জুগেল, দালু ও বিগর। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রায়পাল পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই পিতৃহন্তা পুরীহররাজকে প্রতিফল প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনমধ্যে আয়োজন শেষ হইল। তখন রায়পাল সেই সুসজ্জিত সেনাদল লইয়া মুন্দরদুর্গ আক্রমণ করিলেন। পুরীহরপতি তাঁহার সেই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। মুন্দরদুর্গ বিজয়ী রায়পালের অধিকৃত হইল। কিন্তু রায়পালকে অধিকদিন মুন্দর-দুর্গে সুখভোগ করিতে হইল না। অচিরে বিজিত পুরীহরগণ পুনরায় সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া রায়পালকে মুন্দর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

রায়পালের ত্রয়োদশ পুত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র কহল পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট পুত্রগণ তৎপ্রদেশে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কহলের পুত্র জহল, জহলের পুত্র চেদো এবং চেদোর পুত্র থিদো। ইতিহাসে এই সমস্ত রাঠোর রাজপুত্রের কার্য্যের কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। কেবল এইমাত্র বর্ণিত আছে যে, ইহারা সকলেই বিশেষ জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া স্ব স্ব নিকটবর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দের উপর নিরন্তর অত্যাচার করিতেন ;—কখনও পরাজিত হইতেন, কখন বা প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করিয়া তাহাদিগের ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিয়া লইতেন। যশল্মীরের ভট্টি-দিগের ইতিহাসগ্রন্থে লিখিত আছে, ইঁহাদের মধ্যে চেদো ও থিদোই অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন।

ভট্টিদিগের প্রতি ইঁহারা নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিতেন। সেই জন্য ভট্টিরা ইঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে ক্ষীররাজ্যে আগমনপূর্ব্বক ইঁহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। রাও থিদোর রাজ্য অনেক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি শোণিগুরু-সর্দ্দারের অধিকৃত জিনমহল জনপদ এবং দেবের ও বেসিচারিদিগের রাজ্যসমূহেরও কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। থিদোর সন্তান-সন্ততিগণ শিলকাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। মিবো ও রুদ্র নগরে ইঁহারা ভূমিয়ারূপে অবস্থিতি করিতেছে। থিদোর মৃত্যুর পর শিলক তদীয় সিংহাসন অধিকার করেন। ভট্টগ্রন্থে ইঁহারা কোন কার্য্যবিবরণ বর্ণিত নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর বিরামদেব সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বিরামদেবের সন্তানসন্ততিগণ বিরামুত নামে প্রসিদ্ধ। বিরামদেবের একটি পুত্র ছিল, নাম বীজো। সেই বীজোর বংশধরগণ বীজাবৎ নামে অভিহিত হইয়া সৈতরু, শিবানো ও দৈচু নামক তিনটি জনপদে অবস্থিতি করিতেছেন। বিরামদেবের পর চণ্ড রাঠোরকুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। বিরামদেব উত্তর-প্রদেশস্থ জোহিয়াগণকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার বীরপুত্র চণ্ড হইতে রাঠোরকুলের উন্নতিসাধন হয়। চণ্ড যেরূপ বীর, রাজনীতিতেও সেইরূপ বিশারদ ছিলেন। অলৌকিকী দূরদর্শিতা-প্রভাবে রাঠোরবংশের ভাবী ভাগ্যলিপি পাঠ করিয়া তিনি রাঠোরসমিতির হৃদয়ে এরূপ তেজ ঢালিয়া দিলেন যে, একমাত্র তাঁহারই প্রভাবে বীরকেশরী শিবজীর বংশ মহাগৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে একাদশ পুরুষের মধ্যে রাঠোরকুল রাজবারার প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে আপনাদিগের বংশকে শ্রীবৃদ্ধির উচ্চসোপানে উত্থাপিত করিতে পারিত; আপনাদিগের বীরত্ব-প্রভায় সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিতে সক্ষম হইত; কিন্তু তাহাদিগের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, তাহারা সাহসও করে নাই। ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগের জয়ার্জ্জনের অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু তৎসমুদায়ে তাহাদের কঠোর উদ্যম বা দৃঢ় অধ্যবসায় দৃষ্ট হয় নাই। যাহাদের হৃদয়ে কঠোর উদ্যম ও দৃঢ় অধ্যবসায় স্থান না পায় অনুধাবন করিয়া আত্মোন্নতি-সাধনে যাহারা অগ্রসর না হয়, এ জগতে উন্নতিলাভ করা তাদৃশ রাজপুতের পক্ষে দুরূহ। শিবজীর বিপুল বংশ এতদিন সে পথে অগ্রসর হয় নাই, সুতরাং রাঠোরকুলের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই মহাবীর চণ্ড তাহা বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিতে পারিয়াই রাঠোরদল যেন এক নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল; অভিনব দুর্দ্ধর্ষ বল আসিয়া যেন তাহাদের হৃদয় মহাবলপূর্ণ করিয়া তুলিল। তখন চণ্ড সেই সকল বিচ্ছিন্ন রাঠোরগণকে একত্র করিয়া ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য মুন্দর আক্রমণ। চণ্ডের সেই ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করা পুরীহরাজের অসাধ্য হইয়া পড়িল। তিনি হৃদয়শোণিত দান করিয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া পুরীহর নৃপতির সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। রাঠোরবীর চণ্ডের প্রতি জয়লক্ষ্মীর প্রসন্নদৃষ্টি নিপতিত হইল। অচিরেই রাঠোরকুলের বিজয়বৈজয়ন্তী মরুস্থলীর প্রাচীনদুর্গের চূড়ায় বিরাজ করিতে লাগিল।

রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি উন্নতিলাভের চেষ্টা করেন, উদ্যম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা এই তিনটি গুণে অলঙ্কৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোতোভাবে বিধেয় নচেৎ তাঁহার সৌভাগ্যপথ সুপরিষ্কৃত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এই তিনটি সদ্গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই বীরকেশরী চণ্ড অসংখ্য বিঘ্ন-বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক অবশেষে মুন্দরের সিংহাসন লাভ করিতে পারিলেন। নতুবা এই জয়লাভের সাতদিন পূর্ব্বে তিনি যেরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া কেহই ভাবে নাই যে, চণ্ড মুন্দরের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেন। পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত

সমস্ত ভূমিসম্পত্তি হইতেই তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এমন কি, প্রাণরক্ষার জন্য অজ্ঞাতবাসে কিছুদিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। সেই অবস্থার সময় আত্মরক্ষার্থ তিনি কানু নগরে উপস্থিত হন। তথায় একটি চারণ তাঁহাকে আপন গৃহে আশ্রয় দান করে। ছদ্মবেশে কিছু দিন তথায় থাকিয়া চণ্ড আপনার উন্নতির পথ স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া লইলেন। প্রসিদ্ধি আছে, তিনি মুন্দরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে কানুনগরের সেই চারণ কবি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ড তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই; এমন কি, তাঁহাকে রাজসভাতেও প্রবেশের অনুমতি দেন নাই। তাহাতে সেই চারণ দারুণ মর্ম্মাহত হইয়া একটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজসভার প্রাঙ্গণতলে দাঁড়াইয়া তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। মারবারের ভট্টদিগের মুখে আজিও সেই শ্লোকটি শুনিতে পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই,—

"চণ্ডা নাহি আব চিথ, কচ্চর কালু তিন্না।
ভূপ ভৈও ভৈ-ভিথ, মন্দাবাররা মালিয়া?"

অর্থাৎ চণ্ড কি কালুর জনার ভুলিয়াছেন? তাই কি এখন রাজা হইয়া মন্দবারের বারান্দা হইতে লোকের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছেন?

কিছু দিন অতীত হইল। চণ্ডের হৃদয়ে বিজিগীষা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নাগোরস্থিত রাজকীয় সেনাদলকে আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্পও সুসিদ্ধ হইল। অতঃপর তিনি স্বীয় বিজয়িনী বাহিনী লইয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং অপ্রতিহত-গতিতে গদবারের রাজধানী নাদোলনগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় সেনাদল স্থাপনপুর্ব্বক তিনি স্বনগরে যাইয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরবংশে অবতীর্ণ হইয়া তিনি চিরজীবন বীরোচিত কার্য্য করিয়া আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন বীরত্ববিবরণ যার পর নাই বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমলের একটি বীরানুষ্ঠানের সহিত সেই বীরত্ববিবরণ নিবিড়রূপে অনুস্যূত।

যশল্মীররাজ্যে পুগল নামে একটি জনপদ আছে। ভট্টিনৃপতি তথায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। পুগল তৎকালে রণঙ্গদেব-নামা ভট্টিসর্দ্দারের অধিকারে ছিল। রণঙ্গদেবের পুত্রের নাম সাধু। তিনি মহাবীর্য্যবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। লাক্ষফুলানের ন্যায় সাধুও স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি নাগোর হইতে সিন্ধুনদের তীরপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ আক্রমণ করিতেন এবং বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিতেন। সাধুর নাম শ্রবণমাত্র মরুভূমির সমস্ত লোকেই ভয়ে বিকম্পিত হইতে থাকিত। একদা একটি নগর হইতে কতকগুলি উষ্ট্র ও অশ্ব হরণ করিয়া তিনি মোহিলাগণের রাজধানী ঔরিন্তের সীমান্তপ্রদেশ দিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা মাণিকরায় তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিয়া যথাসময়ে সাধুও তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। পানভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। এ দিকে মাণিকরায় ভট্টিবীর সাধুর নিকটে বসিয়া তদীয় বীরত্বের নানাপ্রকার গল্প শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল গল্প শুনিয়া মোহিলরাজ কখন বিস্মিত, কখন বা আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। মোহিলরাজ মাণিকরায়ের কন্যা কর্ম্মদেবী সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, সেই সমস্ত বীরত্ব-কাহিনী তাঁহার কর্ণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছিল। তিনি নিবিষ্টমনে সেই ভট্টিবীরের বচন-সুধা পান করিতেছিলেন। কর্ম্মদেবী আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিতা, মরুস্থলীর মধ্যে তাঁহার ন্যায় লীলাবতী রমণী আর ছিল না। মুন্দরাধিপ

রাও চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমলের সহিত তাঁহার পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। শীঘ্রই বিবাহ হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধ কর্ম্মদেবীর মনোনীত হয় নাই। তিনি সাধুর মহাবীরত্বের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আজি সেই চিরবাঞ্ছিত পতিকে নেত্রসম্মুখে দর্শন করিয়া এবং স্বকর্ণে তাঁহার বীরত্বকাহিনী শুনিয়া তিনি আপন হৃদয়ভাব প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সহচরীরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না। সহচরীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুচ্ছ রাজসিংহাসনে ফল কি? উচ্চ রাঠোরকুলের পুত্রবধূ হইয়াই বা কি সুখ হইবে? আমি যাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার দাসী হইয়া থাকি, তাহাও ভাল, তথাপি অপরের মহিষী হইতে ইচ্ছা করি না।" কর্ম্মদেবীর কঠোর প্রতিজ্ঞা আজি তাঁহার জনক-জননীর কর্ণে প্রবেশ করিল। ভয় ও দুঃখ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয় বিহ্বল করিয়া ফেলিল। রাঠোরকুলের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিয়া মাণিকরায় হৃদয়ে উচ্চতম কুলগৌরবলাভের আশা পোষণ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশে সে আশা ফলবতী হইল না। কর্ম্মদেবী যদি রাঠোররাজপুত্রের গলদেশে বরমাল্য প্রদানে সম্মত না হন, তাহা হইলে মোহিলকুলের প্রতিকূলে রাঠোরবীর চণ্ডের রোষাগ্নি নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, নিশ্চয়ই তিনি ঔরিন্ত-নগর আক্রমণপূর্ব্বক মোহিলবংশ উচ্ছিন্ন করিবেন। এই সমস্ত চিন্তায় মণিকরায় একান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। উপায় কি স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি কন্যার প্রস্তাবেই সম্মতি দান করিলেন।

পানভোজনের আয়োজন হইল। ভোজনান্তে মাণিকরায় সাধুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন; রাঠোররাজকুমারের হস্তে কন্যাদান না করিলে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও সাধুর নিকট জানাইলেন। মহাতেজা সাধু তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত হইলেন না। মৃদু হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন, "যদি নারিকেল যথাবিধানে পুগলে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি।" এই সমস্ত কথার পর সাধু আপন রাজ্যে প্রতিগত হইলেন। অবিলম্বেই বিবাহের সম্বন্ধসূচক নারিকেল-ফল আসিল এবং অচিরেই শুভলগ্নে ঔরিন্ত নগরে পরিণয়ক্রিয়া সমাপিত হইয়া গেল। এই বিবাহে সাধু বিপুল যৌতুক প্রাপ্ত হইলেন। বহুমূল্য মণিরত্নাদি, বিবিধ সুবর্ণ ও রজতপাত্র, একটি সুবর্ণ ধ্রুবমূর্ত্তি এবং ত্রয়োদশটি রাজপুতরমণী নবোঢ়দম্পতির সহিত ঔরিন্ত নগর হইতে পুগলে যাত্রা করিল।

অচিরেই সকল সংবাদ অরণ্যকমলের নিকট পৌঁছিল। যুগপৎ ক্রোধ ও জিঘাংসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সাধুকে প্রতিফল-প্রদানের জন্য চারি সহস্র রাঠোর-সৈন্য-সহিত তিনি সাধুর পথাবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বীরকেশরী সাধু ইতিপূর্ব্বে শকলা মেহরাজ-নামক এক ব্যক্তির পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ প্রতিশোধ লইবার আশায় রাঠোররাজকুমারের সহিত যোগদান করিলেন। সাধু মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইলেন না। মোহিলরাজ তাঁহার সহিত চারি সহস্র মোহিলসৈন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন, সাধু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। স্বীয় ভুজবল এবং সমভিব্যাহারী নিজ সপ্তশত ভটিসৈন্যের উপরেই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তথাপি মাণিকরায়ের আগ্রহাতিশয় দর্শনে নবপ্রণয়িনীসহ স্বরাজ্যে গমনকালে তিনি আপন শ্যালক মেঘরাজ ও তদধীন পঞ্চশত সৈনিককে সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন।

মুষ্টিমেয় সেনা সমভিব্যাহারে ভট্টিবীর সাধু চন্দন-নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। এ দিকে ক্রোধে রাঠোরবীর সদলে তথায় উপস্থিত হইলেন। সাধু অপেক্ষা তাঁহার সৈন্যবল তিনগুণ অধিক বটে, তথাপি তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর উভয়পক্ষই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বাগ্রে ভট্টিবীর পাহুগোত্রীয় জয়টঙ্গা এবং রাঠোরপক্ষের চৌহান যোট উভয়েই পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। উভয়েই স্ব স্ব যুদ্ধাশ্বকে পরস্পরের প্রতিকূলে নক্ষত্রবেগে চালিত করিয়া দিলেন। উভয়েরই করে শাণিত দ্বিধার অসি বিরাজিত। সেই ভীষণ অসি পরস্পরের বিরুদ্ধে চলিতে লাগিল। ঘাত প্রতিঘাতজনিত মহা সংঘর্ষে অনর্গল বহ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গার করিতে করিতে সেই অসিযুগল ভানুকিরণে তড়িল্লতার ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। পার্শ্বে অরণ্যকমল ও সাধু স্ব স্ব সেনাদলের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রফুল্লচিত্তে সেই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ অপেক্ষা ভীষণতর হইয়া উঠিল। হঠাৎ জয়টঙ্গা এক বিকট চীৎকারে সকলের হৃদয়ে বিস্ময়োপাদনপূর্ব্বক প্রচণ্ড লম্ফপ্রদান করিয়া অশ্বসহ যোটের উপর পতিত হইলেন। যোট সেই মহাবেগ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া চিরদিনের জন্য সবাহনে ভূমিশায়ী হইলেন; প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচণ্ড অসির প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন বিজয়োন্মত্ত পাহু সেই শোণিতাক্ত অসি উত্তোলনপূর্ব্বক শত্রুপক্ষের দিকে প্রধাবিত হইলেন এবং যাহাকে আপনার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচনা হইল, তাহাকেই আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সমকক্ষ বীর কেহই দৃষ্ট হইল না। তিনি একজনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যক্ পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহাঘোর বিপ্লব বাধিয়া উঠিল। অগত্যা দ্বন্দ্বযুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া দলযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দলযুদ্ধে কেবল বৃথা সৈন্যক্ষয় হইবে, এই বিবেচনায় সাধু ও অরণ্যকমল উভয়েই দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিলাষ করিলেন। দূরে রথোপরি আরূঢ় থাকিয়া রূপবতী কর্ম্মদেবী রণাভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। সাধু শেষবিদায় লইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী প্রশান্ত-গম্ভীরস্বরে পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নাথ! আপনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। আমি রথোপরি থাকিয়া আপনার যুদ্ধ দর্শন করিব। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার পতন হয়, তাহা হইলে পরলোকে আমিও আপনার অনুগমন করিব।" কর্ম্মদেবীর বীরত্বগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুর হৃদয় দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ভীষণবেগে শত্রুদলের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার করস্থিত সুতীক্ষ্ণ শূলাঘাতে অসংখ্য রাঠোরসৈন্য রণভূমে শয়ন করিতে লাগিল। উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি রাঠোররাজকুমার অরণ্যকমলের সম্মুখীন হইলেন। সাধুর হৃদয়শোণিতে হৃদয়জ্বালা নিবারণ করিবার অভিলাষে রাঠোররাজপুত্র এতক্ষণ উদ্গ্রীব হইয়া ছিলেন, সাধুকে এতক্ষণ তিনি চিনিতে পারেন নাই। সেই জন্য রোষে উন্মত্ত ও অধীর হইয়াও তৎপ্রতীক্ষায় ধীরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এখন তিনি সমীপবর্ত্তী শত্রুকে চিনিতে পারিয়া স্বীয় পঞ্চকল্যাণ নামক যুদ্ধাশ্বকে তাঁহার দিকে চালিত করিলেন। উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইলে রাজবীরোচিত সদাচারে ক্ষণকাল অতীত হইল। পরক্ষণেই সাধু আপন প্রতিদ্বন্দ্বীর শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া শাণিত অসিচালনা করিলেন। কিন্তু সুচতুর অরণ্যকমল তৎক্ষণাৎ তড়িদ্বেগে তাহা প্রতিরোধ করিয়া সাধুর শিরোদেশে প্রচণ্ড তরবারি প্রহার করিলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়বীরই বজ্রভগ্ন মেরুশৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাঠোরবীর মূর্চ্ছিত

হইয়াছিলেন, সুতরাং আশু পুনরুত্থিত হইলেন ; কিন্তু ভট্টিবীর সাধু আর গাত্রোত্থান করিলেন না, পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল। উভয়পক্ষের সৈন্যগণ ক্ষণকালের জন্য বজ্রাহতপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিল ; পরে যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

কর্ম্মদেবীর সংসারের সকল আশা ফুরাইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, পতিসোহাগিনী হইয়া চিরদিন পতিক্রোড়ে পরমসুখে অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু তাঁহার এমনই দুর্ভাগ্য, সুখের সম্বন্ধবন্ধন হইতে না হইতেই একেবারে চিরদিনের জন্য তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। আহা! আর সেই লাবণ্যময়ীর লাবণ্য নাই, আর সেই হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে মনোমোহন হাস্যের ছটা দৃষ্ট হয় না। রাঠোর-বীর অবণ্যকমল যে মূর্ত্তিকে যত্ন করিয়া হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই বিশদ হাস্যময়ী সরলা সুকুমারীমূর্ত্তি আর নাই! বৈধব্যের বিষাদময়ী কালিমা আসিয়া সেই হাস্যময়ী মূর্ত্তিকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল! কমলকোরক সম্যক্ বিকসিত না হইতে হইতেই একদিনের মধ্যেই বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল! কিন্তু কর্ম্মদেবী বীরাঙ্গনা। তিনিই প্রাণপতিকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তিনি মনশ্চক্ষুতে যেন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পতি ধর্ম্মযুদ্ধে রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন ; তাঁহার স্বর্গের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে ; স্বর্গবিম্বাধরীরা মোহন পারিজাতমালা লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য স্বর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পতিশোকে তাঁহার হৃদয়ে যে বিষাদরাশির উদয় হইয়াছিল, অকস্মাৎ অনেকপরিমাণে তাহা অপসৃত হইল,—স্বর্গীয়বাসনায় তাঁহার হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তিনি পতির অনুগমন করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রণভূমে একটি চিতা প্রস্তুত হইল। মোহিলকুমারী একখানি শাণিত অসি চাহিয়া লইলেন এবং এক করে তাহা ধারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অন্য হস্ত অম্লানবদনে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সহচরী ও সৈনিকবৃন্দ অটলভাবে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কর্ম্মদেবী সেই ছিন্নবাহু স্বীয় শ্বশুরকে দিবার জন্য একজন সৈনিকের হস্তে অর্পণ করিয়া ধীরগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বলিও, শ্বশুরপদে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপ ছিলেন।" অতঃপর তিনি অপর হস্ত বিস্তৃত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একজন সৈনিকের প্রতি আদেশ করিলেন, "এই হস্ত এখনই ছেদন কর" কর্ম্মদেবীর বদনপদ্ম তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল হইতে এক প্রকার অদ্ভুত জ্যোতি বিনির্গত হইতে লাগিল, সৈনিক তাঁহার অনুজ্ঞা-পালনে বিলম্ব করিতে সাহস করিল না। অবিলম্বে একটিমাত্র আঘাতেই সেই বাহুলতিকা ছিন্ন হইয়া পড়িল। দর্শকগণ শোকে ও বিস্ময়ে মর্ম্মভেদী স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; কিন্তু বীরাঙ্গনার সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় বদনকমলে কিছুমাত্র বিষাদের ছায়া পতিত হইল না। তিনি ধীর-গম্ভীর-স্বরে সেই ছিন্ন দ্বিতীয় বাহুলতিকাটি মোহিলকুলের ভট্টকবিকে সমর্পণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া প্রাণনাথের মৃতদেহের সহিত জ্বলন্তচিতায় আরোহণ করিলেন। তাঁহার আদেশমত তদীয় বাহুদ্বয় যথাযথ স্থানে প্রেরিত হইল। পুগলের বৃদ্ধ রাও রণঙ্গদেব সেই বাহু দগ্ধ করিয়া তথায় একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই পুষ্করিণী "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে অভিহিত। বীরাঙ্গনার অমরত্ব ঘোষণা করিবার জন্য অদ্যাপি সেই সরোবর বিদ্যমান আছে।

১৪০৭ খৃষ্টাব্দে এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাঠোরপক্ষীয় শঙ্কলাগণেরই মহাবীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের ত্রিশত সৈন্যের মধ্যে সেনাপতি শঙ্কলার সহিত পঞ্চাশ জন মাত্র সেনা যুদ্ধভূমি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। মেহরাজও এই যুদ্ধে ঘোরতর আঘাত

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অরণ্যকমল ও তাঁহার চারিটি ভ্রাতার অঙ্গে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। সেই আঘাতে গাত্রে যে সকল ক্ষত উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সূত্রেই ছয় মাসের মধ্যে অরণ্যকমলের প্রাণবিয়োগ হইল।

এত দুর্ঘটনা ঘটিল, তথাপি উভয়পক্ষের প্রতিহিংসার শান্তি হইল না। উভয়পক্ষের এক একটি রাজকুমার প্রাণ হারাইলেন; এখন আবার পিতৃগণ অসিধারণ করিলেন। বীরবর শঙ্কলা মেহতার প্রচণ্ডবলেই সাধুর সেনাদল নিহত হইয়াছে। এই জন্য পুত্রশোকাতুর রাও রণঙ্গদেব মেহরাজকে প্রতিফল দিবার অভিপ্রায়ে সদলে তাঁহার জনপদ আক্রমণ করিলেন। শঙ্কলাগণ মহাবিক্রমশালী. এ যাবৎ মরুস্থানী কোন বীরই তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ মেহরাজ সুবিখ্যাত বীরসিংহ হরবা-শঙ্কলের পিতা। তাঁহার প্রচণ্ডবিক্রম এ যাবৎকাল কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। পুগলের রাও রণঙ্গদেব যে আজি তাঁহাকে পরাভব করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। পুগলপতি বিপুল সেনাদল লইয়া সঙ্কলের রাজ্যে আপতিত হইলেন। শঙ্কল তখন অসতর্ক ছিলেন কিংবা রণঙ্গদেবের প্রচণ্ডবল প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহাকে রণঙ্গদেবের নিকট পরাজিত হইতে হইল। বিজয়ী রণঙ্গদেব বিপক্ষের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

তনু ও মৈর পিতার পতনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দারুণ জিঘাংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিরুপায়। তাঁহাদের এমন বল নাই যে, মুন্দররাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সুতরাং দারুণ রোষবেগ সংবরণপূর্ব্বক তখন তাঁহারা উপায়চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মুসলমানরাজ খিজির খাঁ মুলতানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বীরত্ব সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ক্রোধোন্মত্ত তনু ও মৈর তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচুর প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। খিজির খাঁ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ একটি সেনাদল প্রদান করিলেন। সেই সেনাদল সমভিব্যাহারে তনু ও মৈর রাঠোর-রাজ চণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছেন, ইত্যবসরে যশল্মীরপতি রাওল কেহুরের তৃতীয় পুত্র কীলন তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের বলাবল পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে কূট উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন; নিজেও তাঁহাদের কূটোপায়সাধনের সহায়তা করিবার জন্য রাঠোরপতি চণ্ডকে কৌশলজালে আবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং তাঁহার প্রথম ও প্রধান সাধনস্বরূপ তৎকরে স্বীয় একটি কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহিলেন। পাছে চণ্ড অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তজ্জন্য কীলন বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি যদি ইহাতে সন্দেহ করেন তাহা হইলে আপনার ইচ্ছা হইলে আমার দুহিতাকে নাগোরে প্রেরণ করিতে প্রস্তত আছি।" চণ্ড সে প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না।

শুভপরিণয়ের দিন ধার্য্য হইল। নাগোর নগর ইতিপূর্ব্বেই চণ্ডের অধিকৃত হইয়াছে; সেই স্থানেই বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। চণ্ড তথায় উপস্থিত হইয়া বিবাহের দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিবাহবাসর সমাগত। কি কুক্ষণে তিনি যে এই বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এ দিকে যশল্মীরের তোরণদ্বার পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চাশখানি আচ্ছাদিত শকট বহির্গত হইল। কতকগুলি অশ্বারোহী এবং সপ্তদশ উষ্ট্ররক্ষক সেই শকটশ্রেণীর অনুগামী। কিন্তু ইহা বিবাহযাত্রা নহে, ইহা রণযাত্রা। কারণ, সেই সকল আরোহী

ও উষ্ট্ররক্ষক ছদ্মবেশী রাজপুতসৈন্য এবং পূর্ব্বোক্ত সমাচ্ছাদিত শকটের অভ্যন্তরে রমণীর পরিবর্ত্তে পুগলের দুর্জ্জয় মহাবল বীরগণ সংস্থিত। এতদ্ভিন্ন সকলের পশ্চাদ্ভাগে রাজার প্রায় একসহস্র সৈন্য অতি সাবধানে গুপ্তভাবে অগ্রসর হইতেছিল। যে সমস্ত উষ্ট্র তাহাদের সঙ্গে আসিতেছিল, তাহাদের পৃষ্ঠদেশে সৈন্যদলের আহারীয়সামগ্রী এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি গোপনে রক্ষিত ছিল। রাঠোরপতি চণ্ড এ সমস্ত গূঢ় বিবরণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই ছদ্মবেশী ভট্টিদলের প্রত্যুদ্গমনে বহির্গত হইলেন। নগরের তোরণদ্বার হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র সেই শটকগুলি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। ভট্টিরাজ তাঁহাকে প্রতারণা করিবেন, তখনও তাঁহার মনে এ ধারণা জন্মিল না। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে শকট শ্রেণীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মন বিষম সন্দেহে আকুল হইয়া পড়িল। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নাগোরের দিকে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু নগরদ্বারে আসিতে না আসিতেই শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বিশ্বাসঘাতক ভট্টিগণ ছদ্মবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একেবারে তাঁহার উপর আপতিত হইল। কতিপয় শরীররক্ষক ভিন্ন সঙ্গে আর কেহ নাই; সুতরাং কিরূপে তিনি সহস্র সহস্র প্রচণ্ড ভট্টিবীরের গতিরোধ করিবেন? নগরের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইতে পারিলেও এ মহাসঙ্কটে অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারেন, এই বিবেচনা করিয়া দুর্দ্ধর্ষ শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি সিংহদ্বারের দিকে ক্রমে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতরঞ্জিত, শরীররক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই প্রভুর প্রাণ-রক্ষার্থ নিজ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিল। অনর্গল রক্তস্রাবণে ও অস্ত্রাঘাতে চণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল। রাঠোর-কুল-চূড়ামণি মহাবীর চণ্ড সেই নগরদ্বারে ভূমিশায়ী হইলেন। পাষণ্ড ভট্টিগণ জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া বিকট সিংহনাদ করিতে করিতে নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। রাজ-রাজেশ্বর চণ্ডের পবিত্রদেহ তাহাদের চরণতলে দলিত হইতে লাগিল; তাহারা একবার ভ্রূক্ষেপও করিল না।

১৪৩৮ সংবতে রাজ্যলাভ করিয়া মহাবিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালনপূর্ব্বক ১৮৬১ সংবতে চণ্ড ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

রাঠোরগণের একটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্র তিরোহিত হইল। চণ্ড আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে রাঠোরবংশের আরও দ্বিগুণতর উন্নতি সাধিত হইত সন্দেহ নাই। চণ্ডের চতুর্দ্দশ পুত্র;—রণমল্ল, সত্য, রণধীর, অরণ্যকমল, পুঞ্জ, ভীম, কাণ, উজো, রামদেব, বীজো, সহেশমল, বাঘ, লুম্ব ও শিব-রাজ। ইঁহাদের মধ্যে রণমল্ল, সত্য, অরণ্যকমল ও কাণের বংশ আজিও জীবিত আছে। এতদ্ভিন্ন হংসা নামে চণ্ডের একটি কন্যাও ছিল। মিবারের অধিপতি রাণা লাক্ষের সহিত হংসার বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে কুম্ভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবীর চণ্ড ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রণমল্ল মুন্দর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রণমল্লের অবয়ব দীর্ঘ; তিনি অতি বলিষ্ঠ, এমন কি, স্বজাতির মধ্যে তাঁহার তুল্য বলিষ্ঠ আর কেহই ছিল না। চণ্ডের মৃত্যুর পর নাগোর রাঠোরদিগের হস্তচ্যুত হয়। রাণা লাক্ষের সহিত ভগিনীর বিবাহের পর রণমল্ল প্রায় চিতোরেই বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমেই লাক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিল। লাক্ষ তাঁহাকে স্বীয় সামন্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন। তিনি চল্লিশখানি গ্রামের সহিত ধুনল প্রদেশের শাসনভার রণমল্লের প্রতি সমর্পণ করিলেন। লাক্ষের জীবিতকালে রণমল্ল মিবারের একটি মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন।

আজমীরের রাজপ্রতিনিধির নিকট একটি কন্যা লইয়া যাইবার ব্যপদেশে তিনি সসৈন্যে সেই প্রাচীন চৌহানদুর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হন এবং দুর্গের দ্বারপাল ও সৈনিকগণকে বধ করিয়া তাহা অধিকার করেন। তিনি সে দুর্গ স্বয়ং না রাখিয়া রাণার করেই তাহা প্রদান করেন। ক্ষেমসিংহ পাঞ্চোলি-নামা এক ব্যক্তির পরামর্শে তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই মহোপকারের পুরস্কারস্বরূপ রণমল্ল কোটা নামক নগরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। অতঃপর রণমল্ল তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য যে সকল যাত্রী করভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল, স্বয়ং তাহাদিগের সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সদনুষ্ঠানের জন্য তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

রণমল্ল যেরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, যে যে সদ্‌গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহার শোচনীয় চরমবিবরণের সহিত মিবার-ইতিবৃত্তে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। রণমল্লের চতুর্বিংশতি পুত্র। সাধারণের অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম, গোত্র ও ভূমিসম্পত্তির তালিকা এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

নাম	গোষ্ঠী	ভূমিসম্পত্তি
১। যোধ (সিংহাসনলাভ করেন) যোধ।		
২। কণ্ডুল —	কণ্ডুলোট, কণ্ডুল বিকানীর ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন।	বিকানীর।
৩। চম্প —	—চম্পাবৎ— —	অহবা, কোটা, পালরি, হরশোল, রোহিত, জাবুলা, সুলতান শিঙ্গাল।
৪। অখিরাজ; ইঁহার সাত পুত্র। জ্যেষ্ঠ কুম্প	—কুম্পাবৎ— —	আশোপ, কুন্তলিও, চণ্ডবল, শিরিয়ারি, খরলো, হরশোর, বল্লু, বজোরিয়া, সুরপুদ, দেবরিও।
৫। মন্দলো —	—মন্দলোট— —	সারুণ্ডা।
৬। পত্ত— —	—পত্তাবৎ-- —	কুর্ণিচারি, বারো ও দেশনখ।
৭। লাক্ক— —	—লাক্কাবৎ —	
৮। বল — —	—বলাবৎ — —	ধুনার।
৯। জৈৎমল —	—জৈৎমলকোট —	পালশ্নি।
১০। কর্ণ — —	—কর্ণোট — —	লুনাবাস।
১১। রূপ — —	—রূপাবৎ— -	চুটিলা।
১২। নাথু — —	—নাথাবৎ— —	বিকানীর।

১৩। ভুনর্গ —	—	—ভুনগারোৎ	ইঁহাদের ভূমিসম্পত্তি-সম্বন্ধে কোন নাম নির্দ্দেশ নাই। ইঁহাদের বংশধরেরা পরাধীন হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।
১৪। সন্দ —	—	—সন্দাবৎ	
১৫। মন্দ —	—	—মন্দনোৎ	
১৬। বীরু—	—	—বীরোৎ	
১৭। জগমলোৎ	—	—জগমলৎ	
১৮। হুম্প—	—	—হুম্পবৎ	
১৯। শক্ত—	—	—শক্তাবৎ	
২০। করিমচাঁদ	—	— ——	
২১। অবিরল	—	—অবিরলোৎ	
২২। কেৎসি—	—	—কেৎসিওৎ	
২৩। স্থত্রশাল	—	—স্থত্রশালোৎ	
২৪। তেজমল	—	—তেজমলোৎ	

তৃতীয় অধ্যায়

যোধের সিংহাসনারোহণ, যোধপুর স্থাপন, সেতুলমির, মৈরতা ও বিকানীরের নূতন প্রতিষ্ঠা, যোধের মৃত্যু, রাও শূজের সিংহাসনারোহণ, পাঠানকর্ত্তৃক রাঠোরকুমারীদিগকে হরণ, শূজের মৃত্যু, রাও গঙ্গের রাজ্যলাভ, গৃহযুদ্ধ, সাগরের মৃত্যু, বাবর কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ, রাও গঙ্গের মৃত্যু, রাও মালদেবের অভিষেক, রাজ্যচ্যুত হুমায়ূনের প্রতি মালদেবের ব্যবহার, সের শাহের মারবার আক্রমণ, আক্বরের মারবার আক্রমণ, যোধপুরের ফর্ম্মণ আক্‌বর কর্ত্তৃক রাজসিংহের হস্তে অর্পণ, আক্‌বর কর্ত্তৃক যোধপুর অবরোধ, চন্দ্রসেন, তাঁহার বীরত্ব, মালদেবের পরলোকগমন।

রণমল্লের জ্যেষ্ঠপুত্র যোধরাজ ১৪৮৪ সংবতের বৈশাখমাসে জন্মপরিগ্রহ করেন। রণমল্লের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৫১১ সংবতে সুজাতপ্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৫১৫ সংবতের জ্যৈষ্ঠমাসে যোধরাজ বর্ত্তমান যোধপুর রাজধানী স্থাপন করিয়া মরুস্থলীর প্রাচীন রাজধানী মুন্দর পরিহারপূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত তথায় আগমন করেন। রাজপুতেরাই প্রাচীন রোমকদিগের স্থায় কোন একটা সাধারণ ঘটনা অনুসারে শুভাশুভ ফলের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। মরুস্থলীর প্রাচীনরাজধানী সহসা পরিত্যাগ করিয়া নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যোধরাজের ইচ্ছা ছিল না; নামলুব্ধ হইয়াই যে তিনি এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহাও প্রকাশ নাই, মুন্দর নগরে কোন প্রকার কুলক্ষণও দৃষ্ট হয় নাই; একটি সামান্য কারণেই যোধরাজ উক্ত নবীন রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

যে সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইতেছে, সে সময়ে ভারতের দূরদূরান্তরে, গিরিগুহায় এবং গহনকাননে অনেকগুলি যোগী বাস করিতেন। রাজস্থানের সামান্য গৃহস্থ হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই

সেই যোগিগণের উপদেশ প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ ছিলেন। যোধরাজ সেই শ্রেণীর একজন বানপ্রস্থ যোগীর উপদেশেই মুন্দর পরিহার করিয়া যোধপুর নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। মুন্দরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে বাখরচিড়িয়া নামে একটি পর্ব্বত আছে; সেই পর্ব্বতের দ্বিতীয় নাম পক্ষিকুলাল। সেই গিরিশিখরে একজন বানপ্রস্থযোগী বাস করিতেন; তিনি ঐ পর্ব্বতের নাম রাখেন যোধগিরি এবং তাঁহারই উপদেশে যোধনগর নির্ম্মিত হয়। যোধরাজ দেখিলেন, ঐ গিরিশিখর বিপক্ষের পক্ষে নিতান্ত দুর্গম; অতএব তথায় রাজধানী স্থাপন করা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ্। সেই গিরিশিখরস্থ প্রাসাদশিখর হইতে যোধরাজের বংশধরগণ আপনাদের রাজ্যসীমা সন্দর্শন করিতে সহজেই সমর্থ হন। প্রকৃতি পরিচ্ছন্ন থাকিলে যোধগিরিশিখর হইতে মারবারের দক্ষিণসীমা আরাবল্লী-পর্ব্বতের সমুচ্চশিখরমালা পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হয়। উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম এই তিনটি সীমা কেবল অসীম বালুকাময় মরুক্ষেত্র।

গিরিশিখরে যে দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে বিশুদ্ধ পানীয়জল অতি দুর্লভ, পর্ব্বতের তলভাগে একটি সুবিস্তৃত সরোবর আছে; সেই সরোবরসলিল স্বচ্ছ এবং পবিত্র। দুর্গবাসীরা স্নানপানার্থ সেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। সরোবরটি সুদৃঢ় প্রাকার-পরিবেষ্টনে সংরক্ষিত।

এতৎসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। গিরিশিখরে যখন দুর্গ নির্ম্মিত হয়, স্থানপরিমাণ করিয়া স্থপতিগণ তখন বলিয়াছিল, উপদেশদাতা যোগিবর যে স্থানে বসিয়া যোগসাধন করেন, সেই স্থানটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিলে দুর্গের শোভা হইবে না। ইহা শ্রবণ করিয়া যোগী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; কিছুতেই সে স্থান-প্রদানে সম্মত হন না। স্থপতিগণ তাঁহার প্রতিবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আপনাদের ইচ্ছামত স্থানে সুন্দর রাজধানী নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। যোগিবরের অভিসম্পাত আছে, রাজধানীমধ্যে পানীয়জল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। সেই অভিসম্পাত আজি পর্য্যন্ত ফলিয়া আসিতেছে। পানীয়জল সংগ্রহের একমাত্র উপায় পর্ব্বততলস্থ উপরি-উক্ত সরোবর। যে স্থলে সরোবর, তাহার কাছে সমুচ্চ অভেদ্য প্রাকার। কোন বিপক্ষপক্ষ সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকারেই উক্ত সরোবর হইতে জলসংগ্রহে সমর্থ হয় না। মরুক্ষেত্রে শিবজীর আগমন হইতে আজি পর্য্যন্ত এই যোধপুর-নির্ম্মাণ-বৃত্তান্ত রাঠোরবংশের ইতিহাসে প্রধান ঘটনাবলীর মধ্যে তৃতীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত।

শিবজীর পরবর্ত্তী রাঠোরবংশীয়েরা মরুক্ষেত্রকেই ভাগ্যলক্ষ্মী মনে করিতেন। মরুক্ষেত্রের সীমামধ্যে আধিপত্য বিস্তার করাই তাঁহাদের সকলের অভিলাষ ছিল। ক্রমে রাঠোরবংশের পুত্র-পৌত্রসংখ্যা এরূপ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, সীমামধ্যে সকলের স্থান-সমাবেশ হয় না। প্রত্যেকের অধিকৃত প্রদেশের সীমাই পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। মারবারের শেষ নরপতিরা কোন না কোন প্রকারে পূর্ব্বরাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্রগণ অন্যসীমা গ্রহণ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। চণ্ডের চতুর্দ্দশ পুত্র, রণমল্লের চতুর্ব্বিংশতি পুত্র এবং যোধরাজের চতুর্দ্দশপুত্র এই সময়ের মধ্যে মারবাররাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদেশাবলী নিজ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহাদের পরন্তন রাজপুত্রগণের বাসের নিমিত্ত অপরাপর প্রদেশ অধিকার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

যোধরাজের চতুর্দ্দশপুত্রের মধ্যে কুমার সন্তল পিতার জীবদ্দশাতেই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে ভট্টিদের অধিকৃত প্রদেশ জয় করিয়া আপন অধিকার স্থাপন করেন। সন্তলের দ্বিতীয় নাম সতল, কুমার সন্তল সেই বিজিতরাজ্যে সন্তলমীর নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একদা মরুস্থলীয়

সরাইন প্রদেশের অধিপতি খাঁর সহিত সতলের এক ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। বীর্য্যবিক্রমে সতলের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল সেই যুদ্ধে অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বৈরিদলের বহু সৈন্য নিহত করিয়াও তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। সরাইসের খাঁ যদিও তাঁহার সমকক্ষ বীর ছিলেন না, সমরাঙ্গনে যদিও তিনি সেই খাঁ সাহেবের জীবননাশ করিয়াছিলেন, তথাপি আত্ম-প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সামান্য একজন সেনার হস্তে সেই যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ যায়। কুসুমনামক স্থানে রাজা সতলের মৃতদেহের সংকার করা হইয়াছিল। তাঁহার সাতটি মহিষী সেই স্থলে অনুমৃতা হইয়াছিলেন। স্মরণার্থ—সতীত্বের গৌরব প্রদর্শনার্থ কুসুমনগরে একটি রমণীয় মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, আজিও তাহা বিদ্যমান আছে।

যোধের চতুর্থ পুত্র দুধ। তিনি প্রবলপরাক্রমে মৈরতা-প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ মৈরতীয় নামে বিখ্যাত। রাঠোরের ইতিহাসে মৈরতা-গণ মহাবীর নামে প্রশংসিত।

সুপ্রসিদ্ধ মীরাবাই এই দুধরাজের কন্যা। মিবারেশ্বর রাণা কুম্ভ মীরাবাইকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দুধের এক পৌত্র জয়মল। প্রসিদ্ধ বীর বলিয়া জয়মল্লের প্রশংসা ছিল। আকবর শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি চিতোররাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। জয়মল্লের উত্তরাধিকারী: জগৎসিংহ। ইনি একজন প্রথমশ্রেণীর সামন্তরাজমধ্যে গণনীয় ছিলেন। দুধের বংশে যে সমস্ত কুমার জন্মগ্রহণ করেন, ইতিহাসে তাঁহারা সকলেই বীর নামে সুবিখ্যাত।

যোধের ষষ্ঠপুত্র বিকা। তিনি জাটসম্প্রদায়াধিকৃত ছয়টি প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় নবীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবীনরাজ্যের নাম বিকানীর।

১৫৪৫ সংবতে একষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রমে মহারাজ যোধরাও মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া যোগ্যধামে প্রয়াণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের দেহভস্ম যে মন্দিরে সংরক্ষিত হইত, সেই সুরম্য মন্দিরমধ্যে যোধের দেহভস্ম সুরক্ষিত। রাজনীতিবিদ্যায় যোধের বিলক্ষণ গৌরব ও প্রতিপত্তি ছিল; নিজ নীতিজ্ঞতাবলেই তিনি ভাগ্যার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিবজীর পরবর্ত্তী রাঠোর-অধিপতিগণ যখন যে প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন, তখন সেই প্রদেশের প্রাচীন সামন্তরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন। কোন মতেই সামন্তগণের সহিত তাঁহাদের সৌহার্দ্দ জন্মিত না। যোধরাও সে পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। সামন্তমণ্ডলীকে তিনি পরমসাদরে স্বরাজ্যমধ্যে স্থান দিতেন। পূর্ব্বে যাঁহারা তাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও পুনরাহ্বান করিয়া তিনি তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। সামন্তগণের সাহায্যে যোধরাও মুন্দররাজ্য পুনরধিকার করিয়াছিলেন। মুন্দরগাত্রে আজও যে সকল মহাবীরের খোদিত প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত, যোধরাজই সে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিতেই সামন্তরাজগণের যশোগৌরব সজীব রহিয়াছে; যতকাল যোধপুরের নাম বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল মরুস্থলীর মধ্যে রাঠোরজাতির দ্বিতীয় আদিপুরুষ যোধরাজের নাম ভারতে সমকণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত হইবে সন্দেহ নাই।

শিবজীর উত্তরাধিকারী রাঠোরগণ মরুক্ষেত্রের ৮০ হাজার বর্গমাইলপরিমিত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। বহু মহা সমরে বহুতর রাঠোরবীর রণশায়ী হইলেও টড সাহেব গণনা করিয়াছিলেন, যে সময়ে তিনি রাজস্থানের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন, সে সময় শিবজীর জীবিত বংশধরের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছিল; ক্রমে ক্রমে সেই সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

গঙ্গার উপকূলে কান্যকুব্জ নগরে এক সময়ে রাঠোররাজবংশ অসীম গৌরব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে যে সকল আদিম জাতি তথায় বাস করিতেন, তাঁহাদের কথাও সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক রাজপুতজাতির সাংসারিক বীজমন্ত্র অতি ক্ষুদ্র। তাঁহাদের মতে এ জগতে সমস্তই নশ্বর। মানবজীবন খদ্যোতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আলোকপ্রদ। ধনসম্পত্তি, মানগৌরব সমস্তই বিনশ্বর, জীবন বিনশ্বর, কেবল এক কীর্ত্তিমাত্রই জগতে অক্ষয়। শিবজীর বংশধরগণ চিরদিন কীর্ত্তিলাভের জন্যই লালায়িত ছিলেন।

প্রাচীন আদিমজাতির মধ্যে মরুস্থলীতে যাহারা বাস করিতেন, মরুক্ষেত্রের প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থে তন্মধ্যে দ্বাদশটি প্রধান জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—পুরীহর, ইন্দু, সংকল, চোহান, গোহিল, দাবাই, সিন্ধিল, মোহিল, শোণিগুরু, কাটি, জাট এবং হুন। এই দ্বাদশজাতির ঐতিহাসিক বিবরণ কোনপ্রকার অগৌরবের পরিচয় দেয় না, নীতিজ্ঞানেও তাঁহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরত্বেও রণবিজয়ী ছিলেন, দয়া-ধর্ম্মেও তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ গৌরবের পরিচয় আছে। যে কয়েকটি প্রাচীনজাতি আজি পর্য্যন্ত বিরাজমান, তাঁহারা শিবজীবংশের রাজপুত্রগণের চিরানুগত আজ্ঞাবহ।

যোধরাজের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার মধ্যম পুত্র সূর্য্যমল্ল পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সূর্য্যমল্ল পিতার ন্যায় রাজ্যবৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু সপ্তাংশতিবর্ষকাল প্রবলপ্রতাপে সগৌরবে স্বরাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

লোদিবংশীয় সম্রাট্গণ দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যত দিন পরস্পর মহা মহা সংগ্রামে পরিলিপ্ত ছিলেন, তত দিন তাঁহারা এই অনুর্ব্বর মরুক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিদান করিবার অবসর পান নাই। সেরশাহীবংশ যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, সেই সময় যোধের বংশধরেরা দিল্লীর রাজসৈন্যের সহিত রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হন। ১৫৭২ সংবতে পিপার নগরে এক ভয়ানক ঘটনা হইয়াছিল। পিপারে রন্তার জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতিবর্ষে একটি মহামেলার অনুষ্ঠান হয়। প্রাগুপ্ত সংবতে রাঠোররমণীগণ যখন সেই মেলায় সমবেত হইয়াছিলেন, একদল পাঠানসৈন্য সেই সময় মেলাস্থলে প্রবেশ করিয়া একশত চত্বারিংশৎ রাঠোর-যুবতীকে হরণ করিয়া লয়। পাষণ্ড পাঠানের দ্বারা রাজপুতকামিনীগণের হরণসংবাদ কর্ণগোচর করিয়া রাও সূর্য্যমল্ল ক্রুদ্ধ-কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠেন। সামন্ত মিত্রগণের সহিত সসজ্জ হইয়া অবিলম্বে তিনি পাঠানদমনে প্রধাবিত হন। পাঠানেরা তখন কুলবতী যুবতীগণকে লইয়া অধিকদূর পলায়ন করিতে পারে নাই. যোধপুরাধিপতি সূর্য্যমল্ল অত্যল্পমাত্র সৈন্য লইয়া তাহাদের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পাঠানগণ বিষম বিপদ্ দর্শন করিয়াও জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ বীরত্বের পরিচয় দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। তাহাদের সংখ্যাও তখন অধিক ছিল। রাজপুতপক্ষে সহায়বল তখন অল্প। হইলে কি হয়, কুলস্ত্রীর অপমানে রাজপুতসিংহ আপনাপন প্রাণকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কুলস্ত্রীর অপমান হইয়াছে, ঘৃণিত যবন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে, রাজকুলে কলঙ্করেখা অর্পিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? রাজা সূর্য্যমল্ল পিতা অপেক্ষাও পরাক্রমশালী বীর ছিলেন; অধীনস্থ সামন্তরাজগণও শিবজীবংশের চিরানুগত। বীর্য্য-পরাক্রমে কেহই তাঁহারা পাঠান অপেক্ষা হীনবল ছিলেন না। যুদ্ধ অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

স্বয়ং সূর্য্যমল্ল সেনাপতি। তাঁহার অনুবলবর্গ উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবিরত অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাঠান-তস্করেরা পথিমধ্যে বাধা পাইয়া সর্পগতিতে রমণীগণকে বেষ্টন করিয়া

দাঁড়াইল; ক্রমে ক্রমে ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবল বৈরিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; সূর্য্যমল্লের বীরত্ব রাঠোর-ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে। যুদ্ধবর্ণনার রীতিতে পরিচয় দিলেও সে বীরত্বগৌরব যথাযথ পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষণে ক্ষণে পাঠানপক্ষ হীনবীর্য্য হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল; অনেকেই ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু যাহারা প্রসিদ্ধ রণদক্ষ বীরপুরুষ, সাংঘাতিক আহত হইয়াও তাহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিল না। মহাবলবিচ্যুত হইয়া ভগ্নোদ্যম হইলেও সূর্য্যমল্লকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহারা কৃতসঙ্কল্প হইল।

রাজা সূর্য্যমল্ল এই সময় কিছু অনুপায় ভাবিলেন। সে ক্ষেত্রে প্রথম কর্ত্তব্য কি?—কামিনী-গণকে উদ্ধার করা। সৈন্যগণকে আপন পৃষ্ঠরক্ষক রাখিয়া সামন্তমিত্রগণকে তিনি আজ্ঞা দিলেন, "প্রাণ যায় যাউক, গ্রাহ্য করি না। আপনারা যথাসাধ্য যত্নে সর্ব্বাগ্রে রমণীগণের উদ্ধারসাধন করুন। জীবন থাকিতে আমি দেখিয়া যাই, আমার বংশের সতীলক্ষ্মী কুলবালাগণ রাক্ষসকবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন, নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্করাহু-বিমুক্ত হইল, যোধপুর-রাজকুলের কুল-লক্ষ্মীগণ অন্তঃপুর-প্রবেশ করিলেন, আমাদের সময়সাধ এই স্থলেই পূর্ণ হইল।"

সামন্তবীরগণ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র অবশিষ্ট-হীনবল পাঠানগণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমশই পাঠানেরা ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পড়িল। গোগৃহযুদ্ধে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন মহাস্ত্রে কুরুসৈন্যগণকে মূর্চ্ছিত করিয়া যেরূপ বিরাটের গাভীগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, রাঠোরের সামন্তরাজগণ সেইরূপে দুরাত্মা পাঠানগণকে বিদূরিত করিয়া—অধিকাংশকে রণশায়ী করিয়া রাজপুতকামিনীগণকে অক্ষতশরীরে মুক্ত করিয়া লইলেন।

এ দিকে এক মহা অনর্থ উপস্থিত। রমণীগণকে যাহারা রক্ষা করিতেছিল, সামন্তবীরগণের সহিত যে সময় তাহাদিগের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কয়েকজন পাঠান সেই সময় অসি আস্ফালন করিয়া রাজা সূর্য্যমল্লকে, আক্রমণ করে। তখন তিনি নিঃসহায়। বালক অভিমন্যু চক্রব্যূহমধ্যে সপ্তরথী দ্বারা আক্রান্ত হইলে পরিশেষে নিঃসহায়ে যেমন অবসন্ন হইয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রাজা সূর্য্যমল্লও সেই রূপ অবসাদপ্রাপ্ত হইলেন। যাহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা সফল হইল, কামিনীগণ উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলেন। রাজা স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিলেন। ক্ষণকালের জন্য হতাশহৃদয়েও কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতা দর্শন দিল। আর কতক্ষণ? ভীষণ শত্রুব্যূহমধ্যে কতক্ষণ একাকী নিরাপদে থাকিবেন? একাকী বহুসৈন্য নিপাত করিয়া পরিশেষে একজন হীনবল পাঠানের তরবারি-আঘাতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তিনি ভূপতিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, যোধপুরসূর্য্য সেই রণক্ষেত্রাচলে অস্তমিত হইলেন।

পাঠানেরা সেই রণক্ষেত্রে মহাপাপের উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইল, প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল। যে কয়েকজন জীবিত ছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। রাঠোরবীরগণ সামন্ত-বীরগণের সহিত রাজার মৃতদেহ লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন উপযুক্ত যানবাহনে প্রহরি-বেষ্টিত কামিনীকুল ভগ্নান্তঃকরণে অন্তঃপুরমধ্যে নীত হইলেন। তদবধি রম্ভার জন্মোৎসবমেলা-পর্ব্বাহে রাজকবিগণ, রাজভট্টগণ, নগরের গায়কগণ সূর্য্যমল্ল কর্ত্তৃক রাজপুতনারীগণের উদ্ধারবিবরণ এবং সূর্য্যমল্লের প্রাণবিসর্জ্জনগাথা আজি পর্য্যন্ত তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সূর্য্যমল্লের পাঁচটি পুত্র;—ভর্গ, উদ, গর্গ, প্রয়াগ ও বিরামদেব। জ্যেষ্ঠপুত্র ভর্গ যৌবনেই জীবনবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গঙ্গ; সেই গঙ্গই পিতামহের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

দ্বিতীয় পুত্র উদ; তাঁহার একাদশ পুত্র! তাঁহারা উদাবৎ শাখা নামে প্রসিদ্ধ। নিমাজ, জয়ৎরাম, গুণ্ডক, বীরতীয়, রায়পুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য উদাবৎ-শাখার অধিকৃত। তৃতীয় পুত্র সগ, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সগবৎ-শাখা নামে বিখ্যাত। চতুর্থ প্রয়াগ; তাঁহার বংশধরগণ প্রয়াগোৎ নামে অভিহিত। পঞ্চমপুত্র বিরামদেব; তাঁহার ঔরসে নারু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই নারু মরুক্ষেত্রমধ্যে দেবতার স্থায় পুজিত হইতেন। সুজাত নামক স্থানে আজি পর্য্যন্ত নারুর প্রতিমূর্ত্তির পুজা হয়। নারুর বংশধরগণ নরাবৎযোধ নামে সুপরিচিত। এই বংশের এক শাখা হারাবতীর অন্তর্গত পাঁচপাহাড় নামক স্থানে রাজত্ব করেন।

সূর্য্যমল্লের জ্যেষ্ঠপুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করাতে কৌলিক নিয়মানুসারে সেই জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গ যোধপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। কিন্তু সূর্য্যমল্লের তৃতীয় পুত্র সগ সেই গঙ্গকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইবার অভিলাষ করেন; নানাপ্রকার ষড়্‌যন্ত্র করিয়া গঙ্গের প্রাণনাশ করিবারও চেষ্টা পান; কিন্তু রাজধানীর প্রধান প্রধান লোকেরা কেহই সেই অনুচিত পক্ষ সমর্থন করেন নাই। সেই অভিমানে দুঃখে সংক্ষুব্ধহৃদয়ে সগ পিতৃরাজধানী পরিহার পূর্ব্বক নানা-স্থানে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে থাকেন।

ঠিক সেই সময়ে দৌলত খাঁ লোদী রাঠোররাজগণকে নাগোর হইতে বিতাড়িত করিয়া মরুক্ষেত্রমধ্যে মহাবীরত্ব প্রকাশ করিতেছিলেন। রাজ্যলোভী সগ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত তিনি দৌলত খাঁর নিকট সৈন্যসাহায্য-প্রার্থী হইলেন। দৌলত খাঁ পাঠান, হিন্দুরাজগণের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ ছিল, সগের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে তৎক্ষণাৎ তিনি সম্মত হইলেন। তথাপি সেই সময় দৌলত খাঁর মনে কি একপ্রকার ধর্ম্মভাবের উদয় হইল। সিংহাসনাধিষ্ঠিত গঙ্গের নিকটে তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, "যোধপুর রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ সগকে প্রদান করুন, নতুবা রাজ্যমধ্যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিব।"

গঙ্গরাও পাঠান লোদীর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অচিরেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। রাজা অবিলম্বেই সামন্তমণ্ডলী ও সৈন্যদলসহ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। শিবজীর বংশে এরূপ গৃহবিবাদ অথবা আত্মবিগ্রহ আর কখন হয় নাই, ইহাই প্রথম। দৌলত খাঁর সহিত গঙ্গরাজের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহী সগ অবিলম্বেই দৌলত খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। রাজপক্ষের প্রধান প্রধান বীরগণ সমরক্ষেত্রে নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে পাঠানবীরগণ অপেক্ষা রাঠোর বীরগণের পরাক্রম সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রাজপিতৃব্য সগ নিহত হন এবং গর্ব্বিত দৌলত খাঁ সসৈন্যে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। রাঠোরজাতি কত বড় বীর, সেই যুদ্ধেই পাঠানেরা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। সগ সমরক্ষেত্রে নিহত হইলে গঙ্গরাও নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে থাকেন।

তৈমুরবংশীয় বাবর শাহ এই সময়ে প্রবল-প্রতাপে রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন। যোধপুর-সিংহাসনে গঙ্গরাওয়ের অভিষেক হইবার দ্বাদশবর্ষ পরে সমগ্র রাজপুতজাতির সহিত বাবর শাহের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মিবারপতি মহারাণা সংগ্রামসিংহ রাজবারার সমগ্র রাজপুতের অধিনায়ক-রূপে রণক্ষেত্রে দর্শন দেন। সংগ্রামসিংহের দ্বিতীয় অভিধান সঙ্গসিংহ। সেই নামের প্রতি বাবরের এক প্রকার বিতৃষ্ণা ছিল। বাবরের বাসনা, সমগ্র রাজবারা-প্রদেশ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া স্বয়ং তাহার প্রভু হইবেন। মিবার এবং মারবার প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের নরপতিগণ আপনাদিগের

জাতীয় স্বাধীনতাবিলোপের পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া জাতীয় সামন্তলোককে একত্র করিয়া সভা করেন। সভায় স্থির হয়, সকলেই প্রাণপণে যবনের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তৎকালে রাজ্যমধ্যে রাণা সংগ্রামসিংহের বিশেষ প্রতিপত্তি, সমগ্র ভারতবর্ষের দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে মিবারপতি সংগ্রামসিংহই তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকর্ম্মের অগ্রণী বলিয়া সকলের নিকটেই তিনি সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। বাবরের সহিত সংগ্রামকালে মারবারাধিপতি মহারাণা সংগ্রামসিংহকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলেন। জাতীয় স্বাধীনতারক্ষার নিমিত্ত তিনি রাণা সংগ্রামসিংহের রাজপতাকার অধীনে যুদ্ধ করিবার জন্য একদল প্রবলবলশালী রাঠোর-সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। বাস্তবিক রাজপুতজাতির সেই মহাসমরে রাঠোরসেনাদল সবিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করেন। বিজাতীয় যবনের বিরুদ্ধে ভারতের রাজপুত-রাজগণের সর্ব্বজনবিদিত জাতীয় উত্থান ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ। কিন্তু এই জাতীয় উত্থানের ফলগুলি রাজস্থানের পক্ষে অনুকূল হয় নাই। শঠতা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা বাবর শাহ জয়লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মযুদ্ধে রাজপুতজাতি কখনই পরাস্ত হইতেন না, ধর্ম্মযুদ্ধ হইলে রাঠোর-বীরগণের অসি অবশ্যই জয়লাভ করিতে পারিত। গঙ্গরাও সে যুদ্ধে যদিও স্বয়ং গমন করেন নাই, কিন্তু তিনি স্বীয় প্রাণোপম পৌত্র রায়মল্লকে এবং খাও ও রত্ন প্রভৃতি কতিপয় প্রথমশ্রেণীর সামন্তরাজকে বিপুল রাঠোরসৈন্যসহ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাঠোরবীরেরাই সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অসংখ্য যবনসৈন্য বিনষ্ট করেন। তাঁহারাই রণক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত ছিলেন; বহুসৈন্য বিনাশ করিয়াও শীঘ্র তাঁহারা হীনবল হইয়া পড়েন নাই। অবশেষে যবনের ধূর্ত্ততায় রায়মল্ল, খাও ও রত্ন এবং কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ রাঠোরবীর অতি শোচনীয়রূপে জীবনবিসর্জ্জন করেন। বাবর শাহ সেই যুদ্ধে রাঠোর-জাতির বাহুবলের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঠতার সাহায্যগ্রহণ না করিলে সম্মিলিত রাজপুত-রাজগণের সৈন্যগণের হস্তে তাঁহার সৈন্যগণ সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইত, বাবর শাহ ইহাও বুঝিয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের চারিবৎসর পরে যোধপুরাধিপতি গঙ্গরাও প্রাণত্যাগ করেন। যবনযুদ্ধে পরাভব এবং প্রাণসম পৌত্র রায়মল্লের বিয়োগশোক, এই উভয় কারণেই তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহাতেই তাঁহার অকালে দেহনাশ ঘটে।

যতিপ্রণীত একখানি ইতিহাসে প্রকাশ আছে, কোন পাপাত্মা কাহারও প্রলোভন-প্রণোদিত হইয়া গঙ্গরাওকে বিষপ্রয়োগে নিধন করিয়াছিল। মহামতি টড সাহেব বলেন, রাজস্থানের অন্য কোন ইতিহাসে ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।

গঙ্গরাও লীলাসংবরণ করিলে পর ১৫৮৮ সংবতে মল্লদেব মারবারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাঠোর ইতিহাসে মল্লদেবের নাম অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত পরিকীর্ত্তিত। রাও মল্লদের প্রথমাবস্থায় মহাবীরত্ব প্রকাশ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজপুত-জাতির পরমশত্রু সম্রাট্ বাবর গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজ্য-সমূহ অধিকার করিতে অত্যন্ত অভিলাষী এবং অতিশয় ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে তিনি মারবার আক্রমণ করিতে অবসর পাইবেন না। মরুস্থলীতে রাঠোরজাতির প্রাধান্যবিস্তার করিবার মানসে মল্লদেব সেই সময় বীরমূর্ত্তিতে বহির্গত হইলেন। মরুস্থলীর যে সকল সীমান্তদুর্গ যবনসম্রাটের সৈন্য দ্বারা পরিরক্ষিত, মল্লদেব সর্ব্বাগ্রে একে একে তৎসমস্ত অধিকারভুক্ত করিলেন। পরিশেষে সুন্দরের হৃদয় পর্য্যন্ত বিজয়পতাকা সমুড্ডীন করিয়া দিলেন।

মল্লদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মিবারেশ্বর মহারাণাগণই রাজবারার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর মিবারের সিংহাসন লইয়া মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়। রাণা-বংশের একটি অপ্রাপ্তব্যবহার শিশু মিবারের সিংহাসনে সমুপবিষ্ট হন। এই সুযোগে মোগলেরা উত্তরদিক্ হইতে এবং গুজরাটের রাজগণ দক্ষিণদিক্ হইতে মিবার আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় মল্লদেব অতি সহজে রাজবারা-মধ্যে প্রভুত্ববিস্তার করিয়া শত্রুসংহার করিতে থাকেন; নব নব রাজ্য অধিকার, নব নব দুর্গ নির্ম্মাণ এবং ভিন্ন ভিন্ন নব নব জাতিকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাজপুতানামধ্যে সেই সময়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিরূপে অতুলসম্মান লাভ করেন। যাবনিক ইতিহাসবেত্তা ফেরেস্তা লিখিয়াছেন, হিন্দুস্থানের নরপতিগণের মধ্যে মল্লদেবের তুল্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ও বলশালী নরপতি আর তখন কেহই ছিলেন না। শিবজীর পরবর্ত্তী রাঠোর-অধিনায়ক-গণের মধ্যে প্রবলপরাক্রমে একমাত্র মল্লদেব এই সময়ে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছিলেন।

অজমীর এবং নাগোর ইতিপূর্ব্বে রাঠোরদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। মল্লদেব রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমবর্ষেই সেই দুটি প্রদেশ পুনরধিকার করেন। ১৫৯৬ সংবতে মল্লদেব একাদিক্রমে ঝালোর, পত্তন, শিবানো এবং সিন্ধলদিগের নিকট হইতে ভদ্রার্জ্জুন প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। যোধরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র বিকা নিজ বাহুবলে বিকানীর রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধি-কারিগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত বিকানীর-রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তৎকালে যিনি বিকা-নীরের অধিপতি, তিনি মল্লদেবের নিকটজ্ঞাতি হইলেও মল্লদেব মরুস্থলীতে অন্য কোন স্বাধীনরাজ্য থাকিতে দিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ভদ্রার্জ্জুন অধিকারের দুই বৎসর পরে মল্লদেব বিকানীররাজ্য আপন রাজ্যের অধীনে আনয়ন করেন। আদিম রাঠোরেরা মরুস্থলীর মধ্যে মেহো এবং লুনী নদীর তীরবর্ত্তী যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রদেশের অধিনায়-কেরা সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া রাঠোর-অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাধীন হন। মল্লদেব এই সময়ে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া পুনরায় সেই সকল প্রদেশ আপন রাজ্যের অধীন করিয়া লন। তত্রত্য অধিনায়কেরা মল্লদেবের সামন্তপদে বরিত হন। যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সসৈন্যে মল্লদেবের সাহায্য করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ।

এই সকল কার্য্যের পর মল্লদেব নিজ পরাক্রান্ত সৈন্যসাহায্যে ভট্টিগণের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিক্রমপুররাজ্য অধিকার করেন। সেই বিক্রমপুরে মল্লদেবের কতিপয় বংশধর অবস্থিতি করিতেন। এক্ষণে সেই রাজ্য যশল্মীররাজ্যের সহিত মিলিত হইয়াছে। টড সাহেব বলেন, তথাকার রাজ-পুত্রেরা এক্ষণে মালদেওৎ নামে অভিহিত হইয়া মরুস্থলীমধ্যে অসমসাহসিক দস্যুরূপে গণ্য। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব যে সময় ইংরাজদিগের প্রতিনিধিরূপে কাবুলে গমন করেন, সেই সময় তিনি ঐ মালদেওৎ দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় পাইয়াছিলেন।

কেবল রাজ্যবিস্তার করাই মল্লদেবের কার্য্য ছিল না, রাজবারার নানা প্রান্তে নানাস্থানে নিজ বংশধরগণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; বিক্রমপুরের ন্যায় মিবার এবং ঢুন্ধরেও নিজ বংশধরগণকে বসবাস করাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জয়পুরের দশক্রোশ দক্ষিণে কচ্ছবাহদিগের রাজধানী চাতসু; সেই চাতসু নামক স্থান জয় করিয়া মল্লদেব সেই স্থানে সুন্দর পরিখাযুক্ত সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

মল্লদেবের জননী শিরোহী-প্রদেশস্থ দেবরাজাতীয় নরপতির কন্যা ছিলেন। তিনি সেই দেবরাগণের নিকট হইতে শিরোহীরাজ্য অধিকার করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে অর্পণ করেন।

আধিপত্য বিস্তার করিয়া মহামতি মল্লদেব যোধপুর রাজধানী দৃঢ়-দুর্গবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে চারিদিকে বিরাটাকার সমুচ্চ অভেদ্য প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আয়তন-বৃদ্ধি এবং নবীন নবীন প্রাসাদ-নির্ম্মাণকার্য্যেও তাঁহার বহুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। মৈরতা-প্রদেশ মল্লদেবের অতি প্রিয়স্থান ছিল, সেই জন্য তিনি সেই স্থানের নাম মল্লকোট রাখিয়াছিলেন। তথায় সুদৃঢ় প্রাচীর ও দুর্গনির্ম্মাণে মল্লদেব দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। যোধরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র সতল বহুব্যয়ে সতলমীর নামে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মল্লদেব সেই দুর্গ অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া তাহা ভগ্ন করিবার আদেশ দেন। সেই সকল উপকরণে পোকর্ণ প্রদেশ সুদৃঢ় দুর্গবদ্ধ করা হয়। পোকর্ণপ্রদেশ ভট্টিদিগের নিকট হইতে অধিকৃত। সতলমীরের সমস্ত অধিবাসী এবং মরুস্থলীর সম্ভ্রান্ত বণিক্‌বর্গ পোকর্ণে গিয়া বাস করেন।

রাঠোর-শাসন সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে বীরবর মল্লদেব রাজ্যের প্রত্যেক প্রধান প্রধান স্থানে সুন্দর সুন্দর সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভদ্রার্জ্জুন-প্রদেশে শিবানোর নিকটবর্ত্তী ভীমলোদ পর্ব্বতশিখরে গুন্দক নামক স্থানে পিপার এবং ধুনারা নামক প্রদেশে মল্লদেবের কয়েকটি বিরাট দুর্গ বিদ্যমান আছে; শিবানো প্রদেশের কুন্দলকোট নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ মল্লদেবের এক সুকীর্ত্তি ঘোষণা করে। অজমীরের যে দুর্গপ্রাসাদ এক্ষণে গড়বেতলী নামে প্রসিদ্ধ, তাহাও মল্লদেবের এক সুকীর্ত্তি। মল্লদেব ঐ দুর্গের নাম রাখিয়াছিলেন, কোট-বুরুজ। শিল্পবিজ্ঞানেও মল্লদেবের বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। দুর্গমধ্যে বিশুদ্ধ জল লইয়া যাইবার জন্য তিনি একটি বৃহৎ চক্রযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; সেই চক্রযন্ত্র-সাহায্যে অতি সহজেই দুর্গমধ্যে জল আকৃষ্ট হইত। ইহাতে দুর্গবাসিগণের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল।

রাঠোরের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, একমাত্র সম্বরহ্রদের আয়ের দ্বারা মল্লদেব প্রদেশীয় দুর্গাবলী নির্ম্মাণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন্ কোন্ প্রদেশ এবং কোন্ কোন্ রাজ্য মল্লদেবের অধীনে ছিল, ইতিহাসে তাহার তালিকা আছে। কতকগুলি প্রসিদ্ধ রাজ্যের নাম এই স্থলেও গৃহীত হইল;—সুজাত, সম্বর, মৈরতা, খাতা, বেদনোর, রায়পুর, ভদ্রার্জ্জুন, নাগোর, শিবানো, লোহগড়, জয়কুলগড়, বীকানীর, বীণমহল, পোকর্ণ, কুশলী, বেরাশ্ব, ঝালোর, যাযাবর, মুলার, ফিলোদি, চাতসু, দেবতা, ফতেপুর, অমরসার, বেণিয়পুর, টঙ্ক, অজমীর, জিহাজপুর এবং শিখাবতী। এই সকল রাজ্যের অতিরিক্ত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল; রাজ্যমধ্যে গ্রামনগরাদিও প্রচুর ছিল। কতকগুলি রাজ্য মল্লদেব চিরদিনের জন্য রাঠোর-রাজ্যভুক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই; ক্রমান্বয়ে তৎসমস্তই হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

বেদনোর-প্রদেশে এবং তদধীনস্থ ষষ্ট্যধিক তিন শত নগর ও গ্রামে যদিও রাঠোরদিগের বসতি, যদিও একজন রাঠোর-সামন্ত তাহার অধিনায়ক, কিন্তু সেই রাঠোরগণ বিখ্যাত জয়মল্লের অধীনস্থ মৈরতীয়গণের বংশসম্ভূত। জয়মল্ল নিজেও রাঠোর, মিবারের রাণার অধীনে তিনি ষোড়শজন প্রথমশ্রেণীর সামন্তের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন, মিবারেশ্বরের উপকারার্থ প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি অসিধারণ করিতেন। অধিক কথা কি, বীরবর জয়মল্ল রাঠোরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বজাতীয় রাজা এবং জন্মভূমির বিরুদ্ধেও অসিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রাজপুতজাতির প্রভুভক্তি এই প্রকার। যোধরাজের বংশক্রমের মৈরতী শাখা এইরূপ প্রবল পরাক্রমপ্রকাশে বহুকাল স্বাধীনতা-সুখসম্ভোগ করেন। সহজে কেহই তাঁহাদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারেন নাই। পরিণামে কিন্তু সেই প্রদেশটি সম্পূর্ণরূপে মারবারের অধীশ্বরের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। শিবাজীর

সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত মারবারের সামন্তগণের হস্তে নিয়মিতরূপে রাজ্যশাসনভার সমর্পিত হয় নাই। নব নব রাজবংশধরগণ ক্রমে ক্রমে শাখাবদ্ধ হইয়া মরুস্থলীর প্রত্যেক অধিকারে আপনারা বাস করিতে থাকেন। সেই সূত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত এবং তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশসংখ্যা পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়। মহারাজ মল্লদেব যখন দেখিলেন, মূলরাজ্য এইরূপে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইলে সামন্তশাসন-প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না এবং সামান্তমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ না করিলেও সুশাসনের সুবিধা হইবে না, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে সমন্তগণের পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তাঁহার নির্দ্ধারিত সেই ব্যবস্থা ও শ্রেণীবিভাগ পরবর্ত্তী রাজগণ কেহই পরিবর্ত্তন করেন নাই।

রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করিয়া রাজনীতিজ্ঞ মল্লদেব রাজ্যমধ্যে অবিরোধী শান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শাসনবিস্তার, প্রভুত্ব-স্থাপন, দুর্গনির্ম্মাণ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য সুসম্পাদিত হইবার পর দশ বৎসরকাল রাজ্যমধ্যে অবিরোধী শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশী অথবা বিদেশী, কোন শত্রুই তাঁহার সে সুখশান্তি ও রাজগৌরবে বাধা দিতে অগ্রসর হয় নাই। মরুস্থলীর সমগ্র প্রাচীন স্বাধীনজাতি এই সময়ে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল; কেহই আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই। সর্ব্বত্রই কেবল শিবজীর বংশধরগণের জয় এবং সর্ব্বত্রই কান্যকুব্জের জয়পতাকা সমুড্ডীন।

মল্লদেবের ভাগ্যচক্র এই দশ বৎসর পরেই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। এই দশ বৎসর তিনি যেরূপ প্রবল-প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, দশ বৎসর পরে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য সংঘটিত হইল। এই সময়ে ভারতে আদি মোগলাধিকার প্রতিষ্ঠাতা বাবর শাহ পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্যত্র আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হন। তাঁহারই সেনানী দুরাচার সেরশাহ তাঁহার সেই দুর্দ্দশার মূল। পদচ্যুত হুমায়ুন সেই অসহায় অবস্থায় রাজবারার মল্লদেবকে প্রবলক্ষমতাশালী জানিয়া তাঁহারই আশ্রয়গ্রহণ করেন; কিন্তু মল্লদেব তাঁহার প্রতি অনুকূল ব্যবহার করেন নাই। বিজাতীয়, বিধর্ম্মী, পদচ্যুত আশ্রয়ার্থী নৃপতির প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ রাজধর্ম্মপ্রতিপালক নরপতির পক্ষে নিন্দনীয় বলিতে হয়, কিন্তু টড্ সাহেব বলিয়াছেন, সম্রাট্ বাবরের সহিত সমস্ত রাজপুতজাতির যখন যুদ্ধ হয়, সেই সময় মল্লদেবের প্রাণোপম পুত্র রায়মল্ল রণক্ষেত্রে নিহত হওয়াতে সেই পুত্রশোকে মল্লদেব বিষম মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই নির্ঘাত মনোবেদনাবশেই তিনি বাবরপুত্র হুমায়ুনকে অভয়দান করেন নাই, দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার-সঙ্কল্পেও তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র সহায়তা করেন নাই। ইতিহাসে বরং এইরূপ আভাস আছে যে, মল্লদেব সেই দুঃসময়ে হুমায়ুনকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন।

মানুষ কদাচ ভবিষ্যদ্ভাগ্য আয়ত্ত করিতে পারে না। নিরাশ্রয় হুমায়ুনকে আশ্রয়দানে বিমুখ হইয়া মহারাজ মল্লদেব তৎকালে হয় ত প্রীতিলাভ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেই হুমায়ুনের ঔরসে আকবর শাহ আবির্ভূত হইয়া পিতৃ-অবমাননার প্রতিফল প্রদান করিবেন, মল্লদেব তখন তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। আকবরের জন্মগ্রহণের এক সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে যে প্রবল প্রতাপ রাঠোর ভূপাল উপবিষ্ট হইয়া ভারতশাসন করিয়াছিলেন, সেই রাঠোরভূপালকুলে মল্লদেবের জন্ম, তাঁহাকে যে আকবরের নিকট নতমস্তকে রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে, মল্লদেব ইহাও ভাবিতে পারেন নাই। শিশু আকবর তাঁহার পুত্রকে রাজরাজেশ্বর উপাধিভূষণে বিভূষিত করিবেন, ইহাও মল্লদেবের স্বপ্নের অগোচর ছিল। আকবর যে সময় মল্লদেবের পুত্র উদয়সিংহকে

রাজরাজেশ্বর উপাধি প্রদান করিয়া ললাটে রাজটীকা দিয়া কটিতটে হেমমণ্ডিত অসি বিলম্বিত করিয়া দেন, সে সময় তিনি উদয়সিংহের পিতা মল্লদেব কর্ত্তৃক নিজপিতা হুমায়ুনের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়াছিলেন কি না, কেহই তাহা বলিতে পারেন না।

হুমায়ুনের প্রতি মল্লদেবের দুর্ব্যবহার কিরূপ, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন। হুমায়ুন যোধপুরে আসিয়া মল্লদেবের আশ্রয় চাহিলেন আশ্রয়দানের পরিবর্ত্তে মল্লদেব তাঁহাকে বিপক্ষ হস্তে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা পাইলেন। কোন সূত্রে হুমায়ুন তাঁহার সেই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া গর্ভবতী মহিষীসমভিব্যাহারে অগত্যা তথা হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। হুমায়ুনকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া সেরশাহ স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন, হুমায়ুন যোধপুরে পলায়ন করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে অশীতি সহস্র সুসজ্জিত সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া মল্লদেবের দমনার্থ অবিলম্বে যোধপুর যাত্রা করিলেন। মল্লদেবকে দমন করা অথবা হুমায়ুনকে বন্দী করা এই দুই বিষয়ের কোনটি তখন সেরশাহের উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাসে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ নাই। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া দিল্লীর নবীন সম্রাট্ সেরশাহ যোধপুরে আসিতেছেন, মল্লদেব ইহা শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। যে বিধর্ম্মী যবনগণ কান্যকুব্জ হইতে রাঠোরশাসনের উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে, সেই যবনদিগের নূতন বাদশাহের সহিত বহুবর্ষ পরে পুনরায় সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইবে, এই আনন্দে স্বজাতির গৌরব-বিস্তারার্থ মল্লদেব বরং উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

মল্লদেবের রাজ্য তখন সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন। রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থলে অভেদ্য দুর্গম দুর্গ, সৈন্যগণ সুশিক্ষিত এবং সমস্ত সামন্ত বশীভূত। বিপক্ষের সহিত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিতে মল্লদেব তখন সর্ব্বাংশেই প্রস্তুত। সেই সাহসেই সেরশাহের আগমন-সংবাদে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না, বরং প্রতিহিংসার অভিলাষে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল।

অশীতিসহস্র যবনসৈন্য সমভিব্যাহারে সেরশাহ মরুস্থলীতে দর্শন দিলেন, পঞ্চাশৎ সহস্র রাঠোরসৈন্য সমভিব্যাহারে বীরবর মল্লদেবও মহাবীরদর্পে রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সমরনীতিজ্ঞ মল্লদেব সর্ব্বত্র মহাবীরত্বের সহিত রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তৎকালে রাঠোর জাতির বীর্য্যবিক্রমের প্রশংসা ভারতের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল। সেরশাহ বীরদর্পে অগ্রসর হইলেও মল্লদেব কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তাঁহার সৈন্যগণের হৃদয়ও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বরং তাহাদের স্মরণ হইল, বিধর্ম্মী যবনেরা একবার কান্যকুব্জ হইতে রাঠোররাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল, পুনরায় সমরক্ষেত্রে সেই যবনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে। প্রতিহিংসায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই রাঠোরেরা এই যুদ্ধে মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেও তাহারা কিছুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করিল না।

রাজা মল্লদেব ইতিপূর্ব্বে রাজ্যের নানা স্থানে দুর্ভেদ্য দুর্গাবলী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; আপন সেনাদলকেও সামরিক বিদ্যায় উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। সেরশাহের সহিত সমরে রাঠোর সেনাগণের পরীক্ষা হইবে, ইহাই মল্লদেবের উৎসাহানলের প্রধান কারণ। তিনি নিজেও যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত। শিবজীবংশে বীরত্ববিক্রমে কেহই ন্যূন নহেন, তথাপি মল্লদেবের রণনীতি-জ্ঞতার উচ্চ-প্রশংসা। সেরশাহও মহাবীর। যখন তিনি শুনিলেন, রাঠোর-সৈন্যদল আপনাদের শিক্ষা-নৈপুণ্যে পূর্ণসাহস এবং জাতীয় একতায় বৈরনির্য্যাতনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তখন তাঁহার মনে

কিঞ্চিৎ চিন্তার উদয় হইল। কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন, "কেনই বা মরুস্থলীতে আসিলাম?" এই কথা বলিয়া সেরশাহ যুদ্ধের অগ্রে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

ক্রমাগত একমাস কাল যবন এবং রাঠোর পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া রহিল; কেহই অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল না। প্রতিদিনই সেরশাহের বিপদাশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। দিন যত অতীত হইতে লাগিল, ততই অবসর প্রাপ্ত হইয়া রাজা মল্লদেব যবনসেনাদলকে ঘোরতর বিপদ্‌জালে জড়িত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সেরশাহ দেখিলেন, আসন্নবিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই, পলায়ন করাও অসম্ভব।

এই অবস্থায় সেরশাহ কিছু কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই সময় যদি বিপক্ষদলে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারা যায় কিংবা যদি রাজভক্ত রাঠোর সামন্তগণের অটলা রাজভক্তির উপর মল্লদেবের কোন প্রকার সন্দেহ জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। যবনেরা সময়ে সময়ে এইরূপ উপায় অবলম্বনেই রাজপুতনরপতিগণের উপর জয়লাভ করিয়া গিয়াছেন; সেই পথ অবলম্বন করাই সেরশাহের ইচ্ছা হইল।

ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার উপায়গুলি সেরশাহ নিজের মনে মনেই রাখিলেন। গোপনে স্বহস্তে রাঠোর-সামন্তগণের নামে তিনি এইভাবে একখানি পত্র লিখিলেন যে, সামন্তবর্গের সহিত তাঁহার যেন গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সমরাঙ্গনে সামন্তগণ সকলেই মল্লদেবের বিরুদ্ধে সেরশাহের সহায়তা করিবেন। একজন সুচতুর যবনদূত সেই পত্রখানি লইয়া রাঠোর-শিবিরের নিকট ফেলিয়া দিয়া আসিল; লোকে মনে করুক, কেহ যেন ভ্রমক্রমেই সেই পত্রখানি ফেলিয়া গিয়াছে। বিগ্রহের সময় প্রতিকূল ঘটনা অনেক হয়। পত্রখানা অগ্রে মল্লদেবের হস্তে পতিত হইল। পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রিয়তম সামন্তগণ যবনের সহিত যোগ দিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, মারবারের কয়েকটি সামন্তরাজ্য তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, সেই আক্রোশেই হয় ত সামন্তেরা সেরশাহের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন। চতুরনীতিজ্ঞ হইয়াও মল্লদেব তৎকালে পত্রখানির সত্যাসত্যতার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না।

দিনকত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া সেরশাহ ইতিপূর্ব্বে মল্লদেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; মল্লদেব তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি যুদ্ধ আরম্ভ হইল না সামন্তগণের চরিত্রে সন্দেহ করিয়াই মল্লদেব নিজসৈন্যকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন; রাঠোরেরা যবনরক্তে অসি ধৌত করিবার জন্য অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল, মল্লদেবের এই নিষেধ-আজ্ঞায় সকলেই বিস্মিত হইল। রাঠোর-সামন্তগণের রণপিপাসা তখন যেরূপ বলবতী, মল্লদেবের ঐরূপ আজ্ঞা প্রচারিত না হইলে একদিনেই সমস্ত যবনসৈন্যের মস্তক রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত হইত সন্দেহ নাই।

সহসা নিষেধ-আজ্ঞা কেন প্রচারিত হইল, রাজভক্ত রাঠোর-সামন্তগণ তাহার কারণ অবগত হইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন, 'ইহা ধূর্ত্ত সেরশাহের চাতুরী, আপনি হৃদয় হইতে অবিশ্বাস দূর করিয়া দিউন; আমরা এতদূর অভক্ত নহি, এতদূর বিশ্বাসঘাতক নহি যে, বিজাতীয় যবনের নিকটে জাতীয় স্বাধীনতা বিক্রয় করিব।'

এ কথাতেও মল্লদেবের বিশ্বাস জন্মিল না। সামন্তেরা দেখিলেন, কিছুতেই মল্লদেবের অবিশ্বাস দূর হইল না, রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে তিনি নিতান্ত অসম্মত। সামন্তগণ তাঁহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস দাঁড়াইল। সামন্তেরা তখন কি করিবেন? হৃদয়স্থ

রাজভক্তির নিদর্শন-প্রদর্শন জন্য প্রধান প্রধান সামন্তেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দ্বাদশ সহস্র রাঠোর-সৈন্য লইয়া তাঁহারা সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সেরশাহের দুর্ভেদ্য শিবির আক্রমণ করিলেন। সে দিন তাঁহাদের শরীরে যেন দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইল, ক্ষণকালমধ্যে বিপক্ষশিবির ভেদ করিয়া তাঁহারা সেরশাহের আবাসশিবির পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইলেন। অগণিত যবনসৈন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইল। সেরশাহ মহাভীত হইলেন। ভয় পাইলেও দুর্দ্দম যবনেরা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যায় না। সের-শাহ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মল্লদেব তখনও স্বয়ং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন না, অনুবল সৈন্যগণকেও অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন না। সামন্ত-সংগৃহীত সেই দ্বাদশ সহস্র রাঠোরবীর বহুক্ষণ রণক্ষেত্রের মহাভীতি উৎপাদন করিয়া অশীতিসহস্র যবনসৈন্যের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। যবন ক্রমশই হীনবল হইতে লাগিল। সেরশাহ তখন সমস্ত সৈন্যগণকে এককালে চতুর্দ্দিক্ হইতে রাঠোর-আক্রমণে অনুমতি দিলেন। যবনেরা মণ্ডলা-কারে রাঠোরসৈন্যগণকে বেষ্টন করিয়া রাঠোররক্তে সমরক্ষেত্র প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিল। তখনও মল্লদেব অগ্রসর হইলেন না। সামন্তসৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ ইতস্ততঃ নিরাশ-নেত্রপাত করিয়া বীরগৌরব রক্ষা করিবার মানসে হতাশহৃদয়ে একে একে রণক্ষেত্রে শয়ন করিতে লাগিলেন। রাঠোরবীরগণের মহাবীরত্বের সংবাদ মল্লদেবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তাঁহার অনুতাপের অবসর আসিল। তখন তিনি বুঝিলেন, সামন্তগণের পূর্ব্ববাক্যই যথার্থ, সেরশাহ তাঁহাকে যথার্থই চাতুরীজালে বিমোহিত করিয়াছিল। এই চৈতন্য যখন তাঁহার উদয় হইল, তখন অসময়। সামন্ত-মণ্ডলী তাঁহার অকারণ অবিশ্বাসে নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; অনেকেই সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সে সময়ে মল্লদেবের সেনাপতিত্বে সে যুদ্ধে কোন বিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত রাঠোরজাতির এই প্রথম অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া গেল। সেরশাহ রণজয়ী হইলেন। দ্বাদশ সহস্র রাঠোরের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তিনি রণক্ষেত্রে বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন। রণজয়ী যবনসেনাদল যখন বিজয়ভেরী বাদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করে, সেরশাহ তখন ভাবিয়াছিলেন, চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া মল্লদেবকে বিমোহিত করিতে না পারিলে একটি যবনসৈন্যও সে দিন মরুক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিত না। রাঠোর-গণের মহাবীরত্বদর্শনে তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—"একমুষ্টি গোধূমের নিমিত্ত আমি হিন্দুস্থানের সিংহাসন হারাইতেছিলাম।" কথিত আছে, মারবার অনুর্ব্বর ক্ষেত্র, রাজবারার অন্তর্গত মিবার প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় সর্ব্বশস্য তথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে না, এই নিমিত্তই সেরশাহ একমুষ্টি গোধূমের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

অচিরেই পুনরায় দিল্লীতে সেরশাহী রাজত্বের বিলোপ হইল। নিগৃহীত পলায়িত হুমায়ুনের মস্তকে পুনরায় ভারতের প্রধান রাজমুকুট অর্পিত হইল, রাজা মল্লদেব স্বচক্ষে তাহাও প্রত্যক্ষ করি-লেন। হুমায়ুনের প্রতি তিনি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন পুনর্ব্বার দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে মল্লদেবের মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তথাপি রাঠোরজাতির বাহুবল তখন সর্ব্বত্র প্রশংসিত থাকাতে সে ভয় অধিকক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে তিনি অক্লেশে হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন, এ ভরসা তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ ছিল। বিশেষতঃ সম্রাট হুমায়ুন অলস-প্রকৃতির লোক, তাঁহার স্বভাব নিতান্ত মৃদু, ইহা স্মরণ করিয়া রাঠোরেরা নির্ভয়ে জাতীয় শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইবেন, এমন আশাও তাঁহাদের জন্মিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই।

দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিয়া সম্রাট্ হুমায়ুন অধিক দিন ভোগ করিতে পান নাই, অচিরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শিশুপুত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হন। আকবরের গর্ভধারিণী পতির দুর্দ্দিনে অমরকোটের অরণ্যে আকবরকে প্রসব করিয়াছিলেন। মল্লদেবের অসদাচরণের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল। মল্লদেবকে প্রতিফল দান করিবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ইহাও কেহ কেহ বলেন। সে কথা সত্য হউক কিংবা না হউক, স্বীয় আধিপত্য-বিস্তার করিবার নিমিত্তই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক আকবর ১৬১৭ সংবতে প্রবল মোগলসৈন্যসহ মারবার-রাজ্য আক্রমণ করেন। রাঠোর-সৈন্যগণ পূর্ব্বেই মল্লকোট নামক স্থানে দৃঢ় দুর্গমধ্যে সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, মোগলসৈন্য সর্ব্বপ্রথমে মল্লকোট-দুর্গ বেষ্টন করিল। কয়েকদিন অবরোধের পরেই সংগ্রাম আরম্ভ। রাঠোরেরা আত্মরক্ষা করিতে কোনক্রমেই অসমর্থ ছিল না, কিন্তু মোগলসৈন্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল। অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়া তাহারা মল্লকোটের দুর্গ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে মুক্ত-তরবারি-হস্তে একদল রাঠোরসৈন্য বহির্গত হইয়া বিপুল বিক্রমে সম্রাট্-শিবির ভেদ করিল। মল্লদেব তৎকালে দুর্গমধ্যে ছিলেন না, শিবিরবিজয়ী সৈন্যগণ সেই সময় তাঁহার সহিত মিলিত হইল। দুর্গমধ্যে যাহারা ছিল, তাহারা অসমসাহসে মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে মল্লদেবের জয় হইল না, বালকবীর সৌভাগ্যশালী আকবর বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে মল্লকোট-দুর্গচূড়ে মোগলজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন।

এইখানেই আকবরের জয়-ডঙ্কার পরিতৃপ্তি হইল না, তৎপরেই তিনি জয়োল্লাসে প্রমত্ত হইয়া নাগোরের দুর্জ্জয় দুর্গ রাঠোর-হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। মল্লদেবকে দণ্ডদান করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন রাজ্যাধিকারের অভিপ্রায় তখন তাঁহার ছিল না, জননীর অনুমতিক্রমেই তিনি মারবার জয় করিতে গিয়াছিলেন, মল্লদেবের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মল্লকোট এবং নাগোর উভয় দুর্গই বিকানীরপতি রায়সিংহকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

পুরুষের ভাগ্য চিরদিন সমান থাকে না। পরিবর্ত্তনশীল জগতের সকল মানবের ভাগ্যচক্রই প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়। মল্লদেব সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রবলপরাক্রমে মরুস্থলী কম্পিত করিয়াছিলেন, উপর্য্যুপরি কয়েকটি মহাসমরে জয়লাভ করিয়া রাঠোরশাসনস্তম্ভ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, রাজ্যে রাজ্যে অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, দিন দিন তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতেছিলেন, এই সময় পতনের আরম্ভ। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে মল্লদেব বিপরীত অবস্থায় নিপতিত।

১৬২৫ সংবতে মল্লদেব অগত্যা আকবর শাহের আনুগত্যস্বীকারে বাধ্য হইয়া পড়েন। এই সময় অনেকগুলি নরপতি মোগলসম্রাটের ক্রীতদাসত্ব-শৃঙ্খল গলদেশে ধারণ করেন। মল্লদেব যদিও যবনের আনুগত্যস্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি জাতীয় গৌরব পরিত্যাগ করেন নাই। অপরাপর নরপতিগণ সশরীরে সম্রাট্-সদনে গমন করিয়া অধীনতাপাশে বদ্ধ হন, মল্লদেব তাহা করেন নাই। তিনি স্বয়ং আকবরের সমীপস্থ না হইয়া স্বীয় পুত্র চন্দ্রসেনকে মহামূল্য উপঢৌকন সহ সম্রাট্-সদনে পাঠাইয়া দেন। আকবর তখন অজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সমগ্র দেশীয় নরপতিকে নিজ সিংহাসনসম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ অবলম্বিত রাজনীতিমতে মিবারপতি প্রতাপের পরাজয়সাধনের সূত্রপাত করিতেছিলেন।

মল্লদেবের পুত্র চন্দ্রসেন অজমীরে উপনীত হইয়া পিতৃদত্ত উপহার সম্রাটসমক্ষে সমর্পণ

করিলেন। আক্‌বর তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। মল্লদেব স্বয়ং উপস্থিত না হওয়াতে রাজসম্মানের অবমাননা করা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া তিনি রোষপ্রকাশ করিলেন। বিকানীর-অধিপতি রায়সিংহ ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের বশীভূত হওয়াতে সম্রাট্ তাঁহার প্রতি বিশেষ পরিতুষ্ট ছিলেন। মল্লদেবের বর্ত্তমান ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বিকানীরপতিকেই সমস্ত যোধপুররাজ্যের সনন্দ প্রদান করিলেন। চন্দ্রসেন রাজদরবারে অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিছু দিন পরে বৃদ্ধ মল্লদেব পুনরায় বিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হন। বিপক্ষসৈন্য তাঁহার রাজধানী যোধপুর আক্রমণ করে। মল্লদেব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বাম হইলেন, সেই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আক্‌বরের শরণাপন্ন হইলেন।

মল্লদেব পরাজিত হইয়া আক্‌বরের অধীনতা স্বীকারের নিদর্শনস্বরূপ নিজপুত্র উদয়সিংহকে সম্রাট্-সদনে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতিপদে বরণ করিয়া মনসবদার উপাধি প্রদান করিলেন। মরুক্ষেত্রে আর্য্যবংশধর চিরপ্রসিদ্ধ বীর রাঠোরপতির যবনের দাসত্বস্বীকার এই প্রথম।

কুমার উদয়সিংহ অল্পদিবসের মধ্যে সম্রাট্ আক্‌বরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সম্রাট্ তাঁহার আচরণে এবং সদ্ব্যবহারে মহা সন্তুষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। রাজা উদয়সিংহ অতিশয় স্থূলকায় ছিলেন; অতএব আক্‌বর তাঁহাকে সকৌতুক-সমাদরে "মোটা রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আক্‌বরের উক্তির পুনরুক্তি করিয়া টড সাহেব ঐ উদয়সিংহকে পুনঃ পুনঃ মোটা রাজা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

মল্লদেব আক্‌বর শাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন, পুত্রকে সম্রাটের নিকট সসৈন্যে অবস্থানের জন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন দুই দিকে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তাঁহার এমন অভিলাষ ছিল না যে, উদয়সিংহ ক্রীতদাসের ন্যায় যবন-সম্রাটের আজ্ঞাপালন করুন; কেবল তাহাও নহে; সমস্ত রাঠোরজাতি উদয়সিংহের আচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। সম্রাট্ আক্‌বর মারবারের সজীব অধিরাজকে অগ্রাহ্য করিয়া তদীয় পুত্র উদয়সিংহকে রাজা উপাধি প্রদান করাতে মল্লদেবের অপমান করা হইল; এই সূত্রে রাঠোরজাতিও আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করিলেন, তাঁহাদের হৃদয়েও অসন্তোষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

মল্লদেব বৃদ্ধবয়সে নিতান্ত অবমানিত হইয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন; যবনসম্রাট্ তাঁহার পুত্রকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন, সেই সঙ্গে রাঠোরের স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে; জাতীয় স্বাধীনতা সমূলে বিলুপ্ত হইয়াছে; এই সকল চিন্তায় দিন দিন তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল, পরিতাপানলে হৃদয় দিন দিন দগ্ধ হইতে লাগিল। ১৬২৫ সংবতে ইংরাজী ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে পরিতপ্তচিত্তে রাজা মল্লদেব মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

মল্লদেবের জীবনের শেষ অবস্থা অতীব শোচনীয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই জাতীয় ব্যক্তিগণকে জাতীয় স্বাধীনতার অমৃতময় ফলাস্বাদন করাইয়া তিনি অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, জাতীয় সমস্ত লোকই তাঁহার অনুগত ছিলেন। মহাতেজস্বী মহাবীর পরমধার্ম্মিক রাজা বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। পৃথিবীতে আসিয়া যাহা লাভ করিতে হয়, মল্লদেবের ভাগ্যে তাহা সমস্তই হইয়াছে। নিরাশ্রয় হুমায়ুনের প্রতি যদি তিনি শরণাগত-পালন-ধর্ম্মের বিপরীতাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে সম্রাট আক্‌বর কখনই তাঁহাকে সেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতেন না। বিপরীত আচরণ করিবার একটি স্বতঃসিদ্ধ কারণ ছিল। মল্লদেবের হৃদয়ে জাতীয় স্বাধীনতার

প্রথম হইতে প্রবলতেজে বিরাজিত, বিজাতীয় বিধর্ম্মীর প্রতি তিনি যে ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন, ইহা বিচিত্র ছিল না। যদিও জীবনের অন্তিমদশায় তিনি আক্‌বরের নিকট পরাজিত হইয়া অধীনতা-স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তথাপিও ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, মল্লদেব স্বয়ং সম্রাটের ক্রীতদাস হন নাই, অথবা সম্রাট-সভায় গমন করিয়া বিষময় পরাধীনতা-নিগড় নিজপদে ধারণ করেন নাই। রাঠোরতেজ তখন পর্য্যন্তও তাঁহার হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ ছিল, আমরণ তিনি সেই তেজ সমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। টড সাহেব লিখিয়াছেন, মল্লদেব যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে উদয়পুরের রাণা প্রতাপসিংহের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তিনি জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে পারিতেন। রাঠোরবংশে মল্লদেবকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন শেষ নরপতি বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মল্লদেবের পরবর্ত্তী রাঠোরনরপতিগণ ক্রমান্বয়ে যবনাধীনতা স্বীকার করিয়া এক্ষণে বৃটিশ-সিংহের অধীনতানিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছেন। পুনরায় আর কোন রাঠোরনরপতি মল্লদেবের ন্যায় স্বাধীন নরপতিনামে জগতে পরিচয় দিতে পারিবেন কি না, পরিবর্ত্তনশীল কালই তাহা বলিতে পারে।

মল্লদেবের দ্বাদশ পুত্র। প্রথম রামসিংহ, নিজ পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি মিবারেশ্বর রাণার শরণাগত হন। রামসিংহের সাতটি পুত্র; তন্মধ্যে কেশবদাস চলাই মহেশ্বরনামক স্থানে গমনপূর্ব্বক সগণে তথায় বাস করেন।

দ্বিতীয় পুত্র রায়মল্ল। মিবার এবং মারবার প্রভৃতি রাজ্যের রাজপুত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া যে সময়ে সম্রাট বাবরের সহিত সমরানল প্রজ্বালিত করেন, রায়মল্ল সেই সময় মারবার সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন। বিয়ানার রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৃতীয় পুত্র উদয়সিংহ, তাঁহার প্রতি আক্‌বরের প্রসন্নদৃষ্টি পতিত হয়। আক্‌বরের অনুগ্রহে তিনি মারবারের অধীশ্বর বলিয়া গণিত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পুত্র চন্দ্রসেন, দুই একটি সামান্য স্থান ভিন্ন ইতিহাসে ইঁহার কোন বিশেষ কার্য্যের বিবরণ পরিকীর্ত্তিত হয় নাই।

পঞ্চম পুত্র অহীশকর্ণ, ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ পুলিয়ানামক স্থানে বাস করিতেছেন।

ষষ্ঠ পুত্র গোপালদাস, ইদোরের যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সপ্তম পুত্র পৃথ্বীরাজ, ইঁহার উত্তরাধিকারীরা ঝালোরপত্তনে বাস করিতেছেন।

অষ্টম পুত্র রত্নসিংহ, ভদ্রার্জ্জুনপ্রদেশে ইঁহার বংশধরগণ রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন।

নবম পুত্র ভাইরাজ, ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ আহারী নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

দশম, একাদশ; দ্বাদশ এই তিনটি পুত্রের কোন বিশেষ পরিচয় ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

উদয়সিংহের অভিষেক, মারবার ইতিবৃত্তে তিনটি প্রধান যুগের অবতারণা, সামন্তপ্রথা, আক্‌বরের হস্তে যোধবাই সম্প্রদান, বিবাহের ফল, উদয়সিংহ কর্ত্তৃক বিপ্র-কুমারী-হরণের চেষ্টা, ব্রহ্মশাপে উদয়সিংহের মৃত্যু।

মল্লদেবের পরলোকযাত্রার পর উদয়সিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তিই ব্যবস্থাসিদ্ধ ছিল, কিন্তু উদয়সিংহ আক্‌বরের আনুগত্যস্বীকার করাতে সমগ্র রাঠোরজাতি তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছিলেন; সুতরাং চতুর্থ পুত্র চন্দ্রসেন মারবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় চন্দ্রসেনও মহাতেজস্বী বীরপুরুষ। স্বাভাবিক জাতীয় গর্ব্ব তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রবল ছিল। সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই তিনি জাতীয় স্বাধীনতারক্ষার নিমিত্ত স্বজাতীয়গণকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করিতেছিলেন। উদয়সিংহ যদিও আক্‌বরের নিকট রাজ-উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ সম্মানিত হইতেছিলেন, সম্রাট্ আক্‌বর যদিও তাঁহাকে মারবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন, যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাতেও তিনি সহায়তা করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও তাঁহার ছিল; কিন্তু চন্দ্রসেন তাহাতে ভীত না হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। আক্‌বরের অধীনতাস্বীকার করিয়া তাঁহার সভায় কৃত্রিম সম্মানভোগ অপেক্ষা অনুর্ব্বর মরুক্ষেত্রে স্বাধীনতার অমৃতরস আস্বাদন সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ। আজীবন তিনি সেই প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রসেন একাদিক্রমে সপ্তদশ বর্ষ মারবারের সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ পরে তিনি প্রবল বিপক্ষের দ্বারা প্রতারিত হইয়া যোধপুর হইতে শিবানোর দুর্গে আসিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হন। সেখানেও তিনি নিরাপদে ছিলেন না, রাজা উদয়সিংহ সম্রাট্ আক্‌বরের সৈন্যের সাহায্যে শিবানো আক্রমণপূর্ব্বক ভীষণ সমরানল প্রজ্বালিত করিয়া দেন। সেই যুদ্ধে চন্দ্রসেন মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব দর্শনে যবনেরা এককালে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। সম্রাটের বহুসৈন্য ক্ষয় করিয়া রাজা চন্দ্রসেন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। যবনের দাসত্ব অপেক্ষা সম্মুখসমরে জীবনবিসর্জ্জন করা ক্ষত্রিয়বীরের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গও রাজপুতবীরের মহামহিমার নিদর্শন, ইহা বিবেচনা করিয়াই সেই ভীষণ সমরানলে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন।

চন্দ্রসেনের তিনটি পুত্র;—প্রথম উগ্রসেন। ইনি বিনাই প্রদেশের অধিপতি। তাঁহারও তিনটি পুত্র, কারণ, কানুজি, কাহান। চন্দ্রসেনের দ্বিতীয় পুত্র অসিকর্ণ। ইতিহাসে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ নাই। তৃতীয় পুত্র রায়সিংহ, দেবজাতীয় শিরোহীর রায় সুরতানের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়। দার্ত্তানীনামক স্থানে চতুর্বিংশতি সামন্তের সহিত সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি নিহত হন।

প্রাচীন রাঠোররাজবংশের শশধরস্বরূপ মহারাজ শিবজী মরুক্ষেত্রে যে বংশবৃক্ষবীজ বপন করিয়াছিলেন, পঞ্চশতাব্দীর মধ্যে সেই বীজোৎপন্ন বংশদ্রুম শাখাপ্রশাখা ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া মরুক্ষেত্রের অনুপম শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। তীব্রতেজের সহিত যে রাঠোরবংশ স্বাধীনতা-রসে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া কমনীয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, পঞ্চশতাব্দী অতীত হইলে সেই গৌরবান্বিত বংশপাদপের অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইল। মল্লদেবের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই

মহামহিমজাতির ভাগ্যচক্র এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রাঠোরগণ পঞ্চশতাব্দীকাল একমাত্র শিবজীবংশীয় অধীশ্বরগণকেই আপনাদের নেতা এবং রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিতেন; তাঁহাদিগের আদেশেই সহাস্যবদনে সমরক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিতেন। মল্লদেবের মৃত্যুর পর সেই রাঠোর-বীরগণ স্বজাতীয় নরপতি অপেক্ষা প্রবলবলশালী আর এক রাজবংশের অধীন হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাঁহাদের জাতীয় জীবনের নূতন যুগ আরম্ভ হইল। অধীনতারূপ অন্ধকার রজনী আসিয়া মারবার-গগন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হায় হায়! মহাতেজস্বী রাঠোরজাতি এই সময় যবন-জাতির অধীনতানিগড়ে আবদ্ধ হইলেন। শিবজী বংশীয়েরা মরুক্ষেত্রমধ্যে পঞ্চরঙ্গপতাকা উড্ডীন করিয়া বালুকাময় গিরিশিখর অমরকোট হইতে সম্বরের লবণহ্রদ এবং মরুস্থলের শেষসীমা গারা-নদীর উপকূল হইতে আরাবল্লীশিখর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভীষণ ভীষণ সমরে উপর্য্যুপরি জয়লাভ করিয়া জাতীয় গৌরব-গরিমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চরঙ্গ-পতাকার পরিবর্ত্তে সেই স্থলে মোগলসম্রাটের রাজপতাকা সমুড্ডীন হইল। সংসারে কালের কুটিলা গতিই এইরূপ।

মহাবীর বলিয়া ভারতের ইতিহাসে যাঁহাদের নাম সগৌরবে অঙ্কিত ছিল, সেই রাঠোরেরা এখন মোগলসম্রাটের অধীনে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভাগ্য অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। যিনি যে পরিমাণে আকবরের সুনয়নে পতিত হইতে লাগিলেন, তিনি সেই পরিমাণেই ধন-মান-পদ-লাভে অধিকারী হইলেন। মোগল-সম্রাটের ইচ্ছার উপর এই রাঠোররাজবংশের শুভাশুভ নির্ভর করিতে লাগিল। চন্দ্রসেনের মৃত্যুর পর রাঠোর-গৌরব যেন মেদিনীমণ্ডল হইতেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। এখন যদিও ভারতে যবনশাসনের অবসান হইয়াছে, যবনরাজবংশ ভারতে বিধ্বস্ত হইয়াছে, সেই মারবার-সিংহাসনে যদিও সেই শিবজীর বংশধর আজিও সমাসীন, কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মল্ল-দেবের পুত্র উদয়সিংহ আকবরের নিকট যে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছেন, তিন শত বৎসর পরে সেই উদয়সিংহের উত্তরাধিকারী ঠিক সেই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত।

মল্লদেব বৃদ্ধবয়সে আপন উত্তরাধিকারী উদয়সিংহকে একদল রাঠোর-সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে অবস্থানার্থ প্রেরণ করেন, মারবারের প্রত্যেক ভবিষ্যৎ অধীশ্বরও সেইরূপ নিজ নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রকে সেইরূপ বহুসৈন্যসহ পরন্তন যবনসম্রাটগণের অধীনে পাঠাইতে থাকেন। টড সাহেব লিখিয়াছেন, রাঠোর-রাজকুমারগণের বীর্য্যবিক্রমদর্শনে যবনসম্রাট্‌গণ মহাপ্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সবিশেষ সম্মানিত করিতেন। অপূর্ব্বর মরুক্ষেত্রমধ্যে যদিও ধনসম্পদের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের মহাযুদ্ধের পর যদিও তথাকার অর্দ্ধেক ধনাংশ মারবারের রাজ-ভাণ্ডারে সমানীত হয়, যদিও মোগল-সম্রাট্‌-সভায় সমবেত ভারতীয় এবং বিদেশীয় ৭৬ জন অধীন নরপতির মধ্যে মরুক্ষেত্রের রাঠোর-অধীশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চসম্মান লাভ করেন, তথাপি রাঠোর-নরপতিগণ আপনাদের বংশের কলঙ্কমূলক নিতান্ত শোচনীয় অধীন অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে মনে একান্ত ব্যথিত হইতেন; এমন কি, সম্রাটের সমক্ষেই কেহ কেহ সেই বেদনা বিজ্ঞাপন করিতেন। তেজস্বী স্বাধীনতাপ্রিয় রাঠোরগণের স্বাভাবিক স্বাধীনতাস্পৃহা হৃদয় হইতে এককালে নির্ব্বাপিত হইয়া যায় নাই।

উদয়সিংহ হইতেই স্বাধীন রাঠোরবংশের পরাধীন নামের উদয় হয়। স্ববংশের শিরে কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিয়া উদয়সিংহ সুখী হন নাই, তিনি নিজেও ইচ্ছাপূর্ব্বক যবনসম্রাটের অনুগত হন নাই, পিতৃ-আজ্ঞা-পালনের নিমিত্তই তাঁহার ঐ দশা ঘটিয়াছিল। উদয়সিংহের আচরণে রাঠোর সামন্তমণ্ডলী অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জগতের মধ্যে যে যে রাজ্যে সামন্তশাসনপ্রণালী প্রচলিত, সেই সেই রাজ্যের অধীশ্বর সেই সেই সামন্তমণ্ডলীর গোষ্ঠীপতি—পিতার ন্যায় সম্মানপাত্র। রাজস্থানের ন্যায় ইংলণ্ডেও সামন্ত শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, ইংলণ্ডের রাজারাও সামন্তমণ্ডলীর নিকটে পূজা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারাও সামন্ত-মণ্ডলীর গোষ্ঠীপতি অথবা পিতৃস্থানীয় ছিলেন; কিন্তু টড সাহেব বলেন, ইংলণ্ডের অধীশ্বরেরা কেবল মৌখিক সম্মানলাভ করিতেন, রাজস্থানের অধীশ্বরেরা অধিকন্তু ভক্তিশ্রদ্ধায় সম্মানিত ছিলেন। কেবল রাজস্থান বলিয়া নহে, ভারতের সকল শ্রেণীর সকল প্রজাই সত্যযুগ হইতে রাজাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ভারতের রাজধর্ম্মের উপদেশ এই যে, রাজা প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন, প্রজাগণও রাজাকে পিতার ন্যায় পূজা করিবে। আর্য্যজাতির শিরায় শিরায় রাজভক্তি প্রবাহিত। আর্য্যধর্ম্মের প্রবল শত্রু আরঙ্গজেব যখন আর্য্যগণের নিকট পিতৃতুল্য সম্মান-প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন, তখন আর আর্য্যজাতির রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে রাজভক্তি যদি এত প্রবলা না থাকিত, রাজদ্রোহ যদি মহাপাপ বলিয়া ইঁহাদের দৃঢ়ধারণা না থাকিত, তাহা হইলে এত দিন ভারতের মানচিত্রের বর্ণ অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, সংসারের নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

রাজা উদয়সিংহের শাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, টড সাহেব তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অভিষেকসময়-নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক পক্ষের মত এই যে, মল্লদেবের স্বর্গারোহণের পরেই উদয়সিংহ রাজা হন। অন্যপক্ষ বলেন, চন্দ্রসেন যত দিন জীবিত ছিলেন, উদয়সিংহ তত দিন রাজচ্ছত্রতলে উপবিষ্ট হইতে পারেন নাই। টড সাহেব বলেন, 'উদয়' শব্দটি সমগ্র রাজস্থানের ইতি-বৃত্তের কুলক্ষণের মূল। উদয়সিংহ যবনসম্রাটের নিকটে জাতীয় স্বাধীনতা বিক্রয় করেন, রাঠোর জাতির ললাটে কলঙ্ককালিমা প্রদান করেন, ইহা যেমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, উদয়পুরাধিপতি উদয়সিংহও সেইরূপে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া নিজকুলের অঙ্গাররূপে গণ্য হইয়াছিলেন। রাণা প্রতাপসিংহ নিজ পিতা উদয়সিংহের দ্বারা বিক্রীত জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের নিমিত্ত বহুবর্ষব্যাপী ভীষণ সমরে পরি-লিপ্ত ছিলেন। বীরকেশরী স্বদেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের নামে আজিও রাজপুতজাতির নিদ্রিত ধমনী সবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে।

মারবারপতি উদয়সিংহ কেবল যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াই তুষ্ট ছিলেন না, পবিত্র আর্য্যবংশীয় রাঠোরকুলের যে কলঙ্ক কখন ঘটে নাই, উদয়সিংহ সেই মহোচ্চ পবিত্র কুলে স্বহস্তে সেই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বীয় দাসত্বের চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ নীচাশয় উদয়সিংহ সম্রাট্ আকবরের হস্তে নিজ সহোদরা যোধবাইকে প্রদান করেন। রাঠোরবংশের রাজকুমারীর সহিত যবনবংশের এইটি প্রথম পরিণয়। উদয়পুরের রাণাগণ প্রাণান্তেও যে যবনের হস্তে কন্যা অথবা ভগিনী সম্প্রদান করেন নাই, মারবারের রাও-বংশ যে যবনদিগকে জাতির প্রধান বৈরি বলিয়া চিরদিন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, উদয়সিংহ সেই যবনের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন। আকবরের সহিত যোধবাইয়ের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই উদয়সিংহের সৌভাগ্যোদয়। ভগিনী প্রদান করিয়া উদয়সিংহ আকবর শাহের আরও অধিকতর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। মল্লদেবের নিকট হইতে আকবর শাহ যে সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, বিবাহের পর কেবল অজমীর ব্যতীত তৎসমস্ত রাজ্য তিনি স্বীয় শ্যালক উদয়সিংহের হস্তে অর্পণ করেন। অজমীর প্রাপ্ত না হওয়াতে পাছে উদয়সিংহ ক্ষুব্ধ হন, সেই জন্য সম্রাট তৎপরিবর্ত্তে মালবের কতিপয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়া দেন। উদয়সিংহের অধিকৃত খাস প্রদেশসমূহের যত আয়, মালবের রাজ্যসমূহের আয় তদপেক্ষা

দ্বিগুণ, এই কারণে অজমীর অপ্রাপ্তি হেতু উদয়সিংহের অসন্তোষের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

আকবরের সহিত ভগিনীর বিবাহ দেওয়াতে উদয়সিংহের প্রতি সমস্ত রাঠোরজাতি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। চন্দ্রসেন তখন জীবিত ছিলেন, তিনিও সামন্তগণের সহিত মিলিত হইয়া সহোদরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। স্বজাতি-পরিত্যক্ত উদয়সিংহ মহাবিপদ্ দর্শনে বিজাতীয় ভগ্নীপতির সৈন্যসাহায্যে মারবাররাজ্য-জয়াভিলাষে বহির্গত হন। কয়েক বর্ষ ব্যাপিয়া উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে চন্দ্রসেনের পতন, মারবারসিংহাসনে উদয়সিংহের উত্থান। সেই সঙ্গেই রাঠোর-সামন্তগণের ক্ষমতাহ্রাস এবং যবনদিগের অধীনতাস্বীকার। উদয়সিংহ পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিবিধ উপায়ে চতুর্দ্দশশত গ্রাম ও নগর স্বাধিকারভুক্ত করেন।

উদয়সিংহ আপন ভগ্নীপতি আকবরের নিকট বহুবিধ উপকার পাইয়াছিলেন, সম্রাট আকবরও উদয়সিংহের দ্বারা নানাবিষয়ে উপকৃত হইয়াছিলেন। উদয়সিংহ রাজনীতি ভাল বুঝিতেন, আকবশাহও উদার রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। সাধারণ যবনরাজগণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কলুষিত ছিল না, আর্য্যজাতির প্রতি কখন তিনি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করেন নাই। আর্য্য শাসন-প্রণালীর যে যে অঙ্গ তাঁহার অবলম্বিত নীতির সহিত মিলিত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। আর্য্যসন্তানগণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিরূপে প্রজারঞ্জন করিতে হয়, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজারা কিসে সন্তুষ্ট থাকে, কিরূপে সকল ধর্ম্মের—সকল শ্রেণীর প্রজার হৃদয় রাজার প্রতি অনুরক্ত হয়, সম্রাট আকবর তাহা উত্তমরূপে জানিতেন; এই কারণেই যবনসম্রাটগণের মধ্যে তাঁহার অদ্বিতীয় বিশেষণ হইয়াছিল।

রাজা উদয়সিংহের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে একাদিক্রমে চতুস্ত্রিংশৎটি পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রকন্যামধ্যে অনেকেই মরুস্থলীর নানাস্থানে নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই সকল রাজ্যের মধ্যে গোবিন্দগড় এবং পাষাণগড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার কতিপয় পুত্র মারবারসীমার বাহিরেও নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কৃষ্ণগড় এবং মালবের অন্তঃপাতী রথলাম-রাজ্য প্রধান।

মল্লদেবের মৃত্যুর পর উদয়সিংহ ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ষ জীবিত ছিলেন। চন্দ্রসেনের মৃত্যুর পর যখন তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হইতে গণনা করিয়া তাঁহার রাজত্বকাল ত্রয়োদশ বর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রয়োদশ বর্ষের শেষে উদয়সিংহ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া যোগ্যধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে একটি বিচিত্র ইতিহাস আছে। এই স্থানে সেইটির উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মৃত্যু-সংক্রান্ত বিচিত্র ঘটনা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল। রাজপুত-রাজকুমারগণ বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির সহিত কোন সংস্রব রাখিতে পারেন না; বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহাদের বিবাহও হইত না; হাস্যবিলাস কাহাকে বলে, পরিণয়ের অগ্রে তাহাও তাঁহারা জানিতেন না। উদয়সিংহ যদিও ঐ প্রকার জাতীয় প্রথানুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রথানুসারে যৌবন-জীবনে বিলক্ষণ সুনীতিসম্পন্নও ছিলেন, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া তিনি সেই সুনীতিকে এককালে পদদলিত করিলেন। তাঁহার সপ্তবিংশতি রূপবতী মহিষী ছিল, তথাপি পরস্ত্রীর প্রতি ভয়ঙ্কর আসক্তি। অধিক কথা কি, পিতৃরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকন্যার রূপে একেবারে তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। আকবরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া যে সময় তিন নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় সেই সুলোচনা বিপ্রকুমারীর

প্রতি তাঁহার নেত্র আকৃষ্ট হয়। কন্যাটি অবিবাহিতা এবং পরম সুন্দরী। তাহার প্রেমলাভ করিবার জন্য উদয়সিংহ এককালে অধীর হইয়া পড়েন। প্রণয় অন্ধ, প্রণয় জ্ঞানহীন, প্রণয় হিতাহিতবিবেচনা-শূন্য; উদয়সিংহও সেই অন্ধপ্রণয়ের অভেদ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কুমারীর পিতা পবিত্রচেতা সাধু ব্রাহ্মণ। উদয়সিংহ নিজে ক্ষত্রকুলোদ্ভব, তাহাতে আবার রাজপদে সমাসীন। ন্যায়বিচারকর্ত্তা রাজা, রাজ্যের সমগ্র স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা করা তাঁহার ব্রত। সেই কন্যার রূপলাবণ্য দেখিয়া এ সমস্তই তিনি ভুলিয়া গেলেন। তাহাকে প্রাপ্ত না হইলে পৃথিবী যেন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসার বোধ হইবে, ইহাই তিনি ভাবিলেন।

ইতিহাসে প্রকাশ, সেই রূপবতীর পিতা আর্য্যাপন্থীসম্প্রদায়ভুক্ত। প্রদেশমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ আর্য্যাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণ সেই আর্য্যামাতার উপাসক ছিলেন। বঙ্গদেশের মদ্যমাংসপরিত্যাগী ব্রাহ্মণদিগের সহিত মরুক্ষেত্রের এই ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের তুলনা করা যায় । এই ব্রাহ্মণেরা মাংস আহার করেন, মদ্যপান করেন এবং সংসারের সমস্ত ব হুসুখ-সম্ভোগে রত হইয়া থাকেন, অথচ বীরধর্ম্মাবলম্বী রাজপুতজাতির সহবাসে তাঁহাদের স্বভাবও অতি তেজস্বী। যে ব্রাহ্মণকুমারীকে দেখিয়া প্রেমার্থী উদয়সিংহের উন্মত্ততা জন্মিয়াছিল, সেই রূপবতী ব্রাহ্মণ কুমারী উদয়সিংহের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিল কি না, তাহা বলিবার উপায় নাই; সে সম্বন্ধে কোন বিবরণও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কুমারীর পিতা ক্রমে ক্রমে এই ব্যাপার শ্রবণ করিলেন। কি করিলে সকলদিক্ রক্ষা হয়, জাতিকুল বাঁচে, অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, অনেক ভাবিয়া দেখিলেন, উপায়ান্তর নাই। প্রাণাধিকা কুমারীকে প্রাণে মারিতে পারিলে পবিত্রতা রক্ষা হইতে পারে, এই উপায়টি পরিশেষে তাঁহার অন্তরে সমুদিত হইল। তখন তিনি পিতৃস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া সাক্ষাৎ পিশাচমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। নিতান্ত নৃশংসাচারে সেই কুমারী-কন্যার প্রাণসংহার পূর্ব্বক অন্য-প্রকার জঘন্য উপায়ে উদয়সিংহের প্রতিহিংসাসাধনে সমুদ্যত হইলেন।

আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণ হোম-যজ্ঞে সুদীক্ষিত ছিলেন। প্রথমে তিনি বৃহৎ হোমকুণ্ড খনন করিয়া করিয়া স্বহস্তে প্রাণাধিকা কুমারীর প্রাণসংহার করিলেন। তাঁহার কমনীয় কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ দেহের একখণ্ড মাংস সেই সকল মাংসখণ্ডের সহিত মিলিত করিলেন; তাহার পর মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হোম আরম্ভ করিয়া দিলেন। হোমসমাপ্তির পর সেই মাংসখণ্ডরাশি হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন; হোমাগ্নি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ভীষণ হুতাশনশিখায় এবং অন্ধকারধূমে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল সেই অগ্নিকুণ্ড সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রাজা উদয়সিংহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, "অদ্য হইতে রাজা উদয়সিংহের সমস্ত শান্তি বিলুপ্ত হইল, এই সময় হইতে তিন প্রহর, তিন মাস অথবা তিন বৎসরের মধ্যে আমার প্রতিহিংসা সফল হউক।" উদয়সিংহকে এইরূপে অভিশাপ দিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিজ প্রাণোপমা নন্দিনীর দহ্যমান মাংসরাশির উপর প্রফুল্ল বদনে নিপতিত হইলেন। অগ্নি পুনরায় ভীষণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ক্ষণেকের মধ্যে ব্রাহ্মণের জলন্ত দেহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। রাণা উদয়সিংহ এই হৃদয়স্তম্ভন লোমহর্ষণসংবাদ শ্রবণ-গোচর করিয়া মহাভয়ে ভীত হইলেন। তাঁহার প্রাণ আকুল হইল, আত্মা কম্পিত হইল, কণ্ঠ-তালু পরিশুষ্ক হইল, হৃদয় বিচলিত হইল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তদবধি তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন সেই ব্রাহ্মণের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই যেন

সংহারমূর্ত্তি বিকাশ করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত, প্রতিমুহূর্ত্তেই কেবল এই কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিল; অবিশ্রান্ত অনুতাপে নিতান্ত কাতর হইয়া তিনি ভয়ে—উৎকণ্ঠায় দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ, ব্রাহ্মণের অভিশাপ অমোঘ, ব্রাহ্মণের মনঃপীড়া সংসারের সর্ব্ববিপদের আমন্ত্রক। রাজা উদয়সিংহ সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে জীর্ণ-শীর্ণাঙ্গ হইয়া ব্রাহ্মণের মুমূর্ষুকালীন উচ্চারিত নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অতি শোচনীয়রূপে বিগতাসু হইলেন।

কর্ণেল টড সাহেব লিখিয়াছেন, যে কোন রাজা অথবা রাজকুমার নিতান্ত ইন্দ্রিয়দাস হইয়া এককালে কলুষিতচরিত্র হইয়া পড়িতেন, যাঁহাদের চরিত্রশোধনের অন্য আশা থাকিত না, ঐ আর্য্যাদেবীর উপাসক আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার চরিত্রশোধন করিয়া দিত। এই বিষয়ের একটি সবিশেষ প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে। উদয়সিংহের দুশ্চরিত্রতার নিমিত্ত ঐ আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণ জীবন্ত দগ্ধ হইয়া লোকযাত্রা সংবরণ করেন। মরণকালে তিনি বলিয়া যান, "অতঃপর চিরদিন আমি অন্তরীক্ষে বাস করিব।" উদয়সিংহের প্রপৌত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা যশোবন্ত-সিংহ তাঁহার এক মন্ত্রীর রূপবতী কুমারীর গুপ্তপ্রেমে আসক্ত হইয়াছিলেন। যশোবন্ত একদা সেই প্রণয়িনীকে এক প্রেমকুঞ্জে লইয়া যান। উপরি উক্ত আর্য্যপন্থী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা সেই নায়ক-নায়িকাযুগলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্করকাণ্ড উপস্থিত করে। যশোবন্তসিংহ উপপ্রণয়িনীকে প্রেতাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যান। প্রেতের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করা বাতুলের কার্য্য যশোবন্ত বাস্তবিক উন্মাদগ্রস্থ হইয়াই জ্ঞানশূন্য হন, কিছুতেই চৈতন্যোদয় হয় না। বহুকষ্টে চৈতন্যোদয় হইলেও দিবারজনী যেন সেই প্রেতাত্মাকেই সম্মুখে দেখিতে থাকেন; অমাত্যমণ্ডলী অনুমান করেন, রাজা ভূতগ্রস্থ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা তাঁহাকে এককালে অধিকার করিয়া লইয়াছে, সময়ে সময়ে রাজকলেবরে প্রেতাত্মার আবির্ভাবও হইত। আবির্ভাবের সময় প্রেতাত্মা বলিত, "যশোবন্তসিংহের সমপদস্থ কোন ব্যক্তি যদি আপন ইচ্ছামতে জীবনদান করে,তবে আমি যশোবন্তকে পরিত্যাগ করিতে পারি। নতুবা কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

প্রেতাত্মার এইরূপ উক্তিতে সম্মুখস্থ সমস্ত ব্যক্তিই মহাবিস্ময়ান্বিত হইতেন। একদিন প্রেত-গ্রস্ত রাজার রসনা হইতে প্রেতাত্মার ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া মন্ত্রি-মণ্ডলী মহাচিন্তাকুল হইলেন। কে ইচ্ছা করিয়া প্রাণ দিবে? যেমন তেমন লোক হইলেও চলিবে না, রাজার সমপদস্থ মান্যলোকের প্রাণ প্রয়োজন। নিদারুণ চিন্তায় সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। রাজপুতজীবনের প্রতি গ্রন্থিতেই রাজভক্তি বিজড়িত। মরুক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সামন্ত এবং রাজা যশোবন্তের ন্যায় মহামান্য নাহর খাঁ দৃঢ়সংকল্প হইলেন; যশোবন্তের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজপ্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। নাহর শব্দের একটি অর্থ ব্যাঘ্র। নাহর খাঁ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলশালী এবং অমিতসাহসী পুরুষ ছিলেন; সেই নিমিত্ত তিনি নাহর খাঁ নামে অভিহিত।

নাহর খাঁ নিজ প্রাণদানে রাজার প্রাণরক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এই বার্ত্তা শ্রবণ-মাত্র পবিত্রচরিত্র ব্রাহ্মণগণ অচিরেই সেই স্থলে সমবেত হইলেন। কি উপায়ে নাহরের প্রাণরক্ষা হয়, রাজাও প্রেতবিমুক্ত হন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে সেই প্রেতাত্মাকে এক জলপূর্ণপাত্রে সমানয়ন করিলেন; তাহার পর বারত্রয় সেই পাত্র রাজমস্তকের চতুষ্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই পাত্রস্থ পূতবারি নাহর খাঁকে

পান করিতে অনুরোধ করা হইল। রাজভক্ত নাহর খাঁ বিনা দ্বিরুক্তিতে সেই জল পান করিলেন। প্রেতাবির্ভাবের সময় রাজা অচেতন থাকিতেন। নাহর খাঁ পুতবারি পান করিবামাত্র তাঁহার চৈতন্যসঞ্চার হইল, উন্মাদ অবস্থাও বিদূরিত হইয়া গেল।

প্রেতাত্মা তখন যশোবন্তকে ছাড়িয়া নাহরের আশ্রয়গ্রহণ করিল। নাহরের আসন্নকাল। এই বিচিত্র ঘটনা রাজস্থানের প্রত্যেক নরপতি নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে নাহরকে অতিবিশ্বাসী রাজভক্ত বলিয়া মহাগৌরবে সেই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নাহরের তুল্য রাজভক্ত অতি বিরল।

নাহর খাঁ মুমূর্ষুকালে স্বীয় পুত্রকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক এইরূপ শপথ করাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশের কেহ যেন ভবিষ্যতে মারবাররাজ্যের প্রধান অমাত্যপদ গ্রহণ না করেন; সে পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এইরূপে জীবনদান করিতে হয়। নাহর খাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা ধারাবাহিকরূপে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে মারবারের প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিলেন, অন্য কেহ সে পদে বরিত হইতেন না; কিন্তু নাহর খাঁর মৃত্যুর পর হইতে পদটি অন্যবংশে গিয়াছে। আহরের চম্পাবৎ সামন্তবংশের উত্তরপুরুষেরা এখন রাজসচিব হইতেছেন। নাহরের উত্তরপুরুষেরা রাজসিংহাসনের দক্ষিণ আসন প্রাপ্ত না হইয়া তদবধি বামদিকে আসন প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজপুতজাতির রাজভক্তি কতদূর প্রবল, নাহর খাঁর এই জীবনদান তাহার এক চূড়ান্ত প্রমাণ।

রাজা উদয়সিংহের সপ্তদশ পুত্র। প্রথম সুরসিংহ, পিতার মৃত্যুর পর ইনি মারবারসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় পুত্র অক্ষিরাজ, ইঁহার কোন বিশেষ কার্য্য মারবার-ইতিবৃত্তে বর্ণিত নাই। তৃতীয় ভগবান্‌দাস, ইঁহার তিন পুত্র,—বল্লবাস, গোপালদাস, গোবিন্দদাস। এই গোবিন্দদাসের দ্বারা গোবিন্দগড় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

চতুর্থ নরহরদাস, পঞ্চম শক্তসিংহ, ষষ্ঠ ভুপসিংহ। ইঁহাদের বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাঁহাদের কোন বিশেষ খ্যাতির উল্লেখ নাই। সপ্তম পুত্র দলপৎসিংহ। ইঁহার চারিপুত্র;—জ্যেষ্ঠ মহেশদাস। মহেশের পুত্র রত্নলাল, ইনি রৎলালরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ, তৃতীয় প্রতাপ সিংহ, চতুর্থ কানাইরাম। উদয়সিংহের অষ্টম পুত্র জগৎসিংহ। ইঁহারও চারি পুত্র;—হরসিংহ, অমরসিংহ, সমরসিংহ, প্রেমরাজ। এই প্রেমরাজের উত্তরাধিকারিগণ কুম্নাতী এবং খাইরবা প্রদেশে রাজ্যভোগ করিতেছেন। নবম পুত্র কৃষ্ণসিংহ। ইনি ১৬৬৯ সংবতে নূতন কৃষ্ণগড় রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার তিন পুত্র;—সাহসমল্ল, জগমল্ল, ভারতমল্ল। ভারতমল্লের পুত্র হরিসিংহ, হরিসিংহের পুত্র রূপসিংহ। রূপনগর রাজ্য রূপসিংহের প্রতিষ্ঠিত। দশম পুত্র যশোবন্ত, ইঁহার পুত্র মানসিংহ; মানপুরী নামক রাজ্য মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত, ইঁহার বংশাবলী মানপুরা-যোধ নামে বিখ্যাত। একাদশ পুত্র কেশব, ইনি পাষাণগড় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত ছয় পুত্রের কোন বিশেষ বিবরণ ইতিহাসে লিখিত নাই, এই সপ্তদশ পুত্র ব্যতীত রাজা উদয়সিংহের সপ্তদশটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শূরসিংহের অভিষেক, ধুন্দব-যুদ্ধ, অমরের মৃত্যু, ঝালোরদুর্গলঙ্ঘন, ক্ষুরমের সহিত গজসিংহের যুদ্ধ, শূরসিংহের মৃত্যু, গোবিন্দদাসের গুপ্তহত্যা, পারাবেজ-নিধন, বারাণসীযুদ্ধ, গজসিংহের মৃত্যু, যশোবন্তসিংহের অভিষেক, অমরের মৃত্যু।

১৬৫১ সংবতে রাজা উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ শূরসিংহ পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। শূরসিংহ সুনীতিজ্ঞ বীরপুরুষ ছিলেন। রাজপদে অভিষিক্ত হইবার অগ্রে ১৬৪৮ সংবতে তিনি দিল্লীর সম্রাটের অধীনে লাহোর প্রদেশের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। সেই কার্য্যে তিনি সম্রাটের সবিশেষ তুষ্টিসাধন করেন। রাজা উদয়সিংহের মৃত্যুকালে শূরসিংহ লাহোরেই ছিলেন, পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মারবারে প্রত্যাগত হন। শূরসিংহ যৌবনকালে এতদূর নীতিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এত অধিক সমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন যে, সম্রাট্ তাঁহাকে উদয়সিংহের জীবদ্দশাতেই "সিবাই-রাজা" উপাধি দিয়াছিলেন।

শিরোহী-প্রদেশের দেবরাজাতীয় অধিনায়ক সুরতান রাও নিজ অধিকৃত প্রদেশ অজেয় এবং দুর্গ অভেদ্য, এইরূপ গর্ব্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্য সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ্। সঙ্কট-সঙ্কুল দুরারোহ পর্ব্বতোপরি তাঁহার দৃঢ় দুর্গ সংস্থাপিত; কোন বিপক্ষের দ্বারা তাহার অবরোধ অথবা অধিকার এককালেই অসম্ভব। এই অভিমানে তিনি দিল্লীসম্রাটের আনুগত্যস্বীকারে সম্মত হন নাই। সম্রাট্ আকবর সুরতানের এই গর্ব্বিত ব্যবহারে মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। শিরোহীরাজ্য অধিকার করিবার নিমিত্ত অচিরে তিনি বীরবর শূরসিংহকে সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করেন। সুরতানের সহিত শূরসিংহের পূর্ব্বাবধি কোন কারণে বিষম বৈরতা ছিল। সম্রাটের আদেশে প্রতিহিংসার বিলক্ষণ সুবিধা হইল. শূরসিংহ ইহা ভাবিয়াই মহাপ্রতাপে শিরোহীযুদ্ধে অগ্রসর হন। সে যুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণরূপেই জয়লাভ হয়। মোগলসৈন্যগণ শিরোহীনগর লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল, সম্রাটের নামে সেনাপতি শূরসিংহও শিরোহীরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শিরোহীপতি রাও সুরতান এতদূর শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছিলেন যে, রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি সহধর্ম্মিণী সহ বনবাসী হইতে বাধ্য হন। মহিষীকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া বনমধ্যে একাকী তাঁহার মস্তকসমীপে বসিয়া তিনি যামিনী-যাপন করিতেন। দিবাভাগে সূর্য্যদেব তাঁহার পত্নীর অঙ্গে প্রখর কিরণ-বর্ষণ করেন বলিয়া একদা তিনি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সূর্য্যদেবকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এইরূপে হতদর্প হইয়া সেই মহাতেজা সুরতান অবশেষে আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজা বশীভূত হইলেন দেখিয়া অচিরে সম্রাট্ তাঁহাকে পুনরায় শিরোহী-শাসনের সনন্দপত্র প্রদান করিলেন। নিয়ম এই হইল যে, স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও তিনি রাজা শূরসিংহের অধীনে সজাতীয় সৈন্যসহ সামন্তপদে নিযুক্ত থাকিবেন।

এই সময় গুজরাটের রাজা মজঃফর শাহের সহিত আকবর শাহের যুদ্ধসংঘটন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। গুজরাটে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য সেনাপতি শূরসেন আদিষ্ট হইলেন। শিরোহীপতি সুরতান রাও নবসন্ধি অনুসারে শূরসিংহের সহিত গুজরাট্যুদ্ধে গমন করিতে স্বীকার করিলেন।

রাজা শূরসিংহ গুজরাট্ বিজয়ে বরিত হইয়া সম্রাট্ আকবরের নিকট গুজরাটের রাজপ্রতিনিধি উপাধি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধযাত্রার সময় কুলাঙ্গনাগণ প্রথামত বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

গুজরাটের অদূরবর্ত্তী দণ্ডক নামক স্থানে সমরক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই স্থানে মজঃফর শাহের সৈন্যদল ব্যূহাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানেই শূরসিংহের সহিত মজঃফর শাহের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে। গুজরাটের সেনাদলও মহাভয়ঙ্কর; রাজা শূরসিংহ সে যুদ্ধে সহজে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। সেই রণক্ষেত্রে বহুসংখ্যক রাঠোরসেনার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। বহুসৈন্য সমরে নিহত হইবার পর মহাবল শূরসিংহ বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন, তদীয় প্রবল প্রতাপে মজঃফর শাহ এককালে পরাভূত হইয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন; রাজ্যটিও দিল্লীশ্বরের অধিকারভুক্ত হইল। শূরসিংহের আদেশে রাঠোর ও মোগল সৈন্যগণ অবিলম্বে গুজরাটের সপ্তদশসহস্র গ্রাম এবং নগর লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত ধনরত্ন সংগ্রহ করিল। রাজা শূরসিংহ তন্মধ্য হইতে এক কোটি মুদ্রা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যোধপুরে প্রেরণ করিলেন, অবশিষ্ট সমস্ত লুণ্ঠনদ্রব্য সম্রাট্ সদনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার নিজের ঐ এক কোটি মুদ্রা হইতে যোধপুরের দুর্গনির্ম্মাণ এবং রাজধানীর সীমা বিস্তার করা হইয়াছিল।

দণ্ডকের যুদ্ধক্ষেত্রে শূরসিংহের বিজয়লাভে সম্রাট আকবর শাহ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া রাজ্যমধ্যে তাঁহার সম্মানবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। খেলোয়াতস্বরূপ মহামূল্য পরিচ্ছদ, স্বর্ণমণ্ডিত কোষসংলগ্ন অসি এবং কয়েকখানি সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রদেশ তিনি উপহার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা শূরসিংহের গুজরাটবিজয় উপলক্ষ করিয়া মারবারের ছয় জন প্রথম শ্রেণীর কবি কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর গীতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রাজা শূরসিংহের নামে নগরমধ্যে তাহা সগৌরবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই গীতিমালা সর্ব্বলোকের চিত্তহারিণী হওয়াতে রাজা শূরসিংহ পরম পরিতুষ্টচিত্তে ঐ ছয়জন কবিকে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। রাজস্থানের সকল সময়ের প্রধান প্রধান কবিগণ গুণবান্ অধিপতিগণের নিকট হইতে এই প্রকার পুরস্কার এবং নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইতেন, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। রাজস্থানে যদিও এখন আর চাঁদকবির ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবি জন্মগ্রহণ করেন না, তথাপি মিবার ও মারবার প্রভৃতি রাজ্যে এখনও যে সকল চারণ ও সিদ্ধ কবি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারাও রাজস্থানের গৌরবস্বরূপ। পূর্ব্বতন কবিবৃন্দের ন্যায় তাঁহারা এখন অজস্র অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হন না বটে, কিন্তু রাজদ্বারে সবিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

গুজরাটবিজয়ের পর দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ। সম্রাটের আদেশে রাজা শূরসিংহ ত্রয়োদশ সহস্র অশ্বারোহী, দশটি বৃহৎ কামান এবং বিংশতিটি হস্তী লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। প্রথমে নর্ম্মদাতীরে রেবারাজ্য আক্রমণ। রেবাপতি চোহানজাতীয় অমরবালিকা * পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সহ শূরসিংহের সম্মুখবর্ত্তী হন। শূরসিংহের সৈন্য যেমন মহাবল, তেমনি গণনায় অধিক, তুলনায় রেবাপতির সৈন্য মুষ্টিমেয়; সুতরাং অমরবালিকার পঞ্চসহস্র সৈন্য অচিরেই রণশায়ী হইল। বীরবর শূরসিংহ সমস্ত রেবারাজ্য ধ্বংস করিয়া দিলেন। সম্রাট্ আকবর শাহ এই বিজয়-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শূরসিংহকে পুনর্ব্বার ধাররাজ্যের অধিপতিত্ব পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিলেন। সেই সময় আরও আদেশ হইল, এক সম্প্রদায় নহবৎ বাদ্যকর রাজা শূরসিংহের নিকট চিরদিন অবস্থান করিবে।

মোগলকুলরবি আকবর শাহ স্বর্গারোহণ করিলেন। কুমার জাঁহাগীর দিল্লীর সিংহাসনে

* চোহানজাতির এক শাখার উপাধি অমরবালিকা।

অভিষিক্ত হইলেন। জাঁহাগীরের অভিষেকসময়ে রাজা শূরসিংহ স্বপুত্র গজসিংহের সহিত দিল্লীর রাজদরবারে উপনীত হন। গজসিংহ যৌবনেই পিতার ন্যায় বীরপরাক্রমে অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাট্ জাঁহাগীর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এই গজসিংহ ঝালোররাজ্য জয় করেন। তাহাতে তাঁহার বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পায়। যুবাবীরের পরাক্রমদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া জাঁহাগীর তাঁহাকে সম্ভ্রমসূচক খেলোয়াত প্রদান করেন এবং স্বহস্তে তাঁহার কটিদেশে পরমসুন্দর অসি বন্ধন করিয়া দেন।

গজসিংহের ঝালোরাধিকারসম্বন্ধে রাঠোর-ইতিহাসে লিখিত আছে, বিহারী পাঠানের বিরুদ্ধে গজসিংহ যুদ্ধযাত্রা করিবার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। অবিলম্বে রণভেরী নিনাদিত হইল, অরিবৃন্দ সেই ভেরীধ্বনি শ্রবণে স্তম্ভিত হইতে লাগিল। বিক্রমশালী আলাউদ্দীন উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, তরুণবয়স্ক গজসিংহ তিনমাসের মধ্যে সেই কার্য্য সমাধা করিলেন। রজ্জুসংযোগে লগ্ন অসি-হস্তে তিনি ঝালেন্দ্র-দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। নিজ অসিবলে সপ্তসহস্র পাঠানের মস্তকচ্ছেদন করিলেন, তাহার পর দুর্গাধিকার করিয়া সমস্ত লুণ্ঠিত ধনরত্ন দিল্লীশ্বরকে উপহার দিলেন। এ গৌরব সামান্য গৌরব নহে, বহুতর যশস্বী রাঠোর-বীর সেই যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু গজসিংহের এই মহাগৌরব ক্ষত্রবীরগণের সম্মুখ-যুদ্ধে জীবনাবসানের ক্ষোভ বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

গুজরাট-বিজয়ের পর রাজা শূরসিংহ কিছু দিন যোধপুরে অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন, কুমার গজসিংহ দিল্লীতেই রহিলেন। এই সময় রাজস্থানে আর এক মহারণাভিনয়ের সূত্রপাত হইল। সম্রাট্ জাঁহাগীর সমাদরে বহুসৈন্য সঙ্গে দিয়া গজসিংহকে সেই সময় মিবারপতি রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। জাঁহাগীর শাহ যে সময় দিল্লীর বাদশাহ, সে সময় মিবাররাজ্যের স্বাধীনতা এবং গৌরবরবি এককালে অস্তাচলচূড়াবলম্বী। রাঠোর-ইতিবৃত্তে প্রকাশ আছে, করুণসিংহ যবনসম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলে গজসিংহ তারাগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জাঁহাগীর সেই সময় শূরসিংহ ও গজসিংহের পরমমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন।

গজসিংহ মিবার আক্রমণে যাত্রা করিলেন। জাঁহাগীরের পুত্র শাহজাদা খুরম সসৈন্যে নেতা-স্বরূপে তাঁহার অগ্রগামী রহিলেন। গজসিংহ সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। জাঁহাগীরকে ইতিহাসলেখকেরা অনেক প্রকার গৌরব দিয়াছেন, কিন্তু টড সাহেব তাঁহার সরলতা-সম্বন্ধে একটি গুহ্যকথা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। রাজপুতবীরগণের সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত ভাব যেরূপ ছিল, মুখে তাহা তিনি অনেক বেশী করিয়া জানাইতেন। তাঁহার অধিকারকালে ভারতে যে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়াছে, নিজের একখানি গোপনীয় স্মারক-পুস্তিকায় জাঁহাগীর তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মিবারের রাণা অমরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গজসিংহকে তিনি পাঠাইয়াছিলেন, সেই স্মারকলিপিতে কিন্তু গজসিংহের নাম নাই। ক্ষত্রিয়-গৌরবের মধ্যে কোটা এবং দাঁতিয়ার রাজার নাম আছে। ঐ দুই রাজার সহায়তায় শাহজাদা খুরম মিবার আক্রমণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, জাঁহাগীরের স্মারকলিপি ইহাই বলে।

জাঁহাগীরের স্মারকলিপি যাহাই বলুক, রাজপুত ইতিহাসলেখকেরা সত্যের অপলাপ করিতে জানিতেন না। একজন বীরের যথালব্ধ গৌরব গোপন করিয়া রাখিবেন, বর্ণরঞ্জনে অপর একজনকে সেই গৌরবের অধিকারী করিয়া দিবেন, রাজপুত-লেখকেরা এতদূর নীচাশয় ছিলেন না। মিবারযুদ্ধে গজসিংহের বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা রাজপুত-ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

মহানুভব টড সাহেব এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ভারতের ইতিহাসলেখকেরা কেবল স্বজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, অন্য জাতির মহাবীরত্বের প্রমাণ থাকিলেও তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই, রাজপুত-ইতিহাসপাঠেই তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। টড সাহেবের এই উক্তিটি প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হয় না। রাজপুতজাতি আপনাদিগের বীর্য্যবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ভারতে যবনাধিকারের অগ্রে রাজপুতের তুল্য বীর কোন জাতিতেই বিদ্যমান ছিল না, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। রাজস্থানের ইতিহাসে এবং রাজকবিগণের কাব্যগীতিকায় রাজপুত্র-গণের বীরত্বগৌরব টড সাহেব যেরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু অত্যুক্তি থাকিতে পারে। স্বজাতির গৌরববর্ণনায় তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন, সেই কারণেই পাশ্চাত্য ইতিহাসের প্রণালী তাঁহারা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। রাজপুত্রেরা ক্ষুদ্রবীর ছিলেন, টড সাহেব এমন কথাও কোন স্থলে স্পষ্ট বলেন নাই, ইহাই ভারতের সৌভাগ্য এবং ইহাই ভারতের মহাগৌরব।

এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা সম্রাট্ জাঁহাগীরের পক্ষসমর্থন করিতে অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, অনুগত সামন্ত বলিয়াই সম্রাটের স্মারকলিপিতে গজসিংহের নাম ছিল না। কোটার রাজা এবং দাঁতিয়ার রাজা যবন-সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, অথচ তাঁহাদিগকেই মিবার-যুদ্ধে কুমার ক্ষুরমের প্রধান সহায় বলিয়া উল্লেখ করিতে জাঁহাগীরের ঔদার্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে। স্বীয় সামন্তের প্রশংসা করা অপেক্ষা স্বাধীনবীরের প্রশংসা করাই জাঁহাগীরের নীতিজ্ঞতার সূত্র ছিল। আরও কিছু গুপ্ত উদ্দেশ্য থাকাও সম্ভব। দিল্লীর রাজসিংহাসনের অধীনতাস্বীকারে যাঁহারা অসম্মত, অকারণেই হউক অথবা সকারণেই হউক, তাঁহাদের মানবৃদ্ধি করিয়া দিলে ভবিষ্যতে তাঁহারাও আনুগত্যস্বীকারে সম্মত হইতে পারেন, জাঁহাগীর ইহাই স্বভাবসঙ্গত ভাবিতেন; অতএব গজসিংহের নাম স্মারকলিপিতে অপ্রকাশ রাখা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ হয় নাই। দোষাবহ না হউক, কিন্তু প্রকৃত বীরের বীরত্বের অপলাপ ইতিহাসের পক্ষে দোষাবহ, ইতিহাস তাহাতে অসম্পূর্ণ থাকে।

এই কথা প্রমাণে আমরা আরও বলিতে পারি, মিবারসমরে গজসিংহের বীরত্বের যদি বিশেষ পরিচয় না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধের পর কি হেতুতে সম্রাট্ সেই সময় তাঁহার পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন? এতদ্দ্বারা স্মারকলিপিতে এবং ইতিহাসে বাক্যবিরোধ ও কার্য্যবিরোধ লক্ষিত হইতেছে। স্মারকলিপিতে ও ইতিহাসে ঐক্য হইতেছে না।

জাঁহাগীরের আদেশে ১৬৭৬ সংবতে রাজা শূরসিংহ দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সেই বৎসরেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দাক্ষিণাত্যবাসিগণের সহিত মোগল-সম্রাটের যুদ্ধ হয়, উহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, সেই কারণেই হউক অথবা সে যুদ্ধে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন নাই, সেই কারণেই হউক, সে যুদ্ধে রাজা শূরসিংহের বিশেষ প্রশংসার কথা বর্ণিত নাই। রাজা শূরসিংহের মৃত্যুকালে তদীয় বিশ্বস্ত অনুচরগণকে এই আজ্ঞা দিয়া যান যে, মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে তাঁহার স্মরণার্থ যেন একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাঁহার বংশের ভবিষ্য উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কোন রাজকুমার যদি নর্ম্মদাপারে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার পক্ষে তাহা অভিসম্পাতস্বরূপ হইবে, ইহাও যেন সেই স্তম্ভগাত্রে খোদিত থাকে।

শৈশবাবধি রাজা শূরসিংহ জন্মভূমিবাসের সুখাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন; পিতার সহিত নিয়তই তাঁহাকে দিল্লী দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত। যৌবনসঞ্চারের পর হইতে সম্রাট্প্রেরিত সমস্ত যুদ্ধে শূরসিংহ পিতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে গমন করিতেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পিতার

মৃত্যুকালে শূরসিংহ দিল্লীর অধীনে লাহোরের প্রধান সেনাপতি; তৎকালে তিনি লাহোরেই ছিলেন, সেই কারণেই চরমকালে পিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কান্যকুব্জে রাঠোরজাতির পূর্ণগৌরব জয়চাঁদ যবনকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া যে সময় মোগলসম্রাটের হস্তে স্বাধীনতার সহিত সমস্ত রাজ্য ধন সমর্পণ করেন, সেই সময় মানসিক যন্ত্রণায় ভাগীরথীসলিলে আপন জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ছলেন; স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল চন্দ্রস্বরূপ সেই জয়চাঁদ স্বাধীনতাবিয়োগে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর সেই জয়চাঁদবংশের দ্বিতীয়-চন্দ্রস্বরূপ শিবজী মরুক্ষেত্রে গমন করিয়া নবীন-রাঠোররাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিবজীর অভ্যুদয়কাল হইতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মহাবীর রাঠোরজাতি মহান্ বলে বলীয়ান্ হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র আপনাদিগের গৌরবগরিমা বিস্তার করেন।

রাজা শূরসিংহের বীরত্বের প্রশংসা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি স্বনামে কতকগুলি মন্দির, সরোবর ও চৈত্য প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎসমস্ত বিশেষ প্রশংসার যোগ্য নহে; তন্মধ্যে শূরসাগর নামক সরোবরটিই অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

শূরসিংহের ছয় পুত্র;—গজসিংহ, সুবলসিংহ, বিরামদেব, বিজয়সিংহ, প্রতাপসিংহ ও যশোবন্ত। এতদ্ভিন্ন সাতটি কন্যাও ছিল, কিন্তু তাঁহাদের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শূরসিংহের পরলোকগমনের পর জ্যেষ্ঠপুত্র গজসিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। লাহোরে গজসিংহের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি বুরহানপুরে রাজশিবিরে ছিলেন। সম্রাটের প্রতিনিধি দেবার খাঁ তথায় উপস্থিত হইয়া গজসিংহের ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। অভিষেক-দিবসে পিতৃরাজ্যের সহিত ধুন্দরের অন্তঃপাতী ঝুলাই ও অজমীরের অন্তর্গত মুসৌদা এই দুটি নগরও তাঁহার হস্তগত হইল। সম্রাট্ আরও একটি উচ্চ সম্মানে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। দক্ষিণাপথের প্রতিনিধিত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইল। সম্রাটের নিয়মানুসারে সর্দ্দারগণের অশ্বগাত্রে মোগলের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্ক অঙ্কিত থাকিত, ইহাতে সামন্তগণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অবমানিত জ্ঞান করিতেন। গজসিংহের অভিষেকদিন হইতে সম্রাট্ সে প্রথাও রহিত করিয়া দিলেন।

শৈশবাবস্থা হইতে গজসিংহ পিতার সহিত দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন; সুতরাং তিনি পিতার সমস্ত গুণরাশি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি অল্পদিনমধ্যে কারকিগড়, গলকুণ্ড, কেলেন, পারনাল, গুজনগড়, আশের ও সাতরা এই কয়টি স্থান জয় করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই সমস্ত স্থান অধিকারকালে যে সকল যুদ্ধ ঘটে, গজসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহ সেই সমস্ত যুদ্ধেই পিতার সহিত থাকিয়া অদ্ভুত রণকৌশলের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত রাজ্য জয় করিবার পর গজসিংহ সম্রাটের উচ্চসম্মানসূচক দলথম্ন (দলস্তম্ভ) উপাধি প্রাপ্ত হন।

সম্রাট্ জাঁহাগীর দুইটি হিন্দুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি রাঠোরবংশে এবং অপরটি কুশাবহকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রাঠোরকুমারীর গর্ভে খুরমের জন্ম হয়। খুরম কনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু পারবেজ অপেক্ষা গুণশালী হওয়াতে সকলেরই অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। শিশোদীয়বীর ভীমসিংহ ও সেনাপতি মহাব্বৎখাঁর সহায়তায় তিনি পারবেজকে সংহার করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

খুরম যখন সৈন্যসামন্ত লইয়া দক্ষিণাঞ্চলে গমন করেন, মারবারপতি গজসিংহ সেই সময়

তাঁহার অব্যবহিত নিম্নপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার অবস্থিতিস্থানও তখন খুরমের আবাসভবন হইতে অদূরবর্ত্তী ছিল। খুরম গজসিংহের নিকট মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পারাবেজের প্রতি গজসিংহের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সুতরাং তিনি খুরমের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। মারবারের বিদেশীয় সামন্ত ভট্টিবংশীয় গোবিন্দদাস গজসিংহের পরমবন্ধু ছিলেন। গজসিংহের মন ফিরাইবার জন্য খুরম গোবিন্দদাসকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু গোবিন্দদাসও তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। সামান্য উপসামন্ত হইয়া গোবিন্দদাস তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন, খুরম ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কিষণগড়পতি কিষণসিংহকে নিয়োগ করিলেন। গোবিন্দদাসকে সংহার করিয়া কিষণসিংহ রাজপ্রসাদে আপন নগরে স্বাধীনরাজত্ব প্রাপ্ত হন। খুরমের জঘন্য ব্যবহারে স্বভাব উদয় হওয়াতে গজসিংহ সম্রাটের কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন অতীত হইল। খুরমের জিঘাংসানলে ভাগ্যহীন পারাবেজ ভস্মীভূত হইলেন। এখন একমাত্র কণ্টক জন্মদাতা জাঁহাগীরকে নিপাত করিতে পারিলেই খুরমের মনোরথ পূর্ণ হয়। এই দুষ্ক্রিয়া-সাধনের জন্য খুরম যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরেই সম্রাটের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল। বিষম সঙ্কটে পড়িয়া সম্রাট্ মারবার, অম্বর, কোটা ও বুন্দির নৃপতিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

সম্রাটের সাহায্যার্থ রাজপুতরাজগণ সসৈন্যে সমবেত হইয়া খুরমের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী স্থানে খুরমের সেনাদল অবস্থিত ছিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল। অম্বররাজ মির্জ্জারাজের হস্তে সেনাদলের সম্মুখরক্ষণভার অর্পিত হইল। সম্রাটের এই আচরণে রাঠোররাজ গজসিংহ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ধ্বজা নমিত করিলেন এবং সৈন্যদল পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গজসিংহ উপস্থিত থাকিতে সম্রাট মির্জ্জারাজের হস্তে সৈন্যদলের সম্মুখরক্ষণের ভার কেন অর্পণ করিলেন, তাহার কোন কারণ উপলব্ধি হয় না। অনেকে বলেন, অম্বররাজের সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, এই জন্যই সম্রাট সেই রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, খুরম কুশাবহ-কুমারীর গর্ভজাত, অম্বররাজও কুশাবহ তাঁহাকে সম্মানিত না করিলে যদি তিনি খুরমের পক্ষ অবলম্বন করেন, সম্রাটের মনে এই আশঙ্কা উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, গজসিংহ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াও থাকিতে পারিলেন না, ভীমের বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি মধ্যবিক্রমে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ভীমসিংহ সেই যুদ্ধে গতাসু হইলেন এবং খুরম পরাজিত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

এই যুদ্ধে অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়া গজসিংহ সম্রাটের নিকট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরব-সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি গুর্জ্জরপ্রদেশে গমন করেন, সেই স্থানেই একটি যুদ্ধে ১৬৯৪ সংবতে তাঁহার মৃত্যু হয়। গজসিংহের তিন পুত্র;—অমরসিংহ, যশোবন্তসিংহ ও অচলসিংহ। অচলসিংহ শৈশবেই লীলাসংবরণ করেন। গজসিংহের মৃত্যুর পর অমরসিংহ ও যশোবন্তসিংহ এই দুই পুত্র জীবিত ছিলেন।

অমরসিংহ স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতি, উদ্ধতস্বভাব, নির্ভীক ও বিবাদে অগ্রগামী। বিশেষতঃ তাঁহাতে রাজোচিত কোন গুণই ছিল না, প্রজাপুঞ্জের মধ্যে অনেকের নিকটেই তিনি বিরাগভাজন ছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া গজসিংহ ১৬৯০ সংবতে বৈশাখমাসে

প্রকাশ্যসভায় যশোবন্তের ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। গম্ভীরস্বরে সভায় সকলের সমক্ষেই তিনি বলিয়াছিলেন, "অমরসিংহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করুন, উঁহাকে অগ্রজস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইল। ভবিষ্যতে যশোবন্তই মারবারের অধিপতি হইলেন।"

মহাতেজস্বী অমর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাসনোচিত কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া নির্ব্বাসনযাত্রা করিলেন। তৎপরে কতিপয় সামন্ত-রাজও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া অমর কতিপয় সামন্ত সর্দ্দার সমভিব্যাহারে সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদারপ্রকৃতি শাজিহান তাঁহাকে তিন সহস্রের মনসবপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাও উপাধিসহ নাগোরজনপদ প্রদান করিলেন। উচ্চপদ ও উচ্চসম্মান লাভ করিয়া অমরের প্রকৃতি আরও গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। তিনি মৃগয়াব্যপদেশে প্রায়ই সম্রাট্ সভায় অনুপস্থিত থাকিতেন, এমন কি, একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সম্রাট অমরকে তাড়নাপূর্ব্বক তাঁহার জরিমানা করিলেন। অমর তাহাতেও ভীত না হইয়া তৎক্ষণাৎ সতেজস্বরে কহিলেন, "আপনি আমার জরিমানা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমার একমাত্র সম্বল এই সুতীক্ষ্ণ তরবারি।"

অমরের উদ্ধত বাক্য শুনিয়া সম্রাটের রোষসঞ্চার হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি জরিমানা আদায় করিবার জন্য খাজাঞ্চী সলাবৎ খাঁকে অমরের নিকট প্রেরণ করিলেন। খাজাঞ্চী উপস্থিত হইয়া সম্রাটের আদেশ বিজ্ঞাপিত করিবামাত্র অমর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সলাবৎ খাঁর অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ আপনাকে অবমানিতজ্ঞানে তৎক্ষণাৎ অমরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। অমর সভায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, সম্রাটের নেত্রদ্বয় আরক্ত, মুখমণ্ডল গভীর, ক্রোধের লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশমান। সম্মুখে সলাবৎ করপুটে দণ্ডায়মান। অমরের হৃদয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধে সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি একলম্ফে সলাবৎকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন, পরক্ষণেই অসি নিষ্কোষিত করিয়া সম্রাটের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সৌভাগ্যবশে স্তম্ভগাত্রে প্রতিহত হইয়া তরবারিখানি ভূপতিত হইল। সম্রাট্ এই অবসরে অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন।

প্রলয়কালীন রুদ্রমূর্ত্তির ন্যায় অমরের সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া সভাস্থ সকলেই মহাভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন যে কেহ অমরের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ ইহলোক হইতে শমনভবনে প্রেরণ করেন। সভাস্থলীতে যেন শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। বিষম হুলস্থূলদর্শনে অমরের শ্যালক অর্জ্জুন গোর তাঁহাকে প্রবোধদান-ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়া সাংঘাতিক আঘাত করিলেন। অমর তৎক্ষণাৎ ভূশায়ী। ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহকায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল।

অমরসিংহের শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারগণ রোষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা প্রচণ্ডবিক্রমে আগরার লালকেল্লামধ্যে প্রবেশ করিয়া যবনসৈন্য মথিত ও দলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে অসংখ্য অসংখ্য মোগলসৈন্য আসিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। রাজপুতসর্দ্দারেরা অতুলনীয় রাজভক্তি ও মহাবীরত্বের নিদর্শন প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রমে যবনের হস্তে আত্মোৎসর্গ করিলেন। যে দ্বার দিয়া তাঁহারা কেল্লামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সেই দ্বার "অমরসিংহের ফটক" নামে প্রসিদ্ধ হইল। তদবধি ঐ দ্বার রুদ্ধ ছিল, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টিল নামক একজন ইংরাজ সেই তোরণ ভগ্ন করেন। অনেকে নিষেধ করিয়াছিল,

তোরণ ভগ্ন করিলে ভীষণ অজগর সর্প আসিয়া দংশন করিবে, অনেকে এরূপ ভয়ও দেখাইয়াছিল, ষ্টিল সাহেব সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু তোরণদ্বার যেমন ভগ্ন হইল, অমনি একটি ভীষণ কৃষ্ণসর্প বহির্গত হইয়া সাহেবকে আক্রমণ করিল। অতিকষ্টে সাহেব পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

যে ঔদ্ধত্য ও তেজস্বিতার জন্য অমরসিংহ পিতৃকর্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেন, সেই ঔদ্ধত্যই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বুন্দিরাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র পতিপরায়ণা সতী তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরেই পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া জ্বলন্তচিতায় আরোহণপূর্ব্বক আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যশোবন্তের সিংহাসনারোহণ, গণ্ডবানযুদ্ধ, ফতিহাবাদের যুদ্ধ, আগ্রোযুদ্ধ, শাজিহানের পদচ্যুতি, সম্রাট্ আরঙ্গজেব, কাজবার যুদ্ধ, মারবার আক্রমণ, সায়েস্তা খাঁর মৃত্যু; দেলহীর খাঁর যুদ্ধসজ্জা, পৃথ্বীসিংহের আকস্মিক মৃত্যু, পুত্রশোকে যশোবন্তের মৃত্যু, নাহর খাঁ।

অমর নির্ব্বাসিত। যশোবন্তসিংহ মারবারের সিংহাসনে অধিরূঢ়। একটি শিশোদীয়-রাজকুমারীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। গিহ্লোটবংশীয়া রাজকুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠসত্ত্বে যে যশোবন্তসিংহ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভট্টগ্রন্থে এমন কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয়, অমরসিংহ উদ্ধতস্বভাব বলিয়াই নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ভট্টকবি বলেন, তৎকালীন নৃপতিগণের মধ্যে যশোবন্তসিংহ অদ্বিতীয় নরপতি। তাঁহার প্রতিভা-বলে দেশের মূর্খতা ও অজ্ঞানান্ধতা তিরোহিত হইয়াছিল এবং তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন।

যে দক্ষিণাবর্ত্ত শূরসিংহ, রাজসিংহ প্রভৃতি নরপতিগণের প্রধান রঙ্গস্থল ছিল, আজি সেই দক্ষিণাবর্ত্ত যশোবন্তসিংহের সাধনক্ষেত্র হইল। শৈশবকাল হইতেই স্বজাতীয় গৌরবস্পৃহা যশোবন্তের হৃদয়মধ্যে অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, উপযুক্ত সাহায্য পাইলেই তিনি ভারত-সন্তানের উন্নতিসাধনের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেন। সম্রাট্ এই সময়ে রমণীগণপরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃ-পুরমধ্যেই বাস করিতেন; তাঁহার পুত্রগণ প্রতিনিধিস্বরূপ সম্রাটের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অবস্থিতি করিতেন। সুতরাং সম্রাট্ শাজিহান যশোবন্তের হৃদয়ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার যথাযোগ্য আনুকূল্য প্রদান করেন নাই। তাহা করিলে মারবারের ইতিহাস অন্যপ্রকার হইয়া দাঁড়াইত। সর্ব্বপ্রথমে যশোবন্তসিংহ গণ্ডবানক্ষেত্রে প্রেরিত হন। আরঙ্গজেবের অধীনস্থ বিশাল সেনাদলের এক বৃহৎ অংশের অধিনায়ক হইয়া যশোবন্ত এই গণ্ডবান এবং ইহার ন্যায় অন্যান্য ক্ষেত্রে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। এই যুদ্ধে যদিও তিনি স্বাধীনভাবে রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তথাপি সম্রাটের সাহায্যহেতু সমরক্ষেত্রে সমবেত সামন্তমণ্ডলীদিগের মধ্যে রাঠোররাজ যশোবন্ত ও তাঁহার অধীনস্থ রাঠোর-সেনাগণই অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাজিহান সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নিজপুত্র দারাকে প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত

কল্মেম এবং যশোবন্তের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারপদে উন্নীত করিয়া মালবে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করিলেন।

পিতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া শাহজাদাগণ পরস্পর রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রাজ্যমধ্যে একটি ভীষণ অগ্নি উপস্থিত হইল। সম্রাট ভাবিলেন, এই মহান্ বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে রাজপুতগণ ভিন্ন আর কেহই সমর্থ হইবেন না। এই বিবেচনা করিয়া তিনি বিশ্বস্ত রাজপুতদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগের আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। তৎক্ষণাৎ বিপদ্গ্রস্ত পীড়িত সম্রাটের সাহায্যার্থে রাজপুতগণ বিদ্রোহী সম্রাট্-পুত্রগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অম্বররাজ জয়সিংহ সুজার এবং যশোবন্তসিংহ কপটাচারী আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

কপট আরঙ্গজেবকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে রাজা যশোবন্তসিংহ ত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত এবং বহুসংখ্যক মোগলসেনা সমভিব্যাহারে আগ্রা হইতে নর্ম্মদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উজ্জয়িনীর আট ক্রোশ দক্ষিণে উপস্থিত হইবামাত্র যশোবন্ত সংবাদ পাইলেন, আরঙ্গজেব তাঁহাদিগের অতি নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন। যশোবন্ত আর এক পদও অগ্রসর না হইয়া সেই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। ক্রমে বিদ্রোহিগণ নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া যশোবন্তের নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। যশোবন্ত মনে করিলে সেই স্থানেই তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ;—ভাবিলেন, একেবারে দুইটি ভ্রাতার সমবেত বল সমুৎসাদিত করিবেন। আরঙ্গজেব এই সুযোগে ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া নিজ নিজ বল বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। কেবল ইহা করিয়াই আরঙ্গজেব ক্ষান্ত রহিলেন না, যশোবন্তের অধীনস্থ মোগলসৈন্যদলের সহিত তিনি ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত যুদ্ধারম্ভের আদেশ প্রদান করিবামাত্র তাঁহার অধীনস্থ মোগল অশ্বারোহীরা তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আরঙ্গজেবের সহিত যোগদান করিল। এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়াও তেজস্বী রাঠোররাজ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং তাঁহার সাহস দ্বিগুণতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রাজপুত সেনাগণ স্বদলের সামর্থ্যের উপর জয়াশা স্থাপন করিয়া শ্রবণবিদারক হুহুঙ্কারে শত্রুসেনার প্রতি প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইল। রাজা যশোবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সভ্রাতৃক আরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। এই জীবনযুদ্ধে দশ সহস্র মোগল ও সপ্তদশ শত রাঠোর-সেনা নিহত হইল ; এতদ্ব্যতীত হার, গোর, গিহ্লোট প্রভৃতি সেনাদলের কতকগুলি বীরও প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। আরঙ্গজেব ও মুরাদ পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন। শীকার পলাইল দেখিয়া যশোবন্ত রক্তাক্ত-কলেবরে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে নিজশিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধজয় করিয়া রাঠোররাজ যশোবন্ত স্বীয় রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু যোধপুরে সহজে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। প্রবেশপথে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী একটি বিষম বাধা উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহিষী শুনিয়াছিলেন, ফাতিয়াবাদের যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর প্রায় সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, পতিও পরাজিত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, মনে ঘৃণার উদয় হইল, তখনই তিনি দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই আকস্মিক আদেশে তাঁহার সহচরীগণ বিস্মিত হইল। মহিষীর আরক্তলোচন ও গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহারা প্রভুপত্নীর সেই আকস্মিক মনোবিকারের

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাণী ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, পবিত্র বীরপূজ্য শিশোদীয় কুমারীর করগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি সমরে শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, সে কি রাজপুতনামের যোগ্য? সে কি বীরপুরুষ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে?—কখনই না, সে কাপুরুষ, কাপুরুষ হইতেও অধম তাদৃশ কাপুরুষকে এই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। তাহাকে বলিও, তৎসদৃশ অধম ব্যক্তিকে পতি বলিয়া স্বীকার করিতেও আমার লজ্জা বোধ হয়। উচ্চ শিশোদীয়বংশে তাহার বিবাহ হইয়াছে, সেই বংশের অসীম গুণরাশির অনুকরণ করা তাহার উচিত। হয় যুদ্ধে জয়লাভ, নতুবা শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া রণস্থলে শয়ন, ইহাই বীরের বীরোচিত ধর্ম্ম। পরাস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবে, তাদৃশ কাপুরুষ রাজপুতনামের যোগ্য নহে।" বলিতে বলিতে রাণীর মুখভাব রূপান্তর গ্রহণ করিল; বিশাল নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল; উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে বৃহৎ চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার জীবনধারণে আর ইচ্ছা নাই, অবমানিত ও কলঙ্কিত স্বামীকেও আর তিনি জীবিত থাকিতে দিবেন না। রাজাকে মরিতে হইবে, তাঁহার সহিত তিনিও চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন। আবার সে ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। আবার তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পিতার উদ্দেশে সহস্র সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এইরূপে আট নয় দিন অতিবাহিত হইল; স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাণীর আদৌ ইচ্ছা হইল না। পরে তাঁহার জননী আসিয়া তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "রাজা রণশ্রান্ত, শ্রান্তি দূর করিয়াই আবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন এবং দুরাচার আরঙ্গজেবকে পরাজিত করিয়া নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইবেন।" জননীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মহিষী ক্রোধ সংবরণ করিলেন, রাজা যশোবন্তসিংহও রণশ্রান্তি দূর করিয়া স্বরাজ্যের শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এ দিকে মালবদেশে আমোদ-প্রমোদে কয়েক-দিন অতিবাহিত করিয়া আরঙ্গজেবও রাজধানী অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিলেন তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বৃদ্ধ শাজিহানের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, মস্তক হইতে রাজমুকুট স্খলিত হইয়া পড়িল। শাজিহান পুনরায় বিশ্বস্ত রাজপুতগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। কেহই তাঁহার আজ্ঞা অব-হেলা করিতে পারিলেন না। রাজপুতবীরগণ বৃদ্ধ সম্রাট্ শাজিহানের সম্মানরক্ষার্থ আবার পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন। আগরার পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণে জাজোগ্রামে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে সম্রাট্ শাজিহানের মস্তক হইতে তাঁহার রাজমুকুট আচ্ছিন্ন হইল, ময়ূর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া সম্রাট্ দীনহীনের ন্যায় অন্ধকারময় কারাগৃহে আবদ্ধ হই-লেন। সেই সঙ্গে প্রিয়পুত্র দারারও অধঃপতন হইল; মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি দূরদেশে বিতাড়িত হইলেন।

পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজেব সিংহাসন অধিকার করিয়া আপনার উন্নতিপথ পরিষ্কার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সহোদর সুজাকে দমন করাই এখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইল। অচিরে সেনাদল সজ্জিত করিয়া তিনি রাঠোররাজ যশোবন্তসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি সত্বর আসিয়া সুজার বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে। অভীষ্টসিদ্ধি ও প্রতিহিংসার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া যশোবন্ত আরঙ্গজেবের আজ্ঞাপালনে সম্মত হইলেন। রাজকুমার সুজা সেই সময় নিজ অধিকার দৃঢ়ীভূত করিবার অভিপ্রায়ে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যশোবন্ত গোপনে তাঁহার নিকট নিজ অভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন।

যুদ্ধের আয়োজন হইল। রাজপুত্রদ্বয় পরস্পর বিজিগীষু হইয়া স্ব স্ব সেনাদলসহ এলাহাবাদের

পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরে কাজবা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। যশোবন্ত নিজ সৈন্যগণসহ কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে রাজকীয় সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজপুত্র মহম্মদ সেই স্থান রক্ষা করিতেছেন রাজা যশোবন্ত অকস্মাৎ তাঁহার সেনাদল আক্রমণপূর্ব্বক ছিন্নভিন্ন করিয়া দ্রুতগতি সম্রাটের শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। অচিরেই সম্রাট্ শিবির লুণ্ঠিত হইল। লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া রাজা যশোবন্ত নিজ নগরে প্রেরণ করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশসাধনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে যশোবন্ত একেবারে আগ্রানগরে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে জনরব উঠিয়াছিল, আরঙ্গজেব যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে তাঁহার সৈন্যগণের হৃদয়ে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। যশোবন্তকে সদলে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহাদিগের সেই ভয় আরও দৃঢ়ীভূত হইল। তাহারা ভয়ে এরূপ আকুল হইয়াছিল যে, যশোবন্ত তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ করিলেও তদ্দণ্ডেই তাহা পালিত হইত। যশোবন্ত মনে করিলে কারারুদ্ধ শাজিহানের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইয়া আরঙ্গজেবের উন্নতিপথে প্রচণ্ড প্রতিরোধ স্থাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু শাজিহানের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। রাঠোরাজের সেরূপ মতি হইল না। তিনি আগ্রা নগরে প্রবেশ করিয়াই তথা হইতে পুনঃ প্রস্থান করিলেন। এরূপ সত্বর-প্রস্থানের বিশেষ কারণ ছিল; তিনি ভাবিলেন, আরঙ্গজেব জয়লাভ করিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলে সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। যশোবন্তের আগ্রা-পরিত্যাগের একটি গূঢ় অভিসন্ধিও ছিল। দারাই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ইহা জানিয়াই যশোবন্ত তাঁহার সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বার্থরক্ষাভিপ্রায়ে রণস্থলে উপস্থিত হইতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বনির্দ্দেশমত আরঙ্গজেবের পশ্চাদ্ভাগে দারার আসিবার কথা ছিল, যশোবন্ত সেই স্থানে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে বিচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু দারা তথায় আগমন করিলেন না, তাঁহার আশা ফলবতী হইল না, সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। আরঙ্গজেব কৌশলের সমধিক সমাদর করিতেন। তিনি অসিবলের উপর নির্ভর না করিয়া কৌশলে সুজাকে দমিত করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর আরঙ্গজেব দিল্লী নগরে উপনীত হইয়াই যশোবন্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি দারার সাহায্যার্থ প্রেরিত সেনাদিগকে ফিরাইয়া লন এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের সংঘর্ষে কোনরূপে সংলিপ্ত না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে গুর্জ্জরের প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত করা হইবে। রাঠোররাজ আরঙ্গজেবের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাজকুমার মোজাকে নিজ সেনাদলের অধিনায়ক করিয়া মহারাষ্ট্রীয় বীরকেশরী শিবজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

দারাই শাজিহানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অনেক রাজপুত প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যশোবন্তকেও তাহাই করিতে হইল; কিন্তু তিনি প্রলোভনের মোহে ভুলিলেন না। তিনি দেখিলেন, দীর্ঘসূত্রী দারা ত্বরিতকর্ম্মা কূটনীতিজ্ঞ আরঙ্গজেবের উপর কখনই জয়লাভ করিতে পারিবেন না; সুতরাং দারার নিজের অযোগ্যতা হেতু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন।

দক্ষিণাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া যশোবন্তসিংহ শিবজীর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ষড়্‌যন্ত্রের ফল, শিবজী কর্ত্তৃক আরঙ্গজেবের প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁর নিধন। যশোবন্ত সেনাপতির কার্য্য করিতে লাগিলেন। অচিরেই এই সংবাদ আরঙ্গজেবের শ্রুতিগোচর হইল।

দারেস্তাখাঁর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বিবেকবলে তিনি ক্রোধানল প্রশমিত করিলেন; সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া যশোবন্তকে কোনরূপে উত্যক্ত করিলেন না, বরং তাঁহার পদোন্নতি হেতু আনন্দ প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আরঙ্গজেব অধিক দিন সেই অন্তনিগূহিত ক্রোধানল হৃদয়মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তিনি যশোবন্তকে স্থানান্তরিত করিয়া অম্বররাজ জয়সিংহকে তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। দাক্ষিণাত্যে উপনীত হইয়া অচিরকালমধ্যে জয়সিংহ কৌশলক্রমে শিবজীকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ কখনই প্রাণবধ করিতে পারিবেন না, শিবজীকে বন্দী করিবার সময় জয়সিংহ তাঁহাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আরঙ্গজেবের আচরণ দেখিয়া বন্দী অবস্থায় শিবজীর মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, দুর্ব্বৃত্ত মোগল তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছেন। তখন তিনি পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, জয়সিংহ নিজ প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হইয়া তাঁহার পলায়নে সহায়তা করিলেন। শঠ কপটাচারী মোগলসম্রাটের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইল। মহারাষ্ট্রীয়বীর শিবজী নিরাপদে পলায়ন করিলেন। জয়সিংহ শিবজীর সহায়, ইহা জানিতে পারিয়া আরঙ্গজেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যশোবন্তকে নিজ প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। সুবিধা বুঝিয়া মারবারাধিপতি স্বীয় অভীষ্টসাধনের অভিপ্রায়ে রাজকুমার মোয়াযেমের সহিত মিলিত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর আরঙ্গজেব তাহা বুঝিতে পারিয়া যশোবন্তকে পদচ্যুত করিলেন। দেলহীর খাঁ প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত আরঙ্গাবাদনগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি জানিতে পারিলেন, আরঙ্গাবাদ হইতে পলায়ন না করিলে তাঁহার প্রাণবিনাশের সম্ভব। প্রাণভয়ে তিনি নর্ম্মদাতীরে পলায়ন করিলেন, কিন্তু পলাইয়াও বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলেন না। রাজা যশোবন্ত ও মোজাম তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি দেলহীর খাঁকে এই বিষম বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার অন্য উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ধূর্ত্ত সম্রাট্ রাঠোররাজ যশোবন্তকে গুর্জ্জরপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; যশোবন্ত সম্রাটের আদেশ অবহেলা করিতে পারিলেন না। আহম্মদাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, শঠচূড়ামণি সম্রাট্ শঠতা দ্বারা তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছেন। মনোমধ্যে নিজ অবিবেচনার বিষয় আন্দোলন করিয়া তিনি আপনাকেই ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ১৭২৬ সংবতে (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) স্বদেশে আসিয়া তিনি এই প্রতারণার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

আরঙ্গজেব রাজা যশোবন্তকে পরমশত্রু বলিয়া জানিয়াছিলেন; বৈরনির্যাতনার্থ তিনি নানারূপ উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনটিও সফল হয় নাই। সকল উপায়ই ব্যর্থ হইল দেখিয়া আরঙ্গজেব ভাবিলেন, শঠতা-প্রতারণা দ্বারা আর তিনি নিজ অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইবেন না, এখন কল্পিতবন্ধুর ভাণ করিয়া যশোবন্তকে এমন স্থানে পাঠাইতে হইবে যেন, তথা হইতে তিনি আর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে না পারেন। এই সময়ে এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া কাবুলরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। যশোবন্ত ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আরঙ্গজেব বিদ্রোহদমনার্থ যশোবন্তকে সেই বিপৎসঙ্কুল সুদূর কাবুলরাজ্যে প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন।

বার বার প্রতারিত হওয়ায় রাঠোররাজ ধূর্ত্ত আরঙ্গজেবের মধুর আশ্বাসবাক্যে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বীসিংহের হস্তে স্বরাজ্যের শাসনভার সমর্পণপূর্ব্বক স্ত্রী, পরিবারবর্গ ও প্রধান প্রধান সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কাবুলযাত্রা করিলেন।

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, আরঙ্গজেব পৃথ্বীসিংহকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাঠোররাজপুত্র আজ্ঞানুসারে রাজসভায় উপস্থিত হইলে সম্রাট্ তাঁহার যথোচিত সাদরসংবর্দ্ধনা করেন। একদিন পৃথ্বীসিংহ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নিয়মিত অভ্যর্থনার পর নিজ আসনে উপবেশন করিতে যাইতেছেন, ইত্যবসরে সম্রাট ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। যশোবন্তকুমারও বিহিত সম্মানপুরঃসর সম্রাট-সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। সম্রাট তাঁহার হস্তযুগল দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন, "রাঠোর! শুনিয়াছি, এই বাহুদ্বয়ে তুমি তোমার পিতার সমতুল্য বল ধারণ করিয়া থাক, দেখা যাক তুমি এখন কি করিতে পার।" পৃথ্বীসিংহ যথোচিত সম্মান সহকারে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর দিল্লীশ্বরের মঙ্গল করুন, সম্রাট। নরপতি যখন প্রজার উপর আশ্রয়স্বরূপ নিজহস্ত বিস্তার করিলে তাহার সকল মনোরথই সফল হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আজি আপনাকে স্বহস্তে এই অধীনের হস্ত ধারণ করিতে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আপনার অনুগ্রহে আমি সসাগরা পৃথিবী জয় করিতে পারিব।" পৃথ্বীরাজের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সম্রাট বলিয়া উঠিলেন, "দেখিতেছি, এ যুবক দ্বিতীয় খুতান।" * আরঙ্গজেব প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখিয়া রাঠোররাজপুত্রের এই সাহসপূর্ণ সরলবাক্যে বাহিক সন্তোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। রাঠোরকুমারও প্রচলিত প্রথানুসারে সম্রাট সমক্ষে সেই সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রাজসভা হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। স্বভবনে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিষম যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে হস্তপদাদি প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে শরীর অবসন্ন—নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। আহা! রাজকুমারের সুবর্ণকান্তি বিবর্ণ হইয়া গেল, পাষণ্ড শত্রু আরঙ্গজেবের নৃশংস আচরণে যশোবন্তের হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন, নয়নের মণি, বার্দ্ধক্যের যষ্টিস্বরূপ কুমার পৃথ্বীসিংহের জীবন অকালে ইহলোক হইতে প্রস্থিত হইল। পৃথ্বীসিংহ বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই বহুমূল্য পরিচ্ছদের প্রত্যেক সূত্রে কালকূট নিহিত ছিল। যশোবন্তের আশা-ভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল। অত্যাচারীর দারুণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার যে হৃদয় এত দিন অটলভাবে সংরক্ষিত ছিল, আজি সেই হৃদয় পুত্রশোকরূপ বজ্রপ্রহরণে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। দুর্বৃত্ত আরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি এইরূপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। পুত্রশোক পাইয়াও যশোবন্ত আর কিয়দ্দিন জীবিত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রদ্বয়ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। শোকে, দুঃখে, দারুণ মর্ম্মবেদনায় ভগ্নহৃদয় মারবারাধিপতি যশোবন্তসিংহ সেই সুদূরস্থিত হিন্দুকুশের ক্রোড়দেশে ১৭৩৭ সংবতে (১৬৭১ খৃষ্টাব্দে) মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কাবুলযাত্রাই তাঁহার মহাপ্রস্থান হইল, আর তাঁহাকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিতে হইল না। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়া পাপী আরঙ্গজেবের প্রায়শ্চিত্তের বিধি প্রদর্শন করিবে, এমন কোন উত্তরাধিকারী রহিল না। যশোবন্তসিংহ সর্ব্বসমেত দ্বিচত্বারিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যে বৎসরে রাজা যশোবন্তের

* সম্রাট সর্ব্বদা যশোবন্তকে খুতান বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজী মানবলীলা সংবরণ করেন। এই দুই মহাবীরের মৃত্যুতে আরঙ্গজেব দুইটি ভীষণতম শত্রুকবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

যশোবন্তের বিচিত্রঘটনাপূর্ণ জীবনীর আমূল বিবরণ পাঠ করিলে তৎসাময়িক ইতিহাস ও দেশে প্রচলিত আচার-ব্যবহার বিশদরূপে বুঝা যায়। তাঁহার অসাধারণী কার্য্যকুশলতা উচ্চশ্রেণীর বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার অপরিমেয় শক্তি, অসীম সাহস ও প্রতিপত্তির সমতুল্য হইলে আরঙ্গজেবের প্রবল শত্রুদিগের সহায়তায় নিশ্চয়ই তিনি ভারতবর্ষ হইতে মোগলসাম্রাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিতেন। তিনি শাজিহানের সকল পুত্র অপেক্ষা সরলহৃদয় দারাকেই অধিক ভালবাসিতেন; কিন্তু সমগ্র মুসলমানজাতিকে হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ও হিন্দুস্বাধীনতার পরমশত্রু বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সাম্রাজ্য অধিকার করিবার লোভে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে যশোবন্ত কোন না কোন ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিতেন। এতাদৃশ অন্তর্বিপ্লবে তাঁহাদের সকলেরই অধঃপতন হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বৃথা বলমদে মত্ত হইয়া তিনি নর্ম্মদাযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, দারার দীর্ঘসূত্রতাহেতু কাজবাক্ষেত্রেও নিজের অভীষ্টসাধনে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। বলক্ষয় ও যশের লাঘব হইলেও যশোবন্ত নিরুৎসাহ হন নাই, বিজয়ী আরঙ্গজেবের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, প্রতিশোধ লইবার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা উপেক্ষা করিতেন না। আরঙ্গজেব তাঁহাকে যখন যে পদ প্রদান করিয়াছেন, প্রতিশোধপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তখনই তিনি সাদরে সেই পদ গ্রহণ করিয়া নিজ অভীষ্টসাধনে তৎপর হইয়াছেন। শিবজীর সহিত ষড়যন্ত্র, সায়েস্তা খাঁর হত্যা, দেলহীর খাঁকে আক্রমণ, রাজকুমার মৌজামকে পিতৃবিরুদ্ধে উত্তেজিতকরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি তাঁহার প্রতিশোধপিপাসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সম্রাট্ আরঙ্গজেব যশোবন্তকে তাঁহার পরমবিদ্বেষী বলিয়া জানিতেন, কিন্তু স্বার্থসাধনোদ্দেশে সকলই সহ্য করিতে হইয়াছিল; যশোবন্তের বিদ্বেষবহ্নি হইতে দূরে থাকিয়া আরঙ্গজেব অতি সাবধানে প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতি সদাচরণ করিতেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, সম্রাট্ রাঠোররাজকে অন্তরের সহিত ভয় করিতেন। যশোবন্ত ক্রমান্বয়ে গুর্জ্জর, দাক্ষিণাত্য, মালব, অজমীর ও কাবুল এই কয়েকটি প্রদেশে সম্রাটের প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যশোবন্তের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিশোধপিপাসার শান্তি; সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সম্রাট্দত্ত ঐ সকল অনুগ্রহকে আপন অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান সাধনস্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

সম্রাটের কোন পারিষদ কর্ত্তৃক যশোবন্তের জীবনী লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করা হইত; কিন্তু আমরা কখনও তাঁহাকে সে অপবাদে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। সম্রাট্ হিন্দুধর্ম্মের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। তাদৃশ হস্ত হইতে স্বধর্ম্মের—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরবরক্ষার্থ যশোবন্ত সম্রাটের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সত্য, সম্রাটের অধীনে থাকিয়া যশোবন্ত তাঁহার অনিষ্টসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, নৃশংস অত্যাচারীর ভীষণ অত্যাচার হইতে হিন্দুজাতির—হিন্দুধর্ম্মের গৌরবরক্ষা করিতে প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতক নহেন, এ সকল কার্য্যকে বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য বলা যায় না। আরঙ্গজেব যশোবন্তকে বিলক্ষণরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন; তিনি রাঠোরাধিপতিকে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না, তিনি জানিতেন, সুবিধা পাইলেই রাঠোররাজ প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবেন। সম্রাট্ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া উচ্চপদ প্রদান করেন নাই, কেবল তাঁহাকে আয়ত্তাধীনে

রাখিবার জন্যই উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। সম্রাট্ মনে করিয়াছিলেন, শাসনাধীনে থাকিলেই ইচ্ছামাত্র তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে পারিবেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যশোবন্তের বিশেষ সতর্কতা হেতু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। জয়সিংহ শিবজী প্রভৃতি যশোবন্তের সমসাময়িক নৃপতিগণ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া চিরশত্রু আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলে নিশ্চয়ই ভারত হইতে মোগলসাম্রাজ্যের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। অত্যাচারীকে মানসিক যন্ত্রণা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলে যথেষ্ট প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে ভাবিয়া যশোবন্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। যশোবন্তের জীব-দশায় আরঙ্গজেব যে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভয় করিতেন, যশোবন্তের পুত্রের হত্যা ও যশোবন্তের মৃত্যুর পর তাঁহার নিরপরাধ পরিবারবর্গের প্রতি অযথা অত্যাচারই তাহার প্রধান সাক্ষ্য। পাষণ্ড আরঙ্গজেবের এই ঘোর অত্যাচার এবং তদানুসঙ্গিক ঘটনাবলী বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, যে বিশ্বস্ত রাঠোর-সর্দ্দারগণ যশোবন্তের জন্য আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদিগের দুই একটি বৃত্তান্ত এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

তৎকালীন রাঠোরসামন্তগণের মধ্যে কুম্পাবৎ-সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ নাহুর খাঁ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার আদিনাম মোকনদাস। যশোবন্তের প্রাণনাশ করিবার জন্য আরঙ্গজেব যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, ইঁহারই সতর্কতা ও অসীম সাহসপ্রভাবে সে সমুদয় ব্যর্থ হইয়াছিল। মোকনদাসের "নাহুর খাঁ" নাম সম্রাট্ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। যে কারণে তাঁহাকে উক্ত নাম প্রদান করা হয়, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

একদা সম্রাট্-প্রেরিত কোন সংবাদের প্রত্যুত্তর-প্রদানে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় মোকনদাস সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। দণ্ডপ্রদান করিবার অভিপ্রায়ে নিষ্ঠুর আরঙ্গজেব তাঁহাকে নিরস্ত্র হইয়া একটা ভীষণ ব্যাঘ্রের পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন। এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে মোকনদাস নির্ভীকচিত্তে ব্যাঘ্রপিঞ্জরে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ব্যাঘ্র পিঞ্জরমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সামন্তরাজ ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে ব্যাঘ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যবনের শার্দ্দূল! যশোবন্তের শার্দ্দূলের সম্মুখীন হও।" এই অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা শুনিবা-মাত্র ব্যাঘ্ররাজ মহাতেজা মোকনদাসের অনলোদ্গারী নেত্রদ্বয়ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল, পরক্ষণেই তৎক্ষণাৎ মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে একপার্শ্বে সরিয়া গেল। ব্যাঘ্রকে অপসৃত হইতে দেখিয়া রাঠোরবীর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, ব্যাঘ্র সম্মুখীন হইয়াও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না, রণবিমুখ শত্রুকে আক্রমণ করা প্রকৃত রাজপুতের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।" এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে কঠিনহৃদয় আরঙ্গজেবও বিস্মিত হইয়া সামন্তরাজের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে "নাহুর খাঁ" নাম সহ নানাপ্রকার পুরস্কার দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাঠোর! তোমার এই অসীম বিক্রমের অধিকারী হইতে কোন সন্তানসন্ততি আছে?" নির্ভীকহৃদয়ে নাহুর উত্তর করিলেন, "আপনি যখন আমাদিগকে স্ত্রী-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আটকের পর-পারে রাখিয়াছেন, তখন আমাদিগের সন্তানসন্ততিলাভের সম্ভাবনা কোথায়?" সম্রাট নীরব রহিলেন। এই বিস্ময়কর বীরত্বপ্রদর্শন করিয়া রাঠোরবীর মোকনদাস নাহুর খাঁ (ব্যাঘ্রপতি) উপাধি প্রাপ্ত হন।

আর একবার নাহুর খাঁ এইরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া শাহজাদার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একদা রাজকুমার যৌবনসুলভ আমোদের বশবর্ত্তী হইয়া নাহুর খাঁকে তাঁহার সম্মানের অনুপযোগী

একটি কার্য্য করিতে আদেশ করেন। তিনি বলেন, "আপনি কি দ্রুতধাবিত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক একটি লম্বিত বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়া দুলিতে পারেন?" এইরূপ ক্রীড়ায় বল ও ক্ষিপ্রহস্ততার প্রয়োজন। ইহা সাধারণের নিকট একটি আমোদকারী ক্রীড়া। মিবারের ইতিবৃত্তে বিবৃত আছে, এই ক্রীড়ায় বুনেরা প্রধানের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তদ্ব্যতীত আরও অনেকে এই ক্রীড়া করিতে গিয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শাহজাদার এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র নাহুর খাঁ সক্রোধে উত্তর করিলেন, "আমি বানর নহি, রাজপুতের ক্রীড়া অসির সাহায্যেই হইয়া থাকে, ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত স্থলে সেই অসির ক্রীড়া দেখাইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া শাহজাদা নাহুরকে শিরোহীর দেবররাজ সুরতানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে নাহুর সমস্ত রাঠোরসেনার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিবেন না বুঝিতে পারিয়া সুরতান গিরিশিখরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন; দুর্গম গিরিশিখরমধ্যে আপনাকে নিরাপদে ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে গভীর নিশীথকালে মোকনদাস নিজ সেনাদলসহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই নিদ্রিত। একজনমাত্র প্রহরী জাগরিত। নাহুর খাঁ তাহাকে সংহার করিলেন। অতঃপর সুরতানের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ উষ্ণীষবসনে শয্যাসমেত তাঁহাকে বন্ধন করিয়া স্বীয় সৈন্যদলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া নাহুরের সৈন্যগণ নাগরাধ্বনি করিতে লাগিল। গম্ভীর বাদ্যধ্বনি শ্রবণমাত্র দেবরসৈন্যগণ জাগরিত হইয়া উঠিল; এবং আপনাদিগের প্রভুর বিপদ্ দর্শন পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মোকনদাস চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদিগের অধিপতির জীবন মরণ আমার করতলগত। আমার ইচ্ছা ইঁহাকে বন্দী করিয়া একবারমাত্র আমার রাজার নিকট লইয়া যাইব, অজ্ঞানতাবশতঃ আমার ইচ্ছায় প্রতিকূলতাচরণ করিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদিগের প্রভুর জীবন হারাইবে। কিরূপে ইঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাই, তাহা দেখাইবার জন্যই আমি তোমাদিগকে জাগরিত করিয়াছি।"

নির্ব্বিঘ্নে বন্দীকে লইয়া সামন্তরাজ অচিরে যশোবন্তসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাঠোররাজ তাঁহাকে সম্রাট্সদনে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেবররাজ সুরতান উপযুক্ত কর্ম্মচারিপরিবৃত হইয়া সম্রাট্-প্রাসাদে আনীত হইলেন। সম্রাট্-সমীপে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বলিলেন, "সম্রাট্কে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতে যেন বিস্মৃত হইবেন না।" এই কথা শুনিয়া মহাতেজা দেবররাজ সুরতান উত্তর করিলেন, "আমার জীবন এখন রাজার হস্তে সত্য, কিন্তু সম্মান আমার নিজের হাতে। আমি কখনও কাহারও নিকট মস্তক অবনত করি নাই, এ জীবনে কখনও করিতে পারিব না।" কিছুতেই সুরতানকে অবমানিত হইতে দিবেন না, রাজা যশোবন্ত এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সেই জন্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সম্মান নষ্ট করিতে পারিল না। সচরাচর রাজকুমারগণ যে পথ দিয়া সম্রাটের নিকট গমন করেন, সুরতানকে সে পথে না লইয়া গিয়া একটি সংকীর্ণ বাতায়ন দিয়া রাজসভায় আনয়ন করা হইল। কর্ম্মচারীদিগের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া দেবররাজ সেই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। অগ্রে পা বাড়াইয়া পরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইল, ইহাই তাঁহার প্রকৃত অভিবাদনস্বরূপ গৃহীত হইল। তাঁহার রাজোচিত আকৃতি দর্শনে এবং বীরোচিত ব্যবহার, স্বাধীনতা-রক্ষার্থ অদম্য উদ্যম ও যশোবন্তের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, তাঁহার নিজের ইচ্ছামত ভূমিসম্পত্তি প্রদানেও স্বীকৃত হইলেন। সম্রাটের এই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে যে একটি গূঢ় অভিসন্ধি

নিহিত ছিল, সুরতান তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহাকে নিজদুর্গ জয়নগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে অধীনস্থ সামন্তরাজগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দেবররাজ সুরতান নির্ভয়ে বলিলেন, "জয়নগড়ের সমতুল্য আমাকে আর কি দিতে পারেন? আমি আর কিছুই চাহি না, আমি আমার স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহি।" সুরতানের এই নির্ভীকবাক্য শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ উদারচিত্তে আন্তরিক আহ্লাদ সহকারে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সুরতান স্বীয় দুর্গে প্রতিগমন করিলেন। এই-রূপ ইতিবৃত্তপাঠে আমরা নাহুর খাঁ এবং মারবারের রাঠোর সামন্তগণের চরিত্র বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি। রাজভক্তি-প্রদর্শন ও স্বদেশের উপকারসাধনার্থ ইঁহারা অম্লানবদনে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন।

সপ্তম অধ্যায়

যশোবন্তের পত্নীগণের সহমরণ, অজিতের জন্ম, আরঙ্গজেব কর্তৃক অজিত হরণোদ্যোগ, মুন্দরাধিকার, আরঙ্গজেব কর্তৃক মারবার আক্রমণ, জিজিয়াকর, যুদ্ধ, সন্ধি, টাইবার খাঁর মৃত্যু, যোধপুরযুদ্ধ, সোজুতে বিসংবাদ, মহামারী, শোনিঙ্গের মৃত্যু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ, শিবানোর অব-রোধ, আশানী নারীদ্বয় হরণ, ঝালোর অবরোধ।

রাঠোরবীর যশোবন্তসিংহ আটকপারে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী (অজিতের মাতা) পতিশোকে আকুলা হইয়া সহমরণের উদ্যোগ করিলেন। তিনি তখন সাতমাস গর্ভবতী। মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারী অজিত তখন তাঁহার গর্ভে সংস্থিত। এই অবস্থায় সহমরণ যুক্তিসঙ্গত নহে। কুম্পাবৎ-গোত্রীয় উদা মহিষীকে নানারূপ প্রবোধবচনে সহমরণসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। মহিষী প্রথমতঃ অনুরোধরক্ষণে অসম্মত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহাকে সে অনুরোধ পালন করিতে হইল। রাজার অন্যান্য পত্নীগণ জলন্তচিতায় আরোহণ করিয়া পতির অনুগমন করিলেন। চন্দ্রাবতী রাণী তখন যোধপুরের অন্তর্বর্ত্তী মুন্দরনগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি তাঁহার একটি উষ্ণীষ লইয়া জলন্তচিতায় আত্মজীবন আহুতি দিলেন। হিন্দুধর্ম্মরক্ষক যশোবন্তকে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ হতাশ ও শোকাকুল হইয়া পড়িল। শোকাচ্ছন্ন মারবারের সর্ব্বস্থান আজি গম্ভীর—নীরব—নিস্তব্ধ। দেবালয়ে মঙ্গলবাদ্য নাই, সূর্য্যোদয়ে আর শঙ্খ ধ্বনিত হয় না, ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমাননীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যশোবন্তের বিধবামহিষী যথাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। নবকুমার অজিত নামে অভিহিত হইল। রাঠোর-সর্দ্দারগণ নবকুমার, নবপ্রসূতি ও অন্যান্য সকলকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যশোবন্তের জীবিতকালে নানারূপে প্রতিশোধ লইয়াও নৃশংস আরঙ্গজেব পরিতুষ্ট হন নাই, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুর পরেও আবার তিনি প্রতিশোধ লইতে উদ্যোগী হইলেন।

সর্দ্দারগণ রাজপরিবার সহ দিল্লী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজকুমারকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, এই আদেশ করিয়া সম্রাট্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদি তোমরা আমার আদেশ পালন কর, রাজপুত্রকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তাহা হইলে আমি মরুদেশ তোমাদিগকে ভাগ করিয়া দিব।" এই কথা শুনিবামাত্র সর্দ্দারগণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়া পাঠাইলেন, "আমাদের মাতৃভূমি আমাদের শিরায় শিরায় জড়িত, আজি সেই শিরা আমাদিগের জন্মভূমি ও রাজাকে রক্ষা করিবে।" রোষোদ্দীপ্ত সর্দ্দারগণ "আমখাস" পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অচিরে যবনসেনাকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের আবাসভবন অবরুদ্ধ হইল। রাজপুত্রের জীবনরক্ষার্থ সর্দ্দারগণ একটি সদুপায় অবলম্বন করিলেন। মিষ্টান্নবিতরণ-ব্যপদেশে রাজকুমার অজিতকে একটি করণ্ডিকামধ্যে লুক্কায়িত করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন।

অচিরেই হিন্দুমুসলমানের ঘোরযুদ্ধ সংঘটিত হইল। অসির ঝন্ঝনা ও চর্ম্মের চটচটা শব্দে রণক্ষেত্র সমাকুল হইয়া উঠিল, অজস্র শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিল্লীর রাজপথে দুহরের বংশধরগণ যে যুদ্ধের অভিনয় করিলেন, কথিত আছে, স্বয়ং শঙ্কর সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিজ কণ্ঠহার পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। মহাবীর রত্ন নয়সহস্র শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অসি জয়লাভ করিতে পারিল না। রণক্ষেত্রে পতিত হইবামাত্র রম্ভা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। দারাবৎবীর তুল্ল আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন, প্রচুর লবণ তিনি সমরক্ষেত্রে লোহিত সলিলসহ মিশাইয়া দিলেন। চন্দ্রভণ অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক চন্দ্রপুরে নীত হইলেন। ভাটিবীর শতখণ্ডে ছিন্ন হইয়া সুরতানের পুত্রপার্শ্বে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বিশ্বস্ত উদাবৎবীর রক্তকমল সদৃশ পরিদৃশ্যমান হইয়া যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। কবিসন্দ দুই হস্তে অসিধারণ পূর্ব্বক সেনাদলের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন। রাজপুতবীরগণ আজি তরবারিতরঙ্গে সন্তরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধন করিলেন। দুর্গাদাস শত্রু-দলের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্বীয় সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। আজি রাজপুতবীরগণের হৃদয় এক অভুতপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ।

যখন রাঠোরবীরগণ দেখিলেন, দুর্ব্বৃত্ত যবনের হস্তে মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ, তখন তাঁহারা প্রথমতঃ রাজপুত্রের জীবন রক্ষা করিয়া আপনাদিগের ও মৃতপ্রভুর সম্মানগৌরব রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন; পবিত্রগৌরব রক্ষণার্থ এবং দুরাচার যবনদিগের হস্ত হইতে প্রাণাধিকা মহিলাগণকে রক্ষা করিবার জন্য এক লোমহর্ষণ কাণ্ডের আয়োজন হইল। অন্তঃপুরস্থ একটি কক্ষমধ্যে রাশি রাশি বারুদ স্তূপীকৃত হইল। বীরজননী রাজপুতরমণীগণ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইল। একটি গবাক্ষ দিয়া স্তূপীকৃত বারুদরাশির মধ্যে অগ্নি প্রদত্ত হইল। বারুদরাশি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জ্বলন্ত অনলে আজি রাজপুতরমণীগণ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীভূত হইলেন।

১৭৩৬ সংবতে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণমাসের সপ্তমদিবস মরুপঞ্জিকামতে একটি পবিত্র দিন। এই দিন রাঠোরবীরগণ আপন আপন সম্মান ও গৌরবরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 'এই ভীষণযুদ্ধের মধ্য হইতেও শিশু রাজকুমার অজিতের জীবনরক্ষা হইল। সর্দ্দারগণ তাঁহাকে একটি মিষ্টান্নের করণ্ডিকামধ্যে লুক্কায়িত করিয়া অজ্ঞাতভাবে এক বিশ্বস্ত মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু মুসলমান অতিযত্নে রাজ-কুমারকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেলেন। হিন্দুমুসলমানের ভীষণ সংঘর্ষকালে হিন্দুবিদ্বেষী আরঙ্গজেবের রাজ্যে বাস করিয়া একজন মুসলমান যে এক হিন্দুরাজকুমারের জীবনরক্ষা করিতে উদ্যত

হইল, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? রাজকুমারকে লইয়া মুসলমান নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে বীর দুর্গাদাস সর্দ্দারদিগকে সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। অজিতের জীবনদাতা দুর্গাদাস নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সুস্থশরীরে রাজকুমার অজিতকে মারবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অজিতও অকৃতজ্ঞ নহেন, তিনি দুর্গাদাসকৃত অসীম উপকারের বিষয় জীবনেও বিস্মৃত হন নাই; দুর্গাদাসকে তিনি পিতৃব্যের ন্যায় যথোচিত সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে কাকা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দুর্গাদাস তাঁহার নিকট যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ সেই সকল ভূসম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে ভোগ করিতেছেন।

যশোবন্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী অজিতকে লইয়া বিশ্বস্ত দুর্গাদাস কতিপয় অনুগত মিত্র সমভিব্যাহারে নিভৃত আর্ব্বুদগিরিপ্রদেশে যাত্রা করিলেন; তথায় একটি মঠমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া সতর্কতা সহকারে রাজকুমারকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। জনরব উঠিল, যশোবন্তের একটি পুত্র জীবিত আছেন; দুর্গাদাস কতিপয় সর্দ্দার সমভিব্যাহারে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। এই জনশ্রুতি শ্রবণমাত্র রাঠোরগণ রাজকুমারের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইল। দুর্গাদাসের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা আর্ব্বুদগিরির নিভৃত মঠে উপস্থিত হইল। দ্রুনার-সর্দ্দার তখন রাজকুমারকে "ধনী" (প্রভু) উপাধিতে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আপনাদিগের রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া রাঠোরগণ তাঁহাকে মারবার-সিংহাসনে অভিষেক করিবার অভিপ্রায়ে মহোৎসাহে জাতীয়বল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহাদিগকে ইন্দো নামক একটি প্রচণ্ডজাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। ইন্দোজাতি পূর্ব্বে মরুদেশে রাজত্ব করিত। ইহারা রাজপুত।—রাঠোর-বীরগণ কর্তৃক ইহারা নিজরাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়। রাজ্যচ্যুত হইয়া দীনভাবে কালাতিপাত করিয়াও ইহারা রাজ্যোদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সম্প্রতি সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাহারা সেই চিরপোষিত আশা পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অচিরেই তাহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। মুন্দরের প্রাচীরশিরে পুরীহরকুলের ধ্বজা পুনরায় সমুড্ডীন হইল। ভ্রষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া যখন ইন্দোগণ আমোদে মত্ত হইয়াছিল, সেই সময় অমরসিংহের পুত্র মহাবীর রত্ন যোধপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কথিত আছে, আরঙ্গজেবের উত্তেজনাতেই রত্ন এই চেষ্টায় উত্তেজিত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, রত্নের চেষ্টা সফল হয় নাই। যশোবন্তের বিশ্বস্ত সর্দ্দারগণ বালক অজিতের স্বত্বরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দোদিগকে মুন্দর হইতে বিতাড়িত করিলেন। রত্নও এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় নাগোরদুর্গে পলায়ন করিলেন। যে উদ্দেশ্যে আরঙ্গজেব রত্নকে যোধপুর অধিকার করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল। আরঙ্গজেব এখন স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিপুল সেনাদল লইয়া তিনি স্বয়ং মারবার-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যোধপুর আরঙ্গজেবের হস্তগত হইল। যবনসেনাগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লাগিল। মৈরতীয় দিদবান্, রোহিত প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরীও যোধপুরের দশা প্রাপ্ত হইল। দেববিগ্রহাদি যবনগণের পদদলিত হইতে লাগিল; দেবমন্দিরসমূহের চূড়ায় মুসলমানের ইসলামপতাকা সুশোভিত হইল। এইরূপ ঘোর অত্যাচার করিয়াও পাষণ্ড আরঙ্গজেবের প্রতিহিংসার শান্তি হইল না, তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির উপর "জিজিয়া" (মুণ্ডকর) স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে রাণা রাজসিংহের লেখনী হইতে এইরূপ তেজোগর্ভ পত্র বাহির হইয়াছিল, যে, রাজপুতগণের সাহায্যার্থ টাইবার খাঁ সপ্ততিসহস্র সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎপরে আরঙ্গজেব স্বয়ং অজমীরে গমন করেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার অভিলাষে মৈরতীয় সামন্তদল সমবেত হইয়া পুষ্কর অভিমুখে যাত্রা করেন। ভগবান্ বরাহদেবের মন্দির-সম্মুখে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৭৩৬ সংবতে ভাদ্রমাসে একাদশ দিবসে এই যুদ্ধস্থলে মৈরতীয়দিগকে হত্যা করা হয়। টাইবার ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মরধরের অধিবাসিগণ পর্ব্বতপ্রদেশে পলায়ন করিলেন। টাইবারের গতিরোধ করিবার জন্য রূপ ও কুম্ভ নামক দুই ভ্রাতা আপনাদিগের সেনাদল লইয়া গুরানামক স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। পঞ্চবিংশতিজন ভ্রাতার সহিত তাঁহারা উভয়ে সেই সংগ্রামে পতিত হইলেন। জলদজাল যেরূপ জগৎসংসারে বারিবর্ষণ করে, আরঙ্গজেবও সেইরূপ দেশের উপরে স্বীয় সেনাদল ঢালিয়া দিলেন। তিনি পাঁচদিবসমাত্র অজয়দুর্গে (অজমীরে) থাকিয়া চিতোর-বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। চিতোরের পতন হইল, বোধ হইল যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া মস্তকে পড়িল। রাঠোরগণ রাজকুমার অজিতকে রক্ষা করিয়া শিশোদীয় সৈন্যগণের অগ্রভাগ দলিত করিতে করিতে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। যবনগণের অত্যাচার-ভয়ে তাঁহারা রাজকুমারকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। সম্রাট্ দোবারির নিকট উপস্থিত হইলে কুম্ভ, উগ্রসেন ও উদো প্রভৃতি রাঠোরবীরগণ তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিলেন। আরঙ্গজেবের আক্রমণকালে আজিম চিতোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দুর্গাদাস ঝালোর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ অজমীরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ঝালোরক্ষেত্রে বিহারীর সাহায্যার্থ মকরা খাঁকে প্রেরণ করিলেন। দুর্গাদাস যুদ্ধসাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহ করিতে করিতে যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। আরঙ্গজেবের মস্তক গগন স্পর্শ করিল। দেশে কেবল একমাত্র মুসলমানধর্ম্ম থাকিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। রাজকুমার আক্‌বর টাইবার খাঁর নিকট প্রেরিত হইলেন। সর্ব্বত্র গৃহে গৃহে অগ্নি প্রদত্ত হইতে লাগিল, গৃহে গৃহে লুণ্ঠন আরম্ভ হইল, দেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল; বিভীষিকা বিজয়দর্পে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু কি হইবে, বিধিলিপি খণ্ডন করা কাহারও সাধ্য নহে। বিধাতার নির্ব্বন্ধে আজি ভারতবাসিগণকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইল। ইন্দোলগণ যেমন যোধপুর অধিকার করিলেন, অমনি চম্পাবৎগণ উদয়পুরে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া সকলের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন; মুরধরদেশের রাও উপাধিতে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। পুরীহরদিগের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিবেন, সম্রাটের মনে এই বাসনা ছিল, কিন্তু ১৭৬৬ সংবতে জ্যৈষ্ঠমাসের ত্রয়োদশ দিবসে এইরূপে সে বাসনা বিফল হইয়া গেল।

রাঠোরগণ আরাবল্লী পর্ব্বতে আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা সেই দুর্গম প্রদেশ হইতে বহির্গত হইতেন এবং মুসলমানদিগকে সংহার করিয়া তাহাদিগের মৃতদেহ কলসাকারে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতেন। * আরঙ্গজেব আদৌ শান্তিসুখভোগ করিতে পাইতেন না। রাঠোরদিগের স্বামিধর্ম্ম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাঁহারা নানারূপে আরঙ্গজেবকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন; একবার একদল ঝালোর আক্রমণ করিল, আবার একদল শিবানোর আক্রমণে ব্যাপৃত হইল। এইরূপে উত্যক্ত হইয়া সম্রাট্ রাণার সহিত সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সমস্ত সেনা মারবারে প্রেরণ করিলেন। অজিতকে আশ্রয়দান করাতে রাণা পুর্ব্বেই সম্রাটের বিষনয়নে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে আবার রাণা রাঠোরদিগের সাহায্যার্থ নিজ পুত্র ভীমকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।

---

* ধান আছড়াইয়া খামারে যে পুঞ্জীকৃত করা হয়, তাহার নাম কলস।

এই সময়ে ইন্দ্রভান ও দুর্গাদাস রাঠোরসৈন্য লইয়া গদবারে অবস্থান করিতেছিলেন। ভীমসিংহ আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন; এ দিকে রাজকুমার আক্‌বর ও টাইবার খাঁ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। নাদোলে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। শিশোদীয়গণ রাজপুতসেনার দক্ষিণবাহু রক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ হইল; সমরক্ষেত্রে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মিবারীদিগের সম্মুখভাগে থাকিয়া রাজকুমার ভীম রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি রাঠোরদিগের দুর্গস্বরূপ ছিলেন। মহান্ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রভান উদাবৎ-জৈতের সহিত রণস্থলে পতিত হইলেন। সেই দিন শোনিঙ্গ দুর্গাদাস বিস্ময়কর বীরত্ব ও রণকৌশল দেখাইয়াছিলেন। সেই পবিত্র দিবসে স্বদেশানুরাগী রাজভক্ত রাজপুতগণের স্বদেশের স্বাধীনতা ও নৃপতির গৌরবরক্ষার্থ বিপুলবিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া রাজকুমার আক্‌বরের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা কেন যে এই বীরজাতির উপর ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অত্যাচারের বিষয় ভাবিয়া তাঁহার মনে আজি দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি টাইবার খাঁর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন এবং পিতার নৃশংসাচরণের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখিতহৃদয়ে বলিলেন, "এরূপ সাহসিক ও বিশ্বস্ত সামন্তসম্প্রদায়কে মোগলের স্নেহবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্রাট্ ভাল কাজ করেন নাই।" অতঃপর রাজকুমার আক্‌বর দূতদ্বারা দুর্গাদাসকে বলিয়া পাঠাইলেন, রাজ্যে শান্তিস্থাপন করাই উচিত। তাঁহার সহিত একবার রাজপুতবৃন্দ সাক্ষাৎ করিলে তিনি পরম সন্তুষ্ট হন। দুর্গাদাস রাঠোরসর্দ্দারগণের নিকট আক্‌বরের প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন; কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইলেন না; কেহ বলিলেন, "কপটাচারী যবন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সকলের প্রাণনাশ করিবে।" কেহ কেহ বলিলেন, "ইহাতে হয় ত দুর্গাদাসের কিছু স্বার্থ থাকিতে পারে; নতুবা সন্ধির জন্য তিনি এত ব্যস্ত হইলেন কেন?" তাঁহাদিগকে ইতঃস্ততঃ করিতে দেখিয়া মহাতেজা দুর্গাদাস বলিয়া উঠিলেন, "সর্দ্দারগণ! কেন তোমরা বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া নানারূপ সন্দেহ করিতেছ? মনোমধ্যে ভয় ও সন্দেহ পোষণ করা কি বীরোচিত কার্য্য? রাঠোরের বাহু কি বলহীন হইয়াছে? শত্রুপক্ষ সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য যখন আপন ইচ্ছায় সাক্ষাৎ চাহিয়াছে, তখন আমরা যদি সাক্ষাৎ না করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অপবাদ রটনা করিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া একত্রে যবন-শিবিরে প্রবেশ করি। যদি যবনের কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে কি আমরা সকলে তাহা ব্যর্থ করিতে পারিব না? কেহ কখন মেঘমালাকে রোধ করিয়া রাখিতে শুনিয়াছ?" দুর্গদাসের গম্ভীরবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্দ্দারগণের সকল সন্দেহ দূর হইল. তাঁহারা রাজকুমার আক্‌বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পরের মনোভাব পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হইলে উভয়পক্ষ সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। আক্‌বরের মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধৃত হইলে সভাভঙ্গ হইল। তিনি স্বনামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করিলেন এবং সর্ব্বত্র পরিমাণ সকল স্থির করিয়া দিলেন। এই গাত্রদাহকারী সংবাদ অজমীরে আরঙ্গজেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহার শান্তিসুখ তিরোহিত হইল। দুর্গাদাস আক্‌বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি মনোবেদনায় নিজশ্মশ্রুরাজি উৎপাটিত করিতে লাগিলেন, রাঠোরগণ সকলেই আক্‌বরের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। দিল্লী সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল। গোবিন্দের কৃপায় আবার মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল।

আরঙ্গজেবের সিংহাসনচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইল; তিনি এক্ষণে বন্ধুবান্ধব ও

সহায়হীন হইয়া রাজপুতগণের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি শত্রুগণের স্বভাব বুঝিয়াছিলেন। বিপদে পড়িলে তিনি শঠতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন এবং সেই শঠতাই তাঁহাকে সেনাদলের ন্যায় সাহায্য করিত। উপস্থিত সঙ্কট হইতে এই শঠতাবলেই তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। মিবার ও মারবারের ইতিহাসে এই সকল বৃত্তান্তের বিভিন্নতা দেখা যায় বলিয়া আমরা নিম্নে শেষোক্ত রাজ্যের ইতিহাস হইতে এই বিবরণ যথাবর্ণিত উদ্ধৃত করিলাম।

অসংখ্য রাজপুত লইয়া আকবর অজমীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। "আরঙ্গজেব এই যাত্রার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া প্রস্তুত হইলে, আকবর টাইবার খাঁর হস্তে ভার অর্পণপূর্ব্বক রমণীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতশ্রবণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আমরা অদৃষ্টের দাস, এই অদৃষ্টের হস্তে আমরা ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করিয়া থাকি। টাইবার বিশ্বাসঘাতকতার কল্পনা করিতে লাগিলেন। তিনি গোপনে সংবাদ পাইলেন যে, আকবরকে সম্রাট্-হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে তিনি প্রভুর নিকট পুরস্কার পাইবেন। তিনি রাত্রিকালে গোপনে আরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাঠোরদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আমি আকবরের সহিত আপনাদিগের সন্ধিবন্ধনের গ্রন্থিস্বরূপ ছিলাম, কিন্তু যে বাঁধ জলরাশি পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, পিতা পুত্রে মিলিত হইয়া আবার এক হইয়াছেন। পরস্পরের পণ রক্ষিত হইয়াছে; বিবেচনা করিয়া আপনারা স্বদেশে প্রতিগমন করুন।" এই পত্রে নিজ মোহর অঙ্কিত করিয়া দূতদ্বারা রাঠোরদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নিজকার্য্যের পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায় আরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার যথাবিহিত পুরস্কার প্রদত্ত হইল। বাক্যোচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই সম্রাটের আদেশ প্রতিপালিত হইল। সম্রাটের হস্তস্থিত ভীষণ গদার প্রহারে বিশ্বাসঘাতককের আত্মা নরকে প্রেরিত হইল; রাত্রি দ্বিপ্রহরে দার্ব্বিশদূত রাঠোরশিবিরে উপস্থিত হইয়া সেই পত্র প্রদান করিল এবং বলিল যে, টাইবার খাঁ নিহত হইয়াছে। শিবিরমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাঠোরগণ সত্বর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকবরের শিবিরের এক ক্রোশ দূরে প্রস্থান করিলেন। রাজকুমারের সেনাদল এই আকস্মিক ভীতির কথা শুনিয়া বায়ুবিক্ষিপ্ত শুষ্ক ইক্ষুপত্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আকবর তখনও সেই গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের মোহে মত্ত হইয়া রহিলেন।

এই বিবরণ পাঠ করিয়া রাজপুতদিগকে হত্যাকারী বলিয়া স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে এবং বিশদরূপে বুঝা যায় যে, তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রায় সকল সময়েই কার্য্য করিয়া থাকেন। আকবরের শিবির তাঁহাদিগের সন্নিকটস্থ হইলেও এই সংবাদের সত্যাসত্য অনুসন্ধানে চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক একেবারে দশক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলেন। বার বার প্রতারিত হইয়া এই উপস্থিত বিপদ্সময়ে তাঁহারা কাহার উপর বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। রাঠোরগণ আকবরের শিবির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আকবরের নিজসৈন্যদল পলায়ন করিয়াছে এবং বিশ্বাসঘাতক টাইবারের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আকবরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক সহস্রের অনধিক ব্যক্তি সঙ্গে লইয়া তিনি পলায়িত সৈন্যগণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। পরদিবস আকবর পলায়িত সৈন্যগণের সন্ধান পাইলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজপুতগণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপুতগণের সন্ধান পাইয়া রাজকুমার আকবর আপনার ও পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের দয়া প্রার্থনা করিলেন।

রাজপুতগণের নিকট যাজ্ঞা কখনও নিষ্ফল হয় না, রাজপুত্রগণ আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মরুপ্রদেশের রাঠোরবীরগণ যেরূপে শরণাগত রাজকুমার আক্‌বরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কবি কর্ণিধন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও জীবন্তভাবে তাহার বর্ণন করিয়াছেন। শরণপ্রার্থী আক্‌বরকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, স্থির করিবার জন্য রাঠোরগণ মন্ত্রণাভবনে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব পদানুসারে আসনগ্রহণ করিলেন; উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভট্টকবি একে একে তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমা গান করিতে লাগিলেন। বিস্তর তর্ক বিতর্কের পর আশ্রয়প্রার্থী আক্‌বরকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করাই স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। চম্পাবৎ-সম্প্রদায়ের অগ্রণীর অনুজ জৈৎকে আক্‌বরের পরিবারবর্গের রক্ষাকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল। এই দিন রাঠোরকুলের জীবননাটকের যে অঙ্কের অভিনয় হইল, বীর দুর্গাদাস সেই অঙ্কের নায়ক। কর্ণিধন তাঁহার মহান্ চরিত্র অতিশয়োক্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

"এ ! মাতা পুত এসা জিন
যেসা দুর্গাদাস,
বন্দে মুদ্রা রোখিও
বিন থাম্বা আকাশ"

অর্থাৎ জননি ! এই দুর্গাদাসের ন্যায় পুত্র প্রসব করিও, যিনি মুদ্রের (মরুর) বাঁধ রক্ষা করিয়া স্তম্ভদ্বারা আকাশকে ধারণ করিলেন।

রাজপুতের আদর্শরূপে এই দুর্গাদাস যেরূপ সাহসী, সেইরূপ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারই অসীম বীরত্ব ও প্রতিভাবলে মারবাররাজ্য রক্ষিত হইয়াছিল, কেহ উহা বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারই বুদ্ধিপ্রভাবে রাজকুমারের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, তিনিই বিপুলবিক্রমবলে যুদ্ধক্ষেত্রে বিষম সঙ্কট হইতে তাঁহার উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই রাঠোরবীরকে আরঙ্গজেব যে ভয় করিতেন, তৎসম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যেটি অতি মনোরম, এই স্থানে সেই গল্পটির উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা আরঙ্গজেব তাঁহার দুইটি প্রধান শত্রু শিবজী ও দুর্গাদাসের দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিতে আদেশ করেন। একখানি চিত্রে অঙ্কিত হইল, শিবজী কৌচের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অপরখানিতে চিত্রিত হইল, দুর্গাদাস অশ্বপৃষ্ঠোপরি অবস্থিতি করিয়া নিজ ভল্লাগ্রে একখানি গোধম-রোটিকা বিদ্ধ করিয়া জনারকাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া উত্তাপিত করিতেছেন। চিত্রদর্শনে আরঙ্গজেব শিবজীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি এই লোকটাকে জালে আবদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু ঐ কুকুর আমার যমস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

কুমার আক্‌বরের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গাদাস নিজ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজ্যের পশ্চিম সীমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন;—ভাবিলেন, লুনীতীরস্থ বালীয়াড়ীর মধ্যে তাঁহারা সম্রাট্‌কে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু চতুর সম্রাট্ অন্য কৌশল অবলম্বন করিয়া দুর্গাদাসকে প্রলোভনে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গাদাসকে অষ্টসহস্র স্বর্ণমুদ্রা (মোহর) পাঠাইয়া দিলেন। রাজপুতবীর তৎক্ষণাৎ সেই মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আক্‌বরের প্রয়োজনমত ব্যয় করিতে লাগিলেন। দুর্গাদাসের এই ত্যাগস্বীকার দেখিয়া রাজকুমার আক্‌বর অতীব প্রীত হইলেন এবং প্রাপ্ত অর্থের কিয়দংশ তাঁহার সর্দ্দার ও সেনানীগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। উদ্দেশ্য বিফল হইল দেখিয়া আরঙ্গজেব স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে একদল সেনা পাঠাইলেন। পিতৃহস্তে পতিত হইলে

অনুগ্রহলাভের কোন আশা নাই ভাবিয়া রাজকুমার পিতা হইতে দূরে অবস্থিতি করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। দুর্গাদাস তাঁহাকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই, আপনার জীবনরক্ষার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম।" অগ্রজ শোনিঙ্গের হস্তে শিশু অজিতের রক্ষণভার অর্পণ করিয়া এক সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল প্রসিদ্ধ রাজপুতবীর আক্‌বরের শরীররক্ষক ছিলেন, কবি কর্ণিদন তাঁহাদিগের নাম ও বংশগৌরব বর্ণন করিয়া অসীমকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেই রাজপুতবীরদিগের মধ্যে চম্পাবৎগণেরই সংখ্যা অধিক ছিল। ইহা ব্যতীত যোধ ও মৈরতীয় প্রভৃতি দেশীয় এবং যদু, চোহান, ভট্টি, দেবর, শোণিগুরু ও সমঙ্গলিয়া প্রভৃতি বিদেশীয় সর্দ্দারগণ দুর্গাদাসের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

সম্রাট্ তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রাঠোরদিগকে পরিবেষ্টন করিল। দুর্গাদাস এক সহস্র নির্ব্বাচিত সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিলেন ঝালোরে উপস্থিত হইয়া আরঙ্গজেব বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন, দুর্গাদাস ঝালোরে আসেন নাই। তিনি গুর্জ্জর দক্ষিণে ও চপ্পন বামে রাখিয়া রাজকুমারসহ নর্ম্মদাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া আরঙ্গজেব নিজ ধর্ম্মের বিষয় বিস্মৃত হইলেন, "কোরাণ লইয়া আমার মাথা হইবে" বলিয়া সেই ধর্ম্মপুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ক্রোধান্ধ আরঙ্গজেব আজিমকে উদয়পুর জয় করিতে আদেশ দিলেন। আরও বলিলেন, অন্য উদ্দেশ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাঠোরকুল নির্ম্মূল করিয়া নিজ দুরাচার ভ্রাতাকে যেন তিনি হস্তগত করেন। প্রভঞ্জনবলে জ্যোৎস্নাপ্রতিরোধক জলদজাল যেরূপ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ কামন্দদেবের বীরানুষ্ঠান মিবারের সকল ক্লেশ বিদূরিত করিল। অজমীরের যুদ্ধযাত্রার দশদিবস পরে যোধপুর ও অজমীরে স্বীয় সৈন্য রাখিয়া সম্রাট্ স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। দুর্গাদাসের মহিমাগুণে পঙ্গপাল ক্ষেত্রভূমি পরিত্যাগ করিয়া গেল। *দুর্গা বাসুকি এবং আক্‌বর মন্দরগিরি। এতদুভয়ের সাহায্যে আরঙ্গরূপ সমুদ্র মথিত করিয়া চতুর্দ্দশটি রত্ন উদ্ধৃত হইয়াছিল। সেই চতুর্দ্দশটি রত্নের মধ্যে আমরা লক্ষ্মী ও ধন্বন্তরিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

খীচিবংশীয় শিবসিংহ ও মুকুন্দ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে হইতে পারে? আর্ব্বুদপর্ব্বতপ্রদেশে শিশু অজিতের সংগোপনভাবে অবস্থানকালে ইঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল ইঁহাদিগেরই দুই জন ও বিশ্বস্ত শোণিগুরুর নিকট দুর্গাদাস তাঁহার নিভৃত আবাসের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মারবারের নবকোটের সমস্ত সামন্তই জানিতেন যে, অজিত লুক্কায়িত ছিলেন, কিন্তু কোথায় এবং কাহার আশ্রয়ে, তাহা কেহই বিদিত ছিলেন না। কেহ ভাবিয়াছিলেন তিনি যশল্মীরে, কেহ ভাবিয়াছিলেন বিক্রমপুরে, কেহ ভাবিয়াছিলেন শিরোহীতে লুক্কায়িত আছে। সামন্তগণের অষ্টবিভাগ তাঁহাদিগের নির্ব্বাসনকাল প্রকৃত বীরের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বীরানুষ্ঠানের জন্য রাও রাজা ও রাণাগণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সকলেই সমভাবে ধ্বংসজালে জড়িত হইয়াছিল। মরধরের নয় সহস্র এবং মিবারের দশ সহস্র অধিনগরে আদৌ জনমানবের সম্পর্ক ছিল না। ইনায়েৎ খাঁ দশ সহস্র সৈন্যসহ যোধপুররক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। চম্পাবৎ-সর্দ্দার মরুপ্রদেশে সুমেরু সদৃশ অটল; দুর্গাদাসভ্রাতা শোনিঙ্গও নির্ভীক। কর্ণাট ক্ষেমকর্ণ, যোধবংশীয় সুবল, মাহিতি বিজয়মল, সুজোৎ জৈৎমল, কর্ণোট কেশরী এবং যোধবংশীয় শিবদাস ও ভীমনামক ভ্রাতৃদ্বয় স্ব স্ব

সেনাদল সংগ্রহ করিয়া যখন শুনিলেন যে, সম্রাট্ অজমীরের চারিক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যোধপুরমধ্যে খাঁ সাহেবকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এ দিকে খাঁর উদ্ধারার্থ বিংশতি সহস্র মোগলসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। যোধপুরদ্বারে আর একটি ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। সেই যুদ্ধে যদুবংশীয় কেশরী এবং অন্যান্য অনেক সর্দ্দার নিহত হয়। শত্রুপক্ষের অনেকেও এই যুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছিল। ১৭৩৭ সংবতে আষাঢ়মাসের ৯ম দিবসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

শোনিঙ্গ চারিদিকে স্বীয় অসি ও আগ্নেয়াস্ত্র চালিত করিলেন। আরঙ্গ অগ্রসর বা পশ্চাদপসরণ করিতে পারিলেন না। গন্ধমূষিক ধরিয়া সর্প যেমন বিষভয়ে ত্যাগ করিলে অন্ধ হইবার আশঙ্কায় তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না, রাঠোরদিগের আক্রমণে আরঙ্গজেবের সেইরূপ দশা ঘটিল। তাঁহাকে একস্থানেই দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। হরনট ও কর্ণসিংহ সুজাত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং অসুরগণের পশ্চাদ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর এক ভয়াবহ সংগ্রাম সংঘটিত হইল। সেই যুদ্ধে অসুরগণের সেনানায়ক নিহত হইল, হরনট, কর্ণ এবং জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলে হৃদয়শোণিত দিয়া রণস্থল রঞ্জিত করিলেন। ১৭৩৭ অব্দের শেষ এবং ১৭৩৮ সংবতের প্রারম্ভ হইতে সুজোৎপুবীয় সংবৎ এই শব্দে প্রচলিত হয়। এই সময়ে তরবারি ও মহামারী একত্র হইয়া রাজ্য শূন্য করিয়া ফেলিল।

সমরক্ষেত্রে শোনিঙ্গ রুদ্রের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরানুষ্ঠানে আগ্রা ও দিল্লী বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি আরঙ্গকে শুক্লপক্ষায় প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণকান্তি দেখিলেন। সন্ধিপ্রার্থনা করিয়া সম্রাট্ শোনিঙ্গের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি অজিতকে সাতহাজারার মনসবপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং অভিলষিত সম্মান-স্বরূপ তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃদিগকে অজমীর প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এতদ্ব্যতীত সন্ধিপত্রে লিখিত হইল, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া এই সন্ধিপত্রের অনুমোদনরূপ ইহাতে পাঞ্জা অঙ্কিত হইল। দেওয়ান আস্‌সাদ খাঁ মধ্যস্থস্বরূপ সেই সন্ধিপত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী আরেমেদি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন যে,সেই সন্ধিপত্রের মত যথাযথ রক্ষিত হইবে। আরঙ্গজেব আক্‌বরের চিন্তা হইতে একদণ্ড বিরত থাকিতে পারিতেন না। সন্ধিবন্ধন শেষ হইবামাত্র তিনি দক্ষিণাবর্ত্ত-যাত্রা করিলেন। আস্‌সাদ খাঁ অজমীরে এবং শোনিঙ্গ মৈরতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শোনিঙ্গ আরঙ্গজেবের কণ্টকস্বরূপ। সেই কণ্টক উদ্ধারার্থ তিনি ব্রাহ্মণগণকে উৎকোচ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ হোমকুণ্ডে মরিচ নিক্ষেপ করিয়া শোনিঙ্গকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন। আরঙ্গের মারণমন্ত্রবলে সন্ধিবন্ধনের পরদিবস ১৭৩৮ সংবতে আশ্বিনমাসের ষষ্ঠ দিবসে শোনিঙ্গের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল।

আস্‌সাদ খাঁ সম্রাটের নিকট শোনিঙ্গের মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করেন, তাঁহার কণ্টক বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার ভয়ের কারণ তিরোহিত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সন্ধিপত্র হইতে পাঞ্জা উঠাইয়া লইলেন এবং জয়োল্লাসে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। শোনিঙ্গের মৃত্যুতে দেশ শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণপুত্র মৈরতীয় মুকুন্দসিংহ মাতৃভূমির মঙ্গলসাধন জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নিজ "মনসব" পরিত্যাগ করিলেন। মৈরতের সন্নিকটে আস্‌সাদ খাঁর সৈন্যগণের সহিত একটি তুমুল সংগ্রাম বাধিল। এই যুদ্ধে বিটুলদাসের পুত্র অজিত সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন. প্রত্যেক গোত্রের বহুসংখ্যক বীরের সহিত তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। ইহাতে

অসুরগণের আনন্দ বাড়িল, কিন্তু রাজপুতদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। ১৭৩৮ সংবতে চান্দ্র-কার্ত্তিকের দ্বিতীয়দিবসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

রাজকুমার অজিত আস্‌দাদ খাঁর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ইনায়েৎ যোধপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান সমাধিসকল দৃষ্টে প্রতীতি জন্মে যে, তাঁহাদিগের সৈন্যগণ দেশের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চণ্ডবলের অধীশ্বর কুম্পাবৎ শম্ভু উদয়সিংহ বকৃশী এবং দুর্গাদাসের পুত্র তেজসিংহের সহিত রাঠোরসৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমার আক্‌বরকে দাক্ষিণাত্যে নিরাপদে রক্ষিত করিয়া ফতেসিংহ ও রামসিংহ তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক রাজপুতবীর তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিলেন। ইঁহারা মিবার পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িলেন এবং পুরুমণ্ডল বিধ্বস্ত করিয়া তত্রত্য শাসনকর্ত্তা কাসিম খাঁকে নিহত করিলেন।

এই সকল ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ হেতু সম্রাটের সেনাবল ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদিগকে সর্ব্বদা ভীতচিত্তে কালাতিপাত করিতে হইত। মরুস্থলীর বীরকুলও নির্ম্মূলপ্রায় দেখিয়া রাঠোরগণ পুনর্ব্বার আরাবল্লীপর্ব্বতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সেই পর্ব্বতপ্রদেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া তাহারা সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই শত্রুগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেন। এইরূপে একবার তাঁহারা জয়তারণস্থ সেনাদলের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে দলিত ও বিতাড়িত করেন। ১৭৩৯ সংবতে রাঠোরগণও গিরি আশ্রয়ে পলায়ন করিলেন। সেই সময়ে চম্পাবৎবংশীয় বিজয়সিংহ সুজোতদুর্গ বিধ্বস্ত করেন। তৎকালে রামসিংহ যোধাবৎ সৈন্য লইয়া উত্তরপ্রদেশে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ঐ যোধাবৎ-সৈন্যগণ উদয়ভান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া চেরাইশের শাসনকর্ত্তা মির্জ্জা নুর আলীকে আক্রমণ করে। তিন ঘণ্টা কাল যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে যবনদিগের মৃতশরীর রণস্থলে স্তূপীকৃত হয়।

জয়তারণসংগ্রাম শেষ হইলে চম্পাবৎ উদয়সিংহ ও মৈরতীয় মাকমসিংহ গুর্জ্জর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্ষীরালু নগরে প্রবেশ করিলে গুর্জ্জরের হাকিম সৈয়দ মহম্মদ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাদিগের অনুসরণপূর্ব্বক রৈণপুরের পর্ব্বতপ্রদেশে তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করেন। সমস্ত রজনী তাঁহারা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকেন। প্রভাত হইলে তাঁহাদিগের তরবারি অজস্র শোণিতপাত করিল। কর্ণ কেশরী ও গোকুলদাস ভট্টি সমস্ত দেওয়ানা কর্ম্মচারীর সহিত রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন। এই দিবস রামসিংহও নিজ জীবনবিসর্জ্জন করিলেন। সৈন্যসামন্ত হারাইয়া অসুরগণ রশ্মি সংযত করিল। এই ১৭৩৯ সংবতে পলীও যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। পরে নুর আলীর সহিত সংহারকার্য্যও আরম্ভ হইয়াছিল। তিনশত রাঠোর সম্রাটের পাঁচশত সৈন্যের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ভীষণ সংগ্রামে সম্রাটের সেনাপতি আফজল খাঁ রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। বীরবল্লই যবনদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়িত করিয়াছিলেন। উদয় সুজোতে সিন্ধিদিগকে আক্রমণ করেন। বৈশাখ মাসে মৈরতীয় মাকমসিংহ মৈরতাস্থিত সম্রাট্‌সেনা আক্রমণপূর্ব্বক আলীর প্রাণবিনাশ করিয়া যবনসেনাগণকে দূরীকৃত করিয়া দিলেন।

অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ ও অসংখ্য নরহত্যার সহিত ১৭৩৯ সংবৎ অতীত হইল। রাঠোরবীরগণ যে স্বদেশের মঙ্গলসাধন জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই গুলিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। যে সকল রাজপুতবীর যুদ্ধে নিহত হইলেন, তাঁহাদিগের স্থান আর কিছুতেই পরিপূর্ণ হইল না। কিন্তু যবনসেনা

আবার তদ্দণ্ডেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। এই বৎসর যশল্মীরের ভট্টিগণ সম্মানগৌরব-রক্ষার্থ সংগ্রামলিপ্ত রাঠোরদিগের সহায়তা করিতে আসিয়া সমরক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

১৭৭০ সংবতে আজিম ও আসদাদ খাঁ দক্ষিণাবর্ত্তে সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং ইনায়েৎ খাঁ অজমীরের শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে এই আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল যে, বর্ষাসমাগমেও যেন তিনি মারবারযুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত না হন। মৈরবারকে নিরাপদ্ ভাবিয়া রাঠোরগণ সপরিবারে তন্মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। পল্লী, সুজোত, গদবার প্রভৃতি কয়েকটি নগর ও জনপদ সম্মিলিত যোধ ও চম্পাবৎগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিল। পার্ব্বত্যপ্রদেশে লুক্কায়িত রাঠোরদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশে ইনায়েৎ খাঁর একাদশ সহস্র রণবিশারদ সেনা প্রেরিত হইল। খাজা শা নামক এক মুসলমান সেনাপতি প্রাচীন মুন্দরনগর অধিকার করিয়াছিলেন। ভট্টিগণ এক্ষণে সেই নগর আক্রমণ করিয়া তথা হইতে যবনসেনাকণ্টক দূর করিয়া দিলেন। কাবী নামক স্থানে বৈশাখমাসে একটি ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে রামসিংহ ও সামন্তসিংহ নামধেয় দুইটি ভট্টিনাথ সহস্র মোগলসেনার প্রাণ সংহার করিয়া দুই শত সৈনিকসহ সমরক্ষেত্রে শায়িত হন। অজুর্নসিংহ, কমলোট ও কুম্পাবৎদিগকে লইয়া লুনীতীরস্থ যবনদিগের প্রাণবিনাশ করিতে লাগিলেন। মাধব নিজ মৈরতীয় সেনা সমভিব্যাহারে স্বীয় পিতৃকুলের আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া যবনদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। এই উৎপীড়নে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া যবনসেনাপতি দস্তর আলী নিজ সেনাদল সহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মৈরতীয়গণ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যবন-সেনাপতি তাঁহাদিগের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলেন এবং সন্ধিবন্ধনার্থ উভয়পক্ষ একত্র সম্মিলিত হইলে বিশ্বাসঘাতক যবন মৈরতীয়দিগের অগ্রণীকে গুপ্তভাবে হত্যা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে দক্ষিণাবর্ত্তে শাহা পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন।

১৭৭১ সংবৎ উপস্থিত হইল, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের বিরাম নাই; বিভীষিকারও শান্তি নাই। সুজনসিংহ রাঠোরসেনা লইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লাক্ষা চম্পাবৎ ও কেশর কুম্পাবৎ ভট্টিও চোহানদিগের সাহায্যে যোধপুরস্থ যবনদিগের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিলেন। সুজনসিংহ নিহত হইলে ভট্টকবি সংগ্রামসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বজাতীয় ভ্রাতৃদলের সহিত সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিলেন। সংগ্রাম ভট্টকবির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। রাঠোরগণ সদলে তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা শিবাঞ্চা আক্রমণপূর্ব্বক সেই নগর এবং ভালোত্র ও পঞ্চভদ্রের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। যবনসেনা নগরমধ্যে অবরুদ্ধ থাকাতে ইহাদের সাহায্যার্থ আসিতে পারিল না। সূর্য্য অস্তমিত হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মরুস্থলীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হইল, দুর্গগুলি অসুরগণের অধিকারে থাকিল; জনস্থানভূভাগ অজিতের জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইল, উদয়ভান স্বীয় যোধাবৎ সৈন্যদলের সহিত ভদ্রার্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শত্রুদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদের কামান ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। যোধপুরস্থ যবনসৈনিকগণ জয়লব্ধ দ্রব্যজাত পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিল না, যোধাবৎগণই জয়ের উপর জয়লাভ করিল।

পুরদিল খাঁ শিবানো এবং নাহর খাঁ মিরাতী ও কুনারী অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে চম্পাবৎগণ মকুলসর নামক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। নুর আলী আশানীকুলের দুইটি যুবতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া তাঁহাদিগের প্রতিশোধ-পিপাসা

দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। রত্ন পুরদিল খাঁকে আক্রমণ করিলেন। পুরদিল খাঁ ছয়শত সৈন্য সহ নিহত হইলেন। এই দিন চৈত্র মাসের নবম দিবসে একশতমাত্র রাঠোরসৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণমাত্র মির্জ্জা আশানীরমণীদ্বয়কে লইয়া তোড়ানগরে পলায়ন করিলেন এবং কুচলে উপস্থিত হইয়া শিবিরস্থাপন করিলেন। ঐশকর্ণের পুত্র সুবলসিংহ এই সংবাদ পাইয়া অহিফেনসেবনাস্তর মির্জ্জার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সেনাপতি মির্জ্জা স্তম্ভস্বরূপ বীরগণে পরিবেষ্টিত থাকিলেও সুবলসিংহের তরবারি তাঁহার হৃদয় ভেদ করিল। এদিকে ভট্টিও খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া রণস্থলে পতিত হইলেন। সেইসময় পথসকল দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল. যবনদিগের খানা সকলও বৃহৎ প্রণালীরূপে পরিণত হইয়াছিল।

১৭৪২ সংবতের প্রারম্ভে লাক্ষাবৎ ও আশাবৎগণ সম্বরে আসিয়া যবন-সেনাদল উৎসাদিত করিলেন। সেই সময়ে অন্যান্য সামন্তগণ গদবার হইতে অজমীরের তোরণ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলেন। মৈরতাক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে রাঠোরগণ পরাস্ত হইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রতিজিঘাংসা-বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সংগ্রামসিংহ যোধপুরের উপনগরসকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা ঝালোর আক্রমণ করিল। বিহারী সহায়সম্বলহীন হইয়া তাহাদিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ধর্ম্মের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত রহিল। এইরূপে ১৭৪২ সংবতের পরিসমাপ্তি হইল।

অষ্টম অধ্যায়

সর্দ্দারগণের রাজদর্শন, আরঙ্গজেবের ভয়, রূপনৃপতি, পুরমণ্ডল-বিপ্লব, হারনাজের মৃত্যু, সেফি খাঁর পরাভব, অমরসিংহের বিদ্রোহ, আরঙ্গজেবের সন্ধি-প্রার্থনা, বিজয়পুরকাণ্ড, অজিতের বিবাহ, অজিতের রাজ্যলাভ, হিন্দুজাতির দুর্দ্দশা, অজিতের পুত্রলাভ, অভয়সিংহের জন্মপত্রিকা, ক্রণার যুদ্ধ, আরঙ্গজেবের মৃত্যু, মুসলমানের দুর্গতি, অজমীরে সিংহাসনলাভ, আগার যুদ্ধ, যোধপুর আক্রমণ, সম্বর-যুদ্ধ, অজিতের জয়লাভ, বিকানীর আক্রমণ, অজিতের তীর্থযাত্রা।

মুসলমানদিগের সহিত রাঠোরবীরগণ মহাসংগ্রামে সংলিপ্ত। এ দিকে নিভৃত গিরিকন্দরে রাজকুমার অজিতসিংহ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন। তিনিই রাঠোরকুলের ভাবী আশা-ভরসার একমাত্র আস্পদ। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে রাঠোরবীরগণ এ যাবৎ রাজদর্শন করিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৪৩ সংবতের প্রারম্ভেই চম্পাবৎ, কুম্পাবৎ, উদাবৎ, মৈরতীয়, যোধ, করমসোট ও মরুভূমির অন্যান্য সর্দ্দারেরা রাজদর্শনার্থ একান্ত সমুৎসুক হইলেন। তাঁহারা এত অধীর হইয়া উঠিলেন যে, রাজদর্শন না করিয়া কেহ পানভোজন করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। অগত্যা খীচিবংশীয় মুকুন্দ সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া ১৭৪৩ সংবতের চৈত্রমাসের শেষদিবসে আবুগিরিকন্দরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোটাপতি হাররাজ দুর্জ্জনশালও দুই সহস্র অশ্বারোহী সহ তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।

শুভক্ষণে সকলে রাজদর্শন করিলেন। যে সমস্ত ভূপতি, সামন্তনৃপতি ও সর্দ্দারগণ উপস্থিত ছিলেন, রাজদর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়কমল আনন্দে বিকসিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বাগ্রে হাররাজ নবীনভূপতি অজিতসিংহকে অভিবাদন করেন। অতঃপর সকলেই পর্য্যায়ক্রমে অভিবাদন করিয়া স্বর্ণ, মুক্তা, মণি ও অশ্বাদি উপহার প্রদান করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া যবনসেনাপতি দুরাচার ইনায়েৎ খাঁ সম্রাট্-সদনে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! রাজা ব্যতিরেকেও যখন রাজপুতগণ দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিল, তখন রাজা পাইয়া যে তাহারা এখন দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অধিকতর সেনাবল সংগ্রহ করিয়া এখন তাহাদিগের অভিমুখে যাত্রা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

এ দিকে রাঠোরবীরেরা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে অজিতকে লইয়া আহোরে উপস্থিত হইলেন। আহোররাজ যথাবিধি বাধু বিধান * সম্পাদনপূর্ব্বক অজিতকে কতকগুলি দ্রুতগামী তুরঙ্গ উপহার প্রদান করিলেন। অতঃপর সেই স্থানেই টিকাডোরের আয়োজন হইল। শিশু রাজকুমার অজিতসিংহ আহোরদুর্গ হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রায়পুর, ভিলার, বারুন্দ, আশোব, লোবৈরা, বিয়া, কেবনশির প্রভৃতি স্থান করগত করিলেন। সর্ব্বত্রই সামন্ত সর্দ্দারগণ বিবিধোপচারে অজিতের সৎকার করিয়া নানাবিধ উপহার প্রদান করিলেন। তৎপরে কালুনগরে উপস্থিত হইবামাত্র পাতুরাও সাদর সম্ভ্রমে অজিতকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত সামন্ত-সর্দ্দারগণ নবীন ভূপতির পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হইলেন। ১৭৪৪ সংবতের ১০ই ভাদ্র অজিত পোকপূর্ণপুরাতে গমন করিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে দুর্গাদাস আসিয়া সেই সময় তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। রাঠোরদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহাদিগের বিক্রম, তেজ, সাহস ও উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

রাজপুতগণের নবীভূত সেনাদল দেখিয়া ইনায়েৎ খাঁ ভীত হইয়া পড়িলেন। অচিরে তিনিও বিশাল সেনাসজ্জার আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে সেই বিশালবাহিনীর বলাবল পরীক্ষা করিতে হইল না; কালের কঠোর হস্তে পড়িয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইল। যবন সম্রাট্ সেই সময় একটি কূট কৌশল অবলম্বন করিলেন। মহম্মদ শা নামক এক ব্যক্তিকে তিনি যশোবন্তের পুত্র পরিচয় দিয়া তাঁহাকে মারবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু অজিতকে পাঁচ হাজারী মনসবপদ-গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বলিলেন। কিন্তু অপ-ভূপতি মহম্মদ শার ভাগ্যে সে সম্মান ঘটিল না, যোধপুরযাত্রাকালে পথিমধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

ইনায়েৎ খাঁর মৃত্যুর পর সুজৈৎ খাঁ মারবারের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হইলেন। হারগণের সাহায্যে রাঠোরবীরেরা শত্রুকবল হইতে মরুভূমি উদ্ধার করিয়া অপর অপর স্থানের মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন; মালপুর ও পুরমণ্ডলবাসী যবনগণ রাজপুতকরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। পুরমণ্ডলযুদ্ধেই একটি গোলকাঘাতে হাররাজের প্রাণবিয়োগ হয়, বিজয়ী রাজপুতগণ এই স্থানে যুদ্ধে পণস্বরূপ অষ্টসহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। ১৭৪৪ সংবতে এইরূপে নানাস্থান জয় করিয়া রাজপুতগণ মারবারে প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে দেওয়ান ও পুরোহিতেরাও রাজ্যমধ্যে বহুল অর্থসংগ্রহ করিলেন; অজিতের কোষাগার অতুলধনরত্নে পরিপূর্ণ হইল।

---

* কোন ব্যক্তি মুক্তাপূর্ণ একখানি পিত্তলপাত্র লইয়া নবীন ভূপতির মস্তকোপরি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করে। ইহারই নাম বাধু-বিধান।

১৭৪৪ সংবৎ অতীত; ১৭৪৫ সংবৎ উপস্থিত। সুজেৎ খাঁ মারবারপ্রদেশ ইজারা দিতে প্রস্তাব করিয়া কহিলেন, পণ্যদ্রব্য হইতে যে শুল্ক আদায় হইবে, তাহার একচতুর্থাংশ তিনি রাঠোরদিগকে প্রদান করিবেন। রাঠোরেরা ইহাতে অসম্মত হইলেন না। অতঃপর সুজেৎ খাঁ দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রৈণবল নামক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র যোধ হরনট তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যাদিসহ সহচারিণী মুসলমানমহিলাগণকে হরণ করিলেন। অগত্যা সুজেৎ খাঁকে কচ্ছবাহদিগের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার এইরূপ বিপদ্-সংবাদ পাইয়া উদ্ধার করিবার জন্য সুজাবেগ অজমীর হইতে বহির্গত হইলেন; কিন্তু তাঁহারও দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। চম্পাবৎ মুকুন্দদাস পথিমধ্যে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইলেন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় ১৭৪৬ সংবৎ অতীত হইল। ১৭৪৭ সংবতে সেফি খাঁ অজমীরে হাকিমরূপে বাস করিতেছিলেন। দুর্গাদাস তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। একটি গিরিবর্ত্মের নিকট এই যুদ্ধ ঘটে; অচিরেই সম্রাটের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল। খাঁ সাহেবকে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, দুর্গাদাসকে পরাজয় করিতে পারিলে তাঁহার পদোন্নতি হইবে, নচেৎ সুজেৎ খাঁ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। অধিকন্তু ঘৃণাপ্রদর্শনসূচক বালা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে।

সেফি খাঁ বিষম সঙ্কটাপন্ন। কূটনীতি অবলম্বন না করিলে এ বিপদে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া তিনি রাঠোর-রাজকুমারের নিকট এই মর্ম্মে একখানি প্রতারণাপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিলেন যে, সম্রাট্ আপনার পিতৃরাজ্য আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, আমার নিকট সনন্দ-পত্র আছে। সত্বর আপনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই সনন্দ গ্রহণ করুন। পত্র পাইবামাত্র বিংশতিসহস্র সৈন্যসহ অজিত অজমীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালার নিকট উপস্থিত হইয়া আর অগ্রসর হইলেন না; খাঁ সাহেবের অভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মুকুন্দচম্পাবৎকে গুপ্তচরস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। মুকুন্দ প্রত্যাগত হইলেই অজিৎ প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিলেন। তথাপি তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্র ভীত হইল না; তৎক্ষণাৎ তিনি সদলে মহাবিক্রমে অজয়দুর্গ আক্রমণ করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা সেফি খাঁ তাঁহার শরণ গ্রহণপূর্ব্বক কতকগুলি অশ্ব ও ধনরত্নাদি সমর্পণ করিয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিলেন।

১৭৪৮ সংবতে মিবারে মহান্ অন্তর্বিপ্লবাগ্নি সমুত্থিত হয়। পিতা জয়সিংহের বিরুদ্ধে তৎপুত্র কুমার অমর অস্ত্রধারণ করেন। রাঠোরবীরগণ ও মৈরতীয়গণের সাহায্যে জয়সিংহ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে অজিত রাণার সাহায্যার্থ দুর্গাদাস ও ভগবান্‌কে প্রেরণ করেন। কিন্তু কাহাকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। বিদেশীয় মধ্যস্থগণের সাহায্যে পিতা-পুত্রের বিবাদ-ভঞ্জন হয়। মিবার ইতিবৃত্তে এ সকল বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

অজিতকে মহাবলে বলীয়ান্ দেখিয়া সম্রাট্ আরঙ্গজেবের হৃদয় ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে আকবরের একটি কন্যা দুর্গাদাসের আশ্রয়ে ছিল। অজিতকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া সম্রাট্ সেই যবনকন্যার সম্মানসম্ভ্রমের জন্য নানারূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। রাঠোরগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল। উভয়পক্ষের সন্ধিবন্ধনের কথা-বার্ত্তা হইতে হইতে ১৭৪৯ সংবৎ অতীত হইল।

১৭৫০ সংবতে যোধপুর, ঝালোর ও শিবানোর যবন-শাসনকর্ত্তৃগণ নিজ নিজ সৈন্যদলসহ অজিতকে আক্রমণ করিলেন। অজিতকে পূর্ব্ববৎ দুর্দ্দশার ক্রোড়ে শয়ন করিতে হইল, তিনি গিরি-কন্দরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। বল্লবংশীয় অপেক্ষা মুসলমানসেনার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু অচিরেই

তাঁহাকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। এই সময়ে মুসলমান সেনা একটি উৎকৃষ্ট বৃষ হত্যা করে. সেই সূত্রে মুকুন্দশির নামক স্থানে মুকুন্দদাসের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মুকুন্দদাস জয়লাভ করেন; সৈন্যসামন্তসহ চক্রের হাকিম তাঁহার করে বন্দী হন।

১৭৫১ সংবতে হিন্দুমুসলমানযুদ্ধে যবনেরা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে রাঠোরগণের অধীনত্ব স্বীকার করিতে হইল। কেহ কেহ চৌহ ও কেহ কেহ কর দিয়া রাঠোরগণের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। এই সময়ে অজিত বিজয়পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাসিম খাঁ ও সম্বর খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অচিরেই দুর্গাদাসের পুত্রের হস্তে তাহাদিগকে সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতে হইল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল। অজিতের বয়সের সহিত রাঠোরবংশের আশা-ভরসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ দিকে দুর্গাদাসের আশ্রয়ে আকবরের কন্যাও ক্রমে ক্রমে যত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সম্রাটের হৃদয় তত চিন্তা-তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকিল। অবশেষে যোধপুরের হাকিম সুজৈৎ খাঁকে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, সহস্র ত্যাগস্বীকার করিয়াও যাহাতে আমার সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা হয়, তাহা করিও।

গজসিংহ মিবারের রাণার কনিষ্ঠভ্রাতা। গজসিংহের একটি রূপবতী কন্যা ছিল। অজিতের হস্তে সেই কন্যাসম্প্রদানের অভিলাষে গজসিংহ সম্বন্ধের নিদর্শনস্বরূপ নারিকেলফল এবং দুইটি সজ্জিত হস্তী ও দশটি ঘোটক প্রেরণ করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসে শিশোদীয়কুমারের সহিত রাঠোররাজকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। ঐ বৎসর আষাঢ়মাসে দেবলনগরে অজিত আর একটি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

আকবরের কন্যা সুলতানী দুর্গাদাসের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। কিরূপে তাহার মানসম্ভ্রম রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় সম্রাট্ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে আকবরকুমারী সুলতানীকে প্রত্যর্পণ করিয়া অজিত পিতৃসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। দুর্গাদাস মধ্যস্থ হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। দুর্গাদাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ পঞ্চসহস্রের সেনাপতিপদে বরণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু দুর্গাদাস তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার মাতৃভূমি ঝালোর, শিবাঞ্চি, সঞ্চোর ও থিরাৎ এই কয়টি স্থান প্রত্যর্পণ করুন।" দুর্গাদাস যেরূপ যত্ন ও সম্মান-সম্ভ্রমের সহিত সুলতানীকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অবগত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে তদীয় প্রার্থনামত সমস্ত স্থান প্রত্যর্পণ করিলেন।

অতঃপর ১৭৫৬ সংবৎ পর্য্যন্ত মারবারে কোন বর্ণনযোগ্য ঘটনা উদ্ভূত হয় নাই। ১৭৫৭ সংবতের পৌষমাসে অজিত পিতৃসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। যোধপুরনগরীর প্রধানদ্বার পাঁচটি। অজিত যে দিন রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন প্রত্যেক দ্বারে এক একটি মহিষ বলিদান করিলেন। সুজৈৎ খাঁ পরলোকগত, সুতরাং শাহজাদা (আজিম) সুলতান অজিতের পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। আজিম তৎকালে গুর্জ্জর ও মারবারের প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত।

১৭৫৯ সংবতে আজিমশাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পুনরায় অজিতকে যোধপুর পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকে বিপক্ষের সেবায় নিযুক্ত হইলেন, কেহ কেহ বা রাঠোরের শরণগ্রহণ করিলেন। অজিতকে নিরুপায় হইয়া ঝালোরে অবস্থিতি করিতে হইল। রাণাও তখন নিরুপায়। এদিকে অম্বররাজ দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে যবনরাজের পরিচর্য্যায়

সংলিপ্ত। দিন দিন যবনের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহারা প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানে গোহত্যা করিতে আরম্ভ করিল। যোগী ও বৈরাগিগণ ভীতিবিত্রস্ত হইয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই দুর্ব্বৎসরে চৌহানী-স্রাব গর্ভে অজিতের একটি নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই নবকুমারই মহাবীর মহাতেজা অভয়সিংহ নামে পরিচিত। নিম্নে অভয়সিংহের জন্মপত্রিকা প্রদর্শিত হইল।

অভয়সিংহের জন্মপত্রিকা।
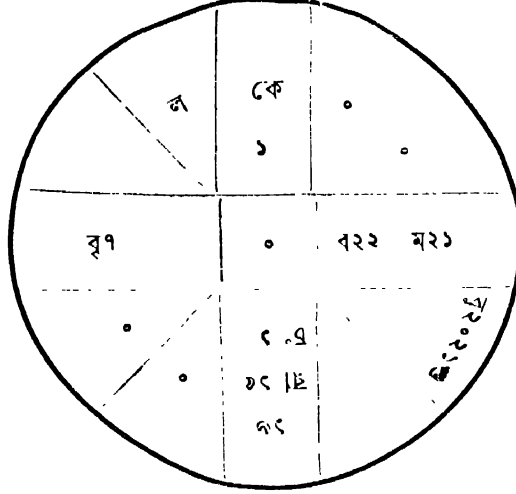
একতুঙ্গে ভবেদ্‌ভোগী দ্বিতুঙ্গে নৃপবল্লভঃ। ত্রিতুঙ্গে নৃপতির্জ্ঞেয়শ্চতুস্তুঙ্গে ধনেশ্বরঃ

	৭	১৬	১৫	
শুভমস্তু সংবৎ ১৭৫৯।০।	২১	৫২	১৯	দিনমানং ২৭।২২
২৯।১৫।২২।০।০	৩৩	৩	২১	নিশামানং ৩২।৩৮
	২২	৩	২০	যোগাঙ্ক ৬০।০
		জন্মাঙ্কঃ।		

শুভমস্তু সংবৎ ১৭৫৯।১৯।১৫।২২। এতচ্ছকাব্দীয়-সৌরমাঘস্য বিংশতিদিবসে শনিবারাধিকরণ-কাসিতপক্ষীয়ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ দিবা দ্বাবিংশতিপলাধিকপঞ্চদশদণ্ডাস্তিম-সময়ে শুভবৃষলগ্নেহস্যায়নাংশলগ্ন-মানদণ্ডাদি ৪।৫ শুক্রস্য ক্ষেত্রে রবেহোরায়াং সূর্য্যস্য দ্রেক্কাণে বুধস্য নবাংশে বাচস্পতের্দ্দশাংশে বুধস্য ত্রিংশাংশে এবং শুভাশুভষড়্‌বর্গে শ্রীশ্রীস্বেষ্টদেবতাচরণপরায়ণ-দাতৃ-ভোক্তৃ-শেষগুণালঙ্কৃত-ক্ষত্রিয়ানুগত-রাঠোররাজবংশীয়-মহারাজাধিরাজ-শ্রীল-শ্রীঅজিতসিংহস্য প্রথমপুত্রো জাতঃ। তস্য নক্ষত্রং ১৬ বিশাখা তুলারাশৌ চন্দ্রে দেবারিগণোঽয়ং ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ পরমকল্যাণীয় অস্য রাশ্যাশ্রয়ং নাম শ্রীলশ্রীরতনসিংহঃ তস্য জন্মপত্রিকেয়ম্‌। অথ গ্রহযোগাদিফলম্‌ ;—অথ বৃহস্পতিতুঙ্গযোগো-ঽস্তি, তৎফলং ;—মন্ত্রি-নরেন্দ্রপ্রীতিবলপ্রধানঃ প্রচণ্ডবীর্য্যোঽপি ধনেশ্বরশ্চ। জীবোঽপি তুঙ্গী যদি কর্কটঃ স্যাৎ সম্মানযুক্তঃ পুরুষঃ সদৈব॥ অস্য রিপুভবনং তুলাখ্যং শুক্রালয়ং, তত্র শনীরাহুশ্চন্দ্রশ্চ তিষ্ঠন্তে। তৎফলং ;—রাহুণা সহিতো মন্দঃ শত্রুক্ষে শত্রুবীক্ষিতঃ। মহাপাতকযোগোঽয়ং যদি শক্র সমো ভবেৎ॥ অস্য দ্রেক্কাণফলং,—দ্রেক্কাণে দিবসেশ্বরস্য মলিনঃ শূরোঽঙ্গনাবল্লভো, মুগ্ধঃ সাহসিকঃ কুকর্ম্মকুশলো মূর্খো বিরূপঃ সুতঃ। বহ্বাশী গুরুঘাতকোঽতিকৃপণো দ্যূতক্রিয়ায়াং রতঃ, পাপাত্মা

মুখরঃ খলোহতিসধনঃ স স্যাদভৃত্যো নরঃ॥ অথ রবের্হোরাফলং,—বিক্রান্তো মতিমান্ শূরঃ সংগ্রামে গজনির্জ্জিতঃ। হতবৈরীর্মহোৎসাহো হোরায়াং চেদ্দিবাকরঃ॥

ইসফের প্রতি যোধপুরের হাকিমত্বভার সমর্পিত ছিল, ১৭৬১ সংবতে তিনি পদচ্যুত হইলেন। মুর্শিদকুলী তৎপদে নিযুক্ত হইয়া যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি অজিতকে মৈরতাপ্রত্যর্পণার্থ রাজকীয় সনন্দপত্র দেখাইলেন। কুশলসিংহ ও গোবিন্দদাস মৈরতার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে ইন্দ্রসিংহের পুত্র মাক্কমসিংহ আপনাকে অবমানিতজ্ঞানে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া রাজার নিকট সেনাপতিপদ প্রার্থনা করিলেন, সেই সঙ্গে পত্রে ইহাও লিখিত থাকিল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া তিনি স্বকার্য্য সাধন করিবেন।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে মুর্শিদকুলী পদচ্যুত হইলেন। জাফর খাঁ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এমন সময় মাক্কমসিংহ স্বদেশীয় রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যবনের পক্ষে যোগদান করিলেন। ক্রনার নামক স্থলে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ বাধিল। অজিত সেই যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে বিদ্রোহী ইয়েন্দবংশ সর্দ্দারের পতন হইল। ১৭৬২ সংবতে এই যুদ্ধ ঘটে।

ইব্রাহিম খাঁ লাহোরের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ১৭৬৩ সংবতে গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি মারবারের মধ্য দিয়া তৎপ্রদেশে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে ঐ বৎসর চৈত্রমাসের দ্বিতীয় দিবসে অমাবস্যা তিথিতে দুর্বৃত্ত আরঙ্গজেব ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ভারতবাসীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পঞ্চমদিবসে অজিত যোধপুর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। আনন্দকোলাহলে নগরী সমাকুল হইল। অজিত দেবগণের উদ্দেশে প্রতিদ্বারে নানাবিধ বলি উৎসর্গ করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া যবনগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। ষড়বিংশবর্ষ ধরিয়া ক্রমাগত অজিত যবনের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, আজি তাঁহার দুঃখনিশা প্রভাত হইয়া সুখসূর্য্যের উদয় হইল।

আজি হিন্দুগণের আনন্দের পরিসীমা নাই। আজি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারা জয়লাভ করিলেন। যবনগণ ছদ্মবেশে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। চারিদিকে "সীতারাম, হরগোবিন্দ" এইরূপ পবিত্রনাম ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। মোল্লাগণ শ্মশ্রুরাজি মুণ্ডনপূর্ব্বক করস্থিত জপমালায় রামনাম জপ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ম্লেচ্ছস্পর্শে যোধগড় কলুষিত হইয়াছিল, জাহ্নবী-সলিলে তাহা বিধৌত হইল। মাক্কমসিংহ প্রাণভয়ে নাগরে পলায়ন করিলেন। রাজকুমার অজিত পিতৃপুরুষগণের পবিত্রদুর্গে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশে আজিম ও মৌজাম উভয় ভ্রাতায় ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। আগ্রানগরীতে এই যুদ্ধ ঘটে। সৌভাগ্যবশে মৌজাম শা আলম বাহাদুর শা নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। অজিত যবনকে সংহার করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে শা আলমের হৃদয় রোষ-প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি সসৈন্যে অজমীরে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র রাঠোর-সামন্তগণ সসৈন্যে অজিতের নিকট উপস্থিত হইয়া শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যবনরাজ চৈ-বিলার নামক স্থানে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া সন্ধিস্থাপনার্থ অজিতের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অজিত প্রথমতঃ সম্রাটের সেনাকটক দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর ফাল্গুনমাসের প্রথমদিবসে তিনি যোধপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক যবনরাজের সেনাকটক দর্শনার্থ বিশিলপুরে উপস্থিত হইলেন। রাজপ্রেরিত সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাবাদিতেই রাত্রি

অতিবাহিত হইল। প্রভাতে অজিত আনন্দপুরে উপস্থিত হইয়া শা আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই সময় শা আলম তাঁহাকে টেগ-বাহাদুর (যোদ্ধার তরবারি) উপাধি প্রদান করিলেন। এদিকে শা আলম কূটনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক যোধপুর অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে মাক্ষমসিংহ ও মৈরব খাঁকে তথায় প্রেরণ করিলেন। অজিতের কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশমাত্র তিনি রোষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কি করিবেন, তখন নিরুপায়। শা আলমের সহিত দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তাঁহাকে কমবক্সের অধীনে পরিচর্য্যা করিতে হইল। অম্বরপতি মির্জ্জারাজ জয়সিংহও অজিতের সমভিব্যাহারে ছিলেন, তাঁহারও দুঃখের অবধি রহিল না। বাহাদুর শাহ অম্বরে একটি সেনাদল স্থাপনপূর্ব্বক জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়সিংহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যবনরাজ সদলে নর্ম্মদাপারে উপস্থিত হইবামাত্র রাজপুতরাজদ্বয় স্ব স্ব সামন্তগণ সমভিব্যাহারে রাজপুতনায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া রাণা অমরসিংহের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সাদরে তাঁহাদিগকে লইয়া রত্নাসনে বসাইলেন। নৃপতিত্রয় তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ন্যায় পরমশোভা ধারণ করিলেন। অতঃপর রাঠোররাজ ও কুশবহ-নৃপতি রাণার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক মারবার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যথাকালে সকলে আহোবে উপস্থিত হইলেন। উদয়ভানের পুত্র সংগ্রামসিংহ স্বীয় রাজার পদমার্জ্জনী বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন।

অজিতের প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া মৈরব খাঁর অন্তর ভয়বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ১৭৬৫ সংবতের শ্রাবণমাসের সপ্তম দিবসে ত্রিংশৎসহস্র রাঠোরবীর যোধপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন। ঈশকর্ণের পুত্র দুর্গাদাসের অনুগ্রহে প্রাণ লইয়া যবনসেনাপতি সভয়ে সপরিবারে দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন।

রাজপুত্র হইয়া মির্জ্জারাজ জয়সিংহ রাজ্যধনে বঞ্চিত। শূরসাগরতীরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার ভাগ্যগগন পরিষ্কার হইল; অজমল তাঁহাকে অম্বরসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাঠোররাজ ও কুশবহপতি একত্র হইয়া মৈরতা নগরে উপস্থিত হইয়াছেন, সংবাদ পাইয়া আগরা ও দিল্লীনগর কম্পিত হইতে লাগিল। নৃপতিদ্বয় অজমীরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা প্রাণভয়ে খাজাকুতবের মসজীদবাসী ফকিরের শরণগ্রহণ করিলেন; অবশেষে রাজপুতগণকে যথেষ্ট পণ দিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে হইল। অতঃপর অজিত মহাবেগে সম্বরের উপর আপতিত হইলে সামন্তগণ আসিয়া তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বাদশসহস্র বীরসহ লবণসরসীতটে যাত্রা করিয়া সৈয়দ পরিশেষে অজমলের সম্মুখীন হইলেন। কুম্পাবৎগণও রণভূমে প্রবেশ করিলেন। আশু ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হইল। ষট্‌সহস্র সৈন্যসহ হোসেন সেই যুদ্ধে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। অবশিষ্ট যবনেরা দুর্গমধ্যে পলায়ন করিল। অজিতের হস্তে পুরীহারও সেই যুদ্ধে বিগতায়ু হইলেন। যবনগণ অম্বর পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অজিত অগ্রহায়ণমাসে জয়সিংহকে অম্বরের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিলেন। অতঃপর বিকানীররাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্দেশে রাঠোররাজ সংগ্রামের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে অজিত রঘুনাথ বিদারীনামক রাজনীতিজ্ঞ যোগ্য ব্যক্তির হস্তে দাওয়ানীকার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক বিশালবাহিনী লইয়া যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

১৭৬৬ সংবতে ভাদ্রমাসে মহাযুদ্ধে আরঙ্গজেবের হস্তে কমবক্সের প্রাণবিয়োগ হইল। *

* ইতিপূর্ব্বে আরঙ্গজেবের মৃত্যু হইয়াছে। ভ্রমপ্রমাদে টড সাহেব এস্থানে আরঙ্গজেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বাহাদুরের পরিবর্ত্তে ভ্রমে আরঙ্গজেব নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অতঃপর যবনরাজের সহিত জয়সিংহও সন্ধিস্থাপন করিলেন। এই ঘটনার পর অজিত নাগরের শাসনকর্ত্তা ইন্দ্রসিংহকে আক্রমণ করিলে নাগরপতি নিরুপায় হইয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। অজিত তখন তাঁহাকে লাদানুনামক জনপদের ভূমিবৃত্তি দিয়া সামন্তরূপে পরিগণিত করিয়া রাখিলেন। নাগরের অধিপতি হইয়া আজি সামান্য লাদানুর ভূমিবৃত্তি ভোগ করিতে হইল, এই মনোদুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়া ইন্দ্রসিংহ যবনপতির নিকট সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। যবনরাজের হৃদয় রোষপ্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি রাজপুতনরপতিগণকে নানারূপ ভয়প্রদর্শন করিলে আবার তাঁহারা একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। দিলবানের অদূরবর্ত্তী কোলিওনামক স্থানে রাজপুতরাজগণ সমবেত হইলেন; এদিকে সম্রাট্‌ও অজমীরে উপস্থিত হইলেন। অজমীরে উপস্থিত হইয়াই তিনি রাজপুতনৃপতিগণের নিকট পাঞ্জা ও বন্ধুত্বসূচক পত্র প্রেরণ করিলেন। এই সময়েই যবনসম্রাট্ অজিতকে নাকোটা মারবারের রাজা এবং রায়সিংহকে অম্বরের রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। অতঃপর অজিত ও জয়সিংহ সম্রাটের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক পুষ্করযাত্রা করিলেন। তীর্থদর্শন সমাপিত হইলে রাজদ্বয় স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ১৭৬৭ সংবতের শ্রাবণমাসে অজিত যোধপুরে প্রত্যাগত হন। এই বৎসরেই একটি গরকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমখাসে অমরসিংহকে সংহার করিয়া অর্জ্জুন যে বিবাদের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, এই বিবাহের দিন হইতে সেই বিবাদ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইল। নূতন বিবাহ করিয়া অজিত কুরুক্ষেত্রতীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য ভীষ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া তাঁহার মন পরমপবিত্রতা লাভ করিল।

এই পবিত্রকুণ্ড সম্বন্ধে একটি মনোহারিণী কিংবদন্তী আছে। কুরুক্ষেত্র কুরুপাণ্ডবের পবিত্র রঙ্গভূমি। ঐ স্থান পরিদর্শন করিবার উদ্দেশে কোন সময়ে সম্রাট্ বাহাদুর শাহ মহিষী ও অন্যান্য অনুচর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটি ক্ষত্রিয়কুমারীর সহিত বাহাদুরের বিবাহ হয়। সেই মহিষীই তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। সম্রাট্ ভীষ্মকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি বিশালতরুমূলে পটগৃহ স্থাপন করিলেন। একদিন সম্রাট্ মহিষী সমভিব্যাহারে তরুমূলে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে একটি গৃধ্র চঞ্চুপুটে একখণ্ড অস্থি লইয়া সেই তরুশাখায় উপবেশন করিল। দুর্ভাগ্যবশে তাহার চঞ্চুপুট হইতে অস্থিখণ্ডখানি কুণ্ডগর্ভে নিপতিত হইল, অমনি গৃধটি মনুষ্যের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া সম্রাট্ যেমন তাহার দিকে নেত্রপাত করিলেন, অমনি পক্ষিরাজ মানুষের ন্যায় স্পষ্টাক্ষরে কথা কহিতে লাগিল। বিস্ময়ে রাজ-রাণীর হৃদয় স্তম্ভিত। পক্ষী কহিল, "সম্রাট্! পূর্ব্বজন্মে আমি যোগিনী ছিলাম। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে রণক্ষেত্র হইতে আমি একটি নিহত বীরের ছিন্নহস্ত লইয়া প্রস্থান করি। সেই ছিন্ন হস্তে একগাছি সুবর্ণবলয় নিবদ্ধ ছিল। বলয়গাছটির উপর রক্ষাকবচের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রয়োদশটি স্ফাটিকলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। ছিন্ন হস্তের মাংসাদি ভক্ষণপূর্ব্বক আমি সেই বলয়গাছটি কুণ্ডমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। এ জন্মে আমি গৃধ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার মুখ হইতে অস্থিখণ্ড স্খলিত হইয়া কুণ্ডগর্ভে পতিত হইবামাত্র জন্মান্তরীণ স্মৃতির উদয় হওয়াতেই আমি হাস্য করিলাম।" বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্রাট্ সেই কুণ্ডের জলরাশি ছেঁচিয়া ফেলিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। কুণ্ডের তলদেশে গৃধ্রবর্ণিত বলয়গাছটি দৃষ্ট হইল। তদুপরি যে ত্রয়োদশটি লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহার এক একটি ন্যূনতঃ একসের হইবে। সম্রাটের সমভিব্যাহারে সেই সময় অজিত, জয়সিংহ এবং অন্যান্য কতিপয় হিন্দুনরপতি ছিলেন। সম্রাটের নিকট

হইতে অজিত একটি এবং জয়সিংহ দুইটি লিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। জয়সিংহ যে দুইটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হই-লেন, তন্মধ্যে একটি জয়পুরবাসিনী শিলাদেবীর মন্দিরে এবং দ্বিতীয়টি গোবিন্দদেবের মন্দিরে রক্ষিত হইল। অজিতসিংহ প্রাপ্ত লিঙ্গমূর্ত্তিটি যোধপুরের গিরিধারীর মন্দিরে স্থাপন করিলেন। ঐ সমস্ত লিঙ্গ আজিও যথাবিধানে পুজিত হইতেছেন।

১৭৩৭ সংবতে যেদিন রাঠোরকুলতিলক মহারাজ যশোবন্তসিংহ পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইয়া বিদেশে প্রাণবিসর্জ্জনপূর্ব্বক আরঙ্গজেবের বিশ্বাসঘাতকতা জগৎসংসারে প্রকাশ করিলেন, সেই দিন হইতে অজিতের সিংহাসনাধিকার পর্য্যন্ত ত্রিংশদ্বর্ষ অতীত হইল। এই দীর্ঘকাল রাজপুতবীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থে—স্বধর্ম্মরক্ষার্থে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহেই ব্যাপৃত ছিলেন। আরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর অত্যাচারে রাঠোরবংশের গৌরবরবি কতবার অস্তমিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কতবার রাঠোরবীরগণ বিপন্ন হইয়াছিলেন, অদম্য উৎসাহবলে এবং স্বধর্ম্মপরায়ণতাপ্রভাবে তাঁহারা সেই গৌরবগরিমা অতি কষ্টে রক্ষা করিয়াছেন। রাঠোর সর্দ্দারদিগকে হস্তগত করিবার জন্য আরঙ্গজেব কতবার কত কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যে সকল স্বদেশপ্রেমিক রাজপুতবীর-গণ মহত্ত্ব বীরত্ব, রাজভক্তি, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণরাজি প্রদর্শন করিয়াছেন, মহাপুরুষ দুর্গাদাস তন্মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। যতদিন একটিমাত্র রাজপুতও ইহজগতে জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার পবিত্র নাম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে না। চতুর চূড়ামণি মোগলসম্রাট্ তাঁহাকে করগত করিবার জন্য কতবার কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, কিছুতেই দুর্গাদাসের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। পাঁচহাজারী মনসবীপদও দুর্গাদাস তুচ্ছবোধে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশে দুর্গাদাস অনেকগুলি উপযুক্ত রাজপুতবীরের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী আলো-চনা করিলে পদে পদে মহত্ত্বের অগণ্য উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবিরামগতিতে কালস্রোত প্রবাহিত হইবে, জগতের কত শত পরিবর্ত্তন ঘটিবে, কিন্তু বীরকেশরী মহাপুরুষ স্বদেশপ্রেমিক দুর্গা-দাসের পবিত্র নাম আপ্রলয় জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইবে না।

নবম অধ্যায়

অজিতের শাসন, সম্রাটের মৃত্যু, গৃহবিপ্লব, মুণ্ডকর-রহিত, দুর্নিমিত্ত দর্শন, যবনকর্ত্তৃক-মারবার আক্রমণ, যবনরাজ্য-লুণ্ঠন, পুত্রহস্তে অজিতের মৃত্যু ও রোমহর্ষণ সহমরণ।

রাঠোরবীর অজিতসিংহের রাজত্বকালীন ঘটনাবলী যতই আলোচনা করা যায়, হৃদয় ততই বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে থাকে। ১৭৬৮ সংবতে তিনি নাক্ ও হিমাদ্রির শাসনকর্ত্তৃগণের প্রতি-কূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পার্ব্বত্যসর্দ্দারেরা পরাভূত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর হরিপদবিহারিণী সুরধুনীর পবিত্রসলিলে অবগাহনাদি করিয়া বসন্তকালে অজিতসিংহ যোধ-পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

১৭৬৯ সংবতে শা আলম ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিষম অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই গৃহবিবাদের ফল কি?—আজিম লীলা সংবরণ করিলেন, মণিময় রাজমুকুট মৈজুদ্দীনের শিরোপরি সুশোভিত হইল। এই সময়ে বিদ্দারী কৈমসিংহ নামক এক

ব্যক্তি অজিতসিংহের আদেশে নবীন-সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্‌ তাঁহাকে যথাবিধি সাদরসংবর্দ্ধনা করিলেন এবং গুর্জ্জরের প্রতিনিধিত্ব অজিতের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক জৈমসিংহের নিকট একখানি সনন্দপত্র প্রদান করিলেন। নিয়োগপত্র পাইয়া অজিত ঐ বৎসর অগ্রহায়ণমাসে একটি বিশাল সেনাদল সুসজ্জিত করিলেন। গুর্জ্জরের অন্তর্গত সপ্তসহস্র নগর অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই সময়ে শাকতীরকুলের নূতন নূতন বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৈয়দেরা মৈজুদ্দীনকে (জাহান্দর শাহকে) নিপাত করিয়া ফিরকশিয়রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। জুলফিকার খাঁ লীলাসংবরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোগলের বলবীর্য্যও বিলুপ্ত হইল। আততায়ী জুলফিকার খাঁ ও তদীয় পিতা আস্‌দাদ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় জাহান্দর বিপক্ষহস্তে পতিত হন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে ফিরকশিয়র জাহান্দর শাহাকে সংহার করেন। জুলফিকার খাঁও পাপের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছিল। বিপক্ষেরা তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে সৈয়দদ্বয় একান্ত উদ্ধত হইয়া উঠিল। অজিতকে তাহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইল যে. তিনি আশু তাঁহার পুত্র অভয়সিংহকে সামন্তদলসহ আগ্রায় প্রেরণ করেন। অভয়ের বয়ঃক্রম তখন সপ্তদশবর্ষ। বিশ্বাসঘাতক মুকুন্দ তখন সৈয়দের নিকট অবস্থিত ছিলেন। অজিত আপন পুত্র অভয়কে সামন্তদলসহ তথায় প্রেরণ করিলেন। রাঠোরবীরেরা দিল্লীর মধ্যস্থলে মুকুন্দের প্রাণবধ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সৈয়দ রোষপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অচিরেই যোধপুর আক্রমণে অগ্রসর হইল। এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র অজিত রাজধানীর সম্রান্ত ব্যক্তিগণকে শিবানোনগরে এবং পুত্রকলত্রাদিকে লুনীনদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী রর্দ্দ্রো প্রদেশে রাখিয়া আসিলেন।

নগর অবরুদ্ধ হইল। বিপক্ষগণ অজিতের নিকট এই মর্ম্মে পত্র পাঠাইল যে, রাজকুমার অভয়সিংহ দেহবন্ধকস্বরূপ সম্রাট্‌-সভায় গমন করিলে তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। রাজা প্রথমে তাহাতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু দেওয়ান ও ভট্টকবির পরামর্শে অবশেষে তিনি সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অভয়সিংহ রর্দ্দ্রো হইতে যোধপুরে প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর পিতার আদেশে ১৭৭০ সংবতের আষাঢ় মাসের শেষে হোসেন আলীর সহিত তাঁহাকে দিল্লীযাত্রা করিতে হইল। তথায় সম্রাটের আদেশে তিনি পঞ্চসহস্রের সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীর রাজসভার অধিবেশন উপলক্ষে অজিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য কতকগুলি স্মারকস্তম্ভ তাঁহার নাম নেত্রপথে নিপতিত হইল। দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজেবের বিদ্বেষাগ্নি হইতে অজিতকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল রাঠোরবীর আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, স্তম্ভগুলির তলদেশে তাঁহাদের পূততনুর ভস্মরাশি সংরক্ষিত ছিল। সেই সমস্ত দর্শন করিয়া পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হওয়াতে অজিতের হৃদয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নারোজা, যবনরাজ্যের সহিত রাজপুতকুমারীগণের বলপূর্ব্বক বিবাহ, গোহত্যা ও মুণ্ডকর এই সকল স্মরণ করিয়া তিনি নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিরূপে তৈমুরবংশকে প্রতিশোধ প্রদান করিবেন, মনে মনে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুরাচার সৈয়দ যখন যোধপুর আক্রমণ করে, তখন যোধরাজের নিকট যে সমস্ত দাওয়া করিয়াছিল, তন্মধ্যে অজিতের কন্যার সহিত ফিরকশিয়রের বিবাহ-প্রস্তাবই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতম। এই কারণেই অজিতের হৃদয়ে প্রতিশোধপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পিতৃ-আচরিত কূটনীতির অনুসরণপূর্ব্বক সৈয়দগণের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার অভীষ্টও সুসিদ্ধ হইল। তিনি এইরূপ নূতন স্বত্ব প্রাপ্ত হইলেন যে, দেবদেবীর উপাসনা উপলক্ষে শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য বাদিত

হইবে, তাহাতে কোন আপত্তি থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত অজিত পৈতৃকরাজ্য দৃঢ় ও বশীভূত করিতে পারিবেন।

গুর্জ্জরের প্রতিনিধিত্ব পাইয়া ১৭৭১ সংবতের জ্যৈষ্ঠমাসে অজিত যোধপুরে প্রত্যাগত হইলেন। মন্ত্রিবর কৈরমসিংহের সাহায্যে এই সময় হইতে মুণ্ডকর রহিত হইল। সমগ্র হিন্দুসমাজ আনন্দিত হইয়া দুই হস্ত তুলিয়া অজিতসিংহকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

১৭৭২ সংবতে অজিতসিংহ পুত্র অমরকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয়রাজ্য পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইলেন; ঝালোরে উপস্থিত হইয়া তথায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর তিনি শিরোহী ও আবুর দেবরণের মিবাসা (গিরিগহন) আক্রমণ করিলেন। অচিরেই নিমজ পরাভূত ও বশীভূত হইল, দেবরগণও উপস্থিত হইয়া অজিতকে করপ্রদান করিল। এ দিকে ফিরোজ খাঁ পহ্লনপুর হইতে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। থিরডের রাণ, ক্যাম্বে অধিপতি কোলিরাজ কেমকর্ণ প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার অধীনতাস্বীকার ও করপ্রদান করিল। এমন সময়ে বিজুবিন্দারীর সহিত চম্পাবৎ-গোত্রীয় শক্তসিংহও আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি অজিতের অধীনেই পত্তন-শাসনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭২ সংবৎ অতীত হইল।

১৭৭৩ সংবতে হুলবুদের ঝালা-সর্দ্দার এবং নবনগরের জামরাজ অজিতের নিকট পরাভূত হইলেন। জামরাজের নিকট অজিতসিংহ করস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা এবং পঞ্চবিংশতিটি অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর অজিত দ্বারকানাথদর্শন ও গোমতী-সলিলে স্নানাদি সমাপনানন্তর স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই শুনিলেন, ইন্দ্রসিংহ পুনরায় নাগোরদুর্গ অধিকার করিয়াছেন।

১৭৭৪ সংবতে সৈয়দ ও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অন্তর্বিপ্লবে বিজড়িত হইয়া পড়িল। হোসেন আলী সে সময় দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল, এ দিকে রাজাও আবদুল্লার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই সময়ে পত্রের উপর পত্র পাইয়া অজিত সৈয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যে কয়েকটি নগর দৃষ্ট হইল, তত্রত্য সেনাদল দৃঢ় করিয়া তিনি মারোটে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে অমরসিংহকে যোধপুররক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সংবাদ পাইয়া সৈয়দও তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল। আলীবর্দ্দীর সরাইয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তথায় ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অজিত ও সৈয়দ উভয়ে জয়সিংহ ও মোগলগণের বিক্রমরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রবল শত্রু জুলফিকার খাঁকে অচিরে সংহার করাই অজিত ও সৈয়দের প্রধান উদ্দেশ্য। *

অজিতের দিল্লী উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া সম্রাটের আদেশানুসারে তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া যাইবার জন্য কোটার হাররাও ভীম খান্দোরাণ খাঁ আগমন করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া কতকগুলি রাঠোরবীর সমভিব্যাহারে অজিতসিংহ সম্রাট্-সদনে যাত্রা করিলেন। মতিবাগে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইল। সম্রাট্ সেই সভাসমক্ষে রাঠোররাজ অজিতকে সপ্ত সহস্রের সেনানীপদে বরণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত অজিত "মহী মরাতীব" রাজনিদর্শনসহ গজ, বাজি, তরবারি, ছুরিকা, হীরকমণ্ডিত শিরপেঁচ, চিকণ পর ও দুই ছড়া মৌক্তিকদাম প্রাপ্ত

* ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আসদ খাঁর মৃত্যু হইয়াছে, আবার এখানে সেই নামের উল্লেখদৃষ্টে বোধ হয়, এই জুলফিকার খাঁ অন্য ব্যক্তি হইবে। কোন কোন ইতিবৃত্তলেখক বলেন, দাউদ খাঁর পরিবর্ত্তে ভ্রমবশতঃ জুলফিকার খাঁর নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

হইলেন। অতঃপর সম্রাট্-সদনে বিদায় লইয়া অজিত আবদুল্লা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সৈয়দ কিয়দ্দূর প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল। তাঁহারা একতাবন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইব, তথাপি জয়লাভের জন্য দৃঢ় অধ্যবসায় হইতে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইব না। এই সংবাদ পাইয়া মোগলগণের হৃদয় ভয়বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা অজিতের প্রাণবিনাশার্থ গোপনে গোপনে উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। ১৭৭৫ সংবতে পৌষমাসে শুক্লা দ্বিতীয়াতে সম্রাট্ অজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অজিত তাঁহাকে লক্ষ টাকা এবং গজবাজী প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন। তৎপরে ফাল্গুনমাসে সৈয়দের সহিত মিলিত হইয়া অজিত সম্রাট্-সদনে উপস্থিত হইলেন। সভাভঙ্গের পর তিনি হোসেন আলীকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, আশু দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া তিনি যেন তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন; নচেৎ অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

এই সময়ে রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সারমেয়গণের অমঙ্গল রোদন, দিবাভাগে শিবার অশিব চীৎকার, ক্ষণে ক্ষণে দিঙ্মণ্ডলের আরক্তাভা, বিনামেঘে বজ্রধ্বনি, এইরূপ দুর্নিমিত্ত দর্শনে রাজ্যবাসীরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। বিংশতিদিনের মধ্যেই হোসেন আলী দিল্লী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদীয় বদনমণ্ডল গম্ভীর ও ভীষণ। অসংখ্য তুরগসৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইল। নগরীর উত্তরপ্রান্তে হোসেন আলী শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। অজিতের সহিত হোসেনের সাক্ষাৎ হইল। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সমগ্র মোগলজাতিই বিষমভয়ে আকুল হইয়া স্ব স্ব গৃহমধ্যে লুক্কায়িত হইল। সম্রাট্ হোসেন আলীকে নানারূপ উপহার পাঠাইয়া দিলেন।

অজিতের স্কন্ধাবার যমুনাতটে সংস্থাপিত। পরদিন হোসেন আলী ও অন্যান্য সকলে সেই শিবিরে সমবেত হইলেন। অজিত রাঠোরসেনা সমভিব্যাহারে প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার বিশ্বস্ত লোক রক্ষিত হইল। এই সময় অজিত যেন প্রলয়কালীন ঝড়-বাগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। দিল্লীশ্বরের ভাগ্যগগন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অজিতের অধীনস্থ সৈন্যগণের সিংহনাদে দিল্লী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজকোষ লুণ্ঠিত হইল। ফিরকশিয়রকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিতে আজি একটি মোগলবীরও অগ্রসর হইল না। দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল। জয়সিংহ আত্মপ্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

দিল্লীসিংহাসনে একটি নবীন ভূপতি সমাসীন। কিন্তু তাঁহাকেও অধিক দিন সুখভোগ করিতে হইল না; চারিমাসমধ্যেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। অতঃপর দৌলা (রাফি উদ্দৌলা) দিল্লীসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু দিল্লীর মোগলেরা নিকুশাহ নামক এক ব্যক্তিকে আগ্রার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের দমনার্থ হোসেন আলী তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে আগ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; সম্রাটের নিকট অজিতসিংহ ও আবদুল্লা অবস্থিত থাকিলেন।

১৭৭৬ সংবতে অজিত ও সৈয়দ আগরা অভিমুখে গমন করিলেন। মোগলেরা ভীত হইয়া নিকুশাহকে তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিল। নিকুশাহ সেলিমগড়ে অবরুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে সম্রাট্ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অজিতের অভ্যুদয়কালে কত রাজ্য উন্নতিসোপানে আরোহণ করিল, আবার কত রাজ্য একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। জয়সিংহ নিরুপায় হইয়া অজিতের শরণ গ্রহণ করিলেন। অজিত করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে স্বীয়

আশ্রয়তরুমূলে স্থানদান করিলেন। নির্ভয় হইয়া জয়সিংহ অজিতের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অজিতের অতুলনীয় ভুজবল দর্শনে সম্রাটের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সন্তুষ্ট হইয়া তিনি অজিতকে আহম্মদাবাদরাজ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর অজিত অম্বরপতি জয়সিংহ ও বুন্দির হাররাজ বুধসিংহ সমভিব্যাহারে নিজরাজ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মনোহরপুরের শিখাবৎ-সর্দারের কন্যার সহিত তাঁহার শুভপরিণয় সমাপিত হইল। কিছুদিনের পর তথা হইতে তিনি নিজ রাজধানী যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। সুরসাগরের তীরে অম্বররাজের এবং নগরীর উত্তরপ্রান্তে হাররাজের স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইল।

১৭৭৭ সংবতের বর্ষাঋতু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে জয়সিংহ ও বুধসিংহ অজিতের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। দূতমুখে সংবাদ আসিল, মোগলগণ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিয়া অজিতের প্রাণবিনাশের সুযোগপ্রতীক্ষায় রহিয়াছে। এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র মহারাজ অজিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া শপথ করিলেন, যে কোনরূপেই হউক, তিনি স্বয়ং অজমীর অধিকার করিবেন। অজিত অচিরে অম্বরপতিকে বিদায় দিয়া দ্বাদশ দিবসের মধ্যে মৈরতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অবিলম্বে যবনদিগকে অজমীর হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনি অজমীর-দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। অজমীরস্থ যবন-শাসনকর্ত্তার প্রাণসংহার করিয়া তিনি তারাগড়দুর্গ আক্রমণ করিলেন। হিন্দুর দেবালয়সমূহে আর একবার শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, মুসলমানদিগের মসজীদ মোল্লা-ফকির-রহিত হইয়া গেল; যে অজমীরে নিরন্তর কোরাণ পাঠ হইত, এক্ষণে সেই অজমীরে পুরাণপাঠ হইতে লাগিল; মসজীদের স্থলে মন্দির নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল; কাজিগণ বিতাড়িত হইল এবং ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। যে অজমীরে প্রত্যহ শত শত গোহত্যা হইত, আজি পুনর্ব্বার সেই অজমীরে হোমকুণ্ড স্থাপিত হইতে লাগিল। অজিত সম্বর ও দিদোবানোর লবণহ্রদ এবং অপরাপর প্রদেশসকল একে একে অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। অজিত নিজ পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র শোভিত হইল। তিনি স্বনামে মুদ্রা প্রচলন, স্বতন্ত্র পরিমাপক গজপ্রচলন, স্বতন্ত্র সের প্রভৃতি বাটখারাসৃষ্টি ও স্বতন্ত্র বিচারালয় সংস্থাপন করিলেন। দিল্লীর অশ্বপতির ন্যায় অজিত অজমীরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অজিত পুনরায় নিজ জাতিধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সমগ্র মরুক্ষেত্র হইতে মুসলমানধর্ম্ম বিদূরিত হইয়াছে, অবিলম্বে এই সংবাদ সমগ্র ভারতে, এমন কি, মক্কা ও ইরাণে বিঘোষিত হইল।

১৭৭৮ সংবতে মোগলসম্রাট্, অজিতের হস্ত হইতে অজমীর পুনরধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। সম্রাট্ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া মজঃফর খাঁ বর্ষাকালেই সসৈন্যে মারবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষদমন জন্য অজিত মারবারের আট জন বীর সামন্ত ও ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ অসীমসাহসী নিজপুত্র অভয়সিংহকে পাঠাইয়া দিলেন। সেনাদলের দক্ষিণে চম্পাবৎগণ, বামে কুম্পাবৎগণ এবং মধ্যে করমসোট, মৈরতীয়, যোধ, ইন্দো, ভট্টি, শোণিগুরু, দেবর, খীচি, ধুন্দল ও গগাবৎ প্রভৃতি বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই সেনাদল গঠিত হইয়াছিল। অচিরে রাঠোরসৈন্যসহ সম্রাট্সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। মজঃফর সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া ভয়ে নগরমধ্যে পলায়ন করিয়া নিজ নাম কলঙ্কিত করিল। অভয়সিংহ যবন-সেনাপতির এইরূপ ভীরু কাপুরুষের ন্যায় আচরণ দেখিয়া সম্রাট্কে শাস্তি প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি শাজিহানপুর অধিকার এবং নারনোল লুণ্ঠনপূর্ব্বক পত্তন ও রেবারী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন, অবশেষে পল্লীসমূহে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন।

সেই অগ্নি আলিবর্দ্দীর-সরাই পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া বিষম ভীতির সঞ্চার করিল। দিল্লী ও আগ্রা ভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। অভয়সিংহের বীরত্ব সন্দর্শনে অসুরগণ পাদুকা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ-ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল; তাহারা অভয়সিংহকে যবনবংশধ্বংসকারী বলিয়া 'ধনকুল' উপাধি প্রদান করিয়াছিল। কুমার অভয়সিংহ সম্বর ও লুধানা প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নরুকাশ সম্প্রদায়ের নেতার কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

১৭৭৯ সংবতে অভয়সিংহের সম্বরে অবস্থিতিকালে তাঁহার পিতা অজিত অজমীর হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কশ্যপের সহিত সূর্য্যের সাক্ষাতের ন্যায়, অজিতের সহিত তদীয় পুত্র অভয়সিংহের সাক্ষাৎ হইল। অভয়সিংহ মজঃফরকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুদিগকে সুখী করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পুনর্ব্বার অজিতের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে চারি সহস্র সৈন্যসহ নাহর খাঁকে সত্বর অজিতের নিকটে প্রেরণ করিলেন। অপমানসূচক ভাষা প্রয়োগ করায় নাহর খাঁ সেই চারি সহস্র সৈন্যের সহিত সত্বর সমরক্ষেত্রে নিহত হইলেন। এই সময়ে চোবান জাটের পুত্র আসিয়া অজিতের শরণাগত হইলেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ এই সকল বিবাদে নিতান্ত অসুখী হইয়া রাজমুকুট পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনের শেষাংশ মক্কাতীর্থে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু নাহর খাঁর প্রাণসংহারের প্রতিশোধ-পিপাসা দূর করিতে না পারিয়া তিনি প্রথমতঃ প্রবল সেনাদল সজ্জিত করিলেন। সাম্রাজ্যের দ্বাবিংশতি রাজপ্রতিনিধির অধীনে যে সমস্ত সৈন্য ছিল তিনি তৎসমস্ত সংগ্রহ করিলেন এবং অম্বররাজ জয়সিংহ, হাইদার কুলী, ইরাদৎ খাঁ, বঙ্গেশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরদিগকে অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করিয়া অজিতের বিরুদ্ধে অজমীরে প্রেরণ করিলেন। শ্রাবণ মাসে তারাগড় নামক দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। সেই দুর্গের রক্ষাভার অমরসিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া অভয়সিংহ সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। যবন-সেনাদল চারিমাসকাল সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। এই চারিমাস-কাল অজিত রাঠোর-বাহুবল প্রকাশ করিতে বিরত রহিলেন না। অবশেষে অম্বরাধিপতি জয়সিংহের প্রস্তাবানুসারে অজিত সম্রাটের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সন্ধিপত্রের নিয়মাবলী প্রতিপালিত হইবে বলিয়া সম্রাট্পক্ষীয় ওমরাহগণ কোরাণ স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিলে অজিত সম্রাটের হস্তে অজমীর অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। অভয়সিংহ তৎপরে জয়সিংহের সম-ভিব্যাহারে সম্রাট্-শিবিরে গমন করিলেন। শিবিরমধ্যে প্রস্তাব হইল, তিনি যে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে সম্রাট্-সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁহার কোন বিপদ্ ঘটিবে না বলিয়া অম্বরপতি জয়সিংহ প্রতিশ্রুত হইলেন। নির্ভীক অভয়সিংহ অসিস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এই অসিই আমার প্রতিভূ।"

মারবারের যুবরাজ সম্রাট্-সভায় মহোচ্চসম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন। কিন্তু অভয়সিংহ স্বজাতিসুলভ গর্ব্বিত এবং উদ্ধত আচরণে সম্রাট্-সভায় যে কাণ্ড উপস্থিত করিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অমরসিংহকৃত আগ্রা-সভার কাণ্ডের পুনরভিনয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। একমাত্র তাঁহার পিতাই সম্রাটের দক্ষিণে প্রধান আসন অধিকার করিয়া থাকেন জানিয়া অভয়সিংহ ভাবিলেন, যখন তিনি তাঁহার পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ আগমন করিয়াছেন, তখন তিনিও সেই সম্মানসূচক আসন অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র। পৃথিবীর মধ্যে দিল্লীর সম্রাট্-সভার নিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইলেও অভয়সিংহ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি সগর্ব্বে সভাতলোপবিষ্ট ওমরাহগণকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এমন কি, সিংহাসনের একটি সোপানে তাঁহার একটি পদ বিন্যস্ত হইল। এইরূপ ব্যাপার দর্শনে জনৈক আমীর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। অভয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অসিকোষে

হস্তার্পণ করিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ যদি সেই মুহূর্ত্তে প্রত্যুৎপন্নমতিবলে নিজগলদেশ হইতে হীরকহার খুলিয়া অভয়ের গলে সাদরে সমর্পণ না করিতেন, তাহা হইলে দিল্লীর সভাস্থল রুধিরধারায় প্লাবিত হইয়া যাইত।

অভয়সিংহ নিজ পিতা অজিতের অনভিমতে দিল্লীর সম্রাট্-সভায় গমন করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারি কলুষিত হৃদয়-নিহিত পাপকল্পনা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে, তন্নিমিত্ত তিনি জনকের বিনা আজ্ঞায় দিল্লীনগরীতে গমন করিয়াছিলেন। অভয়সিংহ অশেষগুণসম্পন্ন হইলেও আমরা তাঁহাকে রাঠোররাওকুলাঙ্গার বলিয়া বর্ণন করিতে বাধ্য। অভয়সিংহ যে জঘন্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পিতার প্রাণসংহারপূর্ব্বক রাঠোররাজকুলে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অভয়সিংহ স্বহস্তে পিতার প্রাণসংহার না করিলেও তিনিই তাহার মূল। ভক্তসিংহ রাজ্যলাভ-প্রত্যাশায় অগ্রজের প্রলোভনে পড়িয়া এই গুরুতর পাপকার্য্যে—পিতৃপ্রাণসংহারে পরিলিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসে অভয়ই মহাপাতকী পিতৃহন্তা বলিয়া কীর্ত্তিত।

যে রাঠোর-কবিদ্বয়ের ইতিবৃত্ত হইতে অজিতের জীবনী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই উভয় ইতিহাস, অজিতের প্রাণহন্তা অভয়ের আদেশে লিখিত। সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থে অজিতের হত্যাসম্বন্ধে এইমাত্র লিখিত আছে যে, "অজিত এই সময়ে স্বর্গারোহণ করিলেন।" কিন্তু কে তাঁহাকে স্বর্গধামে প্রেরণ করিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। রাজরূপক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় অজিতস্বরূপ অভয় অশ্বপতির নিকট প্রেরিত হইলেন। এই সংবাদে অজিত পরমানন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু এই জগৎ অসার অলীক স্বপ্নমাত্র। অগ্রেই হউক আর দুই দিবস পরেই হউক, সকলেই কালের কবলিত হইবে। কোন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ বা অসীম বলশালী মহারাণাও মৃত্যুমুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এ জগতে আমাদিগের পরমায়ু-পরিমাণ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ইহার একতিলও বৃদ্ধি করিতে পারি না। জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র বিধাতা আমাদিগের ললাটদেশে ভাগ্যলিপি লিখিয়া দেন, কোনরূপেই তাহার হ্রাসবৃদ্ধি করিবার উপায় নাই। অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। গোবিন্দের আদেশ যে, ইন্দ্রের অবতারস্বরূপ অজিত মর্ত্ত্যধামে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া অমরত্ব লাভ করিবেন। সুতরাং শত্রুকুলের কণ্টকস্বরূপ অজিত পরলোকে নীত হইলেন। তিনি জাতীয়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম পদানত করিয়াছিলেন। অচিরে মরুক্ষেত্রের অধীশ্বর বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। রাজধানী শোকান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। প্রত্যেক প্রজা সভয়ে, সজলনয়নে প্রতিবাসীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "আমাদিগের আদিত্য অস্তগমন করিয়াছেন।" যমরাজের অধিকারকাল উপস্থিত হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? পঞ্চপাণ্ডব কি হিমালয়প্রদেশে প্রাণত্যাগ করেন নাই? হরিশ্চন্দ্রও ভাগ্যলিপি খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই। এ জগতে মুনি, ঋষি, মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ নহে। মহারাজ বিক্রম ও কর্ণকেও কৃতান্ত-হস্তে পতিত হইতে হইয়াছিল। অজিত কিরূপে তবে সেই কালের কবল হইতে মুক্তিলাভের আশা করিতে পারিবেন?

১৭৮০ সংবতের শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিবসে মরুক্ষেত্রের প্রধান অষ্ট সামন্তের অধীনস্থ সপ্তদশ সহস্র রাঠোরসৈন্য আপনাদিগের স্বর্গগত অধীশ্বর অজিতের শবদেহের নিকট সমবেত হইলেন। তাঁহারা মহারাজের মৃতদেহ একখানি তরণীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট যানযোগে * বহন

---

* বৈতরণী নদী পার হইবার জন্যই রাজপুতগণ তরণীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যানে রাজার মৃতদেহ রক্ষা করিয়া থাকেন।

করিয়া চন্দনকাষ্ঠ, নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য, তুলা, ঘৃত এবং কর্পূর দ্বারা সজ্জিত চিতায় স্থাপন করিলেন। কবি কিরূপে এই হৃদয়ভেদী শোকঘটনা বিবৃত করিবেন? নাজির রাওলার রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক "রাও সিদাও" বলিয়া আহ্বান করিবামাত্র চৌহানী-রাজ্ঞী ষোড়শ জন সহচরীর সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আজি আমার আনন্দের দিন। আজি আমার বংশ সমুজ্জ্বল হইবে, যাঁহার সহিত একত্র চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছি, কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব?" *

জশলের শাখা-সম্ভূত বীরজকন্যা পতিপরায়ণা সাধ্বী ভটিনী মহিষী চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি আনন্দের সহিত আমার হৃদয়েশ্বরের অনুগমন করিতেছি। প্রভো! তোমার চরণে শরণ লইলাম, যেন আমার সতীত্বরক্ষা হয়।" দেববলের রাজনন্দিনী মৃগবতী, নিকলঙ্কবংশীয়া তুয়ারমহিষী, সৌরাণী এবং শিখাবতী-মহিষী ভট্টিনী রাজ্ঞীর ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবার অভিপ্রায়ে, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ছয়টি রাণীর হৃদয়ে মৃত্যুভয় উদিত হইল না। ইঁহারা মহারাজ অজিতের অনুরাগিণী প্রাধানা প্রিয়তমা ছিলেন। ইঁহাদিগের ন্যায় মহারাজের আরও অষ্টপঞ্চাশৎ ভার্য্যা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন, "এমন সুযোগ আর আসিবে না। যদি আমরা জীবনধারণ করিয়া থাকি, ব্যাধি আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, আমরা নিজ নিজ কক্ষমধ্যে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ হারাইব। যখন সমস্ত জীবন যমের খাদ্য এবং আমাদিগকেও যখন সেই যমের কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তখন কেন আমরা প্রভুসঙ্গ পরিত্যাগ করিব? এই ঘোর কলির ক্রীড়াভূমি হইতে বিদায়গ্রহণ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।" ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ও গলদেশে তুলসীমালা ধারণ করিয়া ভট্টিনী মহিষী বলিলেন, "প্রাণপতি ব্যতীত আমাদিগের জীবন বিফল।" মহিষীগণ এইরূপে পতির সহগমন-কামনা প্রকাশ করিলে নাজির নাথু তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "সহগমন বড় সুখকর নহে। আপনারা জানেন, চন্দনকাষ্ঠ অতি শীতল, কিন্তু যখন জলন্ত অগ্নিযোগে সেই শীতলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে, তখন কি আপনারা আপনাদিগের এই সঙ্কল্প অব্যাহত রাখিতে পারিবেন? যখন সেই ভীষণ অগ্নিশিখায় আপনাদিগের কোমলাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকিবে, দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তখন হয়ত আপনারা চিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া আসিতে উদ্যত হইবেন; তাহা হইলে আর আপনাদিগের কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনারা সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমার মতে আপনারা এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। আপনাদের সুকোমল দেহে জলন্ত চিতাগ্নিতেজ কিরূপে সহ্য হইবে?" অন্তঃপুররক্ষকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষীগণ বলিলেন, "সমগ্র জগৎ আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণপতিকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" এই বলিয়া মহিষীগণ যথাবিধি স্নানসমাপনপূর্ব্বক বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া মহারাজ অজিতের চরণে জন্মের মত প্রণিপাত করিলেন। মন্ত্রিবর্গ, কবিবৃন্দ এবং পুরোহিতগণ প্রধানা রাজমহিষী চোহানরাজনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি কৃতসঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হউন, পুত্র অভয় ও ভক্তকে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না; আপনি অনাথ, দরিদ্র এবং সাধুদিগের পালয়িত্রী। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি রাজ্যের মঙ্গলসাধনে মনোনিবেশ করুন।" এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "এই জীবন অলীক ছায়া সদৃশ, ইহা কেবল দুঃখের আগার মাত্র। আমাদিগকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন না। কোনরূপ প্রবোধেই

* অজিত অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থায় ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনিই পিতৃহন্তার জননী।

আমাদিগের হৃদয় প্রশান্ত হইবে না। প্রাণপতির সহিত জলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া আমরা এই দুঃখময় জীবনের অবসান করিব।"

অচিরে শোক-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মহারাজ অজিতের মৃতদেহ লইয়া সকলে শ্মশান-অভিমুখে গমন করিল। অবিরত হরিনামধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় পথিমধ্যে দীনদরিদ্রদিগকে অর্থরাশি বিতরিত হইতে লাগিল। মহিষীগণের মুখমণ্ডল অপূর্ব্বজ্যোতি ধারণ করিল। স্বর্গ হইতে উমাদেবী রাজমহিষীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহাদিগের সেই অতুলনীয় পতিভক্তির পুরস্কারস্বরূপ দেবী এই বর দান করিলেন যে, তাঁহারা যেন জন্মান্তরে অজিত-কেই পতি প্রাপ্ত হন। সুসজ্জিত চিতার উপর রাজার মৃতদেহ স্থাপিত হইল। অচিরেই অগ্নি-সংযোগে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চিতাধূমরাশি গগন-স্পর্শ করিল। সমবেত ব্যক্তিসকল "থামান থামান" (উত্তম উত্তম) বলিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবকন্যাগণ যেরূপ মানসসরোবরে অবগাহন করেন, মহিষীগণও সেইরূপ সেই অনলে দেহ ঢালিয়া দিলেন। তাঁহারা পতির অনুগমন করিয়া স্ব স্ব বংশ পবিত্র করিলেন। শূন্য হইতে দেবগণ বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য ধন্য অজিত! স্বধর্ম্মের সম্মানবৃদ্ধি ও অসুরদিগের পরাভব করিয়াছ।" সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, গঙ্গা এবং গোমতী সকলে একত্র হইয়া সেই সাধ্বী মহিষীদিগকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। ৪৫ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন মর্ত্যধামে অবস্থান করিয়া মহারাণা অজিত অমরপুরে প্রস্থান করিলেন।

অজিত জন্মভূমির কৃতজ্ঞ সন্তান। তিনি স্বজাতির পরম হিতৈষী, স্বধর্ম্মের অভ্যুদয়সাধক, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহার জীবনী নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। অজিতের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা হিন্দুকুলচূড়ামণি মহারাজ যশোবন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজভক্ত রাঠোরসামন্তগণের বীরত্বেই অজিতের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য অসংখ্য রাঠোরসামন্ত সম্মুখসমরে মহাবীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবেন বলিয়াই বিধাতা অজিতকে নরপিশাচ আরঙ্গজেবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে রক্ষিত হইয়াও তাঁহার প্রাণের ভয় বিদূরিত হয় নাই। মারবারের অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে আবুশিখরে অতি সংগোপনে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। তৎ-পরে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইবামাত্র তিনি অনুরক্ত বিক্রমশালী সামন্তগণের সহিত পিতৃরাজ্য উদ্ধার জন্য বহির্গত হইলেন। অজিত জন্মিয়া অবধি যত দিন জন্মভূমির উদ্ধারসাধন করিতে সমর্থ না হইয়াছিলেন, তত দিন রাঠোরজাতি তাঁহার প্রতি যেরূপ অচলা রাজভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সামন্তদলের মধ্যে সেরূপ রাজভক্তির আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয় না। সপ্তবর্ষবয়সে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে অজিত যে রাজপুত-সামন্তগণের নয়নপথে একবারও পতিত হন নাই, সেই সকল সামন্তও অজিতের জন্য যবনসমরে অকাতরে আপনাদিগের অমূল্যজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। রাঠোরকবি বলিয়া গিয়াছেন, তরুণ অরুণোদয়ে যেরূপ কমলদল বিকসিত হয়, সেইরূপ সেই শিশু অধীশ্বরকে দর্শনমাত্র প্রত্যেক রাঠোরের হৃদয়কমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাঠোরজাতির প্রত্যেক সম্প্রদায় ষড়্‌বিংশবর্ষকালব্যাপী সমরে যেরূপ আত্মশোণিত দান করিয়া-ছেন, রাঠোর ইতিবৃত্তে তাহার আংশিক বিবরণ বিদিত হইবার সম্ভাবনা। স্বধর্ম্ম এবং নরপতিগণের স্বাধীনতা-সঞ্চয় জন্য যে বীরবৃন্দ জীবনদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ সংস্থাপিত মন্দিরগাত্রে যে লিপি ক্ষোদিত আছে, তৎসমুদায়ও বিলক্ষণরূপে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি বিঘোষণ করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের আবশ্যক হইলে মিবার, অম্বর প্রভৃতি রাজ্যসমূহের কবিগণের এবং রাঠোরদিগের চিরশত্রু যবনের ইতিহাসই অলন্ত প্রমাণ।

অজিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার শরীরও বীরপুরুষের ন্যায় ছিল; দুর্দ্ধর্ষ সাহসেও তিনি পিতার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ। একাদশবর্ষ বয়সেই তিনি নিজ রাজধানীমধ্যে শত্রুসমক্ষে উপস্থিত হইয়া সেই অসীমসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন বিনয়নম্র আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল রাজপুতগণই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতিবৎসরে যে সকল খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেক সময়েই অজিত স্বয়ং সমগ্র রাঠোরসৈন্যসামন্তসহ মহাবীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সংবতে দুর্দ্ধর্ষ সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত ভীষণ সংগ্রাম হয়, যে সংগ্রামে অজিত সৈয়দদ্বয়ের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, সেই যুদ্ধেও অজিত স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। অজিতের জীবনের অবশিষ্টাংশ রাজসভাতেই অতিবাহিত হয়। অজিত যেরূপ মহাবলশালী ও অসীমসাহসী ছিলেন, ষড়্‌যন্ত্রবিদ্যাতে সেইরূপ পারদর্শী হইতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই সৈয়দদ্বয়কে দমন করিয়া প্রবলপ্রতাপ বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন। ফিরিকশিয়র হইতে মহম্মদ শাহ পর্য্যন্ত যে কয়েকজন সম্রাট্ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, অজিতই তাঁহাদিগের অভিষেকের নেতা ছিলেন। বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পিতার ন্যায় তিনিও মুসলমানদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; যে কোন উপায়ে হউক, তাহাদিগের বিনাশসাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলে তিনি সে সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না।

অজিতের জীবনী একটি দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত। রাজরূপক গ্রন্থে এই কলঙ্কের কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা এরূপ প্রমাণিত যে, তাঁহার জীবনী-সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়া, যে ঘটনাটি রাজপুতজাতির চরিত্রের পূর্ণচিত্র প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, যে ঘটনা রাজপুতসামন্তশাসনের অপূর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, সেই ঘটনার বর্ণনা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। যিনি তাঁহার রক্ষক, যৌবনে শিক্ষাদাতা ও উপদেষ্টা, সেই মহাবীর দুর্গাদাসকে তিনি রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্গাদাস অনেকবার অনেক স্থলে মহোচ্চ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ ধনলোভ ও মহোচ্চ সম্মান-লোভও সংবরণ করিয়াছেন। সেই ধনলোভ সেই সম্মানলোভ পরিহার না করিলে তিনি সামান্য সামন্তপদ হইতে নিজ প্রভু অজিতের ন্যায় সমপদস্থ এবং ক্ষমতাশালী হইতে পারিতেন না। যে দুর্গাদাস বাহুবল, বীরত্ব, বিক্রম ও বুদ্ধিবলে যবনদিগের হস্ত হইতে মারবাররাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দুর্গাদাস সেই মারবাররাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। অজিত কোন্ সময়ে এবং কি কারণে এই গভীর কলঙ্কপঙ্কে মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। বাহাদুর শাহের শিবির হইতে প্রেরিত সংবাদপত্রসকল অনুসন্ধান করিতে করিতে ঘটনাক্রমে সেই বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়। একখানি পত্রে লিখিত থাকে, দুর্গাদাস নিজ পারিবারিক অনুচরবর্গের সহিত উদয়পুরের পেশোলা-সরোবরতীরে বাস করিতেছিলেন এবং প্রত্যহ রাণার নিকট হইতে পঞ্চশত মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেছিলেন। সম্রাট্ বাহাদুর শাহ রাণার নিকট তাঁহাকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলে রাণা অসম্মতি-প্রকাশে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। টড সাহেব ইতিবৃত্তাভিজ্ঞ কোন যতির নিকট ইহা ব্যক্ত করিলে সেই যতি তৎক্ষণাৎ এই শ্লোক উচ্চারণ করেন;—

"দুর্গা দেশ্‌সে কর্‌দিয়া,
গোলা, গঙ্গানী।"

ইহার অর্থ এই যে, দুর্গাদাসকে নির্ব্বাসিত করিয়া গঙ্গানী প্রদেশ একজন্ গোলামের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে।

গঙ্গানী প্রদেশ লুনীনদীর উত্তরতীরে সংস্থাপিত। ইহা কর্ণোট-সম্প্রদায়ের প্রধান নগর। দুর্গাদাস সেই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। এই প্রদেশ এক্ষণে মারবারাধিপতির খাসদখলীভূত। কর্ণোটসম্প্রদায় বীর দুর্গাদাসের স্মরণার্থ সেই গঙ্গানীতে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে আজিও বীরপূজা করিয়া থাকেন।

দশম অধ্যায়

মারবারের অধঃপতন, অভয়সিংহের শাসন, মীনগণের অত্যাচার, রাজপুতের যুদ্ধসভা, শিরবুলন্দের সহিত যুদ্ধ, অভয়ের গুর্জ্জর-শাসন।

দুরাচার অভয়সিংহের পিতৃহত্যারূপ মহাপাপের অনুষ্ঠানে রাঠোরগণের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। মরুক্ষেত্রে অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল। অভয়ের সেই মহাপাপের প্রতিফল তাঁহার বংশধরগণকেও ভোগ করিতে হইয়াছিল। যদি অভয়সিংহ রাজ্যলাভার্থ ধর্ম্মসঙ্গত আচরণের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরগণ ভারতে মহা-প্রতাপান্বিত নরপতি হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রচণ্ড প্রতাপ ব্যাহত করিয়া ফেলিতেন সন্দেহ নাই।

রাঠোরকবি লিখিয়া গিয়াছেন, ১৭৮১ সংবতে মারবারাধিপতি অজিত অমরলোকে গমন করিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ স্বহস্তে অভয়সিংহের ললাটদেশে রাজটীকা, কটিদেশে স্বর্ণকোষবদ্ধ অসি, মস্তকে রাজমুকুট ও হীরকখচিত কিরীট প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে মারবারের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ছত্র, চামর এবং অন্যান্য বহুবিধ মূল্যবান্ উপহারদানে সম্রাট্ অজিতপুত্রের পদোপযুক্ত সম্মান পরিবর্দ্ধিত করিলেন। নাগোর অমরসিংহপুত্রকে প্রদত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই প্রদেশের শাসনভার অভয়সিংহকে অর্পণ করা হইল। এইরূপে মহোচ্চসম্মান প্রাপ্ত হইয়া অভয়সিংহ সম্রাট্-সভা হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নগরের পর নগর অতিক্রম করিয়া অভয়সিংহ রাজধানীতে পদার্পণ করিবামাত্র প্রত্যেক স্থানের কুলবধূ জলপূর্ণ কলস মস্তকে স্থাপন করিয়া সুহেলিয়া সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। * যোধপুরে উপনীত হইয়া

* রাঠোরজাতির কোন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অথবা রাজা গ্রাম বা নগরমধ্যে আগমন করিলে তাঁহার সসম্মান অভ্যর্থনার জন্য গ্রাম বা নগরের প্রত্যেক পরিবারের এক একটি রমণী জলপূর্ণ কলস মস্তকে লইয়া গ্রাম বা নগরের প্রধান নেতার বাটীতে উপস্থিত হন। পরে সকলে মিলিয়া সুহেলিয়া নামক আনন্দসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইয়া আগন্তুক নরপতি বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। আজিও এই প্রথা প্রচলিত আছে। মহাত্মা টড সাহেব রাজবারার সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ মিবারে এইরূপ মহোচ্চ সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইতেন।

অভয়সিংহ রাঠোর-সামন্তদিগকে উপহার, কবি ও চারণদিগকে ধন এবং পুরোহিতদিগকে ভূমি দান করিলেন।

রাঠোর কবি কর্ণিধন-সম্বন্ধে মহাত্মা টড লিখিয়াছেন, "কবি কর্ণিধন কান্যকুব্জের শেষ হিন্দু রাজা জয়চাঁদের সভায় প্রধান কবির বংশে সমুৎপন্ন। কর্ণিধন যেরূপ প্রথমশ্রেণীর কবি, সেইরূপ রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা ও পণ্ডিত ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়েই তিনি নিজ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মারবারের আত্মবিগ্রহকালে প্রত্যেক রাজনৈতিক ঘটনাতেই তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বীরত্ব-সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অতুলনীয় জীবন সংগ্রামে লিপ্ত রাজপুতবীরগণের মধ্যে যাঁহারা জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কবি কর্ণিধন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তৃতীয়তঃ, সার্দ্ধ সপ্তসহস্র কবিতাপূর্ণ সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অক্ষয় নিদর্শন। সেই সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থ যে কেবল তাঁহার পৈতৃকগুণের প্রমাণ, এমত নহে, তিনি নিজ গৌরবগরিমা পরিবর্দ্ধন জন্য যে প্রকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, গ্রন্থখানি তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নরপতির অভিষেক উৎসব অল্পদিনমধ্যেই পরিসমাপ্ত হইল। অভয়সিংহ নাগোর অধিকার জন্য যুদ্ধের আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। যে সময়ে অজিতের সহিত সম্রাট্ মহম্মদ শাহের বিবাদ-বিসংবাদ চলিতেছিল, সেই সময়েই সম্রাট্-পক্ষ হইতে রাও অমরসিংহের উত্তরাধিকারী ইন্দ্রসিংহকে এই নাগোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

যে সময়ে সম্রাটের সেনাদল অজিতের বিরুদ্ধে অজমীর অবরোধ করে, সেই সময় জিজিয়াকর-সংগ্রাহক ইরাদৎ খাঁ ইন্দোর (ইণ্ডের) হস্তধারণপূর্ব্বক নাগদুর্গের (নাগোরের) সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দেন। গোলী সমাধা হইবামাত্র জ্বালামুখীর অবতারসমূহের (অগ্নির অবতারস্বরূপ কামানসমূহের) গাত্রে ছাগরক্ত, ঘৃত ও সিন্দূর বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইল। অভয়সিংহের চতুরঙ্গসৈন্য নবান অধীশ্বরের অধীনে নাগোর অধিকার অভিপ্রায়ে বহির্গত হইল। এই সংবাদ শ্রবণে রাও ইন্দ্র সম্রাট্-স্বাক্ষরিত নাগোর-শাসনসনন্দ অভয়সিংহের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "সম্রাট স্বয়ং আমাকে নাগোর-প্রদেশ প্রদান করিয়াছেন, অন্য কেহ এই প্রদেশ অধিকার করিতে পারিবেন না, অম্বরপতি জয়সিংহ ইহার প্রতিভূ।" অভয়সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নাগোর রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব ভাবিয়া রাও ইন্দ্র সসম্মানে উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন। অভয়সিংহ নাগোর অধিকার করিয়া নিজ অনুজ ভক্তসিংহের হস্তে উহা অর্পণ করিলেন। অভয়সিংহ নাগোর অধিকার করিবামাত্র মিবার, যশল্মীর, বিকানীর এবং অম্বরের অধীশ্বরগণ সসম্মানে অভিনন্দন করিয়া পাঠাইলেন। নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রজাগণ সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৭৮০ সংবতে এইরূপে নাগোরজয় হয়।

১৭৮৩ সংবতে সুচতুর অভয়সিংহ স্বরাজ্যের পশ্চিমসীমান্তবাসী উদ্ধত ভূমিয়াদিগের দমনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। বিন্দিল, দেবরা, বালা, বোরা, বলিচা এবং সেদাগণ অভয়সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল।

১৭৮৩ সংবতে সম্রাট্-সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য অভয়সিংহের নিকট একখানি আদেশপত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অনুমতি মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তিনি নিজ অধীনস্থ সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং অচিরেই তাঁহাদিগের সহিত দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে প্রত্যেক প্রদেশ, দুর্গ এবং সৈন্যগণের পরীক্ষা, শাসনের সুব্যবস্থা ও প্রজাগণের

ন্যায্য প্রার্থনা পূরণ করিলেন। পুরবতখাঁর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াই অভয়সিংহ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই সঙ্কট হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সকলে জগৎরাণীর (শীতলা-দেবীর) উপাসনা করিতে লাগিলেন।

১৭৭৪ সংবতে অভয়সিংহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সসম্মানে তাঁহাকে রাজধানীমধ্যে আনয়ন করিবার জন্য সম্রাট্ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সামন্তকে প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। অভয়-সিংহ সম্রাট-সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক সম্রাট্ কহিলেন, "খোসবক্ত! (সৌভাগ্যবান্) মহারাজ রাজেশ্বর! বহুদিন পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। অদ্য আমি পরম আনন্দলাভ করিলাম। আজি আমখাস-সভার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইল।" অভয়সিংহ বিদায়গ্রহণ করিলে সম্রাট্ তাঁহার বাসভবনে নানাবিধ সুস্বাদু ফল, সুগন্ধি তৈল ও গোলাপজল পাঠাইয়া দিলেন।

মরুরাজ অভয়সিংহকে সম্রাট্, আমীর ও সামন্তবর্গের সর্ব্বোচ্চপদে স্থাপন করিলেন; ১৭৮৫ সংবতের শেষভাগে গুর্জ্জরের রাজপ্রতিনিধি শিরবুলন্দ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সেই সূত্রে রাঠোরজাতির বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রকাশের একটি শুভ অবসর উপস্থিত হইল; রাঠোরকবিও কাব্যরচনার উপযুক্ত উপকরণ প্রাপ্ত হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে গোলযোগ প্রবল হইয়া উঠিল। শাহাজাদা জঙ্গলী বিদ্রোহী হইয়া ষষ্টিসহস্র সৈন্য সহ মালব, সুরাট এবং আহম্মদপুরের শাসনকর্ত্তৃগণকে আক্রমণ করিলেন। গিরিধর বাহাদুর, ইব্রাহিম কুলি, রস্তম আলী এবং মোগল মুজায়েৎ প্রভৃতি সম্রাটের প্রতিনিধিগণ শাহজাদার হস্তে নিপতিত হইলেন।

এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সম্রাট্ বিদ্রোহ নিবারণের জন্য শিরবুলন্দ খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য ও তাহাদিগের উপযুক্ত খাদ্যাদির জন্য এক ক্রোর মুদ্রা লইয়া বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রথম যুদ্ধেই তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র সৈন্য পরাজিত হইল। শিরবুলন্দ খাঁ বিদ্রোহীদিগের সহিত সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক অধিকৃত দেশ বিভাগ করিয়া লইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে মারবারাধিপতি নিজ পৈতৃকরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিরবুলন্দ খাঁর বিদ্রোহিতা উপলক্ষে কবি কর্ণিধন যেরূপ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, আমরা এই স্থলে তাহা সন্নিবেশিত করিলাম। কবি লিখিয়াছেন:—

সম্রাট্ মহম্মদ শাহ দ্বিসপ্ততিসংখ্য সম্রান্ত ওমরাহে পরিবেষ্টিত হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শিরবুলন্দ খাঁর বিদ্রোহিতার সংবাদ আসিল। শিরবুলন্দ গুর্জ্জর সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া আপনাকে তৎপ্রদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তিনি মণ্ডল, ঝালা, চৌরসীমা, ভাগল ও গোহিলজাতিকে পরাস্ত এবং বালাজাতিকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। হালর জাতি তাঁহাকে কর প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে। শিরবুলন্দের পরাক্রম এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, ভূমিয়াগণ নিজ নিজ দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়াছে এবং তাঁহাকে সপ্তদশ সহস্র প্রদেশের (আর্য্যশাসনকালে গুর্জ্জর সপ্তদশ সহস্র গ্রামনগরে পূর্ণ ছিল বলিয়া সপ্তদশ সহস্র নামে অভিহিত) অধীশ্বররূপে সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। শিরবুলন্দ আপনাকে আহম্মদাবাদের অধিপতি বলিয়া বিঘোষণপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন।

সম্রাট্ বিবেচনা করিলেন যে, যদি এই বিদ্রোহের শান্তি না হয়, তাহা হইলে সকল রাজপ্রতিনিধিই আপনাদিগকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিবে। ইতিমধ্যেই উত্তরে জাওরিয়া খাঁ, পূর্ব্বাঞ্চলে সৈয়দ খাঁ এবং দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল-মুলুক আপনাদিগের পাপ অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছে।

সম্রাটের আদেশে মীর তাজুক একখানি সুবর্ণপাত্রে বীরা (তাম্বুল) রাখিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট বলশালী আমীর, ওমরাহ এবং দেশীয় নৃপতিগণের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিলেন। এইরূপ প্রথা ছিল, যে সাহসী বীর বীরা গ্রহণ করিতেন, তিনিই সভাস্থলে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইতেন; কিন্তু কেহই বীরা গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না। কেহ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কাহারও শরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল, সেই বীরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও কেহ সাহস করিলেন না।

যিনি ইচ্ছামাত্র পথের ভিখারীকে দশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলেই যিনি আমীরকে ভিখারী করিতে সমর্থ, আজি সেই প্রচুর-শক্তিমান্ সম্রাট্ বীরশূন্য। আমীরদিগের মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিলেন, "যাঁহার প্রজ্বলিত শিখাবিশিষ্ট বজ্রাগ্নি ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে, তিনিই শিরবুলন্দের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হউন।" অপর এক ব্যক্তি বলিলেন, "যিনি বন্যামুখে পতিত তরীসহ সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইতে পারেন, তিনিই শিরবুলন্দের সহিত সমর করিতে সমর্থ।" আর এক জন কহিলেন, "যিনি বিষধর সর্পের মুখে হস্তপ্রদান করিতে সাহস করেন, তিনিই শিরবুলন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হউন।"

সম্রাট্ বিষম বিপদে পতিত হইলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল পরিশুষ্ক হইল। সম্রাট্‌কে বিষণ্ণ দেখিয়া রাঠোররাজ অভয়সিংহ হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক বীরা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "জগতের সম্রাট! আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমি নিশ্চয়ই সেই শিরবুলন্দকে পরাভূত করিব, নিশ্চয়ই তাহার আশালতা উন্মূলিত হইবে; শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহার ছিন্নমুণ্ড আনিয়া আপনার সিংহাসনতলে উপহার প্রদান করিব।"

অভয়সিংহ স্বহস্তে বীরা গ্রহণ করিলেন, হিংসাবশে আমীরগণের বক্ষঃস্থল যেন পক্বদাড়িম্বের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই সম্রাট্ অভয়সিংহের হস্তে গুর্জ্জরের শাসনসনন্দ প্রদান করিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপ্লুত হইল, সম্রাট্ বলিলেন, "সিংহাসনরক্ষার জন্য আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ বীরাচরণ করিয়া গিয়াছেন; সম্রাট্ জাঁহাগীরের শাসনসময়েই এইরূপে কুমার খুরম ও ভীমের বিদ্রোহিতা নিবারিত হইয়াছিল; দাক্ষিণাত্যের গোলযোগও এইরূপে বিদূরিত হয়। আমার বিশ্বাস, আপনিও সেইরূপে মহম্মদ শাহের সম্মান ও সিংহাসন রক্ষা করিতে পারিবেন।"

সম্রাট মহম্মদ শাহ রাঠোরপতি অভয়সিংহকে মহামূল্য সাতটি রত্ন ও নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। ধনাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, সৈন্যগণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অভয়সিংহ একত্রিংশ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। অস্ত্রাগার হইতে তাঁহাকে কামানসকল প্রদত্ত হইল। সম্রাট্ কর্ত্তৃক এইরূপে আহম্মদাবাদ ও অজমীরের রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইয়া শাসনসনন্দ গ্রহণপূর্ব্বক অভয়সিংহ ১৮৮৬ সংবতের আষাঢ়মাসে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

এই সময় হইতেই মোগলসম্রাটের সহিত মারবারের রাজনৈতিক বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। শিরবুলন্দের বিদ্রোহিতাই সাম্রাজ্যবিভাগের পূর্ব্বলক্ষণ। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে মারবাররাজ

দিল্লীর সম্রাট্-সভা হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। অভয়সিংহ অজমীরের রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত। সর্ব্বাগ্রে অজমীরে গমন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কারণ, অজমীরে মারবারের (কেবল মারবারের নহে, রাজপুতনার প্রত্যেক রাজ্যের প্রবেশপথস্বরূপ) উহা অধিকার করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সেই সংশয়জনক রাজনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে অম্বরপতির সহিত পরামর্শ করিবেন। কি অভি-প্রায়ে জয়সিংহ অজমীরে উপস্থিত ছিলেন, রাঠোর-ইতিবৃত্তে কিন্তু তাহার উল্লেখ নাই। অনুমান হয় যে, পুষ্করতীর্থে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সময়ে অজমীরে আগমন করিয়াছিলেন। এই নরপতিদ্বয়ের সাক্ষাৎ সন্দর্শন রাঠোরকবি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, হিন্দুনরপতিদ্বয়ের জন্য উষ্ণীষবসন বিস্তৃত হইলে তাঁহারা তাহার উপর দিয়া আগমনপূর্ব্বক একত্র ভোজন করিলেন এবং যবন-সাম্রাজ্যধ্বংসের জন্য গুপ্ত পরামর্শে লিপ্ত হইলেন। এইরূপ বর্ণনাদৃষ্টে বোধ হয় যে, কর্ণিধন এই গুপ্ত রাজনৈতিক পরামর্শের বিষয় বিদিত ছিলেন।

অজমীরে নিজকর্ম্মচারিগণকে যথাযোগ্যপদে নিযুক্ত করিয়া অভয়সিংহ মৈরতা অভিমুখে গমন করিলেন। তদীয় অনুজ ভক্তসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে ভক্তসিংহ নাগোরশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় যোধপুর-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে অভয়সিংহ সামন্তগণকে বিদায় দিলেন; বলিয়া দিলেন যে, শীঘ্রই শিরবুলন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে; আপনারা সত্বর সেনাবল সংগ্রহ করিয়া যোধ-পুরে সমবেত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মারবারের রাঠোর-সামন্তমণ্ডলী নিজ নিজ সুসজ্জিত সৈন্যসহ যোধপুরে আসিয়া মিলিত হইলেন। রাঠোরকবি সামন্তগণের এই সমরায়োজনের বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সৈন্যগণ সমবেত হইলে শাস্ত্রানুসারে কামানশ্রেণীর পূজা হইল। রাঠোর-বীরগণ স্বহস্তে ছাগ বলিদান করিয়া সেই বলিদত্ত ছাগরক্ত, চন্দন বা ঘৃত দ্বারা কামানশ্রেণীর গাত্র সুশোভিত করিয়া দিলেন।

শিরবুলন্দের বিদ্রোহনিবারণের পরিবর্ত্তে অভয়সিংহ প্রথমতঃ প্রতিবাসী শিরোহীপতিকে প্রতিফল প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি এখন গুর্জ্জরের রাজপ্রতিনিধি, প্রচণ্ড সেনাদল তাঁহার অধীনে সমবেত, তিনি এরূপ শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। শিরোহী-পতিকে দমন করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শিরোহীপতি যেরূপ উগ্রপ্রকৃতি, সেইরূপ অমিততেজা স্বাধীন বীর ছিলেন। তিনি কখন কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন নাই। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। শিরোহীপ্রদেশ দুর্গম গিরিদুর্গোপরি সংস্থিত, তিন দিকে পার্ব্বতীয় আদিম অধিবাসীদিগের বাস। সেই অসমসাহসী পার্ব্বতীয়দিগের সহিত মিত্রতাস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের সহায়তায় শিরোহীরাজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শিরোহীরাজ্যের যে অংশ মারবারাভিমুখে সংস্থিত, সেই অংশরক্ষার জন্যই কেবল তাঁহাকে সবিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে হইত।

শিরোহীরাজ্যের তিন দিকে যে পার্ব্বত্যজাতির বাস, তাহারা মীননামে পরিচিত। ইহারা অভয়সিংহের বিষনয়নে পতিত হইয়াছিল। দিল্লী হইতে যোধপুরে আগমন এবং সামন্তমণ্ডলীকে বিদায়দান, এই উভয়ের ব্যবধানগতকালে অভয়সিংহ অহিফেন-সেবন ও বিলাসিতায় উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে মীনগণ তাঁহার সৈন্যকটক হইতে পশুপাল হরণ করিয়া আপনাদিগের পর্ব্বতপ্রদেশে পলায়ন করে। এই সংবাদ অভয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রশান্তগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "তাহারা আমার পশুপাল হরণ করে নাই। তাহারা জানে, আমার পশুগণের জন্য

যথেষ্ট খাদ্যসঞ্চয় নাই, তাহারা 'পার্ব্বত্যপ্রদেশে পশুদিগকে আহার্য্য দিবার জন্যই লইয়া গিয়াছে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, মহারাজ অভয়সিংহ যুদ্ধযাত্রার উদ্‌যোগ করিবামাত্র মীনগণ সেই অপহৃত পশুপাল আনিয়া প্রত্যর্পণ করিল। তখন অভয়সিংহ আপন সামন্তগণকে বলিলেন, "আমি ত বলিয়াছি, এই মীনগণ আমার বিশ্বস্ত প্রজা।"

১৭৮৬ সংবতের চৈত্রমাসের দশম দিবসে অভয়সিংহ যোধপুর হইতে বহির্গত হইয়া ভদ্রার্জ্জুন, মল্লগড়, শিবানো ও ঝালোর অতিক্রমপূর্ব্বক রেবারো প্রদেশ আক্রমণ করিলে তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শত্রুদলের অসিবর্ষণ হইতে লাগিল। চম্পাবৎ-নেতা নিহত হইয়া রণভূমে নিপতিত হইলেন, দেবরাগণ প্রাণভয়ে পার্ব্বত্যপ্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। গিরিপৃষ্ঠে এক দল সৈন্য রক্ষা করিয়া অভয়সিংহ সসৈন্যে পশালিয়ো প্রদেশে গমন করিলেন। আবুশিখর ভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। শিরোহীরাজ্য দুঃখসাগরে ভাসিতে লাগিল। রেবারো এবং পশালিয়ো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শিরোহীপতি নিরাশাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। শিরোহী-পতি চৌহানরাজ রাও নারায়ণদাস অভয়সিংহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাজ্যরক্ষা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

মায়ারাম নামক সৌরবংশীয় এক রাজপুতসামন্তের মধ্যস্থতায় শিরোহীপতি রাও নারায়ণদাস অভয়সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তাঁহার হস্তে নিজ অগ্রজ মানসিংহের কন্যাকে সম্প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। রণক্ষেত্রেই নারায়ণদাস বিবাহের সম্বন্ধসূচক একটি নারিকেল, আটটি উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং চারিটি হস্তীর মূল্য পাঠাইয়া দিলেন। অভয়সিংহও বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিয়া ঐ সকল উপহার সাদরে গ্রহণ করিলেন। রণবাদ্য নিবারিত হইল, বিবাহোৎ-সবের আনন্দকোলাহল সমুত্থিত হইল। এই বিবাহের দশ মাস পরে যোধপুরে রামসিংহের জন্ম হয়। এই সন্ধিসম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত বিষয় সকল বর্ণন করিয়া রাঠোরকবি লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইউরোপের ন্যায় রাজপুতদিগের মধ্যেও বিশুদ্ধ গূঢ় রাজনীতির অভাব ছিল না। রাও নারায়ণদাস পরমসুন্দরী ভ্রাতু-পুত্রীকে অভয়সিংহের হস্তে সম্প্রদান ব্যতীত গোপনে করপ্রদানপূর্ব্বক সন্ধিবন্ধন করিয়া লইলেন।

বিদ্রোহী শিরবুলন্দকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে দেবরা-সামন্তগণ স্ব স্ব অধীনস্থ সৈন্যসহ রাজকীয় সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতীতীরবর্ত্তী পাহ্লনপুর ও সিদ্ধপুর অতিক্রম করিলেন। শিরবুল-ন্দের দুর্গের নিকট আসিয়া তিনি বুলন্দের নিকট একটি দূত প্রেরণ করিলেন। দূতমুখে বিজ্ঞাপিত হইল যেন তিনি অবিলম্বে রাজকীয় কামান প্রভৃতি সামরিক এবং অন্যান্য দ্রব্যসমূহ প্রত্যর্পণ করেন, রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেন এবং আহম্মদাবাদ ও তৎপ্রদেশস্থ দুর্গসমূহ হইতে বিদ্রোহী সৈন্যসকল বিদায় করিয়া দেন। অভয়সিংহের এই আদেশে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া শিরবুলন্দ গর্ব্ব ও অহঙ্কার সহকারে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি স্বয়ং রাজা, যত দিন আমার দেহে মস্তক বিরাজ করিবে, তত দিন কাহাকেও রাজ্য প্রত্যর্পণ করিব না।"

দূত প্রত্যাগত হইল। দূতমুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাঠোররাজ রোষপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অচিরেই রাজপুতশিবিরে একটি মহতী সামরিকসভা আহূত হইল। মরুক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান অষ্টসামন্তগণ সেই সভায় যুদ্ধসম্বন্ধে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। চম্পাবৎবংশীয় প্রধান সামন্ত আহোরপতি হরনটের পুত্র কুশলসিংহ সর্ব্বাগ্রে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে কুম্পাবৎ-সম্প্রদায়ের নেতা আশোপপতি কানাইরাম বলিলেন, "আসুন, কিলকিলার (মাছরাঙ্গা পক্ষীর) ন্যায় আমরা সমরসাগরে ঝম্প প্রদান করি।" অতঃপর মৈরতীয়-সর্দ্দার কেশরীসিংহ স্বীয়

অভিমত প্রকাশ করিলে, উদাবৎ-সম্প্রদায়ের বয়োবৃদ্ধ, অসমসাহসী, বীর নেতা নিজ মনোভাব প্রবিব্যক্ত করিলেন। পরে যোধসম্প্রদায়ের নেতা থানায়োপতি এই বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন যে, "আমি সর্ব্বাগ্রে সমরক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জনপূর্ব্বক অপ্সরোগণের বরমাল্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী। আসুন, আমরা কুস্থমশোভিত পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক রক্তবর্ণে অসিভল্ল রঞ্জিত করিয়া শিরবুলন্দের মস্তক লইয়া ক্রীড়া করি।" জৈতাবৎ ফতেসিংহ এবং করুণাবৎ অভয়মল্ল ঐ কথায় অনুমোদন করিলেন। সকলেই সমস্বরে "সংগ্রাম সংগ্রাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ভানুলোক জয় করিতে মনস্থ করিলেন। চম্পাবৎ কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "অমৃতপূর্ণ পাত্র হস্তে অপ্সরোগণ সূর্য্যলোকে আমাদিগকে সাদরসম্ভাষণ করিবে।" প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক সামন্ত এবং প্রত্যেক কবি সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সংগ্রাম সংগ্রাম!" অতঃপর ভক্তসিংহ নিজ অগ্রজ অভয়সিংহ এবং রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনারা এই শিবিরে বিশ্রামলাভ করুন, আমি সর্ব্বাগ্রে সৈন্যদল চালনা করিয়া শিরবুলন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করি।" সাদরে কনিষ্ঠ সোদরকে আলিঙ্গন করিয়া অভয়সিংহ তাঁহাকে সেনানীপদে বরণ করিলেন। অচিরে কুস্থমবাসিত একটি জলপূর্ণ কুম্ভ নবাভিষিক্ত সেনাপতির সম্মুখে স্থাপিত হইল। তিনি সেই জল সকলের গাত্রে সিঞ্চন করিবামাত্র সকলেই সমস্বরে বলিলেন, "এই সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে অমরপুরে বাস করিতে পারিব।"

অতঃপর সভাভঙ্গ হইল। রাঠোরবীরবৃন্দ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলেন। এ দিকে আত্মরক্ষার জন্য শিরবুলন্দও নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে দুই দুই সহস্র সৈন্য এবং পাঁচ পাঁচটি কামান স্থাপিত করিলেন। কামানগুলি ফিরিঙ্গী গোলন্দাজগণের হস্তে অর্পিত হইল। এক দল বন্দুকধারী সৈন্য তাঁহার শরীররক্ষকরূপে নিকটে অবস্থিত থাকিল। অচিরেই সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কামানের বিভীষণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষ হইতে ক্রমাগত তিন দিন এইরূপ গোলাবর্ষণের পর শিরবুলন্দের পুত্র নিহত হইলেন। ভক্তসিংহ রাঠোরসৈন্যসহ বিপক্ষপক্ষ আক্রমণ করিলেন। প্রত্যেক রাজপুতসামন্তই এই সময়ে নিষ্কোষিত অসি ও ভল্ল হস্তে ভক্তসিংহের ন্যায় রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। চম্পাবৎ-সম্প্রদায়ের নেতা কুশলসিংহ রণক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। অভয়সিংহ এবং ভক্তসিংহ উভয় ভ্রাতাই রণরঙ্গে মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে শত্রুপক্ষের একাধিক নেতার প্রাণবিনাশ হইল।

দিবা অবসানপ্রায়। শিরবুলন্দ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের নেতা উলিয়ার খাঁ অসমসাহসের সহিত শত্রুগণসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি শেষে ভক্তসিংহের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। রাঠোরপক্ষে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। নবাব রণকুণ্ডে আজি সমস্ত গর্ব্ব বিসর্জ্জন করিলেন। শিরবুলন্দের রণমাতঙ্গ তীব্রবেগে পলায়ন করিল। এই সময়ে বিপক্ষপক্ষের ৪৪৯৩ জন হত হয়, তন্মধ্যে একশত জন পালকীনশীন, আট জন হাতীনশীন এবং তিন শত তাঞ্জামনশীন। অভয়সিংহের পক্ষে এক শত বিংশতি জন উচ্চশ্রেণীর রাঠোরসেনানী এবং পাঁচ শত অশ্বারোহীসৈন্য হত ও সপ্তশত সৈন্য আহত হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে শিরবুলন্দ খাঁ অভয়সিংহের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার অনুচর ও সহযোগিগণ বন্দী হইলেন। আহত মোগলগণের মধ্যে অনেকেই বন্দিভাবে প্রাণ হারাইলেন। এই সময়ে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হেতু বীরবর অভয়সিংহ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর সপ্তদশ সহস্র নগরপূর্ণ গুর্জ্জর, নয় সহস্র নগরপূর্ণ মারবার এবং এক সহস্র নগরপূর্ণ অন্য একটি

প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ইদর, ভুজ, পাকর্‌র, সিন্ধু, শিরোহী, ফতেপুর, ঝুনঝুনু, যশল্মীর, নাগোর, ডুঙ্গারপুর, বংশবারা, লুনাবারা, হুলাবাদ প্রভৃতি প্রদেশসমূহের অধীশ্বরগণ প্রতিদিন প্রাতে মহারাজা অভয়সিংহের পদে প্রণত হইতেন।

যে বিজয়া-দশমীতে রামচন্দ্র লঙ্কাজয় করেন, ১৭৮৭ সংবতের (খৃঃ অব্দ ১৭৩১) সেই বিজয়া-দশমী তিথিতে দ্বাদশ সহস্রের অধিনায়ক শিরবুলন্দ খাঁর সহিত সমর সমাপ্ত হইল।

জনপদ ও রাজধানী রক্ষার জন্য সপ্তদশ সহস্র সৈন্য রাখিয়া লুণ্ঠিত ধনরত্নাদিসহ অভয়সিংহ নিজ রাজধানী যোধপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুর্জ্জর জয় করিয়া অভয়সিংহ তথা হইতে নগদ চারি কোটি মুদ্রা, এক সহস্র চারি শত নানাজাতীয় কামান এবং অগণিত সামরিক দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলেন। মোগলসাম্রাজ্য অধঃপতনোন্মুখ দেখিয়া মহারাজ অভয়সিংহ সেই সমস্ত উপকরণ দ্বারা নিজদুর্গ এবং সেনাবল দৃঢ় করিয়া লইলেন। অবশেষে নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া মোগলশাসনের সম্পূর্ণ বিলোপদর্শনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

একাদশ অধ্যায়

ভ্রাতৃসংঘর্ষ, অভয়সিংহকর্তৃক বিকানীর আক্রমণ, জয়সিংহের সহিত অভয়ের বিবাদ, রাঠোর ও কুশাবহযুদ্ধ, গাঙ্গেরিয়া যুদ্ধ, ভক্তসিংহের কঠোর উদ্যম, সৈন্যক্ষয় হেতু ভক্তের বিলাপ, অভয়সিংহের মৃত্যু।

আশা স্বার্থের সহচরী। আশার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া স্বার্থপরায়ণতা যাহার হৃদয় অধিকার করে, স্বার্থের পাপমন্ত্রে যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয়, সংসারে সে হিতাহিতবিবেচনাপরিশূন্য হইয়া পদে পদে ঘৃণিত, জঘন্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। সেই স্বার্থের কুহকে মুগ্ধ হইয়া অভয়সিংহ স্বীয় জন্মদাতার প্রাণসংহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সহোদরের সহায়তায় তিনি এই মহাপাপে কলুষিত হইয়াছিলেন। অবশেষে আবার সেই সহোদর ভক্তসিংহের সর্ব্বনাশ করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

রাজবারার সর্ব্বত্রই ভক্তসিংহের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইত; সকলেই তাঁহার সাহস, কার্য্যদক্ষতা ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিত। অভয়সিংহের হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না। ভক্তের রণনৈপুণ্যের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মন ভীষণ চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িল। প্রতিনিয়ত তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন, ভক্ত মারবারের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সশস্ত্রবেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। সেই আশঙ্কায় অভয়সিংহ একান্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইতেন এবং মনে মনে সহোদরের সর্ব্বনাশকামনা করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ভক্তকে নাগোররাজ্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিতেন, কিন্তু পাছে ভক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, এই ভয়ে তাহাতে সাহস করিলেন না। এই প্রকারে কিছু দিন অতীত হইল। ক্রমে শিরবুলন্দের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আবার শান্তিস্থাপন হইল। অভয়সিংহ ভাবিলেন, সেই শান্তি সমভাবে থাকিবে;

কিন্তু তাঁহার মনের দোষেই সেই শান্তি অশান্তিতে পরিণত হইল। তিনি স্বভাবতঃ অলস, তাহাতে অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করিতেন। দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের আশায় তিনি অহিফেনের মাত্রা বাড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

ভক্তসিংহ জ্যেষ্ঠের ভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে জ্যেষ্ঠকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিলেন, ভক্ত নিজ উদ্ধত প্রকৃতির বিষয়ও বুঝিতেন; সেই ঔদ্ধত্যের জন্যই রাঠোরগণ তাঁহাকে সদা সশঙ্কভাবে দেখিত, অনেকে তাঁহাকে অবিশ্বাসও করিত। স্বদেশবাসিগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বিশেষ সতর্ক না হইলে নাগোরের ত্রিশত ষষ্টি নগর কদাচ রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিদেশীয় বলের সাহায্য গ্রহণ করাও তাঁহার অভিলাষ নহে; তিনি জানিতেন যে, যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে নিজ বাহুবলেই করা কর্ত্তব্য। এই ধারণা অনুসারে এতদিন তিনি নিজ পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি কবি কর্ণের পরামর্শে তিনি এক অদ্ভুত নীতির অনুসরণ করিলেন। কবি কর্ণ শিরবুলন্দের পরাজয় বিবরণের সহিত স্বীয় কাব্যগ্রন্থ শেষ করিয়া যোধপুর হইতে নাগোরে উপস্থিত হইলেন। কর্ণ কূটমন্ত্রণায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন, রাঠোরগণ তাহা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতেন; সুতরাং তাঁহার পরামর্শ কেহই অগ্রাহ্য করিতেন না। যোধপুর হইতে তিনি নাগোরে উপস্থিত হইলে ভক্ত সাদরে ও সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজকুমার স্বীয় অবস্থার বিষয় আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন কবি তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, "অম্বররাজের সহিত মহারাজের বিবাদ বাধাইয়া দিতে পারিলেই আপনার শ্রেয়ঃসাধন হইবে।"

কবির মন্ত্রণা সাদরে গৃহীত হইল। ভক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আশু উপযুক্ত অবসরও উপস্থিত হইল। বিকানীরের রাজপুত্র কোন কারণে অভয়সিংহের ক্রোধানল উদ্রিক্ত করিলে মারবারপতি তাঁহাকে শাস্তি দিয়া সেই উত্তেজিত রোষানল নির্ব্বাণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং সসৈন্যে তাঁহার রাজধানী অবরোধ করেন। বিকানীররাজ অনেক চেষ্টাতেও নগরোদ্ধারে সমর্থ হইলেন না। রাঠোর সর্দ্দারগণ এই সময়ে অবরুদ্ধ নাগরিকবৃন্দের প্রতি যেরূপ সানুগ্রহ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা অধিপতির সম্মানরক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ না করিয়া ভিতরে বিকানীরপতিকে অহিফেন, লবণ ও অস্ত্রশস্ত্রাদির সংযোজনা করিয়া দিয়া নিতান্ত নিস্তেজভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিকানীরপতি আরও কিছু দিন আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। রাঠোরসর্দ্দারেরা বিকানীররাজকে সেরূপ সাহায্য না করিলে তাঁহাকে অভয়সিংহের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইত। রাঠোরসর্দ্দারগণের এরূপ আচরণের প্রকৃত কারণ এই যে, সাজাত্য ও সৌহার্দ্দবশতঃ তাঁহারা রাজার অজ্ঞাতসারে অবরুদ্ধ সৈনিকদিগের উদ্ধারের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিকানীর তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের শোণিতে পরিপুষ্ট, বিকানীররাজের ধমনীতে যে শোণিত, তাঁহাদেরও ধমনীতে সেই এক শোণিত প্রবাহিত। সেই নিকটশোণিতসম্বন্ধনিবন্ধন বিকানীরের রাঠোরেরা মারবারের সম্মানগৌরবরক্ষার্থে অনেকবার আপনাদের হৃদয়শোণিত দান করিয়াছেন; এই কারণেই বিপদের পরম সহায়, চিরবন্ধু বিকানীরপতিকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাঠোরসর্দ্দারগণ গোপনে গোপনে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

এ দিকে কবি কর্ণ ভক্তসিংহকে কহিলেন, "কুমার! এমন অবসর আর হইবে না। এই

সময়ে অম্বররাজকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করুন। আপনার পূজনীয় পিতৃদেব অম্বররাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক কুশাবহরাজের যে অবমাননা করিয়াছিলেন, সে অবমাননার প্রতিশোধ লওয়া হয় নাই; এখন তাহার উপযুক্ত অবসর। জয়সিংহকে সংবাদ প্রেরণ করুন যেন, এই সুযোগেই তিনি যোধপুর আক্রমণ করেন।"

জয়সিংহসমীপে তৎক্ষণাৎ পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে বিকানীরের দূত সময়োপযোগী পরামর্শ জিজ্ঞাসার নিমিত্ত ভক্তসমীপে উপস্থিত হন। ভক্ত মন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে অম্বররাজের নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন; কার্য্যোদ্ধারের গূঢ় কৌশলও বলিয়া দিলেন।

অম্বরপতি অত্যন্ত মদিরাসক্ত। কিন্তু তিনি এই অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ মদিরাদেবীর উপাসনা করিবেন, ততক্ষণ বৈষয়িক কোন কার্য্যই তৎসকাশে জ্ঞাপিত হইবে না। যখন বিকানীরের দূত অম্বরের রাজসভায় উপস্থিত হন, রাজা জয়সিংহ তখন সুরাদেবীর পূজা করিতেছিলেন। সর্দ্দারগণ ভক্তের পত্রপাঠ করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত কি না তৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মীমাংসা হইল, রাঠোরগণের আক্রমণে হস্তার্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। ভক্তসিংহের উদ্দেশ্য বিফল হইল। কিন্তু সুচতুর দূত রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় বিদ্যাধরনামা একটি বিচক্ষণ অম্বরপতির প্রধান দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হয়। কি জ্যোতিস্তত্ত্ব, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র, কি পুরাণতত্ত্ব সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শী ছিলেন। যে জয়পুর নগর আজি শোভা-সৌন্দর্য্যে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ মহানুভব বিদ্যাধরের অঙ্কিত আদর্শ দেখিয়াই সেই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি দূতের একজন প্রিয়সুহৃদ্; এক্ষণে দূত তাঁহারই সাহায্যে রাজদর্শন লাভ করিয়া সবিনয়ে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। জয়সিংহের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কহিলেন, "মহারাজ! বিকানীররাজ বিষম সঙ্কটাপন্ন, এরূপ অবস্থায় আপনি রক্ষা না করিলে অভয়সিংহের আক্রোশে বিকানীর উৎসাদিত হইবে। আমাদের রাজা আপনাকেই মহারাজ বলিয়া স্বীকার করেন; তিনি ভ্রমেও মারবারপতির অধীনতা স্বীকার করেন না, সম্প্রতি আপনি ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর নাই" গর্ব্বে জয়সিংহের হৃদয় অন্ধপ্রায় হইল, তখন তিনি অভয়সিংহকে লিখিলেন, "আমরা উভয়ে এক মহৎ পরিবারের অন্তর্ভূত, অতএব বিকানীরের দোষ ক্ষমা করিয়া তথা হইতে আপনি শিবির উঠাইয়া লইবেন।" এই কথা লিখিয়াই জয়সিংহ আর এক পাত্র সুরাপান করিলেন এবং গুম্ফমর্দ্দন করিতে করিতে চিঠিখানি মুড়িবার জন্য অপরের হস্তে অর্পণ করিলেন। দূত কহিলেন, "মহারাজ! দয়া করিয়া এই দুইটি কথা পত্রখানিতে যোগ করিয়া দিউন, 'নতুবা জানিবেন, আমার নাম জয়সিংহ' তখনই সেই কয়েকটি কথা লিখিত হইল। দূত বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সানন্দে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। দূত রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী ভাঁস্কো-সর্দ্দার রাজসদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার নিকট সেই পত্রের মর্ম্ম ব্যক্ত করিলেন। সর্দ্দার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যদি কচ্ছাবহকুল নির্ম্মূল করিতে অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে আশু সেই পত্র ফিরাইয়া আনিতে অনুমতি করুন্।" তৎক্ষণাৎ দূতের পর দূত প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই সেই পত্রবাহককে দেখিতে পাইল না। সকলের হৃদয়ই আশঙ্কাকুল হইল। সেই দিন 'রসোরা' গৃহে রাজাকে বেষ্টনপূর্ব্বক অম্বরের সমস্ত সর্দ্দার মধ্যাহ্নভোজনে উপবিষ্ট হইলে রাজা সর্ব্বসমক্ষে সেই পত্রের বিষয় প্রকাশ করিলেন। তখন দীপসিংহ কহিলেন,

"মহারাজ! আপনি যে কাজ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমাদিগকে বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হইবে।"

অভয়সিংহের নিকট হইতে আশু সেই পত্রের উত্তর আসিল। "আমার কার্য্যে আপনার হস্তার্পণ করিবার আবশ্যক কি, এরূপ পত্র লিখিবারই বা আপনার ক্ষমতা কি? যদি আপনার নাম 'জয়সিংহ' হয়, তবে স্মরণ রাখিবেন, আমার নাম অভয়সিংহ।"

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া দীপসিংহ বলিলেন, "মহারাজ! দেখুন, যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। এখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার উপায়ান্তর নাই; সম্প্রতি অম্বরের চিরবন্ধু সৈন্য-সামন্তগণকে সমবেত করিতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ গম্ভীররবে নাগরা বাদিত হইল; রণবাদ্য শ্রবণ-মাত্র সর্দ্দার ও সামন্তগণ জাগরিত হইয়া উঠিলেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা প্রচার হইল যে, যুদ্ধক্ষম কচ্ছাবহমাত্রেই আশু রাজপতাকামূলে উপস্থিত হইবে। অম্বরের বিশালবৈজয়ন্তী নগরের বহির্দ্বারে সমুন্নত হইত। দেখিতে দেখিতে অম্বরের চারিদিক্ হইতে কচ্ছাবহ-সৈন্যসামন্ত-গণ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। বুন্দির হারগণ, কেরৌলীর যাদবগণ, শাপুরের শিশোদীয়গণ এবং খীচি ও জাটগণও আসিয়া যোগদান করিল। এইরূপে একলক্ষ সৈন্য অম্বরদুর্গের প্রাকারতলে সমবেত হইল। সেই বিশালবাহিনী প্রচণ্ড পদভরে ধরণী কম্পিত করিয়া ক্রমে ক্রমে মারবারের অভিমুখে অগ্রসর হইল। মুরন্ধরের সম্মুখস্থিত গঙ্গাবানী নামক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া অম্বররাজ স্বীয় শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং যথোচিত শিষ্টাচারের সহিত অভয়-সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে রোষান্বিত রাঠোরপতি বিকানীর হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভক্তসিংহ বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি শুদ্ধ রাজদ্বয়মধ্যে একটু বিবাদ বাধাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই ইচ্ছা হইতে যে বিষম সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পাছে তাঁহার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়, এ আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু এই উপস্থিত আশঙ্কার নিকট সে আশঙ্কা অতি তুচ্ছ। ভক্ত রাজপুত্র, মারবার তাঁহার পিতৃপুরুষগণের লীলাভূমি। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ আছে বলিয়া কি এই বিপদের সময় মাতৃভূমিরক্ষার্থ তিনি একত্র হইবেন না? ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার বিদ্বেষাচরণ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে কহিলেন, "অবরোধ হইতে সেনাবল উঠাইয়া লইবেন না; আমাকে অনুমতি করুন, আমি একাকীই নাগোরের সামন্তগণের সাহায্যে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।" অভয়সিংহ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, ঘোরতর যুদ্ধের সময়ে ভক্তকে সদলে শত্রুমুখে ত্যাগ করিয়া আসবেন; কিন্তু কি জানি, কি ভাবিয়া সম্প্রতি ভক্তের প্রস্তাব গ্রাহ্য করি-লেন না। ভক্ত মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি সেই ভীষণ যুদ্ধের সময় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি-লেন না। নাগোরে প্রতিগত হইয়া দিল্লীতোরণে উপবেশনপূর্ব্বক গম্ভীরশব্দে নাগরাবাদ্য করিতে লাগিলেন। অমনি নাগোরের সর্দ্দারগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্তসহ তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ভক্তের সম্মুখে দুইটি পিত্তলপাত্র ছিল; একটিতে অহিফেনদ্রব্য, দ্বিতীয়টিতে কুঙ্কুমবাসিত স্বচ্ছসলিল। এক একজন সর্দ্দার যেমন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, অমনি ভক্ত তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়া এবং সেই সুবাসিত জলে স্বীয় দক্ষিণকর সিঞ্চিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি অষ্টসহস্র রাজপুতবীরকে কঠোর যুদ্ধব্রতে ব্রতী করিয়া লইলেন,—সেই অষ্ট-সহস্রের মধ্যে সকলেই স্বদেশের জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত। ভক্ত তন্মধ্যে অধিকতম সাহসিক ও

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরদিগকে বাছিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। সেই প্রচণ্ড সেনাদলসহ একটি বিশাল জনারক্ষেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাঠোররাজপুত্র সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বীরবৃন্দ। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ রণভূমে জয়লাভ বা তনুত্যাগ করিতে প্রস্তুত না থাকে, তবে সে প্রতিগমন করুক।" এই কথা বলিয়াই তিনি সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। যাহারা সাহসী, তাহারা তাঁহার অনুগামী হইল। অবশিষ্ট সকলে সেই জনারক্ষেত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া অবনতবদনে গৃহে প্রতিগমন করিল। ভক্ত সেই নিবিড় শস্যব্যবধানে রহিলেন; তাহাদের কলঙ্কিত মুখ তিনি দর্শন করিলেন না। ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া রাঠোরবীর দেখিলেন যে, পঞ্চ সহস্রেরও অধিক সৈন্য তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। তখন সানন্দে তাহাদিগকে লইয়া তিনি ভীষণ সমরসাগরে অবতরণ করিলেন।

গঙ্গবানীতে অম্বরপতির স্কন্ধাবার সংস্থাপিত আছে। দূরে ভক্তের প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য দেখিতে পাইয়া অম্বররাজ নিজ বিশাল বাহিনীকে তাহাদিগের অভিমুখে চালিত করিলেন। ভক্তের আদেশে তদীয় সর্দ্দার ও সামন্তগণ তরবারি ও শূল উদ্যত করিয়া মহাবেগে শত্রুসেনার উপর পতিত হইলেন। দুই দলে ঘোরযুদ্ধ সংঘটিত হইল। ভক্ত সমভিব্যাহারী বীরদিগকে লইয়া অম্বরের বিশাল ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভীষণ মহাকালরূপে অগণ্য শত্রুসেনা নিপাত করিতে করিতে রণভূমির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসেনা মথিত ও বিত্রাসিত করিয়া যখন তিনি তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সেই পঞ্চ সহস্রের মধ্যে কেবল ষাটজন মাত্র তাঁহার অনুগামী ছিল। তাঁহার প্রধান সর্দ্দার গঙ্গসিংহ পুর তি তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমাদের পশ্চাতে একটি নিবিড় জঙ্গল, এই সময়—"

সর্দ্দারের কথায় বাধা দিয়া রাঠোরবীর সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "পশ্চাতে জঙ্গল কিন্তু সম্মুখে কি?—দুর্ভেদ্য বিপক্ষসেনা। তাহাও আমরা ভেদ করিয়াছি;—ভেদ করিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছি, সেই পথ দিয়াই পুনরায় প্রতিগমন করিব।" ভক্তের বাক্য শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে অম্বরের "পঞ্চরঙ্গিণী পতাকা" তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, নেত্রদ্বয় হইতে জ্বলন্ত বহ্নিকণা বহির্গত হইল; জ্বলন্তচক্ষে সেই হতাবশিষ্ট কয়েকটি বীরের দিকে নেত্রপাত করিয়া তিনি জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বীরবৃন্দ! প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, লজ্জাবনতবদনে গৃহে ফিরিয়া যাইও না; ঐ দেখ, স্বর্গে রম্ভা পারিজাতমালা লইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" অমনি সেই কতিপয় বীর শ্রবণভৈরব শব্দে সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া আবার সেই বিশাল শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে ধাবিত হইলেন। এ দিকে সতর্ক খুম্বানীসর্দ্দার (ভাঁস্কোসর্দ্দার) স্বীয় রাজাকে যুদ্ধত্যাগ করিতে মন্ত্রণা দিলেন। অম্বরপতি সম্মত হইলেন না। অবশেষে যখন ভাঁস্কোসর্দ্দার পুনঃ পুনঃ তাহাকে বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি অতিকষ্টে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা, জীবন যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেন না। তদনুসারে বিপক্ষসেনার দিকে সম্মুখ করিয়া উত্তরস্থ কুচৈগুলার দিকে তিনি স্বীয় সৈন্যসামন্ত চালিত করিলেন। রণভূমি হইতে এইরূপে বহির্গত হইবার সময় মর্ম্মাহত জয়সিংহ বলিয়া উঠিলেন, "এ জীবনে আজি পর্য্যন্ত সপ্তদশযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলাম, কিন্তু অসির সাহায্যে একটিরও মীমাংসা হইল না।" এইরূপে অম্বরের বিজ্ঞতম মহাবল নরপতি গৌরবের সহিত দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া মুষ্টিমেয় রাঠোরসেনার সম্মুখে যুদ্ধভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সেই দিন সেই গঙ্গবানীর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অতুল বিক্রম ও গৌরব বিঘোষিত হইল। সেই দিন রাজবারার ইতিবৃত্তে

"এক জন রাঠোর দশ জন কচ্ছাবহের সমান" এই কথা বলিয়া তাঁহার শুভ্রযশোগুণ বর্ণিত হইল।

সেই যুদ্ধে রাঠোররাজপুত্র ভক্তের বিস্ময়কর রণনৈপুণ্য দেখিয়া সকলেরই হৃদয় স্তম্ভিত হইয়াছিল। যখন ভক্ত সেই কতিপয়মাত্র বীর সমভিব্যাহারে গর্জ্জন করিতে করিতে রণভূমে কৃতান্তের ন্যায় প্রবেশ করিলেন, অম্বরের ভট্টকবি তখন তাঁহার জ্বলন্ত তেজ ও শ্রবণভৈরব গর্জ্জন কীর্ত্তন করিতেছেন, "এ কি মুণ্ডমালিনী কালীর, না বীরশ্রেষ্ঠ হনূমানের ভীমগর্জ্জন? এ কি অনন্তদেব ভীষণরবে গর্জ্জন করিতেছেন, না কপিলেশ্বর ভীমরবে জগৎসংসারকে তাড়না করিতেছেন? এ কি নরসিংহের অবতার, না প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ ময়ূখমালা?"

এই যুদ্ধে কতিপয় বীর রাঠোররাজকুমার ভক্তের সহিত প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কবিবর কর্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। সেই সময়ে কর্ণ না থাকিলে ভক্ত আবার তৃতীয়বার শত্রুসেনাসাগরে ঝম্প প্রদান করিতেন। ক্রমে শত্রুসেনা যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে যখন তাঁহার রণমত্ততা দূর হইল, তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, তখন তিনি সেই অবশিষ্ট কতিপয়মাত্র সৈনিক দেখিয়া নিজের বিষম ক্ষতি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় মথিত হইল;—নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিজ বলাপচয় দর্শনে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। অবশেষে তাঁহার অগ্রজ আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, "আজিকার যুদ্ধে তোমার বীরত্বে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি।" তখন ভক্ত ক্রন্দন সংবরণপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন; আবার তাঁহার হৃদয় উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিল; আবার তাঁহার বদনমণ্ডল বীরতেজে প্রফুল্ল হইল, আবার তিনি সোৎসাহে সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "আমি এখনও সেই 'ভক্তকে' তাহার অম্বরদুর্গ হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারি।"

জয়সিংহ মদিরামত্ত হইয়া অভয়সিংহকে অনর্থকরী পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, সেই কারণেই রাজস্থানে বিষম গৃহবিপ্লব প্রজ্বলিত হইল. তাহাতে রাজপুতকরে রাজপুতশোণিত প্রভূতপরিমাণে নিঃসারিত হইল। জয়সিংহ নিজ অবিবেচনার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তিনি যে বিকানীরাজ্যের উদ্ধারার্থ সেই অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন, আজি তাহার উদ্ধার হইল। রাণা তাঁহাদের মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিলেন।

প্রসিদ্ধ আছে, ভক্তসিংহের কুলদেবতা কোনরূপে অম্বরপতির হস্তগত হইয়াছিলেন।. জয়সিংহ তাঁহাকে অম্বরে লইয়া গিয়া স্বগৃহস্থ একটি স্ত্রীদেবতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং পরিশেষে ভক্তের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই যুদ্ধের পর তাঁহাদের পরস্পরের বিবাদভঞ্জন হইল। তখন আবার তাঁহারা মৈত্রিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং রাণা দুইটি শিশোদীয়কুমারীকে তাঁহাদের উভয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া সেই সৌহার্দ্দসূত্রের গ্রন্থি দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। সেই শুভ বিবোহোৎসবে স্ব স্ব সর্দ্দারবৃন্দের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহারা "মানোয়ার পিয়ালার" মহিমায় সকল বিবাদ বিস্মৃত হইলেন।

১৭০৬ সংবতে (১৭৫০ খৃষ্টাব্দে) রাঠোররাজ অভয়সিংহ যোধপুরে লীলাসংবরণ করেন। তিনি স্বভাবতঃ অলসপ্রকৃতি ছিলেন। সেই আলস্য হইতেই তাঁহার প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। অভয়সিংহের আলস্যপ্রিয়তা-সম্বন্ধে অনেকগুলি কিংবদন্তী আছে। ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে, যখন অজিত চৌহানীর পাণিগ্রহণার্থ গমন করেন, পথিমধ্যে দুইটি সিংহশিশু তাঁহার

নেত্রপথে পতিত হয়। তন্মধ্যে একটি নিদ্রিত, দ্বিতীয়টি জাগ্রত। এক জন শাকুনশাস্ত্রবিৎ অজিতের সঙ্গে ছিলেন। সেই ব্যক্তি সেই সিংহশাবকদ্বয়কে দেখিবামাত্র কহিলেন, "চৌহানী রাণী দুইটি সন্তান প্রসব করিবেন। তন্মধ্যে একজন সুতীর্থা (অলস,) অপরটি দক্ষযোদ্ধা হইবেন।" যদি সেই শাকুন-বিৎ ভবিষ্যতের অন্ধতম গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক বলিতে পারিতেন যে, সেই ভ্রাতৃ-যুগল পিতৃশোণিতে হস্ত কলুষিত করিবে, তাহা হইলে বোধ হয়, মহারাজ অজিত সেই কঠোর অপঘাতমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন; মারবারেরও সেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না।

অভয়সিংহের চরমজীবনীসম্বন্ধে একটি মনোহর গল্প আছে। রাঠোরেরা কুশাবহগণকে সৈনিক বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করেন। ইহা রাঠোরদিগের চিরন্তন অভ্যাস। দুঃখের বিষয়, অভয়-সিংহের হৃদয়েও এই প্রবৃত্তি পোষিত হইয়াছিল। যদিও তিনি অম্বরপতি জয়সিংহের শ্বশুর; তথাপি জামাতা কুশাবহবংশে উৎপন্ন বলিয়া তিনি তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। জয়সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি প্রায়ই তাঁহার সম্মুখে বলিতেন,"তুমি কুশকুলে সম্ভূত, সুতরাং তোমার তরবারির ধারও কুশতৃণের ন্যায়।" এইরূপ তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্যবাণ জয়সিংহের হৃদয়ে বিষদিগ্ধ বাণবৎ সংবিদ্ধ হইত। এই কারণে মধ্যে মধ্যে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন; কিন্তু সাহস করিয়া শ্বশুরের সেই শ্লেষবাক্যের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন না।

কিছু দিন অতীত হইল। অভয়সিংহের সেই বাক্যবাণের প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়সিংহ তাঁহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাঠোরপতি প্রচণ্ডবলশালী, জয়সিংহ যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার বল হ্রাস করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি তৎকালে ভারতের বিজ্ঞতম রাজা; বাগ্‌দেবীর কৃপায় যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্রই তাঁহার কণ্ঠস্থ। তিনি সুচতুর ও বুদ্ধিমান্। অভীষ্টসাধনার্থ তিনি আপন চাতুর্য্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিয়োগ করিলেন। তৎকালে কৃপারাম নামে এক রাজপুত যবনরাজের অধীনে বেতনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। কৃপারাম দাবাখেলায় বিলক্ষণ পারদর্শী, এই জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কৃপারাম সমস্ত সামন্তনৃপতিগণের অপেক্ষা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হই-তেন। যখন তিনি রাজার সহিত একাসনে বসিয়া দাবাখেলা করিতেন, তখন রাজপুতসামন্তগণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া ক্রীড়া দেখিতেন; কেহই আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন না। চতুর জয়সিংহ এই কৃপারামের সাহায্যে নিজ অভীষ্টসাধন করিলেন। কোনপ্রকারে তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিয়া তিনি তাঁহার নিকট আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কৃপারাম সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি সম্রাটের নিকট প্রায়ই বলিতে লাগিলেন, "রাঠোরপতি মহাবলশালী, তিনি এমন সুচারু কৌশলের সহিত অসিচালনা করিয়া থাকেন যে, এক আঘাতে একটি প্রকাণ্ড মহিষের মস্তকচ্ছেদন করিতে পারেন।" এইরূপে অভয়সিংহের অসিচাল-নার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে সম্রাট্ একদিন স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং অভয়-সিংহকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "রাজরাজ! অনেক লোকের মুখেই আপনার অসিচালন-কৌশলের প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়।" বিনয়নম্রবদনে অভয়সিংহ উত্তর করিলেন, "হাঁ হজরৎ! আপনার ইচ্ছা হইলে, তাহা দেখাইতে প্রস্তুত আছি।"

একটি দিন ধার্য্য হইল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে নির্দ্দিষ্ট দিনে অসংখ্য অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল। জনস্রোতে রাজধানীর পথ-ঘাট সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। সকলে রঙ্গভূমির চারিদিক্ বেষ্টন-পূর্ব্বক সোৎসুকে দণ্ডায়মান হইল। সম্রাট্ পাত্রমিত্রগণ সহ সেই রঙ্গভূমিতে সমুচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন। মল্লবেশে অভয়সিংহ একখানি প্রচণ্ড খড়্গহস্তে সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে

দেখিতে একটি প্রকাণ্ড মহিষ কয়েকটি বলিষ্ঠ সৈনিক কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। তাহার বিশালকায় ও সুদীর্ঘ শৃঙ্গ দেখিয়া রাঠোরপতি সম্রাটের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সম্রাট্! আমায় ক্ষণকাল অবসর প্রদান করুন, আমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি।" অতঃপর দ্বিগুণ মাত্রা অহিফেন-সেবন করিয়া তিনি রঙ্গস্থলে পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, জয়সিংহ তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন। তখন তাঁহার ক্রোধের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। একে রোষবেগ, তাহাতে আবার তিনি দ্বিগুণ মাত্রা অহিফেন সেবন করিয়াছেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহা হইতে যেন জ্বলন্ত বহ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। জয়সিংহের দিকে সেই আরক্ত-নেত্রে বিকটভ্রূকুটি করিয়া অভয়সিংহ মহিষকে আক্রমণ করিলেন। অমনি মহিষ বিকটগর্জ্জনসহকারে স্বীয় সুদীর্ঘ বিষাণযুগল উন্নত করিয়া তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইল। রাঠোর-রাজ খড়্গাধারণ পূর্ব্বক হিমাদ্রির ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার সেই বিলোল নেত্রদ্বয়ের জ্বলন্ত তেজ দর্শন করিয়াই যেন সেই মহাকায় জন্তু তাঁহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। অভয়সিংহ তাহাকে জয়সিংহের দিকে চালিত করিলেন। তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চতুর অম্বরপতি সম্রাটকে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "আর অধিক অগ্রসর হইবেন না।" পুনশ্চ মহিষ অভয়সিংহের সম্মুখীন হইল। তখন রাঠোরপতি নিজ প্রচণ্ড অসি দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক এরূপ ভীষণবেগে তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন যে, মহিষের মুণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া রাজার জানুর উপরিভাগে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি তার ভরে পড়িয়া গেলেন। সকলে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তিনি সুস্থশরীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তদবধি সম্রাট্ আর কখনও রাজাকে মহিষের মুণ্ডচ্ছেদন করিতে অনুরোধ করেন নাই।

রাজা অভয়সিংহ যখন রাজত্ব করেন, দুর্জ্জয় নাদির শা সেই সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রণভেরীর গভীরধ্বনি শ্রবণমাত্র তৈমূরের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, যবনসম্রাটের মুকুট অকস্মাৎ ভূতলে পড়িয়া গেল। সমগ্র ভারত ভূকম্পনের ন্যায় কম্পিত হইল। সেই নিষ্ঠুর নাদির শার শোণিতপিপাসু অসি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সম্রাট্ রাজপুতবীরগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। সেই ভীষণ বিপ্লব হইতে ভারত-ভূমি রক্ষার্থ কোন রাজাই অগ্রসর হইলেন না। কর্ণালক্ষেত্রে মন্দভাগ্য মহম্মদ শাহের কঠোর অদৃষ্টলিপি পরিপূর্ণ হইল। তিনি নাদির কর্ত্তৃক লৌহনিগড়ে বদ্ধ হইলেন। দিল্লী নাদিরের অধিকৃত হইল। সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আফগানবীর স্বদেশে যাত্রা করিলেন। এই সুযোগে উদ্‌যোগী হইলে রাজপুতগণ নিশ্চয়ই ভারতের সিংহাসন হস্তগত করিতে পারিতেন, কিন্তু ভারতমাতার দুর্ভাগ্যবশে তাঁহার নির্ব্বোধ সন্তানেরা সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নির্জীবভাবে দিনপাত করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

রামসিংহের অভিষেক, ভক্তসহ তাঁহার বিবাদ, গৃহযুদ্ধ, মৈরতাসমর, ভক্তসিংহের সিংহাসনলাভ, রাজা ভক্ত ও পুরোহিত, মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, ভক্তের মৃত্যু, সতীর অভিশাপ।

দেবরুরাজ মানসিংহের কন্যার গর্ভে অভয়সিংহ একটি পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রামসিংহ। রামসিংহ স্বভাবতঃ দর্পিত ও উদ্ধতপ্রকৃতি। অভয়সিংহ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে রামসিংহ মারবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার অভিষেকসময়ে মরুস্থলীর যাবতীয় সর্দ্দার ও সামন্তরাজগণ নানারূপ উপহার লইয়া নবীনরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভক্তসিংহ স্বয়ং আগমন করিলেন না; প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি আপন ধাত্রীকে প্রেরণ করিলেন।* পিতৃব্য স্বয়ং আসিলেন না, ধাত্রীকে পাঠাইয়াছেন, রামসিংহ তদ্দর্শনে রোষপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ভক্তসিংহ যে সকল উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া রামসিংহ কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কাকা কি আমাকে বানর বিবেচনা করিয়াছেন? আমাকে রাজটীকা দিবার জন্য তিনি কি স্বয়ং আসিতে পারিলেন না? একটি বুড়ী ডাকিনীকে পাঠাইয়াছেন কেন?" এই বলিয়া ধাত্রীকে দূর করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ একটি দূতকে পিতৃব্যের নিকট প্রেরণ করিলেন;—বলিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে ঝালোর প্রত্যর্পণ করুন।

অবমানিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধাত্রী ফিরিয়া আসিল; ভক্তের নিকট সমস্ত কথা নিবেদন করিল। এ দিকে রামসিংহপ্রেরিত দূতও আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষুব্ধচিত্তে ভক্তসিংহ দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "ঝালোর ও নাগোর উভয় রাজ্যই আপনার হাতে, ইচ্ছা করিলেই আপনি লইতে পারেন।"

রামসিংহের উদ্ধতস্বভাবের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি গর্ব্বে অন্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্মানীর সম্মাননা ও মর্য্যাদাশীলের মর্য্যাদা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। অধিক কথা কি, চম্পাবৎ ও কুম্পাবৎ সর্দ্দারেরাও তাঁহার নিকট অবমানিত হইয়াছিলেন। চম্পাবৎ কুলসিংহ মারবারের শ্রেষ্ঠ সর্দ্দার। তাঁহার আকার খর্ব্ব, মুখমণ্ডল অগণ্য ব্রণচিহ্নে চিহ্নিত; এই কারণে রামসিংহ তাঁহাকে গুজি গণ্ডক বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই অবমাননাসূচক সম্বোধনে সর্দ্দারের হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইত, কিন্তু রামসিংহ বালক, কাজেই সর্দ্দার সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন সর্দ্দার সভায় উপস্থিত হইবামাত্র রামসিংহ "আসুন গুজি" বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সভাসমক্ষে এইরূপ অবমাননাসূচক সম্বোধন শুনিয়া সর্দ্দারের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। উত্তেজিতস্বরে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "হাঁ, এই গুজি (কুক্কুর) সিংহকেও দংশন করিতে সমর্থ।" রামসিংহ সে দিন নিরুত্তর রহিলেন বটে, কিন্তু সর্দ্দারকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার কল্পনা করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক দিন রামসিংহ উপবনে সমাসীন আছেন, সর্দ্দার-সামন্তগণ চারিদিকে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যবসরে রাঠোররাজ কুশলসিংহের নিকট একটি বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

* রাজপুতসমাজে ধাত্রী বিশেষ সম্মানের পাত্রী, জননীর ন্যায় মাননীয়া।

সর্দ্দার সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "চম্প যেমন রাজপুতবংশের গৌরবস্বরূপ, ইহাও সেইরূপ উদ্যানের গৌরবস্বরূপ চম্পবৃক্ষ।" তৎক্ষণাৎ রামসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "শীঘ্রই এ বৃক্ষ ছেদন কর, মারবারে চম্প নাম থাকিবে না।" কেবল মারবারের মুখ চাহিয়াই সর্দ্দার-চূড়ামণি এইরূপ দারুণ অবমাননা সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আশু এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল যে, সর্দ্দারকে রামসিংহের প্রবল-শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে হইল। যে দিন রামসিংহ দর্পভরে পিতৃব্য ভক্তসিংহকে ঝালোর প্রত্যর্পণ করিতে লিখিয়া পাঠান, সেই দিন তাঁহার সৌভাগ্যরবি অস্তগমনোদ্যত হয়। তিনি ঝালোর প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এমন কি, পিতৃব্যকে প্রতিফল দিবার জন্য সেনাদল সুসজ্জিত করিতে অনুমতি প্রদান করেন। এই বালোচিত অসঙ্গত ব্যবহারের কথা কুশলসিংহের কর্ণে প্রবেশ করে। মারবারের মুখ চাহিয়াই সর্দ্দারপ্রবর রামসিংহের অতীত দুরাচরণ উপেক্ষা করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অভিলাষ, রাজাকে তাদৃশ মূর্খোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে নিবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে বাসনা ফলবতী হইল না। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিতে না করিতেই তিনি রামসিংহের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইলেন। চঞ্চলবুদ্ধি রাজা তাঁহাকে দর্শন-মাত্র বলিয়া উঠিলেন, "বুড়ো গণ্ডক! কি মনে করিয়া উপস্থিত হইয়াছ? তোমার বিকট মুখ যত কম দেখি ততই ভাল।" এই দারুণ অবমাননাসূচক বাক্যে সর্দ্দারের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; নিদারুণ রোষ ও জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া হস্তস্থ ঢাল সবেগে বিস্তৃত গালিচার উপর উল্টাইয়া দিলেন এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক গর্ব্বিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বালক! তুমি যে রাঠোরের অন্তরে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিলে, তিনি ইচ্ছা করিলে এই ঢালের ন্যায় মারবাররাজ্য বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন।" এই বলিয়াই তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় সামন্তদল সমভিব্যাহারে মুন্দিয়াবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

রাত্রি দ্বিপ্রহর। অকস্মাৎ গভীররাত্রে ভক্তের নিকট সংবাদ আসিল, সর্দ্দার-চূড়ামণি কুশলসিংহ নাগোরের প্রান্তদেশে মুন্দিয়াবারে আসিয়া সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন। রাঠোরের রাজকুমার তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নিজ নিকেতন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভট্টকবির আবাসে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন, কুশলসিংহ প্রসুপ্ত। ভক্তকে দেখিয়া চম্পাবৎ সর্দ্দারের অনুচরবৃন্দ প্রভুকে জাগরিত করিবার উদ্যম করিল; কিন্তু ভক্ত নিষেধ করিয়া সর্দ্দারের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যথাকালে কুশলসিংহ জাগ্রত হইলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়াই তিনি ধূমপানার্থে ভৃত্যের প্রতি হুঁকা আনয়নে আদেশ করিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পরিচারক অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া রাজপুত্রকে দেখাইয়া দিল। সর্দ্দার-চূড়ামণি ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। বিরামদায়িনী নিদ্রার সুখালিঙ্গনে তাঁহার ক্রোধ ও জিঘাংসা অনেকাংশে প্রশমিত হইয়াছিল, সংপ্রতি তাঁহার স্বীয় অবস্থা তদীয় মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইল। কিন্তু উপায় কি? যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সহজ নহে। ভক্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "রাজপুত্র! এ মস্তক এখন আপনার আদেশ বহন করিবে।"

চম্পাবৎ সর্দ্দার যোধপুর পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু রামসিংহের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না। আশু যে তাঁহাকে দারুণ সঙ্কটে পতিত হইতে হইবে, অজ্ঞানান্ধহৃদয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিল না। তিনি কাঞ্চনভ্রমে কাচের আদর করিয়াছিলেন, কোকিলকে দূরে ত্যাগ করিয়া

* এই স্থানে কবিবর কর্ণ বাস করিতেন। তাঁহার ভূমিসম্পত্তির বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা।

বায়সের কর্কশস্বরে তাঁহার মন বিমুগ্ধ হইয়াছে। উমিয়া নাকরাচি নামক এক লঘুচেতা হীনপদস্থ সর্দ্দার সেই সময়ে যোধপুরে অবস্থিতি করিত। সেই নিকৃষ্টমনার কুপরামর্শে তিনি এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাহার মন্ত্রণার উপরেই তিনি অটল বিশ্বাস রাখিতেন। রাজকুমারের বুদ্ধির যে কিঞ্চিন্মাত্র হীনজ্যোতিঃ ছিল, সেই ধূর্ত্তের চাতুর্য্যজালে সমাবৃত হইয়া সেটুকুও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধসর্দ্দার কুশলসিংহ অবমানিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তিনি একবার তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিতেও প্রয়াস পাইলেন না, একবারও স্বীয় দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিলেন না, মনে মনে বিন্দুমাত্র লজ্জিতও হইলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি সভাসমক্ষে মারবারের দ্বিতীয় প্রধান সামন্ত কুম্পাবৎ-সর্দ্দারকেও সেইরূপে অবমানিত করিলেন। আশোপপতি কুম্পাবৎ-সর্দ্দার কানাইরাম সভায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইত্যবসরে রামসিংহ তাঁহাকে "আও বুড়া বাঁদর!" বলিয়া শ্লেষস্বরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই অবমাননাসূচক সম্বোধনে কুম্পাবৎ সর্দ্দার রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং রোষকষায়িতনেত্রে কঠোরস্বরে বলিলেন, "যখন এই বানর নৃত্য করিবে, তখন তুমি আমোদ পাইবে।" এই বলিয়াই সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মীয়পরিজন ও সৈন্যসামন্তসহ তৎক্ষণাৎ নাগোরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতি-সংবাদ পাইয়া ভক্ত যথোচিত সম্মানসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং নানারূপ প্রবোধবচনে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে কুশলসিংহ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করাতে তাঁহার অভিমান ও ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। চতুর-চূড়ামণি ভক্ত তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই প্রবোধিত হইলেন না; বরং উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "যতদিন বাঁচিব, রামসিংহকে রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করিব না। আপনাকে মহারাজ যোধের সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখি, ইহাই আমাদের কামনা। যদি আপনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমরা মারবার পরিত্যাগ করিব, মারবারের কল্যাণের জন্য আর কোন চেষ্টাই করিব না, মারবারের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভিন্নরাজ্যে গিয়া বাস করিব।" বহুক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভক্ত তাঁহাদের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

সমস্ত সংবাদ রামসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল। ভক্তসিংহ সর্দ্দারদ্বয়কে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি পিতৃব্যকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "এখনই ঝালোর ফিরাইয়া দিউন।" এই কঠোর অনুশাসনে ভক্তের হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি বিনয়গর্ভ উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজার সহিত বিবাদ করি, সে সাহস আমার নাই। তবে যদি তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমি পূর্ণকুম্ভ লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিব।"

পত্রপাঠে রামসিংহের হৃদয় ক্রোধপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; আশু যোধগিরির সমুচ্চ সৌধশিখরে প্রচণ্ডরবে রণদামামা বাদিত হইল; দেখিতে দেখিতে অস্ত্রের ঝনৎকারে এবং প্রমত্ত বীরবৃন্দের শ্রুতিকঠোর সিংহনাদে মারবারভূমি কাঁপিতে লাগিল। যদিও রাঠোরের দুইটি প্রধান বল বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারই উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নাই। যে মৈরতীয় সর্দ্দারগণের অদম্য সাহস ও রাজভক্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, রাজার মঙ্গলের জন্য যাহারা সর্ব্বস্বত্যাগেও কুণ্ঠিত নহেন, আজি তাঁহারা সকলেই যোধদুর্গের প্রাকারমূলে সমবেত হইলেন। এতদ্ভিন্ন রিয়া, বুধসু, মেহজী, খোর্টুর, তোলাবর, কোচামন, অলিনবাস, জুওরি, বোকরি, ভরুণ্ডা, ইয়ারবো প্রভৃতি নগরের সর্দ্দারবৃন্দ স্ব স্ব দলবল সহ আসিয়া রামসিংহের পতাকামূলে উপস্থিত হইলেন। যোধাবৎবংশের সর্দ্দারেরা পবিত্র প্রভুধর্ম্মের অনুরোধে

মৈরতীয়গণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। গোবিন্দগড় ও ভদ্রার্জ্জুনের সর্দ্দারগণ যে এত দিন নৃপতির লবণভোজন করিয়াছিলেন, আজি তাহার স্বার্থকতা-সম্পাদন করিতে সমুৎসাহী হইলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সর্দ্দারেরা ভক্তসিংহের পক্ষে যোগদান করিলেন। ইহাতে রামসিংহের ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু পঞ্চসহস্র জারিজা সৈনিকের বিচ্ছেদে তাঁহাকে যে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় উক্ত ক্ষতি অতি সামান্য বলিয়া পরিগণিত। ভোজনগরের জারিজা-নৃপতির দুহিতাকে বিবাহ করিয়া তিনি শ্বশুরের নিকট সেই সেনাসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় স্বভাবসুলভ প্রচণ্ড দর্প ও ঔদ্ধত্যবশে তিনি সে সাহায্যেও বঞ্চিত হইলেন। দর্প ও ঔদ্ধত্যদোষেই তিনি আত্মীয়স্বজনের চক্ষুঃশূল হইলেন, সহায়সম্বলহীন হইয়া পড়িলেন, অবশেষে সিংহাসনচ্যুত হইয়া তাঁহাকে নিরতিশয় দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইল।

নগরের বহির্ভাগে স্কন্ধাবার স্থাপিত হইল। একদিন একটা অশুভশংসী কাক আসিয়া পটগৃহের বসনপ্রাচীরে উপবেশন করিল। সেই পটগৃহমধ্যে জারিজা মহিষী উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি শাকুনশাস্ত্রে বিলক্ষণ সুদক্ষা। কাককে কানাতের উপর বসিতে দেখিয়াই তিনি একটি বন্দুক গ্রহণ করিলেন এবং সেই পক্ষী তিনবার 'কা কা' ধ্বনি করিতে না করিতেই অস্ত্র-প্রয়োগে তাহাকে সংহার করিলেন। বন্দুকের স্ফোটনধ্বনি কর্ণে প্রবেশমাত্র উদ্ধত রামসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বিশেষ তথ্যানুসন্ধান না করিয়াই তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, "যে বন্দুক ছুড়িল, এই মুহূর্ত্তে তাহাকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" পরিচারকেরা রাণীর নাম করিল, তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না; কঠোরস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রাণীকে বল, এখনই তিনি আমার রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে প্রস্থান করুন। এরূপ স্ত্রীর মুখদর্শন করা আমার অভিপ্রেত নহে।" জারিজা রাজপুত্রী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। পতির রোষশান্তি করিতে তিনি অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস বিফল হইল। রাজা তাঁহার মুখদর্শন করিতেও ইচ্ছা করিলেন না। অনেক অনুনয়বিনয়ের পর রাণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পতির চরণতলে পড়িয়া করুণাস্বরে তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামসিংহ কিছুতেই আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না, বরং কঠোরস্বরে বলিলেন, "তুমি এই দণ্ডে আমার রাজ্য হইতে বিদায় হও।" রাজার এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে জারিজাকুমারী লগুড়-তাড়িতা ফণিনীর ন্যায় কুপিতা হইয়া উঠিলেন; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন, ভাল, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এই সূত্রেই আপনাকে মারবারের সিংহাসন হারাইতে হইবে।" মহিষী আর বিলম্ব করিলেন না, আর সেই উদ্ধতপতির মুখের দিকেও চাহিলেন না; মর্ম্মাহত হইয়া অভাগিনী রাজকুমারী সেই পঞ্চসহস্র জারিজা-সৈন্য সহ পিতৃরাজ্যে যাত্রা করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই রামসিংহের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল; অকস্মাৎ তাঁহার মুকুট স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

এ দিকে ভক্তসিংহ যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। গৃহসর্দ্দার ভিন্ন অনেক সর্দ্দার ও সামন্ত আসিয়া তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তন্মধ্যে চম্পাবৎ, কুম্পাবৎ, উদাবৎ ও করমসোটগণই প্রধান। নিমজ, রাইপুর ও রাউনগরের সর্দ্দারত্রয়, উদাবৎদিগকে এবং কেবনশিরের ঠাকুর করমসোটদিগকে চালিত করিয়া ভক্তের সাহায্যার্থ রণভূমে যাত্রা করিলেন।

হীনবল হইয়াও উদ্ধত রাঠোররাজ নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, তিনি রাজা, সুতরাং রণক্ষেত্রে তাঁহারই জয়লাভ নিঃসন্দেহ। কিন্তু হায়! এ বিশ্বাস

তাঁহার ভ্রম। 'রাজা' নামের যোগ্য হইলে তাঁহাকে এরূপ ঘোরসঙ্কটে জড়ীভূত হইতে হইত না।

মহান্ উৎসাহ ও সাহসের সহিত রামসিংহ মৈরতার অজমীর নামক তোরণদ্বারের নিকটে সেনাকটক স্থাপনপূর্ব্বক শত্রুপক্ষের প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষদল অগণ্য অস্ত্রফলকের কিরণজালে দশদিক্ আলোকিত করিয়া মৈরতার নাগোরদ্বার নামক উত্তর-তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রামসিংহের সেনাগণও তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ডরবে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। ভক্ত "মাতাজিকা স্থান" নামক স্থলে স্বীয় স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। অজমীর-তোরণ হইতে ঐ স্থান প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তথায় পাণ্ডবগণ-প্রতিষ্ঠিত কালিকাদেবীর একটি প্রাচীন কুণ্ড বিরাজিত আছে।

ভক্তসিংহ স্বীয় শিবিরশ্রেণী পশ্চাতে রাখিয়া সসৈন্যে রামসিংহের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই রাজমুকুটধারী ভ্রাতুষ্পুত্রকে গোলাবর্ষণপূর্ব্বক অভিনন্দন করিলেন। রামসিংহও সেইরূপ উপচারে পিতৃব্যের অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষে তুমুল গোলাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধূমে ধূমে মৈরতাভূমি অন্ধকার হইল, অগণ্য জ্বলন্ত গোলক বজ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ধূমরাশি ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। কত শত বীর যে অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, কে তাহার গণনা করিবে? কেহই সে সময়ে কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, সম্মুখে প্রিয়তম বন্ধু গোলকস্পর্শে বিগতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; সেই প্রাণসুহৃদের মৃতদেহ পদদলিত করিয়া উভয়পক্ষের বীরবৃন্দ পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দিবা অবসানপ্রায়, তথাপি শান্তি নাই, অবিরাম গোলক-যুদ্ধ চলিতেছে। সহসা এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল যে, সে রজনীর জন্য যুদ্ধরঙ্গভূমের যবনিকা পতিত হইল।

বাজিপা সরোবরের বিস্তৃত তীরভূমে এই যুদ্ধ হইতেছিল, তাহার একপার্শ্বে একটি আশ্রম। দাদুপন্থী সন্ন্যাসীরা তথায় বাস করিতেন। রাঠোররাজ শূরসিংহ কর্ত্তৃক ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসিগণের আশ্রমোদ্যানের অভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে অগণ্য গোলা আসিয়া পড়িতেছিল। বিষম ভীত হইয়া আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা আশ্রমাধ্যক্ষ বাবা কিষণদেবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। বাবা কিষণদেব পলায়ন করিলেন না, অদৃষ্টদেবের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই অগ্নিবৃষ্টি নিয়ে নির্ভয়ে অবস্থিত রহিলেন। সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হয় দেখিয়া উভয়দলই তাঁহাকে আশ্রমত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু কিষণবাবা সে অনুরোধ গ্রহণ করিলেন না, নির্ভয়ে বলিলেন, "যদি অদৃষ্টে গোলার আঘাতেই মৃত্যু লিখিত থাকে, তাহা হইলে কে তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে? পরমায়ু থাকিলে সহস্র গোলকের মধ্যেও প্রাণ হারাইব না।" কিষণদেব নিজের প্রাণের জন্য চিন্তিত হন নাই কিন্তু আশ্রমতরুর জন্য তাঁহার অত্যন্ত ভাবনা হইয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে তিনি উভয়পক্ষকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া সে স্থল পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। দাদুপন্থীর আজ্ঞা কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, উভয়পক্ষই সে রজনীর জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন।

পরদিন আবার উভয়পক্ষ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। আজ রাজা রামসিংহই সর্ব্বাগ্রে সমরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিলেন। সেনাদলের পুরোবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং তিনি স্বীয় পিতৃব্যকে আক্রমণ করিলেন। ভক্তসিংহও রণমদে মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার

সম্মুখীন হইলেন। প্রতিশোধপিপাসা চম্পাবৎ-সর্দ্দার কুশলসিংহের হৃদয় বহুদিন হইতেই আকুল করিয়া রাখিয়াছে, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তিনিও রামসিংহের দিকে আপন সেনাদল চালিত করিলেন। সেই ক্রোধোন্মত্ত চম্পাবৎ-সর্দ্দারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজভক্ত মৈরতীয় বীরবৃন্দ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভ্রাতা ভ্রাতৃত্ব, আত্মীয় আত্মীয়তা ও বন্ধু বন্ধুত্ব ভুলিয়া আজি পরস্পর পরস্পরের হৃদয়শোণিতপাত করিতে উদ্যত। "হয় জয়ী হইব, নয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিব," সকলেই আজি এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত। মৈরতীয়-সেনার অধিনায়ক সেরসিংহ চিরগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিলাষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর্য্যবান্ চম্পাবৎ সর্দ্দারও ইহা অপেক্ষা হীনবীর্য্য নহেন। দর্পিত রামসিংহ প্রকাশ্যসভায় অপমান করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে অনল জ্বালিয়া দিয়াছেন, আজি কুশলসিংহ রাজপুত্রের হৃদ্‌শোণিতে সেই প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন, কে তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিফল করিতে সাহসী হইবে? রামসিংহ তাঁহাকে কুক্কুর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, আজি সর্দ্দার দেখাইবেন যে, সেই কুক্কুর রাজপদ দংশন করিতে সমর্থ হয় কি না। মহাবীর সেরসিংহ ভীষণ আস্ফালনপূর্ব্বক নিজ বেগগামী রণতুরঙ্গকে চালিত করিয়া সদলে চম্পাবৎদলের সম্মুখীন হইলেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দ্দারেরা পরস্পরের নাম ধরিয়া আহ্বানপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর মৈরতীয়-সর্দ্দার সেরসিংহ রণভূমে শয়ন করিলেন। তৎক্ষণাৎ চম্পাবৎগণ শ্রবণভৈরব সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া উৎসাহসহকারে মৈরতীয়দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মৈরতীয়গণও নিরুৎসাহ নহেন, তাঁহারাও তদনুরূপ উৎসাহ ও সাহসের সহিত সমরসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন।

সেরসিংহ পতিত হইবামাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি জ্বলন্ত উৎসাহবাক্যে স্বীয় সৈন্যসামন্তগণকে উত্তেজিত করিয়া ভ্রাতৃঘাতীর হৃদয়শোণিতে শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার অভিলাষে স্বীয় রণতুরঙ্গকে চম্পাবৎ-সর্দ্দারের দিকে তাড়িত করিলেন। অমনি উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক তড়িদ্‌বেগে স্ব স্ব তরবারী চালনা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই জয়পুর-পরিবারের দুইটি ভগিনীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং সম্পর্কে উভয়েই পরস্পরের ভ্রাতা। কিন্তু সে ভ্রাতৃভাব আজি ভীষণ বৈরি-ভাবে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে হৃদয়ে একদিন উভয়ে পরস্পরকে ধারণপূর্ব্বক স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতেন, আজি সেই হৃদয়ের শোণিতপাত করিতে পরস্পরে অগ্রসর। এখন আর সে শ্রুতিসুখকর ভ্রাতৃসম্বোধন নাই,—সে বিমল স্নেহোচ্ছ্বাস নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। অবশেষে চম্পাবৎ-সর্দ্দার কুশলসিংহ সমরভূমে পতিত হইলেন। অধিনায়কের পতনে চম্পাবৎগণ বিন্দুমাত্রও হতাশ বা নিরুৎসাহ হইলেন না। ইতিপূর্ব্বে তাহারা যে স্থলে অব-স্থিত ছিল, অধুনা সর্দ্দারের পতনে তথা হইতে সূক্ষ্ম কেশ পরিমাণ ভূমিও পশ্চাদপসৃত হইল না। উভয়দলই বহুক্ষণ ধরিয়া সমসূত্রভাবে যুদ্ধ করিল; কেহই একপদ অগ্রসর বা পশ্চাদপসৃত হইল না।* কিন্তু ভক্তসিংহের পক্ষ উত্তরোত্তর বলবৎ হইয়া উঠিল। ভ্রাতুষ্পুত্র রামসিংহকে ইতস্ততঃ তাড়িত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে ভক্তসিংহ নায়কবিহীন চম্পাবৎগণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বহস্তে সমস্ত সেনাচালনের ভার লইয়া রামসিংহের সমস্ত সেনার উপর পতিত হই-লেন। এতক্ষণ একরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু এখন প্রকৃত দলযুদ্ধ আরম্ভ হইল মৈরতীয় বীর-গণ যে প্রতিজ্ঞায় হৃদয়বন্ধন করিয়া রণভূমে প্রবেশ করিয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা আজি প্রাণপণে পালন

করিবে। প্রাণ থাকিতে তাহারা বিপক্ষকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। ভক্তসিংহের প্রচণ্ড বল ব্যর্থ করিতে অসমর্থ হইয়া এক একটি করিয়া অসংখ্য মৈরতীয়-বীর যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট সৈনিকেরা তাহা দেখিয়াও অণুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না; চরমসাহসে নির্ভর করিয়া দেহের সমস্ত বল একত্র আকর্ষণপূর্ব্বক সেই মুষ্টিমেয় মৈরতীয়সেনা প্রাণপণে সমরসাধ মিটাইতে লাগিলেন। ক্রমে বীরবর ভক্তের প্রচণ্ডসেনা ভীষণ জয়ধ্বনিতে উদ্বেল সমুদ্র-তরঙ্গবৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মৈরতীয়বীরের নিকট আস্ফালন অচিরেই বিলীন হইয়া গেল। তাঁহাদের সঙ্গে ইয়ারবা, শিবুরো, জুশোরি ও মেহত্রীর উপাসামন্তগণও রণক্ষেত্রে চিরদিনের জন্য শয়ন করিলেন।

এই ভীষণ গৃহবিপ্লবে মৈরতীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মেহত্রী-সর্দ্দারের পুত্র স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও পিতার সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যেদিন এই অনর্থকর বিবাদের সূত্রপাত হয়, সেইদিন তিনি নীরকী-সর্দ্দারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছিলেন। সুকোমল কুসুম-মালিকায় বরকন্যার হস্ত একত্র সংবদ্ধ হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বিদ্রোহিদল মৈরতাক্ষেত্রে উপস্থিত। মেহত্রীনন্দন আর বিলম্ব করিলেন না, নবীন প্রণয়িনীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন না, পুরোহিত ও আত্মীয়কুটুম্বের নিষেধবাক্যেও কর্ণপাত করিলেন না। রণভূমে সুরসুন্দরীগণের স্বর্গীয় প্রেমসম্ভোগ করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ নবোঢ়া ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া সেই বরবেশেই রণসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে যুদ্ধস্থল অন্যূন অশীতি ক্রোশ ব্যবধান। বীরযুবক মেহত্রীনন্দন অশ্বারোহণে সেই দীর্ঘপথ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়দিবসে মৈরতাপক্ষে যোগদান করিলেন এবং যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। সেইদিন মারবারের ভট্টকবিরা তাঁহার সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধৃবেশ ও বীরত্ব দেখিয়া এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—

"কানে মতি বলবলা,
গলে সোনি এ মালা,
আশী কোশ করো হো আয়া,
কোণ্ডার মেহত্রীওয়ালা।"

অর্থাৎ শ্রুতিমূলে সমুজ্জল মৌক্তিককুণ্ডল এবং গলদেশে মোহনমালা ধারণপূর্ব্বক অশীতিক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হইয়া মেহত্রীনন্দন রণসাগরে অবতীর্ণ হইলেন।

পতিপরায়ণা নীরকী-নন্দিনী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণপতির অনুগমন করিলেন। মনে মনে তিনি এই আশা পোষণ করিয়াছিলেন, মেহত্রীকুমার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জয়োৎফুল্লহৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করিবেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহার সেই আশা সমূলে উৎপাটন করিলেন। তিনি শ্বশুরালয়ের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, ইত্যবসরে করুণ-রোদনধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; অমনি তাঁহার আশা ভরসা জন্মের মত ফুরাইয়া গেল। বিবাহের চন্দনাঙ্ক অঙ্গে বিলুপ্ত হইতে না হইতে তাঁহার সীমন্তসিন্দূর জন্মের মত বিলুপ্ত হইল। দুর্ভাগ্যবশে বিবাহের পরক্ষণেই তিনি বিধবা হইলেন। পতিশোকে ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া তিনি স্বামীর অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরে চিতা সজ্জিত হইল। নীরকীকুমারী প্রাণনাথের উষ্ণীষ ও তোড়া ধারণপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সুকোমল অঙ্গ জ্বলন্ত চিতানলে ভস্মীভূত হইল।

রামসিংহ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক যোধপুরের অভ্যন্তরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন এবং নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রণশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয় নিশ্চিন্ত হইল না; ভক্তের রোষাগ্নি যেন সেই উচ্চপ্রাচীর ভেদপূর্ব্বক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; নানারূপ

বিভীষিকাময়ী চিন্তায় আকুলিত হইয়া তিনি সেই নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গভীর রজনীযোগে দক্ষিণাবর্ত্তে পলায়ন করিলেন। অচিরেই উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় বীর জয় আপ্পাসিন্ধিয়ার সাহায্যলাভার্থ যত্নবান্ হইলেন। যে দিন হতভাগ্য রামসিংহ সিন্ধিয়ার সাহায্য-প্রার্থনা করিলেন, সেই দিন মারবার-ক্ষেত্রে অনর্থের উপর ঘোরতর অনর্থের আবির্ভাব হইল।

যোধপুর ভক্তের অধিকৃত হইল। আশু অভিষেকের আয়োজনও হইতে লাগিল। মারবারের অধিকাংশ সর্দ্দার ও সামন্তগণ অভিষেচনিক উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। সমবেত রাজপুতবৃন্দের সমক্ষে ভক্তসিংহ বগরীর অধিপতি জৈতাবৎ-সর্দ্দার কর্ত্তৃক মারবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন এবং আত্মবল দৃঢ়ীকরণে উদ্যত হইলেন। যদিও মারবারের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সামন্তবৃন্দ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রকৃত রাজনীতির অনুসরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট সকলের অভ্যর্থনা লাভ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মধুময়ী বাণী ও অর্থ, এই উভয়ের সাহায্যে তাঁহার সে সঙ্কল্পও সুসিদ্ধ হইল। যে দুই চারিজন রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে রাষ্ট্রাপহারক বোধে তাঁহার অভিষেক-সময়ে আগমন করেন নাই, তাঁহারা সকলেও তৎপ্রদত্ত অর্থ ও মধুরবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এইরূপে দাওয়ান, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপুরুষও ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কেবল একজনকে তিনি কোন প্রকারেই বশীভূত করিতে পারিলেন না। সে ব্যক্তি কে?—রাঠোরকুলের পুরোহিত জগধর। জগ স্বীয় নৃপতির প্রধান মন্ত্রদাতা—রাজপুতগণের প্রধান শিক্ষক। সেই বিপদ্‌সময়ে প্রায় সমগ্র রাঠোর ভক্তসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল; কিন্তু সহস্র প্রলোভনেও জগধরের মন টলিল না। যে সময়ে রামসিংহ জয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই বিশ্বস্ত পুরোহিত প্রিয়তম রাজকুমারকে মারবারের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যলাভার্থ দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করেন। ভক্ত তাঁহাকে করগত করিবার জন্য স্বহস্তে একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। কবিতাটির মর্ম্ম এই যে, "হে মধুকর! যে পুষ্পের সৌরভ তোমাকে আমোদিত করিয়াছিল, আজি ঝটিকাদ্বারা তাহা আক্রান্ত হইয়াছে; সে সুন্দর গোলাপপুষ্পের একটিমাত্রও পত্র নাই; তবে বৃথা কেন তাহাতে বসিয়া কণ্টকাঘাত সহ্য করিতেছ?"

পত্রের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর আসিল;—"সেই পত্রশূন্য গোলাপবৃক্ষে বসিয়া থাকার কারণ এই যে, আবার মধুমাস আসিতে পারে; শুষ্কশাখা আবার মুঞ্জরিত হইতে পারে; আবার অভিনব পুষ্পরাজিতে তরু বিমণ্ডিত হইতে পারে।"

রাজার প্রতি পুরোহিতের দৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া ভক্তসিংহ বিস্মিত হইলেন। পুরোহিতের প্রশংসা না করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। সেই দিন হইতে আর তিনি জগধরকে কোন প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করেন নাই।

ভক্তসিংহের হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দময়। তিনি রাজপুত-চরিত্রের একটি আদর্শ। তাঁহার আকৃতিও তদীয় গুণাবলীর অনুরূপ ছিল। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বলদেবমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাকে দর্শনমাত্র হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। এতদ্ব্যতীত তিনি একজন সুপণ্ডিত ও কবি; তাঁহার রচিত কবিতাকলাপ ভট্ট-কবিগণের আদরের সামগ্রী; কিন্তু একমাত্র পৈশাচিক পাপানুষ্ঠানে তাঁহার গুণরাশি কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। দুরপনেয় পাপকলঙ্কে তাঁহার চরিত্র কলুষিত না হইলে তিনি রাজবারার একটি শ্রেষ্ঠ নরপতির আসনে স্থান পাইতে পারিতেন। রাজাসন প্রাপ্ত হইবার পরেই তিনি যেরূপ গুণের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহাতে অধিকাংশ রাজপুত তৎপ্রতি

অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল; ক্রমে তাহাদের অনুরাগ এত বাড়িয়া উঠিল যে, যখন পরাজিত রামসিংহের দূত সিন্ধিয়ার সাহায্যলাভার্থ দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করিল, তখনই সেই সকল অনুগত রাজপুত মহারাষ্ট্রীয়-আক্রমণ হইতে যোধপুররক্ষার্থ স্বেচ্ছাক্রমে অস্ত্রধারণ করিয়া ভক্তের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। এমন কি, সিন্ধিয়া যখন সদলে যোধপুরে আপতিত হইলেন, তখন রাঠোররাজের সেনাবল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া উঠিলেন।

সদলে সিন্ধিয়া আসিয়া যোধপুরে আপতিত হইলেন, সংবাদ পাইয়া ভক্তও নিজ সৈন্যসামন্তসহ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। অজমীর তাঁহার রঙ্গভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়বীরের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে তিনি অম্বরপতি ঈশ্বরসিংহকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "হয় আমার সহিত একত্র হইয়া মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করুন, নচেৎ সমরে অবতীর্ণ হউন্।" ঈশ্বরসিংহ রামসিংহের শ্বশুর; কাজেই তিনি জামাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, ভক্তের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভক্তকে অন্তরের সহিত ভয় করিতেন। এখন উপায় কি, স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার উভয়সঙ্কট উপস্থিত। একবার ভাবিলেন, 'জামাতার সাহায্য করাই উচিত, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। পিতৃহন্তা ভক্তকে মারবার-সিংহাসনে কখনই অবস্থান করিতে দিব না।" ভক্তের ভীষণভ্রূকুটি অন্তরে জাগরূক হওয়াতে আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। মনে করিলেন, "জামাতার জন্য কি নিজে ধনে প্রাণে মারা যাইব?" পরন্তু এক পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে। এইরূপ উভয়সঙ্কটে পড়িয়া অম্বরপতি আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইদরের রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইদর সে সময় অজিতের অন্যতম পুত্র আনন্দসিংহের করে সমর্পিত ছিল। সুতরাং সম্পর্কে ঈশ্বরসিংহের মহিষী ভক্তের ভ্রাতৃকন্যা। ঈশ্বরসিংহ রাঠোর-রাজকুমারীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহিষীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "মহিষি ভক্ত মহাপাপী, পিতৃহন্তা; তাদৃশ দুরাচার কুলাঙ্গার যে যোধপুরের পবিত্র সিংহাসনে সমারূঢ় থাকিবে, তাহা আমার সহ্য হইবে না। কিন্তু এখন উপায় কি? কোন্ পক্ষই বা অবলম্বনীয়? যে পক্ষেই যাই না কেন, অস্ত্রধারণ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না; কিন্তু অস্ত্রবলে দুর্দ্ধর্ষ ভক্তের উপর জয়লাভ করা সুকঠিন। জামাতাকে ত্যাগ করিয়া ভক্তের পক্ষ অবলম্বন করিলেও লোকসমাজে অপযশ রটিবে। এ অবস্থায় ভক্তকে গুপ্তহত্যা করা ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না। কিন্তু মহিষি! তোমার সাহায্য ব্যতীত সে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিব না। ভাবিয়া দেখ, ভক্ত তোমার কি অপকার করিয়াছে। তোমার পিতামহকে হত্যা করিয়াছে। তোমার জামাতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেই অপহৃতরাজ্য তোমার আমার চক্ষুর উপর ভোগ করিতেছে, ইহা কি তোমার প্রাণে সহ্য হয়? আমার অনুরোধ রাখ, পিতৃহন্তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর এবং জামাতাকে যোধপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখভাগিনী হও।"

রাঠোরনন্দিনী পিতৃব্যের প্রাণবধ করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি বিষপ্রয়োগে পিতৃব্যের প্রাণসংহারের সংকল্প করিলেন। অচিরে একটি বিষাক্ত অঙ্গরাখা প্রস্তুত হইল। সেই কালকূটময়ী সজ্জা লইয়া অম্বরমহিষী অজমীরে উপস্থিত হইলেন। এবং সেই কালকূটপূর্ণ পোষাকটি পিতৃব্যকে উপহার প্রদান করিলেন। রাজপুত্রগণের প্রচলিত শিষ্টাচারের অনুরোধে ভক্ত তৎক্ষণাৎ তাহা পরিধান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। অচিরে উপযুক্ত চিকিৎসক আনীত

হইলেন ; ভক্তের নাড়ীপরীক্ষা করাও হইল, চিকিৎসক বিষণ্ণ হইলেন। সম্মুখে সর্দ্দারগণ উপবিষ্ট ছিলেন, বৈদ্যের বিষণ্ণবদন দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয় ! আপনার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইল কেন ?" চিকিৎসক উত্তর করিলেন, "ভীষণ সঙ্কট ! এ রোগের ঔষধ নাই ; স্বয়ং মহাদেব আসিলেও মহারাজকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এখন অন্তিমকালীন ক্রিয়ার উদ্যোগ করুন।"

বৈদ্যের কথা শুনিয়া ভক্তসিংহ সরোষে বলিয়া উঠিলেন, কি শূদ্র ! এ রোগের ঔষধ নাই ? যদি তুমি আমার রোগ আরাম করিতে না পারিবে, তবে আমার ভূমিভোগ কর কেন ?" বৈদ্য পটগৃহমধ্যে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা জলে পরিপূর্ণ করিলেন ; তন্মধ্যে কি একটি দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই গর্ত্তমধ্যে জলরাশি হিমশীলার ন্যায় শীতল হইয়া পড়িল। তখন বৈদ্য ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ ! আপনার রোগ আরাম করা মানুষের সাধ্য নহে। এক্ষণে নিবেদন, আর বিলম্ব করিবেন না, আত্মার সদ্‌গতির জন্য শীঘ্র শাস্ত্রমত অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হউন্।" ভক্ত আর কোন কথা কহিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে. আসন্নকাল উপস্থিত, অল্পক্ষণমধ্যেই তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বিজয়-সিংহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন ; বিজয়সিংহ তাঁহার জীবনের জীবন, তাঁহার সংসারাকাশের ধ্রুবনক্ষত্র। বিজয়সিংহ তখন বালক ; বালক হইয়া কি প্রকারে বিশাল মারবাররাজ্য রামসিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে ? কি প্রকারে রাজসিংহের বিষনয়ন হইতে আত্মজীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ? যুগপৎ এই সমস্ত চিন্তা উদিত হইয়া ভক্তের হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি চিন্তার বিষময়ী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন ; তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র বারিধারা প্রবাহিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সেই অশ্রুসিক্ত বক্ষে বিজয়সিংহের অশ্রুপ্লাবিত বদন ধারণ করিয়া একবার জন্মের শোধ চুম্বন করিলেন, আবার তখনই নেত্রজল মার্জ্জনা করিয়া নিজ সর্দ্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। সর্দ্দারগণ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সর্দ্দারগণ ! তোমরা শোক করিও না, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিল, শোক করিয়া ফল কি ? অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। এক্ষণে সকলে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাবে শ্রবণ কর। আমি জন্মের মত তোমাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম। তোমরা আমার জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমা-দের ত্যাগস্বীকারের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারিলাম না ; মনে ছিল, যবনরাজ্যের উচ্ছেদ করিয়া ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিব, তোমাদিগকে উচ্চ উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিব এবং প্রত্যেককে এক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রদান করিব ; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। এখন আমার একমাত্র অনুরোধ, আমার নয়নের মণি বিজয়কে তোমরা দেখিও ; বিজয় তোমাদের হস্তে অর্পিত হইল ; তোমরা ব্যতীত বিজয়ের আর সুহৃদ্ কে আছে ? দেখিও, রামসিংহ যেন বিজয়কে পদচ্যুত না করে। তোমাদের মুখে সাহসের কথা শুনিলেই আমি সুখে জীবন ত্যাগ করিতে পারি। সর্দ্দারগণ ! আমার সম্মুখে তোমরা শপথ করিয়া বল, বিজয়কে ত প্রাণপণে রক্ষা করিবে ?" ভক্ত নীরব হইলেন ; দীর্ঘশ্বাসভরে তাঁহার দেহলতিকা কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শেষ হইবামাত্র রাঠোরসর্দ্দারগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ ! এই আমরা আপনাপন অসি স্পর্শ করিয়া আপনার সমক্ষে শপথ করিতেছি, প্রাণ থাকিতে রাজনন্দন বিজয়সিংহকে পদচ্যুত করিতে দিব না।" ভক্ত প্রীত হইলেন ; অতঃপর কুলপুরোহিত আহূত হইলেন। রাজা দেবত্বস্বরূপ তাঁহাকে

কয়খানি ভূমিদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে নানা বিভীষিকাময়ী চিন্তা উদিত হইয়া তদীয় হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। সেই কাল-অমাবস্যার বিকটদৃশ্য তাঁহার মানস মুকুরে প্রতিফলিত হইল। অমনি তিনি দেখিলেন যেন, তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার প্রতি বিকট ভ্রুকুটিনিক্ষেপ করিতেছে; যেন সেই সহমৃতা বিমাতা কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া অভিসম্পাত করিতেছেন, "ভক্ত! তুই পিতৃহন্তা, আর তোর রক্ষা নাই। এইবার তোর পাপবপু মারবারের বহির্ভাগে দগ্ধ হইবে।" ভক্ত ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন; চীৎকারস্বরে-সেই সতীশিরোমণিগণের অভিশাপবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক উন্মত্তস্বরে বলিলেন, "ভক্ত! তুই পিতৃহন্তা, আর তোর রক্ষা নাই, এইবার তোর পাপবপু মারবারের বহির্ভাগে দগ্ধ হইবে।" ভক্ত নীরব—দেহ নিস্পন্দ—নয়ন জ্যোতিহীন। ভক্তের লীলাখেলা ফুরাইয়া গেল। তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিল। তাঁহার মৃতদেহ সেই স্থলেই ভস্মীভূত হইল। সেই ভস্মরাশির উপরিভাগে "বুড়া দেউল" (পাপমন্দির) নামে যে স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজিও তাহা বিদ্যমান আছে।

একটিমাত্র দুরপনেয় কলঙ্কে কলুষিত না হইলে ভক্তসিংহ স্বজাতীয় প্রধানতম রাজন্যবর্গের মধ্যে একখানি উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। বীরকেশরী শিবজীর পবিত্রবংশে ভক্তের সমান সাহসিক পুরুষ অতি বিরল। তিনি যেরূপ সাহসিক, সেইরূপ একজন পরমপণ্ডিত ছিলেন। পিতৃশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবার পূর্ব্বে তিনি সকলের পূজার ও অনুরাগের পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহায়তাবলেই গুর্জ্জর ও অন্যান্য জনপদ অধিকৃত হইয়াছিল। তাঁহারই অদ্ভুত বাহুবলের সাহায্যে অভয়সিংহ শিরবুলন্দের উন্নতমস্তক চরণতলে দলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভক্ত যে উদ্ধতস্বভাব চঞ্চলমতি রামসিংহকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রাষ্ট্রাপহারী বলিয়া নিন্দাভাজন হইতে পারেন না। কারণ, রামসিংহ রাজনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র; তাদৃশ ব্যক্তিদ্বারা রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত হয় না। রাজা রাজপুতের উপাস্য-দেবতা সত্য, কিন্তু যিনি রাজনামের যোগ্য নহেন, আত্মপদের মর্য্যাদা যিনি রাখিতে জানেন না, তাঁহাকে লোকে কিরূপে পূজা করিবে? এই সকল কারণেই অযোগ্য রামসিংহকে পদচ্যুত করিয়া সর্দ্দারেরা ভক্তকে মারবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কি প্রণালীতে রাজ্যপালন ও প্রজারঞ্জন করিতে হয়, ভক্ত তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং রাজনীতির প্রকৃষ্ট বিধানানুসারে স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রকৃতিপুঞ্জের হিতানুষ্ঠান করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভক্তসিংহ তিন বৎসরের অধিক রাজ্যভোগ করেন নাই। স্বল্পসময়ের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। মারবাররাজ্যের সমস্ত দুর্গগুলির দৃঢ়ীকরণ এবং যোধগড়ের অবশিষ্ট দুর্গ-প্রাকারের সংগঠন, ইহাই তাঁহার কীর্ত্তির প্রধান নিদর্শন। আহম্মদাবাদ জয় করিয়া তিনি যে সমস্ত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই রাজপ্রাসাদসমূহের সৌষ্ঠববিধানে ব্যয়িত হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত মুসলমান-নৃপতিগণের মসজীদ বিধ্বস্ত করিয়া তিনি তৎসমুদায়ের উপকরণ দ্বারা হিন্দুদেবালয়সমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, কোন মুসলমান বাঙ্গ পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এই বিধি আজও মারবারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে; অদ্যাপি কোন মুসলমান ঈশ্বরস্মরণকালে মারবারে চীৎকার করিতে পায় না। ভক্ত যদি আরও কয়েকবৎসর জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আবার মহারাজ নয়নপালের বংশধরগণের পূর্ব্বগৌরব জগতে বিঘোষিত হইত; কিন্তু ভারতের

দুর্ভাগ্যবশে তাহা হইল না। স্বদেশের গৌরব উদ্ধার করিতে করিতে নিজ কর্ম্মদোষে আততায়ীর অত্যাচারে তাঁহাকে অকালে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইল।

পিতৃঘাতীর হৃদয়শোণিতে নিহত পিতার নিধনের প্রতিশোধ হইল; বিধাতা পাপের উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিলেন। এরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড রাজবারাভূমে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও হৃদয়গুণ্ঠন কাণ্ডের অভিনয় পাশ্চাত্যজগতে অনেক দৃষ্ট হয়। যে সময়ে রাঠোর-চূড়ামণি শিবজী মরুস্থলীতে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক রাঠোরের মৃতকল্প শরীরে অমৃতবারি-সিঞ্চনে আবার তাহাকে পূর্ব্বতেজে সমুত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, সেই সময় হইতে পাশ্চত্য জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইতে আরম্ভ করে। সেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া ইউরোপের মধ্যযুগে যুনানী রাজগণ যে সকল মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাদিগকে পশুর ন্যায় হেয় বলিয়া ঘৃণা করিতে হয়।

ভক্তসিংহের পাপানুষ্ঠান হইতে মারবারের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, রাঠোরকুল অদ্যাপি সেই দুর্দ্দশার ক্রোড় হইতে পুনরুত্থিত হইতে পারিল না। ভট্টকবিরা নিজ নিজ গ্রন্থে ভক্তের সেই পাপের যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সামান্য হইলেও অনন্তরসনা ভক্তসিংহের দুষ্কর্ম্মকীর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু অভয়সিংহের হস্তও সেই পাপে কলুষিত হইয়াছিল, তিনিও সেই মহাপাপের সমান অংশী, এ কথা কোন রাঠোরই অস্বীকার করেন নাই। এই সম্বন্ধে দুইটি শ্লোক গ্রথিত আছে, তন্মধ্যে একটি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়টি এই ;—

"যোধপুর, আউর, অম্বর,
দুনো থাপ উত্থাপ ;
কূর্ম্ম মারা দিকরো,
কামধ্বজ মারা বাপ।"

অর্থাৎ যোধপুর ও অম্বর সিংহাসনারূঢ় নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন; কূর্ম্ম-(কচ্ছাবহরাজ) * পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন এবং কামধ্বজ (রাঠোরকুল) পিতার শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছেন।

অভয়সিংহ ও অম্বরপতি জয়সিংহ পবিত্র পুষ্করতীর্থে এক সময়ে সন্ধ্যাকালে স্ব স্ব সামন্তগণ সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট আছেন; কথাপ্রসঙ্গে অভয়সিংহ কবিবর কর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কবিবর! একটি সময়োচিত কবিতা করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত কর।" তৎক্ষণাৎ কর্ণ দণ্ডায়মান হইয়া ঐ শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

এই অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রতিবাদ শুনিয়া নরপতিদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহারা কবিবরকে কিছুই বলিতে পারিলেন না।

---

* ইনি আপনজ্র শিবজীকে হত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিজয়সিংহের রাজ্যাভিষেক, মহারাষ্ট্রীয় ও কচ্ছাবহদিগের সহিত রামসিংহের সন্ধিবন্ধন, যুদ্ধ, নাগোর অবরোধ, আপ্পাসিন্ধিয়ার হত্যা, "মুণ্ডকাটি" অর্থাৎ হত্যার প্রায়শ্চিত্ত, চৌথ স্থাপন, আপ্পাসিন্ধিয়ার স্মরণার্থ স্তম্ভ, রামসিংহের মৃত্যু, রাঠোর-প্রজাতন্ত্র, পোকর্ণ-সর্দারের দত্তকবিধান, রাঠোর সামন্তপ্রথার অধঃপতন, গরধন খীচি, রাজা গুরুর মৃত্যু, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী, পোকর্ণের দেবীসিংহের উদ্ধত আচরণ, পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধগ্রহণার্থ সুবলসিংহের রণসজ্জা, তাঁহার মৃত্যু, সিন্ধুরাজ্য হইতে অমরকোট আচ্ছিন্নকরণ, মিবার হইতে গদবারগ্রহণ, মহারাষ্ট্রীয়দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ, টঙ্গযুদ্ধ, দী-বইনের প্রথম আবির্ভাব, অজমীর পুনরধিকার, পত্তন ও মৈরতা-যুদ্ধ, অজমীরের শাসনকর্ত্তার আত্মহত্যা, বিজয়সিংহের উপপত্নীর দত্তক-পুত্রগ্রহণ, বিজয়সিংহের মৃত্যু।

ভক্তসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহের বয়ঃক্রম যখন বিংশতিবর্ষ, যখন তিনি মৈরতানগরের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পথিমধ্যে মারোটনগরে উপস্থিত হইবামাত্র পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিলেন। সেই মারোটনগরেই সর্দারগণ তাঁহার অভিষেচনিক আয়োজন করিলেন। সেই অভিষেকব্যাপারে সম্রাট্ এবং রাজস্থানের প্রায় সমস্ত নৃপতিগণই অনুমোদন করিয়াছিলেন। মৈরতানগরে উপনীত হইয়া বিজয়সিংহ পিতার অশৌচকাল অতিবাহিত করিলেন। এই স্থলে বিকানীরপতি, কিষণগড়রাজ ও রূপনগরের অধিপতি আসিয়া তাঁহার নবাভিষেকে আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মৈরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজয়সিংহ রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনানন্তর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নবীন ভূপতি দীন, দরিদ্র অনাথগণকে অপরিমিত ধনরত্ন দান করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করিলেন।

আততায়ীর বিশ্বাসঘাতকতায় ভক্তসিংহের মৃত্যু হইল, রামসিংহ নিষ্কণ্টক হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যগগন পরিষ্কৃত হইল। তিনি সেই সুযোগে নিজস্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন এবং অম্বরপতির সাহায্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেম। এই সন্ধিপত্র হলদি অথবা বলপত্রনামে অভিহিত। সন্ধির নিয়মগুলি যথাবিধি পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দাক্ষিণীগণ কোটা ও জয়পুরের নিকট দিয়া রাজধানীর দিকে যাত্রা করিল। জয়পুরের রামসিংহ স্বীয় কতিপয় অনুচর এবং অম্বরপতি-প্রদত্ত একটি বিশাল সেনাকটক লইয়া মহারাষ্ট্রীয়সেনানীগণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাবলের সাহায্য পাইয়া নির্ব্বোধ রামসিংহ মনে করিয়াছিলেন যে, সেই দাক্ষিণী দস্যুরা নির্ব্বিরোধে তাঁহার অভীষ্টসাধনে সহায় হইবে, কিন্তু তাঁহার সে ধারণা

ভ্রমমূলক। দস্যুতা ও লুণ্ঠনপ্রিয়তা যাহাদের ব্রত, যাহারা ঐ ব্রতকেই জীবনের মুখ্যধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে, সেই ঘোর স্বার্থপর মহারাষ্ট্রীয়গণ কি নির্ব্বিরোধে সাহায্য প্রদান করিবে? অজমীরে উপস্থিত হইয়াই তাহারা সেই নগরী লুণ্ঠনে উদ্যত হইল; রামসিংহ তিরস্কার করিয়া তাহাদিগকে সেই পাপচেষ্টা হইতে নিবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহার তিরস্কারে মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং ধীরভাবে তাহা সহ্য করিল।

আশু বিজয়সিংহ সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন। রামসিংহ মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাঠোরমাত্রেরই হৃদয় সংক্ষুব্ধ হইল। তাঁহারা রামসিংহকে কাপুরুষ বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে শত শত ধিক্কার প্রদান করিলেন এবং দাক্ষিণীগণের আক্রমণ হইতে রাঠোরকুলের গৌরবসম্ভ্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য সকলে অচিরে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মারবারের যাবতীয় সর্দ্দারগণ সমরসাজে সজ্জিত হইয়া বিজয়সিংহের উন্নত পতাকামূলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞা, জীবন থাকিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে জয়লাভ করিতে দিবেন না। এইরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এবং স্বদেশপ্রেমিকতা ও আত্মোৎসর্গের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাঠোরবীরগণ রাঠোরপতি বিজয়সিংহের সাহায্যাভিলাষে ভীষণ রণসাগরে ঝম্পপ্রদানার্থ ধাবিত হইলেন।

এদিকে কচ্ছাবহ ও মহারাষ্ট্রীয়সেনা পবিত্র পুষ্করে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক দিন তাহারা সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বিশ্রাম করিল। রামসিংহ তথা হইতে বিজয়সিংহের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন, "পত্রপাঠমাত্র মারবারের সিংহাসন আমাকে প্রদান কর।" সমবেত সর্দ্দারমণ্ডলীর সমক্ষেই বিজয়সিংহ পত্রখানি পাঠ করিলেন। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিক হইতে "রণ রণ" শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল। সতেজস্বরে সকলে বলিয়া উঠিলেন, "কি, মহারাষ্ট্রীয় দস্যু মহারাজ যোধরাওয়ের পবিত্র সিংহাসনে আরোহণ করিতে চাহে? জম্বুক হইয়া মৃগেন্দ্রের রাজপদদংশনে অভিলাষী? কে সেই আপ্পা—আমাদিগকে ভয়প্রদর্শন করে, এমন বলী কে? মহারাজ! কিছুমাত্র চিন্তা নাই; আমরা আপনার সম্মুখে অসি স্পর্শ করিয়া বলিলাম, যদি মস্তকোপরি শত শত বজ্রপাত হয়, যদি আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি আমাদের মস্তক স্তম্ভরূপে উন্নত থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিবে।" রাঠোরবীরগণের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল।

রামসিংহের পত্রের প্রত্যুত্তর আসিল। বিজয়সিংহ সাধ্যপক্ষে তাহার হস্তে যোধপুর সমর্পণ করিবেন না। তিনি বীর, বীরের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বীরোচিত অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ থাকিবেন। সুতরাং যুদ্ধের সাহায্যে পরস্পর অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে হইবে। আশু উভয় পক্ষে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, রাঠোর ও মহারাষ্ট্রীয়গণ হুহুঙ্কারে রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিল; উভয় দলেই অনর্গল গোলাবর্ষণ হইতে থাকিল। প্রথম দিবসের অধিক ভাগ গোলাযুদ্ধেই অতীত হইল; অবশেষে অসিযুদ্ধের সহিত সেই দিবসের রণাভিনয় পরিসমাপ্ত হইল; কিন্তু কোন দলই জয়লাভ করিতে পারিল না। পরদিন প্রভাতেই পুনর্ব্বার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিজয়সিংহ পঞ্চসহস্র নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। রামসিংহের বিশাল অনীকিনীর বিরুদ্ধে বিজয়সিংহের সেই কতিপয় সৈনিক মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সেই পঞ্চসহস্রের ভুজদণ্ডে যে প্রচণ্ড শক্তি ও হৃদয়ে যে প্রচণ্ড তেজ নিহিত ছিল, তাহা বোধ করা দুরূহ। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রাণপণে চেষ্টা করিল, তাহাদের

অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য রণস্থলে শয়ন করিল, কিন্তু কিছুতেই সে শক্তি—সে তেজ ব্যর্থ করিতে পারিল না, সেই পঞ্চসহস্র রাঠোরবীরের প্রচণ্ড তেজ ক্রমে ক্রমে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল; মহারাষ্ট্রীয়েরা পতঙ্গবৎ তাহাতে বিদগ্ধ হইয়া গেল।

বিজয়সিংহ এক জন সুচতুর যোদ্ধা। স্বীয় সেনাবলের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি সে বিশ্বাসে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বিপক্ষের সংখ্যাধিক্য দর্শনে মনে মনে ভীত হইয়া তিনি আত্মরক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি বিধাতার কঠোর বিধানে তাঁহাকেই পরাজিত হইতে হয়, তাহা হইলে সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পলায়ন করিবেন। সেইজন্য তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে স্বীয় যানবাহনাদি অনুক্ষণ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় দিনে বিজয়সিংহের সেনাদল সেই সমস্ত সজ্জিত পশুগুলিকে শিবিরের পশ্চাদ্ভাগস্থ একটি নদীতে জলপান করাইতে লইয়া গেল। পশুগুলি জলপানার্থ নদী-সৈকতে অবতরণ করিয়াছে, ইত্যবসরে দূরে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। চমকিত হইয়া রাঠোর-সৈনিকগণ দেখিল, কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেই অশ্বারোহিগণকে রামসিংহের দলবলভ্রমে তাহারা যেমন "দাগ্ গা" "দাগ্ গা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি সকলে স্ব স্ব বন্দুক উদ্যত করিয়া তাহাদিগের প্রতি গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা প্রকৃত শত্রু কি মিত্র, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল না; ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই আত্মনাশে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের ঐরূপ শত্রুতাচরণ দর্শনে সেই আক্রান্ত সেনাদল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রাঠোরসৈন্যগণ! ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও! ভ্রমে পতিত হইয়াছ, আত্মহত্যা করিও না। আমরা তোমাদের বিপক্ষ নহি।" কেহই সে সকল কথায় কর্ণপাত করিল না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল—বুঝিতে পারিল যে, বৃথা ভ্রমে অন্ধ হইয়া তাহারা মিত্র-নাশে উদ্যত হইয়াছে; অমনি সকলে "হায়! কি করিলাম" বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিল এবং নদীর পরপারে গিয়া সেই হতাবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যের নিকট উপস্থিত হইল,—দেখিল, যে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী বীর প্রচণ্ড বাহুবলে মহারাষ্ট্রীয় সেনা দলিত ও বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদেরই অবশিষ্ট। বিপক্ষদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই কতিপয় কবচীবীর শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন;—সঙ্কল্প ছিল, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় শত্রুদলকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইল না। শত্রুর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রমুখ হইতে রক্ষিত হইয়া মিত্রের আক্রমণে দেহত্যাগ করিতে হইল। সেই আক্রমণকারী ভ্রমান্ধ মিত্রসৈনিকগণ নিকটে উপস্থিত হইলে, সেই হতাবশিষ্ট কতিপয় বীরের হৃদয় যুগপৎ শোকে ও দুঃখে মথিত হইলে, তাঁহারা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হা মূঢ়গণ! কি করিলে? আত্মপর বিবেচনা না করিয়া স্বহস্তে আত্মপদে কুঠারাঘাত করিলে?" তাহারা আর কি উত্তর দিবে?—মৌনভাবে অবস্থান করিল। অবশেষে সেই সকল হত ও আহত সৈন্যদিগকে লইয়া শিবিরে উপস্থিত হইল। আশু এই অশুভ সমাচার বিপক্ষের শ্রুতি-গোচর হইল। তাহারা ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তেই রাঠোরসেনা আক্রমণপূর্ব্বক সকলকে সংহার করিতে পারিত, কিন্তু বিজয়সিংহের কবচীসেনা তাহাদিগকে এরূপ বিত্রাসিত করিয়াছিল যে, তাহারা আর তখন পুনরাক্রমণ করিতে সাহসী হইল না।

রাঠোরশিবিরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেরই মুখকমল শোকনীহারে পরিশুষ্ক হইল; নৈরাশ্য ও ভীতির গভীর ছায়া পতিত হইয়া উহা মলিন করিয়া ফেলিল। সকলে

ভয়চকিতলোচনে ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আজি বিজয়সিংহ বিষম সঙ্কটাপন্ন। সেই ভীষণ-সঙ্কট-মোচনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অচিরে একটি সমর-সভা আহুত হইল। তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও সামন্ত, তদ্ভিন্ন বিকানীর ও কিষণগড়ের নৃপতিদ্বয় সেই সভায় উপস্থিত হইয়া সঙ্কোটোদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথম বিকানীররাজ মারবারপতি বিজয়সিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! উপস্থিত সঙ্কটে যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়াই বিবেচনাসঙ্গত।" অনেকেই এই মতের পোষকতা করিলেন। বিজয়সিংহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সর্দ্দার ও সহকারী রাজগণ যুদ্ধের বিরোধী। একদিকে মারবারের সিংহাসন অন্য দিকে তাঁহার অমূল্য জীবন, আজি যদি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেই সিংহাসন হারাইতে হয়, জীবিত থাকিলে হয় ত আর একদিন তাহার পুনরুদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু জীবন গত হইলে আর রাজসিংহাসন উদ্ধার হইবে না। বিশেষত: এখন কাহাকে লইয়াই বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন? সর্দ্দারগণ যুদ্ধে ক্লান্ত, সহকারী রাজারা নিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব সেনাদল সহ স্বদেশগমনে উদ্যত; তবে কাহাকে লইয়া সেই বিশাল বিপক্ষবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন? এই সকল চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে বিজয়সিংহ একান্ত আকুলিত হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পিতার কথা তাঁহার মনে পড়িল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভক্তের সেই গভীর রাজনীতিজ্ঞতা, সেই অভ্রান্ত বিচারক্ষমতা, সেই অদম্য সাহস ও সহিষ্ণুতা যদি বিংশতিবর্ষবয়স্ক বিজয়সিংহের হৃদয়ে সংক্রামিত হইত, তাহা হইলে তিনি সেই সমস্ত চিন্তা হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বালক, রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশী অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, কোন বৃদ্ধ সর্দ্দার সে সময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিপদুদ্ধারের সুপথ দেখাইয়া দিবেন, তাহাও তখন হইল না। যাঁহারা রাজনীতিবিশারদ, তাঁহারা অনেককেই রণক্ষেত্রে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন; যাঁহারা অবশিষ্ট, তাঁহারাও প্রায় সকলেই 'বিকানীরপতির পরামর্শের সমর্থন করিলেন। বিকানীরপতি ও কিষণ-গড়ের রাজা স্বীয় দলবল লইয়া স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন। বিজয়সিংহের পক্ষ অনেক পরিমাণে হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তথাপি যে কয়েকটি সর্দ্দার ও সামন্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যদি সেই সময়ে পূর্ব্ববৎ অদম্য উৎসাহ ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, সেই বিরাট মহারাষ্ট্রীয়বল পরাহত হইয়া পড়িত; কিন্তু বিকানীর যে কুসংস্কারের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহার কুহকে মুগ্ধ হইয়া আর কেহই সাহস বা উৎসাহে সমুত্তেজিত হইল না।

এ দিকে রামসিংহ উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয়সৈন্যের সহিত সেই স্বল্পপরিমিত রাঠোর সর্দ্দারে ও সামন্তগণকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইল। তাঁহাকে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাঠোর সর্দ্দারগণ ঘন ঘন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে করিতে স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ডবেগে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। যে রাঠোর-সর্দ্দারগণ ইতিপূর্ব্বে কুসংস্কারের কুহকে পড়িয়া নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, আবার'যেন তাঁহারা নবীন উৎসাহে উৎসাহিত নবীনতেজে উত্তেজিত হইয়া আপনার অধিপতির সম্মানরক্ষার্থ প্রাণপণে রণরঙ্গে উন্মত্ত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের বাহুবলের নিকট শত্রুসেনা তিষ্ঠিতে না পারিয়া পশ্চাদপসৃত হইবার উপক্রম করিল; কিন্তু রূপনগরের অধিপতি সাবন্তসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র সর্দ্দারসিংহের কৌশলে পরক্ষণেই তাহারা বিজয়সিংহের উপর জয়লাভ করিল।

কিষণগড়ের রাজা ইতিপূর্ব্বে রূপনগর কাড়িয়া লইয়া সর্দ্দারসিংহকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সামন্তসিংহ পুত্রকলত্রাদি সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন-তীর্থযাত্রা করেন। বিষময়ী সংসারজ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল কেবল ভগবানের আরাধনাতে অতিবাহিত হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক বাসনা। নিজ পুত্রকেও সামন্তসিংহ সেই ব্যাপারে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। যুবা সর্দ্দারসিংহ উত্তর করিলেন, "পিতঃ! আপনি দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ও বিলাসভোগ করিয়াছেন, আপনার তাহাতে আর স্পৃহা না থাকিতে পারে; কিন্তু আমি জীবনে ত সে সুখের আস্বাদ পাইলাম না; অনুমতি করুন, আমি রূপনগরের উদ্ধারের উপায় দেখি।" পিতার অনুমতি লইয়া তিনি রামসিংহের দূতের সহিত মহারাষ্ট্রীয়-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আপ্পাসিন্ধিয়া তাঁহাকে আশ্রয়দান করিয়া তদীয় রাজ্যোদ্ধারের আশ্বাস দিলেন। তৎপরে সেই দ্বিতীয়দিবসের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রাঠোরবীরগণের মহাবিক্রম ও রণকৌশল ভাবিয়া সিন্ধিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্দ্দারসিংহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তদীয় সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন সিন্ধিয়া উত্তর করিলেন, "যুবক! দেখিতেছি, তোমার গ্রহ রামসিংহের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ, অদৃষ্টদেব বুঝি তোমাদের প্রতি বাম; সম্প্রতি প্রস্থানের উদ্যোগ করিয়াছি, এখন বলের সাহায্যে বিজয়সিংহকে পরাস্ত করা কঠিন।" চতুর সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন "বলে না হউক, ছলে ত হইতে পারে; অনুমতি হইলে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" ঈষৎ হাস্য করিয়া সিন্ধিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতিদান করিলেন। সর্দ্দারসিংহ কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করিয়া সগোত্রীয় একজন সৈনিককে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, মৈনোটমন্ত্রী যেখানে যুদ্ধ করিতেছেন, তুমি তথায় বিজয়সিংহের সৈনিকবেশে উপস্থিত হও এবং তাঁহাকে কাল্পত শোকের সহিত বল যে, আর যুদ্ধ করিয়া কি হইবে, বিজয়সিংহ যুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছেন।" সর্দ্দারসিংহের উপদেশমত সেই সৈনিক তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। রাঠোরসেনার যে অংশ মহারাষ্ট্রীয়গণকে প্রচণ্ডবিক্রমের সহিত দলিত করিতেছিল, মৈনোটমন্ত্রী তাহার পরবর্ত্তী ছিলেন। সর্দ্দারপ্রেরিত সৈনিক তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া কল্পিত শোক-সহকারে চীৎকারস্বরে বলিল, "মন্ত্রিবর! আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি? মহারাজ বিজয়সিংহ বিপক্ষের গোলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া রণভূমে শয়ন করিয়াছেন।" মৈনোট-মন্ত্রী অমনি অস্ত্রত্যাগ করিলেন এবং অশ্রুনীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন। এই অলীক দুঃসমাচার দাবাগ্নির ন্যায় প্রচণ্ডবেগে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ সকলে অশ্ব ফিরাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। বিজয়সিংহ যে স্থানে সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, ক্রমে এই সমাচার তথায় বাহিত হইল তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং নিজ হতাশ সৈন্যগণকে আশ্বাসিত করিবার জন্য কতকগুলি সৈনিক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাদের কথায় কাহারও বিশ্বাস হইল না। বিজয়সিংহ যদি কোন সর্দ্দারের হস্তে সৈন্যাপত্যভার প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং সেই ত্রস্ত সৈনিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহারা আবার নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিত;—সে উৎসাহের সম্মুখে সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি অল্পবয়স্ক, এ বুদ্ধি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল না। তথাপি যে কতিপয় সর্দ্দার তৎসমীপে উপস্থিত রহিলেন, তাঁহারা আপনাদের বালক রাজাকে বেষ্টনপূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিপক্ষসেনার বলাধিক্যদর্শনে তাঁহারা বিজয়সিংহের প্রাণরক্ষার্থে উৎসুক হইলেন এবং সমীপস্থ মৈরতাদুর্গে আশ্রয়লাভার্থ তদভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন;

কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বিশাল মহারাষ্ট্রীয়বাহিনী উদ্বেল সাগরতরঙ্গবৎ মহাবেগে সেই কতিপয় রাঠোরবীরের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। দূরে থাকিয়া বিজয়সিংহ সেই মুষ্টিমেয় রাঠোরসেনার অদ্ভুত বীরত্ব দর্শন করিলেন, দেখিলেন, তাঁহারা বিপক্ষ কর্তৃক শতগুণে আক্রান্ত হইলেও বিস্ময়কর বীরত্বসহকারে অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়সৈন্যকে নিপাত করিয়া পরিশেষে রণভূমে শয়ন করিলেন। বিজয়সিংহ আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না; তখন তাঁহাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া তিনি আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

রৈণনগরাধিপতি সর্দ্দার লালসিংহ এবং পাঁচজন অশ্বারোহী কবচী সৈনিক বিজয়সিংহের সঙ্গে চলিলেন। মৈরতা হইতে জহিল যাইবার পথে রৈণ নগর স্থাপিত। রৈণ সচরাচর রহিন নামে অভিহিত। এই নগরের অধিকারী বলিয়াই সর্দ্দার লালসিংহ 'রৈণের ঠাকুর' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দিবাভাগে কোন গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে বিজয়সিংহ নগরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। একে কৃষ্ণপক্ষের রজনী, তাহাতে অনন্ত নৈশগগন স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম জলদজালে আচ্ছন্ন। সেই অগভীর মেঘমালা ভেদ করিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ অগণ্য খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লালসিংহ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। বিজয়সিংহ ও সেই পঞ্চ কবচী সৈনিক তাঁহার অনুগামী। বহুদূর অতিক্রমের পর বিজয়সিংহ দেখিলেন যে, পথভ্রমে অন্যদিকে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি তখনই রৈণসর্দ্দারকে বলিলেন, "লালসিংহ! আমরা বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহা যে তোমার রৈণে যাইবার পথ। আইস, এই সময় প্রকৃত পথ আশ্রয় করি।" বোধ হয়, লালসিংহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজাকে সেই পথে লইয়া গিয়াছিলেন; কারণ, তিনি তৎক্ষণাৎ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, 'মহারাজ! আমি বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। অনুমতি হইলে একবার পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করি; ইচ্ছা আছে, তাহা-দিগকেও সঙ্গে করিয়া লই।" বিজয়সিংহ কোন উত্তর না করিয়া সেই পঞ্চ কবচী সৈন্যের সহিত স্বীয় গন্তব্যপথ পুনরাশ্রয় করিলেন; রৈণের ঠাকুর ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া আপন বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বিজয়ের ইচ্ছা ছিল, তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবেন, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সে ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারিলেন না। তিনি কুজবানের সম্মুখস্থ উচ্চ প্রাকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বিপদের বন্ধু তৎকালের একমাত্র সম্বল প্রিয়তম অশ্বটি কঠোর পরিশ্রমে প্রাণত্যাগ করিল।

রাজা বাহনশূন্য; সমভিব্যাহারী একটি সৈনিক নিজ অশ্বটি রাজাকে দিয়া আপনি পদব্রজে চলিতে লাগিল তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নরপতি দেশোয়াল নামক স্থলে উপস্থিত হইলেন। কঠোর পরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অশ্বগুলি আর একপদও অগ্রবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইল না। বিজয়সিংহ বিষম সঙ্কটাপন্ন হইলেন; কোথায় যাইবেন, কোথায় উপস্থিত হইলে কে আশ্রয় দিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ইচ্ছা হইল, সকলকে ত্যাগ করিয়া পদব্রজে নাগোরে গমন করেন, কিন্তু নাগোরও দূরবর্ত্তী, সে স্থান হইতে প্রায় আট ক্রোশ। এ দিকে রজনী প্রভাতপ্রায়। সেই অল্পসময়ের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে নাগোরে উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পরিশেষে সমভিব্যাহারী সৈন্যগণকে ত্যাগ করিলেন এবং স্বীয় রাজবেশ লুক্কায়িত করিয়া একটি, জাটকৃষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে রজনী-প্রভাতের পূর্ব্বে নাগোরে পৌঁছাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে পাঁচটি টাকা পারিশ্রমিক দিব।" জাট সম্মত হইয়া একখানি বলদবাহী শকট আনয়ন করিল। বিজয়সিংহ তদুপরি আরূঢ়

হইলে শকটাধ্যক্ষ কহিল, "দেখ, আমি কিন্তু চলনসই টাকা চাই।" বিজয় তাহাতে স্বীকার করিলেন। অমনি লগুড়তাড়িত হইয়া বলীবর্দ্দ-দুটি প্রাণপণে ত্বরিতগতিতে ধাবিত হইল। মুহূর্ত্ত পরেই রাজা কৃষককে ক্রমাগত "হাঁক্ হাঁক্" করিয়া উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। কৃষক বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলদ-দুটি প্রাণপণে শকট টানিয়া যাইতেছে, তথাপি আরোহী "হাঁক্! হাঁক্!" করিয়া চীৎকার করিতেছে, সুতরাং উত্যক্ত জাট রুক্ষস্বরে বলিল, "হাঁক! হাঁক! কে হে বাপু তুমি? অত তাগিদ কেন হে বাপু? চোরের মত নাগোরের দিকে যাওয়া অপেক্ষা তোমার মত মূর্খের মৈরতাক্ষেত্রে বিজয়সিংহের নিকট যাওয়া ভাল। তুমি বুঝি দাক্ষিণীদিগের ভয়ে পলাইয়া যাইতেছ? যাহা হউক, চুপ করিয়া থাক, ইহা অপেক্ষা একতিল বেশী জোরে আমি গাড়ী হাঁকাইব না।"

রজনী প্রভাত হইল। উষাসতী অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া জগতের সমক্ষে দর্শন দিলেন। শকটচালক একবার সেই অধীর আরোহীকে দেখিবার জন্য তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া অমনি শকট হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল;—কহিল, 'মহারাজ! আমি চিনিতে না পারিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন।" রাজা প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই, ক্ষমা করিয়াছি, এক্ষণে যত শীঘ্র পার, শকটচালন কর।" জাট শকটোপরি বসিয়া বলদ-দুইটিকে কঠোর লগুড়াঘাতে তাড়িত করিতে লাগিল। যতক্ষণ সেই শকট নাগোরে উপস্থিত না হইল, ততক্ষণ তাহার "হাঁক্ হাঁক্" ধ্বনি থামিল না। নাগোরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিজয়সিংহ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং জাটকৃষককে পাঁচটি টাকা দিয়া তখনই বিদায় দিলেন। বিদায়কালে শকটাধ্যক্ষকে তিনি ভবিষ্যতে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের আশা দিয়াছিলেন। "বিজয়বিলাস" নামক ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে, রাজা বিজয়সিংহ সেই জাটকে পাঁচশত বিঘা জমী একেবারে চিরকালের জন্য দান করিয়াছিলেন। সেই জাটকৃষকের সন্তানসন্ততিগণ আজিও সেই সকল ভূমিসম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতেছে।

রাজাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া নাগরিকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তৎক্ষণাৎ দুর্গশিরে বিশালপতাকা উত্থাপিত হইল। বিজয়সিংহের আদেশে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। সর্দ্দারগণ তৎক্ষণাৎ রণসাজে সজ্জিত হইয়া প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত দুর্গের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণতলে সমবেত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই সংবাদ আসিল যে, বিপক্ষেরা দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এই অশুভ সমাচার শ্রবণমাত্র বিজয়সিংহ ভাবিয়া দেখিলেন, দুর্গে সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত অল্প; সুতরাং দুর্গদ্বার রুদ্ধ রাখিতে অনুমতি করিলেন। এ দিকে বিপক্ষেরা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল, ছয়মাস দুর্গ অবরুদ্ধ রহিল; কিন্তু শত্রুগণ বিজয়সিংহের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিল না; বরং আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল; কারণ, তাহারা অবরোধযুদ্ধে পারদর্শী নহে। এ দিকে বিজয়সিংহ সেই দীর্ঘকালের মধ্যে সময়ে সময়ে দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক সদলে শত্রুসেনা আক্রমণ করিতেন এবং সম্মুখে যাহাকে পাইতেন, নিপাতিত করিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইত না। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইল। শত্রুদলের অনেক সৈন্য ক্ষয় হইল; এক একটি করিয়া বিজয়েরও অনেকগুলি সৈনিক রণক্ষেত্রে শয়ন করিল, ক্রমে ক্রমে তাঁহার আশাভরসা বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, বরং আত্মপক্ষের দুর্ব্বলতা দর্শনে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। নগরমধ্যে আর অধিক দিন অবরুদ্ধ থাকা তাঁহার মতে যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। শত্রু পরিবেষ্টিত

হইয়া দুর্গমধ্যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করাও কাপুরুষের কার্য্য। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ; তথাপি দুর্গমধ্যে এ ভাবে রুদ্ধ থাকিয়া মরিব না।" অতঃপর বিজয়সিংহ নাগদুর্গের উচ্চতম সৌধশিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, শত্রুসেনা বিশাল সাগরের ন্যায় নগরী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।—তন্মধ্যে কেহ নৃত্য, কেহ গীত এবং কেহ বাদ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। কেহ কেহ বা নানাপ্রকার ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছে, নিকটে নিকটে প্রহরিগণ সশস্ত্রবেশে দলে দলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। বিজয়সিংহের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার পাঁচশত বলিষ্ঠ উষ্ট্র ছিল, তাহাদের পৃষ্ঠে সহস্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুতবীর স্থাপনপূর্ব্বক বিজয়সিংহ গভীরনিশীতে দুর্গদ্বার উন্মোচন করিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে মহারাষ্ট্রীয়শিবির ভেদ করিয়া বিকানীর-রাজ্যের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিকানীররাজের সাহায্যগ্রহণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

এক দিবসের মধ্যেই বিজয়সিংহ বিকানীরে উপস্থিত হইলেন। বিকানীররাজ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান-সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। বিজয়সিংহের মনোভিলাষ জানিতে পারিয়া বিকানীরপতি তাঁহাকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন না। বিজয়সিংহের হৃদয় একান্ত সংক্ষুব্ধ হইল। নিকট-আত্মীয় হইয়া বিকানীরপতি যে আজি সঙ্কটে মারবাররাজকে সাহায্যদানে বিমুখ হইবেন, বিজয়সিংহ স্বপ্নেও ইহা চিন্তা করেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এখন অম্বররাজ ঈশ্বরসিংহের নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আশু সেই বলিষ্ঠ উষ্ট্রসেনা জয়পুরের দিকে প্রধাবিত হইল। পরদিন প্রভাতে জয়পুরের মনোহর উচ্চ প্রাকার বিজয়-সিংহের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কিন্তু তিনি একেবারে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া নগর-প্রাচীরতলে বিশ্রাম করিলেন এবং তথা হইতে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "এ বিপদে আমাকে আনুকূল্য প্রদান করিতেই হইবে; আমি স্বয়ং আপনার দ্বারে অতিথি, রাজপুত হইয়া পবিত্র আতিথেয়তার অবমাননা করিতে নাই, এ কথা আপনার ন্যায় বিচক্ষণ উদারাশয় মহাপুরুষের নিকট বলা বাহুল্যমাত্র।"

আতিথেয়তা রাজপুতজাতির পরমধর্ম্ম। অতিথি তাঁহাদের নিকট দেববৎ পূজ্য। এই আতি-থেয়তার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিজয়সিংহ শত্রুর প্রধানমিত্র ঈশ্বরসিংহের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু রাজপুতকুলাঙ্গার সেই কাপুরুষ অতিথিসৎকারের যে পবিত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা মনে পড়িলে তাহার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে। সেই দুরাত্মা স্বনগরে পাইয়া বিজয়সিংহকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একমাত্র মৈরতাসর্দ্দার যুবনসিংহের অসীম প্রভুভক্তির প্রভাবে বিজয় আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

দূতমুখে সংবাদ পাইয়া ঈশ্বরসিংহ তখনই অতিথিসৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজ-অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জয়পুরের অন্যতম প্রধান সর্দ্দার আচরোলপতি প্রেরিত হইলেন। গমনকালে আচরোলকে আহ্বান করিয়া অম্বররাজ তাঁহার কানে কানে কি বলিলেন; "যে আজ্ঞা" বলিয়া সর্দ্দার বিদায়গ্রহণ করিলেন। এই সর্দ্দারের কন্যার সহিত মৈরতা-সর্দ্দার যুবন-সিংহের বিবাহ হইয়াছিল বিজয়সিংহকে অতিথিশালার উপযুক্ত আসনে বসাইয়া আচরোলপতি নিজ জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বাটীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায়কালে নিম্ন-স্বরে বলিলেন, "সতর্ক থাকিবে, বিজয়সিংহকে রাজা বন্দী করিতে আমার প্রতি অনুমতি করিয়াছেন; কিন্তু সাবধান, এ গুপ্তকথা যেন প্রকাশ না হয়।" জয়পুরাধিপ অতিথির অভ্যর্থনার জন্য অতিথি-শালায় উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

অতঃপর উভয়েই একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরস্পর পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। ইত্যবসরে মৈরতাসর্দ্দার ধীরে ধীরে ঈশ্বরসিংহের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন; অম্বরপতির প্রলম্বিত অঙ্গরাখার একাংশ ভূতলে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়াছিল, যুবনসিংহ সহসা তদুপরি চাপিয়া বসিলেন। এরূপ কৌশল ও সতর্কতার সহিত বসিলেন যে, কেহই তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিলেন না। তিনি শ্বশুরের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, গুপ্তকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না,—সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইল। মৈরতীয় সর্দ্দার রাজার দক্ষিণদিকে আসনগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে পশ্চাতে বসিতে দেখিয়া ঈশ্বরসিংহ তদভিমুখে ফিরিয়া বলিলেন, "কেন ঠাকুর, আজি যে আপনি পশ্চাদ্ভাগে বসিলেন?" "মহারাজ! প্রয়োজন আছে।" যুবনসিংহ প্রশান্ত-স্বরে এইমাত্র উত্তর করিলেন। তৎপরে নিজ প্রভুর দিকে ফিরিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! উঠুন, এখনই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাউন, নতুবা আপনার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।" অমনি বিজয়সিংহ ত্বরিতগতিতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক ঈশ্বরসিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু যুবনসিংহ তাঁহার অঙ্গরাখার উপর উপবিষ্ট হওয়াতে প্রতিরোধ পাইয়া আসন ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে উঠিতে উদ্যত দর্শনে মৈরতাসর্দ্দার নিজ তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া তদীয় বক্ষের উপর ধারণ করিলেন এবং কঠোরস্বরে বলিলেন, "সাবধান! মহারাজের গমনে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে এই ছুরিকা আপনার হৃদয়শোণিত পান করিবে।" এই বলিয়া বিজয়সিংহকে বলিলেন, "মহারাজ! অশ্বে আরোহণ করিয়াই আমাকে সংবাদ দিবেন।" সভাস্থ সকলে চমকিত হইলেন। স্বয়ং ঈশ্বরসিংহ কিংবা তাঁহার কোন সর্দ্দারই যুবনসিংহের প্রতিকূলে কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। ক্ষণকালমধ্যেই অতিথিশালার বহির্দ্দেশ হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "যুবনসিংহ! মহারাজ আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতে-ছেন।" অমনি মৈরতী সর্দ্দার ছুরিকা কোষস্থ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং অম্বরপতির সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক তীব্র-বেগে গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই অপূর্ব্ব প্রভুভক্তিদর্শনে ঈশ্বরসিংহ যুবনসিংহকে প্রত্যভিনন্দন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ দেখ, প্রভুভক্তির কি জলন্ত নিদর্শন দেখ। এরূপ লোকের প্রতিকূলে জয়লাভ করা দুরাশা মাত্র।"

বিজয়সিংহের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তিনি যাহারই নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন, সেই ব্যক্তিই মহারাষ্ট্রীয়গণের ভয়ে তাঁহাকে সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইলেন। বারংবার হতোদ্যম হইয়াও বিজয়সিংহ উৎসাহ পরিত্যাগ করিলেন না, অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে তিনি নাগোরে প্রতিগমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ কৌশলে সেই গভীর রজনীযোগে তন্নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে কোন্ সময়ে দুর্গ হইতে বহির্গত হন, আবার কখন্ যে তাহাতে পুনর্ব্বার আগমন করেন, চতুরচূড়ামণি হইয়াও মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

এই প্রকারে আরও ছয়মাস অতীত হইল; তথাপি বিপক্ষেরা নগর পরিত্যাগ করিল না। বিজয়সিংহ বিষম চিন্তাকুল হইলেন। একদিন নিভৃতে বসিয়া বিপদুদ্ধারের উপযুক্ত উপায় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার অধীনস্থ দুইটি পদাতিক সৈন্য তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন রাজপুত, দ্বিতীয় ব্যক্তি আফগান। তাহারা সবিনয়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ, অনুমতি করুন, আমরা আপনাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করি।" বিজয়সিংহ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই

সৈনিকদ্বয় পুনঃ পুনঃ আগ্রহ সহকারে বলিতে লাগিল, "রাজন্! উপহাস করিবেন না, আপনার আদেশ পাইলে আমরা এখনই সেই দুর্জ্জয় দাক্ষিণী আপ্পাকে সংহার করিতে পারি।" বিজয়সিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি প্রশান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিন্ধিয়ার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য, তোমরা কিরূপে তাঁহাকে বধ করিবে?" তাহারা উত্তর করিল, "আপনি যদি আমাদের পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে আমরা সেই অসংখ্য শত্রুর মধ্যস্থলেও তাঁহাকে সংহার করিতে পারি।" বিজয়সিংহ স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর সেই সৈনিকদ্বয় মোদকের বেশ ধরিয়া কল্পিত গণ্ডগোল আরম্ভ করিল এবং বিবাদ করিতে করিতে আপ্পা-সিন্ধিয়ার স্কন্ধাবারের নিকট উপস্থিত হইল। মহারাষ্ট্রীয়বীর তখন পটগৃহের বহির্ভাগে স্নান করিতেছিলেন। সৈনিকদ্বয় ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল; যত নিকটবর্ত্তী হইল, ততই তাহাদের বিবাদ বাড়িয়া উঠিল। স্নান করিতে করিতে সিন্ধিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তাহারা এক বাণ্ডিল হিসাবের কাগজ তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনি আমাদের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিউন।" বলিতে বলিতে তাহারা ক্রমে ক্রমে সিন্ধিয়ার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইল এবং আপ্পা যেমন সেই কাগজ তুলিয়া লইতে যাইবেন, অমনি রাজপুতসৈনিক তাঁহার হৃদয়ের দক্ষিণপার্শ্বে ছুরিকাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই আঘাত নাগোরের জন্য।" পরক্ষণেই সেই আফগানসৈনিক হৃদয়ের বামভাগে তীক্ষ্ণছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়া সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই আঘাত নাগোরের জন্য।" শিবিরমধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা হাহাকাররবে চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবিত হইয়া সেই মুসলমানঘাতককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; কিন্তু সুচতুর রাজপুতসৈনিক "চোর চোর" রবে চীৎকারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দলবলের মধ্যে মিশিয়া গেল। এবং একটি বিশাল পয়ঃপ্রণালীর ভিতর দিয়া একেবারে নাগোরে উপস্থিত হইল। বিজয়সিংহ তাহাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর সেই রাজপুতের মুখদর্শন করেন নাই।

ক্রমাগত দ্বাদশমাস ধরিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ দুর্গ অধিকার করিয়া রহিল বটে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবরোধযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পারদর্শী নহে। এতদিন তাহারা একপ্রকার নিস্তেজভাবে দিনপাত করিতেছিল, কিন্তু সিন্ধিয়ার অন্যায় হত্যাতে তাহাদিগের হৃদয় রোষে ও জিঘাংসায় শতগুণে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন সেই রোষান্ধ মহারাষ্ট্রীয়দল সিন্ধিয়াহত্যার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আবার নবীন উদ্যমে মহারাষ্ট্রীয়দল সুসজ্জিত হইতে লাগিল; তাহাদের রোষাগ্নি হইতে কে নাগোরকে রক্ষা করিবে? বিজয়সিংহের কর্ণে সকল সংবাদ পৌঁছিল; আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সন্ধিস্থাপনের আয়োজন হইল; বিজয়সিংহ অজমীর উৎসর্গ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট ত্রৈবার্ষিক করদানের সহিত সিন্ধিয়ার হত্যাজনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিলেন। ইহাই রাজপুতের "মুণ্ডকাটী।" এই মুণ্ডকাটীতে মহারাষ্ট্রীয়দল প্রীত হইয়া রামসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিল। পরিত্যক্ত রামসিংহের সৌভাগ্যসূর্য্য আবার অস্তগমন করিল।

বিজয়সিংহ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্তু রাজস্থানের হৃদয়ে যে একটি প্রচণ্ড বিষবৃক্ষ রোপিত হইল, তাহা তিনি তখন অনুধাবন করিলেন না। মহারাজ অজিতের অন্যায় হত্যা হইতে ক্রমাগত শতবর্ষ ধরিয়া যে মারবার অসংখ্য উপদ্রব ও অসীম শোণিতপাত সহ্য করিয়াও ধীরে

ধীরে উন্নতিলাভের চেষ্টা করিতেছিল, অজমীরত্যাগের সহিত সে উন্নতির আশা অতল নিখাতে নিমগ্ন হইল।

সিন্ধিয়া-হত্যার পর হইতেই মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজপুতগণের প্রতি অত্যন্ত সন্দিহান হইল; যে কোন রাজপুত তাহাদের নেত্রপথে পতিত হয়, তাহাকেই তাহারা আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে মিবারের রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ সন্ধিবন্ধনার্থ স্বরাজ্যের প্রধান সর্দ্দার কবীরসিংহকে মহারাষ্ট্রীয়-শিবিরে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনিও দুর্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। কবীর একজন বিখ্যাত রাজপুত-সর্দ্দার। তাঁহা দ্বারা রাজপুতসমাজের যে সকল মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। তিনি মধুসিংহ ও ঈশ্বর সিংহের মধ্যে বিবাদভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধিয়া নগর হইতে যাহাতে সেনাদল উঠাইয়া লন, তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিবার জন্যই তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সর্দ্দারসিংহ সেই সময়ে সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন; তিনি স্বীয় কৌশলের সাফল্য দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অভিনন্দন প্রকাশ করিবার জন্য আপ্পার সমীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়দল তাঁহাকেও আক্রমণ করিল; কিন্তু সিন্ধিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়া নিজ সেনাপতিগণের প্রতি অনুজ্ঞা করিলেন, সর্দ্দারের পিতৃরাজ্য তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিবে।" তোষসর নামক স্থলে সিন্ধিয়ার দেহসংকার হইল এবং তাঁহার ভস্মরাশির উপর একটি চৈত্য-মন্দির নির্ম্মিত হইল, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণের মতে সেই চৈত্য পরম পবিত্র।

মহারাষ্ট্রীয়গণ রামসিংহকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রামের আশাভরসা সকলই ফুরাইল। পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য তিনি দ্বাবিংশতিবার রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। হতভাগ্য রামসিংহের মনোবেদনার অবধি রহিল না। নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া তিনি পরিশেষে জয়পুরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানেই ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামসিংহের দেহ বিলক্ষণ সবল ও দীর্ঘ ছিল। যে ঔদ্ধত্যনিবন্ধন শৈশবে তিনি অনেকের ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়াতে তাহা অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে তিনি এতদূর দয়ালু, প্রশান্তপ্রকৃতি ও শিষ্টাচারী হইয়াছিলেন যে, রাঠোরগণ তাঁহার যৌবনের সমস্ত দুর্ব্ব্যবহারই বিস্মৃত হইয়াছিল। তাঁহার বিচারক্ষমতা সর্ব্বজনপ্রশংসিত। এই সকল সদ্গুণের সাহায্যে তিনি মনোরথ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেন; কিন্তু তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্ততাই তাঁহার কাল হইয়াছিল। ঔদ্ধত্য বিস্মৃত হইয়াও তিনি সেই প্রচণ্ড প্রবৃত্তি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহাকে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতে হইয়াছিল, পরিশেষে নির্ব্বাসনক্লেশে দিনপাত করিতে হইল। অনেকগুলি রাঠোর-সর্দ্দার সম্পদে বিপদে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই; ইঁহাদের মধ্যে মৈরতীয় সর্দ্দার সেরসিংহ ও সর্দ্দার রূপসিংহ প্রধান। পণ্ডাবৎকুলে রূপসিংহের জন্ম। যখন প্রায় সমস্ত সর্দ্দার বিজয়সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল, রূপসিংহ তখন প্রাণান্তেও রামসিংহের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। বিজয়সিংহ তাঁহার কিলোডী দুর্গ অবরোধ করিলেন। বহুদিনব্যাপী অবরোধে দুর্গের খাদ্যদ্রব্যাদি নিঃশেষ হইল; তথাপি মহাতেজা রাজভক্ত রূপসিংহ বিজয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হইলে তিনি দুর্গস্থ উষ্ট্রগুলিকে বধ করিয়া নিজ সামন্তগণ সহ তন্মাংস ভক্ষণ করিলেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না।

রামসিংহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অন্তঃসারহীন হইয়াও যে মারবার এক

প্রকার দাঁড়াইয়াছিল, আজি দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয়গণের রাক্ষসিক প্রপীড়নে তাহার শোচনীয় অধঃপতন ঘটিল; সমগ্র রাজ্য যেন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। নগর, গ্রাম ও পল্লী অরাজক হইয়া উঠিল। কৃষকমণ্ডলী হলগোধন বিক্রয় করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিল, বণিকের অভাবে বিপণিদ্বার অবরুদ্ধ হইল। সেই শ্মশানসদৃশ ক্ষেত্রের বীভৎসভাব শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়েরা সদর্পে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কে তাহাদের গতিরোধে অগ্রসর হইবে? বিজয়সিংহ বালক—অদূরদর্শী। রাঠোরকুলের কোষাগারে যে ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল, অন্তর্বিগ্রহের সময় সমস্তই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। বিজয়সিংহ নিঃসম্বল। দুঃখের বিষয়, সেই সময়ে সর্দ্দারগণও তাঁহার মুখ চাহিলেন না; একবার মারবারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। স্বার্থপরতার কুহকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা রাজ্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সরকারী ডাক পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া পড়িল।

রাজবারার মধ্যে মারবারের সামন্তসমিতি যেরূপ ক্ষমতা পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, অন্যান্য প্রদেশের সামন্তগণ সেরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যে দিন শিবজী মরুস্থলীতে উপবিষ্ট হন, সেই দিন রাঠোর-সর্দ্দারগণ এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে সেই ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিলেন, কাজেই রাজ্যের মহা অনিষ্ট ঘটিল। দত্তকবিধানই এই অনিষ্টের কারণ।

মহাসিংহ নামক সর্দ্দার মারবারের অন্তর্গত পোকর্ণ-জনপদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চম্পাবতের অন্যতম শাখাকুলে তাঁহার জন্ম। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বংশলোপের ভয়ে চরমসময়ে তিনি সহধর্ম্মিণীকে এই আদেশ করিয়া যান যে, ইচ্ছা করিলে তিনি বংশরক্ষার্থ একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। পতির আজ্ঞানুসারে সর্দ্দারপত্নী মহারাজ অজিতের অন্যতম পুত্র দেবীসিংহকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই সূত্রেই মারবারে যে মহাবিপ্লব সমুত্থিত হয়, তাহা সহজে প্রশমিত হয় নাই। দেবীসিংহ নিজ জন্মস্বত্ব ত্যাগ করিলেন; যেদিন মহাসিংহের উষ্ণীষ তাঁহার শিরোপরি বিরাজিত হইল, সেই দিন হইতে তিনি আর প্রকাশ্যে অজিতের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেই দিন হইতেই পালকপিতা ব্যতীত জন্মদাতা পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তাহার উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই, যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আপনাকে মহারাজ অজিতসিংহের পুত্র বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং কিরূপে জন্মদাতা পিতার সিংহাসন হস্তগত করিবেন নিরন্তর তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। অগ্রজ অভয় ও ভক্তসিংহের সেই পাশব পাপানুষ্ঠানের বিষয় যখন তাঁহার স্মরণ হইত, তখনই তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিত; তখন কে যেন তাঁহার কানে বলিত, "অভয়সিংহ পিতৃঘাতী, ভক্তও সেই পাপের অংশভাগী। তুমি নিষ্পাপ, অতএব তুমি মহারাজ, যোধপুরের পবিত্র সিংহাসনের যোগ্য পাত্র।" যে সময়ে অভয়সিংহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া রাজ্যে বিষম অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল, তখনও দেবীসিংহের হৃদয় হইতে সে আশা বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু সে আশা কে পূরণ করিবে? রাজপুতদত্তক-প্রণালীর এমনই বিধি যে, দেবীসিংহ একজন সামন্ত কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়াতে সমস্ত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা আনন্দসিংহ ইদরের অধিপতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হন নাই।

অজিতসিংহের চতুর্দ্দশ পুত্রের মধ্যে পাঁচজনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই পাঁচজন যথাক্রমে অভয়সিংহ, ভক্তসিংহ, আনন্দসিংহ, রাস ও দেবীসিংহ নামে অভিহিত। ইঁহাদের মধ্যে ইদররাজকুলে আনন্দসিংহ, মালবার অন্তর্গত জাবোয়ার অধিপতি কর্ত্তৃক রাস এবং পোকর্ণ-সর্দ্দার কর্ত্তৃক

দেবীসিংহ দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। অভয়সিংহের পুত্র রামসিংহ এবং ভক্তসিংহের পুত্র বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহের সাত পুত্র;—ফতেসিংহ, জালিমসিংহ, শাবন্তসিংহ, সেরসিংহ, ভুমসিংহ, গোমানসিংহ ও সর্দ্দারসিংহ। ফতেসিংহ শৈশবেই প্রাণত্যাগ করেন। জালিমসিংহই বিজয়সিংহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। শাবন্তসিংহের পুত্র শূরসিংহ। সেরসিংহ নিঃসন্তান ছিলেন। লালসিংহকে তিনি দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ভুমসিংহের পুত্র ভীমসিংহ এবং ভীমের পুত্রই অপনৃপতি ধনকুলসিংহ, গোমানসিংহের পুত্র মানসিংহ। সর্দ্দারসিংহ ভীমের হস্তে নিহত হন।

দেবীসিংহ উত্তরাধিকারস্বত্ব হারাইলেন; কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে যে অন্য কোন ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন অধিকার করিবেন, তাহা তাঁহার প্রাণে অসহ্য। তিনি যে বংশে গৃহীত হইয়াছেন, সেই বংশের বীরগণ জন্মভূমি ও স্বদেশীয় নৃপতির উপর আপনাদের ক্ষমতাপরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, আজি তিনি সেই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বীয় অভীষ্টসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন এবং চম্পাবৎ-গোত্রের অপরাপর শাখাকুলের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অপর অপর সিংহাসনার্থীদিগের পথে প্রতিরোধ স্থাপন করিতে সমুদ্যত হইলেন। দেবীসিংহের নিতান্ত ইচ্ছা, নৃপতি তাঁহার সম্পূর্ণ হস্তগত থাকেন। এই ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্য তিনি দলবলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই দুই ভাগই নৃপতির শরীররক্ষকস্বরূপ নিয়োজিত হইল। তন্মধ্যে একভাগ দুর্গমধ্যে এবং দ্বিতীয়ভাগ নিম্নে নগরমধ্যে অবস্থিত রহিল। বিজয়সিংহ প্রথমতঃ দেবীসিংহের গূঢ় অভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা এবং সর্দ্দারবৃন্দের দুর্ব্ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া তিনি যখন পোকর্ণ-সর্দ্দারের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনই সেই কুচক্রী দেবীসিংহ তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে বলিয়াছেন, "মারবারের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে না, বৃথা চিন্তা করিয়া কেন আপনি কষ্ট ভোগ করেন? মারবার আমার তরবারির অগ্রেই রহিয়াছে।" এই কথায় বিজয়সিংহের হৃদয় আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িত। তিনি নিভৃতে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেন এবং ধাই ভাই জগধরের নিকট আপন মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া সেই দুর্ভর দুঃখের লাঘব করিতেন। জগ যেমন চতুর, সেইরূপ একজন বহুদর্শী ব্যক্তি। পোকর্ণ-সর্দ্দারের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহা বিফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌশলক্রমে দেবীসিংহের প্রসাদলাভ করিয়া তিনি তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কতকগুলি সৈন্ধবীসৈন্যকে নগররক্ষকরূপে নিয়োজিত করিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিল না। তিনি শুদ্ধ সৈন্যনিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের ভরণপোষণ চলে, তদুপযোগী বৃত্তিও স্থির করিয়া লইলেন। মারবারের বেতনভোগী সৈন্যের প্রচলন ইহাই প্রথম। ইহারা সকলেই পদাতিক, পাশ্চাত্য যুদ্ধকৌশলে বিলক্ষণ পারদর্শী। সৈন্ধবী, পূরবীয়, রাজপুত, আরব অথবা রোহিলগণ এই বেতনভোগী সেনার পুষ্টিবিধান করিত। ইহারা পদাতিক বটে, কিন্তু ইহাদিগের প্রতি কোনরূপ আজ্ঞাদানে সর্দ্দারদিগের অধিকার ছিল না। রাজা আপন দাওয়ানের দ্বারা ইহাদিগের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিতেন, ইহারা সেই আজ্ঞাই সাদরে পালন করিত। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ও আশুসাধ্য কার্য্যই ইহাদের দ্বারা সাধিত হইত। ক্রমে ইহারা রাজার একান্ত অনুরাগভাজন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সর্দ্দারগণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল; তাহারা দেখিল যে, রাজা ও তাহাদিগের মধ্যে একটি বিশাল প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। তখন তাহাদের হৃদয় ঈর্ষায় অধীর হইয়া পড়িল। যাহাতে সেই পদাতি-সেনাদলের সমূল উচ্ছেদসাধন হয়, তাহারা তখন সেই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

চতুরচূড়ামণি জগ এই প্রকারে সপ্তশত বেতনভোগী সৈন্যসংগ্রহ করিলেন; তাহাদের

ভরণপোষণার্থ বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্রমে ক্রমে তাহারা দুর্গদ্বারে প্রহরিরূপে নিয়োজিত হইল। রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। এখন তিনি রাজ্যের শান্তিস্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থ জগ ও দাওয়ান ফতেচাঁদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিঃসম্বল, উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী ব্যয়নির্ব্বাহ করেন, সে ক্ষমতা নাই। এরূপ সঙ্কটকালে ধাইভাই তদীয় মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চাশ সহস্র টাকা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার জননী বিজয়সিংহের ধাত্রী। বিজয়সিংহের জন্মকালে তিনি ঐ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি পুত্রকে টাকা দিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু যখন জগ বলিলেন, "না দিলে আমি তোমার সম্মুখেই আত্মহত্যা করিব," তখন অগত্যা সেই টাকা বাহির করিয়া দিতে হইল। জগ বিজয়সিংহকে সেই অর্থ উপহার দিলেন। রাজার আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি প্রিয়তম ধাইভাইকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। অতঃপর পার্ব্বত্যগণকে দমন করিবার ব্যপদেশে তিনি আপন অশ্বারোহী সেনাগণকে নাগোরে প্রেরণ করিলেন এবং বাহনোপযোগী অশ্ব না থাকাতে সেই সমস্ত সৈনিককে শকটে করিয়া লইয়া গেলেন। যথাসময়ে সকলে তথায় উপস্থিত হইল। নগর প্রাকার হইতে কামানগুলি নিম্নে অবতারিত হইল। আশু একটি সুসজ্জিত সেনাদল রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্যদিগের প্রতিকূলে যাত্রা করিল এবং সামান্য যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু একবারে নগরে উপস্থিত না হইয়া বিজয়ী সৈন্যদল পথিমধ্যে শীলবকরি নামক দুর্গ আক্রমণ করিল। সেই দিন রাঠোরসর্দ্দারেরা রাজ-অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং রাজধানীর দশক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী বীরশীলপুর নগরে সকলে সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সর্দ্দারগণ সমবেত হইয়া বিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন, রাজা বিজয়সিংহ ইহা বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত শঙ্কিত হইলেন এবং সেই বিদ্রোহদমনার্থ ধীচিবংশীয় গরধন নামক রাজপুতের সাহায্য-প্রার্থনা করিলেন। গরধন একজন বিশ্বস্ত ও অসীমসাহসী বীরপুরুষ। তাঁহার রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া রাজা ভক্তসিংহ মৃত্যুকালে বিজয়ের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া যান। রাজাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া গরধন তাঁহাকে সাহস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! চিন্তা নাই, সর্দ্দারদিগের সম্মানের প্রতি বিশ্বাস রাখিবেন। আপনি একাকী অরক্ষিতভাবে তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া যুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে প্রয়াস পাইবেন; তাহারা আপনাকে কিছুই বলিবে না; আমি অগ্রে গিয়া আপনার অভ্যর্থনাযোগ্য আয়োজন করি।" পরদিন প্রভাতে গরধন সর্দ্দারবৃন্দের শিবিরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সর্দ্দারগণ! আপনাদের রাজভক্তির উপর রাজার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি শীঘ্রই আপনাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন; তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন করুন।" কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না;—কেহই কোন উত্তরও দিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে মিনতি করিলেন, মধুরবাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। দেখিতে দেখিতে বিজয়সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সর্দ্দারদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখিল না। গরধন আর তাহাদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজার সহিত আহোব-সর্দ্দারের পটগৃহে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সমস্ত সর্দ্দারই সেই স্থানে সমবেত হইলেন। সকলেরই বদনমণ্ডল গম্ভীর, সকলেরই দৃষ্টি ভূমিলগ্ন—সকলেই নীরব। ক্ষণকাল পরে মৌনভঙ্গ করিয়া রাজা চম্পাবৎ-সর্দ্দারকে সম্বোধনপূর্ব্বক করুণস্বরে কহিলেন, "সর্দ্দারচূড়ামণি! আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন কেন?"

আহোব-পতি উত্তর করিলেন, "রাজন্! আমাদের একটিমাত্র মস্তক; যদি আর একটি থাকিত, তাহা হইলে ইহা আপনার জন্ম উৎসর্গ করিতে পারিতাম।" রাজা অনেক তর্ক-বিতর্ক করিলেন; কিন্তু কিছুতেই সর্দ্দারগণের তুষ্টিসাধন করিতে পারিলেন না; অবশেষে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, কি করিলে আপনারা সন্তোষলাভ করেন? কি হইলে আমার পক্ষে যোগদান করিতে পারেন?" তখন তাঁহারা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; ধাই-ভাইয়ের সেনাদল ভাঙ্গিতে হইবে, পাট্টাবহিগুলি তাঁহাদের (সর্দ্দারগণের) হস্তে অর্পণ করিতে হইবে এবং রাজসভার অধিবেশন দুর্গমধ্যে না হইয়া নগরে হইবে।" এই তিনটি প্রস্তাবে যদি রাজার অভিমত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে তৎপক্ষে যোগদান করিতে পারেন, নচেৎ অন্তর্বিপ্লবাগ্নি আবার মহাবেগে জ্বলিয়া উঠিবে। প্রথম প্রস্তাবটি অবশ্য-পালনীয় স্থির হওয়াতে আশু পালিত হইল। শেষোক্ত প্রস্তাবটিও নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিষয় ভাবিয়া রাজা একান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। রাজ্যের একটি প্রধানতম স্বত্ব কিরূপে তিনি পরিত্যাগ করিবেন? যাহা হউক, অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সর্দ্দারদিগের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। আশু সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সর্দ্দারবৃন্দ সভাভঙ্গ করিয়া আপন আপন অভীষ্টস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, অনেকে স্ব স্ব ভূমিবৃত্তিতে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে চম্পাবৎগণ রাজার উপর আপনাদের পূর্ব্বক্ষমতা পরিচালন করিবার অভিপ্রায়ে তৎসহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন।

অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনে মারবারে যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, বিজয়সিংহের গুরু আত্মারাম সেই সময় কঠোররোগে আক্রান্ত হন। রোগের কবল হইতে গুরুর জীবনরক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া বিজয় সর্ব্বদাই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিতেন। একে রাজ্যে নানারূপ বিপদ্, তাহাতে আবার গুরুনাশ, বিজয়সিংহ আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মুমূর্ষু আত্মারামের সম্মুখে সর্ব্বদাই দুঃখপ্রকাশ করিতেন; কিন্তু গুরুদেব তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে বলিতেন, "মহারাজ! চিন্তা নাই, আমি তোমার সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা ও আধিব্যাধি লইয়া ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিব।"

অল্পদিনের মধ্যে গুরুদেব ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা বিজয়সিংহ তাঁহার জন্য কল্পিত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহার অন্তরের কপটতা প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, গুরুর অন্ত্যেষ্টিবিধান দুর্গের অভ্যন্তরেই সংসাধিত হইবে। অতএব সর্দ্দার ও সামন্তবর্গ যেন কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন। এই আদেশ-প্রচারের মধ্যে যে একটি কুটিল ভাব নিহিত ছিল, তাহা তখন কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। এ দিকে রাজমহিষীরা আপনাদের কুলগুরুকে অন্ত্যেষ্টি পূজা করিবার ব্যপদেশে রক্ষক ও সৈনিকগণকে লইয়া দুর্গপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। পবিত্র অন্ত্যেষ্টিবিধানের সময়ে কাহারও অন্তঃকরণে সন্দেহ থাকা অসম্ভব। এমন কি, সন্দেহের প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও রাজপুতগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। রাজগুরু-শেষ সংস্কারে সম্মিলিত হইবার জন্য সর্দ্দারগণ সকলে একত্র যোধগড়ে আরোহণ করিলেন এবং গিরি-কুক্ষ কুণ্ডলিত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর উঠিবামাত্র দেবীসিংহের হৃদয় সহসা উদ্বিগ্ন ও শিহরিত হইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ জনৈক সার্দ্দরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আজিকার দিন বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" কিন্তু সেই ব্যক্তি তাঁহার তোষামোদ করিয়া কহিল, "আপনি মারবারের স্তম্ভস্বরূপ। আপনার প্রতি কুটিল চক্ষে দৃষ্টিপাত করে, কাহার সাধ্য?" অনেকগুলি দ্বার ও প্রাঙ্গণ অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহারা নাগরা-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই দ্বারের শিরোদেশে একটি বড় নাগরা স্থাপিত থাকে। ইহা বাদিত

হইলেই সর্দ্দারগণ বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদিগকে রাজদরবারে আহ্বান করা হইতেছে। এই বাদ্যভাণ্ড তাড়িত হইয়া যখন প্রচণ্ড-নির্ঘোষে গর্জ্জন করিয়া উঠে, তখন সর্দ্দারগণ যে যেখানে থাকুন না, শীঘ্রই তাঁহাদিগকে রাজসমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। আহোর-সর্দ্দার সেই দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ। অমনি "বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং অসি নিকোষিত করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকে নিহত হইল; কিন্তু তাঁহার দলবল শেষে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; ধাই-ভাইয়ের হস্তে তাহারা বন্দী হইল। সর্দ্দারদিগকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া ধাই-ভাই উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সর্দ্দারগণ! বৃথা চেষ্টা, আজি তোমাদের পরমায়ু ফুরাইয়াছে।" এই কঠোরবাক্য শুনিয়া সর্দ্দারগণ উন্মত্তস্বরে বলিল, "মরিতে আমরা ভয় করি না; কিন্তু তোমার নিকট আমাদের শেষ অনুরোধ যে, নিকৃষ্ট সৈন্ধবীগণের গুলীতে যেন আমাদের প্রাণসংহার না হয়; আমরা রাজপুত, অসি ভিন্ন অপর অস্ত্রে মরিলে আমাদের আত্মার সদ্গতি হইবে না।" তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল কি না, ভট্টগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, একে একে সকল সর্দ্দারই রাজদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় সকলেই ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন।

দেবীসিংহের মৃত্যুসম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর গল্প প্রচলিত আছে। তিনি মহারাজ অজিতসিংহের ঔরসজাত পুত্র, এই জন্য তাঁহার শোণিতপাত করিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। একপাত্র অহিফেন দ্রব সেবন করাইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করা হইবে, এইরূপ আদেশ হইল। দেবীসিংহ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া নিজ মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সেই অহিফেনপাত্র তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। সেই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্রও উপস্থিত। দণ্ডাজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া দেবীসিংহের হৃদয় মথিত হইল;—নয়নদ্বয় হইতে অনল বহ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। মৃন্ময় অহিফেনপাত্র পদাঘাতে সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ডস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি! দেবীসিংহ একটা মৃৎপাত্রে অহিফেন সেবন করিবে? স্বর্ণপাত্র লইয়া আইস, এখনই সাদরে গ্রহণ করিব।" তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না, বরং একজন নিষ্ঠুর শ্লেষসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে অসিকোষের ভিতর মারবারের ভাগ্য ধৃত, এখন তাহা কোথায়?" দেবীসিংহ সদর্পে উত্তর করিলেন, "পোকর্ণে সুবলের কটিবন্ধে।" দেবীসিংহ ক্ষণকাল নীরব, কেহই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিল না; কেহই স্বর্ণপাত্রে অহিফেন আনয়ন করিল না, তখন তিনি প্রচণ্ডবেগে ভিত্তিগাত্রে আপন মস্তক আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সেই বীভৎস প্রাণোৎসর্গ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

দেবীসিংহের পুত্র সুবলসিংহ। পিতার বীভৎস আত্মত্যাগের সংবাদ পোকর্ণে সুবলসিংহের কর্ণগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ যুবাবীর রোষপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। প্রতিশোধ-পিপাসায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। বিজয়সিংহের শোণিতে সেই প্রচণ্ড প্রতিশোধতৃষ্ণা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে অবিলম্বে তিনি সসৈন্যে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। গমনকালে তিনি পল্লী, নগরী লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। অতঃপর তিনি লুনীতীরবর্ত্তী ভীলবারা অধিকার করিবার ইচ্ছায় তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও ফলবতী হইল না। অধিকন্তু তাঁহার জীবনের সহিত আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল। নগর অবরোধপূর্ব্বক তিনি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, ইত্যবসরে দুইটি অনলন্ত গোলক নগরপ্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল। দেবীসিংহের বংশধর অকালে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

সামন্ততন্ত্র-রাজ্যে রাজা ও সামন্তসমিতির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সপুত্র দেবীসিংহের মৃত্যুর পর আবার মারবারের শস্যক্ষেত্র শস্যরাজির নয়নস্নিগ্ধকর হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইল, বিপণি-সমূহ আবার বিবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত হইল, ভগবতী কমলা মারবারের প্রতি আবার করুণ-কটাক্ষে নেত্রপাত করিলেন। নিজ সর্দারগণকে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া বিজয়সিংহ তাঁহাদিগের সন্তোষসাধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তিনি মরুভূমির দুর্দ্ধর্ষ খোসা ও শাহরেশদিগের প্রতিকূলে স্বীয় বিজয়িনী সেনা চালিত করিলেন; ইহাতে সিন্ধুরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ সংঘটিত হইল। সে বিবাদে বিজয়সিংহেরই জয়লাভ হইল; সিন্ধুকূলবর্ত্তী প্রসিদ্ধ অমরকোট তাঁহার অধিকৃত হইল। অমরকোট জয় করিয়া তিনি যশল্মীর আক্রমণ করিলেন। তৎপ্রদেশের দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তস্থিত অনেকগুলি ভূভাগ তাঁহার অধিকৃত হইল। বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তিনি সমৃদ্ধ গদবাররাজ্য অধিকার করিতে উৎসুক হইলেন। তৎকালে শিশোদীয়নৃপতির হস্তে গদবারের শাসনদণ্ড সমর্পিত ছিল; জিগীষু বিজয়সিংহ কৌশলক্রমে তাহাও অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে স্বরাজ্যের উন্নতির একটি প্রধান অবলম্বন প্রাপ্ত হইলেন। যোধপুর স্থাপিত হইবার অনেক পূর্ব্বে গিহ্লোটরাজ রাহপ সম্মানসূচক "রাণা" উপাধির সহিত উক্ত গদবার জনপদ মুন্দরের পুরীহররাজের নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে ক্রমাগত পঞ্চশত বৎসর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু রাণা অমরসিংহ ভীষণ অন্তর্ব্বিবাদে বিজড়িত হইয়া ভ্রমবশতঃ রাঠোরপতি বিজয়সিংহের করে তাহা সমর্পণ করিলেন। এই প্রকারেই গদবাররাজ্য বিজয়সিংহের হস্তগত হয়।

জয় আপ্পার মৃত্যুর পর মাধাজী মহারাষ্ট্রীয়সেনার অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহার ন্যায় চতুর ও রাজনীতিবিশারদ মহারাষ্ট্রীয়মধ্যে অতি বিরল। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি একবার মহারাষ্ট্রীয়কুলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা কোনরূপেই রাজপুত-তুরঙ্গসেনার সমকক্ষ নহে; সুতরাং যাহাতে রাজপুতদিগের উপর সহজে জয়লাভ করা যায়, এরূপ একটি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, যে সকল ইউরোপীয় তৎকালে ভারতভূমে আপতিত হইয়া লুণ্ঠন ও উৎসাদনের পাপমন্ত্রে স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তিবিধান করিতেছে, যদিও তাহাদের রণকৌশল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঘৃণ্য, তথাপি তাহাদিগের রণকৌশল অবলম্বন করিতে পারিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাই অবলম্বন করিলেন। সেই কুটিল রণকৌশল অবলম্বন করিয়া রাজপুতের উপর তিনি জয়লাভে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, রাজপুতানার প্রধান প্রধান নৃপতিগণের মধ্যে পরস্পরের একতা ও সৌহার্দ্দ নাই; এই সময় তাঁহাদিগের উপর আপতিত হইতে পারিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা। এই বিবেচনায় তিনি একটি বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া জয়পুররাজ্যে আপতিত হইলেন। সিংহাসন লইয়া মধুসিংহ ও ঈশ্বরসিংহের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে অম্বরের আভ্যন্তরীণ বল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। মধুসিংহের মৃত্যুর পর প্রতাপসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন; রাজ্যের বিগত অন্তর্বিপ্লব-সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা তন্মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া যে অনর্থের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল; কিন্তু প্রতাপসিংহ তাহা বুঝিয়াছিলেন। এখন মাধাজী সিন্ধিয়ার রণসজ্জার বিবরণ শুনিয়া মনে করিলেন যে, এ সময়ে একতাবন্ধন বিশেষ আবশ্যক; নচেৎ ধূমকেতুস্বরূপ প্রবল শত্রুর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। মনে মনে এইরূপ

স্থির করিয়া কুশাবহপতি প্রতাপসিংহ রাঠোররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। উদারমতি বিজয়সিংহ তাঁহার অনুরোধ তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য করিলেন। অম্বরপতি অক্ষয়সিংহ তাঁহার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন; অম্বরকে স্বরাজ্যনির্বিশেষে রক্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। তিনি অবিলম্বে স্বীয় সেনাদল লইয়া প্রতাপের সহিত যোগদান করিলেন। আবার রাঠোর ও কুশাবহ একত্র সম্মিলিত হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে ভট্টকবি একটি সংগীত রচনা করিয়াছিলেন—

"পত রেখো প্রতাপক কা
ন কোটি কা নাথ,
আগলা গুণা বকস দিয়া
আব্ কি পাক্ড়ো হাত।"

অর্থাৎ কোটি রাজকর্তৃক প্রতাপের সম্মান রক্ষিত হইল। তিনি তৎকৃত পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তদীয় হস্তধারণপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন।

বীর রিয়াপতি রাজপুতসেনানীপদে বরিত হইলেন। টঙ্গা নামক সিন্ধিয়ার সৈন্যকটকের সম্মুখে রাজপুতবল উপস্থিত হইল। ইস্মায়েল বেগ ও হামদানী নামক প্রসিদ্ধ মোগলসেনাপতি-দ্বয়ও রাজপুতদিগের সহিত যোগদান করিলেন। এ দিকে সিন্ধিয়ার সেনাচালনভার প্রসিদ্ধ ফরাসী বীর দী-বইনের হস্তে অর্পিত হইল। দী-বইন সদলে সমবেত রাজপুতবলের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। রিয়াপতি সর্দ্দার যুবনসিংহ স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যগণকে একটি নিবিড় ব্যূহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া দী-বইনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধিয়ার সৈনিকগণ যুবনসিংহের তরবারিমুখে পতিত হইয়া রণভূমে শয়ন করিতে লাগিল। রাঠোরবীরগণ ক্রমে মহাবিক্রমে বিপক্ষসেনার কামানশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে দলিত ও মথিত করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের প্রচণ্ড তেজের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। আজি সুশিক্ষিত যুনানীবীরের রণকৌশল রাজপুতের নিকট পরাহত হইল। লজ্জা ও মনোবেদনায় ম্লানমুখে মাধাজী রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মথুরানগরীতে প্রস্থান করিলেন। এই সুযোগে অজমীর উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে বিজয়সিংহ আপনার ধাইভাইকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও সুসিদ্ধ হইল। দুর্গশিরে রাঠোরের পঞ্চরঙ্গিণী বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া মহাপ্রতাপ বিজয়সিংহের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। তিন বৎসরের মধ্যে মাধাজী সিন্ধিয়া আর একবারও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহস করিলেন না।

তিন বৎসর অতীত হইল। চতুর্থ বর্ষেরও প্রায় অর্দ্ধ অতীত। মাধাজী সিন্ধিয়া টঙ্গাযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, আজি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি একটি বিশাল বাহিনী লইয়া রাজপুতদিগের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। এরূপ বিশাল সৈন্যকটক লইয়া কেহই ইতিপূর্ব্বে রাজবারা আক্রমণ করেন নাই। সিন্ধিয়ার ভয়াবহ রণসজ্জার সংবাদ পাইয়া রাঠোরগণ মহাতেজে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য জয়পুরের উত্তরসীমায় যাত্রা করিলেন। এ দিকে কুশাবহ-সেনা তাঁহাদের সহিত যোগদানার্থ নগর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইল। পত্তন (তুয়ারবতী) নামক নগরে রাঠোর ও কচ্ছাবহসেনা সমবেত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সম্মুখীন হইল। এই প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় একীভূত রাজপুতবৃন্দকে উৎসাহিত করিবার জন্য রাঠোর-ভট্টগণ যে সমস্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আজিও মারবারে তাহা শ্রুতিগোচর হয়। তন্মধ্যে

একটি শ্লোক হইতে রাঠোর ও কচ্ছাবহকুলের পরাজয় হইল এবং সেই সঙ্গে রাজবারাভূমির সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইলেন। সেই কবিতা এই ;—

"উতুল তিন অম্বরকা রাখে রাঠোরান্।"

রাঠোরগণ অঙ্গরাখা হইয়া অম্বরের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন। পত্তনসমরে রাজপুতবৃন্দ জয়ী হইলে একজন চারণ রাঠোরের গৌরবকীর্ত্তন করিয়া এই শ্লোকার্দ্ধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বীরবিক্রমে ও রণকৌশলে কুশাবহগণ আপনাদিগকে রাঠোরগণের সমকক্ষ বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করে। কিন্তু এই শ্লোকার্দ্ধে তাহাদের সে দম্ভ অধঃকৃত হইয়াছে। পত্তনরঙ্গভূমি হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ লজ্জাবনতবদনে প্রস্থান করিলে সেই যুবা চারণকবি এই শ্লোক গান করিল, তচ্ছ্রবণে কুশাবহসৈন্যগণ অপ্রতিভ হইল। রাঠোরেরা যে তাহাদিগের উপর অধিকতর যশস্বী হইবে, তাহা তাহাদিগের সহ্য হইবে না। তদবধি রাঠোরগণ কুশাবহগণের চক্ষুঃশূল হইল, সেই দিন হইতে অম্বর মারবারের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। কিন্তু সেই দিন রাজপুত-জাতির যে অধঃপতন হইল, সে অধঃপতন হইতে আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না। এ দিকে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়বৃন্দের সৌভাগ্যের পথও ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া আসিল।

রাঠোরগণের সহিত যখন কুশাবহগণ পত্তনক্ষেত্রে সম্মিলিত হয়, তখন তাহাদের মনে মনে তদ্রূপ দুরভিসন্ধি ছিল কি না, ভট্টগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাহারা প্রথমতঃ মহোৎসাহের সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, কিন্তু সংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধিবন্ধনে সংবদ্ধ হইল। সন্ধিতে স্থির হইল যে, কুশাবহসেনা সংগ্রামের সময় কার্য্যক্ষেত্র হইতে অন্তরে অবস্থিতি করিবে। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিল, "আমরা জয়লাভ করিতে পারিলে জয়পুরের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করিব না।" দুঃখের বিষয়, রাঠোরবীরগণ এই ষড়্যন্ত্রের বিষয় বিন্দুমাত্রও জানিতে পারেন নাই। জয়পুরাধীশ্বরের সরল মৈত্রী ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা মহাবিক্রমে রণভূমে অবতীর্ণ হইলেন এবং দী-বইনের সেনাকটক দলিত ও মথিত করিতে করিতে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অসি-প্রহারে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় সেনা রণভূমে শয়ন করিল; দী-বইনের অমোঘ আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে রাঠোরগণের মহাবীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল। অজস্র গোলাঘাতে রাঠোরবাহিনী একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই বিষম সঙ্কটকালে মারবারের সর্দ্দারেরা কুশাবহসেনার আনুকূল্য প্রত্যাশায় পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন ;—কিন্তু তাঁহাদের কেহ দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন না। বিষম ক্রোধ ও ঘৃণায় সর্দ্দারগণের হৃদয় আলোড়িত হইল। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কুশাবহগণ কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। জয়লাভের আশা নাই দেখিয়া রাঠোর-বীরগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহাদের মর্ম্মবেদনার আর সীমা রহিল না। তাঁহারা যখন পলায়ন করেন, তখন কচ্ছবাহগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুশাবহ ভট্টকবি তৎক্ষণাৎ গম্ভীরস্বরে সঙ্গীত ধরিলেন ;—

"ঘোড়া, জোড়া, পাগড়ী,
মোচা, খড়্গ, মারবার,
পাঁচ রেকমে খেলদিয়া
পত্তন মে রাঠোরী।"

অর্থাৎ পত্তনক্ষেত্রে মারবারের রাঠোরেরা অশ্ব, রণসজ্জা, উষ্ণীষ, গুম্ফ ও অসি, এই পঞ্চ দ্রব্য হারাইয়া পলায়ন করিলেন।

পরাজয়সংবাদ পাইয়া বিজয়সিংহ নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। এখন কি কর্ত্তব্য, স্থির করিবার জন্য তিনি একটি সামরিক সভা আহ্বান করিলেন। বিকানীর, কিষণগড় ও রূপনগরের নৃপতিত্রয় এবং সমস্ত রাঠোর সর্দ্দার সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহ সর্ব্বপ্রথম মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "রাঠোরের স্তম্ভস্বরূপ অনেক প্রধান বীর রণভূমে নিপতিত হইয়াছেন, এখন আর কোন্ ভরসায় মহারাষ্ট্রীয়-বাহিনীর সম্মুখীন হইবে? আমার মতে দাক্ষিণীদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে অজমীর অর্পণ করাই শ্রেয়ঃ।" তৎক্ষণাৎ রাঠোরসর্দ্দারগণ উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না, তাহা কখনই হইবে না। জীবন থাকিতে দাক্ষিণী-দস্যুর সহিত সন্ধিবন্ধনে সংবদ্ধ হইব না। আমরা যুদ্ধ করিব।" সর্দ্দারগণের উৎসাহবহ্নি যেন সভাস্থল সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বিজয়সিংহ তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারিল না। আশু মারবারে সর্ব্বত্র এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করা হইল, "যে ব্যক্তি অস্ত্রধারণে সমর্থ, তাঁহাকেই রাঠোরবংশের পঞ্চরঙ্গিণী পতাকামূলে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।" শোণিতসিক্ত মৈরতাভূমির মধ্যভাগে বিশাল রাঠোরবৈজয়ন্তী সমুত্থাপিত হইল। মহা উৎসাহে সমুৎসাহিত হইয়া রণনিপুণ রাঠোরমাত্রেই স্বদেশরক্ষার্থ সেই পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেখিতে দেখিতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের দশম দিবসে ত্রিংশৎসহস্র রাঠোরসৈন্য মৈরতাক্ষেত্রে সম্মিলিত হইল।

মৈরতা পরম পবিত্র। রাঠোরবীরগণের শোণিতে এই ক্ষেত্র কতবার অভিষিঞ্চিত হইয়াছে, রাজার সম্মানগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কত মহাবল শূরবীরগণ অম্লানমুখে এই স্থানে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অসীম বীরত্বের অনন্ত নিদর্শনস্বরূপ অগণ্য চৈত্য আজিও মৈরতাক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে; সম্মুখে সেই সকল চৈত্য দেখিয়া রাঠোরবীরগণ প্রচণ্ড উৎসাহে সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন। সেই গম্ভীরধ্বনি অনন্তগগনে উঠিয়া দুরে দী-বইন ও সিন্ধিয়ার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। ভয়ে তাঁহাদের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য কাঁপিয়া উঠিল, সেই দিন সেই প্রচণ্ড উৎসাহ যদি মুহূর্ত্তে কার্য্যে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয় ও ফরাসী বীরের সমস্ত উদ্যম বিফল হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এক কুলাঙ্গার কৃতঘ্ন স্বদেশের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সেই প্রচণ্ড উৎসাহ বিফল করিয়া দিল। সেই কৃতঘ্ন কুলাঙ্গার কে?—কিষণগড়ের অধিপতি বাহাদুরসিংহ। রূপ-নগরের অধিপতির সহিত সে একত্র দুই শত দশটি নগরের আধিপত্য করিত; তন্মধ্যে একটিও মারবাররাজ্যের বহির্ভূক্ত নহে। অভিষেকসময়ে সেই দুইটি রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা মারবারপতির অনুজ্ঞা গ্রহণ করিত এবং সামন্তপ্রথার অনুসারে অধিকৃত ভূমি ভোগ করিত। পাষণ্ড বাহাদুর সেই সময়ে রূপনগরের অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করে। ইহাতে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলার উদয় হয়। এই বিশৃঙ্খলা-নিবারণের জন্য বিজয়সিংহ রূপনগরে গিয়া পদচ্যুত রাজাকে তাহাতে পুনঃস্থাপন করেন। দুরাচার বাহাদুরের আশা পূর্ণ হইয়াও বিফল হইয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল, অবাধে রূপনগরের শাসনদণ্ড পরিচালন করিবে, কিন্তু রাজা বিজয়সিংহ তাহার সে আশা উন্মূলন করিলেন। পাষণ্ডের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। স্বদেশের মমতা বিস্মৃত হইয়া পরিণামচিন্তা না করিয়াই দুর্ব্বৃত্ত বাহাদুর বিজয়সিংহের আচরণের প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সেই নরাধম অবিলম্বে ফরাসীবীর দী-বইনের নিকট উপস্থিত হইল এবং স্বীয় দুরভিসন্ধি-সাধনের জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। ফরাসীবীর সম্মত হইলেন

এবং অচিরে স্বীয় প্রচণ্ড গোলন্দাজ সেনা লইয়া রূপনগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। একদিনের মধ্যেই রূপনগর তাঁহার অধিকৃত হইল। তিনি বাহাদুরকে তথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় সেনা সহ অজমীরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অজমীর-দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। বিজয়সিংহ নিরুপায় হইয়া দুর্গপতি দমরাজের প্রতি আদেশ পাঠাইলেন, "দুর্গ সমর্পণ কর।" দমরাজ সাহসিক বীর, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে অজমীর অর্পণ করেন; কিন্তু রাজার আজ্ঞা, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেও পারেন না; তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এক দিকে কাপুরুষের ন্যায় আত্মসমর্পণ, অপর দিকে রাজার কঠোর আজ্ঞা। তিনি প্রভুভক্ত; আপনার প্রাণ দিতেও কাতর নহেন, তিনি প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এ দিকে সিন্ধিয়ার করে দুর্গ সমর্পণ করিলে যে দারুণ অপমান হইবে, তাহাও তাঁহার প্রাণে সহ্য হইবে না। অগত্যা মরণই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া তিনি হীরকচূর্ণ ভক্ষণ করিলেন। মৃত্যুকালে বলিয়া গেলেন, "রাজাকে বলিও, তাঁহার আজ্ঞা-পালনের আমি অন্য উপায় পাইলাম না। আমি জানি যে, আমি মরিলে দাক্ষিণীগণ অজমীরের দুর্গে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইবে না। সেই জন্য আমি আত্মবিসর্জ্জন করিলাম।"

দমরাজ আত্মহত্যা করিয়া প্রভুভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। সিন্ধবীকুলে এই মহাবীরের জন্ম· ইনি একজন দেওয়ান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে অজমীর-মারবারের একটি মুকুট খসিয়া পড়িল। মাধাজী সেই পুনর্জিত নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লাকুবা, জীব-দাতা, সদাশিব ভাও এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণ তাঁহার প্রচণ্ড সেনাকটক লইয়া মৈরতার দিকে অগ্রসর হইলেন। অশীতি কামান ও প্রচণ্ড গোলন্দাজ লইয়া দী-বইন তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অনুগামী হইলেন, কিন্তু একদিনের পথ পশ্চাতে পড়িয়া নিত্রয়া নামক স্থানে তাঁহাকে শিবির-সন্নিবেশ করিতে হইল। এ দিকে রাঠোরসেনা মৈরতাভূমে একটি দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া বিপক্ষের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল; তাহাদের মধ্যে একদল দঙ্গিবাস নামক স্থানে অতিবাহিত করিল। মহারাষ্ট্রীয়দল ক্রমে ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল; কিন্তু মৈরতা হইতে তাহারা এখনও আড়াই ক্রোশ দূরে স্থিত। দী-বইন তদপেক্ষাও পশ্চাতে। লুনী-নদীর সৈকতপ্রদেশে তদীয় কামানবাহী শকটগুলির চক্র এরূপ প্রোথিত হইয়া গিয়াছে যে, তিনি তাহার উদ্ধারে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সুযোগে রাঠোরেরা যদি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয়ের সকল উদ্যম বিফল হইয়া পড়িত। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাঠোররাজের মন্ত্রিগণ সেই অমূল্য সুযোগ উপেক্ষা করিলেন। আপনাদের পরাজয়ের পথ আপনারাই পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দল রাঠোরগণকে পুনরায় আক্রমণ করে, রাজার প্রধান মন্ত্রী খুবচাঁদ সিঙ্গবী তখন প্রভুর সহিত রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অপর মন্ত্রিদ্বয় গঙ্গারাম বিন্দারী ও ভীমরাজ সিঙ্গবী রাঠোরসেনার সহিত যুদ্ধভূমে যাত্রা করিয়াছিলেন। শত্রুকুল উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া প্রধান রাঠোরসর্দ্দারদ্বয় আহোবপতি শিবসিংহ এবং অশোপপতি মহীদাস মন্ত্রিদ্বয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "বিপক্ষদল নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু দী-বইনের কামানগুলি লুনীর সৈকতপ্রদেশে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছে, এই সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত; বিলম্ব করিলে বিপদের সম্ভাবনা।" মন্ত্রিদ্বয় সর্দ্দারগণের উৎসাহে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। তাঁহাদের সেই ভাব দর্শনে বিরক্ত হইয়া সর্দ্দারচূড়ামণি বলিলেন, "সে কি? আপনারা যে নীরবে রহিলেন? এ সময়ে কি নীরবে বা নিরুৎসাহভাবে থাকা উচিত? মস্তকপার্শ্বে শত্রু,

কোন্ বুদ্ধিমান্ এ সময়ে নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারে?" তাঁহার সুমিষ্ট ভর্ৎসনায় ভীমসিংহের মুখ লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল; শিবসিংহ ও মহীদাসের স্থায় অন্যান্য সর্দ্দারগণকে সংগ্রামার্থ উৎসুক দেখিয়া তিনি প্রধান মন্ত্রী খুবচাঁদের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র তাঁহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যদি রাজার প্রতি আপনাদের ভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই পত্র মান্য করিবেন; যতক্ষণ ইস্মাইল বেগ নাগোর হইতে আসিয়া রাঠোরসেনার পুষ্টিসাধন না করিতেছেন, তাবৎ সংগ্রামে নিবৃত্ত থাকিবেন।" এই বাক্য সর্দ্দারদিগের কর্ণে বজ্রবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কি করিবেন, রাজাজ্ঞা পালন করিতে হইবে। মন্ত্রিবরের গূঢ় দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলে তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে ফরাসীবীরের মস্তক লুনীতীরস্থ সৈকতভূমে প্রোথিত করিতেন। রাঠোরকুলের দুর্ভাগ্যবশে তাঁহারা সেই গূঢ় দুরভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না; নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া তাঁহারা ম্লানবদনে স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে দী-বইন কামানগুলি উদ্ধার করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন।

বিকানীরপতি সচিবের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, মারবার নিশ্চয় পরাস্ত হইবে। তখন তিনি নিজের বিষয় ভাবিয়া মনে মনে ভীত হইলেন; ভাবিলেন, "মহারাষ্ট্রীয়গণ জয়ী হইলে যখন শুনিবে যে, আমি মারবারের সহায়তা করিতে আসিয়াছি, তখন তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে না; নিশ্চয়ই আমার রাজ্য তাহাদের কবলে পড়িবে। অতএব এই বেলা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করাই কর্ত্তব্য।" মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়াই ভীরু বিকানীরপতি রাঠোরদল পরিত্যাগপূর্ব্বক রাত্রিযোগে নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। সেই রাত্রি প্রভাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্জ্জয় দী-বইন নিজ প্রচণ্ড গোলন্দাজসেনা লইয়া অজ্ঞাতসারে রাঠোরগণকে আক্রমণ করিলেন। সেরূপ অসময়ে শত্রুকুল আক্রমণ করিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বিবেচনায় রাজপুতগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না। গোলাবর্ষণ দেখিয়া সকলে ত্রস্তভাবে অস্ত্রগ্রহণ করিতে লাগিল; কিন্তু অস্ত্রগ্রহণ করিয়া ফল কি? রাঠোরসেনা বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন। প্রতি মুহূর্ত্তে অগণ্য জলন্ত গোলক আসিয়া তাহাদিগের শত শত সৈন্যকে সংহার করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাঠোরেরা ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গঙ্গারাম শিবির ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিলেন।

সেই রণভূমির অনতিদূরে আহোব ও আশোপের সর্দ্দার স্ব স্ব শিবিরে প্রসুপ্ত ছিলেন। বিপক্ষের কামানশ্রেণী জলন্ত গোলকরাশি উদ্গার করিয়া শ্রুতিকঠোর গর্জ্জনে চম্পাবৎসর্দ্দার শিবসিংহকে জাগরিত করিল। ব্যস্তসমস্তভাবে তিনি শয্যা হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, রাঠোর সৈন্যগণ উর্দ্ধমুখে পলায়ন করিতেছে। তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন; পরক্ষণেই প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং কুম্পাবৎসর্দ্দারের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। আশোপ-পতি অতিরিক্ত অহিফেন সেবন করিতেন, সুতরাং গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবসিংহ তদীয় শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মহীদাস জাগরিত হইলে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সৈন্যসামন্ত সকলেই পলায়ন করিয়াছে; আমরা একা পড়িয়া রহিয়াছি।" আশোপসর্দ্দার স্তম্ভিত হইলেন। বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া তিনি তখনই বলিলেন, "তবে চল, আমরা অশ্বারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হই।" তৎক্ষণাৎ অশ্ব সুসজ্জিত হইল। রণবিশারদ দ্বাবিংশতি সর্দ্দার অমনি সমবেত হইয়া চরমজীবনের জন্য অহিফেন সেবন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে অপরাপর সামন্তবর্গও তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইলেন। একে একে চারিসহস্র রাঠোরবীর বিপক্ষের আক্রমণ হইতে জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধার্থ সম্মিলিত হইলেন। সকলে তুরঙ্গারোহণে একত্র দলবদ্ধ হইলে আহোবপতি শিবসিংহ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বীরগণ! এখন কি আমরা পলায়ন করিতে পারি? বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া এখন কি আমাদের পলায়ন করা উচিত?—না, কখনই নহে; পলায়ন করিলে কাপুরুষ বলিয়া সকলে আমাদিগকে ঘৃণা করিবে। চল, পুত্রকলত্রের মায়া-মমতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মাতৃভূমির জন্য রণসাগরে ঝম্প প্রদান করি।" রাঠোরসৈন্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিল; তাহাদের প্রত্যেকের চক্ষু হইতে যেন বহ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। অতঃপর সকলেই যেমন সোৎসাহে স্ব স্ব হস্ত ভালতটে স্থাপন করিল, অমনি আহোবপতি "অগ্রসর হও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সকলে স্ব স্ব রণতুরঙ্গ চালিত করিয়া দী-বইনের গোলন্দাজসেনার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়া রাঠোরবীরগণ ভীমগর্জ্জনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পত্তন মনে রাখিও।" এই উৎসাহসূচক শব্দ তৎক্ষণাৎ সমস্বরে উচ্চারিত হইল। তৎক্ষণাৎ সকলে ভীষণ উৎসাহসহকারে দী-বইনের গোলন্দাজ-সেনার উপর আপতিত হইল। জীবনের প্রতি মমতা নাই, আত্মীয়স্বজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল সেই বিকট রণনাদ "পত্তন মনে রাখিও" উচ্চারণপূর্ব্বক সকলে কৃতান্ত-দূতের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রাঠোরসেনা প্রচণ্ড সাগরতরঙ্গের ন্যায় ভীষণতেজে দী-বইনের গোলন্দাজের উপর আপতিত হইল। রাঠোরের ভীষণ তরবারিমুখে পতিত হইয়া অগণ্য য়ুনানীবীর সমরশয্যায় শয়ন করিল। দী-বইন রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অতঃপর প্রচণ্ড উৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাঠোরবীরগণ গোলন্দাজসেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণের উপর আপতিত হইলেন। প্রচণ্ড মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীর পক্ষে সেই কতিপয় রাঠোরবীর গণনায় মুষ্টিমেয়, কিন্তু যে কঠোরবিক্রম তাহাদের প্রত্যেকের বাহুতে বিরাজ করিতেছিল, তাহা কে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে? ক্ষণকালমধ্যেই, অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়সেনা রাঠোর-হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। রাঠোরবীরগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না; তাঁহারা সোৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই সময়ে যদি তাঁহারা দী-বইনের কামানগুলি করগত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মৈরতাযুদ্ধ জয়গৌরবে টঙ্গাভূমিকে অতিক্রম করিত। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যাগত হইতে না হইতেই চতুর দী-বইন ছিন্নভিন্ন গোলন্দাজসেনাকে পুনরায় এক করিয়া কামানশ্রেণীর মুখ ফিরাইয়া রাঠোরদিগের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আর কতক্ষণ সহ্য হইবে? সেই চারি সহস্রের মধ্যে যে কতিপয় রাজপুতবীর জীবিত ছিলেন, তাঁহারা আর কি প্রকারে অশীতিকামানের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন? তথাপি তাঁহারা যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হয় জয়ী হইবেন, নচেৎ বীরের ন্যায় সমরভূমে শয়ন করিবেন, তথাপি শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেন না; সে প্রতিজ্ঞা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। দেখিতে দেখিতে মহারাষ্ট্রীয় কামানশ্রেণী শ্রুতিকঠোর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই বিকটশব্দে রাঠোরবীরের উন্মত্ত আস্ফালন যেন অনন্তে বিলীন হইয়া গেল; ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহাদের প্রায় সকলেরই লীলাখেলা ফুরাইল। আগ্নেয়াস্ত্রের ধূমপটল শূন্যে বিলীন হইলে রণভূমির বীভৎস দৃশ্য সকলের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। কোথাও ছিন্নভিন্নাঙ্গ অগণ্য শবদেহ একত্র একস্থলে স্তূপীকৃত, কাহারও হস্তপদ খণ্ড বিখণ্ডিত, কাহারও মুণ্ড ছিন্ন, কাহারও দেহ দ্বিধা বিভক্ত। কেহ অশ্বের উপর, আবার

কাহারও উপর ঘোটক পতিত—সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত। বিশাল মৈরতাভূমি বীভৎসরূপী মহাশ্মশানে-পরিণত। তাহার সর্ব্বস্থান শোণিতে পঙ্কিল। অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়, ফরাসী ও রাঠোরসৈনিক সেই শোণিতপঙ্কিল আরক্ত কলেবরে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। আহা! আর তাহারা জাগরিত হইবে না। আর কেহ তাহাদিগকে প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া রণস্থলে প্রেরণ করিবে না। যে নয়ন জগজ্জিগীষায় এককালে বহ্নিকণা উদ্গার করিয়া বিশ্বদাহন করিত, আজি তাহা হীনপ্রভ। মৈরতা-মহাশ্মশানে আজি চতুঃসহস্র রাঠোরবীর স্বদেশের জন্য অম্লানবদনে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সে রজনী প্রভাত হইল, আবার দিন আসিল, কিন্তু সেই রণক্ষেত্রে পতিত নির্জ্জীব শিব-সিংহকে কেহই উজ্জীবিত করিতে উপস্থিত হইল না। দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে প্রবল বারিবর্ষণ হইয়া তাঁহার ক্ষতশূল দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিল; তিনি সেইরূপ নিস্পন্দ অবস্থায় পতিত রহিলেন। আবার রাত্রি আসিল; দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি জলন্ত উল্কা হস্তে সেই জনশূন্য রণভূমে প্রবেশ করিল এবং পতিত বীরবৃন্দের মুখের উপর আলোক ধরিয়া যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। মানুষের উপর মানুষ, তদুপরি অশ্বের শবদেহ, তদুপরি আবার মানুষ, ছিন্নহস্তে, ছিন্নমুণ্ডে, ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে। মশাল লইয়া সেই ব্যক্তি সকলের মুখের কাছে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, তাহাকে পাইল না বলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যে স্থলে শিবসিংহ পতিত আছেন, তথায় উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনুসন্ধানের পর সেই ব্যক্তি পরিশেষে স্তূপীকৃত শবদেহের ভিতর হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিল—দেখিল, তাঁহার জ্ঞান নাই, দেহ নিস্পন্দ, ক্ষত ও রক্তাক্ত; তিনি নিমীলিত নয়নে পতিত রহিয়াছেন। সে অমনি কিঞ্চিৎ অহিফেনদ্রব মূর্চ্ছিত সর্দ্দারের বদনবিবরে প্রদান করিল। ক্ষণকাল-মধ্যেই তাঁহার মূর্চ্ছা দূর হইল, চৈতন্যলাভ করিয়া তিনি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে বন্ধু, আমার প্রাণদান করিলে?" তখনই সেই ব্যক্তি হর্ষগদগদস্বরে উত্তর করিল, "প্রভো! একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন,—আপনার অনুগত ভৃত্য সুরযমল।" শিবসিংহ অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু নেত্র উন্মীলন করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। বিশ্বস্ত শূদ্র সেই অন্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ প্রভুকে অতি সাবধানে শিবিরে লইয়া চলিল। পথিমধ্যে লাকুবার হরকরাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা প্রভুর অনুমতিক্রমে আহত সেনানী ও সৈনিকবৃন্দের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে। অতঃপর শিবসিংহ মৈরতার শিবিরে আনীত হইলেন। তাঁহার ক্ষতস্থলগুলি সীবন করিবার জন্য লাকুবা একজন শল্য-চিকিৎসককে পাঠাইলেন; কিন্তু মহাতেজা চম্পাবৎ-সর্দ্দার মহারাষ্ট্রীয়বীরের সমস্ত শিষ্টাচার অগ্রাহ্য করিয়া সদর্পে বলিলেন, "যাবৎ আমার সামান্য সৈনিকদিগের চিকিৎসা না হইতেছে, তাবৎ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিব না।" তাঁহার উচ্চহৃদয় ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া লাকুবা চমৎকৃত হইলেন এবং যাহাতে সেই রাজপুতবীরের মনস্তুষ্টি জন্মে, তদুপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না।

অল্পদিনের মধ্যেই শিবসিংহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবার পূর্ব্বজ্যোতি ধারণ করিল। দেহে প্রচুর বলাধান হইলে তিনি রাজদর্শনের বাসনা করিলেন, এ দিকে রাজা বিজয়-সিংহ সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। রাজদর্শনোপযোগী পরিচ্ছদধারণের পূর্ব্বে শিবসিংহ ক্ষৌরকার্য্যসমাপন ও স্নান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্নানসময়ে তাঁহার ক্ষতমুখগুলি আবার খুলিয়া গেল; প্রবলবেগে বারিধারার ন্যায়

রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সর্দ্দার-চূড়ামণি শিবসিংহ রাজদর্শনের পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

ভীমরাজ সিঙ্গবী নাগোরে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট একখানি তিরস্কার-সূচক পত্র প্রেরণ করিলেন। সেই পত্র পাঠমাত্র মর্ম্মাহত ভীমরাজ বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তদীয় অমনোযোগিতা ও অযোগ্যপলায়ননিবন্ধন রাঠোরসেনা পরাজিত হইল বটে, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মন্ত্রিবর খুবচাঁদকেই প্রধান দোষী বলিয়া গণ্য করিতে হয়। খুবচাঁদ সেই যুদ্ধে রাজার স্থলে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সর্দ্দার ও সামন্তগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, নতুবা যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সিন্ধিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতি-স্রোত সেই মৈরতাক্ষেত্রে যে প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাঠোরকুলের দুর্ভাগ্যবশে তাহা হইল না। খুবচাঁদ বিদ্বেষবশতঃ ভীমরাজকে সেই অনর্থকর পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহার মনে ভয় হইয়াছিল, পাছে ভীমরাজ যুদ্ধে জয়ী হইয়া সগর্ব্বে রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ভীমরাজের চিরবিদ্বেষী; ভীমরাজের উন্নতি দেখিলে তিনি ঈর্ষানলে বিদগ্ধ হইতেন। কিন্তু সেই পাশবী ঈর্ষা যে পরিশেষে মারবারের সর্ব্বনাশসাধন করিবে, তাহা দুরাচার খুবচাঁদ একবারও চিন্তা করেন নাই।

এইরূপে প্রধান মন্ত্রীর বিদ্বেষবশতঃ মারবারের যে অধঃপতন হইল, সেই নিদারুণ অধঃপতন হইতে মারবার আর উঠিতে পারিল না; ভবিষ্যতে পারিবে কি না, তাহাও সন্দেহ। সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে সত্য, কিন্তু রাজস্থানের কি এমন সৌভাগ্য আবার হইবে? আবার কি কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া অমৃতকুণ্ডের জলসেচনে আর্য্যবীরদিগকে তাঁহাদের ভস্মরাশি হইতে পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইবেন?

মৈরতার মহাশ্মশানে মারবারের গৌরবরবি অস্তমিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতেও দুঃখের শেষ হইল না। সর্দ্দার ও মন্ত্রিবৃন্দের দুর্ব্বৃত্ততাবশতঃ তাহার যে শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছিল, অবশেষে রাজা বিজয়সিংহের ইন্দ্রিয়দোষে তাহা অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধাবস্থায় আশোয়াল কুলের একটি রমণীর প্রতি রাজা বিজয়সিংহ অত্যন্ত আসক্ত হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি রাজকার্য্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সেই সুন্দরীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহিতা রমণীদিগের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, তিনি সেই নিকৃষ্টা উপপত্নীর প্রতি সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দর্শনে সর্দ্দারগণ তৎপ্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু আশোয়ালরমণী রাজার সেই প্রগাঢ় অনুরাগের যে নিকৃষ্ট প্রতিদান করিত, তাহা শুনিলে বিজয়সিংহের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। জনরব এইরূপ, তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে পাদুকাপ্রহার করিয়া সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিত। কাপুরুষ বিজয়সিংহ সেই পবিত্র প্রেমোপহার পাইয়াও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মারবারপতির এই ঘৃণিত জঘন্য আচরণে রাজ্য আশু মহা অনর্থের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল; যথেচ্ছাচার ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়া মারবারের সর্ব্বত্র ভীমবেশে বিচরণ করিতে লাগিল।

পাশবানী রমণীর প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাজা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানটি লীলাসংবরণ করিল। তখন রাজা নিজ পৌত্র মানসিংহকে আনিয়া দত্তকরূপে প্রেমময়ীর অঙ্কে প্রদান করিলেন। তাঁহার একান্ত বাসনা যে, মানসিংহই মারবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্য তিনি

সর্দ্দারদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা যেন মানসিংহের অভিষেকে উপস্থিত হইয়া যথোচিত উপহার প্রদান করেন। এই ঘোষণাপত্র প্রচার হইবামাত্র রাঠোর-সর্দ্দারগণ সমবেত হইয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আমরা প্রাণান্তে গোলামের পুত্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহি।" মানকে বিজয়সিংহ আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনপূর্ব্বক প্রণয়িনীর করে দত্তকপুত্ররূপে প্রদান করিয়াছেন, সে মানকে যে সর্দ্দারেরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, ইহা রাজার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি আত্মমত দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য আবার বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন। পাশবানী রমণী ইহাতে প্রীত হইয়া বালক মানকে ঝালোরদুর্গে পাঠাইয়া দিল। বিজয়সিংহের চতুর্থ পুত্র সেরসিংহ মানকে দত্তকপুত্ররূপে ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি চতুর ও কার্য্যদক্ষ; তাঁহার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিষয় চিন্তা করিয়া পাশবানী মনে মনে প্রীত হইল। পাছে সেরসিংহ তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করেন, এই আশঙ্কায় আশোয়াল-কামিনী মানকে ফিরিয়া আসিতে বলিল। মানসিংহ আশু প্রত্যাগত হইয়া তাহার কক্ষেই অবস্থিতি করিলেন। সেই পাশবানীর অন্তঃপুরমধ্যে নিকৃষ্ট পরিচারিকাগণে পরিবৃত হইয়া মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারী দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

উপপত্নীর প্রণয়ে অন্ধপ্রায় হইয়া বিজয়সিংহ ক্রমে এত অপদার্থ হইয়া পড়িলেন যে, রাজ্যের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার সেইরূপ আচরণদর্শনে রাঠোর-সর্দ্দারবৃন্দ তৎপ্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহার উপর সেই নিকৃষ্ট পাশবানীর অযথা প্রভুত্ব তাঁহাদের প্রাণে সহ্য হইল না। তাঁহারা দেখিলেন যে, বিজয়সিংহকে পদচ্যুত না করিলে রাজ্যরক্ষা করা দুরূহ। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা মালকাশুনী-নামক স্থলে একত্র হইলেন এবং রাজার পদচ্যুতি সম্বন্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অচিরে সকল সংবাদ বিজয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। স্বার্থরক্ষায় তৎপর হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ দিকে সর্দ্দারবৃন্দ রাউস-সর্দ্দারের নিকট দুর্গমধ্যে গোপনে দূত পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, "ভীমসিংহকে লইয়া আশু দুর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন।" সংবাদ পাইবামাত্র রাউসপতি তৎক্ষণাৎ পাশবানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজা শিবিরে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন, আপনার সম্মানোপযোগী সম্ভাষণ করিবার জন্য একদল সৈনিকও দুর্গমধ্যে প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আপনি সত্বর রাজ-শিবিরে গমন করুন।" রমণী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া শরীররক্ষকদিগকে সঙ্গে না লইয়াই প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি শিবিকামধ্যে আরোহণ করিল। অমনি কে একজন গুপ্ত-ভাবে থাকিয়া এক আঘাতেই তাহার প্রাণসংহার করিল। মন্দভাগিনী পাশবানীর দ্রব্যাদি তখনই ক্রোক করা হইল। এ দিকে রাউসসর্দ্দার কুমার ভীমসিংহকে লইয়া দুর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজ-ধানীর নাগোরতোরণে শিবির স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই যদি তিনি একেবারে সর্দ্দারগণের শিবিরে গমন করিতেন, তাহা হইলে বিজয়-সিংহ সেই মুহূর্ত্তেই পদচ্যুত হইতেন।

রাউসসর্দ্দার ও ভীমের যাত্রার বিবরণ রাজা বিজয়সিংহ ও সর্দ্দারগণের কর্ণগোচর হইল। বিজয় তৎক্ষণাৎ নাগোর-তোরণের সম্মুখস্থ শিবিরে উপস্থিত হইয়া রাজ্যলোভী ভীমসিংহকে আক্রমণ করি-লেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তেই ভীমসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজ্য-লিপ্সা বিড়ম্বনা মাত্র। নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া পড়িল। কিন্তু রাজা তাঁহাকে একেবারে নিরাশ না করিয়া

সুজোত ও শিবানো নামক দুইটি জনপদ অর্পণপূর্ব্বক শেষোক্ত জনপদে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও রাজার শান্তিবোধ হইল না। জ্যেষ্ঠ জালিমসিংহকে তিনি অযথারূপে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই অন্যায় আচরণে জালিম অতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য তিনি গদবাররাজ্য প্রদান করিলেন এবং গোপনে বলিয়া দিলেন, অবিলম্বে ভীমকে আক্রমণ করিবে। এ গুপ্ত সংবাদও আশু ভীমের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সতর্ক থাকিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইল, জালিমসিংহ কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হইলেন। সে আক্রমণ তিনি প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, অগত্যা তাঁহাকে পোকর্ণে পলায়ন করিতে হইল। কিন্তু সে স্থানও নিরাপদ্ না হওয়াতে অবশেষে যশল্মীরে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে অন্তর্বিপ্লবে উত্তেজিত হইয়া রাজা বিজয়সিংহ চরমবয়সে নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকদিন সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। একত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী রাজ্যভোগের পর তিনি ১৮৫০ সংবতে আষাঢ়মাসে লীলাসংবরণ করিয়া সমস্ত সংসার-যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রাজা ভীম কর্ত্তৃক গদী-আক্রমণ, ঝালোর অবরোধ, ভীম কর্ত্তৃক সর্দ্দারদিগের অবমাননা, নিমজ-আক্রমণ, ভীমসিংহের আকস্মিক মৃত্যু, মানসিংহের অভিষেক, পোকর্ণের শোবেসিংহের বিদ্রোহ, চম্পাশূনীর ষড়্যন্ত্র, ভীমসিংহের বিধবা পত্নীর গর্ভে একটি পুত্রের জন্ম, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর অজ্ঞাতবাস, ধনকুলের জন্ম প্রচার, ক্ষেত্রীর অভয়সিংহের আশ্রমে ধনকুলের রক্ষা, শোবের চক্রান্ত, ধনকুলকে মারবারের রাজা বলিয়া জয়পুরাধিপের স্বীকার, মানসিংহের আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা, যুদ্ধ, রাজার সঙ্কট, আত্মরক্ষার্থ উৎকোচদান, কচ্ছাবহদিগের নিকট হইতে যোধপুরের লুণ্ঠিতদ্রব্যাদি হরণ, মানসিংহের অধীনে মীর খাঁর পদগ্রহণ এবং সর্দ্দার চতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে যোধপুরে প্রত্যাগমন।

বিজয়সিংহের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তমাত্র ভীমসিংহ তৎক্ষণাৎ যোধপুরে উপস্থিত হইয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। যখন ভীমসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মারবারের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী জালিমসিংহ রাজধানীর মৈরতাদ্বারে সেনাকটক স্থাপনপূর্ব্বক অধিবাসের আয়োজন করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার অধিবাসই সার হইল, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলেন

না। ভীম গোপনে যোধপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জালিম স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তিনি তত শীঘ্র আসিতে পারিবেন; সেই জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া অভিষেকোপযোগী শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার দীর্ঘসূত্রতাই তদীয় সর্ব্বনাশসাধন করিল। ভীমের অভিষেকসংবাদ পাইয়া তিনি ভগ্নহৃদয়ে ভিলারের দিকে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলেন না, ভীম তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক তথায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন জালিমসিংহ উদয়পুরে পলায়ন করিলেন। রাণা তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভরণপোষণোপযোগী ভূমিবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ আশ্রয়ে স্থানদান করিলেন। জালিমের আশা-ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইল। রাঠোররাজকুমার সকল আশাভরসা জলাঞ্জলি দিয়া কেবল বিদ্যাচর্চ্চাতেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইল। স্বহস্তে নিজদেহের একটি শিরা খুলিতে গিয়া তিনি একটি ধমনী কাটিয়া ফেলেন; তাহাতেই দেহ হইতে অবিরাম রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। জালিমসিংহ অনেকগুলি শারীরিক ও মানসিক গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। রাজবারার মধ্যে তিনি একজন যোগ্য কবি বলিয়া পরিগণিত।

প্রকৃত উত্তরাধিকারী না হইয়া ভীমসিংহ নিজ বাহুবলে রাজ্য অধিকার করিয়া প্রাপ্তরাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করিলেন। বিধাতাও তাঁহার সহায় হইলেন। তাঁহার অভিষেকের পূর্ব্বেই তদীয় পিতা ও পিতৃব্যত্রয় লীলাসংবরণ করিলেন। এক্ষণে যে কয়েক ব্যক্তি তাঁহার উন্নতিপথের কণ্টক, তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্য সর্দ্দারসিংহ এবং পালকপিতা সেরসিংহ প্রধান। মন্দভাগ্য সর্দ্দারসিংহ ভীমের রোষানলে আশু পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইলেন এবং সেরসিংহের নয়নযুগল উৎপাটিত হইল। অন্ধ অবস্থায় পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা জ্ঞানে তিনি স্বহস্তে আত্মহত্যা করিলেন। অতঃপর শূরসিংহের উপর ভীমের কোপদৃষ্টি পড়িল। শূরসিংহকেও অচিরে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

ভীমসিংহ এখন প্রায় নিষ্কণ্টক; একমাত্র মানসিংহ তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। তাঁহার নিপাতসাধন করিতে পারিলেই ভীম সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হন। কিন্তু মান এখন ঝালোরে অবস্থান করিতেছেন। ভীমের শোণিতপিপাসু ছুরিকা সেই ঝালোরের প্রচণ্ড প্রাকার ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। বিধাতা যদি মানকে ভীমের সহিত ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পিতৃঘাতী অভয়সিংহ ও ভক্তসিংহের পাপবংশ নির্ম্মূল হইত এবং ইদর হইতে আনন্দসিংহের বংশধর আসিয়া মারবারকে কঠোরপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিতেন, যোধরাওয়ের লীলাক্ষেত্র মারবার আবার সুখসমৃদ্ধিতে পরিশোভিত হইয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিত।

মানসিংহকে ইহলোক হইতে বিদায় করিতে না পারিলেও ভীমের শান্তি নাই। সুতরাং অবিলম্বেই তিনি ঝালোরদুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু সে অবরোধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ভীম বহুদিন ধরিয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্তগণ ক্রমে নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। মানসিংহ সেই সুযোগে সসৈন্যে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া নগরাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছু দিন অতীত হইল। একদিন তিনি পল্লীনগর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। তথা হইতে তিনি ঝালোরের দিকে প্রতিগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে পথিমধ্যে ভীমসিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। আশু একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সে যুদ্ধে ভীমের বল প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া মানসিংহ অশ্বারোহণে পলায়ন

করিলেন। অকস্মাৎ তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইলেন, অমনি ভীমের সৈন্যসামন্তগণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এমন সময় আহোব-সর্দ্দার তথায় উপস্থিত হইয়া মানসিংহকে নিজ পশ্চাদ্ভাগে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে পলায়ন করিলেন। যদি আহোব-সর্দ্দার তখন তথায় উপস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলে মানকে ভীমসিংহের হস্তে বন্দী হইয়া পিতৃব্য ও ভ্রাতৃগণের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত।

ভীমসিংহের সর্দ্দারগণ দিন দিন এত উদ্ধত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর উপর ক্ষমতা পরিচালন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীম তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিলেন। ঝালোর-দুর্গের অবরোধ কিছুই ফলপ্রদ না হওয়াতে ভীম একদিন স্বীয় সর্দ্দারগণকে বলিলেন, "তোমাদের অশ্বগুলি কাড়িয়া ষাঁড় চড়িতে দিব।" এই অবমানসূচক কথা শুনিয়া সর্দ্দারগণ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, তখনই তাঁহারা ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, মানসিংহের পক্ষে যোগদান করেন। যাহা হউক, কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য সকলে গদবারের অন্তর্গত গানোরে সমবেত হইলেন। নানা তর্কবিতর্কের পর ধার্য্য হইল যে কোন পক্ষই অবলম্বনীয় নহে, দেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যান্তরে গমনই শ্রেয়ঃ। মানসিংহ তাঁহাদিগের আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পারিপার্শ্বিক নৃপতিদিগের নিকট আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সর্দ্দারদিগের এইরূপ ব্যবহার দর্শনে ভীম তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের অনেকেরই ভূসম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লইলেন; উদাবৎদিগের প্রধান আবাসভূমি নিমজনগর অবরুদ্ধ হইল, নগরবাসিগণ একবর্ষ ধরিয়া নগর রক্ষা করিল, কিন্তু আর সমর্থ হইল না। সুতরাং নিমজ ভীমের অধিকৃত হইল। এই অবরোধে অধিকাংশ বিদেশীয় বেতনভোগী সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল; তাহারা নিমজের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া দুর্গপ্রাচীরগুলি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

এই প্রকারে নিমজ অধিকার করিয়া ভীমসিংহ স্বীয় বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহারে ঝালোর অবরোধের জন্য নূতন বল যোজনা করিলেন। মান ক্রমে ক্ষীণসহায় ও ক্ষীণবল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে যখন নগরের নিম্নভাগ শত্রুর অধিকৃত হইল, তখন তাঁহার আশা-ভরসা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। একে সেনাবলের ক্ষয়, তাহাতে আবার আহারীয়ের অভাব; দুর্গমধ্যে এমন খাদ্য নাই যে, ক্ষুধাতুর অবশিষ্ট সেনাদল আর একদিন খাইয়া জীবনধারণ করিবে। কিঞ্চিৎ শক্তু মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাতে অতি কষ্টে দুই চারি জনের ক্ষুধাশান্তি হইতে পারে; অবশিষ্ট সকলের উপায় কি? মানসিংহ বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই সঙ্কটসময়ে যখন তিনি ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যসামন্তগণের মলিন বদনমণ্ডলের দিকে চাহিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি আত্মরক্ষায় হতাশ হইলেন; শত্রুকরে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তখন তিনি আত্মরক্ষার উপায়ান্তর দেখিলেন না। এই বিষম সঙ্কটের সময়ে ১৮৬০ সংবতের কার্ত্তিকমাসের দ্বিতীয় দিবসে ভীমসিংহের প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে সংবাদ আসিল, "ভীমসিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনিই রাঠোরবংশের অধিপতি; আপনার সেবা করিয়াই আমরা সুখী হইব।" মানসিংহ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাকে করগত করিবার জন্য কি শত্রুদিগের এই ছলনা? ক্রমাগত একাদশ বর্ষ ধরিয়া তিনি যে প্রচণ্ড বৈরীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, সে শত্রু কি হঠাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে? অদৃষ্টদেব মানসিংহের প্রতি কি এতই অনুকূল? মানের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি কখনও আশা করেন নাই যে, বিধাতা তাঁহাকে অকস্মাৎ সেই

বিষম বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। সেনাপতির পত্রের সহিত যদিও প্রধান মন্ত্রী ইন্দুরাজ সেই ভাবেই পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তথাপি মানের হৃদয়ে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল না। তাঁহার এই সন্দেহের সময় তদীয় দীক্ষাগুরু দেবনাথ ভীমের শিবির হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রফুল্লবদনে বলিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রতি বিধি অনুকূল, শিবিরে এক ব্যক্তিরও গুম্ফ নাই। অশৌচ নিবন্ধন সকলেই কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছেন।" তখন মানসিংহের বিশ্বাস জন্মিল, তৎক্ষণাৎ তিনি সগৌরবে সেই রাঠোরশিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় সমবেত সর্দার ও সৈনিকবৃন্দ তাঁহাকে রাজা বলিয়া পরম সমাদর করিলেন। তখন "জয় মহারাজ মানসিংহের জয়" শব্দে সভামণ্ডলী প্রতিধ্বনিত হইল।

ভীম অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহার কারণ কি? শিবির হইতে আরম্ভ করিয়া মারবারের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার কিংবদন্তী হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই জনরব রাজবারার সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিল, "ভীমসিংহকে কোন গুপ্তহন্তা বিনাশ করিয়াছে।" কেহ বলিল, "তিনি রোগে ভুগিয়া মরিয়াছেন।" এই প্রকার নানা জনশ্রুতি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাহাদের ধারণা, রাজা গুপ্তহন্তার হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কুলগুরু দেবনাথকে সেই গুপ্তহন্তা বলিয়া সন্দেহ করিল। প্রসিদ্ধি আছে, মানসিংহ যখন নিরাশাসাগরে নিমগ্ন হন, তখন দেবনাথ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "কুমার! আপনার প্রতি বিধি অচিরে অনুকূল হইবেন।" এই ভবিষ্যদ্বাণী রাজগুরু যে কিরূপে ফলবতী করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় তথ্য অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজগণ যে সকল গুরু, ভট্ট, দৈবজ্ঞ ও বৈদ্য প্রভৃতি ব্যক্তি দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত থাকেন, যাঁহাদের বাক্য বেদবাক্যরূপে গৃহীত হয়, তাঁহাদিগের দ্বারা সময়ে সময়ে রাজসংসারের মহা অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল লোক আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মকথিত বাণী ফলবতী করিবার জন্য নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুরতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ভীমসিংহের মৃত্যু হইল, কুলগুরু দেবনাথের ভবিষ্যদ্বাণীও ফলবতী হইল। মানসিংহের সমস্ত বিপদ্ ও বিঘ্ন বিদূরিত হইল। ১৮৬০ সংবতের (১৮০৪ খৃষ্টাব্দের) অগ্রহায়ণমাসের পঞ্চম দিবসে তিনি পিতামহ বিজয়সিংহের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে সুখ লিখেন নাই। তত সঙ্কটের পর রাজ্য হস্তগত করিয়াও তিনি নির্ব্বিরোধে তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কিছু দিন পরে পোকর্ণের শোবেসিংহ তাঁহার প্রতিকূলে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। দেবীসিংহ মরণসময়ে যে কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা আজি পর্য্যন্ত কেহ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই। মহাতেজা দেবীসিংহ যে তীক্ষ্ণ ছুরিকা স্বীয় পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় পৌত্র শোবেসিংহের হস্তে সামান্য কাল্পনিক অস্ত্ররূপে বিরাজ করিত না; সেই অস্ত্রের ভয়ে মহাবীর বুদ্ধিমান্ মানসিংহ অনুক্ষণ সশঙ্কিত ছিলেন।

রাজা মানসিংহের রাজ্যলাভের স্বল্পদিন পরেই শোবেসিংহ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী চম্পাশূনী নামক স্থলে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। অনেকগুলি সর্দার আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই সমবেত সর্দারদিগের সহিত তিনি মানসিংহের প্রতিকূলে ষড়্‌যন্ত্র রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "স্বর্গীয় রাজা ভীমসিংহের মরণসময়ে তাঁহার মহিষী গর্ভবতী ছিলেন, আজি তিনি আসন্নপ্রসবা হইয়া উঠিয়াছেন, যদি তাঁহার গর্ভে পুত্র জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাকে যোধরাওয়ের সিংহাসনে অভিষেক করিতে

হইবে।" আশু একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল। সভাস্থলে সকলেই সেই পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভীমসিংহের গর্ভবতী বিধবা রাণীকে দুর্গ হইতে লইয়া নগরের মধ্যবর্ত্তী প্রাসাদে রক্ষা করিলেন এবং অবহিতভাবে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। কেবল ইহা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে মানসিংহের স্বাক্ষর লইবার জন্য এক প্রকাশ্যসভায় তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি ভীমসিংহের বিধবা মহিষীর গর্ভে পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে মারবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবে এবং নাগোর ও শিবানো ভূমিসম্পত্তিস্বরূপ তাহার করে প্রদত্ত হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শোবেসিংহ কিছু কালের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন।

যথাসময়ে ভীমসিংহের বিধবা মহিষীর গর্ভে একটি নবকুমার প্রসূত হইল। প্রসূতি কাহাকেও না বলিয়া একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের করে সেই সদ্যঃপ্রসূত কুমারটি সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমার প্রাণকুমারকে লইয়া সত্বর গোপনে পোকর্ণে প্রস্থান কর। সেখানে শোবেসিংহের করে ইহাকে সমর্পণ করিও। দেখিও, অন্য কেহ যেন ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে।" বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই সদ্যোজাত কুমারটিকে একটি করণ্ডিকামধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক গোপনে পোকর্ণে উপস্থিত হইল। কেহ ইহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিল না। পোকর্ণসর্দ্দার শোবেসিংহের অভীষ্ট অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভীমসিংহের গর্ভবতী বিধবা রাণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলে মানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিবেন, এত দিনে তাঁহার সেই আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। যথাকালে শোবেসিংহ সেই নবপ্রসূত কুমারের ধনকুল নাম-করণ করিলেন। সেই দিন হইতে ক্রমাগত দুই বৎসর পর্য্যন্ত ধনকুলের বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়াছিলেন; এমন কি, সর্দ্দারগণের নিকটেও প্রকাশ করেন নাই। যদি মানসিংহ প্রজাহিতকারী রাজনীতির অনুগামী হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ধনকুলের নাম সেই পোকর্ণদুর্গের প্রাচীর ভেদ করিয়া অন্যত্র কাহারও শ্রুতিগোচর হইত না; কিন্তু রাঠোরগণের দুর্ভাগ্যবশে মানসিংহ রাজ্যের শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পাশবী স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া দুর্নীতির অনুসরণ করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে মারবাররাজ্যের অধঃপতন হইতে আরম্ভ হইল। যে সমস্ত সর্দ্দার রাজকক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঝালোরে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকেই ভালবাসিতেন, আর সকলে যেন তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিলেন; এমন কি, তাহাদিগের মুখাবলোকনেও তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন। এই জন্য রাজ্যমধ্যে মহা অনর্থ সংঘটিত হইল। যাহারা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, প্রকৃত বিবেককে পদদলিত করিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই চারিটি মাত্র প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, সেই চারিজনের মধ্যে কেবল দুটি লোক তাঁহার সগোত্রীয়। তাঁহার অবশিষ্ট আত্মীয়কুটুম্বগণ তদীয় নিষ্ঠুরাচরণ দর্শনে ব্যথিত হইয়া গর্ভাগ্নিক পর্ব্বতের ন্যায় মনের আগুন মনোমধ্যে নিহিত রাখিয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আসিয়া ধনকুলের আশ্রয়দাতা পৃষ্ঠপোষক শোবেসিংহের পক্ষে যোগদান করিলেন।

কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে দুই বৎসর অতীত হইল। তখন শোবেসিংহ আপন সর্দ্দার-গণের নিকট ধনকুলের জন্মবিবরণ প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে মানসিংহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল, "মহারাজ! ভীমসিংহের বিধবা মহিষীর গর্ভে ধনকুলের জন্ম, অতএব তাঁহাকে নাগোর ও শিবানো প্রদান করিয়া আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করুন্।" প্রত্যুত্তরে মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন,

"ধনকুল ভীমসিংহের পুত্র, ইহা সপ্রমাণ হইলে আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিব।" উত্তর পাইয়া সর্দ্দারগণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজা নিজে অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিলেন। ভীমপত্নী সে সময়ে যোধপুরেই অবস্থিত ছিলেন। মানসিংহ যে স্বয়ং ধনকুলের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লইতে অগ্রসর হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া রাণী অত্যন্ত ভীত হইলেন। রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সেই ভয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। সেই ভয়ের নিকট সরল অপত্যস্নেহ তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল। ভয়ার্ত্তা মহিষী সর্ব্বসমক্ষে ধনকুলকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন না, আপনার পদে তিনি আপনিই কুঠারাঘাত করিলেন। অচিরেই এই সংবাদ সর্দ্দারগণের শ্রুতিগোচর হইল, তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন; যে পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ মাতা হাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, আজি মহিষী আত্মপ্রাণরক্ষার্থ সেই স্নেহাস্পদ কুমারকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু সর্দ্দারগণের উৎসাহভঙ্গ হইল না। তাঁহারা উৎসাহের সহিত মানসিংহের অনিষ্টাচরণে উদ্যোগী হইলেন। তবে ধনকুলের সম্বন্ধ কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে সর্দ্দারগণেরও মনে সন্দেহ জন্মিল। প্রকৃতপক্ষে মহিষী যে ধনকুলকে প্রসব করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

মানসিংহ আপনাকে একপ্রকার নিরুদ্বেগ মনে করিলেন। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে হইল না। সর্দ্দারগণের একটি প্রধান উদ্যম বিফল হইয়া গেল। ধনকুল যে ভীমসিংহের পুত্র, তৎসম্বন্ধে শোবেসিংহ কোন সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। সুতরাং কি বলিয়া ধনকুলের জন্য স্বত্বের দাবী করিতে পারেন? এখন বলপ্রকাশ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু পোকর্ণ-সর্দ্দার বলপ্রয়োগ না করিয়া একটা দুর্ব্বোধ্য কূটকৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশলের আশ্রয়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যদি তিনি তাঁহার পরিণাম বিবেচনা করিতেন, যদি বুঝিতে পারিতেন যে, সেই কৌশল সুসিদ্ধ হইলে তাঁহার জীবনের সহিত জন্মভূমির সুখশান্তির অধঃপতন হইবে, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়স্তম্ভন শোচনীয় দশা সংঘটিত হইত না। বিষম অন্তর্বিবাদ ও শত্রুপীড়নে নিরতিশয় প্রপীড়িত হইয়াও যে মারবার এত দিন অটলভাবে দণ্ডায়মান ছিল, শোবেসিংহের সেই কূটকৌশল হইতে তাহা এক প্রকার শ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। তখন এক বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় প্রবল বৈরী আসিয়া মারবারের পদে যে দুশ্ছেদ্য দাসত্বনিগড় বন্ধন করিল, তাহাতে বীরকেশরী যোধরাওয়ের লীলাভূমি বীরজননী মারবারভূমি নির্জ্জীব ও নিস্পন্দপ্রায় হইয়া পড়িল। শোবেসিংহ ধনকুলের সম্বন্ধে তখন আর কোন আন্দোলন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেও পারিলেন না। পোকর্ণে থাকিলে পাছে সেই বালক মানসিংহের করে পতিত হন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ স্থানে লইয়া গেলেন। ছত্রসিংহনামা ভট্টি-সর্দ্দারের হস্তে বালককে অর্পণ করিয়া ক্ষেত্রীনগরে অভয়সিংহের নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। ধনকুল ক্ষেত্রীনগরে আনীত হইলে অভয়সিংহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ আশ্রয়ে স্থানদান করিলেন।

অতঃপর পোকর্ণ-সর্দ্দার শোবেসিংহ সঙ্কল্পিত উপায় অবলম্বনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি যেরূপ বীর, সেইরূপ চক্রী। তাঁহার কূটবুদ্ধি সর্ব্বজন-প্রশংসিত। মারবারের পূর্ব্ব-অধিপতি ভীমসিংহ শিশোদীয়রাজকুমারী নারীশিরোমণি কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণার্থ রাণাসমীপে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব গৃহীত হইতে না হইতে তিনি লীলাসংবরণ করেন। চতুরচূড়ামণি চম্পাবৎ-সর্দ্দার এই সামান্য বিষয়কে নিজ অভিসন্ধিসিদ্ধির প্রধানতম অবলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। এই সময়

জগৎসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসী। শোবেসিংহ তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকুমারীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা তুলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রণয় উদ্রিক্ত করিয়া দিলেন;—বলিলেন, "মহারাজ! মৃত রাঠোরপতি মিবারকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহের জন্য সমুৎসুক হইয়া রাণার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আপনি তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন, অতএব আপনিও রাণার নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করুন্।" স্বর্গসুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া বিলাসপ্রিয় জগৎসিংহের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল। সেই ললনা-রত্নকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ মহামূল্য বিপুল উপঢৌকনের সহিত মিবাররাজ ভীমসিংহের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব প্রেরিত হইল। চতুঃসহস্র সৈনিক সকল উপহার রক্ষা করিতে করিতে প্রজাপতির দূত সমভিব্যাহারে উদয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে চতুর চম্পাবৎ-সর্দ্দার মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া জগৎসিংহের বিবাহ-প্রস্তাব উল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন, "রাজন্! আপনি মারবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে জগৎসিংহ যদি কৃষ্ণাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য আপনার পবিত্র নামে কলঙ্ক-রেখা পড়িবে। আপনাকে বলা বাহুল্য যে, কৃষ্ণকুমারীর বিবাহসম্বন্ধ মারবারের সিংহাসনের সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছিল; সে সিংহাসনে যে কেহ থাকিবেন, তিনিই সেই অমূল্য ললনারত্নের প্রকৃত অধিকারী।" মানসিংহ সগর্ব্বে স্বীয় গুম্ফমর্দ্দনপূর্ব্বক কহিলেন, "মানসিংহ জীবিত থাকিতে তুচ্ছ কচ্ছপ গিয়া সেই নারীরত্ন গ্রহণ করিবে? আমি এই দণ্ডে তাহার সমস্ত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতেছি।" তৎক্ষণাৎ যোধগড়ের সৌধচূড়ায় প্রচণ্ডনির্ঘোষে নাগরা বাদিত হইল। দেখিতে দেখিতে তিন সহস্র অশ্বারোহী সেনা দুর্গের প্রাকারমূলে আসিয়া দণ্ডায়মান। সেই সময় হীরাসিংহনামা এক রাজপুত মিবারের প্রান্তসীমায় সসৈন্যে অবস্থিত ছিল। মানসিংহ তাহার সহিত মিলিত হইয়া তদীয় বেতনভোগী সৈন্যগণের সহিত রাঠোরবাহিনীকে একত্র করিলেন এবং অম্বর-সেনাদলের গতিরোধার্থ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। রাঠোরেরা উপহার-দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিল। অচিন্তিতপূর্ব্ব দারুণ অবমাননায় একান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া জয়সিংহ রাঠোরপতিকে প্রতিফলদানে স্থিরসংকল্প হইলেন। অচিরেই রাজ্যের সর্ব্বত্র এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করা হইল যে, "যে কেহ অস্ত্রধারণে সমর্থ, অচিরে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া নগরতোরণে সম্মিলিত হইবে।"

শোবেসিংহের বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি যে কূট উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধপ্রায় বলিয়া বোধ হইল। আর তখন কাহাকে ভয়? এখন তিনি প্রকাশ্যভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরে ক্ষেত্রীনগর হইতে ধনকুলকে আনাইয়া জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। অম্বরপতি তাহাকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত একপাত্রে আহার করিলেন। তখন ধনকুলের শুদ্ধজন্ম-সম্বন্ধে আর কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ভীমসিংহের সহিত জগৎসিংহের একটি ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। মারবার-সিংহাসনে ধনকুলের স্বত্ব সর্ব্বসমক্ষে সপ্রমাণ করিবার জন্য জগৎসিংহ নিজবিধবা ভগিনীর অঙ্কে তাহাকে স্থাপন করিলেন। সেই প্রকাশ্য সভাসমক্ষে সমবেত কুশাবহসর্দ্দারদিগের নিকট ধনকুলের শুদ্ধজন্ম ও স্বত্ব সপ্রমাণ হইলে জগৎ তাহাকে নিজ ভাগিনেয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন; তাহার স্বত্ব সংরক্ষা করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন বিকানীররাজ এবং মারবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা অপনৃপতির পক্ষে যোগদান করিলেন। বিকানীররাজবংশ সে সময় রাঠোরকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই কুলের প্রধান রাজাকে অপনৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া প্রায় সমস্ত সর্দ্দারই মানসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ

করিলেন। মানসিংহ একপ্রকার নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। তথাপি তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। রাজা মানসিংহ উপস্থিত সঙ্কটসময়ে অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় অধ্যবসায় এই দুইটি গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যথাসাধ্য সেনাদল সংগ্রহ করিয়া বিপক্ষের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য অবিলম্বে নগর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অম্বরপতির সৈন্যসংখ্যা একলক্ষেরও অধিক, সুতরাং তৎসহ তুলনায় মানসিংহের সেনা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। সেই বিশালবাহিনী লইয়া জগৎসিংহ ও ধনকুল রাঠোররাজকৃত কঠোর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রচণ্ডবিক্রমে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভীষণ সমরোদ্যোগের সংবাদ পাইয়া চারিদিক্ হইতে রাজগণ সমাগত হইয়া এই প্রচণ্ড সমরাভিনয়ে যোগদান করিতে লাগিলেন। ললনারত্ন কৃষ্ণার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র সামান্য রাজাও তল্লাভে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং আশার সোহাগে নানারূপ সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যথেচ্ছক্রমে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজদ্বয়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এমন কি, অর্থলোভী লুণ্ঠনপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয়গণও অর্থলিপ্সা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যাহার যে পক্ষ ইচ্ছা, দলে দলে সেই পক্ষ পরিপুষ্ট করিতে অগ্রসর হইল।

জয়পুর মারবার অপেক্ষা সমৃদ্ধশালী। সমাগত বীরগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই জগৎসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মানসিংহ অটলহৃদয়ে একবার আপনার বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলেন, দেখিলেন ক্রমে ক্রমে চারিদিক্ হইতে ঘোর জলদমালা আসিয়া তাঁহার ভাগ্যাকাশ আচ্ছাদন করিতেছে। তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলেই ধনকুলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। ক্ষণকাল তিনি এই সকল আন্দোলন করিলেন বটে, কিন্তু নিরুৎসাহ বা হতাশ হইলেন না। সে সময়ে একটিমাত্র বীরনৃপতির উপর তাঁহার আশাভরসা নির্ভর করিতেছিল। সেই মহাবলশালী বীরনৃপতি কে?—হুলকার। ইংরাজবীর লর্ড লেকের ভ্রূকুটিভয়ে মহারাষ্ট্রীয়বীর আত্মরক্ষার্থ সুদূর আটকপারে পলায়ন করিলে মানসিংহ তাঁহার পুত্রকলত্র ও পরিবারগণকে আপন রাজ্যমধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই মহোপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য হুলকাররাজ মানকে আশ্বাস দিয়া পাঠাইলেন, আগামী কল্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মানসিংহ শত্রুর অসংখ্য সেনানীদর্শনেও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ডশত্রু শোবেসিংহ হইতে সে আশা বিফল হইয়া গেল। হুলকার সসৈন্যে মানসিংহের নয় ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইতিমধ্যে শোবে ও জগৎসিংহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যদি আপনি এখন মানসিংহের পক্ষে যোগদান না করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে দশ লক্ষ টাকা অর্পণ করিব। আপনি কোটা নগরে থাকিয়াই এ টাকা প্রাপ্ত হইবেন।" অর্থগৃধ্নু মহারাষ্ট্রীয়ের অর্থলালসা বলবতী হইয়া উঠিল। দুরাত্মার হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া গেল। পাশবী স্বার্থপরতা-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ হুলকার দক্ষিণমুখে ফিরিয়া কোটার দিকে অগ্রসর হইলেন। মানের আশাভরসা অতলসাগরে নিমগ্ন হইল।

অতঃপর শোবে ও জগৎসিংহ মানরাজকে আক্রমণ করিলেন। রাজা মান তখন পিল্লোলিনামক প্রদেশে বিপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অচিরে উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইল। রাঠোররাজের সর্দ্দারগণ সর্ব্বাগ্রে মানকে অভিবাদন করিলেন। মান মনে করিলেন, তাঁহারা বুঝি স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়া জগৎসিংহের পক্ষে যোগদান করিলেন।

অবিলম্বেই কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। ধূমপটলে সমরাঙ্গন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যখন অন্ধকার বিদূরিত হইল, তখন মানসিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন, চারিজন ব্যতীত আর সমস্ত রাঠোরসর্দ্দারই ধনকুলের পক্ষে যোগদান করিয়াছেন। এমন কি, যে মৈরতীয়গণ রাজ্যের প্রধান অবলম্বন, রাঠোর সিংহাসনে যে কেহ থাকুক না কেন, আমরা প্রাণপণে সেই সিংহাসন রক্ষা করিব, এই প্রতিজ্ঞা যাঁহাদের হৃদয়ে চিরবদ্ধ ছিল, শতসহস্র কঠোর বিপদ্ সহ্য করিয়াও যাঁহারা সে প্রতিজ্ঞা হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হন নাই, আজি রাজ্যের এই অনিবার্য্য অধঃপতনকালে তাঁহারাও রাঠোরপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কেবল কুচামন, আহোব, ঝালোর ও নিমজ এই চারি স্থানের সর্দ্দারচতুষ্টয় তাঁহার পক্ষে অবস্থান করিতেছেন। ধন্য মানসিংহের সাহস ও নির্ভীকতা! তিনি সেই চারিটি সামন্তসেনা এবং বুন্দিরাজপ্রেরিত সৈন্যদল লইয়াই বিপক্ষের প্রচণ্ড বাহিনীর প্রতিকূলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহকারী সর্দ্দারগণ তাঁহাকে আশু যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করিলেন। ইহাতে মানসিংহের হৃদয় দারুণ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় নিজ অদৃষ্টকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিলেন এবং হস্তস্থ বন্দুক উদ্যত করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে কুচামনসর্দ্দার শিবনাথ তাঁহার হস্ত হইতে বন্দুকটি কাড়িয়া লইলেন। মানসিংহ একটি হস্তীর উপর আরূঢ় ছিলেন। বিশ্বনাথ তাঁহাকে সেই গজপৃষ্ঠ হইতে অবতারিত করিয়া নিজ অশ্ব প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে অবিলম্বে রণভূমি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন।

রণভূমি হইতে পলায়ন করা রাঠোররাজ মানসিংহের হৃদয়ে নিতান্ত অপমানকর বলিয়া জ্ঞান হইল। অলক্ষিতে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দুইটি অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইল। শিবনাথের দিকে ফিরিয়া তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন, "কাপুরুষ মানসিংহ সমরক্ষেত্রে কচ্ছাবহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আজি সর্ব্বপ্রথম রাঠোরনাম কলঙ্কিত করিল।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রণভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। সেই দিন প্রভাতে তিনি যে স্থলে স্বীয় সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহা পর্ব্বতশির নামক গিরিবর্ত্মের অর্দ্ধক্রোশ সম্মুখে থাকাতে তাঁহার পলায়নের বিশেষ সুবিধা হইল, মানসিংহ সেই কূটপর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে বিপক্ষেরা তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া পথ অবরোধ করিল। তথায় রাঠোরের সহকারী সৈন্যগণের অধিনায়ক উনিয়ারা-সর্দ্দার অনুগামী সেনাদলের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন। সেই অবসরে মানসিংহ নির্ব্বিঘ্নে মৈরতানগরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার ধারণা হইল, শত্রুরা আসিয়া নগরী অবরোধ করিলে তিনি অধিকদিন নগর রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই ধারণা হওয়াতে তিনি মৈরতা পরিত্যাগ করিয়া পিপারের অভ্যন্তর হইয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। এখন সেই চারিজনমাত্র বিশ্বস্ত সর্দ্দার ও কতিপয় সৈনিক তাঁহার অনুগামী ছিল। এ দিকে শত্রুগণ তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিল। তৎপরিত্যক্ত আটটি কামান সিন্ধিয়ার অন্যতম সেনাপতি বন্নরাও ইঙ্গলিয়ার হস্তগত হইল এবং তাম্বু, গজ ও সামান্য সামান্য তৈজসপত্রাদি মীর খাঁ করগত করিল। এ দিকে দেখিতে দেখিতে গিরিশির ও নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহ ভস্মে পরিণত হইয়া পড়িল। মানসিংহের শোচনীয় দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা রহিল না।

শোবেসিংহের দুরভিসন্ধি ক্রমে ক্রমে সুসিদ্ধ হইতে লাগিল। পলায়মান রাঠোরপতির পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে সেই সমবেত জয়পুরসেনা মৈরতানগরে উপস্থিত হইলে বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া জগৎসিংহ শোবেসিংহকে বলিলেন, "অদৃষ্টদেব আপনার প্রতি অনুকূল; এখন আপনারা সুপ্রসাদ

ভোগ করুন ; আমি আমার জীবনতোষিণী ভাগ্যধরী কৃষ্ণাকে পাইবার জন্য অনতিবিলম্বে উদয়পুরে যাত্রা করি।"

জগৎসিংহ আপন গন্তব্যপথ আশ্রয় করিলেন। এ দিকে শোবে মৈরতানগরে তিন দিন অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার প্রতিশোধ-তৃষ্ণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইল। আজি পোকর্ণ-সর্দ্দারের আনন্দের অবধি নাই ; কিন্তু সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও তিনি ধনকুলের কথা বিস্মৃত হন নাই। মানসিংহ জীবিত থাকিতে ধনকুল মারবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু সেই মানসিংহ এক্ষণে আত্মরক্ষার্থ দূরে পলায়ন করিয়াছেন। শোবেসিংহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, মান যোধপুরে আবার আশ্রয়গ্রহণ করিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, মানসিংহ রক্ষকহীন যোধপুরে আত্মরক্ষা অসম্ভব জানিয়া একবারে ঝালোরে প্রস্থান করিবেন। এই সংস্কারবশতঃ তিনি মৈরতাভূমে তিন দিন অতিবাহিত করিলেন। ফলতঃ তাঁহার ভাবিদর্শন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। ঝালোরে আশ্রয়গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই রাজা মানসিংহ তদভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি বীরশিলপুর নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছেন, ইত্যবসরে তাঁহার সমভিব্যাহারী দাওয়ান জ্ঞানমল সিঙ্গবী বলিলেন, "মহারাজ ! ঝালোর নিরাপদ্ নহে, ঝালোরে গমনও সময়-সাপেক্ষ, সে স্থান এখনও ষোল ক্রোশ দূরে ; কিন্তু যোধপুর নয় ক্রোশ ব্যবধান। বিশেষতঃ যোধপুর রাজধানী ; রাজধানীতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে আর কোথায় পারিবেন ? রাজধানীতে থাকিয়া আপন সিংহাসন রক্ষার উদ্যম করিলে কদাচ বিফলমনোরথ হইবেন না।" এই উপদেশ যুক্তিসঙ্গত বোধে রাজা মানসিংহ পূর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করিলেন এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই যোধপুর নেত্রপথে পতিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়াই তিনি আত্মরক্ষার্থ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পোকর্ণ-সর্দ্দার যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। তিনি মৈরতানগরে বিলম্ব না করিলে যোধগিরি-পাদপ্রস্থে গমন করিতে না করিতেই মানকে হস্তগত করিতে পারিতেন।

রাজা মানসিংহ আত্মরক্ষার্থ যোধপুরে গিয়া সেনাদল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হুন্দল খাঁর গোলান্দাজসেনা হইতে তিন সহস্র, কৈমদাসের অধীনস্থ বৈষ্ণবী সেনা হইতে এক সহস্র এবং চৌহান, ভট্ট ও ইয়েন্দ প্রভৃতি অপরাপর বিদেশীয় রাজপুতবৃন্দকে একত্র করিয়া আরও এক সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ তিনি পঞ্চসহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এই নবগঠিত সেনাদলের উপর তাঁহার জয়াশা সম্পূর্ণ নির্ভর করিল। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল, ইহাদের সাহায্যেই তিনি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়াতে তিনি হুন্দলের সেনাদল হইতে একাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ঝালোরদুর্গের দৃঢ়ীকরণ এবং সুন্দর সিন্ধুকূলবর্ত্তী অমরকোট নগরকে সৈন্ধবীগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক এক ভাগকে উক্ত দুই স্থলে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট সেনা যোধদুর্গে অবস্থিত থাকিল। বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণ অনুক্ষণ সজ্জিত থাকিল। মানসিংহ এখন সম্পূর্ণ নির্ভয়। তিনি নির্ভীকহৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে শোবেসিংহের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; আত্মীয়-বন্ধুর আচরণ দর্শনে তাহাদের উপর এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, আত্মীয়গণের মুখদর্শন করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। এই কারণেই তিনি বিদেশীয় সেনাদলের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। রাঠোর নামের প্রতি এরূপ ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, যে সর্দ্দারচতুষ্টয় সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে এত দিন অনুক্ষণ তাঁহার সহিত একত্র দিনপাত করিয়া আসিলেন, যাঁহারা ঘোর সঙ্কটেও তাহাকে প্রাণান্তে পরিত্যাগ করেন নাই, রাজা মানসিংহ বিপদ্

হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহাদিগেরও মুখদর্শন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিপক্ষেরা নগর আক্রমণ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমরা যোধরাও-য়ের পবিত্র কাজরাগুলিকে রক্ষা করি।" কিন্তু রাজা তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না; বরং প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা হয় ত তোমরা নগর রক্ষা করিতে পার।" যাঁহারা শত্রুদত্ত শতসহস্র প্রলোভনেও মুগ্ধ না হইয়া সমূহ ত্যাগস্বীকার করিয়াও প্রভুর প্রাণরক্ষার্থ অম্লানমুখে হৃদয়-শোণিত দান করিলেন, যাঁহাদের সাহায্য না পাইলে সেই গিরিশিরের কূটবর্ত্মে তাঁহার মস্তক বন্য জন্তুর পদতলে দলিত হইত, আজি সুযোগ পাইয়া সেই অসময়ের বন্ধুগণের প্রতি রাজা মানসিংহ এই-রূপ ঘৃণাব্যঞ্জক উত্তর প্রদান করিলেন। অকপট প্রভুপরায়ণতার প্রতিদান এই হইল। রাঠোরসর্দার-চতুষ্টয় মর্ম্মাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুপক্ষে যোগদান করিলেন।

আশু বিপক্ষকর্ত্তৃক যোধপুর অবরুদ্ধ হইল; নগরের রক্ষণোপযুক্ত তাদৃশ উপায় ছিল না, সুতরাং সামান্য উদ্‌যোগেই তাহা হস্তগত হইল। বিপক্ষেরা নগরীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। ক্রমে ক্রমে ফিলোদী ও অন্যান্য দুর্গ-নগরাদিও ধনকুলের অধিকৃত হইল। ফিলোদীর সর্দ্দার তিন মাস পর্য্যন্ত নিজদুর্গ রক্ষা করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু আর অধিক দিন পারিলেন না, ধনকুল তাহা অধিকার করিয়া বিকানীরপতির পুরস্কারস্বরূপ তৎকরে উহা প্রদান করিলেন। এই প্রকারে কেবল ফিলোদী ব্যতীত মারবারের সকল প্রদেশই অপ-নৃপতির করগত হইল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রাজধানী অধিকারের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে, যোধগড় তাঁহাদের অধিকৃত হইবে; তখন মানসিংহকে পদভ্রষ্ট করিয়া ধনকুলকে তাঁহারা মারবারের আধিপত্যে অভিষেক করিবেন। এই আশার মোহমন্ত্রে সমুৎসাহিত হইয়া তাঁহারা উৎফুল্লচিত্তে মানসিংহের অধঃপতন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবার অনেক লক্ষণও দৃষ্ট হইল। কিন্তু একটি অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সেই সকল উত্তম বিফল করিয়া ফেলিল; তাঁহারা মানসিংহের সংহারবাসনায় যে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, সে ষড়্‌যন্ত্র শেষে তাঁহাদের আপনাদিগের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

ক্রমাগত ছয়মাস যোধগড় অবরুদ্ধ। বহুদিনব্যাপী অবরোধেও রাজার হৃদয় বিন্দুমাত্র ভীত হইল না, বরং তিনি নূতন উৎসাহের সহিত নানারূপ রণকৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক অবরোধকারিগণের সমস্ত চেষ্টা ও উত্তম ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। ছয়মাস পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইত্যবসরে অপ-নৃপতির সেনানীনিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলকাঘাতে দুর্গের ঈশানকোণ ভগ্ন হইয়া গেল। বিপক্ষেরা সেই রন্ধ্রপথে আরোহণ করিবার উত্তম করিতে লাগিল; কিন্তু রন্ধ্র এত উচ্চে স্থিত যে, তাহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে চতুঃপঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ একটি দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ করিতে হইবে। শত্রুগণ সেই দুর্গম প্রদেশে আরোহণের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তাহাদের সেনাদল বেতনের জন্য বিষম গণ্ডগোল উত্থাপন করিল। অশ্বাদির আহারও নিঃশেষপ্রায়। ভাণ্ডারে যব, গোধূম বা তৃণাদি কিছুই নাই। অশ্বারোহিগণ স্ব স্ব অশ্বগুলিকে লইয়া দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী দূরদূরান্তরে জনপদ সমূহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে আমীর খাঁ নামক একজন কুটিলমতি মুসলমান রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার অনিষ্টসাধন করিতে লাগিল। অপ-নৃপতির সহকারী রাঠোরসর্দার ও সৈনিকগণকে প্রধান সবনদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেখিয়া সেই দুর্বৃত্ত মুসলমানসেনানী পল্লী, পিপার ও তিলার প্রভৃতি নগরের অন্তর্গত রাজকীয় ভূমিমণ্ডল আক্রমণপূর্ব্বক যুদ্ধপণ সংগ্রহ করিতে লাগিল। যে সকল সর্দ্দার অপ-নৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ভূমিবৃত্তি

লইয়া সেই দুর্ম্মতি কঠোররূপে পীড়ন করিতে লাগিল। সর্দ্দারগণ তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জগৎসিংহের নিকট আপনাদের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু সেই দুরাচারের দৌরাত্ম্যের প্রতিশোধ দিতে কেহই অগ্রসর হইলেন না। রাজপুতজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কুলাঙ্গার যবন রাজবারার ভাগ্যাকাশে এক প্রচণ্ড ধূমকেতুরূপে উদিত হইল।

অবরোধকারী সৈন্যগণ দিন দিন বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা প্রাপ্য বেতনের জন্য ক্রমে ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। জগৎসিংহ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, কি উপায়ে যে তাহাদের গণ্ডগোল নিবারিত হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বহুদিনব্যাপী সংগ্রামে তাঁহার কোষাগার শূন্যপ্রায়; তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু তদীয় রাজ্যেও নানারূপ অমঙ্গল দৃষ্ট হইতেছে, নিজের পরিণাম-চিন্তায় আকুল হইয়া তিনি মনে করিলেন, "কেনই বা পরের জন্য ইচ্ছা করিয়া এত অনর্থকে গৃহে ডাকিয়া আনি?—এ সকল অনর্থের মূল কে?—শোবেসিংহ।" জগৎসিংহ পোকর্ণ-সর্দ্দারের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "সৈন্যবৃন্দের গণ্ডগোল আপনাকেই নিবারণ করিতে হইবে।" শোবেসিংহ আপনার এবং নিজ অনুগত সর্দ্দারবৃন্দের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাহাতেও সৈন্যগণের বেতন পরিশোধ হইল না। অপরাপর সর্দ্দারের নিকটেও তাঁহাকে সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। যে চারিজন সর্দ্দার মানসিংহের প্রতি বিরক্ত হইয়া অপ-নৃপতির দলে যোগদান করিয়াছিলেন, শোবে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাদিগের নিকটও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা এক কপর্দ্দকও দিতে সম্মত হইলেন না; বরং অপ-নৃপতির পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক একবারে আমীর খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আমীর খাঁ এ যাবৎ ধনকুলের পক্ষেই ছিলেন, কিন্তু সর্দ্দার-চতুষ্টয়ের প্রলোভনে পড়িয়া সেই অর্থগৃধ্নু যবনসেনাপতি রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সর্দ্দারগণ তাঁহাকে বলিলেন যে, জয়পুর অরক্ষিত; এই সুযোগে যদি তন্নগর আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলে অতুল অর্থ ও মহার্ঘ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে। দুরাচার মুসলমানের অর্থলিপ্সা বাড়িয়া উঠিল। জয়পুর আক্রমণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি গোপনে আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জগৎসিংহের কর্ণে এই গুপ্তসংবাদ পৌঁছিল। কুচক্র বিফল করিবার জন্য সেনাপতি শিবলালের প্রতি তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন। শিবলাল আশু বীরবিক্রমে দুর্ব্বৃত্ত আমীর খাঁর উপর আপতিত হইয়া তাহাদের কুতর্ক ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক লুনীনদীর পরপারে বিতাড়িত করিলেন। যবনসেনানী অজমীরের তিন ক্রোশ দূরে উদয়সিংহের পৌত্র গোবিন্দসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দগড়ে পলায়ন করিল। জগৎসিংহ সে স্থানেও উপস্থিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া বিপক্ষগণ হরশৃঙ্গী নামক স্থলে পলায়ন করিল। গভীর নিশীথে শিবলাল সে স্থলেও উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে পলায়ন করিয়া দুরাচার মুসলমান-সেনানী জয়পুরের প্রান্তসীমা ফাগ্‌গি নামক স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন। বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া শিবলাল তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক সে স্থানেও উপস্থিত হইলেন এবং বিপক্ষগণকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জয়পুরে প্রত্যাগত হইলেন। ক্রূরমতি মুসলমানসেনানী আমীর খাঁর উপর পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া শিবলাল আত্মবিক্রমের সফলতায় স্বয়ং বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই আত্মপ্রসাদই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়াইল। আমীর খাঁকে মারবার হইতে বিতাড়িত করিয়া শিবলাল মনে করিয়াছিলেন যে, নিজ কর্ত্তব্য সাধিত হইল, কিন্তু তিনি একবার ভ্রমেও চিন্তা করেন নাই যে সেই চতুর মুসলমান তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ দমিত হয়

নাই। শিবলাল ফাগুগিগ্রামে স্বীয় সেনাকটক স্থাপন করিয়া যখন রাজধানীতে প্রতিগত হন, আমীর খাঁ তখন টঙ্কের নিকটবর্ত্তী পীপ্লু নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। জয়পুরসেনাপতির রাজধানী গমনবার্ত্তা শুনিয়া তিনি মহম্মদ শা ও রাজা বাহাদুরের প্রচণ্ড গোলন্দাজসেনার সাহায্য গ্রহণ করিলেন এবং "হাইদ্রাবাদ রেশেলা" নামক সেনাদলকে করগত করিয়া কুশাবহগণের শিবির আক্রমণ করিলেন। রেশেলার বিচ্ছেদ এবং আপনাদের সেনাপতির অনুপস্থিতি হেতু জয়পুরসেনা অনেক পরিমাণে নিঃসহায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা মহাবিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্রটি করিল না। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বীর হীরাসিংহের গোলন্দাজসেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল; কুশাবহসেনা পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন যবনসেনাপতি তাহাদিগের শিবির লুণ্ঠন করিলেন এবং বহুসংখ্যক অস্ত্র-শস্ত্র ও নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীও তাঁহার হস্তগত হইল।

অতঃপর রাঠোরসর্দ্দারেরা আমীর খাঁকে জয়পুর আক্রমণ করিতে বলিলেন। ঐ চারিজন সর্দ্দারের বাহুবলেই আমীর খাঁ সেই যুদ্ধে বিজয়বৈজয়ন্তী উত্তোলনে সমর্থ হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা আমীর খাঁর অভিপ্রেত হইল না। আশু জয়পুরের সিংহদ্বারে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের প্রচণ্ড রণভেরী বাজিয়া উঠিল। ভয়ে সমস্ত জয়পুর কাঁপিয়া উঠিল, নাগরিকবৃন্দ বিষম ভয়াকুল হইয়া আত্মরক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে নাগরিকগণ বিজয়ী আমীর খাঁকে মুক্তিপণ দিয়া প্রাণসঙ্কট বিপদ্ হইতে পরিত্রাণলাভ করিল।

কূটচক্রী শোবেসিংহ যে আশা করিয়া কূটজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সে আশা সফল হওয়া দূরে থাকুক, পরিশেষে আপনাকেই সেই জালে বিজড়িত হইতে হইল। যে দিন দুর্দ্ধর্ষ আমীর খাঁ তাঁহাদের মিত্রসেনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই রাঠোরসর্দ্দার-চতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হইলেন, সেই দিন তাঁহার ভাগ্যাকাশ গভীর জলদমালায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা গভীরতর হইয়া বজ্রাগ্নি উদ্গিরণপূর্ব্বক তাঁহারই সর্ব্বনাশসাধন করিল। যে সমস্ত নরপতি তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন, ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া তাঁহারা পরিশেষে তৎপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব সেনাদল লইয়া আপন আপন রাজ্যে প্রস্থিত হইলেন। বিকানীররাজ ও শাপুরের নৃপতি ইতিপূর্ব্বেই স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এই প্রকারে এক এক জন করিয়া প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গই ধনকুলের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। জগৎসিংহ অকস্মাৎ শ্রবণ করিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ উন্মূলিত হইয়াছে এবং কতিপয় রাঠোরসৈনিক লইয়া দুর্জ্জয় আমীর খাঁ জয়পুর অবরোধ করিয়াছে। এই সংবাদ জয়পুরের রাজজননী কর্ত্তৃক বহুদিন পূর্ব্বে জয়পুরের প্রধান সচিব রায়চাঁদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি চতুরচূড়ামণি শোবের প্রলোভনে পড়িয়া এ যাবৎ জগৎসিংহের নিকট প্রকাশ করেন নাই। সত্যকথা আর কত দিন লুক্কায়িত থাকিবে? রাজধানী অবরুদ্ধ হইল; দূতের পর দূত দ্রুতগামী অশ্বারোহণে জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। এক দিন, দুই দিন—তিন দিন গোপন করিতে করিতে পরিশেষে চতুর্থ দিনে সমস্ত সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। আত্মরক্ষার্থ ভীত হইয়া তিনি অবরোধ ত্যাগ করিলেন এবং যোধপুর-লব্ধ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি আপন সর্দ্দারগণের সহিত অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া মহারাষ্ট্রীয়-সেনাপতিগণকে নিকটে আহ্বান করিলেন। সাগ্রহে তাঁহাদিগকে তিনি কহিলেন, "আমাকে নিরাপদে আমার রাজধানীতে রাখিয়া আসুন, আমি আপনাদিগকে স্বদেশ হইতে লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিব।" আপনার পরিণাম ভাবিয়া তিনি এতদূর ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, যাহার তাহার নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি, যে দুরাচার পাঠান তাঁহার সেই দুরবস্থার প্রধানতম কারণ, তিনি

তাহাকেই নয় লক্ষ টাকা দিয়া বিনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যেন সে তাঁহার পলায়নের পথ অবরোধ না করে। বাস্তবিক, তখন তাঁগর দুরবস্থার অবধি ছিল না। তাঁহার বিরাট বাহিনীর অধিকাংশ বিপক্ষ-হস্তে পতিত; যে কতিপয় সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও পদে পদে দলিত, মথিত ও বিত্রাসিত; স্বরাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি যে স্থানে সেনাকটক স্থাপন করিয়াছেন, দুরন্ত শত্রুদল সেই স্থানেই তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে—তাঁহার পটগৃহগুলিও দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমে তাঁহার নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও বিপন্ন হইয়া উঠিল। তিনি যে গজোপরি আরূঢ় ছিলেন, তাহার মন্দগতিহেতু তিনি একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে ত্বরিতগতি চালিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কঠোর অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিলেন। দারুণ প্রহারে বিকট চীৎকার করিয়া সেই মহাকায় রণমাতঙ্গ সাধ্যমত দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইল। কিন্তু তাহাতেও জগৎসিংহের তৃপ্তি হইল না। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বহস্তে সেই গজরাজকে সংহার করিলেন।

যে চারিজন রাঠোরসর্দ্দার মানসিংহের অদৃষ্টস্রোত স্বহস্তে ফিরাইয়া দিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, জগৎসিংহ যোধপুরের লুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া যদি নিজ রাজ্যে উপস্থিত হন, তাহা হইলে রাঠোর-বংশের কলঙ্কের অবধি থাকিবে না। যে কুশাবহগণকে তাঁহারা হীনতেজা ও ক্ষীণবল বলিয়া ঘৃণা করেন, সেই কুশাবহগণ রাঠোরের অনন্ত কলঙ্কনিদর্শন লইয়া যে জয়পুরে প্রবিষ্ট হইবে, ইহা রাঠোর-সর্দ্দারগণের প্রাণে অসহ্য। অতএব যাহাতে তাহারা সেই সকল লুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া আপনাদের রাজধানীতে উপস্থিত হইতে না পারে, তাহাই করিবার জন্য সেই সর্দ্দারচতুষ্টয় নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত একত্র করিয়া মৈরতা নগরের দশ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী একটি গ্রামে জগৎসিংহের পথরোধপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। রাঠোরবংশের পূর্ব্বতম দেওয়ান ইন্দুরাজ সিঙ্গবী রাঠোরসেনার অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুশাবহগণকে আক্রমণ করিলেন। পথিমধ্যেই দুই পক্ষে ক্ষণকালের নিমিত্ত দারুণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। কচ্ছাবহগণ রাঠোরগণের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। অপহারকের অপহৃত চল্লিশটি কামান ও অন্যান্য দ্রব্যজাত বিজয়ী রাঠোরদিগের করে পতিত হইল। তাহারা সেই সকল পুনর্লব্ধ দ্রব্যসামগ্রী কুচামন দুর্গে স্থাপন করিল।

জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া রাঠোরেরা আমীর খাঁর উদরপূরণার্থ কিষণগড়ের অধিপতির নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিষণগড়াধীশ্বর যদিও রাঠোর, তথাপি তিনি বিগত বিপ্লবসময়ে সম্পূর্ণ নিঃসংস্রবভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা তিনি রাঠোরসর্দ্দারদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। আশু দুই লক্ষ মুদ্রা আমীর খাঁর করে প্রদত্ত হইল। কিষণগড়ের রাজদত্ত এই অতুল অর্থ পাইয়া অর্থলিপ্সু আমীর খাঁ প্রীত হইল এবং মানসিংহের স্বার্থসংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যোধপুরে উপস্থিত হইল। সেই সর্দ্দারচতুষ্টয় তাহার পূর্ব্বেই রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা মান তাঁহাদের গাঢ় রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া প্রফুল্লচিত্তে সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত ভূসম্পত্তি ফিরাইয়া দিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যোধপুরে আমীর খাঁর অভ্যর্থনা, শোবের দল উন্মূলনার্থ উদ্যম, রাজপুত-সর্দ্দারগণের হত্যা, অপনৃপতির পলায়ন, আমীর খাঁর নাগোর লুণ্ঠন, জয়পুরবিপ্লব, বিকানীর আক্রমণ, মন্ত্রী ইন্দুরাজ এবং পুরোহিত দেবনাথের হত্যা, মানের নিভৃত নিবাস, ব্রিটিসের সার্ব্বজনীন প্রভুত্ব, ইদরের রাজকুলে রাজ্যশাসনন্যাস. মানের কল্পিত উন্মাদরোগের প্রমাণ, যোধপুরে ব্রিটিস কর্ম্মচারীর আগমন, দাওয়ানী বিভাগের অখিচাঁদ, সলিমসিংহের মন্ত্রিত্ব, অজমীরে ব্রিটিস এজে-ণ্টের প্রতিগমন, রাজা মানের সভায় একজন চিরস্থায়ী এজেণ্টের অভিষেক, সামন্তসমিতির ভূসম্পত্তি ক্রোক, নিমজ আক্রমণ, আনরসিংহের প্রতি মানের কৃতঘ্নতা, ব্রিটিস গবর্ণ-মেণ্টের নিকট নির্ব্বাসিত সর্দ্দার-গণের আবেদন।

ধনকুলের ভাগ্যগগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দুর্ব্বৃত্ত যবনসেনানী যোধপুরে আগমন করিলে রাজা মান কর্ত্তৃক তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইলেন। তাঁহার অবস্থিতির জন্য দুর্গমধ্যে একটি প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল; মান তাঁহাকে কতকগুলি মহামূল্য উপহার প্রদান করিলেন। কেবল ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, আমীর খাঁকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি আশ্বাস-বাক্য কহিলেন, "যদি আপনি শোবেকে প্রতিফল দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনাকে ভবিষ্যতে আমি আরও পুরস্কার প্রদান করিব।" আমীর খাঁ তাঁহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, শোবেসিংহের দমন তিনি যেরূপে পারেন করিবেন। রাজা মান তখন যারপরনাই প্রীত হইলেন। পাঠান শোবেসিংহের বিনাশোপযোগী যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিল, তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন বিবেচনায় মান তাঁহাকে বন্ধুভাবে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তখনই পরস্পরের মধ্যে উষ্ণীষপরিবর্ত্তন হইল এবং আমীর খাঁ আপন খতগুলি পরিশোধার্থ রাঠোরনৃপতিসমীপে অগ্রিমস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

আমীর খাঁর সহিত মানের বন্ধুত্ব হইল, এ দিকে শোবেসিংহের আশালতাও সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল। তিনি আমীর খাঁকে জড়িত করিবার ইচ্ছায় যে কৌশলজাল বিস্তার করিতেছিলেন, শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিতে তাহা ছিন্ন হইতে লাগিল। যোধপুর অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পোকর্ণ সর্দ্দার অপ-নৃপতিকে নাগোরদুর্গে লইয়া গেলেন। তথায় গমনপূর্ব্বক তিনি ভবিষ্যৎ সাফ-ল্যের উপায় কল্পনা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে একদিন আমীর খাঁর নিকট হইতে একটি দূত আসিয়া নিবেদন করিল, "আমীর খাঁ নাগোরের পাঁচ ক্রোশ দূরে মুন্ডিয়াবার নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে-ছেন, সম্প্রতি তিনি জানাইতেছেন যে, যদি আপনারা তাঁহাকে নাগোরের পীর টর্কিনের মসজীদে ঈশ্বরোপাসনা করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি অনুগৃহীত হন।" শোবেসিংহ যবনসেনানীর অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন। আমীর খাঁ কতিপয় অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নাগোরে প্রবেশ করিলেন এবং

ভজনাদি শেষ করিয়া শোবেসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কথা-প্রসঙ্গে আমীর খাঁ বিদায়কালে কল্পিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি প্রতারিত হইয়াছি, রাজা মান যে আমাকে এ প্রকার সামান্য পুরস্কার দিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। আগে বুঝিতে পারিলে আমার সেনাদলকে উপযুক্ত লোকের সাহায্যে নিয়োগ করিতে পারিতাম।" শোবের লালসাবৃদ্ধি হইল। তিনি সাগ্রহে খাঁকে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কিরূপ পণের অভিলাষী, বলুন, আমি প্রদানে স্বীকৃত আছি এবং আপনার সম্মুখে বলিতেছি যে, যে দিন আপনি ধনকুলকে যোধপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সেই দিন আপনাকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিব।" খাঁ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন এবং কোরাণের শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, এমন কি, পাছে তাঁহার প্রতি শোবের সন্দেহ জন্মে, এই আশঙ্কায় তাঁহার সহিত উষ্ণীষপরিবর্ত্তনও করিলেন। অতঃপর পোকর্ণ সর্দ্দার তাঁহাকে ধনকুলের সমীপে লইয়া গেলেন। তথায় নানাবিধ উপহার পাইয়া পাঠানবীরকেশরী সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম। আমাকে স্মরণ রাখিবেন।" তাঁহার এই মধুরবাণী শুনিয়া ধনকুলের হৃদয় বিমুগ্ধ হইল, উল্লাসে তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনোমধ্যে আশার নানারূপ মোহিনী মূর্ত্তি উদিত লাগিল। অনন্তর বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক হতভাগ্য ধনকুলের সর্ব্বনাশ কল্পনা করিতে করিতে দুর্বৃত্ত পাঠান সেনাপতি আপন স্কন্ধাবারে প্রতিগমন করিলেন। এই প্রকারে ১৮৬৪ সংবতের ১৮ই চৈত্র অতীত হইল।

পরদিন প্রভাতে আমীর খাঁ শোবে ও ধনকুলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ধনকুল ও শোবে প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও প্রায় পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে মুন্দিয়াবারে উপস্থিত হইলেন। দুর্বৃত্ত যবন যে কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিবে, স্বপ্নেও তাঁহারা তাহা চিন্তা করেন নাই। উৎসবে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবে বলিয়াই তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধমনে তদীয় শিবিরে গমন করিলেন। পাঠান শিবিরের মধ্যে একটি বিস্তৃত পটগৃহ স্থাপিত। পটগৃহের চতুর্দ্দিকে কামান সজ্জিত; কামানগুলি বারুদ ও গোলায় পরিপূর্ণ। পবিত্র ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের এই প্রকার জঘন্য প্রতিদান করিবার সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া দুরাত্মা যবন আপন পটগৃহের বহির্দ্বারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে শোবেসিংহ সদলে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমীর খাঁ সহাস্যমুখে করপ্রসারণপূর্ব্বক সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শিষ্টাচার দর্শনে ধনকুল ও পোকর্ণ-সর্দ্দার পরম প্রীতিলাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না যে, সেই আপাত-মধুর অভ্যর্থনার মধ্যে কালকূট-মিশ্রিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা সংগুপ্ত রহিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক যবন তাঁহাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুনর্ব্বার ধনকুল ও শোবেসিংহের সহিত উষ্ণীষবিনিময় করিলেন।

অনন্তর সুসজ্জিত সভামণ্ডলীতে সকলে উপবেশন করিলেন। ধনকুল সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন। দুর্বৃত্ত যবন তাহার নিকটে উপবিষ্ট। দেখিতে দেখিতে পরমসুন্দরী কোকিলকণ্ঠী নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। তাহাদের কলকণ্ঠ-বিনির্গত মনোহর সঙ্গীতধ্বনিতে সকলেই মোহিত হইয়া পুনঃপুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। এমন সময় আমীর খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া বিনয়গর্ভবাক্যে মুহূর্ত্তকালের জন্য নিজ অতিথিদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত যে সকলের সর্ব্বনাশসাধন করিবার জন্য সেই সময়ে সভামঞ্চ হইতে বহির্গত হইলেন, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তখন সকলেরই চিত্ত উৎসবরঙ্গে

নিবিষ্ট। ক্ষণকাল পরেই বাস্তকরগণ দাগ্‌গা দাগ্‌গা রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সেই পটগৃহ সহসা উৎখাত অট্টালিকার ন্যায় সমবেত রাজপুতমণ্ডলীর মস্তকোপরি পতিত হইল, দেখিতে দেখিতে কামানাবলী অনন্ত গোলকপুঞ্জ উদ্গার করিয়া ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল, ধূমে ধূমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। সেই নিবিড় ধূমপুঞ্জের মধ্যে ছিন্ন পটগৃহের বিস্তৃত ঘনবসনে জড়িত হইয়া নিরীহ বিশ্বস্ত-হৃদয় রাজপুতগণ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। দ্বাচত্বারিংশ সর্দ্দার এইরূপে দুরাত্মার কুহকে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। শোবে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সর্দ্দারদিগের ছিন্নমুণ্ড রাজা মানের পদতলে উপহার প্রদত্ত হইল। তাঁহাদের অনুচরেরা প্রাণরক্ষার্থ দূরে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু যবন-কুলাঙ্গারের কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। দুর্বৃত্ত সেনাপতি তাহাদিগের অনুসরণপূর্ব্বক তাহাদিগকেও সদলে নিপাতিত করিলেন। কেবল দুর্ভাগ্য অপ-নৃপতি ও কতিপয় সৈনিক আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ধনকুল পলায়ন করিয়া নাগোরে উপস্থিত হন; কিন্তু সে স্থলও নিরাপদ নহে বিবেচনায় তন্নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যস্থানে আশ্রয়গ্রহণ করেন। আমীর খাঁ তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক নাগোরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য সমস্ত ধনরত্ন ও দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিলেন। এই প্রকারে ধনকুলের সমস্ত সামগ্রী, এমন কি, রাজা ভক্তসিংহের অতুল সম্পত্তি, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও তৎসংবলিত তিন শত কামান করগত করিয়া দুর্জ্জয় পাঠান আপনার অধিকারভুক্ত শম্বর ও অন্যান্য দুর্গে প্রেরণ করিলেন।

অতিথির উপযুক্ত আতিথ্যবিধান করিয়া যবনাধম আমীর খাঁ যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। রাজা মান তৎপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া দশ লক্ষ টাকা এবং মুন্দিয়াবার ও কুচিলাবাস নামক দুইটি নগর পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিলেন। ঐ দুইটি নগরই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, বার্ষিক আয় প্রায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ভরণপোষণার্থ প্রত্যহ একশত টাকা নির্দ্ধারিত হইল। এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাজা মান এক প্রকার নিষ্কণ্টক হইলেন, তাঁহার শত্রু শোবেসিংহ স্বীয় দলবলসহ নিহত হইলেন; তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন-বিপদ্ যেন সেই সঙ্গে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল; কিন্তু যে পৈশাচিকবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি শত্রুনিপাত করিলেন, তাহাতে তাঁহার আপনার ও স্বদেশের মস্তকে অনন্ত অমঙ্গল পতিত হইল। শোবের মরণে তিনি আপাততঃ নিষ্কণ্টক হইলেন বটে, কিন্তু যে ভীষণ কণ্টক ভাণবন্ধুত্বের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারিলেন না। হীনতম জঘন্য উপায়ে পোকর্ণ-সর্দ্দার ও তদীয় দলবলকে নিপাত করিয়া তিনি তাঁহার সহকারী অন্যান্য রাজগণকে শাস্তিদানে সঙ্কল্প করিলেন। আশু আমীর খাঁ সদলে জয়পুর নগরে আপতিত হইলেন। অম্বরপতি তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার হাস্যময় বিশালরাজ্য নিষ্ঠুর যবনের অত্যাচারে আশু একটি বীভৎস মরুশ্মশানে পরিণত হইল। মানসিংহ তখন বিকানীরপতির শোণিতে নিজ প্রচণ্ড প্রতিশোধতৃষার শান্তি করিবার জন্য তাঁহার প্রতিকূলে দ্বাদশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। পঁয়ত্রিশটি কামান লইয়া আমীর খাঁ ও হুন্দন খাঁর কতিপয় গোলন্দাজসৈনিকও সেই বাহিনীর সহিত যোগদান করিল। ইন্দুরাজ সিঙ্গবী এই প্রচণ্ড সেনার অধিনেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক বিকানীরের প্রতিকূলে অগ্রসর হইলেন। বিকানীররাজ সেই প্রচণ্ড আক্রমণের সংবাদ পাইয়া রাঠোরসেনার অনুরূপ এক সেনাদল সহ বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। বিকানীররাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী বাপ্রিনামক স্থানে উভয়পক্ষের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর বিকানীরপক্ষে দুই শত সৈনিক ধ্বংস হইলে নৃপতি প্রাণভয়ে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু বিজয়ী ইন্দুপতি তাঁহার

পশ্চাদনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন না; অনুগমন করিতে করিতে তিনি গুজনৈরে উপস্থিত হইলেন; তখন বিকানীরপতি আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া বিপক্ষের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আশু সন্ধির প্রতিজ্ঞাদিও স্থিরীকৃত হইল। বিকানীররাজ যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা পণসহ ফিলোদীনগর শক্রকরে প্রদান করিলেন।

শোবেসিংহের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মারবারের সৌভাগ্য-রবিও অস্তমিত হইল। যে রাজ্য এক সময়ে শিবজীর সাধনার ধন ছিল, যে রাজ্য যোধরাও, যশোবন্ত ও অজিতসিংহের লীলাভূমি বলিয়া পরিচিত, সেই পবিত্র মারবারভূমি আজি যবনকুলাঙ্গার পাঠানের বিলাসভূমি হইল। আমীর আজি সমগ্র মরুস্থলীর একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা; কোটি কোটি রাঠোরের ভাগ্যসূত্র আজি তাহার অপবিত্র হস্তে ধৃত হইল। রাজা মানসিংহ রাঠোরসিংহাসনে অধিরূঢ় বটে, কিন্তু তিনি সেই দুরন্ত যবনের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ। তাঁহার এমন ক্ষমতা নাই, এমন বিক্রম নাই, এমন সাহস নাই যে, তিনি সেই দুর্জ্জয় পাঠানের প্রচণ্ড প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মীর খাঁ একদল সেনার সহিত গাফুর খাঁকে নাগোরে সংস্থাপনপূর্ব্বক মৈরতার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত সম্পত্তি আপন অনুচরদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে নওয়া ও শম্বরের লবণহ্রদ দুইটিও তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, এখন সেই সরোবর দুটি দৃঢ়রক্ষিত করিবার ইচ্ছায় নওয়া-দুর্গে একটি শিবির স্থাপন করিলেন। সেই সময়ে ইন্দুরাজ ও প্রধান পুরোহিত দেবনাথ ব্যতীত আর কেহই মানের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। এই দুইজনের প্রতি মারবারের অধিবাসিবৃন্দ একান্ত বিরক্ত হইয়াছিল; কারণ, তাহারা জানিত যে, ইন্দুরাজ ও দেবনাথই মারবারের সেই শোচনীয় দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। তাহাদেরই প্ররোচনাতে বিদেশীয় বিপক্ষেরা মারবারে প্রবেশপূর্ব্বক দেশকে একান্ত নিপীড়িত করিতেছে। সম্প্রতি সেই কুচক্রী ব্যক্তিদ্বয়ই রাঠোরপতির মন্ত্রণাদাতা। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? রাঠোর-সর্দ্দারবৃন্দ প্রতিমুহূর্ত্তে ইন্দুরাজ ও দেবনাথের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহারা উহাদের নিপাতসাধনার্থ এতদূর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে দুরাচার আমীর খাঁর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যদি আপনি দেবনাথ ও ইন্দুরাজকে সংহার করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে সাত লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।" অর্থপিশাচ আমীর খাঁর অর্থলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞাপালনের উপযুক্ত উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। অতঃপর আমীর খাঁর অধীনস্থ কতিপয় পাঠানসেনা প্রাপ্য বেতনের জন্য ইন্দুনৃপতির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। বিবাদ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল এবং সেই শোণিতাপিপাসু দুর্ব্বৃত্ত পাঠানেরা হতভাগ্য প্রধান মন্ত্রীকে সংহার করিল।

ইন্দুরাজ নিহত হইল। তৎপরে দেবনাথকেও তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। বলিতে গেলে পুরোহিত দেবনাথ মানসিংহের অদৃষ্টের প্রধান নেতা ছিলেন। ভীমসিংহের হত্যা হইতে তাঁহার নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি রাজা মানকে যে মোহিনী মায়ায় বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেম, মানসিংহ তাহা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। পুরোহিতের প্রতি মানের দেববৎ ভক্তি ছিল। যে দিন দেবনাথ স্বহস্তে বিষপ্রয়োগে ভীমসিংহকে বধ করিয়া স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী করিলেন, সেই দিনেই তিনি মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন, সেই দিন রাজা মান তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আনন্দগদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "প্রভো! আপনি আমাকে যে ঋণজালে আবদ্ধ করিলেন, সমস্ত অমরাবতী দিলেও তাহার পরিশোধ হয় না।" এমন কি, রাজা দেবনাথকে নিজ

সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে উপবেশন করাইতে সম্মত হইলেন। সেই দিন মারবারের প্রত্যেক জনপদেই তাঁহাকে কিছু কিছু ভূসম্পত্তি প্রদান করা হইল। এই প্রকারে দেবনাথ এত বিপুল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহার তুলনায় প্রধানতম সর্দ্দারগণের ভূমিসম্পত্তি অতি তুচ্ছ। সেই ভূমির আয় মারবাররাজ্যের আয়ের দশমাংশ হইয়া দাঁড়াইল। এতদ্ব্যতীত দেবনাথ বিস্তর ধন রত্নও প্রাপ্ত হইলেন। সেই সকল অর্থের সাহায্যে তিনি চতুরশীতি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক মন্দিরের নিকট এক একটি মঠ নির্ম্মাণ করিলেন। তথায় অগণ্য শিষ্য বিনা ব্যয়ে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া মনোমত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবনাথ পরম পণ্ডিত, চতুর ও কার্য্যদক্ষ। নিজ পাণ্ডিত্যের বলে তিনি সকলের নিকটেই পূজনীয় হইলেন। কিন্তু সে সম্মান তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। মানসিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার পরেই তিনি ইন্দুরাজের সহিত একত্র হইয়া নানারূপ ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং সকলের উপর অযথা প্রভুত্ব পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই সকলে তৎপ্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত দুরাচরণই দেবনাথের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। প্রসিদ্ধি আছে, দেবনাথের অন্যায় প্রভুতায় রাজা মানসিংহও অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিনাশার্থ গোপনে সম্মতিদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে রাজা মানসিংহ শোকপ্রকাশ করিয়া নিভৃত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেইরূপ ভাব দেখিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার চিত্তবিকার ঘটিয়াছে। তিনি নিয়ত নিভৃতে থাকিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, কাহারও মুখ দর্শন করিতেন না।

এই প্রকারে কিছুদিন অতীত হইল। রাজার অমনোযোগিতাবশতঃ ক্রমে রাজমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাজাসনে রাজা নাই, মন্ত্রণাগারে মন্ত্রী নাই, রাজ্যের প্রধান পুরোহিত নিহত, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সমস্ত কার্য্যই এক প্রকার বন্ধ হইয়া পড়িল। তখন রাঠোর সর্দ্দারগণ রাজা মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়গর্ভবাক্যে কহিলেন, "রাজন্! রাজ্যভারবহন যদি আপনার অনভিমত হয়, তবে আপনার পুত্র ছত্রসিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করুন; নতুবা রাজ্য অরাজক হইবার উপক্রম হইয়াছে।" রাজা তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন এবং পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ভালতটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন; কিন্তু যৌবনের সহচরী বিলাসবাসনা বশবর্তী হইয়া যুবরাজকে বিপথে লইয়া গেল। তিনি রাজকার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারিলেন না। ক্রমে নানারূপ অবশ্য প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধন করিতে গিয়া অকালে তাঁহাকে লীলাসংবরণ করিতে হইল। ছত্রসিংহের মরণ-সম্বন্ধে দুই প্রকার জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, তিনি বিলাসিতায় আসক্ত হইয়া সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কোন সর্দ্দার-কন্যার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই উৎপীড়িতা কুমারীর পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিপাত করিয়াছিলেন।

পুত্রের অকাল মৃত্যুতে রাজা মানসিংহের হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল। সংসারের প্রতি তিনি একেবারেই বীতরাগ হইয়া পড়িলেন; সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল। যে কেহ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়, তাহাকেই তিনি অবিশ্বাসী বলিয়া ঘৃণা করিতেন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেইদিকেই বোধ হইত যেন, সকলেই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। এমন কি, নিজ মহিষীর প্রতিও তাঁহার বিশ্বাস রহিল না, তাঁহার মুখদর্শনেও তিনি ঘৃণাবোধ করিতে লাগিলেন। মহিষী খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিলে তিনি তাহা ভক্ষণ করিতেন না। সেই বিশাল

রাজপরিবারের মধ্যে কেবল একটিমাত্র লোক তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র ছিল। কে সেই বিশ্বাসের পাত্র ?—পাচক ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ স্বহস্তে পাক করিয়া অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ ভোজনপাত্র নিজ উষ্ণীষের ভিতর স্থাপনপূর্ব্বক বহন করিত। তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য রাজা স্পর্শও করিতেন না। ক্ষৌরকারের প্রতিও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তিনি কেশ-শ্মশ্রু মোচন করিতেন না; স্নান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তৈল ও সংস্কারবিরহে মস্তকের কেশপাশ রুক্ষ ও জটা-বদ্ধ হইয়া পড়িল, শ্মশ্রুসমূহ তাম্রবর্ণ ধারণ করিল। পরিশেষে লোকে তাঁহাকে প্রকৃত উন্মাদরোগী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। রাজার এইরূপ শোচনীয় অবস্থাদর্শনে তদীয় সামন্তগণ রাজ্যরক্ষা ও শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। রাজা মান বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কাহা-রও কোন কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার মন্ত্রী বা সর্দ্দারগণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে উপস্থিত হইলে তিনি নিতান্ত অমনোযোগীর ন্যায় তাঁহাদের প্রস্তাবে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন, কথ-নও হাসিয়া উঠিতেন, কখনও বা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন,কখনও বা আপন মনে নানাপ্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেন। এই উন্মাদ প্রকৃত কি কল্পিত,কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। কেহ কেহ অনুমান করিলেন, তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য তদীয় শত্রুকুল যে কূটজাল বিস্তার করিয়া-ছিল, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই তিনি ভাণ করিয়া উন্মাদ সাজিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহ ইন্দ্ররাজের হত্যায় গোপনে সংলিপ্ত ছিলেন; কিন্তু তৎসহ দেবনাথকে নিহত হইতে দেখিয়া শোকে, দুঃখে ও বিষম অনুশোচনায় ব্যাকুল হইয়া প্রকৃত উন্মাদরোগী হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। ফলতঃ তিনি দুরাচার আমীর খাঁর দুর্নীতির যেরূপ প্রশ্রয় দিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত ঘটনার পরে যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রায় সকলেরই সন্দেহ জন্মিয়া-ছিল। যাহা হউক, কল্পিত হউক বা প্রকৃত হউক, রাজা মান ঐ প্রকার অবস্থায় বহুদিন অতি-বাহিত করিলেন। তখন শোবেসিংহের পুত্র সালমসিংহ সেই সামন্ততন্ত্রের শিরোভাগে থাকিয়া রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঘটনাস্রোতে শ্বেতদ্বীপ হইতে কতিপয় ইংরাজ আসিয়া যে দিন মারবারের মধ্যস্থরূপে দণ্ডায়মান হইলেন, সেই দিন মার-বারের শাসননীতি অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিল।

বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক ইংরাজ বাহাদুর ভারতের দগ্ধহৃদয়ে শান্তিসলিল সেচন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সে সময় ভারতের মধ্যপ্রদেশসমূহে অরাজকতা উপস্থিত; সমগ্র ভারত দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের প্রবল উৎপীড়নে প্রপীড়িত, প্রজাপুঞ্জের ধনসম্পত্তি অপহৃত, দুর্ব্বলের পক্ষে সম্মান-সম্ভ্রম আকাশকুসুমে পরিণত। যাহার বল আছে, সেই প্রভু; যে দুর্ব্বল, সে অতুল ধনের অধিপতি হইলেও ক্রীতদাসবৎ পদদলিত। বস্তুতঃ সে সময় বলবিক্রমই অদৃষ্টের একমাত্র নিয়ামক। ইহার উপর আবার রাজবারার সর্ব্বাঙ্গ অন্তর্বিদ্রোহী ভীষণ দাবাগ্নিতে দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছিল। ভারতের এই সার্ব্বজনীন শোচনীয় দুর্দ্দশার সময় ব্রিটিসসিংহ নিপীড়িত রাজপুত-জাতিকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিলেন এবং যাহাতে তাঁহারা লুণ্ঠনপ্রিয় রাজন্যগণের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সমগ্র ভারতে শান্তিস্থাপনে ব্রিটনের সাহায্য করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। যথাসময়ে সেই আমন্ত্রণপত্র মারবারে উপস্থিত হইল। অতঃপর রাঠোর-সর্দ্দারেরা দিল্লীতে দূত পাঠাইয়া দিলেন। তখন বালক ছত্রসিংহ রাঠোরসিংহাসনে অধিরূঢ়। সর্দ্দারগণ ভাবিয়াছিলেন, সেই শিশু রাজাকে সিংহাসনে রাখিয়া স্বেচ্ছামত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন, কিন্তু ব্রিটিসশাসনের সহিত সেই সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে না হইতেই বিলাসপ্রিয় ছত্রসিংহ ইহলোক

হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে রাঠোরসর্দ্দারগণ একান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, পাছে মানসিংহ শাসনদণ্ড পুনরায় গ্রহণ করেন। এই ভয় হইতে পরিত্রাণলাভের প্রত্যাশায় তাঁহারা ইদরের রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্রকে মারবারের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইদরের রাজার সেই একমাত্র পুত্র, রাঠোরসর্দ্দারগণের অনুরোধ প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য না করিয়া তিনি বলিলেন, মারবারের সমস্ত সর্দ্দার যদি একমত হইয়া তাঁহার পুত্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তিনি পুত্রকে প্রদান করিতে সম্মত আছেন। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী রাজপুতগণের মধ্যে ঐক্যমত সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সকলের সম্মতি গ্রহণ করিতে পারিলেন না; সুতরাং ইদররাজ নিজ পুত্রকেও কিছুতেই প্রদান করিলেন না। রাজ্য সম্পূর্ণ অরাজক হইয়া উঠিল, অগত্যা রাজা মানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত না করিলে রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর নাই। এই ভাবিয়া সর্দ্দারগণ তৎসমীপে মারবাররাজ্যের শোচনীয় দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত এবং ইংরাজগণের সন্ধিবন্ধনের কথা উল্লেখ করিয়া বিনয়গর্ভবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি পুনরায় রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করুন, নচেৎ রাজ্যের দুর্দ্দশার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না।" রাজা উন্মত্তবৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন, পর মুহূর্ত্তেই সর্দ্দারগণের প্রতি বিকট ভ্রূকুটিবিক্ষেপপূর্ব্বক নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। কিন্তু সর্দ্দারবৃন্দ সহজে নিরস্ত হইলেন না; তাঁহারা যতই পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন, রাজাও তত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বহুক্ষণ চেষ্টার পর মানসিংহ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি তখন 'রাজ্যের সকল অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছি" বলিয়া স্বীকার করিলে সর্দ্দারবৃন্দ তাঁহাকে সেই নির্জ্জন কারাবাস পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর রাজা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজকার্য্য পুনর্গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন এবং ব্রিটিসশাসনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া সন্ধিপত্রের প্রতিজ্ঞাগুলি পাঠ করিতে চাহিলেন। তখনই তাঁহার সম্মুখে সন্ধিপত্র আনীত হইল। সন্ধিপত্রে এইরূপ লিখিত ছিল;—

১ম। মাননীয় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মহারাজা মানসিংহ এবং তদীয় উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণের চিরদিনের জন্য বন্ধুত্ব, সমবেদনা ও একীভাব সংবদ্ধ থাকিবে। এক পক্ষের শত্রু-মিত্র অপরপক্ষের শত্রু ও মিত্র বলিয়া গণনীয় হইবে।

২য়। যোধপুর-নৃপতিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইলেন।

৩য়। মহারাজ মানসিংহ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিয়া অধস্তন সহযোগিরূপে কার্য্য করিবেন এবং অন্য কোন রাজা বা রাজ্যের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না।

৪র্থ। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আদেশ না লইয়া এবং তাঁহাকে না জানাইয়া মহারাজ বা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ কোন রাজা বা রাজ্যের সহিত কোন সন্ধিপ্রস্তাব বা সন্ধিবন্ধন করিতে পারিবেন না। তবে তিনি তাঁহার বন্ধু ও জ্ঞাতিকুটুম্বগণের সহিত পত্রাদি দ্বারা যে প্রকার আলাপসম্ভাষণ করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন আপত্তি রহিল না।

৫ম। মহারাজ স্বয়ং বা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ কাহারও উৎপীড়ন করিতে পারিবেন না। যদি ঘটনাচক্রে কাহারও সহিত তাঁহার কোন বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে ব্রিটিসগবর্ণমেণ্ট বিবাদের মীমাংসা ও বিচারের ভার গ্রহণ করিবেন।

৬ষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত যোধপুররাজ্য সিন্ধিয়াকে যে কর দিয়া আসিয়াছে, (তাহার একটি স্বতন্ত্র

তালিকা এতৎসহ সন্নিবিষ্ট হইল) তাহা এখন হইতে চিরদিনের জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইবে। এই কর সম্বন্ধে সিন্ধিয়ার সহিত যোধপুরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে।

৭ম। মহারাজ যখন প্রকাশ করিলেন যে, একমাত্র সিন্ধিয়া ভিন্ন অন্য কাহাকেও যোধপুর কর দিত না এবং স্বীকার করিলেন যে, উক্ত কর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইবে, তখন যদি সিন্ধিয়া বা অন্য কোন ব্যক্তি সেই করগ্রহণে দাবী করে, তাহা হইলে ব্রিটিসগবর্ণমেণ্ট সেই দাবীর উত্তর প্রদান করিবেন।

৮ম। আবশ্যক হইলে যোধপুররাজ ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের সেবার্থ পঞ্চদশ শত অশ্বারোহী সৈন্য সংযোজনা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে দেশরক্ষার উপযুক্ত সেনাবল স্থাপনপূর্ব্বক আর সমস্ত সেনা ব্রিটিসসেনার সহিত একত্র হইবে।

৯ম। মহারাজ বা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ স্বদেশের একমাত্র শাসনকর্ত্তা থাকিবেন, তাঁহার রাজ্যে ব্রিটিসশাসন প্রচলিত হইবে না।

১০ম। দশ প্রতিজ্ঞা-সংবলিত এই সন্ধিপত্রখানি দিল্লী নগরীতে এবং মেঃ চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ, ব্যাস বিষণরাম ও ব্যাস অভয়রাম কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহর দ্বারা অঙ্কিত হইল। অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে মহামান্য মহানুভব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর এবং রাজরাজেশ্বর মানসিংহ বাহাদুর ও যুবরাজ মহারাজকুমার ছত্রসিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের ষষ্ঠ দিবসে দিল্লী নগরীতে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল।

রাজা মানসিংহ নিবিষ্টচিত্তে সন্ধিপত্রখানি সমস্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার মনঃপূত হইল না। অষ্টম প্রতিজ্ঞাটি তাঁহার একান্ত অসন্তোষকর। তিনি দেখিলেন যে, তাহাতে বিবাদের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। যাহা হউক, স্বরাজ্যকে আপাততঃ অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিবার অন্য উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা তিনি সেই সন্ধিপত্র স্বীকার করিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীনগরে ব্যাস বিষণনামা জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেই দিন মুষ্টিমেয় ইংরাজের করে কোটি কোটি রাঠোরের ভাগ্যচক্র সমর্পিত হইল; সেই দিন বিধাতা অলক্ষিতে থাকিয়া মারবারের পদে আর একটি কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাইয়া দিলেন। যে রাঠোর-রাজগণ এত দিন মোগলের অধীনতা-ক্লেশ সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহাদের সেই প্রাচীন কলঙ্কের উপর আবার নব কলঙ্করেখা অঙ্কিত হইতে লাগিল। সন্ধিবন্ধন শেষ হইলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উইল্ডার নামক একজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী মারবারে উপস্থিত হইয়া রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শন করিলেন। রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু রাঠোরের শাসননীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; রাজসভাও প্রাচীন সৌন্দর্য্যে সুশোভিত ছিল। ইহার কারণ এই যে, রাঠোরমাত্রেই যোধরাওয়ের সিংহাসনের সম্মান এবং শাসননীতি ও বিধিপ্রণালীকে অব্যাহত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জ নৃপতিকে অযোগ্য জানিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছে সত্য, কিন্তু কেহই প্রাণান্তে সিংহাসনের অবমাননা করিতে সাহসী হয় নাই। সুতরাং প্রাচীন প্রথা ও আচারব্যবহারাদি সম্যক্ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। সেই মহীপতি যোধরাও এবং যশোবন্তসিংহের রাজত্বকালে রাজসরকারে যতগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, যতপ্রকার পর্ব্ব ও উৎসবাদি তৎকালে অনুষ্ঠিত হইত, আজি মারবারের শোচনীয় দুর্দ্দশাতেও ততগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন এবং সেইরূপ আচারব্যবহার যথানিয়মে আচরিত হইয়া আসিতেছে।

"যখন ইংরাজদূত মারবারের অবস্থা দেখিতে উপস্থিত হন, তখন অখিচাঁদ দেওয়ান এবং সলিম-সিংহ সামন্তসমিতির প্রতিনিধিরূপে অবস্থিত ছিলেন; মন্ত্রণাগারের আসন তাঁহাদেরই অধিকৃত ছিল। রাজ্যমধ্যে যেখানে যত সৈন্য ও কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাদিগের উভয়ের ক্রীড়াপুত্তলি-স্বরূপ। তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতীত একপদমাত্রও কেহ অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত না। এতদ্ব্যতীত নিহত ইন্দুরাজের ভ্রাতা ফতেরাজের করে নগররক্ষার ভার সমর্পিত ছিল। ফতেরাজ নিজ ভ্রাতার অন্যায়হত্যার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে যে মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। চতুরচূড়ামণি রাজা মানও তৎসমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজাসন পুনর-ধিকার করিয়া তিনি একবার স্বীয় অবস্থা অনুশীলন করিলেন;—দেখিলেন, মন্ত্রাগার হইতে রক্ষক-শালা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীই সলিমসিংহের হস্তগত। তিনি রাজা, কিন্তু বলিতে গেলে তাঁহার পক্ষে কেহই নাই। রাজা মান বুঝিলেন, তিনি সঙ্কটাপন্ন; কিন্তু ব্রিটিসসিংহের অনুগ্রহে তিনি সেই সঙ্কট হইতে আশু উত্তীর্ণ হইলেন। ইংরাজদূত প্রত্যাগত হইয়া শাসনসমিতির নিকট মারবারের অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট রাজা মানসিংহকে সেনা-সাহায্য না করিলে তাঁহার রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। অতঃপর তৃতীয় দিবসে ইংরাজ বাহাদুর রাজার হস্তে কতকগুলি সৈন্য প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে রাজা মানের হৃদয় একটি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তিনি ভাবিলেন, ইংরাজের আনুকূল্যে সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র ক্ষণকালের মধ্যেই চূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু সাধ্যপক্ষে উঁহাদের সাহায্য লওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তাহা হইলে রাঠোরসর্দ্দারগণ বিরক্ত হইবে; আমার প্রতি আর তাহাদের বিশ্বাস থাকিবে না। সর্দ্দারগণের অন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে না পারিলে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ইংরাজেরা আমাকে সাহায্য করিবে, ভাল, এখন ইহা কথাতেই থাকুক, আপাততঃ গ্রহণের প্রয়োজন নাই।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি শিষ্টাচারের সহিত ব্রিটিসের সেই অনুগ্রহ গ্রহণে আপাততঃ অস্বীকার করিলেন। মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি ইংরাজ দূতকে কহিলেন, "আমার রাজ্যকে আমিই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিব।" তাঁহার ভাবভঙ্গীদর্শনে এবং কথাবার্ত্তা শ্রবণে সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, তিনি যেন অতীত বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। মধুরবচনে ও সহাস্য সম্ভাষণে তিনি সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলেন, সর্দ্দারগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া নানাবিধ আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন এবং উভয়পক্ষের কতিপয় ব্যক্তিকে মন্ত্রণাগারের অধস্তন পদসমূহে নিয়োগ করিলেন। রাজা মানসিংহের এই প্রকার আপাতমনোরম আচরণে অতি সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণেরও হৃদয় নিঃসন্দিগ্ধ হইল; সকল কর্ম্মচারীই ভীতচিত্তে তখন আপন আপন কর্ত্তব্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল পরেই ব্রিটিস-এজেণ্ট অজমীরে প্রতিগত হইলেন। "ব্রিটিস সার্ব্বভৌমিক প্রভুত্বের প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ না করিলে মারবাররাজ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপিত হওয়া অসম্ভব" ব্রিটিস-দূত পুনঃ পুনঃ রাজা মানকে এই কথা বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু রাঠোররাজ সে কথা কিছুতেই গ্রাহ্য করিলেন না; ব্রিটিস দূত যতই তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ততই তিনি বলিতে লাগিলেন, "সংপ্রতি রাজ্যের যেরূপ ভাবগতিক, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সে কার্য্য আমি স্বয়ংই করিতে সমর্থ হইব। তবে বৃথা আপনাদিগকে কষ্ট দিব কেন?"

এ দিকে ভারতের গবর্ণর জেনারাল বাহাদুর স্বহস্তে ক্ষমতা দিয়া একজন দূতকে (টড-সাহেবকে) রাজা মানসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে রাথারফোর্ড নামক এক ইংরাজ কতকগুলি পণ্যদ্রব্য লইয়া বিক্রমার্থ পল্লীনগরে উপস্থিত হন। পল্লীর প্রাচীন বণিকেরা আপনাদের

একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিঘ্ন হইবে জানিয়া সেই সাহেবকে নগর হইতে দূর করিতে প্রয়াস পায়। বণিক্‌গণ জৈন, সুতরাং জীবহত্যার বিষম বিরোধী। তৎকালে পল্লীনগরে কেহই কোন জীবহত্যা করিতে পারিত না। কিন্তু রাথারফোর্ড সাহেব নিজ উদরপূর্ত্তির জন্য নগরের মধ্যে প্রায়ই দুই একটি করিয়া ছাগহত্যা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বণিকগণ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আশু তাহারা সকলে একত্র হইয়া মানসিংহের নিকট সেই সাহেবের প্রতিকূলে অভিযোগ উত্থাপন করিল। মহাত্মা টড সাহেব উদয়পুরে ছিলেন। মানসিংহ ব্যাস বিষণরামের দ্বারা এতদভিযোগের মীমাংসার্থ টডের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে টড সাহেবের আসিতে বিলম্ব হইল। কয়েকমাস পরে তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজধানীতে আসিয়া তিনি দেখিলেন, রাজ্যের অবস্থা প্রায় ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে তাঁহার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্য হইতে বিদায় লইবার সময় মারবারের যে দশা দেখিয়াছিলেন, আজ নবেম্বর মাসেও প্রায় সেইরূপ রহিয়াছে। সেই কালচক্রই রাজা মান ও কর্ম্মচারিগণের অদৃষ্ট নিয়মন করিতেছে। নৃপতি হইতে সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই সেই চক্রচালকগণের করে ক্রীড়াপুত্তলিরূপে সংস্থিত। তাহাদের কার্য্যাবলীতে স্বয়ং রাজা অল্পই মনোনিবেশ করিতেন, তবে তাহারা যখন সম্মতি লইবার জন্য উপস্থিত হইত, তখন তিনি তাহাতে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। বেতনভোগী সৈন্ধবী ও পাঠানসৈন্যগণ ক্রমাগত তিন বৎসর বেতন পায় না, তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়; ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা পরিশেষে তৃণ ও ইন্ধনকাষ্ঠ মস্তকে বহনপূর্ব্বক পথে পথে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল; কোন কোন সৈনিকপুরুষকে ভিক্ষাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ-এজেণ্ট রাজধানীতে আসিলে তাহাদের হিসাবকিতাব একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল। একজনের বেতন অনেক পরিমাণে বাকী পড়িয়াছে। তাহারা এখন সকলেই আপন আপন প্রাপ্য বেতনের এক-তৃতীয়াংশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল; কিন্তু তাহা কেবল স্তোকমাত্র। কারণ, এজেণ্ট সাহেব একবিংশতি দিবসেই রাজধানী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সুতরাং হতভাগ্য সৈনিকগণের আশা ফলবতী হইল না।

মারবারভূমি শোকের আগার হইয়া উঠিল। কুচক্রিগণের কুটিলাচারিতায় প্রজাপুঞ্জের কষ্টের পরিসীমা রহিল না। অথচ কুচক্রীদিগের বিরুদ্ধে কথা কহিতেও কাহারও সাহস হইল না। কুচক্রিগণের অভিসন্ধি এই যে, রাজা তাহাদের করে ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ অবস্থিত থাকেন। এই আত্মকর্ম্মী দুষ্প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধনার্থ তাহারা সাধ্যপক্ষে রাজাকে স্বাধীনতা প্রদান করিত না। এমন কি, যে কার্য্যের দ্বারা তিনি ক্ষণেকের জন্য তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহাতেও বিঘ্ন উৎপাদন করিত। যে তিন সপ্তাহ এজেণ্ট সাহেব রাজধানীতে ছিলেন, তত্দিনের মধ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার অনেকবার গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইংরাজ-কর্ম্মচারী রাঠোর-বংশের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিদিত ছিলেন। কি অবস্থায় মহারাজ শিবজী মরুস্থলীতে উপবিষ্ট হইলেন, কি অবস্থায় বীরকেশরী যোধরাও রাঠোরকুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, যশোবন্ত ও অজিতসিংহ কি উপায়ে সেই জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, ক্রমে ক্রমে কি প্রকারেই বা জীবনীশক্তির হ্রাস হইল, কিরূপে মারবারের অধঃপতন ঘটিল এবং কি কারণে অবশেষে রাণা মানসিংহ বর্ত্তমান অবস্থায় পড়িলেন, এই সমস্ত বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে নানা তর্কবিতর্ক হইল। কিরূপ শাসননীতির অনুসরণ করিয়া মানসিংহের স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ মারবার শাসন করিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা ন্যায়সঙ্গত, এই সমস্ত বিষয়েরও বিস্তর

অনুশীলন হইল। এজেণ্ট সাহেবের গভীর বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া এবং সুন্দর যুক্তি শুনিয়া রাজা তাঁহার কথায় দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। অতঃপর এই কয়েকটি কথা বলিয়া ব্রিটিসদূত বিদায় গ্রহণ করিলেন যে, আপনি যে সমস্ত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমস্তই আমি বিদিত আছি; আপনি যে কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও জানি, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে আপনার প্রকাশ্য শত্রুসকল বিনষ্ট হইল, ব্রিটিস-গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে আপনার বন্ধু। সাহস করিয়া বিশ্বস্তহৃদয়ে ইহার উপর আপনি নির্ভর করুন; দেখিবেন, অল্পকালমধ্যেই আপনার আশা ফলবতী হইবে।

ব্রিটিস এজেণ্টের সারগর্ভবাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া রাজা মানসিংহ উত্তর দিলেন, "এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত কার্য্য বন্ধুর ইচ্ছামত সম্পাদিত হইবে।" ব্রিটিস কর্ম্মচারী পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ! যদি আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যেই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সংশোধিত হইবে।" রাজ্যের উন্নতিবিধানার্থ যে কয়েকটি বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, যদিও তৎসমস্ত সংখ্যায় অল্প ও সামান্য নহে, তথাপি ইংরাজকর্ম্মচারীর মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাজা মান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তাহা অল্পদিনের মধ্যেই সুসম্পাদিত হইবে।

উপযুক্ত শাসননীতির সংগঠন; রাজ্যের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা; খাসজমীগুলির অবস্থা-পরিদর্শন; প্রায়শঃ অন্যায় ও অধর্ম্মের সহিত যে সামন্তিক ভূমিভাগ ক্রোক করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের অনুশীলন; বিদেশীয় সেনাদলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা; রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে, যাহারা রাজ্যমধ্যে আসিয়া মধ্যে মধ্যে নগর গ্রাম লুণ্ঠন করে, তাহাদিগের দমনার্থ তৎপ্রদেশে বলিষ্ঠ শান্তিরক্ষিণী-সেনাস্থাপন; পণ্যদ্রব্যজাতের উপর যে গুরুভার শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার সংস্কারসাধন, এই কয়েকটি বিষয়ই মারবাররাজ্যের আশুকর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এজেণ্ট সাহেব যোধপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি রাজধানীর প্রান্তসীমা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই রাজ্যমধ্যে আবার নূতন নূতন অনর্থরাশি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুচাক্রদল তাঁহাকে দুরভিসন্ধিসিদ্ধির অন্তরায়জ্ঞানে এক্ষণে তাঁহার প্রস্থানে পুলকিত হইয়া উঠিল; কাজেই রাজ্য আবার অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। অর্থলিপ্সা বা প্রতিশোধতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য কিংবা অন্য কোন প্রবৃত্তির তৃপ্তিবিধানার্থ যে তাহারা সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, তাহা স্থির করা কঠিন। আশু গদবারের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমৃদ্ধ গানোর জনপদ তাহাদের রোষদৃষ্টিতে নিপতিত হইল। তৎক্ষণাৎ দেওয়ান তাহা পৃথক্ করিয়া লইলেন এবং যতক্ষণ উক্ত প্রদেশের বার্ষিক আয় অপেক্ষা অধিক টাকা পণস্বরূপ প্রাপ্ত না হইলেন, তাবৎ তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন না। এই প্রকারে উক্ত সমৃদ্ধ রাজ্যের অপরাপর সর্দ্দারগণও অখিঁচাদ ও তদীয় অনুচরগণের বিদ্বেষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিল দেওয়ান তাহাদের সকলের ভূমিসম্পত্তি হরণপূর্ব্বক নিজভ্রাতার করে প্রদান করিলেন। চণ্ডবলও বিচ্ছিন্ন হইল; অবশেষে তত্রত্য সর্দ্দার অতুল পণ পাইয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিল। ইহাতেও সেই কুচক্রিদলের পিপাসার শান্তি হইল না, বরং উত্তরোত্তর ধনপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন কি, সেই দুরাকাঙ্ক্ষ দেওয়ান পরিশেষে মারবারের প্রধান 'ভূবৃত্তি আঁহোব পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্যম বিফল হইয়া গেল। বীরবর চম্পের বংশধর তাঁহার সেই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "আমার আঁহোব নূতন সম্পত্তি নহে; বহুদিন হইতে ইহা আমি উপভোগ করিতেছি; নিশ্চয় জানিবেন, সহজে ইহা আমি পরিত্যাগ করিব না।"

ফতেসিংহ দিন দিন নিতান্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তদীয় সহচরগণও তাঁহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। তাঁহাদিগের ব্যবহারে প্রজাপুঞ্জ একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। রাজ্যমধ্যে বিবাদ, অবিশ্বাস, ক্রোধ ও অভিমান যেন প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিল। যাঁহারা রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ, যাঁহাদের আনুকূল্যে দুর্দ্ধর্ষ যবনের হস্ত হইতে মারবারভূমি রক্ষিত হইত, আজি তাঁহাদের সম্পত্তি একটা অবস্থ কুচক্রীর বিলাসভোগ্য হইয়া পড়িল। কতিপয় দুষ্ট কুচক্রী কর্ত্তৃক তাঁহাদের মানসম্ভ্রম বিলুপ্ত হইল। সর্দ্দারগণের মর্ম্মবেদনার আর অবধি রহিল না। তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, রাজা মান গোপনে গোপনে তাহাদের সহিত লিপ্ত থাকিয়া অলক্ষিতে সেই চক্র চালিত করিতেছেন। সকলেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, তাহাদের সেই বিশ্বাস প্রকৃত কি না, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নরপতির এরূপ কার্য্য যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তিনি অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, কারণ, বৃটিস এজেণ্টের অনুপস্থিতি সময়ে তিনি পুনরায় নির্জ্জনবাস অধিকার করিলেন এবং রাজ্যের শাসনকার্য্যে নিতান্ত অমনোযোগিতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজকার্য্যে অনবধানতা প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু অখিচাঁদ ও ফতেরাজের বিরোধভঞ্জনে বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। ইহাতে তৎপ্রতি অনেকেরই সন্দেহ জন্মিল। ফতেরাজ মৃত ইন্দুরাজের সহোদর; ইতিপূর্ব্বে তিনি নগরপালপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা তাঁহার স্বপক্ষ, তদ্ভিন্ন রাজার প্রিয়তমা মহিষী তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অখিচাঁদ সে প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া কল্পিত ক্রোধ সহকারে কহিলেন, "আমার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হইতেছে, অতএব আমি নগরের মধ্যে অবস্থিতি করিব না।" তিনি দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন এবং যাহাতে তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার ত্রিসীমায় আসিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হইলেন।

দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধবৎসর অতীত হইল। এত দিন অখিচাঁদের বিপুল প্রতাপের প্রতিকূলে কেহই দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইল না। সেই গূঢ়চক্রের মধ্যে কি কি ঘটনার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রাজা মান যেন কেহই নহেন, তিনি যেন দেওয়ান অখিচাঁদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি। বস্তুতঃ মানসিংহের প্রতি প্রজাপুঞ্জের ঘৃণার উদ্রেক হইল, তাহারা তাঁহাকে অতি অপদার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল। কিন্তু অচিরকালমধ্যেই তাহাদের সে ভ্রম অপসৃত হইল, মায়াজাল ছিন্ন হইয়া গেল, মানসিংহ আপনার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সর্দ্দারগণের শত সহস্র অভিশাপ ভোগ করিয়া, নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের দীর্ঘনিশ্বাসে অনুক্ষণ দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া দুর্জ্জয় অখিচাঁদ আপনার উদর পূর্ণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার শিরোপরি ভীষণদণ্ড প্রহত হইল; তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পাপ পাদপূর্ণ হইলে আর রক্ষা নাই; অখিচাঁদের তাহাই হইল। চতুরচূড়ামণি মানসিংহের আর উন্মাদরোগ নাই; এখন তিনি আর অখিচাঁদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি নহেন; বরং অখিচাঁদ এখন তাঁহার করগত। রাজ-আদেশে জল্লাদের শাণিত অসিতে অখিচাঁদের প্রাণদণ্ড হইবে। এইরূপ আকস্মিক ঘটনাদর্শনে নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া পড়িল। রাজা উন্মাদরোগের ভাণ করিয়া চতুরতার সহিত এত দিন মনোভাব গোপন রাখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে উন্মত্ততা নাই। সেই কল্পিত উন্মত্তভাব, সেই বিষয়কার্য্যে ঔদাসীন্য, সেই নিভৃতবাস একেবারে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ইদানীন্তন ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে কে তাঁহাকে বলিতে পারে যে, তিনি দুই দিবস পূর্ব্বে উন্মাদরোগে অভিভূত ছিলেন? সমস্তই তাঁহার ছলনা। আত্মরক্ষার্থ সংসারক্ষেত্রে রাজা মানসিংহ উন্মাদচিত্রের যে দৃশ্য

অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন,' পবিত্র রাজপুত-রাজবংশে জন্মিয়া অতি অল্পলোকেই সেইরূপ করিতে পারে।

উন্মাদরোগের ভাণ করিয়া রাজা মান স্বীয় শত্রুগণের সর্ব্বনাশসাধনার্থ শনৈঃ শনৈঃ যে কূট-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, আজি কুচক্রিদল তাহাতে দৃঢ়রূপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অখিচাঁদ বধ্যভূমিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ; তাঁহার সহচর ও অনুচরগণও সেই অবস্থায় দণ্ডায়মান। এখন আর তাহাদের সেই উদ্ধত ও গর্ব্বিত ভাব নাই। আজি তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়পোষিত প্রাণতোষিণী সেই আশা তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। অখিচাঁদের পাপমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনুচরবৃন্দ রাজার ও প্রজাপুঞ্জের যে সকল ধন আত্মসাৎ করিয়াছিল, আজি রাজার অনুচরদিগের কঠোরপীড়নে তাহা বাহির করিয়া দিতে হইল। সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ লক্ষ টাকার একটি তালিকা প্রস্তুত হইল। শৃঙ্খলিত দেওয়ান ও তদীয় সহচরগণের কুক্ষি বিদারণ-পূর্ব্বক সেই অপহৃত অর্থ সংগৃহীত হইল। অতঃপর রাজা তাহাদিগের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালিত হইল। দুর্ভাগ্য অখিচাঁদ শোচনীয় ও বীভৎস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সদলে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। কেল্লাদার নাগজীই রাজপুত্র ছত্রসিংহের অকালমৃত্যুর প্রধান হেতু সেই ব্যক্তির প্ররোচনাতেই যুবরাজ পাপপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মানসিংহের কুটিলদৃষ্টি এখন তাঁহার ও তদীয় অন্যতম সহচর মূলজী দণ্ডুলের উপর পতিত হইল; যুবরাজ ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর ইহারা দুই জনে রাজসরকার হইতে বিদায়গ্রহণ করে এবং ছত্রসিংহকে পাপপথে লইয়া গিয়া যাহারা সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, তাহারাই দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। রাজা মানসিংহ পুনর্ব্বার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন অনেকগুলি বিশ্বাসঘাতক ও রাজদ্রোহীকে ক্ষমা করিলেন, সেই সময়ে নাগজী ও মূলজীও তৎসমক্ষে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন, অধিকন্তু রাজার অনুগ্রহে নিজ নিজ পূর্ব্বতন পদেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু রাজা মান যে তাহাদিগকে কৌশলজালে বিজড়িত করিবার উদ্দেশে তত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, নির্ব্বোধেরা তাহা আদৌ বুঝিতে পারে নাই। মানসিংহ তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিলেন, তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং প্রত্যহই নূতন নূতন উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দেখিলেন যে, তাহাদের মন সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছে, তখন একদিন তাহাদিগের উভয়ের গলদেশে শৃঙ্খল অর্পণ করিলেন। ক্ষণস্থায়ী রাজত্বকালের মধ্যে মূলরাজ ছত্রসিংহ ঐ দুই ব্যক্তিকে যে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, আশু তৎসমস্ত আচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর হতভাগ্যদ্বয়ের প্রতি মৃত্যু-দণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। রাজার আদেশে উভয়ের সম্মুখে দুইটি বিষপাত্র আনীত হইল। হতভাগ্য নাগজী ও মূলজী অকম্পিত-হস্তে সেই বিষপাত্র গ্রহণ করিল, তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিল; দেখিতে দেখিতে বিকট কৃতান্তদূত আসিয়া তাহাদের প্রাণবায়ু হরণ করিল। তাহাদের শবদেহ দুর্গতোরণোপরি হইতে দুর্গতলে নিক্ষিপ্ত হইল। শবদেহের সৎকার হইল না। অতঃপর খাচি বিহারীদাস ও একজন সূচিধরের সহিত হতভাগ্য মূলজীর অন্যতম ভ্রাতা জীবরাজ মানসিংহের সম্মুখে আনীত হইল। রাজা আজ্ঞা করিলেন, "উহাদিগের মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক উহাদিগকে দুর্গ-পরিখাতে ফেলিয়া দাও।" তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞাও পালিত হইল। কিন্তু ইহাতেও মানসিংহের হৃদয় সম্পূর্ণ শান্ত হইল না। ছাগপশুর ন্যায় প্রত্যহ নূতন নূতন বলি তাঁহার সম্মুখে নিহত হইতে লাগিল, হতভাগ্যদিগের শবদেহে দুর্গের একপ্রান্ত সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল; তথাপি মানসিংহের

নিবৃত্তি নাই। এমন কি, ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞগণও তাঁহার শোণিতপিপাসু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। বেদব্যাখ্যাতা ব্যাস শিবদাস এবং জ্যোতিষী কিষণও সেই হতভাগ্যগণের ন্যায় বীভৎসদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই প্রকারে অনেকগুলি দুর্ভাগ্য ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল। অতি দূর-প্রদেশেও অখিচাঁদের যে সমস্ত অনুচর ছিল, অচিরে তাহারা সমসময়ে ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; সুতরাং এক ব্যক্তিও রাজার কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তবে উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ ধনসম্পত্তি রাজহস্তে প্রদান করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন; এই প্রকার জঘন্য উপায়ে পাশবী প্রতিশোধতৃষার শান্তি করিতে গিয়া রাজা মান এক ক্রোর টাকা সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অগণ্য প্রজার হৃদয়শোণিতপাত করিয়া এরূপ বিপুল অর্থসংগ্রহে কি ফল? পাশবী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পাশব উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া রাজা মান জগতে ঘোর অত্যাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ইহাতে তিনি যে কলঙ্কবীজ উৎপাদন করিলেন, যত দিন রাজপুতনাম জগতে থাকিবে, তত দিন এ কলঙ্ক বিলুপ্ত হইবে না। রাজপরিবারের কয়েকটি উচ্চ কর্ম্মচারী দেওয়ান অখিচাঁদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া এবং কতিপয় বিদ্রোহী সর্দ্দারগণের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া যদি তিনি সেই পৈশাচিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট সকলে তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার দলে যোগদান করিতে পারিত এবং উপযুক্ত বলিয়া প্রজাগণ তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত; কিন্তু তিনি আপন দোষে সকলের ভক্তি ও সহানুভূতি হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং দারুণ মর্ম্মবেদনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ভোগবাসনা যতই চরিতার্থ করা যায়, অর্থগৃধ্নুর ধনলালসা ততই বলবতী হইয়া উঠে। প্রত্যহ দুই চারিটি করিয়া হতভাগ্য রাজা মানসিংহের হস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিতে লাগিল; প্রত্যহ রাজা এইরূপে অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ধনলিপ্সা প্রশমিত হইল না। তখন প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপর তাঁহার উৎক্রোশদৃষ্টি পতিত হইল। কপট বন্ধুত্ব ও স্নেহ প্রদর্শনপূর্ব্বক করগত করিয়া তিনি সেই সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিকেও নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পোকর্ণের সলিমসিংহ, নিমজের শূরতানসিংহ এবং আহোরের আনরসিংহ ও তাঁহাদের সগোত্রীয় অপ্রাপ্তব্যবহার কুমারগণ রাজার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যহ রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। এত দিন তাঁহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে নাই. কিন্তু যে দিন রাজা দেওয়ান অখিচাঁদকে কারারুদ্ধ করিলেন, সেই দিন তাঁহাদের অন্তর বিষম সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল। চতুরচূড়ামণি মান ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের ভয় দূর করিবার জন্য কতিপয় কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন; বলিয়া পাঠাইলেন,"অখিচাঁদ দুষ্ট-প্রকৃতি রাজদ্রোহী, কাজেই তাঁহার দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য; কিন্তু আপনারা নির্দ্দোষী, আপনাদের ভয় কি? অখিকে দণ্ড দেওয়াতেই আমার সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।" রাজার এইরূপ আপাতমধুর কপটবাক্য শুনিয়া সলিম-প্রমুখ সর্দ্দারগণ তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সতর্ক থাকিলেন। সেই দিন রাত্রিকালে মানসিংহের আদেশে প্রায় আট সহস্র সৈন্ধবী ও অন্যান্য বেতনভোগী সৈন্য বন্দুক ও কামান লইয়া নিমজের সর্দ্দার শূরসিংহের আবাসগৃহে আপতিত হইল। সগোত্রীয় এক শত অশীতিসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে শূরতান নিজ বাটীর প্রাচীরোপরি থাকিয়া সেই অষ্ট সহস্র সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; ক্রমে গোলকের উপর গোলক-বর্ষণ হওয়াতে তাঁহার অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইল। তখন বীর শূরসিংহ অসি-হস্তে সদলে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং নিজ ভ্রাতা ও অশীতিজন আত্মীয়স্বজনের সহিত বিপক্ষসেনামধ্যে

বীরের ন্যায় প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। অবশিষ্ট সকলে আপনাদের শিশুসর্দ্দারকে রক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নিমজের দিকে অগ্রসর হইল। বীরবর শূরতান আত্মরক্ষার্থ যে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে অগণ্য শত্রুসৈন্য ও অনেকগুলি নাগরিকের প্রাণসংহার হইয়াছিল। ইহাতে মানসিংহ সেই রজনী-যোগে পোকর্ণ-সর্দ্দারকে আক্রমণ করিতে পারেন নাই। সলিমসিংহ সমস্ত রাত্রি সশস্ত্র অবস্থায় ছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত হন নাই। সেই দিন হইতে সর্ব্বদা অবহিতভাবে দিনপাত করিয়া তিনি পলায়নের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আশু উপযুক্ত সুযোগও উপস্থিত হইল। তিনি সদলে মরুভূমিস্থ স্বীয় আশ্রমনিবাসে পলায়ন করিলেন। যদি তিনি আত্মরক্ষার্থ সেইরূপ কৌশলে অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যোধ-দুর্গের বহির্ভাগে তাঁহার মস্তক শৃগাল-কুকুরের চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইত।

পাপচরিত্রের বর্ণনা করিতে লেখনীও কম্পিত হয়, ঘোরতর ঘৃণাবোধে লেখনীও সে বর্ণনায় অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে না। মানসিংহ কলঙ্কিত চরিত্রের একটি প্রধান আদর্শ। যে দিন সলিম-সিংহ আত্মরক্ষার্থ নিজদুর্গে আশ্রয় লইলেন, যে দিন এ সমস্ত রোমহর্ষণ ব্যাপারের অভিনয় সমাপ্ত হইল, তাহার পরদিন রাজা মানসিংহ ফতেরাজকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক মৃদুহাস্য সহকারে কহি-লেন, "আমি যে কেন তোমাকে আশু দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, তাহার কারণ তুমি এত দিনে বুঝিতে পারিলে কি?" এই সামান্য কয়েকটি কথার প্রত্যেক বর্ণে তাঁহার কুটিলচরিত্র পূর্ণভাবে প্রতিভাত হইতেছে। অতঃপর ফতেরাজ দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং রাজা মান কর্ত্তৃক অপহৃত বিপুলধনের সাহায্যে সৈন্যবৃন্দের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিয়া তাহাদিগের তুষ্টিবিধান করিলেন। এ দিকে রাজ্যমধ্যে জনশ্রুতি হইল যে, রাজ্যের অশান্তি-নিবারণার্থ রাজা মান ব্রিটিস-সেনাবলের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। এই জনশ্রুতি আশু সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবামাত্র প্রজাপুঞ্জ দারুণভয়ে আকুলিত হইল—এমন কি, যে রাঠোর-সামন্তগণ ইচ্ছা করিলে সেই নিষ্ঠুর প্রজাপীড়-ককে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হইতেন, সেই দিন তাঁহারা ঘৃণা, ভীতি ও মর্ম্মবেদনায় উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পাপরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

শূরসিংহের আত্মীয়স্বজনেরা নিমজে পলায়ন করিল, কিন্তু সে স্থানও নিরাপদ্ হইল না। রাজা মানের বিদ্বেষানল তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই দূরদুর্গেও উপস্থিত হইল। মান শূরসিংহের শিশু-কুমারকে আক্রমণ করিলেন। শিশুর অভিভাবকেরা অদ্ভুত বীরত্বের সহিত প্রচণ্ড আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। মুষ্টিমেয় সেনা বিশাল-বাহিনীর ভীষণ আক্রমণ কি প্রকারে রোধ করিবে? একে একে সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল; এ দিকে রাজা মানসিংহ স্বীয় সেনাপতির দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, সলিমের পুত্র যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে এবং তাহার সমস্ত ভূমিসম্পত্তি পুনঃ প্রদান করা হইবে। আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া পোকর্ণের শিশুসর্দ্দার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন এবং সসৈন্যে রাজা মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মানসিংহ আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। শূরতানের পুত্র যেমন তাঁহার স্কন্ধাবারে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি দেও-য়ান নৃপতির স্বাক্ষরিত অনুশাসনপত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন—বলিলেন, "আপনি বন্দী, সম্প্রতি আপনাকে রাজার নিকট গমন করিতে হইবে।" কাপুরুষোচিত এই ঘৃণিত আচরণ দর্শনে বেতন-ভোগী সৈন্ধবী সেনাপতিরও অন্তরে বিষম ঘৃণার উদয় হইল। তিনি সেই দণ্ডাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া সদর্পে বলিলেন, "না, তাহা কখনই হইতে পারে না; ইনি আমার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া

আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; এখন ইঁহাকে বন্দী করা কাপুরুষের কাজ। ভাল, যদি রাজা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-পালনে বিমুখ হন, তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা অটল থাকিবে। আর কিছু করিতে না পারি. আমি ইঁহাকে কোন নিরাপদ্ স্থানে রাখিয়া আসিব।” সৈন্ধবীসেনাপতি যে বাক্য উচ্চারণ করিলেন, কার্য্যেও তাহা পালিত হইল। তিনি সেই মুহূর্ত্তে বালককে লইয়া দুর্ভেদ্য আরাবল্লীর পাদপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। সুরতানের শিশুপুত্র তথায় মিবারের রাণার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইলেন।

মানসিংহের এই প্রকার ঘৃণিত পৈশাচিক ব্যবহার দর্শনে রাঠোরসর্দ্দারগণ ক্ষুণ্ন ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, মারবারের আর মঙ্গল নাই, তাঁহাদিগেরও এ রাজ্যে বাস সুখকর নহে। পদে পদে নিষ্ঠুর নরপতির বিদ্বেষবিষ পান করিতে হইবে, পদে পদে নিকৃষ্ট বেতনভোগী সৈন্যগণের তাড়না সহ্য করিতে হইবে। তাঁহারা তাদৃশ সহায়বলসম্পন্ন নহেন যে, তাহার সাহায্যে নরাধম রাজাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। মানসিংহ বিপুলসেনাবলসম্পন্ন—দশ সহস্র বেতনভোগী গোলন্দাজসৈন্য তাঁহার করগত; এতদ্ভিন্ন সামন্তসেনাও অনেক। সেই সকল সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন? আপন আপন দুর্গে থাকাও তাঁহাদের সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। পাছে ব্রিটিস সেনা আসিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিজ নিজ দুর্গবাসেও শঙ্কিত হইয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। যে মারবার তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের লীলাভূমি, বিপক্ষের আক্রমণ হইতে যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অম্লানমুখে আত্মোৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, পাষণ্ড রাজার নিষ্ঠুরাচরণে আজি তাঁহাদিগকে সেই জীবনের জীবন জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আপনার ধনে বঞ্চিত হইয়া পরের অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, মহারাজ শিবজীর গর্ব্বিত রাঠোরবংশে জন্মিয়া অন্য রাজপুতকুলের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে, রাঠোরের চিরগর্ব্ব—তেজস্বিতা, বিক্রম ও গৌরবগরিমা চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইবে, এই সমস্ত চিন্তা অন্তরে উদিত হওয়ামাত্র তাঁহারা একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। সপরিবারে মারবার ত্যাগ করিবার অগ্রে তাঁহারা একবার সতৃষ্ণনয়নে জন্মভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, অলক্ষিতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল, মর্ম্মভেদী চীৎকারে “বিদায় বিদায়” বলিয়া সর্দ্দারগণ ভগ্নহৃদয়ে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

যে মারবারভূমি অসংখ্য নরনারীতে আনন্দনগরীর ন্যায় শোভা পাইত, দুই এক মাসের মধ্যেই সেই স্থান পশু ও পিশাচগণের আবাসভূমি হইয়া পড়িল। আজি সেই মরুস্থলী শ্মশানে পরিণত হইল। স্বদেশবিসর্জ্জনপূর্ব্বক সেই বীরগণ মিবার, অম্বর, কোটা ও বিকানীর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ পাইয়া উক্ত প্রদেশসকলের রাজগণ সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বাসোপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও নিষ্ঠুর মানসিংহের নৃশংসব্যবহারের শান্তি নাই। পাশব স্বার্থপরতার পাপমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি এরূপ অন্ধ হইয়াছিলেন যে, বিপদের চিরবন্ধু পরমবিশ্বস্ত আনরসিংহকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যে আনরসিংহ তাঁহার সঙ্কটের শাসনকর্ত্তা, যে ব্যক্তি নিজপৃষ্ঠ দিয়া তাঁহাকে ভীমের তীক্ষ্ণ ছুরিকা-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ঝালোরের অবরোধসময়ে মান সর্ব্বচ্যুত হইলে যিনি আপনার যথাসর্ব্বস্ব—অধিক কি, সহধর্ম্মিণীর গাত্রের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণরক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, পল্লীনগর আক্রমণ করিতে গিয়া মানসিংহ অশ্বচ্যুত ও শত্রুকরে পতিত হইলে যিনি তাঁহাকে স্বীয় স্কন্ধোপরি তুলিয়া পলায়ন

করিয়াছিলেন, সমগ্র রাঠোরসর্দ্দার ধনকুলের পক্ষে যোগদান করিলেও যিনি শত সহস্র প্রলোভন অতিক্রম করিয়াও রাজপক্ষ ত্যাগ করেন নাই, রাজা মানসিংহ সেই মহোপকারী বিপদ্‌বন্ধুর উপকার বিস্মৃত হইয়া, কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সেই উদারাশয় আনন্দসিংহকেও হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এরূপ রাজপুতনামে ধিক্!

অষ্টাদশ মাস অতীত হইল। মারবারের সর্দ্দারগণ নির্ব্বাসিত হইয়া, পরান্নে প্রতিপালিত হইয়া, পরগৃহে শয়ন করিয়া, এই অষ্টাদশমাস দুঃখে অতিবাহিত করিলেন। দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর ভীষণ প্রপীড়নে মৃতকল্প হইয়াও যাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য জন্মভূমিকে ত্যাগ করেন নাই, আজি তাঁহারা নিষ্ঠুর রাজপুতকুলাঙ্গার নৃপতির পৈশাচিক ব্যবহারের ভয়ে বিদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। আশ্রয়দাতা বন্ধুগণের অনুগ্রহে তাঁহাদের ভরণপোষণের কষ্ট নাই বটে, কিন্তু জন্মভূমি ত্যাগ করিতে মর্ম্মে মর্ম্মে যে বেদনা পাইয়াছেন, সে বেদনা কিসে দূর হইবে? অনুক্ষণ সেই মরুময়ী মাতৃভূমির মনোহর চিত্র তাঁহাদের মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইতেছে—সেই আতপসন্তপ্ত অনন্ত বালুকারাশি যেন তাঁহাদের নেত্রসম্মুখে কাঞ্চনকণিকাপুঞ্জের ন্যায় ধু ধু করিতেছে, মারবারের দীর্ঘনালসমাবৃত জনারক্ষেত্র যেন তাঁহাদের মানসমুকুরে প্রতিফলিত হইয়া শোভমান ধান্য ও গোধূমক্ষেত্রের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। নয়ন মুদিয়া তাঁহারা যেন শুনিতেছেন, সেই লবণসলিলা ক্ষীণাঙ্গী লুনী নদী কলকলনাদে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের অমরকীর্ত্তিকলাপ গান করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। হায়! সেই সুখের জন্মভূমি এখন কোথায়? নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক স্বার্থপর রাজার অত্যাচারে আজি তাঁহারা মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া হীনদশায় দূরদুরান্তরে দিনপাত করিতেছেন। আজি তাঁহাদের হৃদয় নিরানন্দ, নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম। আজি তাঁহাদের সকল আশা-ভরসাই ফুরাইয়াছে। কিন্তু এরূপ নিরানন্দ অবস্থায় তাঁহারা আর কত দিন অতিবাহিত করিবেন? আর কি মাতৃভূমির ক্রোড়ে একদিনের জন্যও উপবেশন করিয়া জন্মসাধ মিটাইতে পারিবেন না? ক্রমে সেই নিরুৎসাহভাব বীরহৃদয় রাঠোরসর্দ্দারগণের অসহ্য হইয়া উঠিল। সেই শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ইংরাজবাহাদুরের সাহায্যলাভের প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু একবর্ষের মধ্যে তদ্বিষয়ের বিশেষ আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আপনাদের শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া সেই সমস্ত মহাতেজা রাঠোরসর্দ্দার ব্রিটিস-কর্ম্মচারীর নিকট একখানি মর্ম্মভেদী পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রখানি পাঠ করিলে অতি নিষ্ঠুর পাষণ্ডেরও পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। ১৮৭৮ সংবতে শ্রাবণমাসে তাঁহারা একটি বিশ্বস্ত লোক দিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারীর (টড সাহেবের) নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। আবেদনখানির সারমর্ম্ম এই স্থানে পরিগৃহীত হইল;—

"এই বিশ্বস্ত পত্রবাহকের মুখে আপনি আমাদের সমস্ত কথা অবগত হইবেন। সরকার কোম্পানী এক্ষণে হিন্দুস্থানের অধীশ্বর, আপনি আমাদের অবস্থা সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। যদিও আপনি আমাদের ও আমাদের সমস্ত বৃত্তান্তই জানেন, তথাপি আমাদের সম্বন্ধে এমন একটি বিষয় আছে, যাহা আপনাদের নিকট অদ্য আমরা জানাইতে অগ্রসর হইলাম।

শ্রীমহারাজজী ও আমরা একবংশের সন্তান। আমরা সকলেই রাঠোর। রাজা আমাদের শীর্ষস্থানীয়, আমরা তাঁহার অধীন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ; আমরা আমাদের জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত। আমাদের পৈতৃকসম্পত্তি ও আবাসভবনের মধ্যে কতকগুলি খালিশা করা হইয়াছে এবং যাহারা দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, তাহাদের অদৃষ্টে এইরূপই ঘটে। কেহ কেহ অতি গুরুতর

প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া বঞ্চিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; কেহ কেহ চিরদিনের জন্য কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে; মুতসুদী, সরকারী কর্ম্মচারী এবং স্বদেশীয় বা বিদেশীয় সকলেই রাজরোষে আক্রান্ত। আমাদের প্রতি এরূপ রোমহর্ষণ উৎপীড়ন করা হইয়াছে যে, আমরা তাহা লেখনীতে লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। রাজার মনের যেরূপ ভাব হইয়াছে, আমরা সেরূপ ভাব যোধপুরের আর কোন রাজার দেখি নাই। রাজার পিতৃপুরুষেরা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের সচিব ও মন্ত্রীর কাজ করিয়া গিয়াছেন; রাজার যখন যাহা কিছু কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের সর্দ্দারদিগের সমবেত পরামর্শ ব্যতীত তাহা সাধিত হয় নাই। তাঁহার পিতৃপুরুষগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের পিতৃপুরুষগণ অম্লানমুখে আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। রাজার সেবা করিতে গিয়াই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যোধপুরকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। যেখানে অন্য কোন নৃপতির সহিত মারবারের বিগ্রহবিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সমবেত হইয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াও মাতৃভূমিকে রক্ষা করিয়াছেন। কোন কোন সময় বালকও আমাদের রাজা হইয়াছেন। কিন্তু তখন আমাদের পিতৃপুরুষগণের বিজ্ঞতা ও রাজভক্তির প্রভাবে আমাদের দেশ রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে বংশ-পরম্পরানুক্রমে এই ভাব চলিয়া আসিতেছে। রাজা মানের চক্ষুর উপর আমরা অনেক কাজ করিয়াছি; সেই বিপদ্‌সময়ে যে দিন জয়পুরের প্রচণ্ড সেনাদল যোধপুর অবরোধ করিল, আমরা রণভূমে তাহাদের সম্মুখীন হইলাম, আমাদের জীবন ও সৌভাগ্য বিপন্ন হইল, পরে জগৎপতির কৃপায় বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ইহার সাক্ষী। এখন সে কাল অতীত হইয়াছে, অবিবেকী ব্যক্তিগণ এখন আমাদের রাজার নিকট অবস্থিত; তাহাতেই এই ভাবের বিপর্য্যয়। যতক্ষণ আমরা তাঁহার সেবা করি, তাবৎ তিনি আমাদের প্রভু; কিন্তু যখন সেবা না করি, তখন আমরা তাঁহার আবার সেই ভ্রাতা, সেই কুটুম্ব, সেই স্বত্বাধিকারী ও ভূমিপ্রার্থী।

সংপ্রতি আমরা রাজা কর্ত্তৃক বঞ্চিত। কিন্তু আমাদের প্রাণ থাকিতে কি কেহ আমাদিগকে প্রতারিত করিতে পারিবে? ইংরাজগণ সমগ্র ভারতের অধিপতি। ****** ঠাকুর আপন দূতকে অজমীরে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দিল্লীতে যাইতে বলা হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি তথায় উপস্থিত হন। কিন্তু তাহার কোন উপায় করা হয় নাই। যদি ইংরাজসেনাপতি আমাদিগের কথা গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলে আর কে করিবে? ইংরাজগণ কাহাকেও অপরের ভূমি হরণ করিতে দেন না। মারবার আমাদের জন্মভূমি; সুতরাং মারবার হইতেই আমরা আমাদের আনুকূল্য সংগ্রহ করিব। এক লক্ষ রাঠোর কোথায় যাইবে? ইংরাজ বাহাদুরের মর্য্যাদা রাখিবার জন্যই আমরা এ যাবৎ ধৈর্য্য ধরিয়া রহিয়াছি। আপনাদের গবর্ণমেণ্টকে না জানাইলে ভবিষ্যতে আপনারা দোষী করিতে পারেন, সেই কারণে আমরা জানাইলাম এবং সকল দোষ হইতে মুক্ত হইলাম। মারবার হইতে আসিবার সময় যাহা কিছু আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; এখন ঋণ ভিন্ন আর উপায় নাই; কিন্তু তাহাতেও ব্যয়নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। অন্নাভাবে যখন মরিতেই হইবে বুঝিতেছি, তখন আমরা এখন সকলই করিতে পারি; কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহি। ইংরাজ বাহাদুর আমাদের অধীশ্বর—শাসনকর্ত্তা রাজা আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। আপনারা মধ্যস্থ হইলে আমাদের কষ্ট দূর হইতে পারে; নচেৎ অন্য কাহারও উপর আমাদের বিশ্বাস নাই; প্রার্থনা করি, আমাদের এই আবেদনের প্রত্যুত্তর দানে অনুগৃহীত করিবেন। শান্তভাবে আমরা প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিন্তু উত্তর না পাইলে আর আমাদের দোষ

নাই; ক্ষুধার্ত্ত হইয়া লোকে উদ্ধারোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। একমাত্র আপনার সরকার বাহাদুরের সম্মান রাখিয়া আমরা এত দিন নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছি; সরকার বাহাদুর আমাদের রোদনে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু আর কত দিন সহ্য করিয়া থাকিব? পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা, আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন। ইতি সংবৎ ১৮৭৮ শ্রাবণ।"

এই পত্রখানি পাঠ করিয়া উদারমতি টড সাহেব বলিয়াছিলেন যে, যদি যথাসময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপায়ের কোন চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে; কেহই তাহাদিগকে দোষী করিতে পারিবে না।

রাঠোরসর্দ্দারগণ আশ্বাস পাইলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদের বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করিয়া দিবেন, এই আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা একরূপ সুখে দুঃখে দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হায়! নৃশংস নৃপতির অত্যাচারেই তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল। মারবারের সেই পাষণ্ড রাজা হইতে রাজ্যের যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতার সাহায্যে রাজা মান মহারাজ যোধরাওয়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন দোষে সে সিংহাসনের সম্মানরক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহা হইতেই মারবারের পূর্ণ অধঃপতন ঘটে, তাহা হইতেই রাঠোরকুল দুর্দ্দশার অন্ধতম কূপে নিহিত হয়, পৈশাচিক স্বার্থপ্রবৃত্তির বশীভূত না হইলে রাজা মানসিংহ নিশ্চয়ই আপনার ও স্বরাজ্যের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। তিনি দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সামন্তসমিতিকে দমন না করিয়া একেবারে নিপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই নৃশংসাচরণে যে বিষময় ফল উদ্ভূত হইয়াছিল, এখনকার বর্ত্তমান রাঠোরগণ সেই বিষময় ফল উপভোগ করিতেছেন।

মারবারভূমির বীরসন্ততি রাঠোরবংশের গৌরব গরিমাপূর্ণ ইতিবৃত্ত পরিসমাপ্ত হইল। বীরবর শিবজীর বংশধরগণের লীলাভূমি মারবারের রঙ্গভূমে যে সকল বিচিত্র বিচিত্র ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল, এইখানেই তাহার পরিসমাপ্তি—এইখানেই তাহার যবনিকা-পতন। যে দিন সেই বীরকেশরী দেবকল্প পুরুষ রাঠোরকুলের পঞ্চরঙ্গিণী পতাকা সুরধুনীর সৈকতপ্রদেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া লুনীতীরবর্ত্তী অনন্ত বালুকারাশির উপর রোপণ করিলেন, সেই দিন হইতে সমালোচ্যকাল পর্য্যন্ত প্রায় ছয় শত শতাব্দীরও অধিক অতিবাহিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার পবিত্রবংশে কত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতির সন্তান জন্মিল, কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অমানুষিক ঘটনা ঘটিল, সমস্তই বর্ণিত হইল। অবশেষে কুলাঙ্গার রাজপুতনামের অযোগ্য মানসিংহের কলঙ্কিতজীবনীর সহিত রাঠোরবংশের ইতিহাস পরিসমাপ্ত হইল। একসময়ে যাঁহাদিগের দুর্দ্দান্ত বাহুবলে মোগল-সম্রাটের বিরাট্ সিংহাসনও কম্পিত হইয়াছিল, আজি তাঁহাদের একটিমাত্র বংশধর সান্ধ্য গগনে ক্ষীণরশ্মিরেখার ন্যায় মারবার-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। আর সে তেজ নাই—আর সে পূর্ব্বদর্প নাই—আর সে অনন্ত প্রতাপ নাই। সকলই নির্ব্বাপিত, সমস্তই শীতল। শত শত অত্যাচারে ও শত শত উৎপীড়নেও যে রাঠোর এক প্রকার গৌরবগরিমায় দণ্ডায়মান ছিল, প্রাণপণে যাহারা কষ্ট স্বীকার করিয়াও আপনাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, শেষ বিধাতার কঠোরলিপি পূরণ করিবার জন্য সেই হতভাগ্য রাঠোরেরা ভীষণতম অন্তর্বিপ্লবে বিজড়িত হইয়া আপনাদের পদেই আপনারা কুঠারাঘাত করিল। লুণ্ঠনপ্রিয় নৃশংস মহারাষ্ট্রীয় ও শোণিতপিপাসু পাঠানেরা অলক্ষিতে সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল,—কাজেই রাঠোরকুলের জীবনীশক্তি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তাহাতেও

তাহারা নিরুৎসাহ হয় নাই, আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের অনন্তগর্ভবিলীন উন্নতির আশাপথ চাহিয়া তাহারা দিনযাপন করিতেছিল, বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন। কুলাঙ্গার রাজার অত্যাচারে রাঠোরকুল ছিন্নভিন্ন হইল, মারবার ভূমি একপ্রকার শ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। কষ্টের উপর কষ্ট, দুর্দ্দশার উপর দুর্দ্দশা, পীড়নের উপর পীড়ন। এত সঙ্কটেও রাঠোরকুলের আশা ছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মারবারের অশান্তিনিবারণ করিবেন, রাঠোরগণের দগ্ধহৃদয়ে শান্তিসলিল সিঞ্চিত হইবে। ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য রাঠোরগণের দুরদৃষ্টে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত বা কার্য্যে পরিণত হইল না। দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল, সত্যসন্ধ ব্রিটন কিছুই মনোযোগ করিলেন না, রাঠোরগণের আশাভরসা কালস্রোতের সহিত অনন্তসাগরে ভাসিয়া গেল। তাহাদিগের শোকাশ্রু মার্জ্জন করে, তাহাদের দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করে, এমন দয়াবান্ মহাপুরুষের আবির্ভাব আর হইল না।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, রাঠোরেরা পরিশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে মানের হৃদয় বিদ্ধ করে। নৃশংস রাজপুতকুলাঙ্গার ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে অপ-নৃপতি ধনকুল যোধরাওয়ের পবিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া উদারাশয় মহামতি টড সাহেব আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "মারবার রাজ্যে রাঠোররাজের ও সামন্তের স্বত্ব সমান। আমরা তাহাদের মধ্যস্থ না হইয়া ভালই করিয়াছি। তাহারা আপনারাই যে আপন আপন স্বত্বরক্ষা করিয়াছে, ইহা পরমসুখের বিষয়। ধনকুল রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। আমার বিবেচনায় একটি মহতী সভা আহ্বান করা রাজপুতগণের কর্ত্তব্য। সভায় যাহা সকলের কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তদনুসারে কার্য্য করিলেই পুনরায় মারবার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, রাজ্যে সুখশান্তি সংস্থাপিত হইবে, প্রজাপুঞ্জও আনন্দের ক্রোড়ে সুখে বাস করিতে পাইবে।"

ধন্য ইংলণ্ডবাসী! ধন্য তোমার উদারহৃদয়তা! ধন্য তোমার বিশ্বহিতকরী উপদেশমালা! সৌভাগ্যবশেই ভারতবাসীরা তোমার ন্যায় ইংলণ্ডবাসীকে ভারতবন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদি তুমি পবিত্রদেহ লইয়া আর কিছুদিন মরধামে অবস্থিতি করিতে, যদি তত শীঘ্র শীঘ্র ভারতের দুর্ভাগ্যবশে অনন্তধামে অনন্তসুখভোগ করিতে না যাইতে, তাহা হইলে আর্য্যসন্তানগণ তোমার বিশ্বপ্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্র শিক্ষা করিয়া সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের গৌরবগরিমা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইতেন সন্দেহ নাই। যত দিন ভারতেতিহাস বিদ্যমান থাকিবে, যত দিন ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানগণের একজন মাত্র জীবিত থাকিবে, তত দিন জগৎ হইতে তোমার পবিত্র নাম অন্তর্হিত হইবে না, তত দিন অনন্তরসনায় তোমার যশোরাশি পরিকীর্ত্তিত হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়

মারবারের বিস্তৃতি, অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ, ভূমি, শস্য, খনিজদ্রব্য, শিল্পদ্রব্য, বাণিজ্যস্থল, বণিক্‌সম্প্রদায়, মুৎসব ও ভালোত্রার সেনা, বিচারনীতি, দণ্ডবিধি, করবিধি, লবণহ্রদের আয়, সামন্তশ্রেণী, সামন্তিক ভূমি ও তাহার আয়ের তালিকা।

মারবার উত্তর-দক্ষিণে ন্যূনাধিক ২২০ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্বপশ্চিমে দুই শত সত্তর মাইল বিস্তৃত। মারবারের সীমাবন্ধনীর এক অংশ অন্যান্য রাজ্যের অন্তর্ভাগে এরূপভাবে প্রবিষ্ট যে, ত্রিকোণমিতি প্রক্রিয়া ব্যতীত ইহার প্রকৃত সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না।

অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ।—মারবারের লোকসংখ্যা প্রায় বিংশতি লক্ষ। তন্মধ্যে জিত পঞ্চাষ্টম, রাজপুত দ্বি-অষ্টম এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও শূদ্র; সুতরাং রাজপুতের সংখ্যা পুরুষ, বালক ও শিশু লইয়া সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ। ইহাদিগের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র ব্যক্তি অস্ত্রধারণে সুদক্ষ।

ভারতবর্ষের মধ্যে রাঠোরের অশ্বসেনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য প্রত্যেক বর্ষে মারবারে যত অশ্ব বিক্রীত হইত, রাজবারার অন্যস্থানে তদ্রূপ বিক্রীত হইতে দৃষ্ট হয় না। কচ্ছ, কাত্তিবার, মুলতান ও জঙ্গলদেশ হইতে বহুসংখ্যক ঘোটক ভালোত্রা ও পুষ্করের অশ্বমেলায় আনীত ও উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। লুনীতীরবর্ত্তী বর্দ্দ্রো এবং মারবারের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী অপরাপর নগরেও উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ দৃষ্ট হইত। কিন্তু মারবারের অন্তর্ব্বিবাদ এবং দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের উৎপীড়নের পর হইতেই সেই সমস্ত স্থান পরিত্যক্ত ও শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই কচ্ছ, বর্দ্দ্রো ও জঙ্গলদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই উৎকৃষ্ট অশ্ব দৃষ্ট হয় না।

ভূমি ও শস্য।—মারবারের ভূমি বৈকাল, চিকনি, পীলা ও সফেদ, এই চারি অংশে বিভক্ত। বৈকালভূমি বালুকাময়, ইহাতে মৃত্তিকার অংশ অতি অল্প। ঐ ভূমিতে মুগ, তিল ও কুটি-তরমুজ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। চিকনির (মাটা) মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ; দিদবানো, মৈরতা, পল্লী এবং গদবারের অনেকগুলি সামন্তিক ভূমির মৃত্তিকা ঐরূপ; ইহাতে প্রচুর গোধূম ও ধান্য জন্মে। অপরাপর জনপদের স্থলে স্থলে এই মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মৃত্তিকাতে যব যথেষ্ট উৎপন্ন হয়; তামাক, পলাণ্ডু ও অপরাপর শস্যও জন্মে। এই মৃত্তিকাতে পাট্টাগেঁও নামক গোধূমের চাষও দেখিতে পাওয়া যায়। সফেদ (সাদা) ভূমি প্রায় বিশুদ্ধ শ্বেতবালুকাতে পূর্ণ। ইহাতে প্রায়ই কোন শস্য উৎপন্ন হয় না; তবে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে ইহাতে কোন কোন শস্য জন্মিতে পারে। লুনীনদী পুষ্করহ্রদ হইতে বাহির হইয়া এবং মারবারকে প্রায় দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী মরুদেশের উর্ব্বর ও বন্ধুর ভূমির মধ্যস্থিত সীমারেখাস্বরূপ। এই নদী দ্বারা ভূমির অবস্থা সম্বন্ধে অনেক উপকার হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরাবল্লী পর্ব্বত হইতে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ বাহির হইয়া লুনীর দক্ষিণাস্থিত পল্লী, সুজোৎ ও গদবারের উর্ব্বরশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সমস্ত স্থানে সকল শস্যই জন্মে; কিন্তু জনার উৎপন্ন হয় না।

খনিজ দ্রব্য।—মারবারের খনিজ দ্রব্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাঁচভদ্র, দিদবানো ও সম্বরের

লবণ-সরোবরগুলি লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান। এই সমস্ত হ্রদোৎপন্ন লবণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রেরিত হইয়া থাকে। মকোরণের মর্ম্মরশিলা সর্ব্বজন-প্রশংসিত। মুসলমান-অধিকারসময়ে এই প্রস্তর দ্বারা দিল্লী ও আগ্রার উত্তমোত্তম অট্টালিকা, মসজীদ, সমাধি-মন্দির ও স্তম্ভাদি সংগঠিত হইয়াছে। অদ্যাপি সেই সকল সৌন্দর্য্য জগৎ-সমক্ষে মারবারের মকরোণশিলার গৌরব প্রদর্শন করিতেছে। এই সুন্দর শিলা হইতে মারবারে অনেক আয় হইত। এতদ্ব্যতীত যোধপুর ও নাগোরের নিকট চূণের পাথর এবং অন্যান্য স্থানে কাঁকর যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুজোতে টীন ও সীসা, পল্লীতে ফটকিরি এবং বিন-মহলে ও গুর্জ্জরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে লৌহের খনি আছে।

শিল্প।—মারবারিগণ শিল্পশাস্ত্রে সুদক্ষ নহে। তথায় বাণিজ্যের তাদৃশী উন্নতি নাই। মোটা সূতার কাপড় ও বনাত প্রভৃতি সামান্য সামান্য প্রস্তুত হয়। বন্দুক ও তরবারি এবং অন্যান্য রণোপকরণ যোধপুর ও পল্লীনগরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পল্লীর অধিবাসীরা বিলাতী টিনের বাক্সের ন্যায় একপ্রকার বাক্স প্রস্তুত করে। এই সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষা লৌহকটাহ এত অধিক পরিমাণে বিক্রীত হয় যে, কর্ম্মকারগণ সর্ব্বক্ষণ কাজ করিয়া যোগাইয়া উঠিতে পারে না।

বাণিজ্যস্থল।—রাজপুতানার সর্ব্বত্রই এক একটি বাণিজ্যস্থল দৃষ্ট হয়। মিবারের ভিলবারা, বিকানীরের চুরু এবং মারবারের মালছুর একটি প্রধান হট্ট। পরন্তু পল্লী রাজপুতানার মধ্যে প্রধান হাট বলিয়া গণনীয়। বস্তুতঃ ভারতের অধিকাংশ বণিক্‌গণই মারবারী।

মারবার যখন উন্নত অবস্থায় সংস্থিত ছিল, তখন পল্লীনগরই সমস্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের পণ্যবন্দর ছিল; ভারতবর্ষ, কাশ্মীর ও চীনের পণ্যদ্রব্যসমূহের সহিত ইউরোপ, আফ্রিকা, পারস্য ও আরবের পণ্যদ্রব্যের বিনিময় এই পল্লীতেই হইত। পশ্চিম ও দক্ষিণদেশসমূহের কর্পূর, গজদন্ত, আম্র, গঁদ, চন্দনকাষ্ঠ, খর্জ্জুর, কৌষেয় বস্ত্র, বেসবার প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য সকল সাগরপথে কচ্ছ ও গুর্জ্জরের উপকূলে একত্র হইত এবং তথা হইতে উষ্ট্রবাহনে বাহিত হইয়া পল্লীর হাটে উপস্থিত হইত; মারবারিগণ নানা প্রকার কৌষেয় ও পট্টবস্ত্র, শর্কর, অহিফেন, বনাত, শাল, অস্ত্র শস্ত্র ও লবণাদি দ্রব্যের বিনিময়ে ঐ সমস্ত সামগ্রী ক্রয় করিত।

চারণগণ রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবিকুল। ইহাদিগের প্রতি সকলেই ভক্তিপ্রদর্শন করে। ইহারাই উষ্ট্র দ্বারা পণ্যদ্রব্য বাহিত করিত। ইহাদের হস্তে যে সকল উষ্ট্র অর্পিত থাকিত, অতি দুরন্ত দস্যুও তৎসমুদয়কে হরণ করিতে সমর্থ হইত না।

মেলা।—মারবারে বর্ষে বর্ষে দুইটি মেলা হয়;—একটি মুন্দবে, দ্বিতীয়টি ভালোত্রনগরে। এই দুইটি মেলাতেই নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়; তন্মধ্যে মুন্দবে গবাদি পশুই অধিক আনীত হইয়া থাকে। ঐ মেলায় নানাদেশের বণিক্‌গণ উপস্থিত হয়। কিন্তু মারবারের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত মুন্দব ও ভালোত্রের শ্রীসৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে; এখন আর পূর্ব্ববৎ শোভা-সমৃদ্ধি নাই।

বিচার ও দণ্ডবিধি।—রাজপুতের বিচার ও দণ্ডবিধি অতি কোমল। গুরুতর অপরাধ ব্যতীত-চরমদণ্ডের আদেশ হয় না। রাজপুত-বিচারক ন্যায়নিষ্ঠ, সূক্ষ্মদর্শী ও নিরপেক্ষ। সময়ে সময়ে নর-হন্তাও অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত, কারারোধ বা নির্ব্বাসন সহ্য করিয়া বিচারকর্ত্তার করুণায় প্রাণরক্ষা করে। চৌর্য্যাদি সামান্য সামান্য অপরাধে অর্থদণ্ড বা স্বল্পকালের জন্য কারারোধ হয় এবং কখন কখন দোষী অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়াও পরিত্রাণ পায়। মারবারে চোর অতি কম, মারবার কেন, রাজপুতরাজ্যেই তস্কর অল্প। পূর্ব্বতন হিন্দুগণের রাজত্বকালে তস্করতা কেবল নামমাত্রেই শ্রুত ছিল। রাজা বিজয়সিংহের লীলাসংবরণের পর হইতে মারবারের বিচারাসন একপ্রকার শূন্য রহিয়াছে

বলিলেই হয়। কারণ, তাঁহার পর তাঁহার ন্যায় সুবিচারক রাঠোরবংশে আর কেহ জন্মে নাই। তিনি কখনও কাহারও বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেন নাই। তাঁহার সুবিচার সম্বন্ধে অদ্যাপি অনেক প্রবাদ শ্রুতিগোচর হয়। একদা তাঁহার সদ্বিচার ও দণ্ডবিধানে বিমোহিত হইয়া মারবারের বন্দিগণ বলিয়াছিল, "আমরা বাহিরে একটু শাকের যোগও পাই না, কিন্তু কারাগৃহে বসিয়া লাড্ডু ভক্ষণ করিতেছি।" এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক রাজার নবাভিষেক ও রাজকুমারের জন্ম উপলক্ষে কারাবাসিগণ মুক্তি পাইয়া থাকে।

প্রাচীনকাল ইহাতেই ভারতে অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি কঠোরদণ্ড প্রচলিত আছে। সতীশিরোমণি জানকী অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নিজ পবিত্রতা ও পাতিব্রত্য সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তদবধি বহুদিন অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহা প্রায় কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না। জলিমসিংহ হারাবতীর ডাকিনীগণকে উষ্ণজলে ফেলিয়া দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিচারকেরা এরূপ দণ্ডও প্রয়োগ করিতেন, যাহাতে দোষী ব্যক্তিরা উষ্ণতৈলে হস্ত প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু এ প্রকার কঠোরদণ্ড কেবল বাদিপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

পঞ্চায়ৎ।—প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে পঞ্চায়ৎ-প্রথা প্রচলিত আছে। যে বিচারবিধির জন্য ঈর্ষাপরতন্ত্র ইংরাজেরা ভারতের বর্ত্তমান উদারনৈতিক শাসনকর্ত্তার প্রতি কুটিলকটাক্ষ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক ভারতীয়দিগকে পঞ্চায়ৎ-প্রথার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া চীৎকার করিতেন, তাহা অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। অত্যাচারী যবনগণও আমাদিগকে এই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করে নাই। এই প্রথা দাওয়ানী বিচারেই প্রযুক্ত হইত। এই বিচারে সন্তোষ না জন্মিলে বাদী বা প্রতিবাদী নৃপতি-সমীপে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিত। এই বিচারালয়ের কার্য্য অতি সামান্য। বাদী জেলার হাকিম বা নিজ গ্রামের পেটেলের নিকট অভিযোগ করিল; অমনি প্রতিবাদীর প্রতি শমনজারী হইল। বাদী ও প্রতিবাদী প্রত্যেকেই দুইখানি গ্রাম হইতে স্ব স্ব পক্ষের প্রতিভূ নির্ব্বাচন করিল। অতঃপর তদনুসারে সেই সেই গ্রামের পেটেলের নিকট সংবাদ পাঠাইবামাত্র তাঁহারা নিজ নিজ পাটোয়ারী লইয়া পল্লীবিচারালয়ে আগমন করিলেন। সাক্ষিগণ আহূত হইল। তাহারা "গদি কা আন" (সিংহাসনের দিব্য) বা অন্য কোন শপথ গ্রহণ করিল। বিচার হইলে বিবাদের মীমাংসা হইল। বিচারপতি স্বনামে মোহর অঙ্কিত করিলেন। যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রবেশ করে নাই, শঠতা ও প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা যখন ধর্ম্মভীরু ভারতসন্তানগণ জানিত না, সেই সুখের সময়ে—রাজপুতজাতির সেই গৌরবসময়ে এই সামান্য পঞ্চায়ৎপ্রথা দ্বারাই সকল বিবাদের মীমাংসা হইত।

রাজস্ব।—মারবারের রাজস্ব যে যে উপায়ে উদ্ভূত হয়, তন্মধ্যে "খালিসা বা খাসজমী," লবণ-সরোবর; শুল্ক; হাসিল (নানাপ্রকার কর) এই কয়েকটি প্রধান।

মহাত্মা টডের সময়ে মারবারের খাসজমী হইতে বর্ষে বর্ষে দশ লক্ষ টাকা উদ্ভূত হইত, কিন্তু তাহার পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে রাজা বিজয়সিংহের রাজত্বকালে ষোল লক্ষ টাকা উঠিত। ইহার একার্দ্ধ লবণহ্রদ হইতে উদ্ভূত হইত। পূর্ব্বে রাজা উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইতেন; ক্রমে তাহা চতুর্থাংশে উঠিল; অবশেষে বাঁটাই-প্রথার অনুসারে রাজপুতরাজারা এখন অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত প্রজা বণ্টন ও রক্ষণজন্যও আরও কিছু প্রদান করে। প্রত্যেক দশ মণে দুই টাকা করিয়া ধার্য্য হয়। ইহাতে যে টাকা উদ্ভূত হয়, তাহাতে কোটাল ও কাঁওয়ারিগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধের পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, পেটেল ও পাটোয়ারী তাহা বণ্টন করিয়া লন। ইঁহারা রাজা ও

প্রজা উভয়ের অংশ হইতে বেতন প্রাপ্ত হন। শস্য কর্ত্তিত ও বিভক্ত হইলে রাজা প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে এক এক গাড়ী খড় কর্বি প্রাপ্ত হন। খালিসা অপেক্ষা সামন্তিক ভূমির কৃষকগণের অবস্থা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট। কারণ, তাহাদিগের নিকট হইতে কেবল ছয় আনার হিসাবে অংশ গৃহীত হয় এবং অপরাপর করস্বরূপ তাহারা কর্ষিত প্রতি একশত বিঘার উপর ১২৲ টাকা প্রদান করে। তন্মধ্যে কৃষকেরা সর্দ্দারগণের সেবা করিয়া এই টাকা কাটান দেয়।

আঙ্গ, ঘাসমালি ও কেওয়াড়ি নামক তিন প্রকার করও আদায় করা হয়।

আঙ্গ (মুণ্ডকর);—পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের উপর এক টাকা হিসাবে আদায় হয়।

ঘাসমালি;—গবাদি পশুপালের উপর এই কর আদায় হয়। ইহা প্রত্যেক ছাগের বা মেষের উপর বাৎসরিক এক আনা, মহিষের উপর আট আনা এবং উষ্ট্রের উপর তিন টাকা।

কেওয়াড়ি (দ্বারের উপর কর);—ইহা অত্যাচারমূলক বলিয়া গণনীয়। ইহা রাজা বিজয়-সিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত। যখন তাঁহার সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া পল্লী নগরীতে গিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ষড়্যন্ত্র করে, তিনি সেই সময় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে দেখেন যে নগরদ্বার রুদ্ধ, ভীম-সিংহ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণলাভার্থ তাঁহার বিপুল অর্থের আবশ্যক হয়; কিন্তু অর্থসংগ্রহের অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি স্বীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট সাহায্য প্রার্থনা-পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেক গৃহের উপর তিন টাকা হিসাবে কর ধার্য্য করেন। ক্রমে ইহা হইতেই রাজ্যের বিপুল আয় হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি আর এ কর উঠাইয়া দিলেন না। অবশেষে রাজা মান কেওয়াড়ি করকে তিন হইতে দশ টাকায় বর্দ্ধিত করেন। কিন্তু এখন আর ঠিক সমানরূপে আদায় হয় না, প্রত্যেক নগরের গৃহসংখ্যা নিরূপিত হইলে যাহার যেমন অবস্থা, সে সেই অনুসারে এই কর দেয়। তন্মধ্যে কেহ দুই এবং কেহ কুড়ি টাকা প্রদান করে। সামন্তগণও এই কর-প্রদানে বাধ্য। তবে রাজা অনুগ্রহ করিয়া কোন কোন সামন্তকে এই কর হইতে অব্যাহতি দিয়া থাকেন। মারবারের উন্নতির সময় বর্ষে বর্ষে যোধপুর হইতে ৭৬,০০০, নাগোর হইতে ৭৫,০০০, দিদবানো হইতে ১০,০০০, পর্ব্বতশিখর হইতে ৪৪,০০০, মৈরতা হইতে ১১,০০০, কোলিয়া হইতে ৫,০০০, রালোর হইতে ২৫,০০০, পল্লী হইতে ৭৫,০০০, যশল ও ভালোত্রের মেলা হইতে ৪১,০০০ টাকা উদ্ভূত হইত। এতদ্ব্যতীত লবণসরোবর হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১৫০০০ টাকা উঠিত। তন্মধ্যে পাঁচ-ভদ্র হইতে ২,০০,০০০, ফিলোদী হইতে ১,০০,০০০, দিদবানো হইতে ১,১৫,০০০, সম্বর হইতে ১,০০,০০০, এবং নোবা হইতে ১,০০,০০০, টাকা উদ্ভূত হইত। এতদনুরূপ আর আর বিভাগ হইতে পূর্ব্বে মারবারের যে রাজস্ব সংগৃহীত হইত, তন্মধ্যে খালিসা হইতে ১৪৮৪, নগর ও পল্লী হইতে ১৫,০০,০৮০, কর হইতে ৪,৩০,০০০ লবণহ্রদ হইতে ৭১,৫,০০০, এবং হাসিল বা অন্যান্য কর ও শুল্ক ইত্যাদিতে ৩,০০,০০০, টাকা আদায় হইত।

এই প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, মারবারের উন্নতির সময় রাজ্যের প্রায় অশীতি লক্ষ টাকা আয় ছিল। এখন এই বিপুল রাজস্বের অর্দ্ধাংশও উদ্ভূত হয় কি না সন্দেহ।

মারবারের প্রথমশ্রেণীর সর্দ্দার-সংখ্যা আট এবং দ্বিতীয়শ্রেণীর ষোড়শ। ইহাঁদের নাম, ধাম, ভূসম্পত্তি ও আয়ের তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রকটিত হইল।—

সর্দ্দারগণের নাম	গোত্র	বাসস্থান	ভূসম্পত্তির আয়	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী				ইহারা মারবারের শ্রেষ্ঠ সামন্ত।
১। কেশরীসিংহ	চম্পাবৎ	আহোর	১০০০০০	এই আয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক পূর্ব্বরাজ-প্রদত্ত, অপরার্দ্ধ সগোত্রীয় নিম্নতম সর্দ্দারের নিকট হইতে হৃত।
২। বক্তিয়ারসিংহ	কুম্পাবৎ	আশোপ	৫০০০০০	
৩। সলিমসিংহ	চম্পাবৎ	পোকর্ণ	১০০০০০	ইনি শ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত সর্দ্দার।
৪। শূরতানসিংহ	উদাবৎ	নিমজ	৫০০০০	শূরসিংহের মৃত্যুর পর নিমজ স্বতন্ত্র হয়।
৫।	মৈরতীয়	রিয়া	২৫৯০০	ইঁহার তুল্য সাহসী সর্দ্দার বিরল।
		গানোর		
৬। অজিতসিংহ	ঐ	কেবনশির	৫০০০০০	গানোর পূর্ব্বে মিবারের ষোড়শ প্রধান সামন্তিক ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল।
৭।	করমসোৎ	বাকিমশির	৪০০০০	
	ভট্টি	ক্ষজলা	২৫০০০	এটি বিদেশীয় ভূমি।
৮।				
দ্বিতীয় শ্রেণী				
১। শিবনাথসিংহ	উদাবৎ	কুচামন	৫০০০	ইনি অসীম ক্ষমতাশালী।
২। শূরতানসিংহ	যোধ	ক্ষেবিকা-দেওয়া	১৫০০০	
৩। পৃথ্বীসিংহ	উদাবৎ	চণ্ডবল	২৫০০০	
৪। তেজসিংহ	ঐ	খাড়া	২৫০০০	
৫। আনরসিংহ	ভট্টি	আহোর	১১০০০	
৬। জৈৎসিংহ	কুম্পাবৎ	বাগোরী	৪০০০০	
		গজসিংহপুর	২৫০০০	
৭। পদ্মসিংহ	ঐ	মেহত্রী	৪০০০০	
	মৈরতীয়	মারোট	১৫০০০	
১০। জালিমসিংহ	উদাবৎ	রোট	১৫০০০	
	কুম্পাবৎ	চৌপুর	১৫০০০	
	যোধ			
১২।	...	ঝুধসু	২০০০০	
১৩। শিবদাসসিংহ	চম্পাবৎ	কেওট(বড়)	৪০০০০	
১৪। জালিমসিংহ	ঐ	হরশালা	৯০০০০	
১৫। শাবলসিংহ	ঐ	দিগোদ	৯০০০০	
	ঐ	কেওটা ক্ষুদ্র	৯৯০০০	

বিকানীর

প্রথম অধ্যায়

-:০:-

বিকানীর রাজ্যের উৎপত্তি, বিকা, আদিম জিতদিগের অবস্থা, বিকার হস্তে নিজ মণ্ডল-গণের আত্মসমর্পণ, জোহিয়া আক্রমণ, ভাগোর অপহরণ এবং বিকানীর স্থাপন, নূন-কর্ণের অভিষেক, জৈতের অভিষেক, রায়সিংহের অভিষেক, আকবরের সহিত রায়সিংহের সম্বন্ধ, আলেকজন্দরের বিক্রম-নিদর্শন, সলিমের (জাঁহাগীর) সহিত রায়সিংহের কন্যার বিবাহ, কর্ণের সিংহাসনারোহণ, কর্ণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের প্রাণত্যাগ, অনুপসিংহের অভি-ষেক, কাবুলে বিদ্রোহদমন, স্বরূপসিংহের অভিষেক, তাঁহার মৃত্যু ; সুজনসিংহ, জোরাবরসিংহ, গজসিংহ ও রাজসিংহের অভিষেক, রাজসিংহকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার রাজ্যাপহরণ, অন্তর্বিপ্লব, যুদ্ধসজ্জা, যোধপুর আক্রমণ, বিদাবতীর বিবরণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আটটি প্রধান রাজ্য লইয়া রাজপুতানা গঠিত, বিকানীর তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মহারাজ যোধরাওয়ের বিশাল বংশতরুর একটি শাখা এই রাজ্যের অধীশ্বর। সেই রাঠোরবীরের বংশধরেরা জিগীষাপরবশ হইয়া আপনাদের পিতৃরাজ্যের উত্তরসীমায় এই বিকা-নীররাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এই রাজ্য মরুভূমির বক্ষে স্থাপিত। ইহার সমন্তাৎ উত্তপ্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। এই কারণেই বিকানীরের রাজগণ বহুদিন ধরিয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৫১৫ সংবতে (১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ যোধরাও যোধপুরে রাঠোরবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুন্দর রাজপাট বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ সংবতে যোধরাওয়ের পুত্র বিকা-নারবারের বালুকারাশির মধ্যে রাঠোরের প্রভুত্ববিস্তার করিবার ইচ্ছায় স্বীয় পিতৃব্য কণ্ডুলের অধি-নেতৃত্বে তিন শত রাঠোরবীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিকার আর একটি ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম বিদা। তিনি পূর্ব্বে মোহিলগণের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বিকা আপনার অস্ত্রবলে অদৃষ্টের পথ পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রকৃত বীরধর্ম্ম অনুসারে দেশজয়ে প্রবৃত্ত হইলে সাধারণতঃ জয়লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। বিকা লুণ্ঠন বা সর্ব্বোৎসাদনের পাপমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অস্ত্রধারণ করেন নাই। "হয় দেশ জয় করিব,

নতুবা রণক্ষেত্রে দেহপাত করিব ;" ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাঠোরবীর বিকা তিন শত সৈন্য সহ জঙ্গলু নামক স্থানের শঙ্খলাগণকে আক্রমণ করিলেন। আশু সেই হতভাগ্যগণ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল। সংবাদ পাইয়া পুগলের ভট্টিরাজ বিকার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর বিকা করন্দশির নামক স্থানে স্বীয় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অবিলম্বে তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইল। সেই দুর্গমধ্যে দলবল রাখিয়া বিকা সুযোগ ও সুবিধাক্রমে স্বরাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই প্রকারে জয়লক্ষ্মীর প্রসাদে বিকার রাজ্য দিন দিন বিস্তার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক ক্রোশ দুই ক্রোশ করিয়া ক্রমে রাজ্যটি প্রাচীন জিতগণের উপনিবেশের সীমাবন্ধনী স্পর্শ করিল। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে জিতগণ সেই মরুময় প্রান্তরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রদেশ লইয়া বিকানীরের অধিকাংশ গঠিত।

জিতজাতি বিলক্ষণ প্রসিদ্ধিশালী ; মিবার-ইতিবৃত্তে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে যে সমস্ত জাতি আসিয়ার মধ্যপ্রদেশে খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জিতগণ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোন্ সময়ে যে ইহারা প্রথম ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হয়, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাবে এক যুতি বা জিতরাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায় ; কিন্তু সেই সময়ের কত দিন পূর্ব্বে যে তাহারা তৎপ্রদেশে আগমন করিয়াছিল,তাহার নিরাকরণ হয় নাই। প্রচণ্ড যবনবিক্রম যতবার ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, ততবারই জিতগণ তাহার প্রবল গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, অদ্যাপি সর্ব্বত্র সকলের মুখে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। মাহমুদ ও বাবরের অভিযানসময়ে তাহারা শতদ্রুর পূর্ব্বকূলে এবং মাবার-উলনিহারে অবস্থিতিপূর্ব্বক উক্ত যবন-বীরদ্বয়ের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বীরকেশরী বাবরের আত্মজীবনীপাঠে জানিতে পারা যায় যে, ভারত আক্রমণার্থ তিনি যতবার পঞ্চনদপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ততবারই জিতগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। পঞ্জাবে তাহারা বহুদিন স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিল। অবশেষে মহম্মদের দলবলের ভীষণ তেজে অধঃকৃত হইয়া অনেকে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল ; অবশিষ্ট সকলে গুরু নানকের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র শিখ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। সন্ন্যাসিপ্রবর গুরুগোবিন্দসিংহের বিকট শবসাধনার বলে সেই ধর্ম্মবীর শিখকুল প্রচণ্ড রাজনৈতিক বীরবৃন্দের আসন অধিকার করিল। তখন জিতকুলের ইতিহাসে এক নবযুগের অবতারণা হইল। ফলতঃ জিতগণ ভুজবলে একদা জগতে অসীম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই বীরজাতি যুতি, জিতি, জিত, জাট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। অধুনা রাজবারার পশ্চিম এবং হিন্দুস্থানের উত্তরপ্রান্তে যে সহস্র সহস্র কৃষক অবস্থিতি করে, তন্মধ্যে জিতগণই শ্রেষ্ঠ।

অনেকে অনুমান করেন, জিতগণ শাকদ্বীপ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাদের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে তাহাই বিশ্বাস হয়। পূর্ব্বে ইহারা প্রকৃত মেষপালকের অবস্থাতে দিনপাত করিত ; তন্মধ্যে বয়োবৃদ্ধগণ মণ্ডল নামে প্রথিত। মণ্ডল দ্বারাই উঁহাদের সমাজ চালিত হইত, কিন্তু শাসিত হইত না। হিন্দুধর্ম্মের সহিত উঁহাদের ধর্ম্মের কিছুমাত্র সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না ; কেবল এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা একটি তরুণী জিত-রমণীকে ভগবতী দুর্গার অব-তারস্বরূপ জ্ঞানে অর্চ্চনা করিত। বস্তুতঃ জিতগণ পৌত্তলিক। সুদূর জাক্সারতীস নদের তীরপ্রদেশে

হইতে তাহারা যে অদ্ভুত পৌত্তলিকধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিল, প্রসিদ্ধ যবনফকির সেখ ফরিদের ধর্ম্ম-নীতি দ্বারা তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র যে কি, অদ্যাবধি তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

শাকতীয় কুলপতি মহাবীর তৈমুর ও তদীয় বংশধর বাবরের অভিযানের ঠিক মধ্যসময়ে রাঠোরগণ জিতবংশের উপর প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছিলেন। ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, তৈমুর জাক্সারতীস-কূল ও ভারতীয় মরুস্থলীতে লক্ষ লক্ষ জিতকে স্বকরে নিধন করিয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমান হয়, মধ্য আসিয়া হইতে বাহির হইয়া ঐ বীরজাতি ক্রমান্বয়ে সিন্ধুনদের পূর্ব্বকূলে আগমন করে। "যে জিতগণ অবশেষে বিকাকে আপনাদের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা ভারতের মরুস্থলীতে দীর্ঘকাল হইতে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের তাৎকালিক রাজ্যের বিস্তৃতি অনুশীলন করিলে আমাদের এ মীমাংসার প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে. কারণ, বিকানীরের প্রান্ত-ভাগস্থ প্রায় সমস্ত রাজ্যই সেই জিতগণের ছয়টি উপনিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই ছয়টি উপনিবেশ পুনিয়া, গোদারা, সারণ, আসিয়াব, বেণীবল ও জোহিয়া বা জোবিয়া নামে পরিচিত।

জোহিয়া উপনিবেশটিকে অনেকে যদুভট্টির শাখা বলিয়া গণনা করেন। অনুমান হয়, জিতকুল হইতে তাহাদের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য তাহারা ইহাদিগকে যদুবংশীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। প্রত্যেক উপনিবেশ এক একটি সম্প্রদায়ের নামে অভিহিত এবং প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি করিয়া জেলা ছিল। তদ্ব্যতীত ভাগোর, খেরীপাট্টা ও মোহিল নামে আরও তিনটি জনপদ তিনটি রাজপুত ভূম্যধিকারীর হস্ত হইতে আছিন্ন হয়। জিতদিগের ছয়টি উপনিবেশ মধ্য ও উত্তর এবং রাজপুত-গণের তিনটি পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের ন্যায় বিকার তেজ ও জয়-গৌরব ধীরে ধীরে এত বাড়িতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি একেবারে ২,৬৭০ খানি পল্লীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সমস্ত পল্লী কোন্ উপনিবেশের অন্তর্গত, পল্লীর সংখ্যা কত, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ জনপদ আছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল ;—

উপনিবেশ।	পল্লীসংখ্যা।	জনপদের নাম।
১। পুনিয়া	৩০০	শাঙ্কু, বাহাদিরান, রাজগড়, অজিতপুর, দদ্রিবো, শিদমুখ ইত্যাদি।
২। বেণীবল	১৫০	বাই, বুকর্কো, মনোহরপুর, কুই, সুন্দুরি, ইত্যাদি।
৩। জোহিয়া	৬০০	উদয়পুর, জৈতপুর, মহাজিন, কুম্বানো, পিপাসর ইত্যাদি।
৪। আসিয়াব	১৫০	ফোগ, রেয়োটসর, ব্রহ্মসর, দদ্দুসর ইত্যাদি।
৫। সারা	৩০০	গণ্ডেলি, বৈজুড়, বুচাবাস, শোবে, বাদিমু, শিরশিলা ইত্যাদি।
৬। গোদারা	৭০০	কালু, পুগু্সর, রঙ্গসর, শেখসর, গরমিসর, গরিবদেসর, গোঁসাইসর ইত্যাদি।
৭। ভাগোর	৩০০	জয়মলসর, বিকানীর, কৈলা, রিন্দীসর,

		রাজসর, সত্যসর, নাল, ছত্রগড়, বিট-নোখ, ভবানীপুর ইত্যাদি।
৮। মোহিলা	১৪০	বিদাসর, শৈন্দা, হেরসর, মুলশিসর, গোলাপপুর, চাররাস, খরবুজরাকোট, চৌপুর (মোহিলার রাজধানী)
৯। খেরীপাট্টা বা লবণ জনপদ	৩০	

এই সকল গ্রামের অধিবাসীরা বিকার অতুল গুণগরিমায় বিমুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে আপনাদিগের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু কালস্রোতে বিকার বংশধরগণের অদৃষ্টচক্র ঘোরতর পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আজি সেই ২৬৭০ পল্লীর মধ্যে কেবল ১৩০ খানি তাহাদের অধিকারভুক্ত আছে।

এই সকল প্রদেশের জিত ও জোহিয়াগণ উত্তরমরুভূমির সমস্ত প্রদেশে, এমন কি, গারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোমেষাদিচারণই উহাদের উপজীবিকা। পশুপক্ষীই তাহাদের সম্পত্তি। তাহারা সারস্বত নামক একশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে পশুপাল এবং দুগ্ধ, ঘৃত ও রোম বিক্রয় করিয়া তদ্বিনিময়ে শস্য এবং জীবননির্ব্বাহোপযুক্ত অপরাপর বস্তু সংগ্রহ করিত।

বিকার প্রতি সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরপ্রসন্ন। তিনি নিজ বীরত্বপ্রভাবে দেশজয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপক্ষের শোণিতপাত করিতে হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা বিদা মোহিলাগণের উপর জয়লাভ করিতে তাঁহার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু যদি জিতগণের মধ্যে অন্তর্বিবাদ না ঘটিত, তাহা হইলে তিনি তত শীঘ্র সেই বিশালরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইতেন না। গৃহবিপ্লবই রাজ্যের অনিষ্টের প্রধান হেতু। গৃহবিপ্লব হইতেই ভারতমাতার পদে কঠোর দাসত্বশৃঙ্খল অর্পিত হইয়াছে। যে কয়েকটি কারণে জিতগণ বিকার মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম জোহিয়া ও গোদারাদিগের মধ্যে কলহ। এই দুইটি সম্প্রদায় জিতগণের পূর্ব্বোক্ত ছয় উপনিবেশের মধ্যে প্রধান। দ্বিতীয়, বিকার ভ্রাতা বিদার বীরত্ব; বিদা তাহাদের নিকটস্থ, সুতরাং ভ্রাতার সহিত সমবেত হইয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তৃতীয়, তাহারা যশল্মীরের ভট্টি ও আপনাদিগের মধ্যে একটি প্রচণ্ড বাঁধ স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। চতুর্থ, বিকার সেনাদলের মহাবল ও রাজ্যলিপ্সা দর্শনে তাহাদের হৃদয়ে ভীতিবিত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিকা সেই সকল সৈন্য লইয়া জিতদিগের সমীপবর্ত্তী জাঙ্গলু নামক স্থলে অবস্থিত। একটু সুবিধা পাইলেই তাহারা নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই সকল কারণে গোদারার জিতগণ সমবেত হইয়া অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির করে যে, রাঠোরের হস্তে আত্মসমর্পণই কর্ত্তব্য।

গোদারাগণের মধ্যে একটি মণ্ডল ছিল, তাহার নাম পাণ্ডু। সেই ব্যক্তিই তাহাদের সকলের প্রধান। সেখসর তাহার বাসস্থান। পাকপত্তনের প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির সেখ ফরিদের নামে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। তথায় তাঁহার একটি দরগা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। জিতগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। কিন্তু যে দিন জিতকুমারী কেরণীমাতা নামে পূজিত হইল, সেই দিন হইতে ফরিদের সম্মানেরও হ্রাস হইয়া পড়িল। পাণ্ডুর নিম্নে রোণিয়ার মণ্ডল। ইহারা উভয়েই সেই সমবেত জিতসভ্যগণ কর্তৃক তাহাদের সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ মনোনীত হইল এবং বিকার নিকট গিয়া কহিল, যদি তিনি তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে সমস্ত জিত তাঁহাকে আপনাদের

আধিপত্য প্রদান করিবে। সেই কয়েকটি প্রস্তাব এই যে, জোহিয়া ও অপরাপর যে যে উপনিবেশের সহিত তাঁহাদের তখন বিরোধ, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বিকা তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। দ্বিতীয়, ভট্টিগণের উপদ্রব হইতে পশ্চিমপ্রান্তসীমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয় জিত সম্প্রদায়ের স্বত্ব অব্যাহত থাকিবে।

তিনটি প্রস্তাবেই বিকা সম্মতিদান করিলেন। তখন জিতগণ তাঁহাকে ও তদীয় বংশধরগণকে গোদারাদিগের উপর আধিপত্য প্রদান করিল। তাঁহার স্বত্ব এই যে, তিনি উপনিবেশস্থিত প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট এক টাকা হিসাবে "ধুয়া" কর এবং তাহাদের অধিকৃত প্রত্যেক একশত বিঘা ভূমির উপর দুই টাকা করিয়া রাজস্ব প্রাপ্ত হইবেন। এই নিয়ম সমভাবে চলিবে।

হঠাৎ জিতগণের মনে একটি সন্দেহ জন্মিল। হয় ত বিকা বা তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তাহাদের স্বত্বলোপ করিতে পারেন; হয় ত তাঁহারা তাহাদের উৎপীড়ন করিবেন, সুতরাং যাহাতে পরিণামে তাদৃশী বিশৃঙ্খলার উদ্ভব না হয়, তাহাই করা উচিত। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা বিকাকে কহিল, "আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ত আপনার করে অর্পিত হইল, এখন আপনি বা আপনার কোন উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করিলেও যাহাতে আমাদিগের স্বত্ব আচ্ছিন্ন করিতে না পারেন, তাহার কোন উপায় করুন।" উদারমতি রাঠোরবীর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাদিগের সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সেখসর ও রোণিয়ার জিতদ্বয় যতক্ষণ না আমাকে রাজটীকা প্রদান করিবে, তাবৎ আমি রাজা বলিয়া পরিগণিত হইব না। তোমাদের উভয়ের করেই আমার অভিষেকের ভার সমর্পিত হইল। তোমাদিগের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমি সিংহাসনের অভিলাষ করি না। তোমাদের উভয়ের উত্তরাধিকারীরা আমার বংশধরগণের ভালতটে যাবৎ রাজটীকা প্রদান না করিবে, তাবৎ তাহারাও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না, তাবৎ সিংহাসন শূন্য থাকিবে।" এই প্রকারে সেই বৃদ্ধ জিতদ্বয়ের নাম বিকানীর-ইতিবৃত্তে চিরদিনের জন্য দেদীপ্যমান রহিল।

জিতগণের হৃদয়ে স্বাধীনতালিপ্সা অত্যন্ত বলবতী বিকার করে আপনাদের আধিপত্য দিয়াও তাহাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল না। অর্জুনের বনবেষ্টিত তীরপ্রদেশ, জাক্কারতীদের শস্যশোভিত বালুকাভূমিময় ভারতের বিশাল মরুপ্রান্তর, এই সমস্ত স্থানের মধ্যে জিতগণ যেখানে যেখানে অবস্থিতি করে, সেই সেইখানেই ইহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার জ্বলন্ত নিদর্শন দৃষ্ট হয়। সেই সৎপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্ত্যর্থ তাহারা অম্লানমুখে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে। আজি ভারতে তাহাদের রাজকীয় স্বাধীনতার বিলোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই তেজস্বিনী স্বাধীনতা-লিপ্সা বিদূরিত হয় নাই। আজিও কোন রাজপুত কোন জিতের বাপোতা-হরণার্থ করপ্রসারণ করিলে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠে, "অগ্রে আমাকে সংহার কর, পরে আমার বাপোতা হরণ করিও।"

গৃহবিপ্লবে বিজড়িত হইয়া গোদারাগণ রাঠোরবীরকেশরী বিকাকে যে চিরস্থায়ী উচ্চতম সম্মান ও আধিপত্য প্রদান করিল, এইরূপ ঘটনা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের দ্বারা অনেক হিন্দুরাজার অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। সেই সকল উপকারের কৃতজ্ঞতাচিহ্ন অদ্যাপি সেই সমস্ত উপকৃত রাজসংসারে বিদ্যমান রহিয়াছে। অগুণা পানোরের পর্ব্বতগহনে বসিয়াও সেই স্মৃতি-নিদর্শন অদ্যাপি গিহ্লোটগণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অম্বরের ইতিবৃত্তে তৎপ্রদেশের আদিম অধিবাসী মীনদিগের এই প্রকার সম্মান দৃষ্ট হয়। কোটা ও বুন্দি উভয়েই হারাবতীর প্রাচীন ভূম্যধিকারিবর্গের স্মৃতিচিহ্ন স্ব স্ব নামে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং

রাঠোরবীর বিকার বংশধরেরা দুই প্রকারে সেই জিতদিগের কৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অদ্যাপি সেই জিতবৃদ্ধ পাণ্ডুর উত্তরাধিকারীরা বিকার বংশধরগণের কপালে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দেয়; তদুপলক্ষে নবাভিষিক্ত রাজা জিতের করে পঞ্চবিংশতি কাঞ্চনখণ্ড প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিকা আপন নগরপ্রতিষ্ঠার জন্য যে স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা একজন জিতের পৈতৃক সম্পত্তি। রাজার আগ্রহাধিক্য দেখিয়া সেই জিত বলিয়াছিল, "যদি আপনি এই নগরের সহিত আমার নাম চিরদিনের জন্য অক্ষয় রাখিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারি।" সেই জিতের নাম নৈর বা নীর। বিকা স্বনামের সহিত তাহার নাম সংযুক্ত করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের নাম রাখিলেন বিকানীর।

জিতগণের স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শনার্থ স্বয়ং রাজা ও তদীয় সামন্তজ্ঞাতিগণ বর্ষে বর্ষে নানাবিধ উৎসব করিয়া থাকেন। বিকার উত্তরাধিকারীরা দেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া গোদারাগণের সহিত সেই প্রাচীন সম্বন্ধবন্ধনের প্রতি তত সম্মান প্রদর্শন করে না সত্য, কিন্তু গোদারা জিতগণের স্মৃতিকে অদ্যাপি বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই;

হোলীপর্ব্ব ও দেওয়ালীর সময় সেখসর ও রোণিয়ার মণ্ডলদ্বয়ের উত্তরাধিকারীরা রাজা ও তাঁহার সামন্তগণকে তিলক প্রদান করে। রোণিয়ার জিত একখানি রজতথাল ও বাটিতে টীকা-প্রদানের উপকরণাদি স্থাপন করে এবং তাহার সহচর সেই সকল দ্রব্য লইয়া যথাক্রমে রাজটীকা দেয়। রাজা তাহাদিগকে একটি মোহর, পাঁচখণ্ড রৌপ্য ও তদীয় সামন্তগণ তাঁহার আদেশের অনুকরণে যথাসাধ্য অর্থ প্রদান করেন। তন্মধ্যে মোহর প্রভৃতি সেখসর জিত এবং রৌপ্যাদি অবশিষ্ট দ্রব্য রোণিয়ার মণ্ডল গ্রহণ করে।

জিতগণের প্রার্থনায় বিকা তাহাদের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যখন শপথ করিলেন, জিতগণের তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তখন তাহারা বিকার সৈন্যগণ সহ সমবেত হইয়া জোহিয়াগণকে আক্রমণ করিল। জোহিয়া-সম্প্রদায় অতি বিশাল; ঐ সম্প্রদায় উত্তর-মরুভূমি; এমন কি, শতদ্রুর পুলিনপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহাদের এই বিশাল উপনিবেশ একাদশ শত পল্লীতে সংগঠিত। কিন্তু কালের কি অদ্ভুত মহিমা! যে সহস্রাধিক পল্লী এক সময়ে অসংখ্য জিতে পরিপূর্ণ ছিল, আজি তাহাদের সামান্য নিদর্শনও দৃষ্ট হয় না। এমন কি, সেই জোহিয়াগণের নাম পর্য্যন্তও কালের অনন্ত গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

জোহিয়াদিগের মণ্ডলের নাম সেরসিংহ। ভুরোপাল নগরে সে ব্যক্তি বাস করিত; বিপক্ষ-গণকে উপস্থিত দেখিয়া সেরসিংহ নিজ সৈন্যগণকে একত্র করিল এবং অদম্য সাহস ও প্রচণ্ড বিক্রম সহকারে রাজপুত ও গোদারা-জিতগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল! কিন্তু কোন স্বদেশদ্রোহী কৃতঘ্নের করে তাহার প্রাণবিনাশ হওয়াতে জোহিয়াবংশের শোচনীয় দশা ঘটিল; তাহাদের পদে দাসত্বশৃঙ্খল সংবদ্ধ হইল; তাহাদের চিরসাধের ভুরোপাল নগরও বিজয়ী রাঠোরগণের অধিকৃত হইয়া পড়িল।

বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া রাঠোরবীর বিকা দলবল সহ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আশু ভট্টিগণের অধিকৃত ভাগোরজনপদের উপর তাঁহার রোষদৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি স্বীয় বাহুবলে ঐ জনপদ অধিকার করিলেন। ভাগোরজনপদ জিতগণের হস্ত হইতে ভট্টিকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিল। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আজি তাহা রাজপুতরাজের করগত হইল। রাজা শুভদিনে শুভক্ষণে সেই জনপদমধ্যে বিকানীরনগরী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রকারে মুন্দরত্যাগের ত্রিংশৎ

বর্ষ পরে ১৫৪৫ সংবতে (১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখমাসের পঞ্চম দিবসে বিকা কর্ত্তৃক বিকানীর নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ দিকে বিকার পিতৃব্য কণ্ডুল জিগীষা-প্রণোদিত হইয়া রাজ্যবিস্তারার্থ সসৈন্যে উত্তর-দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কণ্ডুল মহাযোদ্ধা বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারই বাহুবলের সাহায্যে বিকা রাজ্যজয় করিতে পারিয়াছিলেন। মহাবিক্রমে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমনপূর্ব্বক কণ্ডুল ক্রমে ক্রমে আসিয়াঘ, বেণীবল ও সারণ নামক তিনটি জিত-উপনিবেশ করগত করিলেন। ঐ তিনটি জনপদে আজিও কণ্ডুলের সন্ততিগণ অবস্থিতি করিতেছে; এখন তাহারা কণ্ডুলোট-রাঠোর নামে পরিচিত। কণ্ডুলোট রাঠোরেরা স্বভাবতঃ মহাতেজা ও স্বাধীনতাপ্রিয়। বিকানীররাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াও তাহারা অদ্যাবধি রাজাকে কর প্রদান করে না। তাহাদিগের নিকট কর চাহিলে তাহারা সদর্পে বলিয়া উঠে, "আমাদের অসিবলে এ দেশ অধিকৃত হইয়াছে।" রাজাকে তাহারা নামমাত্র মান্য করে;—যাহা করে, তাহাও প্রকৃত ইচ্ছাবশে নহে। অর্থলিপ্সা বা আবশ্যক-মতে যখন রাজা তাহাদের নিকট কর প্রার্থনা করেন, তখন তাহারা নির্ভীকহৃদয়ে বলিয়া উঠে, "কে তাঁহাকে রাজা করিয়াছে? যিনি করিয়াছেন, তিনি কি আমাদের সাধারণ পিতৃপুরুষ কণ্ডুল নহেন? তবে যিনি স্পর্দ্ধা করিয়া আমাদের নিকট কর প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি কে?"

রাঠোরবীর কণ্ডুলের বিক্রম ও প্রতাপে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার ভাগ্যাকাশে বিশাল কালমেঘের উদয় হইল; সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনও ইহলোক পরিত্যাগ করিল। তিনি মুসলমানের অধিকৃত হিসার দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া যবন-সম্রাটের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক রণভূমে নিপাতিত হইলেন।

পুগলের ভট্টিরাজের কন্যার সহিত বিকার বিবাহ হইয়াছিল। সেই ভট্টিরাজনন্দিনীর গর্ভে নূনকর্ণ ও গরসিংহ নামক দুইটি পুত্র জন্মে। নূনকর্ণের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া ১৫৫১ সংবতে (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে) বিকা ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। নূনকর্ণ রাজ্যলাভ করিলেন। গরসিংহ গরসিংহসর ও অমরসিংহসর নামক দুইটি নগর স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সংবরণ করিলেন। গরসিংহের সন্তানসন্ততিগণ গরসোট বিকা নামে অভিহিত। গরসিংহসর ও গরিবদেসর এই দুইটি নগরই তাঁহাদের প্রধান ভূমিসম্পত্তি। এই উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক নগরেই চতুর্ব্বিংশতি করিয়া পল্লী বিদ্যমান আছে।

রাজ্যলাভের অত্যল্পকাল পরেই নূনকর্ণ স্বীয় সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী ভট্টিগণের পল্লী অধিকার করিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পিতার জীবদ্দশাতেই তাঁহার নিকট হইতে মহাজিন ও এক শত চল্লিশটি পল্লী গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় অগ্রজস্বত্ব কনিষ্ঠ জেতের হস্তে প্রদান করিলেন। অতঃপর ১৫৫৩ সংবতে জেত বিকানীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাও উপযুক্ত ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার তিন পুত্র;—কল্যাণসিংহ, শিবজী ও ঐশপাল। জেতসিংহ স্বাধীন গ্রেসিয়া-সর্দারগণের নিকট হইতে নানোট জেলা আচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র শিবজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিদার সন্তানসন্ততিগণকে পরাজয় করিয়া তিনি তাহাদের নিকট বার্ষিক করসংগ্রহও করিয়াছিলেন।

১৫৫৩ সংবতে কল্যাণসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র;—রায়সিংহ, রামসিংহ ও পৃথ্বীসিংহ।

১৬৩০ সংবতে (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে) রায়সিংহ পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় হইতেই

জিতগণের চিরন্তন স্বত্ব বিনষ্ট হইল। এত দিন তাহারা সেই সকল স্বত্ব নির্ব্বিঘ্নে সম্ভোগ করিয়া বীরাচারে জীবনযাপন করিতেছিল, কিন্তু রাজপুতের জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তখন রাজপুতবৃন্দ তাহাদিগের প্রাচীন স্বত্ব আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। মন্দভাগ্য জিতগণ নৈতিক শক্তিভ্রষ্ট হইয়া একান্ত শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে অসি ও অশ্বের পরিবর্ত্তে হলগোধন অবলম্বন করিতে হইল। রায়সিংহের রাজত্বসময়ে বিকানীরের রাঠোরেরা মোগল-সাম্রাজ্যের অধীন অপরাপর রাজ্যের ন্যায় উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু অমূল্য রত্ন স্বাধীনতার বিনিময়ে তাহারা সেই উন্নতি ক্রয় করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর রায়সিংহ তাঁহার দেহের পবিত্র ভস্মাবশেষরাশি স্বয়ং সুরধুনীতীরে লইয়া উপস্থিত হন। তখন ভুবনপ্রসিদ্ধ আক্‌বর দিল্লীর সম্রাট্-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যশল্মীরের দুইটি রাজকুমারীর সহিত রায়সিংহ ও সম্রাট্ উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল। জনকের ঔর্দ্ধদৈহিক সৎকারান্তে রায়সিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ করেন। অতঃপর অম্বরপতি মানসিংহ তাঁহাকে আক্‌বরের সমীপে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মোগল-সম্রাট বিকানীরপতিকে যথোচিত সম্মানসহকারে চতুঃসহস্রের সেনাপতিপদে বরণ করিলেন এবং তাঁহাকে হিসার জনপদের ভার সমর্পণ করিয়া রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। সেই সময়ে যোধরাজ মালদেব সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়াতে আক্‌বর তাঁহার নিকট হইতে নাগোররাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া রায়সিংহকে প্রদান করিলেন। স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে এই সমস্ত সম্মান প্রাপ্ত হইয়া এবং সম্রাটের অন্যতম প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইয়া বিকানীরপতি স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াই ভ্রাতা রামসিংহকে ভুটনৈরের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। অচিরেই রামসিংহ বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া প্রফুল্লবদনে ভ্রাতৃরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

এ দিকে দুর্জ্জয় জোহিয়াগণ রায়সিংহের হস্তে সম্পূর্ণরূপে শাসিত হইল। ইতিপূর্ব্বে জোহিয়ারা দাসত্বনিগড় দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যম করিয়াছিল; কিন্তু সে উদ্যম বিফল হইয়া যায়; অধিকন্তু সেই দাসত্বনিগড় কঠোরতররূপে তাহাদের গলদেশে আবদ্ধ হয়। তাহাদিগকে দমন করিয়া রাজপুতবৃন্দ জোহিয়াদেশকে শ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের লোমহর্ষণ অত্যাচারে জোহিয়ারাজ্য একেবারে ছারখারে গেল। তদবধি জোহিয়ার শোচনীয় দশার বিমোচন হইল না। ক্রমে সেই জোহিয়ার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। জোহিয়া একপ্রকার মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। স্তূপীকৃত কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ব্যতীত এখন জোহিয়ার আর কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না।

জোহিয়াগণের গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ যে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সেকন্দর রুমীর (আলেকজন্দরের) নাম ক্ষোদিত আছে। কিংবদন্তী এইরূপ, বর্ত্তমান দদ্রুসরের অনতিদূরে রংমহল নামে যে ভগ্ন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, এক সময়ে তথায় একটি রাজা বাস করিতেন। মাসীডোনীয় মহাবীর তথায় আসিয়া তাঁহার রাজ্য নষ্ট করিয়া দেন। তদবধি ঐ স্থান মহাশ্মশানে পরিণত রহিয়াছে; পঞ্জাবের যে স্থানে সেই পাশ্চাত্যবীর গৌরবপ্রবীরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা জোহিয়াগণের সেই প্রাচীন বাসস্থান হইতে অতি নিকটবর্ত্তী; কিন্তু আলেকজন্দর গারা পার হইয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার সমসাময়িক ইতিবৃত্ত-লেখকেরা যদিও এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, তথাপি বক্রিয়া ও সিন্ধুনদের তীরে তিনি স্বনামে যে সমস্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তের বিষয় অনুধাবন করিলে একেবারে জোহিয়ার সেই প্রবাদকে

মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। অতএব অনুমান হয়, সেই সকল হিন্দুগ্রীক রাজ্যের কোন শাসনকর্তা সম্ভবতঃ পিথনের কোন উত্তরাধিকারী জোহিয়াগণের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক সেকন্দর রুমীর নাম অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়া থাকিবেন। সেই সকল ভুবনবিদিত প্রবাদে জানিতে পারা যায় যে, সেই জোহিয়া-রাজ্য চিরদিন সেইরূপ অনুর্ব্বর মরুভূমি ছিল না। তদ্দেশীয় ভট্টগ্রন্থেও দৃষ্ট হয় যে, হাকরা নদীর পরিশোষণের সহিত জোহিয়ারাজ্যও ধ্বংস হইয়াছিল।

কাগ্‌গার ও সাকরা শব্দের সহিত হাকরা শব্দের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতৎপ্রদেশের অধিবাসীরা "স" উচ্চারণ করিতে পারে না; তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের "হ" উচ্চারিত হয়। তাহারা বশল্মীরকে হসল্মীর বলে। এই কারণেই অনুমান হয়, সাকরার পরিবর্ত্তে হাকরা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাগ্‌গার এখন অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। সাকরা যদিও এক্ষণে শুষ্ক, তথাপি এক সময়ে শাহ কর্ত্তৃক ইহা তদীয় রাজ্যের সীমাবন্ধনীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাকরা সিন্ধুনদের সহিত সমান্তরাল-রেখায় প্রবাহিত হইত এবং সেই জন্য নাদির ইহাকে নিজ পারসিক রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমারূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক সিন্ধুনদের উপতটস্থ সমস্ত উর্ব্বর প্রদেশকে তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থপাঠে জানা যায়, সোদা রাজা হামিরের রাজত্বসময়েই এই জোহিয়ারাজ্যের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল।

জোহিয়াকুলের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইল। অতঃপর রায়সিংহ স্বীয় দলবল সহ পুনিয়া জিতদিগের প্রতিকূলে অগ্রসর হইলেন। জিতবংশের মধ্যে এই পুনিয়ারাই তখন স্বাধীনসম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু তাহাদের সেই সৌভাগ্য আশু অন্তর্হিত হইল। রাঠোরভুজবলে বিজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব মহামূল্য ভূমিসম্পত্তি জেতৃকরে প্রদান করিল। কিন্তু রায়সিংহ তাহাদের সেই সকল ভূমিতে রাজপুত-উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া জিতগণের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। তাহারা পরাভূত হইল বটে, কিন্তু প্রাণান্তে বিপক্ষের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল না। তখন তিনি তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের রাজ্যে রাজপুতবসতি স্থাপন করিলেন, তাঁহার বংশধরেরা রামসিংহোট নামে প্রথিত। তাহারা বিকানীররাজ্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা কণ্ডুলোটগণের ন্যায় বিকার বংশধরদিগের স্বল্পই বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে। সিদমুখ ও শঙ্কু নামক দুইটি নগর রামসিংহহোটদিগের প্রধান বাসস্থান।

যে দিন রায়সিংহের বাহুবলে পুনিয়া-জিতগণ পরাভূত হইল, সেই দিন বিকানীরের রাজমুকুটে আর একটি নূতন রত্ন স্থাপিত হইল; সেই দিন ছয়টি জিত উপনিবেশের রাজনৈতিক জীবন বিনষ্ট হইল;—তাহাদের হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে হলগোধন স্থাপিত হইল। তাহারা কৃষি ও মেষচারণ দ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বিলাসী রাজপুতদিগের বিশাল উদর পূরণ করিতে লাগিল।

সম্রাট্ আক্‌বর যখন যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, রাজা রায়সিংহ সেই সেই সময়ে স্বীয় প্রচণ্ড রাঠোরসেনা লইয়া তাঁহার সেনাদলের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। আহম্মদাবাদ নগরের অবরোধে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা মির্জ্জা মুহম্মদ হোসেনকে একটিমাত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধে সংহার করিয়া রায়সিংহ বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। রাজনীতিবিশারদ আক্‌বর রাজপুতগণকে ভালরূপেই চিনিতেন। স্বরাজ্যের উন্নতিবিধানার্থ রাজপুতবর্গকে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি রাজপুতবীরত্বের যে সম্মান করিয়াছিলেন, ভারতে আর কোন বিদেশীয় নৃপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। বিকানীরের রাজবংশের সহিত মোগলের সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য আক্‌বর রায়সিংহের

কন্তার সহিত আপনার পুত্র সেলিমের পরিণয় সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বৈজাত্য-বিবাহের বিষময় ফল—মন্দভাগ্য পারাবেজ।

১৬৮৮ সংবতে (১৬৩২ খৃষ্টাব্দে) রায়সিংহের পুত্র কর্ণ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পিতার জীবিতাবস্থাতেই দৌলতাবাদের শাসনকর্তৃত্ব ও দুই সহস্রের সৈন্তাপত্যভার তাঁহার প্রতি প্রদত্ত ছিল। অধিকাংশ রাজপুতের ন্তায় কর্ণও রাজকুমার দারা শিকোর পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, তখন তিনি দারার প্রবল শত্রু সেনাপতির সহিত একত্রে কাজ করিতেন। এই হেতু সেই যবন-সেনাপতি তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিপাত করিবার জন্ত একটি ষড়্‌যন্ত্র রচনা করিল; কিন্তু বুন্দির হাররুপতির প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া রাজকুমার তাহাদের ষড়্‌যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিকানীরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি পুত্র;—পদ্মসিংহ, কেশরীসিংহ, মোহনসিংহ ও অনুপসিংহ।

ভারতের রাজপুতজাতি যেরূপ রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে জানে, বোধ হয়, জগতের আর কোন জাতিই সেরূপ রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না। রাজার উপকারার্থ তাহারা অম্লানমুখে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে। মোগলসাম্রাজ্যের গৌরবরক্ষার্থ তাহারা যে কিরূপে আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, রাজস্থানের ইতিবৃত্তই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। তন্মধ্যে বিকানীরের ইতিবৃত্তে আর একটি জলন্ত আদর্শ বর্ণিত আছে। বিজয়পুরবিপ্লবের সময় কর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র জীবন-বিসর্জন করেন। তৃতীয় মোহনসিংহের মৃত্যু যেরূপ শোচনীয়, তাহা পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

একটি মৃগশিশু লইয়া শাহজাদার শ্যালকের সহিত মোহনসিংহের কলহ ঘটে। সেই সূত্রে আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে বিকানীররাজপুত্র স্বহস্তে সেই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন; স্থানাস্থান ও কালাকাল বিবেচনা না করিয়া সেই প্রাসাদের মধ্যেই যবনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই যুদ্ধে তাঁহারই মৃত্যু হইল। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রাতা পদ্মের কর্ণগোচর হইল। ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যুতে ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়া বিকানীররাজপুত্র কতিপয় সামন্তসহ সত্বর সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন, মোহনসিংহ রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত রহিয়াছেন; যবন তাঁহার উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তখনও উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে দণ্ডায়মান। পদ্মসিংহকে ক্রুদ্ধকেশরীর ন্তায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া যবনরাজশ্যালক ভয়ে আমখাসের একটি স্তম্ভপার্শ্বে লুকায়িত হইল; কিন্তু পদ্মসিংহের প্রচণ্ড প্রতিজিঘাংসা হইতে অব্যাহতি পাইল না। ভ্রাতৃশোকোন্মত্ত রাঠোররাজপুত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া এরূপ সবলে তাঁহাকে আঘাত করিলেন যে, যবনের শরীরের সহিত সেই স্তম্ভও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অতঃপর অনুজের মৃতদেহ লইয়া পদ্মসিংহ স্বীয় সৈন্তসামন্তগণের সহিত নিজ আবাসভবনে প্রস্থান করিলেন এবং জয়পুর, যোধপুর, হারাবতী প্রভৃতি সমস্ত সামন্ত-রাজগণকে একত্র করিয়া ভ্রাতার অন্তায়নিধনবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক যবনরাজের প্রতিকূলে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যবনের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইব।" তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্ত রাজপুত্র মৌজাম জনৈক ওমরাওকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না, ক্রুদ্ধ রাজপুতরাজগণ কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা রাজধানী হইতে বিংশতি মাইলেরও অধিক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় যবনরাজকুমার স্বয়ং তাঁহাদিগের

নিকট আগমন করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর সন্ধির প্রস্তাব হইল। মৌজাম তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুতগণের রোষানল প্রশমিত হইল; তাঁহারা আপন আপন সেনানিবেশে প্রতিগত হইলেন। এই ঘটনার পরেই পদ্মসিংহ ও কেশরী-সিংহ সম্রাটের সাহায্যার্থে রণক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করেন। কিংবদন্তী আছে, কেশরীসিংহ মল্লযুদ্ধে একটি সিংহকে বধ করাতে সম্রাট্ তাঁহাকে কেশরীনামের সহিত পঞ্চবিংশতি পল্লীর একখানি জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। কেশরীসিংহ একটি দুর্দ্দান্ত হাবসী-সেনাপতিকে সংহার করিয়া অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন, সুতরাং ১৭১১ সংবতে (১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে) অনুপসিংহ বিকানীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তদীয় ভ্রাতৃগণের সেবাতে যার পর নাই প্রীত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে পঞ্চসহস্রের সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক আডোনী-দুর্গ ও তৎসংবলিত সমস্ত ভূসম্পত্তি এবং বিজয়পুর ও আরঙ্গাবাদের শাসনভার সমর্পণ করিলেন। যোধরাজের সহিত অনুপসিংহও আফগানদিগের বিদ্রোহদমনার্থ আপন দলবল সহ সেই দূরদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত বলপ্রভাবে যবনদল পরাস্ত হইলে তিনি দক্ষিণাবর্ত্তে প্রতিগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। ফেরিস্তাগ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি দক্ষিণাবর্ত্তেই প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টগণের কাব্যগ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি শিবিরসন্নিবেশনের উদ্‌যোগ করিলে মুসলমান-সেনাপতি তাহাতে আপত্তি করেন। তজ্জন্য বিকানীরপতি বিরক্ত হইয়া সসৈন্যে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন। রাজধানীতে প্রত্যাগমনের অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি স্বরূপসিংহ ও সুজনসিংহ নামে দুইটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১৭৬৫ সংবতে (১৭০৯ খৃষ্টাব্দে) স্বরূপসিংহ বিকানীরের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন রাজ্যসুখসম্ভোগ ঘটে নাই। অনুপসিংহ বিরক্ত হইয়া রাজকীয় সেনাকে পরিত্যাগ করিলে সম্রাট্ তাঁহার নিকট হইতে আডোনী আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। সেই হৃতসম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিতে গিয়া স্বরূপসিংহের প্রাণবিয়োগ হয়।

স্বরূপ লীলাসংবরণ করিলে তদীয় ভ্রাতা সুজনসিংহ বিকানীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বে বর্ণনযোগ্য কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই।

১৭৯৩ সংবতে (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) বিকানীরের সিংহাসন জোরাবরসিংহ অধিকার করিলেন। ইঁহার রাজত্ব সম্বন্ধেও কোন বিশেষ বর্ণনযোগ্য ঘটনা দৃষ্ট হয় না।

অতঃপর ১৮০২ সংবতে (১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) গজসিংহ বিকানীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া একচত্বারিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভট্ট ও ভাওয়ালপুরের খাঁর সহিত তাঁহাকে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। ঐ উভয় শত্রুই তাঁহার হস্তে পরাজিত হয়। প্রথম শত্রুর নিকট হইতে তিনি রাজসর, কৈলা, রণৈর, সত্যসর, বুন্নিপুর, মুটালৈ ও অনেকগুলি সামান্য সামান্য পল্লী আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শত্রু খাঁ ভীত হইয়া তাঁহাকে অনুপগড় দুর্গ প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

ভাওয়ালপুরের প্রতিষ্ঠাতা দাউদ খাঁর সন্তানসন্ততিগণ দাউদপুত্র নামে প্রথিত। শিষ্টান-রাজ্যে দাউদ খাঁর জন্ম। দুর্জ্জয় দাউদপুত্রগণের আক্রমণ রোধ করিবার নিমিত্ত রাজা গজসিংহ অনুপ-সিংহ-গড়ের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী একটি বিস্তৃতপ্রদেশের সমস্ত কূপ মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ করিয়া সমগ্র স্থলকে মরুশ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিলেন।

রাজা গজসিংহ একষষ্টিটি সন্তান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে ছয়টির জন্ম। ঐ ছয়জনের মধ্যে ছত্রসিংহ শৈশবেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাজসিংহ বিমাতৃ-প্রদত্ত বিষ-প্রয়োগে বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। শূরতান ও অজিবসিংহ জ্যেষ্ঠের দুর্দ্দশা দর্শনে বিমাতার বিদ্বেষবহ্নি হইতে পরিত্রাণলাভের জন্ম পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়পুরে পলায়ন করেন। সুরত-সিংহ রাজা হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্যামসিংহ বিকানীরের মধ্যে একটি উপযুক্ত ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার নিরুদ্বেগে অবস্থিত ছিলেন।

শৈশবেই ছত্রসিংহের মৃত্যু হয়, সুতরাং দ্বিতীয় রাজকুমার রাজসিংহ পিতার মৃত্যুর পর সিংহা-সন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ত্রয়োদশ দিনের অধিক তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হয় নাই। চতুর্দ্দশ দিবসে তদীয় বিমাতা আপন পুত্র সুরতের জন্ম তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে সংহার করিল। সুরতের পিশাচী জননী কর্ত্তৃক রাজসিংহ নিহত হইলে সিংহাসন শূন্য হইল সুরত জননীর উপযুক্ত পুত্র, তিনি তখনই সেই শূন্যসিংহাসন অধিকার করিবার অভিলাষে নিজ অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভ্রাতৃগণকে স্থানান্তরিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন।

বিষপ্রয়োগে যখন রাজসিংহের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জ্যেষ্ঠের নাম প্রতাপসিংহ, কনিষ্ঠের নাম জয়সিংহ। রাজসিংহ অনন্তধামে প্রস্থিত হইলে বলপূর্ব্বক রাজপদী অধিকার না করিয়া দুর্ব্বৃত্ত সুরত কৌশলে স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অতঃপর তিনি রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইলেন এবং অষ্টাদশমাস অতিসতর্কতা ও চতুরতার সহিত কার্য্য করিয়া অর্থ ও সুমিষ্টবাক্যে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণকে বশীভূত করিলেন। অষ্টাদশমাস অতীত হইল; আর কত দিন তিনি প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত থাকিবেন? পরিশেষে সুরতসিংহ মহাজিন ও রাহাদিয়ানের ঠাকুরদ্বয়ের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; আপন অভীষ্টসিদ্ধির অভি লাষে তাঁহাদের সহায়তা পাইবার জন্ম তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ভূমিবৃত্তিও প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই গূঢ় দুরভিসন্ধি তখন বিশ্বস্ত বক্তিয়ারসিংহ ব্যতীত আর কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বক্তিয়ারসিংহের পিতৃপিতামহগণ চারিপুরুষ ধরিয়া বিকানীরের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন; তাঁহারা পরমবিশ্বস্ত। অধুনা সেই ষড়্যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহা বিফল করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তখন নিতান্ত অসময়, চক্রিগণের চক্রান্ত তখন প্রায় কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল; বিশেষতঃ তিনি দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক কারা-রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর সুরত তরবারি সাহায্যে বাধা-বিঘ্ন দূর করিবার ইচ্ছায় বাতিন্দা হইতে কতকগুলি সেনা সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু শিশু রাজপুত্রকে করগত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরি-শেষে তিনি বিকানীরের সামন্তগণকে বলিয়া পাঠাইলেন, "সুরতসিংহের আজ্ঞায় সকলে রাজধানীতে আগমন করিবে।" কিন্তু সেই কাপুরুষ সর্দ্দারদ্বয় ভিন্ন আর কেহই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন না। তৎকালে সেই মহাতেজা রাঠোরসর্দ্দারগণ যদি একত্র হইয়া সুরতসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিতে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে বৃথা আর বীরকেশরী বিকার সন্তানসন্ততিদিগের শোণিতপাত হইত না; কিন্তু সেই অভিতপ্ত ঠাকুরগণ তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার কোন আয়োজন না করিয়া নিজ নিজ দুর্গ মধ্যে সংস্থিত থাকিলেন। এ দিকে সুরত সমস্ত সেনা একত্র করিয়া নহরনামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, তথায় বকুকোর সর্দ্দারকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সর্দ্দার উপস্থিত হইলে সেই নহরদুর্গে তাঁহাকে রুদ্ধ রাখিয়া অজিতপুর নামক নগরের অভিমুখে গমন করিলেন। আশু সেই নগর তাঁহার কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেল। সুরতসিংহ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক শক্রনগরের

দিকে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই সেই নগরে আপতিত হইলেন। তত্রত্য অধিপতি দুর্জ্জনসিংহ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত নগররক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন তদীয় চেষ্টা বিফল হইবার উপক্রম হইল, তখন স্বীয় আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বন্দী হইল। জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সুরতসিংহ শত্রুর সামন্তগণের নিকট হইতে অর্থদণ্ডস্বরূপ দ্বাদশ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর চুরু নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর আক্রান্ত হইল। নাগরিকবৃন্দ ছয়মাস পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিল; কিন্তু কারারুদ্ধ বকুবৌ-সর্দ্দার স্বীয় স্বাধীনতার নিক্রয়স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে সেই চুরুনগর করগত করিয়া তৎকরে প্রদান করিল এবং তাঁহাকে তন্নগরের লুণ্ঠন হইতে নিবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছায় দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিল। সুরত চুরু লুণ্ঠন করিলেন না, অচিরে আপন রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দুর্জ্জয় সুরতসিংহ অতুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিকানীরে প্রত্যাগত হইলেন এবং সিংহাসনলাভের প্রধানতম প্রতিরোধক স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাজাকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেই শিশুপুত্র সুরতের ভগিনীর নিকটে ছিলেন। সুরতের ভগিনী স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীলা ও সর্ব্বদা অবহিত। আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি ক্ষণকালের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতেন না, সুতরাং সুরতের সেই দুরভিসন্ধি আশু সুসিদ্ধ হইল না। অতঃপর তিনি স্বীয় ভগিনীকে স্থানান্তরিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজনন্দিনীর বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও পরিণীতা হন নাই। সুরত তাঁহার বিবাহ দিয়া স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। নীরাবরের রাজার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল; কিন্তু বিবাহে রাজনন্দিনীর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিবাহ করিলে পাছে ভ্রাতুষ্পুত্র অন্যের হস্তে পতিত হন, এই আশঙ্কায় তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, চিরকুমারী থাকিয়া এ জন্ম অতিবাহিত করিবেন, তথাপি প্রাণাধিক প্রতাপসিংহকে চক্ষুর অন্তরাল করিবেন না। বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া তিনিভ্রাতাকে কহিলেন, "এ বয়সে আর এখন বিবাহে অভিলাষ নাই।" ভ্রাতাকে এই বলিয়াই তিনি নীরাবররাজকে 'নিবর্ত্তিত করিবার জন্য তৎসকাশে বলিয়া পাঠাইলেন, 'ইতিপূর্ব্বে মিবারের রাণা অরিসিংহের সহিত তাঁহার পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।" এই সংবাদ পাইয়া নিষধপতি নলের বংশোদ্ভূত নীরাবররাজ রাঠোররাজনন্দিনাকে বিবাহ করিতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; সুরতসিংহপ্রদত্ত তিন লক্ষ টাকার যৌতুকের লোভে পরক্ষণেই তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল; তখন তিনি বিবাহ করিতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা রাখিলেন না। রাজকুমারীর সমস্ত আপত্তি উপেক্ষিত হইল। তিনি পরিশেষে নীরাবরপতির করে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ভ্রাতার সেই প্রকার ব্যবহার দর্শনে তিনি সাতিশয় সন্দিহান হইলেন এবং দারুণ অভিমান সহকারে বলিলেন, "নিশ্চয় আপনার অন্তরে কোন দুরভিসন্ধি আছে, নচেৎ আমাকে বিদায় দিবার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন?" সুরতসিংহ আপন দুরভিসন্ধি গোপন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে বলিলেন, "ভগিনি, তুমি ভয় করিও না, হৃদয় হইতে সন্দেহ দূর করিয়া দেও, তোমার প্রাণাধিক প্রতাপসিংহের পদে একটি কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না।" নির্দ্দয় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু রাজকুমারীর প্রস্থানের সহিত তাহার সে প্রতিজ্ঞাও শূন্যে বিলীন হইল। হতভাগ্য রাজপুত্র তাহার প্রচণ্ড বিদ্বেষাগ্নিতে পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইলেন। প্রসিদ্ধি আছে, দুরাচার সুরতসিংহ রাজপুত্রের প্রাণসংহারার্থ মহাজিন-সর্দ্দারের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্দ্দার সেই নৃশংসকার্য্যে অগ্রসর না হওয়াতে সুরতসিংহ স্বহস্তেই রাজপুত্রের শ্বাসরোধ করিয়া তদীয় সুকোমল প্রাণ সংহার করেন।

বীরকেশরী বিকার সিংহাসনে একজন ভ্রাতৃপুত্রহন্তা পাপিষ্ঠ অধিরোহণ করিল। সুরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় শূরতানসিংহ ও অজিবসিংহ জয়পুরে অবস্থিতি করিতেন। ১৮৫৮ সংবতে (১৮০১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহারা ভুটনৈরে উপস্থিত হইলেন এবং রাষ্ট্রাপহারককে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার অভিলাষে বিকানীরের অভিতপ্ত সর্দ্দারগণের উপসামন্ত ও ভট্টিদিগকে একত্র করিলেন। কিন্তু সেই সমবেত সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সুরতসিংহের আক্রোশভয়ে তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল না, উৎকোচে বশীভূত হইয়াও অনেকে তাঁহাদের সহায়তা করিতে অনিচ্ছুক হইল। তখন রাষ্ট্রাপহারী স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়কে আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। আশু বিগোর নামক স্থানে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উভয়পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ হইল। পরিশেষে তিন সহস্র ভট্টিবীর রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। সুরতসিংহ জয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার বাধাবিঘ্ন সমস্তই দূর হইল; তাঁহার রাষ্ট্রাপহরণের পথ পরিষ্কৃত ও নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিল। সেই মহান্ জয়ের চিরস্থায়ী নিদর্শনস্বরূপ তিনি ফতেগড় নামক একটি দুর্গ স্থাপন করিলেন।

সুরতসিংহ কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বত্রই স্বীয় প্রভুতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রচণ্ড বিদাবৎগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগের ভূসম্পত্তি হইতে তিনি পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা আদায় করিলেন। ইতিপূর্ব্বে চুরুনগরের অধিবাসীরা সুরতের শত্রুপক্ষের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, এখন তাহারা সেই কার্য্যের প্রতিশোধ প্রাপ্ত হইল। তাহাদের নগর অবরুদ্ধ হইল, পরিশেষে বিপুল অর্থদণ্ড দিয়া তাহারা পরিত্রাণ পাইল। এই অত্যাচারবৃত্তান্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু সুরতের শত্রুপক্ষ তদ্বিরুদ্ধে একত্র হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদের অনেকেরই নগরাদি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান করিলেন। সে সময়ে কেবল ছানী নামক দুর্গ সুরতসিংহের সেই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিল। ঐ নগর বাহাদিরাণের অধীন ছিল। রাষ্ট্রাপহারকের প্রচণ্ড আক্রমণ এইস্থলে প্রতিরুদ্ধ হইল। ক্রমাগত অর্দ্ধবর্ষব্যাপী অবরোধে বিফলমনোরথ হইয়া সুরত স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছু দিন পরে তিয়ারের কেরাণী-সর্দ্দার ও তাহার অধিপতি ভাওয়াল খাঁর মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। কে[illegible] ভাওয়াল খাঁকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে সুরতসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করে। সেই ঘটনাকে চতুর সুরতসিংহ আপনার উন্নতির আর একটি অবলম্বন বলিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সুযোগে দুর্দ্দান্ত দাউদপুত্রগণ অনেক পরিমাণে দমিত হইয়াছিল। কিছু দিনের মধ্যে সুরতসিংহ আপন সেনাদল সমভিব্যাহারে কেরাণী-সর্দ্দারের সহায়তায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়দলে যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে রাঠোর সেনারই জয় হইল এবং শত্রুকুলের মোজগড়-দুর্গ বিজিত হইল। হিন্দুসিংহ নামক একজন ভট্টি বীর উক্ত দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। হিন্দুসিংহ বিকানীরের প্রধান সেনাচালক। তিনি গভীর রাত্রিকালে মোজগড়ের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দুর্গস্থ সেনা এবং দুর্গাধ্যক্ষ মহম্মদ মরূপ কেরাণীকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে উর্দ্ধ পণ দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। মোজগড় জয় করিবার সময় হিন্দুসিংহ যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রহিয়াছে, পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বিকানীর-সৈন্যদিগের হৃদয়ে আজিও অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে।

যে কেরাণী সর্দ্দার বিকানীরের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার নাম খোদাবক্স। দাউদ-পুত্রদিগের প্রসিদ্ধ জায়গীর তিয়ারো তাহার ভূসম্পত্তি। তিন শত অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত পদাতিক

সেনাসহ খোদাবক্স সুরতসিংহের শরণগ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে কহিল, "আপনি আমাকে সাহায্য করিলে আমিও সময়ে আপনার সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিব। দেখিবেন, আমার সহায়তায় আপনি সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন।" এই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সুরতসিংহ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, তাহার জন্য বিংশতি পল্লী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাহার ভরণপোষণার্থ প্রত্যহ এক শত করিয়া টাকা প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর খোদাবক্সের অনুসন্ধানার্থ বিশাল সেনাকটক সুসজ্জিত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে বিকার সন্তানেরা সসজ্জবেশে উপস্থিত হইয়া সেই প্রচণ্ড রাঠোরসেনার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। এই প্রকারে অল্পদিনের মধ্যেই ২,১৮৮ অশ্বারোহী ৫,৭১১ পদাতিক এবং ২৯টি কামান সংগৃহীত হইল।

এই প্রচণ্ড বাহিনীর পরিচালনভার দেওয়ানের পুত্র জৈতরো মেতোর করে প্রদত্ত হইল। ১৮৫৬ সংবতে (১৮০০ খৃষ্টাব্দে) মাঘমাসের ত্রয়োদশ দিনে রাঠোর সেনাপতি সেই সেনাকটক লইয়া কুনাসহর, রাজসহর, কৈলি ও রানৈরের মধ্য দিয়া আনগড়ে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে শিবগড় ও মোজগড় উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়ী মেতো ফুলারানগরীতে আপতিত হইলেন। এইসকল নগর ও নাগরিক তাঁহার নিকট পরাজিত হইল। ফুলারাতে সর্ব্বসমেত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, নয়টি কামান এবং আরও কতকগুলি বহুমূল্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বীয় বিজয়িনী সেনাসমভিব্যাহারে সিন্ধুনদের দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী ক্ষীরপুরনগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অপরাপর বিদ্রোহী সেনানী তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলে জৈতরো রাজধানী ভাওয়ালপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজধানীর সমীপে গিয়া নিজ সেনাদল সন্নিবেশপূর্ব্বক তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ইহাতে বিকার যে বিলম্ব হইল, ভাওয়াল খাঁ সেই অবসরে আপন প্রধান প্রধান সামন্তদিগকে রাজপুতসেনা হইতে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। যুদ্ধ বাধিল না। কেবল আক্রমণেই বিকানীরের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে মনে করিয়া জৈতরো মেতো লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতসহ বিকানীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সুরতসিংহ তাঁহাকে কাপুরুষ জ্ঞানে ঘৃণা করিয়া সেই উচ্চপদ হইতে বিচ্যুত করিলেন।

একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ভট্টিগণ বিগোর-সংগ্রামের দুই বর্ষ পরে বিকানীর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদের সে উদ্যম বিফল হইল। পরন্তু ভগ্নোদ্যম ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহারা আশু ক্ষান্ত হইল না। সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রামে দুই পক্ষেরই সেনানাশ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬১ সংবতে (১৮০৫ খৃষ্টাব্দে) সুরতসিংহ সেই প্রচণ্ড বিদ্রোহদমনার্থ ভট্টিগণের অধিপতি আবতা খাঁকে তদীয় রাজধানী ভুটনৈরে আক্রমণ করিলেন। অর্দ্ধবর্ষব্যাপী অবরোধের পর ঐ নগর বিকানীরপতির অধিকৃত হইল এবং ভট্টিগণের অধীশ্বর আবতা খাঁ স্বীয় সৈন্য ও ধনসম্পত্তি লইয়া রানিয়া নামক নগরে বিতাড়িত হইলেন।

যে সময়ে যোধপুররাজ মানসিংহ এবং অপ-নৃপতি ধনকুলের মধ্যে বিষম বিগ্রহের সূত্রপাত হয়, সুরতসিংহ তখন অপ-নৃপতির পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক চব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই অতুল সম্পত্তি বিকানীরের প্রায় পাঁচ বৎসরের রাজস্ব হইবে। তিনি স্বয়ং আপনার সেনাকটক লইয়া যোধপুরের অবরোধে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তত পরিশ্রম, তত অর্থব্যয় সকলই বিফল হইয়াছিল। দারুণ অপমান ও মর্ম্মবেদনার সহিত পরিশেষে তিনি সসৈন্যে আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। সেই কঠোর মর্ম্মবেদনা হইতে তাঁহার বিষম পীড়া সঞ্জাত হয়। সেই দারুণ

রোগ দেখিতে দেখিতে উৎকটতর হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা আশা-ভরসা বিসর্জ্জন দিলেন, পুত্রকলত্রগণ কাতরস্বরে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন;—এমন কি, অন্ত্যেষ্টিবিধানের আয়োজন পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ সাহ্লাদে সেই শেষসৎকারে যোগদান করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু তাহাদের সে আনন্দচিহ্ন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। সুরতসিংহ দেখিতে দেখিতে রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ক্রমে দৈহিক স্বাস্থ্য ও বল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজা প্রশান্ত প্রজাপুঞ্জের শোণিতপাতপূর্ব্বক স্বীয় শূন্যভাণ্ডার পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার উৎপীড়নে প্রজাপুঞ্জ একান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পৈশাচিকী স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া সুরতসিংহ অন্ধপ্রায় হইয়া পড়িলেন; তিনি উপকারী বন্ধুদিগেরও সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না এমন কি, তিনি মহোপকারী বুকার্কোসর্দ্দারেরও প্রাণসংহার করিলেন। দেখিতে দেখিতে সিদ্‌মুখের নাহুর খাঁ এবং গণ্ডেগিরির জ্ঞানসিংহ ও গোপালসিংহও তাঁহার কোপাগ্নিতে আশু পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন। প্রধান বাণিজ্যবন্দর চুরু তৃতীয়বার আক্রান্ত হইল। তত্রত্য শাসনকর্ত্তা সুরতের ভীষণ আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ না হইয়া আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন।

রাজ্যমধ্যে অমঙ্গলের সীমা রহিল না। যাহার উপর প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখ নির্ভর করে, সেই রাজাই অত্যাচারীর পিশাচ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে পশুর ন্যায় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ অত্যাচারের জন্য রাজ্য বিশৃঙ্খল হইলে দুর্দ্ধর্ষ রাৎ (ভটিদস্যুগণ) দলে দলে আপতিত হইয়া প্রজাদিগের শস্য ও গোধন হরণ করিতে লাগিল। রাজা প্রজাপুঞ্জের মুখের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না। অতঃপর প্রজাবৃন্দ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রিটিশরাজ্যের প্রান্তসীমাস্থিত হাঁসি হেরিয়ানা জনপদে গিয়া বাস করিল। ইংরাজেরা তাহাদিগকে সাদরে স্থান-দান করিলেন। যে দিন শিরষানগরী এবং ভটিপতি মাহাদুর খাঁর অধিকৃত ভূমিসম্পত্তি ইংরাজ-দিগের অধিকৃত হয়, সেই দিন হইতে কতকগুলি দস্যু দলে দলে বিকানীরের উত্তরসীমাস্থ কৃষক-গণের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে নানারূপে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সেই সময় হইতে সেই সকল কঠোর উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত জিৎগণ স্থানে স্থানে পরিখা বেষ্টিত একরূপ মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেই মৃন্ময় দুর্গের উপরিভাগে এক এক জন রক্ষক কতক-গুলি অস্ত্রশস্ত্র ও এক একটি নাগরা লইয়া অবস্থিত থাকে। বিপক্ষের আক্রমণের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সে তৎক্ষণাৎ ঘোরনিঃস্বনে সেই নাগরা বাদিত করে। তৎক্ষণাৎ জিৎগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুসজ্জিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিকার একটি ভ্রাতার নাম বিদা। বিদাবতী নগরী সেই বিদাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নূতন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া বিদা কতিপয় সেনাসহ মুন্দর হইতে সর্ব্ব-প্রথম গদবারের দিকে যাত্রা করিলেন। গদবাররাজ্য তখন রাণার অধিকারে ছিল। তাঁহার আগ-মনসংবাদ পাইয়া গদবারের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে মহাসমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। বিদা তৎ-প্রতি কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিলেন না। তিনি ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া মোহিল-কুলের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। মোহিলকুল অতি প্রাচীন। অনেকে ইঁহাদিগকে ষট্‌ত্রিংশবৎ রাজপুতকুলের অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যৎকালে বিদা মোহিলরাজ্যে উপস্থিত হন, তখন চোপুর নগরে মোহিলগণের অধিপতি নিজ রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক এক শত চল্লিশটি পল্লীর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার উপাধি ঠাকুর। তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়া সুচতুর বিদা রাজ্য অধিকার করিবার উপায়

অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, বলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় না; সুতরাং ছল বা কৌশলই অবলম্বনীয়। তিনি রাজপুত, তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, যে কোন উপায়ে হউক, ভূমিলাভ করাই রাজপুতের পক্ষে পুণ্যকর। এই বিশ্বাসবশতঃ বিদা বিশ্বাসঘাতকতাকে মস্তকে লইয়া অভীষ্টসাধনের উদ্যম করিলেন। তিনি মারবারের রাজপুত্রীর সহিত মোহিলরাজপুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহে দুই পক্ষেরই সম্মতি হইল। বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে বিবাহযোগ্য আয়োজন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শুভদিন সমাগত। বিদা কন্যার আত্মীয় ও রক্ষকস্বরূপে কন্যাযাত্রীদিগকে মোহিলদুর্গে লইয়া গেলেন। কেহই তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ হইল না। দুর্গমধ্যস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মোহিলঠাকুরের দলবল উৎসবোচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে কতকগুলি সমাচ্ছাদিত শিবিকা ও শকট দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। মোহিলসর্দ্দারেরা আনন্দে তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, হঠাৎ অদ্ভুত দৃশ্য! আচ্ছাদিত শিবিকা-শকটাদির মধ্য হইতে অসংখ্য সশস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ বহির্গত হইয়া মোহিলের প্রধান প্রধান বীরগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ পৈশাচী বৃত্তির সাহায্যে বিশ্বস্ত মোহিলগণকে নিপাত করিয়া বিদা চৌপুরদুর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেনাসংখ্যা অধিক নহে, সেই জন্য তিনি দুর্গদ্বার নিয়ত রুদ্ধ রাখিতেন। এ দিকে মহারাজ যোধ এই সকল সংবাদ পাইয়া পুত্রের সাহায্যার্থ নূতন সেনাবল প্রেরণ করিলেন।

বিদার পুত্রের নাম তেজসিংহ। বিদাসহর তেজসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পিতার স্মরণার্থ তিনি তন্নামে এই নগরের নামকরণ করেন। বিদাবৎ-সম্প্রদায় বিকানীরের মধ্যে মহা প্রতাপশালী। এই সম্প্রদায়ের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে রাজার অধিকার নাই। নির্দ্দিষ্ট বিধি ভিন্ন তাহাদের প্রতি কোন নূতন বিধি বা কর নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। মোহিলগণের প্রাচীন নগর চৌপুরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিভাগ একটি বিশাল উর্ব্বর জনপদ, বর্ষা ঋতুতে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়, এখানে গোধম জন্মে। এই মরুস্থলটি দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ এবং প্রস্থে তিন ক্রোশ। ইহাতে একশত চল্লিশটি পল্লী এবং প্রায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার লোক অবস্থিতি করিত। তাহার এক-তৃতীয়াংশ রাঠোর। বিদাবতী দ্বাদশটি জায়গীরে বিভক্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান; অবশিষ্টগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদমাত্র। বিদার বংশধরেরা এখন দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিকানীরের অধঃপতনের কারণ, ইহার বিস্তৃতি, লোকসংখ্যা, জিৎগণ, সারস্বত ব্রাহ্মণ, চারণ, মালী ও নাপিত, চোরা ও খেওরি, রাজপুতদেশের উপবিভাগ, শস্য, জল, লবণহ্রদ, খনিজ দ্রব্য, তৈলাক্ত মৃত্তিকা, শিল্প ও বাণিজ্য, সেনা, শাসনবিধি, রাজস্ব, কর ও শুল্ক, বিবিধ আয় এবং সামন্ত ও গৃহসেনা।

বিকানীরের আধুনিক অবস্থা শোচনীয় বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধি সর্ব্বজনপ্রশংসিত ছিল। তৎকালে এই রাজ্যের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি দেখিলে হৃদয়ে বিস্ময়ের উদয় হইত,

রাজ্যও বহুসংখ্য লোকে সমাকীর্ণ ছিল ; এখনও বর্ষে বর্ষে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অসংখ্য লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তবে প্রাচীনকাল অপেক্ষা ইহার অবস্থা শতগুণে শোচনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। দস্যুগণের অত্যাচার এবং রাজ্যের অনন্ত করভারই এই রাজ্যের অধঃপতনের প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, প্রজাকুলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রাজার অমনোযোগিতাও অধঃপতনের আর একটি কারণ সন্দেহ নাই। এই সকল কারণেই বিকানীর-রাজ্যের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

বিকানীর দীর্ঘে উত্তর দক্ষিণে ১৬০ মাইল এবং প্রস্থে পূর্ব্বপশ্চিমে ১৫০ মাইল। ইহার উত্তরে ভূটনৈর, পূর্ব্বে রাজগড়, দক্ষিণে মহাজিন এবং পশ্চিমে পুগল, এই চতুঃসীমার মধ্যে বিকানীর-রাজ্য সংস্থিত। এই চতুঃসীমাস্বর্ত্তী প্রদেশের মধ্যে পূর্ব্বে দুই সহস্র সপ্ত শত নগর, গ্রাম ও পল্লী ছিল ; কিন্তু অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনে আজি গণনায় তাহার অর্দ্ধেকও দৃষ্ট হয় না।

মহামতি টড সাহেব বিকানীরের লোকসংখ্যা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, এই রাজ্যে ন্যূনাধিক ৫৩৯,২৫০ লোকের বাস। তন্মধ্যে বারো আনা আদিমজাতি এবং অবশিষ্ট রাজপুত, সারস্বত ব্রাহ্মণ, চারণ ও ভট্ট। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি নিকৃষ্টজাতিরও বাস ছিল।

বিকানীরের অধিবাসিগণের মধ্যে জিৎকুলই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও সমৃদ্ধিশালী। অত্রত্য প্রাচীন ভূমিয়াগণ বহুধনের অধিপতি ; কিন্তু রাজার অত্যাচারভয়ে তাহারা ধনরত্ন লুক্কায়িত রাখিয়া দরিদ্রভাবে অবস্থিতি করে, কেবল বিবাহের সময়েই তাহাদের ধনশালিতা প্রকাশ পায়। সেই উৎসবসময়ে তাহারা অম্লানমুখে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করে।

বিকানীরের প্রায় সর্ব্বত্রই সারস্বত ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদিগের মুখে শুনা যায়, জিৎদিগের অভিগমনের পূর্ব্বে ঐ প্রদেশ তাঁহাদেরই অধিকারে ছিল। সারস্বত ব্রাহ্মণেরা নিরীহ, শ্রমসহিষ্ণু, ও বিপ্রাচারবর্জ্জিত। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া ইহারা গোমাংস-সেবন, ধূমপান এবং স্বহস্তে হলচালনা করে ; এমন কি, গোধন বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেও ভীত হয় না।

মরুভূমির মধ্যে চারণগণ শুদ্ধাচারী বলিয়া সর্ব্বত্র পূজনীয়। ইহারা প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া অভিহিত। ব্রাহ্মণগণের শান্তিরসাস্পদ পাঠ অপেক্ষা বীররসামোদী রাজপুতবৃন্দ ঐ সকল কবির বীরগাথাকে অধিক ভালবাসেন। রাঠোরেরা চারণগণের প্রতি বিশেষ ভক্তি-প্রদর্শন করে।

প্রত্যেক রাজপুত-পরিবারেই মালী ও নাপিত আছে। সমস্ত জিৎপল্লীতেই ইহারা পাচকের কার্য্য করিয়া থাকে। মহামতি টড সাহেব ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

চৌরগণ লক্ষীজঙ্গল এবং তেওয়ারিগণ মিবার হইতে আসিয়া বিকানীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। বিকানীরের অধিকাংশ সর্দ্দারের অধীনে ইহারা বেতনভোগী সৈন্যরূপে নিযুক্ত থাকে ; ইহারা অসীমসাহসী। বাহাদিরাণ সর্দ্দার রাজপুতগণকে বিতাড়িত করিয়া কেবল চৌর ও তেওয়ারিগণকে বেতন দিয়া রাখিয়াছেন। চৌরজাতি অতি বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত। বিকানীরের সমস্ত দুর্গের তোরণদ্বারের ভারই ইহাদের হস্তে অর্পিত। ইহারা একটি অদ্ভুত বৃত্তির অধিকারী। প্রত্যেক মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইলে চৌরগণ তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট চারিটি তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হয়।

বিকানীরের রাঠোরগণ প্রাচীন বীরাচার হইতে পদমাত্রও স্খলিত হয় নাই। দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানদিগের পাশব উৎপীড়নে মিবার, মারবার ও অম্বর অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বিকানীর দুর্গম স্থলে সংস্থিত বলিয়া দস্যুদলের বিদ্বেষময় হইতেও পরিত্রাণ পাইয়াছে ;

তথাপি বিধাতা বিকানীরের প্রতি প্রসন্ন নহেন। কারণ, তাহাকে স্বদেশীয় নৃপতির উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। বিকানীরের রাঠোরেরা যাহার তাহার প্রস্তুত খাদ্য ভোজন এবং যাহার তাহার পিয়ালার জল বা মদ্য পান করিয়া থাকে। তাহারা সাহসী, বলিষ্ঠ এবং শ্রমসহিষ্ণু; বিশেষতঃ তাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট হয়।

কয়েকটি মরুবাস ভিন্ন বিকানীরের আর সমস্ত স্থানই বালুকাময়। এই বিশাল বালুকাময় প্রদেশের মধ্যে মধ্যে বড় বড় বালিয়াড়ি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিকানীরের উত্তরপূর্ব্বদেশান্তর্গত রাজগড় হইতে নহর ও রেয়োটসহর পর্য্যন্ত যে ভূমিভাগ বিস্তৃত, তাহার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, উহাতে অল্পপরিমাণে বালুকা মিশ্রিত আছে। এই প্রদেশ উর্ব্বরা। ইহাতে গোধূম, ছোলা ও ধান যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এই মৃত্তিকা ভুটনৈর হইতে গারার তটভূমি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিকানীরের অপরাপর স্থানে মটর ও তিলও যথেষ্ট জন্মে। এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট বজরা উৎপন্ন হয়, অন্য কুত্রাপি সেরূপ পাওয়া যায় না। বিকানীরের স্থানে স্থানে কার্পাসও উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহা সাত বৎসর অন্তর এক একবার জন্মে। কাঁকুড়, তরমুজ, শসা প্রভৃতি ফলও এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ভারতীয় সমস্ত মরুপ্রদেশেই জল মৃত্তিকার অতি নিম্নস্তরে স্থিত; কিন্তু বিকানীরে ঐরূপ মৃত্তিকার অনেক নিম্নস্তরে জল দৃষ্ট হয়। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী দেশনোখ নগরে এক একটি কূপ দ্বিশত সার্দ্ধদ্বিশত হস্ত গভীর। চল্লিশ বা পঞ্চাশ হস্ত গভীর স্তরের উৰ্দ্ধে পেয় জল আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে মোহিলা প্রভৃতি মরুস্থানসমূহে ইহার অৰ্দ্ধগভীর নিম্নে গবাদির পানোপযোগী কষায়বারি বাহির হইয়া থাকে।

সমগ্র ভারতীয় মরুস্থলীর মধ্যে অনেকগুলি লবণসরোবর আছে। সেই সকল লবণহ্রদ সর নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সেগুলি মারবারের লবণহ্রদের ন্যায় বিশেষ উপকারী নহে। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেটি সর নামক নগরে সংস্থিত। তাহার পরিধি প্রায় ছয় মাইল। চৌপুর নামক নগরে এক ক্রোশ দীর্ঘ আর একটি লবণসরোবর আছে। এই দুইটি হ্রদেই প্রায় তিন হস্ত-পরিমিত জল থাকে; কিন্তু উষ্ণবায়ুর প্রবহনসময়ে শুষ্ক হইয়া যায়; তখন সরোবরগর্ভে একটি ক্ষারময় স্থূল লেপ দৃষ্ট হয়। বিকানীরের দক্ষিণভাগস্থ সরোবরগুলিতে যে লবণ জন্মে, তাহা সর ও চৌপুরের লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

বিকানীরের প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দের মুখে ইহার সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা শ্রুতিগোচর হয়। জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী, এই মহাবাক্যই ঐরূপ প্রশংসার একমাত্র কারণ। স্বদেশের প্রতপ্ত বালিয়াড়ির নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা মলয়পর্ব্বতের স্নিগ্ধ মারুত সেবিত প্রদেশকেও তুচ্ছ বোধ করে। রাবড়ি ও বজরার নীরস বীজচর্ব্বণে তাহাদের যে আনন্দোদয় হয়, সুস্বাদু পানভোজনাদিও তাহার নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। প্রতপ্ত বালুকারাশি দেখিয়া তাহারা যে আনন্দবোধ করে, তাহার কাছে শ্যামল শস্যক্ষেত্রের হাস্যময়ী তরঙ্গলীলাও তাহাদের নিকট ঘৃণ্য।

খনিজ পদার্থের মধ্যে এখানে উত্তরপূর্ব্বে ত্রয়োদশ ক্রোশ দূরে হুশেরা নামক স্থানে এক প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর উদ্ভূত হয়; বিরামসর ও বিদাসর নামক দুই স্থানে তাম্রখনিও আছে, কিন্তু তাহাতে কিছুই আয় নাই; কারণ, তাম্র তুলিতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। পূর্ব্বে বিদাসরের খনি হইতে কিছু কিছু আয় হইত। কোলাথের নিকটবর্ত্তী একটি বিল হইতে তৈলাক্ত মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়; ইহা

হইতে বর্ষে বর্ষে ' সহস্র মুদ্রা উদ্ভূত হয়। গাত্র ও কেশমল দূর করিবার জন্য তত্রত্য অধিবাসিগণ সচরাচর ইহা ব্যবহার করে। কচ্ছী রমণীরা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই তৈলাক্ত মৃত্তিকা সেবন করিয়া থাকে।

এই রাজ্যের সর্ব্বত্রই গো, মেষ, উষ্ট্র ও হরিণ দৃষ্ট হয় গোধন এ স্থলে বিশেষ আদরের বস্তু। এখান হইতে যে সমস্ত উষ্ট্র যুদ্ধে ও বিদেশযাত্রায় ব্যবহৃত হয়, লোকে তাহাদের প্রতি অধিক আদর করিয়া থাকে; উষ্ট্রগুলি দেখিতেও বড় সুশ্রী। এখানে মেষের অভাব নাই। নীলগাঁ ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার মৃগও দৃষ্ট হয়। মরুভূমির শৃগাল অতি সুন্দর। স্থানে স্থানে নানাপ্রকার তরক্ষু ও সিংহও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজগড় বিকানীররাজ্যের প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল; নানা স্থানের বণিকেরা আসিয়া সমবেত হইত। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের পণ্যদ্রব্য সকল, হাসিহিসায় এবং পূর্ব্বপ্রদেশসমূহের বিক্রেয় সামগ্রীনিচয় দিল্লী, রেওয়ারি, দদ্রি প্রভৃতি স্থান হইয়া বাহিত হইত। সিন্ধুদেশ হইতে খর্জ্জুর, পূর্ব্বদেশ হইতে কৌষের বস্ত্র, নানারূপ সুন্দর, সুন্দর বসন, নীল, শর্করা, লৌহ ও তামাক প্রভৃতি, হারাবতী ও মালব হইতে অহিফেন এবং পত্তনগরী হইতে আস মুদ্র দেশসমূহের বেসবার, চীন, ঔষধাদি, নারিকেল, গজদন্ত প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ এই বন্দরে আনীত হইত।

মালবদেশে যে উর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহা তৎপ্রদেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের একটি প্রধান বস্তু। ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যবহারোপযোগী নানারূপ সজ্জা প্রস্তুত হয়। ধনী ও দরিদ্র সকলেই তাহা ব্যবহার করে। তিন টাকা হইতে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে লুই ও কম্বল বিক্রীত হয়। এই উর্ণাতেই স্ত্রীলোকগণের জন্য উষ্ণীষ নির্ম্মিত হয়। উষ্ণীষগুলি যদিও চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ, তথাপি এমন সূক্ষ্ম উর্ণায় নির্ম্মিত যে, তাহা দ্বারা মস্তকের শোভা সমধিক বর্দ্ধিত হয়।

বিকানীরবাসীরা লৌহশিল্পে সুদক্ষ। রাজধানী ও অন্যান্য স্থানে অসংখ্য লৌহশিল্পের বিপণি দৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত বিপণিতে তরবারি, অসিফলক, বন্দুক, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হয়। শিল্পিগণ গজদন্তেও নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করে। সেই সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে স্ত্রীগণের চুড়ি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক ও ফাল্গুনমাসে কোলাথ ও গুজবৈর নগরে দুইটি মেলা দৃষ্ট হইত। সেই দুইটি মেলাতে নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রাম হইতে অসংখ্য অসংখ্য দর্শক ও বণিকগণ উপস্থিত হইত। মেলাতে গবাদি পশু, মরুভূমিজাত উষ্ট্র, ধেনু ও অশ্বসকল বিক্রীত হইত। বণিকেরা স্ব স্ব বিক্রেয় অশ্বগুলিকে মুলতান ও লক্ষীজঙ্গল হইতে আনয়ন করিত। বিকানীররাজ্যের প্রাচীন সৌভাগ্যের সহিত মেলাও অনন্তকালগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বিকানীরের রাজস্ব কখনও পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক আদায় হয় নাই। নানা বিষয় হইতে উক্ত রাজস্ব আদায় হইত। বিকানীরের সামন্তিক ভূমির বিস্তৃতির ন্যায় রাজস্থানের অন্য কোন প্রদেশের বিস্তৃতি দৃষ্ট হয় না। খালিসা বা খাসজমী, ধুয়া, আজ, শুল্ক, পুগাইতি অর্থাৎ হলকর এবং মালবা এই কয়টি বিষয় হইতে বিকানীরের রাজস্ব উদ্ভূত হইত।

পূর্ব্বে খাসজমী হইতে দুই লক্ষ টাকা উঠিত। কিন্তু রাজার বিলাসবাসনা ও কুসংস্কারের সহিত তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া [illegible] হইতে এক লক্ষের অধিক আয় হয় না। ইহার কারণ এই যে রাজা অধিকাংশ [illegible] বাস করিয়া দিয়াছেন।

ধুয়া অর্থে ধূম, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে উনানকর ব্যতীত অন্য কিছুই বলা

যায় না। সকলেই আহার করিয়া থাকে এবং করভয়ে কেহ কখনও আমদ্রব্য আহার করে না; সুতরাং সকলেরই উদ্যানের আবশ্যক। কিন্তু বিকানীরমধ্যে চিমনী (ধূমনির্গমের নল) নাই যে, রাজার মন্ত্রী তদুপরি কর ধার্য্য করিয়া রাখিবেন, সুতরাং প্রতি পাকশালার পরিমাণে খাজনা নির্দ্ধারিত হয়। এতদনুসারে বহাজিন নগর ভিন্ন বিকানীরের প্রত্যেক গৃহস্থ এক টাকা হিসাবে ধূয়া দেয়।

আঙ্গকর অনুপসিংহ প্রচার করেন। পশুপক্ষী প্রভৃতি যে কোন জীব গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিত, তাহাদের প্রত্যেকের উপর এই কর ধার্য্য হইত। মানুষের নরনারী-ভেদে এবং পশুপক্ষি-গণের প্রয়োজনমতে রাজা প্রজাপুঞ্জের উপর আঙ্গকর ধার্য্য করিতেন। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এক অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট, প্রত্যেক আঙ্গকর চারি আনা। গাভী, বৃষ ও মহিষের আঙ্গকর মানুষের সমান; দশটি ছাগে বা মেষে এক অঙ্গ, কিন্তু প্রত্যেক উষ্ট্রে চারি অঙ্গ ধার্য্য হইত। দুঃখের বিষয়, রাজা গজসিংহ প্রত্যেক উষ্ট্রকে আট অঙ্গরূপে নিরূপণ করিতেন। আঙ্গকর হইতে দুই লক্ষ টাকা উদ্ভূত হইত।

শেয়র (শুল্ক) কোন নির্দ্দিষ্ট হারে গৃহীত হয় নাই। পূর্ব্বে যে পরিমাণে এই কর উদ্ভূত হইত, রাজা সুরতসিংহের অধিকার হইতে তাহার পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রায় এক লক্ষ টাকা বর্ষে উদ্ভূত হইত, কিন্তু রাজনৈতিক নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাতে রাজ্যের বাণিজ্য মন্দীভূত হয়, সুতরাং তাহার অর্দ্ধেকেরও কম আদায় হইয়া থাকে।

বিকানীরের প্রায় সমস্ত কৃষকই পুষাইতি (হলকর) প্রদান করে। প্রতি লাঙ্গলে পাঁচ টাকা খাজনা দিতে হয়। পূর্ব্বে রাজা প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যসমূহের একচতুর্থাংশ লইতেন, সেই প্রথা উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই পুষাইতি কর প্রচারিত হইয়াছে। রাজা রাজসিংহ ইহার স্থাপনকর্ত্তা। তদবধি ইহা হইতে প্রতি বর্ষে দুই লক্ষ টাকা উদ্ভূত হইত। কিন্তু রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত দেশীয় কৃষির অধঃপতন হওয়াতে এখন ন্যূনাধিক দেড়লক্ষ টাকা উদ্ভূত হইয়া থাকে।

জিতগণ রাঠোরবীর বিকার অধীনতা স্বীকার করিলে বালবা কর ধার্য্য হয়। বিকানীরের কর্ষিত প্রত্যেক একশত বিঘা ভূমির উপর দুই টাকা হিসাবে কর দিতে হয়।

এই সমস্ত কর ভিন্ন ধাতুই, দণ্ড ও খোসালী ইত্যাদি অন্য অন্য উপায়েও বিকানীরের রাজকোষ পরিপুষ্ট হয়। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ধাতুই কর গৃহীত হয়। প্রত্যেক হলের প্রতি পাঁচ টাকা হিসাবে এই কর ধার্য্য আছে। জোরাবরসিংহ ইহার স্থাপনকর্ত্তা। আসিয়া ঘাঁটির পঞ্চাশৎ এবং বেণীবলের সপ্ততি পল্লী ব্যতীত আর সমস্ত বিকানীররাজ্যে এই কর প্রচলিত আছে। সর্দ্দারগণ ধাতুই কর দেন না। এই কর হইতে প্রায় একলক্ষ টাকা উদ্ভূত হয়।

দণ্ড ও খোসালী শব্দের অর্থ ভিন্ন বোধ হয় বটে, কিন্তু ভারতীয় মরুভূমিতে প্রায় এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণের মধ্যে দণ্ডনীতি প্রচলিত আছে। ইহা চতুর্ব্বিধ প্রসিদ্ধ রাজনীতির অন্যতম। কিন্তু সে দণ্ডে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দুরাজারা অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানার্থ অর্থদণ্ড, মানদণ্ড, নির্ব্বাসনদণ্ড ও প্রাণদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু রাজপুত-রাজারা নির্দ্দোষী প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে স্বেচ্ছাক্রমে সময়ে সময়ে বলপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিতেন। এ স্থলে দণ্ড শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে। এ দণ্ড অর্থদণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বিকানীররাজ্যে সর্দ্দার, বণিক ও শ্রেষ্ঠীদিগের উপরেই এই দণ্ডের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

চতুর্দ্দশজন সংগ্রাহক এই দণ্ড আদায় করে। প্রজাপুঞ্জের অবস্থা অনুসারে এই দণ্ড প্রযুক্ত হয়। এই দণ্ডের কোন পরিমাণ নাই, যাহার নিকট যত আদায় হয়, ততই লাভ।

খোসালী শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাদান বটে, কিন্তু ইহা রাজার অর্থপিপাসায় শান্ত্যর্থ প্রজাপুঞ্জের শোণিতদান বলিতে হইবে। রাজা প্রার্থনা না করিলে প্রজাবৃন্দ কিছু তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে যায় না। বিকানীরের খোসালী কর যেরূপে সংগৃহীত হয়, তাহাও এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। ভুটনৈর জয় করিয়া রাজা সুরতসিংহ প্রফুল্লচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। যুদ্ধের ব্যয় হওয়াতে রাজকোষ তখন শূন্যপ্রায়। চতুরচূড়ামণি রাজা তখন অর্থসংগ্রহে উদ্যত হইলেন। খোসালী মহাস্ত্র; এই অস্ত্রের সাহায্যে তিনি অভীষ্টসিদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আশু বিকানীরের প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট দশ টাকা করিয়া খোসালী প্রার্থনা করিলেন। দীনদরিদ্র প্রজাপুঞ্জ বিষম সঙ্কটাপন্ন। তাহারা হৃদয়শোণিত দান করিয়াও অন্নলাভে রাজার সহায়তা করিল, তাহার উপর আবার তাহাদেরই সামান্য সম্বলের উপর ভূপতির আক্রোশদৃষ্টি।

রাজার চরিত্রের উপর সামন্তগণের মিলন নির্ভর করে। সুরতসিংহ প্রজারঞ্জক হইতে পারিলে বিকার দশসহস্র বংশধর সমবেত হইয়া আত্মশোণিতদান করিয়াও তাঁহার সিংহাসন অটল রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিত তাঁহার রাজত্বকালীন সর্দ্দারমণ্ডলীর নাম, গোত্র, বাসস্থান, উপ-সামন্তসংখ্যা ও ভূমিসম্পত্তির আয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সর্দ্দারগণের নাম	বাসস্থান	গোত্র	উপসামন্ত		আয়
			অশ্ব	পদাতিক	
রাওসিংহ …	যুগলপট্ট ..	ভট্টি …	৪	১৫০০০	৬০০০
কৈৎসিংহ …	রন্দিসর …	ঐ …	২	…	৬০০
ভনিসিংহ …	বিচনক ..	ঐ …	৬	৬০	১৫০০
সর্দ্দারসিংহ …	শূরজির ..	ঐ …	২	৩০	৮০০
জালিমসিংহ …	গরিয়ালা…	ঐ …	৪	৪০	১১০০
পদ্মসিংহ …	কুদসু …	ঐ …	৪	৬০	১৫০০
ভূমসিংহ …	জঙ্গলু …	ঐ …	৯	৪০০	২৫০০
কল্যাণসিংহ …	নৈনিয়া …	ঐ …	২	৪০	১০০০
কর্ণিসিংহ …	সৎসর …	ঐ …	৯	২০০	১১০০
সুলতানসিংহ …	রাজসর …	ঐ …	৫০	২০০	১৫০০
ভূমসিংহ …	চাকরা …	ঐ …	১০	৬০	১৫০০
লখতিরসিংহ …	রনৈর …	ঐ …	৭৫	৩০০	২০০০
কৈৎসিংহ …	জমিনসর…	ঐ …	১৫০	৫০০	১৫০০০

সর্দ্দারগণের নাম	বাসস্থান	গোত্র	উপসামন্ত অশ্ব	উপসামন্ত পদাতি	আয়
সুরতানসিংহ ...	অজিতপুর	নার্নোট	৪০০	৫০০০	২০০০০
দেবীসিংহ ...	সিদমুখ				
কর্ণিধন ...	রিয়াসর				
ওমেদসিংহ ...	কারিপুর				
সুরজমল ...	তিয়ান্দসর	ঐ	৫০০	৪০০০	৪০০০০
অক্তিসিংহ ...	কুচোর				
বাহাদুরসিংহ ...	ময়নসর				
গোমানসিংহ ...	করত্তু				
সেরসিংহ ...	নিমাজি ...	ঐ	১২৫	৫০০	৫০০০
অনুপসিংহ ...	জিসানো ...	বিকো	৪০	১০০	৫০০০
পৈমসিংহ ...	বই ...	ঐ	২৫	৪০০	৫০০০
বেরিসাল ...	মহাজিন ...	ঐ	১০০	৫০০০	৪০০০০
কিষণসিংহ ...	হয়দাসর ...	ঐ	৫০	২০০	৫০০০
জয়সিংহ	সেওন্দা	বিদাবৎ	২০০০	১০০০০	৫০০০০
ওমেদসিংহ	বিস্তাসর				
ঈশ্বরীসিংহ ...	সারুন্দ ...	মুন্দিপা	১৫০	২০০০	১১০০০
শিবসিংহ ...	চুরু ...	বেনিরোট	২০০	২০০০	২৫০০০
চৌনসিংহ ...	সেবো ...	ঐ	৩০০	২০০০	২০০০০
অভয়সিংহ ...	বুকার্কো ...	ঐ	২০০	৫০০০	২৫০০০
হিমতসিংহ ...	রেয়োটসর	রেয়োট	৩০০	২০০০	২০০০০
সম্ভিদান ...	চদেলা ...	রূপাবৎ	২৫	২০০	৫০০০
চন্দ্রসিংহ ...	নথো ...	করমসোট	৫০০	১৫০০	১১০০০
পদ্মসিংহ ...	ভৈরবৎসিসর	পুয়ার	১০০	২০০	৫০০০
সুরতানসিংহ ...	নয়নাবাস ...	কচ্ছাবহ	৩০	১৫০	৪০০০

তৃতীয় অধ্যায়

—৽৽—

ভুটনৈর, ভুটনৈরের জিৎগণ, বীরসিংহের অভিগমন, ভীরুর অভিষেক ও ইসলামধর্ম্মাবলম্বন, রাও দ'লচ, হোসেন খাঁ, হোসেন মহম্মদ, ইমাম ও বাহাদুর খাঁ, জাবতা খাঁ, দেশের অবস্থা, ভুটনৈরের প্রাচীন অট্টালিকা।

ভুটনৈর একসময়ে এরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল যে, তদ্দর্শনে অনেকগুলি রাজার জিগীষাবৃত্তি সমুত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনেকগুলি অসীমসাহসী রাজা তৎপ্রদেশকে জয় করিতে আসিয়া তত্রত্য অধীশ্বরের বীরবিক্রমে পরাহত হইয়া লজ্জাবনতবদনে স্বরাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে, ভট্টিগণ আসিয়া ঐ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু ভট্টিবাসের সহিত ভুটনৈরের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রসিদ্ধি আছে, কোন রাজার ভাটকে তৎপ্রদেশ প্রদত্ত হয়। সেই ভট্টকবি তথায় একটা কবিকুল প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছায় স্বীয় জাতির উপাধি প্রদান করেন। মরুস্থলীর সমগ্র উত্তরপ্রদেশে তদ্দেশের প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক নের নামে কথিত হইত। সুতরাং সেই ভাট শব্দের সহিত নের শব্দ সংযুক্ত হওয়াতেই ভাটনের পদের উৎপত্তি হয়। যে দিন কতকগুলি ভট্টিসম্প্রদায় ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে, সেই দিন হইতেই তাহারা ভাটের পরিবর্ত্তে ভুট শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিল। বোধ হয়. ইহা হইতেই ভুটনৈর বা ভুটনের শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

মধ্য আসিয়া হইতে ভারতে প্রবিষ্ট হইতে হইলে যে পথ দিয়া আগমন করিতে হয়, ভুটনৈর তাহার উপরেই সংস্থিত; সুতরাং পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়ার প্রায় সমস্ত যবন আক্রমণকারীকেই তন্নগর স্পর্শ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এই হেতু ভুটনৈর নাম প্রায় অধিকাংশ প্রাচীন ইতিবৃত্তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহম্মদ গজনবের অভিগমনসময়ে যে সমস্ত জিৎ তাহার সৈন্যগণের উপর উৎপীড়ন করিয়াছিল. তাহাদের জীবনী অনুশীলন করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, সেই সময়ের অনেক পূর্ব্বে তাহারা পঞ্চনদপ্রদেশের মরুভূমিতেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বস্তুতঃ যখন তাহাদিগের নামও রাজবারার ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তখন যে তাহারা ভারতশত্রুর অভ্যুত্থানের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের রাজমুকুট শাহাবুদ্দিনের শিরোপরি বিরাজিত হইবার প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় উত্তরাধিকারী কুতব-উদ্দিন জিৎদিগের প্রতিকূলে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হন, ফিরোজ শাহের উত্তরাধিকারিণী রিজিয়া রাজ্যচ্যুত হইলে তিনি এই জিৎদিগের নিকটে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। জিৎগণ তদীয় রাজ্যোদ্ধারের জন্য তাঁহাকে পুরোভাগে স্থাপনপূর্ব্বক রাষ্ট্রাপহারীর প্রতিকূলে অগ্রসর হইয়াছিল; সেই কঠোর উদ্যমে বীরনারী রিজিয়ার মৃত্যু হয়। তৈমুরের আত্মজীবনীতে লিখিত আছে যে, তিনি ভুটনৈর-রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য জিৎ নামক একটি দস্যুসম্প্রদায়কে বধ করিয়াছিলেন। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। ভুটনৈরের জিৎ ও ভট্টগণ পরস্পরে এতদূর সংমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তন্মধ্যে কে জিৎ ও কে ভাট, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

তৈমুরের অভিযানের কিছুদিন পরে ভট্টিগণ মারোট ও ফুলারা হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদিগের দলপতি বীরসিংহের সহিত ভুটনৈরে উপনিবেশ স্থাপন করে। সে সময় উক্ত নগর একজন মুসলমানের করে অর্পিত ছিল। কিন্তু সেই মুসলমান সামন্ত তৈমুরের কিংবা দিল্লীরাজের অধীনস্থ

কর্ম্মচারী, তাহার কোন নিরূপণ নাই। অনুমান দ্বারা সম্ভবতঃ তৈমুরেরই অধীন কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নাম চিগাট খাঁ। এই খাঁ জিৎগণের হস্ত হইতে ভুটনৈর নগর আচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে একটি বিস্তৃত প্রদেশ তাহার অধিকৃত হয়। কিন্তু দৃঢ় অধ্যবসায়শীল ভট্টিগণ কালে তাহা আবার আচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

সপ্তবিংশতি বৎসর রাজ্যশাসনের পর বীরসিংহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীরু ভুটনৈর-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই সময়ে চিগাটের দুইটি পুত্র দিল্লীশ্বরের সাহায্যে ভুটনৈর আক্রমণ করিল। প্রথম আক্রমণে বিফলমনোরথ হইয়াও তাহারা নিরুৎসাহ হইল না; দলবল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় উহা আক্রমণ করিল। কিন্তু সেবারেও অভীষ্টসিদ্ধি হইল না; পরাজিত হইয়া সেবারেও তাহাদিগকে পলায়ন করিতে হইল। আশু আর একটি মুসলমানসেনা দেখা দিল। ভুটনৈর আক্রান্ত হইল; দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল; ভুটনৈর শত্রুহস্তে পতিত হয়, ইত্যবসরে ভীরুসিংহ সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা উত্তোলন করিলেন এবং দুর্গ-পরিহার ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহিলেন। যুদ্ধ স্থগিত রহিল। যবনগণ দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিল; ইসলামধর্ম্মগ্রহণ এবং রাজার হস্তে কন্যাসম্প্রদান। ভীরুসিংহ প্রথম প্রস্তাবেই সম্মতিদান করিলেন। সেই দিন হইতে সেই ধর্ম্মচ্যুত ভট্টিগণ ভুট্ট নামে প্রথিত হইতে লাগিল। ইতিবৃত্তে ভীরুর অধস্তন ছয়জন রাজার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতঃপর তাঁহার সপ্তমপুরুষ রাও দলিচ ভুটনৈরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নাম হিয়ায়েৎ খাঁ। এই হিয়ায়েৎ খাঁর হস্ত হইতে বিকানীররাজ রাজসিংহ কর্ত্তৃক ভুটনৈর আচ্ছিন্ন হয়। তদবধি ফতেহাবাদ ভুট্টিখাঁদিগের লীলাভূমি হইয়াছে।

হিয়ায়েৎ খাঁ ইহলোক হইতে বিদায় হইলে হোসেন খাঁ সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইনি হিয়ায়েৎ খাঁর দৌহিত্র। হোসেন রাজা সুজনসিংহের নিকট হইতে ভুটনৈর আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অধস্তন ইমাম মহম্মদের অধিকার পর্য্যন্ত ইহা তাঁহাদের অধিকারে ছিল; পরে রাজা সুরতসিংহ বাহাদুর খাঁর নিকট হইতে ইহা হস্তগত করেন।

বাহাদুর খাঁ পরলোকগমন করিলে তদীয় পুত্র জাবতা খাঁ ভট্টিদিগের আধিপত্য গ্রহণ করেন। কিন্তু রাঠোরকুলের তেজোবহ্নির সমক্ষে নিষ্প্রভ হওয়াতে তাঁহার বল, গৌরব, তেজ সকলই বিলুপ্ত হইল। জাবতা খাঁ প্রায় রাণিয়া নামক নগরেই বাস করিত। বিকানীররাজ রায়সিংহের হস্ত হইতে ইমাম মহম্মদ ঐ রাণিয়া নগর অধিকার করে। জনরব এইরূপ, রাজা রায়সিংহ স্বীয় মহিষীর স্মরণার্থ উক্ত নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাণিয়ার সহিত তদন্তর্ভূত পঞ্চবিংশতি পল্লীও মুসলমানের অধিকৃত হয়। দস্যুবৃত্তিই জাবতা খাঁর জীবিকা। পথিক, বণিক্ ও নাগরিকগণের নিকট হইতে সে প্রতি বৎসর দুই তিন লক্ষ টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিত। তাহার উৎপীড়নে সমগ্র উত্তরমরু যার পর নাই নিপীড়িত হইয়াছিল; হতভাগ্য জিৎদিগের ত পরিত্রাণ ছিলই না; অনুক্ষণ তাহাদিগকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত। মরুভূমির পূর্ব্বসীমা ব্রিটিশ-রাজ্যের নিকটবর্ত্তী, সুতরাং দুর্ব্বৃত্ত জাবতা খাঁ সে দিকে বড় কিছু অনিষ্ট করিতে সাহসী হইত না; উত্তরভাগের উপরেই তাহার যত আক্রোশ ও অত্যাচার দেখা যাইত। নিপীড়িত অধিবাসিবৃন্দ ক্রমে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পরিশেষে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্নরাজ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিল। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। ভুটনৈরের উত্তরে গারা পর্য্যন্ত অনেক স্থানের ভূমি উর্ব্বরা; সেই সকল ভূমির অল্প নিম্নেই জল পাওয়া যায়।

ভুটনৈর ও তাহার উত্তরসীমান্ত-প্রদেশসমূহে আজিও পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাতেই অনুমান হয়, পূর্ব্বে ঐ সকল নগর বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, অত্যাচারীর অত্যাচারে শেষে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন নগরের ঐরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে রঙ্গমহল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই স্থান ভুটনৈরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে সংস্থিত।

ভুটনৈরের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, কতিপয় কুটীর ও কয়েকখানি সামান্য শস্যক্ষেত্র ভিন্ন এখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

আভোর, বঙ্গারাকার নগর, রঙ্গমহল, সুরল বা সুরতগড়, মাচোটল, রৈতিবঙ্গ, কালীবঙ্গ, কল্যাণসহর, ফুলারা, মারোট, টিলবারা, গিলবারা, বুন্নি, মাণিকথর, শূরসাগর, ভাযেনি, কোরিওয়ালা, কুলধেয়াণী, এইগুলিই বিকানীরের প্রাচীন নগর। ফুলারা ও মারোটের নাম এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ফুলারা অতি প্রাচীন নগর। প্রমররাজগণের অধিকারকালে ইহা "নকোটী মরুকার" অন্তর্বর্ত্তী ছিল। জৈনদিগের শক্তুণীর বর্ণমালায় ক্ষোদিত অনেক শিলালিপিও এই সকল স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফুলারা প্রসিদ্ধ লাক্ষফুলানের লীলানিকেতন।

বিকানীরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। এই স্থানই অধঃপতিত রাঠোরগণের শেষ রঙ্গভূমি। এই রঙ্গভূমে সেই সকল মহাবীরেরা যেরূপ বিচিত্র বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ বীরত্বের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা-পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অদ্ভুত বীরত্বের জন্য তাঁহাদিগের পবিত্র নাম জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

হারাবতী

বুন্দি

প্রথম অধ্যায়

-:*:-

হারাবতী, অগ্নিকুলের কাল্পনিক উদ্ভব, অর্ব্বুদপর্ব্ব, চৌহানগণের মকাবতী, গলকুণ্ড ও বরণলাভ, অজমীরপ্রতিষ্ঠা, অজয়পাল, মাণিকরায়, মুসলমান অভিযান, সম্বরস্থাপন, লবণহ্রদ, বিলনদেব, মিহিরার বোগা চৌহান বিশালদেব, দিল্লীতে তাঁহার জয়স্তম্ভ, হারদিগের উৎপত্তি, অনুরাজ কর্ত্তৃক অসি অধিকার, রাও হামির, রাও চাঁদের মৃত্যু, রাজকুমার রণসিংহের পলায়ন, তৎপুত্র কলুনের গৌরব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোটা ও বুন্দি এই দুইটি রাজ্য একত্র হইয়া হারাবতী নামে প্রথিত হইয়াছে। এই রাজ্যে চম্বলনদ প্রবাহিত। এখন ঐ নদ কোটা ও বুন্দিরাজ্যের সীমারেখারূপে নির্দ্দিষ্ট। চৌহানকুল যে চতুর্বিংশতি শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে হার সর্ব্বত্র সমধিক প্রসিদ্ধ।

হিন্দুগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত অধর্ম্মপরায়ণ ও পাপাচারী হইয়া প্রজাবৃন্দের প্রতি ঘোরতর উৎপীড়ন করিলে জমদগ্নিনন্দন মহাবীর পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া উপর্য্যুপরি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য কোন কোন ক্ষত্রিয় আপনাদিগকে ভট্ট বলিয়া পরিচয় দিল, কেহ বা নারীবেশে সজ্জিত থাকিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিল। এই প্রকারেই রাজপুতজাতির মূলরক্ষা হয়। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতী নাম্নী একটি নগরী ছিল, হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তত্রত্য সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি বলদর্পিত হইয়া পরশুরামের পিতার মুণ্ডচ্ছেদন করেন। রাজার এইরূপ পাপাচার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুরাম শেষবার ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বালিত করিলেন।

অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ এই দুইটি ব্রাহ্মণের প্রধান অস্ত্র; সুতরাং বাহুবলের অভাবে রাজ্যমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, দেশমধ্যে দৈত্যদানবগণের অত্যাচার বাড়িল, পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থাদি পদতলে দলিত হইতে লাগিল, দেশময় অজ্ঞানান্ধতা ও অবিশ্বাস বিস্তৃত হইল। প্রজাকুল দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারিগণের পীড়নে কোথায়ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইল না। এইরূপে ঘোরসঙ্কটদর্শনে ভগবানের আয়ুধ-গুরু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র একান্ত চিন্তাকুল হইলেন; ক্ষত্রিয়কুলকে পুনর্জীবিত করাই

তাঁহার প্রধান সংকল্প হইল। তৎকালে অর্ব্বুদপর্ব্বতে অনেকগুলি ধর্ম্মনিষ্ঠ ঋষি বাস করিতেন। রাজর্ষি সেই পর্ব্বতকেই আপনার তপস্যার উপযুক্ত স্থল বলিয়া বিবেচনা করিলেন। দৈত্যদানবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অর্ব্বুদগিরিবাসী ঋষিগণ আপনাদের মনোবেদনা জানাইবার জন্য ক্ষীর সাগরতটে ভগবান্ শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় নারায়ণ অনন্ত-শয্যায় শায়িত। তিনি ঋষিগণকে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্জীবিত করিতে অনুমতি করিলেন। অতঃপর তপস্বীরা ব্রহ্মাদিদেবগণের সহিত আবুগিরিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সুরধুনীসলিলে অগ্নিকুণ্ড বিধৌত হইল। নানারূপ স্তব-স্তুতি পঠিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা নানা তর্ক-বিতর্কের পর স্থির করিলেন যে, ইন্দ্রই পুনর্জননক্রিয়া স্বীকার করিবেন। তখন দেবেন্দ্র দূর্ব্বাতৃণের একটি পুত্তলিকা গঠনপূর্ব্বক অমৃতকুণ্ডের জলসিঞ্চনে তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রক্ষেপ করিলেন। এ দিকে সঞ্জীবনীমন্ত্র পঠিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে একটি অপূর্ব্বমূর্ত্তি উত্থিত হইলেন।—তাঁহার দক্ষিণ-করে গদা বিরাজিত এবং বদনকমলে মার মার শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। দেবগণ তখন তাঁহার প্রমার নামকরণ করিলেন এবং অবিলম্বে আবু, ধারা ও উজ্জয়িনী তাঁহার করে সমর্পিত হইল।

অতঃপর আর একটি বীরের উৎপাদনার্থ সকলে ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলে ভগবান্ পদ্মযোনি একটি পুত্তলিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই বহ্নিকুণ্ডে প্রক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ কুণ্ডগর্ভ হইতে আর একটি দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল; তাঁহার এক হস্তে অসি, অন্য হস্তে বেদ এবং গলদেশে যজ্ঞসূত্র বিরাজিত। তিনি চুলুক বা শোলানকি নামে প্রথিত হইয়া আনহলপুরপত্তনের রক্ষণভার গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রুদ্রদেব কর্ত্তৃক তৃতীয়বীরের সৃষ্টি হইল। তিনিও একটি পুত্তলী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুরধুনীসলিলে বিধৌত করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবনীমন্ত্রও পঠিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ এক ধনুর্দ্ধর অসিতমূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দৈত্যসমরে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার পদস্খলন হওয়াতে তিনি "পুরীহর নামে প্রথিত হইয়া দ্বাররক্ষকরূপে অবস্থান করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে মরুভূমির অন্তর্গত নয়টি স্থান প্রদান করিলেন।

তৎপরে আরও একটি বীরের সৃষ্টি হইল। বিষ্ণু তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। সে মূর্ত্তিটি ভগবান্ বিষ্ণুরই অনুরূপ। মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ, প্রত্যেক হস্তে এক একখানি অস্ত্র সুশোভিত; দেবগণ তাঁহার চতুর্ভুজ চৌহান নামকরণ করিলেন। মহাবতী নগরী তাঁহার করে অর্পিত হইল। দ্বাপরযুগে এই নগরী গড়মণ্ডল নামে প্রথিত ছিল।

দেবগণ যখন এইরূপে বীরসমূহের সৃষ্টি করিতেছেন, দৈত্যগণ অদূরে থাকিয়া সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। তাহাদের দুই জন সেনাপতি তখন সেই অগ্নিকুণ্ডের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। বীরগণ অগ্নিগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াই দৈত্যগণের বিরুদ্ধে সমরযাত্রা করিলেন। আশু একটি তুমুল যুদ্ধের অভিনয় হইল, কিন্তু দানবগণের শোণিত যেমন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, অমনি তাহা হইতে নূতন নূতন দৈত্য জন্মিতে লাগিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপারদর্শনে সেই কুলচতুষ্টয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা দানবগণের শোণিতপানে প্রবৃত্ত হইলেন। অগত্যা দানবকুল বিজিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংখ্যাও হ্রাস হইয়া পড়িল; যে চারিটি কুলদেবতা দৈত্যশোণিত পান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাক্রমে আশাপূর্ণা, গাজনমাতা, কিয়ঞ্জমাতা ও সঙ্কৈরমাতা নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা যথাক্রমে চৌহান, পুরীহর, শোলানকি ও প্রমারকুলের অধিষ্ঠাত্রী।

দৈত্যকুল নির্ম্মূলপ্রায় হইলে বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া দেবগণ জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলেন। স্বর্গ হইতে অমৃতবর্ষণ হইতে লাগিল; দেবগণ হর্ষোৎফুল্ল হ রথারোহণে শূন্যপথে সুরপুরে প্রতিগমন করিলেন।

চাঁদভট্টের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে অগ্নিকুলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অবশিষ্টগুলি নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অগ্নিকুল বিপ্রগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত। চৌহানগণ, সামবেদ, চন্দ্রভাগা নদী, সামবংশ, বাৎস্যগোত্র, মাধুনি শাখা, পঞ্চপুরাওয়ার জন্ম, কালভীরু, ভৃগুনিশান, অশ্ব-কা ভবানী, বামুর পুত্র, কক্তনফরি নেকা, আবু অচলেশ্বর মহাদেব ও চতুর্ভুজ চৌহান এই সকল গোত্রজ। ভট্টগ্রন্থপাঠে জানা যায়, ত্রেতাযুগেই এইরূপে অগ্নিকুণ্ড হইতে বীরগণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

এ স্থলে একটি সন্দেহ জন্মিতে পারে। এই চারিটি বীর কি প্রকৃতপক্ষে দূর্ব্বাতৃণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল? অথবা ধর্ম্মগুরু ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছকবল হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় আদিম অধীবাসী কিংবা শাকদ্বীপীয় কোন বিশেষ বংশ হইতে তাঁহাদিগকে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন। পরন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিলে শেষোক্ত যুক্তিটাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভারতের আদিম অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ ও খর্ব্বাকার। তাহাদিগের প্রতি আর্য্যগণের বিষম ঘৃণা ছিল; অগ্নিকুলের বীরগণ গৌরকান্তি ও উন্নতকায়। পারস্যরাজবংশের সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রাচীন শকজাতির বীররসাত্মক কাব্যের ন্যায় ইহাদিগের কাব্যগ্রন্থাদিও বীররসে পরিপূর্ণ। সেই সকল গ্রন্থের বীরভাব অগ্নিকুলের অস্থি-মজ্জার সহিত সংমিশ্রিত; এমন কি, বিপ্রগণ নানারূপ প্রয়াস স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের শাকদ্বীয় আচার-ব্যবহার হইতে পদমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই।

চারিটি অগ্নিকুলের মধ্যে চৌহানগণের রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। কিন্তু প্রমারগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতাপশালী। এ দিকে চৌহানগণের বিশালরাজ্য আবার অতিকষ্টে আবিষ্কার করা যায়। যখন প্রমারগণের গৌরবরবি মধ্যাহ্নগগনে স্থিত, চৌহানেরা তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁদভট্টের গ্রন্থপাঠেও জানা যায় যে, বিক্রমশকের অষ্টম শতাব্দীতে চৌহানেরা তৈলঙ্গ প্রদেশের প্রমারগণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিত। চৌহানবীর পৃথ্বীরাজের সময় চৌহানবংশ মহাতেজে বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী ছিল, পৃথ্বীরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সে তেজ শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

চৌহানরাস নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজাধিষ্ঠান মকাবতী নগরী হইতে প্রভুধর্ম্মের জয়ধ্বনি দ্বিপঞ্চাশৎসংখ্যা নগরে প্রতিনিনাদিত হইয়া উঠিল। চৌহানবীর স্বীয় অপরিমেয় বাহুবলে লাহোর, পেশোর, মূলতান, এমন কি, ভদ্রিগিরিমালা পর্য্যন্ত জয় করিলেন। তখন দানবেরা ভয়বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; সেই আগ্যবীরের প্রভুত্ব দিল্লী ও কাবুল পর্য্যন্ত স্থাপিত হইল। অনন্তর তিনি চৌহানকুলের অন্যতম শাখা মল্লানীগণের হস্তে নেপালরাজ্য প্রদান করিয়া দেবকুলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্লচিত্তে মকাবতী নগরে গমন করিলেন।

পবিত্র অগ্নিকুল ক্রমে ক্রমে জগতে প্রাধান্যলাভ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের লীলানিকেতন মকাবতীনগরীও ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠবে সুশোভিত হইয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যেই অজয়পালনামা এক প্রতিষ্ঠাবান্ বীরকেশরী সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মকাবতী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে

অগ্রসর হইলেন। অজয়মেরু জনপদে উপস্থিত হইয়া তথায় তিনি তারাগড় নামক দুর্গ স্থাপনপূর্ব্বক অক্ষুণ্ণপ্রতাপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, অজমীরের প্রতিষ্ঠাতা অজ পালন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম অজপাল হইয়াছে; সেই অজপাল হইতে অজমীর নামকরণ হইয়াছে। যাহা হউক, অজপালের কীর্ত্তি ইতিবৃত্তের প্রতি ছত্রে স্বর্ণাক্ষরে বিরাজ করিতেছে। আপনার অতুল বাহুবলের সাহায্যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক একটি শকও স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা যে কোন্‌টি, আজিও তাহা স্থিরীকৃত হইল না। যত দিন তাঁহার কীর্ত্তিরাজির দেদীপ্যমান সাক্ষ্যস্বরূপ সমস্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন ইতিবৃত্তকারের করগত না হইতেছে, তত দিন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শকের সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই কঠিন। ভারতের সর্ব্বত্রই তারাগড়পতির কীর্ত্তি উদ্গীত হইতে লাগিল। দানবগণ তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, অজপালের পুত্র না হওয়াতে বংশ অনন্তবিনাশ প্রাপ্ত হয় দেখিয়া তিনি মকাবতী হইতে পৃথ্বীপাহাড় নামক এক ব্যক্তিকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তখন রাজপুতসমাজে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না; সেই কারণেই পৃথ্বীপাহাড় একটিমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই রমণীর গর্ভে তিনি চতুর্বিংশতি পুত্র লাভ করেন। সেই সমস্ত রাজকুমারের গোষ্ঠী রাজস্থানের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তন্মধ্যে একজনের বংশে প্রথিতনামা মাণিকরায়ের জন্ম হয়। ভট্টগ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৭৪১ সংবতে মাণিকরায় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেই সময়েই রাজপুতনার উপর যবনের উৎক্রোশদৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম পতিত হয়। মাণিকরায়ের কীর্ত্তিবিভায় সমস্ত ভারতভূমি সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল।

হিজরার ত্রিষষ্টিতম বৎসরে যবনের অত্যাচারে হিন্দুগণ বিষম সঙ্কটাপন্ন হইলেন। ইসলামের নূতনধর্ম্ম বিকটতেজে পৃথ্বীমণ্ডলী পরিব্যাপ্ত করিল। চতুর্দ্দিকেই ধর্ম্মপ্রচারক, চতুর্দ্দিকেই মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত বিজয়কেতন, চতুর্দ্দিকেই ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিকট সিংহনাদ। তাহাদের পদভরে আসিয়া মহাদেশ কাঁপিতে লাগিল. সকলেই স্ব স্ব পিতৃপুরুষদিগের আচরিত ধর্ম্ম অব্যাপন্ন রাখিতে যত্নবান্ হইয়া উঠিল। যবনের সেই জ্বলন্ত ধর্ম্মানুরাগ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী বিকট গিরিমালা ভেদ করিয়া ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে রোসেন আলী নামক এক জন ধর্ম্মপ্রচারক ভারতবর্ষে আগমন করিল। একদিন সেই নবীনধর্ম্মপ্রচারক অজমীরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ইসলামধর্ম্মের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতেছে, ইত্যবসরে রাজার নবনীত লইয়া একটি গোপ রাজবাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রোসেন সেই নবনীপাত্র স্পর্শ করিল। ম্লেচ্ছস্পর্শে কলঙ্কিত হইল বলিয়া গোপ ভাণ্ডটি তৎক্ষণাৎ দূরে ফেলিয়া দিল। আশু এই সংবাদ রাজার শ্রুতিগোচর হইল। রোমাঞ্চ হইয়া তিনি সেই দাম্ভিক যবনের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদনে অনুমতি করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজ আজ্ঞা পরিপালিত হইল। ছিন্ন অঙ্গুলি নভোমার্গে উড্ডীন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মক্কায় উপস্থিত হইল। মক্কাধিপতি যবনরাজ অঙ্গুলিদর্শনে রাজপুত-নৃপতির অত্যাচার-বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন। প্রতিশোধ লইবার জন্ম তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ তিনি রাজপুতের বিরুদ্ধে একটি বিশাল সেনাদল প্রেরণ করিলেন। সেই প্রকাণ্ড মুসলমান্-বাহিনী, অশ্ববিক্রেতার বেশে সিন্ধুদেশ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভারতে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে অজমীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা নিজ উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল এবং অলক্ষিতভাবে রাজা দুলারায় ও তৎপুত্রকে আক্রমণপূর্ব্বক উভয়কেই নিপাত করিল। গড়বিটলি যবনের অধিগত হইল দুলারায় দানবের হস্তে নিহত হইলেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র সপ্তমবর্ষীয় লোট দুর্গপ্রাচীরের

উপরিভাগে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময়ে শত্রুনিক্ষিপ্ত একটি তীর আসিয়া তাহারও প্রাণ সংহার করিল। *

অজয়দুর্গও যবনের হস্তগত হইল বটে, কিন্তু অধিকদিন তাহারা সে দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। মাণিকরায় ইতিপূর্ব্বে পলায়নপূর্ব্বক সম্বরে আশ্রয় লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেনাবল পুনঃ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। মাণিক অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল বংশধরের প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে পশ্চিম-রাজস্থানের এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেই সকল গোষ্ঠী কালে এক একটি বিশাল বংশে পরিণত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববৎ আর তাহাদিগের প্রতাপ ও তেজস্বিতা দৃষ্ট হয় না। যে মাণিকরায় স্বীয় অমিত বাহুবলে মুসলমানের প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করিয়াছিলেন, যাঁহার উত্তরাধিকারীরা স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া খীচি ও হার প্রভৃতি বংশপরম্পরাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, আজি তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরেরা প্রভাতকালীন নক্ষত্ররাজির ন্যায় নিস্তেজভাবে দিনপাত করিতেছেন। সেই সকল রাজপুতকুলের মধ্যে খীচিগণ সিন্ধুসাগর নামক প্রসিদ্ধ দোয়াবের অন্তর্গত আটষট্টি ক্রোশ ভূমি অধিকার করিয়াছিল। আজি সেই বিশাল ক্ষেত্র চিহ্ন ও সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। খীচপুরপত্তন এই খীচিবংশের রাজধানী। হারগণকর্ত্তৃক হেরিয়ানো নামক জনপদে আসি (হাঁসি) স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন গবানকুণ্ড (গোলকুণ্ড) ইহাদের একটি শাখাকুল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয়। মোহিলগণ নাগোরের চতুর্দ্দিকস্থ অনেকগুলি ভূসম্পত্তি অধিকার করে। ভাদোরীয়গণ চম্বলতটে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজি তাহা তাহাদের বংশধরগণের অধিকারে রহিয়াছে। তৎপ্রদেশ ভাদুরীয় নামে অভিহিত। ধনৈরীয়গণ শাহাবাদে এবং বাগ্রিচাগণ নাদোলে অবস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা কখনও চৌহান নাম ত্যাগ করে নাই। নাদোল একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। ১০৩৯ সংবতে (৯৮৩ খৃষ্টাব্দে) রাও লক্ষণ নামক রাজা অত্রত্য সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি নেহারবারার রাজগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। মিবারের রাজাও তাঁহাকে কর প্রদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ নিজ তেজোবলে গজনবীর শবক্তগীন ও মহামুদের বিদ্বেষনয়নে পতিত হন। তাহারা পিতাপুত্রেই তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় রাজ্য ছারখার করে। এখন নাদোল শ্মশানে পরিণত হইল, কিন্তু কিছু দিন পরে আবার সেই নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে নাদোল হইতে অনেকগুলি বীর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই রণভূমে শয়ন করেন। যে দিন ভারতমাতার পদে শাহাবুদ্দিন কর্ত্তৃক দাসত্বনিগড় সংবদ্ধ হইল, সেই দিন হইতেই নাদোলের রাজবংশ মুসলমান-সাম্রাজ্যের সামন্তত্ব স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতীয় মরুপ্রদেশের অনেক স্থানে মাণিকরায়ের সন্তানসন্ততিগণের অদৃষ্টতরু রোপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেহ স্বাধীন, কেহ বা পরাধীন। অনুসন্ধানে দৃষ্ট হইয়াছে, মহারাজ মাণিকরাও হইতে বিশালদেব পর্য্যন্ত একাদশজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল হর্ষরাজের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। হাম্বির রাসা ও জৈগার তালিকা, এই দুইখানি গ্রন্থেও হর্ষরাজের নাম দৃষ্ট হয়। হর্ষরাজের প্রভুত্ব আবু ও আরাবল্লী গিরি হইতে পূর্ব্বে চর্ম্মণবতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

* মিবার-ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে যে, লোট মাণিকরায়ের পুত্র; কিন্তু এখানে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরন্তু কোন্‌টি সত্য, তাহা নিরূপণ করা একান্ত কঠিন।

৮১২ সংবত হইতে ৮২৭ সংবৎ (হিঃ ১৩৮ হইতে ১৫৩ পর্য্যন্ত) তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। নিজ অতুল বাহুবলে অসুরগণকে বধ করিয়া তিনি অরিমর্দ্দন উপাধি প্রাপ্ত হন ; জন্মভূমির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। ফেরিস্তায় বর্ণিত আছে, হিজিরা ১১ অব্দে যবন মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠিল। বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তাহারা গিরিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মন, পেশোয়া ও সন্নিহিত অপরাপর প্রদেশ অধিকার করিল। সেই সময়ে অজমীর-পতির একটি কুটুম্ব লাহোরে রাজত্ব করিতেছিলেন। দুর্জ্জয় আফ্‌গানদিগের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত তিনি আপন ভ্রাতাকে তাহাদের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। একে আফগানগণের সেনাসংখ্যা অধিক, তাহাতে আবার তাহারা খেলজি, ঘোরী ও কাবুলী প্রভৃতি নবদীক্ষিত যবনগণের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি পাঁচ মাস ধরিয়া সপ্ততিসংখ্য যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে হিন্দুদিগেরই পরাজয় হইল। কিন্তু শীতঋতুর আগমনে তাহারা পুনরায় নববল সংগ্রহ করিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। পেশোয়ার ও কর্ম্মনের মধ্যস্থলে দুই পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। একবার কাফেরগণ কোহিস্থান পর্য্যন্ত সেনাদল চালিত করিয়া যবনগণকে তাড়িত করিয়া দিল, আবার এক সময়ে বা যবন নিক্ষিপ্ত নিশিত শরজালে পীড়িত হইয়া আপনাদের সীমামধ্যে পলাইয়া আসিল।

হামিররাসগ্রন্থে লিখিত আছে, হর্ষরাজের মৃত্যুর পর কুজগণদেব নামক এক ব্যক্তি অজয়-মেরুর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। কুজগণদেবের অধিকারসীমা ভূটনের পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নাজিরুদ্দীনকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তৎকালে দ্বাদশ শত তুরঙ্গ অশ্ব জয় করেন এবং আপনার জয়লাভের নিদর্শনস্বরূপ "সুলতান গ্রহ" নাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হিন্দুশত্রু মহামুদের জনক প্রসিদ্ধ শবক্তগীন এই নাজীরুদ্দিন নামে কথিত ছিলেন।

হর্ষরাজের অধস্তন কতিপয় পুরুষ পরে সুপ্রসিদ্ধ বিশালদেব অজমীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে কয়েকটি রাজা চৌহানবংশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের সকলকেই সময়ে সময়ে স্বদেশরক্ষার্থ যবনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। বিশালদেবের পিতার নাম ধর্ম্মগজ ; কিন্তু গ্রন্থান্তরে তাঁহার বিলুনদেব নাম লিখিত হইয়াছে। এই বিলুনদেবের অধিকারকালেই মাহমুদ শেষবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। বিশালদেবের পিতা অমিত বাহুবলে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া মুসলমানপতিকে অজমীর হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

চৌহানবংশে গোগা নামে একজন প্রসিদ্ধ বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে দিন দুর্জ্জয় মহামুদ নিজ দোর্দ্দণ্ড বাহুবলে ভারতের পশ্চিমপ্রদেশ জয় করিয়া পঞ্চনদপ্রদেশে প্রথম প্রবিষ্ট হয়, সেই দিন বীরকেশরী গোগা যবনের জলন্ত তেজ চূর্ণ করিবার জন্য যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তদীয় নাম রাজপুতসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তদীয় পবিত্র বংশ চৌহানের একটি আদর্শ। বাচ নামক প্রসিদ্ধ রাজার ঔরসে বীরকেশরী গোগার জন্ম। সমস্ত জঙ্গলদেশ গোগার অধিকৃত ছিল। মিহির নগর তাহার রাজধানী। গোগার নামানুসারে রাজধানীও "গোগা কা মৈরি" নামে কথিত হইল। শতদ্রুতীরে এই নগরী স্থাপিত। যবনাক্রমণ হইতে এই রাজধানীকে রক্ষা করিবার জন্য গোগা আপনার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র এবং ষষ্টিসংখ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত রণভূমে শয়ন করেন। রবিবার নবমী তিথিতে এই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। স্বদেশের জন্য বীরকেশরী গোগা যে বীরত্ব ও বিস্ময়কর আত্মত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে

তদীয় পবিত্র নাম স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসিকুলের উচ্চ আসনে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আজিও ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুল তাঁহার উদ্দেশে সেই নবমী তিথিতে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। রাজবারার প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ মরুস্থলীর মধ্যে তাঁহার অধিকতর আদর দৃষ্ট হয়। মরুস্থলীর একটি প্রদেশ আজিও "গোগা-কা-থল" নামে অভিহিত হয়। গোগা নিজে যেমন বীর, তাঁহার রণতুরঙ্গও সেইরূপ প্রভুর অনুরূপ ছিল। সেই অশ্বের নাম যবদীয়া। চারণগায়কগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, গোগা নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্রাভাবে তাঁহাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার কুলের অধিষ্ঠাত্রীদেবী তাঁহাকে দুইটি বর প্রদান করেন। গোগা সেই দুইটির মধ্যে একটি নিজ পত্নীকে এবং অপরটি ঘোটকীকে খাইতে দেন। সেই অশ্বিনীর গর্ভে যবদীয়ার জন্ম হয়। গোগার সহিত যবদীয়ার নামও জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

যেদিন দুর্জ্জয় নিষ্ঠুর যবনপতি মহামুদ মরুভূমির মধ্য দিয়া মুলতান হইতে যাত্রা করে, সেই দিনই তাহার শেষ অভিযান বলিয়া অনুমিত হয়। সেই পাষণ্ড যবনবীর নিজ সেনা সহ অজমীরে উপস্থিত হইয়া তন্নগর অবরোধ করিল। অজমীররাজ ভয়ে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। যবনেরা নির্ব্বিঘ্নে নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম পল্লী-সমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্জ্জয় গড়বিটনি-দুর্গে তাহাদের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হইল। মহামুদ সেই স্থানে দলিত, বিত্রাসিত ও আহত হইয়া নাদোলের দিকে প্রস্থান করিল। সহস্র সহস্র বিপদে পড়িলেও ক্রূরপ্রকৃতির স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। হিন্দুগণের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সেই দুর্বৃত্ত সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। নাদোলে উপস্থিত হইয়াই যবনাধম তন্নগরকে ধ্বংস করিল এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া নেহারওয়ালা জয় করিয়া লইল। তাহার দারুণ অত্যাচারে হিন্দুগণ মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেই পাষণ্ড শত্রুকে দমন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে সময়ে হিন্দুমুসলমানে এই ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, চোহানবীর বিশালদেব সেই সময় অবতীর্ণ হন। দুর্জ্জয় মুসলমানবীরের অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে একমত হইয়া রাজপুতরাজন্য-সমিতি বীরকেশরী বিশালদেবকে প্রধান-সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সমস্ত হিন্দুরাজাই যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু পত্তনের চৌলুক্যরাজ সে যুদ্ধে যোগদান করিলেন না। সমগ্র রাজার সেনাদল চোহানবীর বিশালদেবের পতাকামূলে সমবেত হইয়া মহাবিক্রমে মহোৎসাহে রণভূমির দিকে প্রধাবিত হইল।

শৈলবল জৈতের করে অজমীররক্ষার ভার প্রদানপূর্ব্বক রাজা কহিলেন, "তোমার প্রভুধর্ম্মের উপর আমি নির্ভর করি, এ চৌলুক্য কোথায় আশ্রয় পাইতে পারিবে?" অতঃপর তিনি অজমীর হইতে বহির্গত হইয়া বিশালা নামক সরোবরকূলে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সরোবর আজিও "বিশিল-কা-তালাও" নামে প্রথিত। কতিপয় নির্ঝরিণীর গতি রোধ করিয়া বিশালদেব ঐ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। আজকাল উহা লুনীনদীর জলে পূর্ণ থাকে। সম্রাট জাঁহাগীর ঐ বিশালার উপর একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর রাজা সৈন্যসামন্তদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। পুরীহর মানসিংহ মুন্দরের সেনাদল সহ তদীয় পাদমূল স্পর্শ করিলেন। তখন সেই সেনাকটকের শিরোমণি গিহ্লোট সমাগত হইলেন; ইঁহার নাম তেজসিংহ; ইনি সমরসিংহের পিতা। তুয়ারের সহিত পাবাশির এবং মিবারপতি মহেরের সহিত গরবংশীয় রায় আগমন করিলেন। গর একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ এবং চোহানরাজার অধীন একটি প্রথিত সামন্ত সম্প্রদায়।

ইঁহাদের একটি শাখাকুল কিছুদিন পূর্ব্বে মুই মুপুর এবং প্রায় নয় লক্ষ জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন। ছুলাপুরের মোহিলরাজ কর পাঠাইয়া দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। জিৎকুলসম্ভূত বালোচ করপুটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বামুতির ব্রাহ্মণবাদের অধিপতি সিন্ধুনদ পরিত্যাগ করিল। তাহার পর ভুটনৈর হইতে নজর আসিল এবং টাট্টা ও মুলতান হইতে নলবক্সী আনীত হইল। দরবাসের ভূমিয়া ভট্টির নিকট সংবাদ প্রেরিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহা মান্য করিল। মল্লনবাসের যদুগণও রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিলেন না। অম্বর্ব্বেদের কচ্ছাবহগণের সহিত বীরগুজরি ও মোরীগণও উপস্থিত হইল এবং আরাবল্লীবাসী পরাজিত মৈরগণ আসিয়া রাজপদে প্রণত হইল। অনন্তর গৈলবল মৈতের অধীনে তাকিতপুরের (তোড়ার) সেনাদল দেখা দিল। উদয়প্রমার বেগগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে নরভান, দর, চাঁদেল এবং দাহিমাগণও উপস্থিত হইলেন। দর ও চাঁদেলগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। পৃথ্বীরাজ ইহাদিগের মাহোব ও কলিঞ্জর রাজ্য হরণ করাতে ইহারা তৎসহ তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

এই বিরাট অনীকিনী সম্বন্ধে চাঁদভট্ট যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইল। এই বর্ণনার মধ্যে যে একটি রাজার নাম দৃষ্ট হয়, উহাতে এক একটি বীরচরিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মাণিকরায় ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে চোহানবংশে মহারাজ বিশালদেবের ন্যায় মহাপুরুষ আর কেহ অবতীর্ণ হন নাই। *

দিল্লীর ফিরোজশাহ-প্রাসাদের মধ্যভাগে যে জয়স্তম্ভ বিরাজিত ছিল,তাহার প্রস্তরফলকে দুইটি শ্লোক দৃষ্ট হয়। সেই শিলালিপির শিরোদেশে মহাপুরুষ বিশালদেবের পবিত্র নাম অঙ্কিত। ১২২০ সংবতের বৈশাখের পঞ্চদশ দিবসে ঐ প্রস্তরফলক ক্ষোদিত হয়। বীরকেশরী বিশাল প্রদীপ চৌহান তিলক শাকম্ভরী ভূপতির (পৃথ্বীরাজ) পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বংশকীর্ত্তনার্থ তাঁহার নামমাত্র লিখিত হইয়াছে নতুবা সেই শিলাশাসনের সহিত তাঁহার অন্য কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। চৌহানকুলচূড়ামণি পৃথ্বীরাজ ১২২০ সংবতে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন এবং ১২৪৯ সংবতে শাহাবুদ্দিনের হস্তে আত্মবিসর্জ্জন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকটি পাঠ করিয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট অব্দ দুইটির প্রথমটিকে অমূলক বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত সংবতে মহাবীর বিশালদেব আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ম্লেচ্ছগণকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন। যদি প্রকৃতপক্ষে বিশালদেবের ম্লেচ্ছনিগ্রহব্যাপার দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকাশিত থাকে, তাহা হইলে ১২২০ সংবতের পরিবর্ত্তে ১১২০ সংবৎ বুঝিয়া লইতে হইবে। কেন না, ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১০৬৬ সংবৎ ও ১১২০ সংবতের মধ্যে বিশালদেব অজমীরের সিংহাসনে রাজত্ব করিতেন। তিনি আপনার বাহুবলের সাহায্যে আর্য্যাবর্ত্তক্ষেত্র হইতে মুসলমানগণকে অনেকবার বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া মহামতি টড সাহেব মনে করিয়াছেন যে, প্রথম শ্লোকটি বিশালদেব এবং দ্বিতীয়টিতে পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং ১১২০ সংবতের পরিবর্ত্তে ১২২০ সংবৎ লিখিত হইয়াছে। এ

* বিশালদেব যেরূপ মহাবীর ও উদারাশয় মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার জন্মগ্রহণ বন্ধন চৌহানকুল যে পরম পবিত্র হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার পবিত্রবংশের একখানি বংশপত্রিকা চিত্র করা আবশ্যক বিবেচনায় হারাবতী ইতিবৃত্তের শেষভাগে আমরা উহা সন্নিবেশিত করিলাম।

অনুমান কতদূর অভ্রান্ত, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, তিনি অনেক অনুসন্ধানে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ১০৬৬ সংবৎ ও ১১২০ সংবতের মধ্যে বিশালদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বিশালদেব দিল্লীর তুয়ারপতি জয়পাল। গুর্জ্জরের দুর্ল্লভ ও ভীম ধারানগরীর ভোজ ও উদয়াদিত্য ও মিবারের পদ্মসিংহ ও তেজসিংহের সমসাময়িক রাজা ছিলেন। অধিকন্তু তিনি যে বিশালবাহিনীর অধিনায়ক হইয়া সমরভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা মহামুদ গজনের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মোদাদের প্রতিকূলে সজ্জিত হইয়াছিল। সেই দুর্বৃত্ত মোদায় যখন রাজপুতনার উত্তরপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হয়, তখন আর্য্যাবর্ত্ত পুনরায় পুণ্যভূমি হইয়া উঠে। প্রসিদ্ধি আছে, বিশালদেব বার্দ্ধক্যে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক প্রমাণও দৃষ্ট হয়। ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি পরিশেষে যার পর নাই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মত্যাগরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানার্থ সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশে কালিক জোবনৈব নামক ক্ষুদ্র পর্ব্বতকুটে তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই স্থান বিশাল-কা-ঢণ্ড নামে প্রসিদ্ধ।

ভট্টকবি গোবিন্দরাম নিজগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বিশালদেব অনুরাজ নামে একটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই অনুরাজ হইতেই হারকুলের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু খীচিগণের ভট্টকবি মগজী স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অনুরাজ মাণিকরাজের পুত্র।

অসি দুর্গ অনুরাজের অধিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ইষ্টপাল সিন্ধুসাগরের অন্তর্গত খীচিপুরপত্তনের প্রতিষ্ঠাতা। অজয়রাওয়ের পুত্র অগনরাজের সহিত একমত হইয়া গবালকুণ্ডের শাসনকর্ত্তা চৌহান রণবীরসিংহের সমীপে আপনাদের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে উপক্রম করিতেছিলেন, ইত্যবসরে গজলিবন্ধের গহনকানন হইতে একটি বাহিনী আসিয়া অসি ও গোলকুণ্ড নগরদ্বয় আক্রমণ করিল। রণধীর কঠোর জহরব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। সেই ভীষণসঙ্কট হইতে কেবল তাঁহার কন্যা সুরাবাই আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। সুরাবাই অসির দিকে পলায়ন করিল। এ দিকে অসিনগর যবনাক্রান্ত দর্শনে অনুরাজ পলায়নের উপক্রম করেন, কিন্তু তদীয় পুত্র ইষ্টপাল দানবের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সংকল্প করিয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষে সংগ্রাম সংঘটিত হইল। অচিরেই আক্রমণকারী রণক্ষেত্রে শয়ন করিল। তাহার সেনাদল ছত্রভঙ্গে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ইষ্টপাল দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই দুর্ব্বল অবস্থাতেই বিপক্ষগণের অনুগামী হইলেন। তাঁহার করচরণাদি ক্রমে নিস্পন্দ হইয়া আসিল; পরিশেষে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সেই স্থানের নাতিদূরে অশ্বত্থমূলে অভাগিনী সুরাবাই প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনশনে, অনিদ্রায়, ভয়ে ও কঠোর পথশ্রমে তাঁহার দেহ অস্থিমাত্রসার হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার প্রাণবায়ু পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে সেই বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষের স্কন্ধদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং তন্মধ্য হইতে কুলের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভগবতী আশাপূর্ণা বহির্গত হইয়া তাঁহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর সুরাবাই দেবীর পাদমূলে নমস্কারপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "দেবি, এ জগতে আমি নিঃসহায়, আমার পিতা ও দ্বাদশ ভ্রাতা গজলিবন্ধের দৈত্যকবল হইতে গোলকুণ্ড উদ্ধার করিতে গিয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছেন, আমার আর ছার দেহভারে সুখ কি?" আশাপূর্ণা দেবী প্রবোধবচনে কহিলেন, "বৎসে! ভয় নাই, সেই দানব চোহানবংশের এক বীরের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সেই বীরপুরুষ আমাদের নিকটেই রহিয়াছেন।" অতঃপর ভগবতী সেই শোকবিধুরা কুমারীকে লইয়া ইষ্টপালের নিকট উপস্থিত

হইলেন। তাঁহার সেবায় ইষ্টপালের মূর্চ্ছা দূর হইল। তিনি উজ্জীবিত হইয়া চোহানবংশের প্রাচীন নগর অসিদুর্গ প্রাপ্ত হইলেন।

১০৮১ সংবতে (১০২৫ খৃষ্টাব্দে) অসিনগর হারবংশপ্রতিষ্ঠাতার অধিকৃত হইল। এ দিকে মহাম্মদ হিজরা ৪১ শকে (১০২২ খৃষ্টাব্দে) অজমীর আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইষ্টপালের পিতা মহারাজ অনুরাজ মুসলমান আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ না হইয়া নিজ জীবন ও অসিনগর শত্রু-হস্তে অর্পণ করেন। ঐ সময়ে অজমীরও সেই দানব কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। সেই দানব গজ্‌নিবন্ধ হইতে আগমন করিয়াছিল।

ইষ্টপালের পুত্র চাঁদকর্ণ। চাঁদকর্ণের দুই পুত্র;—হামির ও গম্ভীর। পৃথ্বীরাজ যখন যখন সমর-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, হামির ও গম্ভীর প্রায় সেই সমস্ত যুদ্ধেই তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। ঐ ভ্রাতৃদ্বয় পৃথ্বীরাজের অষ্টাধিকশত সামন্তের অন্তর্ভুত।

চাঁদভট্টের কাব্যগ্রন্থে লিখিত আছে যে, হাররাজপুত্রদ্বয় মহারাজ পৃথ্বীরাজের তৃতীয় দিবসের সংগ্রামে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর হাররাও হামির স্বীয় ভ্রাতা গম্ভীরের সহিত লক্ষ্মীতুরঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তেজোগর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "জঙ্গলেশ! আপনি আত্মরক্ষার উপায় দেখুন। আমরা এ দিকে জয়চাঁদের বাহিনীকে প্রাণ উৎসর্গ করিতেছি। অর্ণবযান যেমন সমুদ্রবক্ষ বিদারণপূর্ব্বক চলিয়া যায়, আমাদের অশ্বগণের খুরসমূহও তদ্রূপ সমরভূমি বিদারিত করিবে।"

এই বলিয়াই ভ্রাতৃদ্বয় কনোজের অন্যতম প্রধান সামন্ত কাশীরাজের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হামির যে সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন, তাহা শৈল-সিংহাসনে দেবী ভগবতীর শ্রুতিগোচর হইল। যুদ্ধ ক্রমশঃই ভীষণতর হইয়া উঠিল। প্রভুর প্রাণরক্ষা করিবার উদ্দেশে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রণভূমে জীবন উৎসর্গ করিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, সেই সর্ব্বনাশকর গৃহযুদ্ধে হারবংশের সমস্ত বীরই নিপতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শাহাবুদ্দিনের সহিত শেষসংগ্রামে ভারতের অধঃপতন হইলে যে কতিপয় রাজপুতবীর রণভূমি হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হার-রাজপুত্রই একজন। হামিরের পুত্র কালকর্ণ, কালকর্ণের পুত্র রাও বাচা এবং বাচার পুত্র রাও চাঁদ।

যে সকল চৌহানবংশীয় স্বাধীন রাজা দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, অসি নগরের রাওচাঁদ তন্মধ্যে অন্যতম। আলাউদ্দীন অসির দুর্গ আক্রমণ করিলে রাওচাঁদ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে তাঁহার সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয়। তদীয় সৈন্যসামন্ত ও আত্মীয়স্বজন সকলেই মুসলমান-করে নিহত হইল, দুর্ভেদ্য অসির দুর্গও ভগ্ন এবং চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সেই ভীষণ কালসমরে তাঁহার একটিমাত্র শিশুকুমার রণসিংহের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। রণসিংহের বয়ঃক্রম তখন আড়াই বৎসর। চিতোরের রাণা তাঁহার মাতুল, সুতরাং তিনি মাতুলভবনেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি ভিনসহর দুর্গ জয় করিলেন। দুঙ্গা নামক একজন ভীল-সর্দার ঐ দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল, রণসিংহ তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দুর্গ হস্তগত করিলেন।

রণসিংহের দুই পুত্র;—কলুন ও কন্থল। কলুন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া শান্তিলাভার্থ গঙ্গাকূলবর্ত্তী কেদারনাথ তীর্থে গমন করিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, অভীষ্ট বরলাভের উদ্দেশে সমস্ত পথ তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ কঠোর তপস্যার সহিত

কলুন কিম্বা নামক পর্ব্বতকূটে উপস্থিত হইলেন। তথায় বাণগঙ্গানাম্নী একটি নদী প্রবাহিত হইত। তদীয় সুশীতল জলে স্নান করিয়া তিনি পুনরায় অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। সেই নদীসলিলে স্নান করিয়াই হউক কিংবা দেবানুগ্রহেই হউক, তাঁহার পীড়া তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইল। ভগবান্ ভূতভাবন কেদারনাথ তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তৎসম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে বরদান করিয়া কহিলেন, "তুমি পথরের অধীশ্বর হইবে।" মধ্যভারতের সমস্ত উচ্চভূমিই এই নামে প্রথিত। ইহা এত দিন গিহ্লোটরাজগণের অধীনে ছিল। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর ধ্বংস হইলে রাণাগণের বাহুবল কিছুকালের জন্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সেই অবসরে পার্ব্বত্য মীনগণ তাঁহাদের নিকট হইতে আপনাদের প্রাচীন গিরিরাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। এখন দেবদেব কেদারনাথের কৃপায় সেই রাজ্য রাও কলুনের অধিকৃত হইল। সেই নবপ্রাপ্ত পথরের একদশমাংশ তিনি আপন ভ্রাতা কক্কুলজীকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কক্কুলজী হইতেই "ক্রোরিয়া ভাট" নামে একদল ভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রাচীনকালে পথর হুন নামক রাজার অধীনে ছিল। প্রসিদ্ধি আছে, প্রমারবংশে হুনের জন্ম। মৈনাল তাঁহার রাজধানী। কিছুদিনের মধ্যেই কালুনের পৌত্র রাও বাঙ্গ মৈনাল নগর অধিকার করিলেন এবং পথরের একটি উচ্চভূমিতে বুঁদেদাদুর্গ স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বদিকে ভিনসহর এবং পশ্চিমে বুঁদেদা ও মৈনাল দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া হারগণ সমগ্র পথরে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই মণ্ডলগড়, বিজোলি, বৈগু, রত্নগড় ও চোরৈডাগড় এই সমস্ত স্থানও হাররাজের অধিকৃত হইল।

রাও বাঙ্গের দ্বাদশ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেওয়া পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। দেওয়ার তিন পুত্র; হরিরাজ, হাতীজী ও সমরসিংহ। হরিরাজের দ্বাদশ পুত্র;—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আলু। ইনি বৈমুদারাজ্য প্রাপ্ত হন; আলু হারের সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিংবদন্তী আছে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তাঁহার প্রবলপ্রতাপে মারবারের রাণাও ভীত হইয়াছিলেন। একদা কোন চারণ তাঁহার উষ্ণীষ ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া তাহা শিরোপরি স্থাপনপূর্ব্বক মারবারের সভায় উপস্থিত হয়। রাজাকে প্রণামকালে মস্তকের সহিত পাছে সেই উষ্ণীষও অবনত হয়, এই জন্য চারণ প্রথমে তাহা মাথা হইতে খুলিয়া রাখিয়াছিল। রাঠোররাজ তদ্রূপ উদ্ধতভাব দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কাহার উষ্ণীষ?" চারণ উত্তর করিল, "বুঁদেদার আলু হারের।" রাজা তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে সেই উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বাধিল। আলু হার চারণমুখে নিজ অবমাননার কথা শুনিয়া স্বগোত্রীয় পাঁচ শত অশ্বারোহীকে ছদ্মবেশে লইয়া মুন্দরে প্রবেশ করেন। তথায় উভয়পক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটে; সেই যুদ্ধে আলুর ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে রাঠোরপতি নিহত হন। তৎপরেই বিবাদ প্রশমিত হয়। নবীন রাঠোররাজ হারবীর আলুর হস্তে নিজ কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া সেই জলন্ত বিগ্রহানলে শান্তি-সলিল সেচন করিলেন।

রাও দেওয়ার অধিকারসময়ে হারগণ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তৎকালে সেকন্দর লোদী দিল্লীর সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাও দেওয়ারকে নিজসভায় আহ্বান করেন। তদনুসারে বুন্দিরাজ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হাররাজকে বুঁদেদার সিংহাসনে অভিষেক করিয়া কনিষ্ঠ সমরসিংহের সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন। কিছুদিন দিল্লীতে থাকিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

প্রসিদ্ধি আছে, রাও দেওয়ার অত্যুত্তম অশ্বদর্শনে তৎপ্রতি সম্রাটের লোভ পড়ে, সেই জন্যই হারনৃপতি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই অশ্বটি অতি প্রসিদ্ধ; হার ও খীচি উভয় বংশের ভট্টগ্রন্থে তাহার নানাবিধ গুণকীর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সেই অশ্বটির জন্ম সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, সম্রাটের অশ্বশালায় একটি ঘোটক ছিল। সেই ঘোটকটি নদীর উপর দিয়া চলিতে পারিত, অথচ তাহার খুর জলে ভিজিত না। দেওয়া রাজার অশ্বপালকে উৎকোচ দিয়া সেই অশ্বটি লইয়া আসেন এবং তাহাকে পথরের অশ্বিনীর সহিত সঙ্গত করাইয়া একটি শাবক উৎপাদিত করেন। সেই ঘোটক শাবকই তাঁহার সেই প্রিয়তম তুরঙ্গ; ইহারই উপর সম্রাটের লোভ পড়িয়াছিল। যাহা হউক, মুসলমান সম্রাটের নীচাশয়তায় যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া রাও দেওয়া ক্রমে ক্রমে নিজ পরিবারবর্গকে স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন; ক্রমে তাহারা নিরাপদস্থানে পৌঁছিলে হাররাজ স্বীয় অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক শূন্যহস্তে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং নির্ভয়ে কহিলেন, "চলিলাম মহারাজ! আজ হইতে স্মরণ রাখিবেন, তিনটি সামগ্রী কদাচ আপনি রাজপুতের নিকটে প্রার্থনা করিবেন না;—রাজপুতের অশ্ব, ভার্য্যা ও তরবারি।" এই বলিয়াই অশ্বারোহণে তড়িদ্বেগে দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই রাও দেওয়া পথরে উপস্থিত হইলেন এবং বুন্দেলা হারনৃপতির করে পথরের ভার প্রদানপূর্ব্বক বান্দুনাল নামক স্থানে গমন করিলেন। এই স্থানেই তদীয় পিতামহ কলুন সেই ভীষণ পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। সেই সময়ে জৈতা নামক একটি সর্দ্দারের অধীনে উশারা বংশীয় মীনগণ তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। বান্দুনাল তখন নিয়মিত নগররূপে পরিণত হয় নাই। প্রাচীর ও কবাট দ্বারা উপত্যকার মুখদ্বয় রুদ্ধ করিয়া সেই অসভ্য আদিম অধিবাসিবৃন্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খলিত কতকগুলি কুটীরাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছিল।

সেই মীনগণ গিহ্লোটবংশের অধীন; কিন্তু রাও গাঙ্গ নামক একটি খীচি-রাজপুত্রের উৎপীড়নে তাঁহারা একান্ত মগ্ন হইতেছিলেন। রাও গাঙ্গ স্বীয় রামগড় (বিলাবান) দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে 'বারচ বোহই' আদায় করিতেছিলেন। তাঁহার ভল্লাঘাতে বান্দুর প্রাকারাবলি অনেকবার ভগ্ন ও বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া মীনরাজ জৈত রাও গাঙ্গের সহিত এই সন্ধিস্থাপন করিলেন যে, প্রত্যেক দ্বিতীয়মাসের পূর্ণিমাতে প্রাচীরের উপর হইতে তাহারা একটি থলিতে করিয়া চোথকর ঝুলাইয়া দিবে। গাঙ্গ তাহাতেই প্রীত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্টকালে রাও গাঙ্গ সেই প্রাকারমূলে গমন করিলেন, কিন্তু কোন দিকেই করের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিলেন না। দারুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তিনি কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে আমার অগ্রে উপস্থিত হইয়াছিস্?" অমনি রাও নিজ প্রিয়তম অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অবলম্বে তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইলেন। রাও গাঙ্গেরও সেই প্রকার একটি সুন্দর তুরঙ্গ ছিল। সে অশ্বে আরোহণ করিলে কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না; তাঁহার বিক্রম ও উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত, তিনি কাহারও নিকট পরাজিত হইতেন না।

রাও দেওয়া ও গাঙ্গ উভয়ে পরস্পর অসি নিষ্কোষিত করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রধাবিত হইলেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক্রমে ভীষণ হইয়া উঠিল। সে সংগ্রামে রাও গাঙ্গ পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হারনৃপতি তদীয় অনুগামী হইয়া চম্বলকূলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমীপবর্ত্তী দর্শনে খীচিবীর অশ্বকে তাড়িত করিয়া নদীগর্ভে পতিত হইলেন; অমনি অশ্ব ও অশ্বারোহী

সলিলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেল; কিন্তু যখন আবার পরপারে উত্থিত হইল, তখন রাও দেওয়ার বিস্ময়ের অবধি থাকিল না। তিনি যার পর নাই বিস্মিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য রাজপুত! তোমার নাম আমাকে বল!" তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল, "গাঙ্গ থীচি।" শ্রবণমাত্র আনন্দ-গদ্‌গদস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর আমার নাম দেওয়া হার। আজ হইতে আমরা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে সংবদ্ধ হইলাম। চম্বল নদী আমাদের উভয়ের রাজ্যের সীমারেখাস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হউক।"

১৩৯৮ সংবতে (১৩৪২ খৃষ্টাব্দে) জৈত ও তাঁহার অনুচর চৌহানবীর রাও দেওয়ার অধীনতা স্বীকার করিল। দেওয়া সেই বিস্তৃত উপত্যকা-প্রদেশ বন্দুকা নালের মধ্যে বুন্দিনগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই দিবস হইতে বুন্দি হারকুলের রাজধানী বলিয়া গণনীয় হইল। যে চম্বল অল্পদিন ধরিয়া উভয়রাজ্যের সীমাবন্ধনীরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অতিক্রান্ত হইল এবং হারবংশের বিজয়-বৈজয়ন্তী মালবের সীমায় সমুড্ডীন হইল। সেই বিস্তৃত রাজ্যই হারাবতী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাও দেওয়ার বুন্দিনির্ম্মাণ, উশারাদিগের হত্যা, দেওয়ার সিংহাসনত্যাগ, সমরসিংহ, চম্বলনদের পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার, কোটীয়া ভীলদিগের হত্যা, কোটার উৎপত্তি নাপুজীর সিংহাসনারোহণ শোলাঙ্কি টোডার সহিত বিবাদ, নাপুজীর হত্যা সহমরণ, হামুর অভিষেক, হামুর দর্প, বীরসিংহ, বীরু, রাও বান্দো, দুর্ভিক্ষ, নারায়ণদাসের পিতৃরাজ্য পুনর্লাভ, রাণা রায়মল্লের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ, নারায়ণদাসের মৃত্যু, রাও সূর্য্যমল, চিতোরের কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ, সাংঘাতিক ফলোৎপত্তি, সুরতান, বিস্ময়কর মরণ, সুরজনের অভিষেক।

অসি (হাঁসি) অনুরাজের অধিকৃত হইল। অনুরাজের পুত্র ইষ্টপাল ১০৮১ সংবতে (১০২৫ খৃষ্টাব্দে) অসি হইতে বিতাড়িত হইয়া পুনরায় অসি প্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতেই হারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু অসিপাতের কত বৎসর পরে যে তিনি হারকুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহার কোন বিবরণ কিছুতেই দৃষ্ট হয় না।

১২২৯ সংবতে (১১৭৩ খৃষ্টাব্দে) কাগারসমরে হামিরের মৃত্যু হয়।

যবনবীর আলাউদ্দীনের হস্তে ১৩৫১ সংবতে অসি নগরে রাওচাঁদ প্রাণত্যাগ করেন। অসি হইতে পলায়নপূর্ব্বক রণসিংহ মিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৩৪৩ সংবতে তিনি ভিনসহর-দুর্গ অধিকার করেন। মণ্ডলগড়, মৈনাল প্রভৃতি নগর রাও বাঙ্গের অধিকৃত হইয়াছিল। বুমেদা নগর তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৩৯৮ সংবতে (১৩৪২ খৃষ্টাব্দে) মীনগণের হস্ত হইতে বান্দু উপত্যকা আচ্ছিন্ন করিয়া রাও দেওয়া বুন্দিনগর স্থাপনপূর্ব্বক সমগ্র প্রদেশের হারাবতী নামকরণ করেন। বুন্দিস্থাপন পূর্ব্বক রাও দেওয়া দেখিলেন যে, হার অপেক্ষা মীনপ্রজার সংখ্যা অধিক; কতিপয়মাত্র

রাজপুতের আনুকূল্যে লক্ষ লক্ষ আদিম অসভ্য ব্যক্তিকে কিরূপে শাসন করিবেন? অকস্মাৎ এই চিন্তা দেওয়ার অন্তরে উদিত হইল। তখন তিনি পাশবী স্বার্থপরতার মোহমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একটি লোমহর্ষণ কার্য্যের উপক্রম করিলেন। সমগ্র মীনকুলকে বধ করিয়া তিনি স্বীয় আধিপত্য দৃঢ় করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ভূমিলাভই রাজপুতের মূলমন্ত্র; এই মন্ত্রসাধনের জন্ম রাজপুত নৃশংস পিশাচের স্থায় কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। হারবংশের ভট্টকবি রাও দেওয়ার উক্ত পাশব হত্যাকাণ্ডকে ক্ষমা করিয়াছেন; এমন কি, তাহার একটি কারণ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি বলেন যে, মীনরাজ পথরাধিপের নিকট তদীয় কন্সাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া রাও দেওয়া তাঁহার সেই প্রগলভতার শাস্তিদানস্বরূপ মীনকুলকে বধ করেন। যাহা হউক, বুন্দোর হার এবং তোড়ার শোলান্কিদিগের সাহায্যে দেওয়া উশারদিগকে নির্ম্মূল-প্রায় করিয়া ফেলিলেন।

এই রোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর রাও দেওয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্র সমরসিংহের করে বুন্দিরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক রাজকার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করেন। বোধ হয়, অনুতাপের নরকাগ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া তিনি ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। মীনবংশনিপাতের কত দিন পরে যে রাও দেওয়া কর্ত্তৃক বুন্দিসিংহাসন পরিত্যক্ত হয়, কোন ইতিবৃত্তেই তাহার উল্লেখ নাই। যাহা হউক, এই তাঁহার দ্বিতীয়বার রাজ্যত্যাগ। হিন্দুনৃপতিগণের এইরূপ প্রথা আছে যে, পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহারা আর পুনরায় রাজ্যের ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না। যে দিন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, সেই দিন হইতে দ্বাদশ দিবসে প্রজাপুঞ্জ তাঁহার একটি কুশপুত্তলি নির্ম্মাণপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে দাহ করে। উক্ত চিরন্তন রাজপ্রথার নিয়মানুসারে দেওয়া সেই দিন হইতে বুন্দি কি বুন্দো কোন নগরের ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন নাই। যত দিন তাঁহার কালপূর্ণ না হইল, তত দিন তিনি বুন্দির পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অমরথুনা নামক পল্লীতে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পরমার্থচিন্তায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সমরসিংহের তিন পুত্র;—নাপুজী, হরপাল ও জয়ৎসিংহ। নাপুজীই পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হরপাল জুগাবরের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা হরপালপোতা নামে অভিহিত। জয়ৎসিংহ সর্ব্বপ্রথম চম্বলনদের পরপারে হারকুলের প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি কিটুনের তুয়াররাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে কোটিয়া ভীলগণের বিস্তৃত পল্লী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই ভীলবসতি চম্বলের একটি খাঁড়ির নিকটবর্ত্তী। ভীলগণের পল্লীদর্শনে ভূমিলুব্ধ রাজপুতের ভূমিলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অমনি অলক্ষিতে তাহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। অনতর্ক ভীলগণ সদলে তদীয় প্রচণ্ড জিঘাংসানলে ভস্মীভূত হইল। সেই উপত্যকা-ভূমির প্রবেশপথে একটি সামান্ত দুর্গদ্বার রক্ষিত ছিল। তথায় ভীলগণের সর্দ্দার আশ্রয় লইয়াছিল। জয়ৎসিংহ সেই দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভীলপতিকে বধ করিলেন এবং তথায় রণদেব ভৈরবের সম্মানার্থ একটি প্রকাণ্ড হস্তী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বুন্দিনগরে প্রত্যাগত হইলেন। সেই প্রচণ্ড হস্তী কোটা-দুর্গের প্রধান দ্বারসম্মুখে "চার ঝোপরা" নামক স্থানে স্থাপিত। সেই ভীলেরা কোটিয়া ভীল নামে পরিচিত। এই কোটিয়া হইতেই কোটা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জয়ৎসিংহ হইতে পর্য্যায়ক্রমে সুরজন, ধীরদেব, কণ্ডুল, ভনঙ্গসিংহ ও দুঙ্গরসিংহ রাজত্ব করেন। ইহাই জয়সিংহের বংশতালিকা। ইহার মধ্যে সুরজন কর্ত্তৃকই ভীলপল্লী কোটা নামে অভিহিত হয়। ধীরদেব দ্বাদশটি সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। ভনঙ্গের রাজত্বসময়ে ঢাকোর ও কেশর খাঁ নামক দুই জন পাঠান কোটা

আক্রমণ করে। ভনঙ্গ মদিরা ও অহিফেন সেবন করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এই হেতু তিনি বুন্দিতে নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার স্ত্রী রাজ্যের সৈন্য সামন্তগণের সহিত কিটুননগরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। কিছু কাল পরে ভনঙ্গসিংহ উন্মাদরোগ হইতে মুক্ত হইলে একান্ত অনুতপ্ত হন এবং স্বীয় ভার্য্যাসমীপে গমন করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন। তাঁহার বনিতা অতীব বুদ্ধিমতী। পতিকে নিকটে আনিয়া কোটা উদ্ধারের একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কৌশল ব্যতীত বলে পাঠানের কবল হইতে কোটা উদ্ধার অসম্ভব। রাজপুতবালা অতি অদ্ভুত কৌশল স্থির করিলেন। হোলীপর্ব্বের সময় চতুরা রাজপুতবালা পাঠানবীর কেশর খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "কিটুনের যুবতীরা আপনাদের সহিত হোলী খেলিবে; অতএব আপনি প্রস্তুত থাকিবেন। আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইব।" এই সংবাদ পাইয়া পাঠানের আনন্দের অবধি রহিল না। রাজপুত-যুবতীগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মদনমোহনবেশে তিনি প্রস্তুত থাকিলেন। এ দিকে রাজপুতরাণী তিন সহস্র বলবান্ হারযুবককে যুবতী সাজাইয়া আবীর গ্রহণপূর্ব্বক কোটা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সকল ছদ্মবেশী যোদ্ধার ঘাগ্‌রার মধ্যে এক একখানি তীক্ষ্ণ অসি লুকায়িত থাকিল। পাঠানদলের সহিত হোলী-খেলার ধুম পড়িয়া গেল, বৃদ্ধার বেশ ধারণপূর্ব্বক একটি যোদ্ধা আবীরের পাত্র লইয়া কেশব খাঁর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার মস্তকের ভাণ্ডটি ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অমনি রাজপুতবৃন্দ ঘাগ্‌রার ভিতর হইতে নিজ নিজ অসি বাহির করিয়া মুসলমানগণকে বধ করিতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যেই পাঠান খাঁ সদলে ইহলোক পরিত্যাগ করিল। এইরূপে বুদ্ধিমতী ভার্য্যার কৌশলে ভনঙ্গসিংহ কোটারাজ্য পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু তদীয় পুত্র ডুঙ্গরসিংহ বুন্দিরাজ রাও সূর্য্যমল কর্ত্তৃক কোটা হইতে বিতাড়িত হন। সেই দিন কোটা বুন্দির হস্তগত হয়।

সমরসিংহ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বুন্দি-সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাপুজী একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি তোড়ার শোলান্‌কিপতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একদিন সস্ত্রীক শ্বশুরগৃহে গমন করিয়া তথায় তিনি একখানি সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তর দেখিয়া ভার্য্যাকে তাঁহার পিতার নিকট ঐ প্রস্তরখানি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তোড়াপতি এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "আমার বোধ হয়, হার এইরূপে আমার মহিষীকেও প্রার্থনা করিবে। এরূপ জামাতা আমার রাজ্য হইতে প্রস্থান করুক্।" এই কঠোর অপমানে নাপুজী একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার অন্তরে বিষম ক্রোধসঞ্চার হইল। সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া নাপুজী আপন ভার্য্যাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন; তাঁহার অনুনয়বিনয়ে আদৌ মনোনিবেশ করিলেন না,—এমন কি, তাঁহাকে শয্যা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। শোলান্‌কি-রাজনন্দিনীর দুঃখের অবধি রহিল না। পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া কুমারী আপন মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিলেন।

"কাজুলি তিস" পর্ব্ব উপস্থিত হইল। শ্রাবণমাসের তৃতীয় দিনে রাজপুতরাজ্যে এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পর্ব্বে গৃহে উপস্থিত থাকিয়া ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা এবং ভার্য্যার সহিত সহবাস করাই প্রথা। যে যত দূরে অবস্থিতি করুন, ঐ দিন গৃহে আসিয়া নিজ পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বুন্দিরাজ নাপুজী ঐ দিন আপন সন্তানগণকে বাটীগমনে অবসর দিলেন। অতঃপর তাহারা সকলে নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইলে বুন্দিরাজ এক প্রকার অরক্ষিত হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে তোড়াও নগরমধ্যে গোপনে প্রবেশপূর্ব্বক হারপতির শিরোদেশে শাণিত ভল্লের আঘাত করিলেন। এই প্রকার কাপুরুষোচিত উপায়ে জামাতার প্রাণবধ করিয়া উদ্ধত তোড়াও অলক্ষিতে প্রস্থান করেন। কিন্তু তিনি নিরাপদ্ হইতে পারেন নাই। বুন্দির অনতিদূরবর্ত্তী একটি

গহ্বরের সম্মুখে আপন সন্তানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কাপুরুষ শোলানকি তাঁহাদের নিকট নিজ ঘৃণিত ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিলেন। সেই গুহার অভ্যন্তরে বুন্দির একজন সর্দ্দার উপবিষ্ট হইয়া অহিফেন সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার মন উৎকন্ঠিত, অধীর, হৃদয় মর্ম্মাহত। অবকাশ পাইয়া তিনি গৃহে যাইতেছেন বটে, কিন্তু গৃহে গিয়া ফল কি? কে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে প্রেমোৎফুল্লনেত্রে অভ্যর্থনা করিবে? তাঁহার গৃহ অরণ্যবৎ; চৌহান-সর্দ্দার স্বগৃহের অভিমুখে আর অগ্রসর না হইয়া সেই গহ্বরাভ্যন্তরেই নিতান্ত দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন. ভার্য্যার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, ইত্যবসরে নিকটে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। চমকিত হইয়া বুন্দি-সর্দ্দার দেখিলেন, কতকগুলি অপরিচিত সেনা অশ্লীল কৌতুকবাক্যে হার-রাওয়ের জঘন্য আচরণ আন্দোলন করিতে করিতে গমন করিতেছে। চতুর-চূড়ামণি চৌহানসর্দ্দার তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং সেই নিষ্ঠুর শোলানকিরাজকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া এক আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। শোলানকি সৈনিকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। চৌহান-সর্দ্দার তখন রাজার ছিন্নবাহুটি স্বীয় গাত্রমার্জ্জনীর দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া বুন্দিনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে রাজধানীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; চতুর্দ্দিকে গোলযোগ,—চতুর্দ্দিকেই আর্ত্তনাদ। সেই শোকরোল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া বিধবা রাজমহিষী পতির মৃতদেহ সহ জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছেন, ইত্যবসরে বুন্দিসর্দ্দার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক অনুমরণোদ্যতা মহিষীকে সেই ছিন্ন বাহুটি প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "ইহা দর্শন করিয়া আপনি শোক দূর করিতে পারেন।" শোলানকি-কুমারী বলয় দর্শনমাত্র পিতার ছিন্নবাহু চিনিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় শোকে অধীর হইয়া পড়িল; একে পতিশোক, তদুপরি পিতৃশোক উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তখনই লেখনী লইয়া নিজ ভ্রাতাকে তিনি এই কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, "যদি তুমি এ কলঙ্ক মোচন না কর, তাহা হইলে তোমার বংশ 'একহেতো শোলানকির বংশ' বলিয়া চিরদিন নিন্দিত হইবে।" পত্রখানি লিখিয়া সতী চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। পত্রখানি যথাসময়ে শোলানকি রাজপুত্রের নিকট পৌঁছিল। পত্রপাঠমাত্র তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল; প্রতি-শোধপিপাসা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি পাষাণস্তম্ভে স্বীয় মস্তক আঘাত করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

নাপুজীর তিন পুত্র;—হামুজী, নরঙ্গ ও থুরদ। নরঙ্গের বংশধরেরা নরঙ্গপোতা এবং থুরদের উত্তরাধিকারিগণ থুরদ হার নামে প্রথিত। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ হামুজী ১৪৪০ সংবতে বুন্দির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হাররাজের মৃত্যুর পর অালু বুন্দিরার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু পথরের রাজবংশের সহিত গিহ্লোটবংশের বিবাদ থাকাতে চিতোরের অধিপতি তাঁহাকে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলেন। অবশেষে আলু আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

দুর্ব্বৃত্ত আলা-উদ্দীনের অত্যাচারে চিতোর অন্তঃসারশূন্য হইয়া কঙ্কালমাত্রসার হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কালসহকারে আবার চিতোর ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়াছে. আবার চিতোরের অধীশ্বর আজি পূর্ব্ববল পুনরুপচয় করিয়াছেন। এই সময়ে রাণা লাক্ষ মিবারের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণকে দমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। চিতোরের গত বিপ্লবের সময় গিহ্লোটবল ক্ষয় হইলে যে সমস্ত সামন্ত অবসর বুঝিয়া চিতোরের অধীনতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়াছিল,

তাহাদিগের উপরেই রাণার কোপদৃষ্টি পতিত হইল। সেই সকল সামন্তের সহিত হার রাজও বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত; রাণা তাহাদিগকে দমন করিতেই কৃতসঙ্কল্প; আশু হামুজী চিতোরে আহূত হইলেন। হাররাজপুত্র কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া স্বয়ং দশহরা ও হোলী উৎসবের সময়ে রাণাকে পূজোপচার প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট রাজটীকাগ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু সামন্তের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবা করিতে সম্মত হইলেন না। রাণা এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞাপালন করিতে কদাচ নিরস্ত থাকিবেন না। অবশেষে তিনি হামুজীকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'চিতোরের অধীনতা স্বীকার কর, নচেৎ দেওয়ার বংশ পথর হইতে সমূলে উৎপাটিত হইবে।"

হামু ভীত না হইয়া তেজোগর্ভবাক্যে উত্তর পাঠাইলেন, "আপনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। হামু রাও দেওয়ার উপযুক্ত বংশধর কি না, তাহা আপনি অচিরেই বুঝিতে পারিবেন।" এইরূপ গর্ব্বিত উত্তর পাইয়া রাণার হৃদয় ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। অবিলম্বেই তিনি স্বীয় সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বুন্দির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাজধানীর কতিপয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী নীমরো নগরে গিহ্লোটের শিবির সন্নিবেশিত হইল। এদিকে রাও হামু এই সংবাদ পাইবামাত্র স্বীয় সামন্তগণকে আহ্বানপূর্ব্বক স্বদেশরক্ষার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পাঁচ শত হারবীর পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক হুলকাররঙ্গের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। জন্মভূমির জন্য রাণার সহিত সমরে আত্মোৎসর্গ করিবে, ইহাই তাহাদের দৃঢ়হৃদয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। প্রচণ্ড গিহ্লোটসেনার প্রতিকূলে তাহারা যে জয়লাভ করিতে পারিবে, এ আশা তাহাদের নাই। তথাপি তাহারা নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ নহে। চরম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে তাহারা নগর হইতে বহির্গত হইল এবং অলক্ষিতে গিহ্লোট সেনা আক্রমণ করিল। সেই বিপুল আক্রমণে শিশোদীয় সৈন্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। শিশোদীয়সেনার উপর পতিত হইবাই হামুজী একেবারে হিন্দুরাজার পটগৃহে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রাণা তথায় উপস্থিত ছিলেন না। আপন সেনামধ্যে তুমুল হুলস্থূল দর্শনে তিনি অন্ধকারে অন্ধকারে স্বনগরে পলায়ন করিয়াছেন। হামুজী মত্তহস্তীর ন্যায় শিশোদীয় সেনাকে মথিত করিয়া রাণার অন্বেষণে চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কুত্রাপি দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে প্রফুল্লবদনে বুন্দিনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভগ্নহৃদয় হইয়া লজ্জাবনতবদনে রাণা স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে হারবীর তাঁহাকে পরাজয় করিলেন, এ অবমাননা রাখিবার স্থান নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "বুন্দিজয় না করিয়া জলগ্রহণ করিব না।" এই প্রতিজ্ঞার কথা সমন্তাৎ প্রচারিত হইল। বুন্দি মিবার হইতে অন্যূন ত্রিশক্রোশ দূরবর্ত্তী। কিন্তু তাহা আবার প্রচণ্ড বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। সেই দূরপথ উত্তীর্ণ হইয়া সেই সকল বীরকে সংহারপূর্ব্বক বুন্দিজয় করা নিতান্ত সহজ নহে। এ দিকে রাজপুতরাজগণের প্রতিজ্ঞা অটল। যেরূপে হউক, রাণা বুন্দিজয় না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না। সেই সময়ে তদীয় সর্দ্দারেরা সমবেত হইয়া একটি শিশুসুলভ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। প্রকৃত বুন্দিজয় করা অসম্ভব, সুতরাং ব্যঙ্গবুন্দি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা আক্রমণ ও জয় করিতে হইবে। আশু চিতোরের প্রাকারাবলীর ছায়ায় একটি কল্পিত বুন্দিনগর অঙ্কিত হইল। রাণা সেই ব্যঙ্গীভূত নগর জয় করিবার উদ্দেশে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। তৎকালে একদল হারসেনা চিতোররাজের অধীনে নিযুক্ত ছিল। কুম্ভ বৈরসিংহ সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন। যে দিন

ঐরূপ ঘটনার অনুষ্ঠান হয়, কুম্ভ সেই দিন সসৈন্যে মৃগয়া-যাত্রা করিয়াছিলেন। মৃগয়াবসানে তিনি চিতোরে প্রত্যাগত হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই অপূর্ব্বকাণ্ডে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি অনুসন্ধানপূর্ব্বক সকল ঘটনা অবগত হইলেন। ক্রোধে ও বিদ্বেষে কুম্ভের হৃদয় আলোড়িত হইল। তিনি আপন সৈন্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "বীরগণ! বুন্দি কি রাণার এমনই চক্ষুঃশূল হইয়াছে যে, প্রকৃত বুন্দিজয় করিতে না পারিয়া তিনি একটা বিদ্রূপবুন্দি জয় করিবেন? আইস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি; প্রাণান্তে এই কৃত্রিম-বুন্দিও রাণাকে জয় করিতে দিব না।" তৎক্ষণাৎ তদীয় সহচরগণ সেই কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। এ দিকে বিদ্রূপ বুন্দি নির্ম্মাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া রাণা সসৈন্যে তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহাদের উপর অনন্ত গুলীবর্ষণ আরম্ভ হইল। সেই সকল রাশি রাশি জলন্ত গুলীবৃষ্টি দর্শন করিয়া রাণা বিস্মিত হইলেন এবং তাহার কারণ অবগত হইবার জন্ত তথায় একটি দূত পাঠাইয়া দিলেন। রাণার দূতকে সম্মুখে দেখিয়া কুম্ভ বলিয়া উঠিলেন, "এই কৃত্রিম বুন্দিও আমরা যেরূপে পারি, প্রাণপণে উদ্ধার করিব। যাও, রাণাকে সংগ্রামে প্রস্তুত হইতে বল।" দূত প্রস্থান করিলে বৈরসিংহ সেই সঙ্কীর্ণদ্বারপথে একখানি চাদর আস্তীর্ণ করিয়া রাণার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সজ্জিত থাকিলেন এবং সেই সার কা বুন্দিরও (মৃন্ময় বুন্দির) চতুঃকাষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া পিতৃকুলের সম্মানরক্ষার্থ সসৈন্যে প্রফুল্লমুখে আত্মোৎসর্গ করিলেন। এই জয়লাভেই রাণার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ভাবিয়া জলগ্রহণ করিলেন।

ষোড়শবর্ষ রাজ্যশাসনের পর মহাবীর হামুন্দী লীলাসংবরণ করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র;— বীরসিংহ ও লাল্লা। খুটকর লাল্লার অধিকারে ছিল। তাঁহারও দুই পুত্র; নবর্ম্মা ও জত। ইঁহাদের উভয়েরই এক একটি বিস্তৃত গোত্র অদ্যাপি রাজবাবায় বিদ্যমান আছে। নবর্ম্মার বংশধরেরা নবর্ম্মপোতা এবং জৈতের উত্তরাধিকারিগণ জৈতাবৎ নামে প্রসিদ্ধ।

বীরসিংহ পঞ্চদশবর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহার তিন পুত্র;—বাঁধু, জবহুর ও নিম। জবহুরের তিন পুত্র; সেই তিন পুত্রই নিজ নিজ নামে এক একটি গোত্রস্থাপন করিয়াছিলেন জবহুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বাচা। বাচার দুই পুত্র;—শিবজী ও শিরাজি। শিবজীর পুত্র মিবজী এবং শিরাজির পুত্র শাবন্ত। মিবজীর সন্তানসন্ততিগণ মিবো এবং শাবন্তের বংশধরেরা শাবন্তহার নামে প্রসিদ্ধ। নিমের বংশধর নিমাবত নামে প্রথিত। পঞ্চাশ বর্ষ রাজ্যশাসনের পর বীর ১৫২৬ সংবতে লীলাসংবরণ করেন। তাঁহার সাত পুত্র;—রাও, বন্দি, সন্দ, আকো, উদো, চন্দ, সমরসিংহ ও অমর সিংহ। প্রথম পঞ্চপুত্র স্ব স্ব নামে এক একটি গোত্রস্থাপন করেন। সেই পঞ্চগোত্রের মধ্যে আকাবৎ, উদাবৎ ও চন্দাবৎ সমধিক বিখ্যাত। ষষ্ঠ ও সপ্তম পুত্র মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

বান্দু অসীম দাতা নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৫৩২ সংবতের (১৪৭৬ খৃষ্টাব্দের) দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রজাপুঞ্জের ভরণপোষণার্থ অজস্র অর্থদান করিয়াছিলেন। একদিন রাও বান্দু স্বপ্নযোগে দেখিলেন, একটি শীর্ণ কৃষ্ণমহিষে আরোহণপূর্ব্বক কাল তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তেজস্বী হারনৃপতি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সেই স্বপ্নময় কালকে আক্রমণ করিলেন। অমনি সেই ছায়াময়ী-মূর্ত্তি চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য বান্দুহার! আমি কাল, তোমার অসি আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তথাপি এই মানবজগতে একমাত্র তুমিই আমাকে প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইয়াছ। এখন আমার কথায় কর্ণপাত কর; দুর্ভিক্ষে এ দেশ মরুভূমিসম হইয়া পড়িবে, তোমার শস্যাগার শস্যে পরিপূর্ণ কর, উদারভাবে দান করিতে প্রবৃত্ত হও, তৎসমুদায়

কখনই শূন্য হইবে না।" এই বলিয়াই কাল তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। রাও বুন্দি তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিলেন না। রাজবারার মধ্যে যেখানে যত শস্য পাইলেন, ক্রয় করিয়া তিনি গোলাবাড়ী পূর্ণ করিলেন।

একবর্ষ অতীত হইল; দ্বিতীয়বর্ষ প্রায় শেষ হয়, এমন সময়ে পর্জ্জন্যদেব রাজবারার প্রতি নিদয় হইলেন; বিন্দুমাত্র বর্ষণ নাই; রাজ্যে যে সকল জলাশয় ছিল, সমস্তই শুষ্ক; চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড পীড়নে সমগ্র ভারতবর্ষ নিপীড়িত হইল। ভারতীয় রাজন্যবর্গমাত্রেই বুন্দিনরপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; বুন্দির দরিদ্র প্রজাপুঞ্জ প্রত্যহ রাজার শস্যাগার হইতে আবশ্যকমত শস্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বান্দুর সেই উদারতা ও দানশীলতার কথা আজিও কেহ বিস্মৃত হইতে পারে নাই; আজিও তাহারা তাঁহাকে "লঙ্গর-কা-গুণরি" নামে অভিহিত করিয়া তদীয় কীর্ত্তিগুণ গান করে।

বুন্দিরাজ এত পুণ্যসঞ্চয় করিলেন, তথাপি বিধাতা তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রাসে জড়িত করিতে ত্রুটি করেন নাই। সমরসিংহ ও অমরসিংহ নামে তাঁহার দুইটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা রাজ্য-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ইসলামধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাটের সহায়তা লাভ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুন্দি হইতে বিতাড়িত করিলেন। নিঃসহায় বান্দু দারুণ মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হইয়া মাটুন্দা নামক গিরিপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সর্ব্বসমেত একবিংশতি বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র;—নারায়ণদাস ও নির্ম্মধ। মাটুন্দা নির্ম্মধের অধিকৃত ছিল।

মাটুন্দার নিভৃত পর্ব্বতবাসে নারায়ণদাস দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজ দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পিতা দুর্ব্বৃত্ত পিতৃব্যদ্বয় কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নারায়ণ তাহার প্রতিবিধান করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং পথয়ের হারগণকে একত্র করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, "বীরবৃন্দ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, হয় পিতৃরাজ্য বুন্দি উদ্ধার করিব, নতুবা এই কঠোর উদ্যমেই আত্মবিসর্জ্জন দিব, তোমরা আমার সহায় হইবে কি না?" তৎক্ষণাৎ সকলেই সোৎসাহে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত সমর ও অমর সমরকাণ্ডী ও অমরকাণ্ডী নাম ধারণ করি-লেন; ভ্রাতৃদ্বয় একত্র একাদশবৎসর রাজ্যশাসন করিলেন। সেই সময়ে একদা নারায়ণদাস পিতৃব্যদ্বয়কে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি একবার তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। পত্র পাইয়া তাঁহারা ভ্রাতুষ্পুত্রকে আসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন; তৎকালে তাঁহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহেরই উদয় হইল না।

এ দিকে নারায়ণদাসও প্রাসাদের সম্মুখস্থ চৌক নামক একটি স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কতিপয়মাত্র বিশ্বস্ত সৈনিক ছিল। তথায় সমস্ত সহচরকে রাখিয়া তিনি একাকী পিতৃব্যসদনে প্রবেশ করিলেন এবং সমর ও অমর যে স্থলে অরক্ষিত অবস্থায় বসিয়াছিল, একেবারে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বীরসুলভ আচরণদর্শনে রাষ্ট্রাপহারী ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে বিষম ভয়সঞ্চার হইল। সেই স্থানে ভূগর্ভে একটি গুপ্ত কক্ষ ছিল; ভ্রাতৃদ্বয় গুপ্ত সোপানাবলী-অবলম্বনে তন্মধ্যে অবতরণ করিবার উদ্‌যোগ করিল। এ দিকে দ্রুতগতি অনুগমনপূর্ব্বক বান্দুতনয় ভীষণবেগে সম-রের মস্তকে ভীষণ অসির আঘাত করিলেন। অমর পলায়ন করিল; কিন্তু নারায়ণ ভল্লাগ্রে বিদ্ধ করিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক সেই ছিন্নমুণ্ডদ্বয়

দ্বারা নারায়ণ ভবানী দেবীর প্রীতিবিধান করিলেন। এ দিকে তাঁহার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তদীয় বিশ্বস্ত সৈনিকগণ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যবনগণকে আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় সমস্ত যবনই নির্ম্মূল হইল। বিজয়ী নারায়ণদাস যবনসৈন্য এবং স্বধর্মত্যাগী পিতৃব্যদ্বয়ের মৃতদেহ দুর্গ-প্রাকার হইতে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন ; শৃগালকুক্কুরের পদতলে তাহা ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যেই নারায়ণদাস রাজবারা-প্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ রাজামধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। বুন্দির দুর্ভাগ্যবশে রাজা উৎকট অহিফেন সেবন করাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। একদা মান্দুনগরে পাঠানগণ কর্ত্তৃক রাণা রায়মল্ল আক্রান্ত হইলে নারায়ণদাস সাহায্যার্থ আমন্ত্রিত হন। তিনি পাঁচশত হারবীর সমভিব্যাহারে চিতোরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম দিবসের পথশ্রমের পর হাররাও নিয়মিত অহিফেন সেবনপূর্ব্বক ব্যাদিতবদনে একটি তরুমূলে শয়ন করিলেন। সৃক্কণী-নিঃসৃত ফেন ও লালা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মক্ষিকাকুল তাঁহার উন্মুক্ত বদন-বিবরে প্রবেশ করিতেছিল। সেই তরুসমীপে একটি কূপ ছিল। একটি তৈলকাররমণী সেই কূপে জলোত্তোলন করিতে আসিয়া নারায়ণদাসের তদবস্থা দর্শন করিয়া বলিল, "হায়, আমার রাজা যদ্যপি ইনি ভিন্ন আর কাহারও সাহায্য না পান, তাহা হইলে কি হইবে ?" অহিফেন-সেবকেরা চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাদের শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। নারায়ণদাস চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে পারিলেন না, কিন্তু তেলিনীর আক্ষেপোক্তি তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রে রাঁড়! তুই কি বলিলি ?" এই বলিয়াই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। ভয়ে তৈলকারযুবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল ; কিন্তু রাও তাহাকে মধুরবচনে কহিলেন, "ভয় নাই, তুমি এইমাত্র যাহা বলিলে, আর একবার তাহা উচ্চারণ কর।" সেই রমণীর হস্তে একগাছি লৌহদণ্ড ছিল। হাররাও সেই লৌহদণ্ডটি লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চক্রাকারে নমিত করিয়া তেলেনীর গলদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "যত দিন না আমি রাণাকে সাহায্য করিয়া ফিরিয়া আসি, তত দিন এই হার ধারণ কর। তবে যদি আমার আগমনের পূর্ব্বে কেহ ইহাকে সোজা করিয়া খুলিতে পারে, তাহা হইলে আর ইহা ধারণ করিতে হইবে না।"

অতঃপর হাররাও পথরের পর্ব্বতকূট দিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, চিতোর অবরুদ্ধ। অকস্মাৎ বিপুলবিক্রমে তিনি শত্রুকুলের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ অসির প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া অসংখ্য যবনসৈন্য জীবনবিসর্জ্জন করিল, অনেকে ছত্রভঙ্গে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বুন্দির রণভেরী প্রচণ্ডনির্ঘোষে বাদিত হইয়া রাজপুতকুলের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। তরুণ অরুণরাগে পূর্ব্বগগন অনুরঞ্জিত হইলে গিহ্লোটসেনারা দেখিল, বিপক্ষেরা চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে ; বুন্দিরাও নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাণা রায়মল্ল এই সংবাদ পাইয়া দুর্গ হইতে বহিরাগমনপূর্ব্বক ত্রাণকর্ত্তাকে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। চিতোরের সর্দ্দারগণও বুন্দিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; অধিক কি, অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারাও লজ্জাভয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আগমনীসঙ্গীত গান করিতে করিতে তাঁহার মস্তকে কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত রমণীর মধ্যে একটি যুবতী নারায়ণদাসের রূপগুণে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করিল। সেই কুমারী রাণা রায়মল্লের ভ্রাতুষ্কন্যা ; তাহার নাম কেতু। ভ্রাতুষ্কন্যার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাণার আনন্দের

পরিসীমা রহিল না। তিনি আশু নারায়ণের হস্তে কেতুকে সম্প্রদান করিয়া বুন্দিপতির উপকার-ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। মহাসমারোহে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। নবোঢ়া মহিষীকে লইয়া সানন্দে তিনি স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন। ক্রমে তাঁহার অহিফেন-সেবনাসক্তি এত বৃদ্ধি হইল যে, একদিন রাত্রে তিনি রাজপুত্রী কেতুর সর্ব্বাঙ্গ নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। ক্ষতগুলি এত গুরুতর যে, মিবারীর অনুপমসৌন্দর্য্যও তাহাতে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িল। প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক নারায়ণদাস গতরজনীর স্বীয় বানরব্যবহারের নিদর্শন দেখিয়া বিষম লজ্জায় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি কেতুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তাঁহার হস্তে অহিফেনপাত্র স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি ইহা গ্রহণ কর, অদ্য হইতে আমি অহিফেনসেবন পরিত্যাগ করিলাম।"

নারায়ণদাসের এক পুত্র; তাঁহার নাম সূর্য্যমল। দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ রাজ্যশাসনের পর ১৫৯০ সংবতে নারায়ণদাস পরলোকগমন করিলে সূর্য্যমল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি পিতার ন্যায় অমিতবলশালী ও অতুল সাহসী ছিলেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত। রাণা রত্নের সহিত সূর্য্যমলের ভগিনী সুজা বাইয়ের বিবাহ হয়, রত্নও নিজ ভগিনীকে হার রাওয়ের হস্তে সম্প্রদান করেন। পিতার ন্যায় রাও সুজাও (সূর্য্যমল) অত্যন্ত মাদকপ্রিয় ছিলেন। একদিন অহিফেন-সেবনান্তে চিতোরের রাণার সম্মুখে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া আছেন, ইত্যবসরে একটি পুরবীয়-সর্দ্দার একগাছি তৃণ লইয়া তাঁহার শ্রবণবিবরে দিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ সুজোর নিদ্রাভঙ্গ হইল, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি স্বীয় অসির বিপরীতভাগের প্রহারে সর্দ্দারের প্রাণবিনাশ করিলেন। পুরবীয় সর্দ্দারের পুত্র পিতৃঘাতীর শোণিতে পিতৃশোক প্রশমিত করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। বুন্দিরাজের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে, তাহার সে সাধ্য নাই; সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধির অন্য উপায় না দেখিয়া সে রাণার সহিত রাওয়ের বিবাদ বাধাইয়া দিতে সংকল্প করিল। দুষ্টলোকের দুরভিসন্ধির সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। তৎকালে সূর্য্যমল প্রায়ই রাণার অন্তঃপুরে আপন ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। পুরবীয় যুবক রাণাকে বলিল, "মহারাজ! আপনি দেখিতেছেন না, মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ ভিন্ন হাররাজের মনে অন্য গুপ্ত অভিসন্ধি আছে।" রাণার মনে সন্দেহ জন্মিল। ক্রমে সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে লাগিল। রাও সুজোর প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি রাণা দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন।

রাজপুত-মহিলারা পতিকুল অপেক্ষা পিতৃকুলের মানসম্ভ্রমের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখেন, এই কারণে রাজবারা-প্রদেশে প্রায়ই ভীষণ বিবাদ সংঘটিত হয়। সুজা বাইয়ের পতিকুলানুরাগ অপেক্ষা পিতৃকুলানুরাগ সম্ভবতঃ অধিকতর ছিল। একদিন সুজা বাঈ স্বহস্তে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পতি ও ভ্রাতা উভয়কেই ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনুসারে উভয়ে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক ভোজনাগারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টে আসনে উপবিষ্ট হইলে সুজা বাই স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইল; ভোজনপাত্র স্থানান্তরিত করিবার সময় অভাগিনী সুজা না বুঝিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "দাদা আমার বাঘের মত আহার করিয়াছেন, কিন্তু মহারাজের খাওয়া ঠিক যেন বাঁদিকের মত।" কুক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইল; এই কথা হইতেই হার ও গিহ্লোট-রাজদ্বয়কে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইল। তুচ্ছ কথার পরিণামে অভাগিনী পতিপরায়ণা সুজাকেও পতির অনুগামিনী হইতে হইয়াছিল।

রাজকুমারীর বাক্য যেন রাণার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইল। রত্ন তাহার প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু তখন তিনি কিছু বলিলেন না। অতঃপর আহেরিয়া উপলক্ষে একত্র

মৃগয়ার্থ হাররাজকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গিহ্লোটরাজ মৃগয়াব্যপদেশে সসৈন্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এ দিকে হাররাজও তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। চম্বলনদের পশ্চিমকূলের অতি নিকটবর্ত্তী নন্দতা নামক গিরিব্রজের অধিত্যকা-ভূমি মৃগয়ার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই গভীর পর্ব্বতগহন নানারূপ জন্তুর আবাসভূমি। রাজদ্বয়ের সেনাগণ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া ঘোর ঢক্কারব ও চীৎকার দ্বারা জীবজন্তুকে বন হইতে বনান্তরে বিতাড়িত করিতে লাগিল। এইরূপ মৃগয়ামোদে সকলে মত্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাণা রত্নের হৃদয় পাপ দুরভিসন্ধি বিস্মৃত হইতে পারে নাই, তিনি অভীষ্টসিদ্ধির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজপুতনৃপতিদ্বয় নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া মৃগয়ামোদ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, কেবল একটি দুইটি বিশ্বস্ত অনুচরমাত্র তাঁহাদের সঙ্গে আছে, অবশিষ্ট সকলে দূরে বনপরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মৃগগণকে তাঁহাদের দিকে তাড়িত করিতে লাগিল। কূটমন্ত্রী পুরবীয় যুবকও রাণার সঙ্গে ছিলেন। রাও সূর্য্যমলকে একাকী দর্শনে রাণা তাঁহাকে বলিলেন, "তরুণ পুরবীয়! বরাহসংহারের এই উপযুক্ত অবসর।" তৎক্ষণাৎ সেই পিতৃশোকোন্মত্ত যুবক স্বীয় শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক হার-রাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। নিজ ধনুকের সাহায্যে হাররাজও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ডন করিলেন। সূর্য্যমল মনে করিলেন, বুঝি হঠাৎ শরটি তাঁহার দিকে আসিয়াছিল। কিন্তু আবার রাণার ধাই-ভাই যখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিল, তখন তাঁহার সে সন্দেহ বিদূরিত হইল। অবিলম্বে তিনি ক্ষিপ্রহস্তে সেই দ্বিতীয় শরটি বিফল করিলেন। ইত্যবসরে রাণা অশ্বকে তদভিমুখে চালিত করিয়া খড়্গাঘাতে সূর্য্যমলকে পাতিত করিলেন। হাররাও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়াই প্রথমে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষণমধ্যেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রাবরণ-বস্ত্র দ্বারা সেই প্রহারজনিত ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। তিনি দেখিলেন, রাণা পলায়ন করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় একান্ত অধীর হইয়া পড়িল। মর্ম্মভেদী স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হা কাপুরুষ! এখন তুমি পলায়ন করিতে পার বটে, কিন্তু মিবারের গৌরব-গরিমা তোমা হইতে নষ্ট হইল।" এই কথা শ্রবণমাত্র পুরবীয় যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, হাররাও ক্ষতস্থান বন্ধন করিতেছেন। তখন সে রাণাকে বলিল, "মহারাজ! কাজটা সম্পূর্ণ করাই কর্ত্তব্য।" কাপুরুষ রত্ন তৎক্ষণাৎ স্বীয় অশ্বকে সূজোর দিকে চালিত করিলেন এবং ভল্ল উদ্যত করিয়া ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবেন, ইত্যবসরে মর্ম্মাহত হাররাও একেবারে চরমসাহসে নির্ভর করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রাণার গাত্রবস্ত্র ধারণ করিলেন এবং একটিমাত্র আক্রমণেই তাঁহাকে পাতিত করিয়া তদীয় বক্ষের উপর জানু স্থাপনপূর্ব্বক এক হস্তে তাঁহার গলদেশ ধারণ করিলেন, অপর হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। বিকট চীৎকার করিয়া রাণা রাও সূজোর পাদমূলে জীবনবিসর্জ্জন করিলেন। হাররাজের প্রতিশোধপিপাসা নিবারিত হইল; কিন্তু তিনিও প্রতিযোগীর মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

এই গভীর শোকবার্ত্তা সূর্য্যমলের মাতার কর্ণগোচর হইল। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শাবক-ভ্রষ্টা সিংহীর ন্যায় মর্ম্মাহত হইয়া রাজমাতা বলিয়া উঠিলেন, "কি, সূজো আমার নাই? সূজো কি একাকী প্রাণত্যাগ করিল? এ স্তন্য পান যে করিয়াছে, সে ত একাকী এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে না।" বলিতে বলিতে তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে ক্ষীরধারা এরূপ প্রবলবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল যে, তাহার নিপতনতেজে ভূতল বিদীর্ণ হইয়া গেল। ইত্যবসরেই একজন দূত আসিয়া নিবেদন করিল যে, রাও সূজোও প্রতিশোধ লইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। অতঃপর

পতিবিরহবিধুরা রাজকুমারীদ্বয় সেই কালস্বরূপ মৃগয়াক্ষেত্রে প্রজ্বলিত চিতায় স্ব স্ব প্রাণপতির মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের পবিত্র ভস্মরাশির উপর এক একটি চৈত্য বিনির্ম্মিত হইল। শিশোদীয়-রাজমহিষী সুজা বাইয়ের স্মারকস্তম্ভ সেই উপত্যকা-প্রদেশের শিরোভাগে স্থাপিত।

১৫৯১ সংবতে (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) রাও শূরতান বুন্দির সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। শক্তাবৎসম্প্রদায়ের আদিপুরুষ বীরবর শক্তসিংহের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সমরদেবতা কাল ভৈরব তাঁহার উপাস্য দেবতা। শূরতান সর্ব্বদাই ভৈরবদেবের বীভৎসপূজাপদ্ধতিতে ভক্তি-সহকারে যোগদান করিতেন। এই যুদ্ধদেবতার সম্মুখে প্রায়ই নরবলি প্রদত্ত হইত; রাও শূরতান নরবলি দিতেন না বটে, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক তদপেক্ষাও ঘোরতর পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইত। স্বীয় প্রজাপুঞ্জের নেত্র উৎপাটন করিয়া তিনি বিকট মহাকালের বেদিকার উপর স্থাপন করিতেন। এই প্রকার পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করাতে রাও শূরতান ক্রমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই নিষ্ঠুর আচরণ দর্শনে বুন্দির সর্দ্দারগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বিতাড়িত করিল। চম্বলতীরে একটি স্থানে শূরতান অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই স্থান শূরতানপুর নামে প্রথিত হইল।

শূরতান নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং নির্ব্বধের জ্যেষ্ঠপুত্র বুন্দি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। নির্ব্বধের আট পুত্র; তন্মধ্যে চারিজন হইতে চারিটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভীম টাকুরদা এবং পুরু হারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাপাল ও পুচৈন নামক অপর পুত্রদ্বয়ের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একধারে বীরত্ব, উদারতা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর গুণাবলীর একত্র সমাবেশ বিরল। যে বুন্দিকুল ইতিপূর্ব্বে গিহ্লোটের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, আজি সেই বুন্দি ও গিহ্লোট উভয়বংশীয় রাজারাই সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া বন্ধুভাবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। বুন্দির বর্ত্তমান রাজা রাও অর্জ্জুন দুর্দ্ধর্ষ বাহাদুরের ভীষণ আক্রমণ হইতে চিতোরনগরীকে উদ্ধার করিবার জন্য অম্লানমুখে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অর্জ্জুনের বীরত্ব সম্বন্ধে ভট্টকবিগণ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে, "বারুদ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে পর্ব্বতের একপ্রদেশ বিদারিত হইল, তখন অর্জ্জুন সেই পর্ব্বতের বিদারিত অংশে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় অসি উত্তত করিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

সুরজনের অভিষেক, আকবরের আক্রমণ, শাবন্ত-হারের আত্মত্যাগ, হারের যুদ্ধযাত্রা, রাও ভোজের সিংহাসনারোহণ, আকবরকর্ত্তৃক গুর্জ্জরজয়, বীররমণীদল, রাও ভোজের অপমান, আকবরের মৃত্যুর কারণ, রাও রতন, সম্রাট জাঁহাগীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হারাবতী-বিভাগ, মধুসিংহ কর্ত্তৃক কোটা-প্রাপ্তি, রাও রতনের মৃত্যু, গোপীনাথের হত্যা, রাও চত্বরশালের অভিষেক, কালবর্গ ও ডায়ুনী, অন্তর্ব্বিবাদ উজীর ও ঢোলপুরের যুদ্ধ, চত্বরশালের মৃত্যু, রাও ভাওয়ের অভিষেক, বুন্দি আক্রমণ, রাও অনুরাদের অভিষেক, তাঁহার মৃত্যু, রাও বুধ, জাজৌ যুদ্ধ, কোটারাজের মৃত্যু, বুন্দিরাজ্য হরণ, রাও বুধের মৃত্যু।

রাও অর্জ্জুন ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ১৫৮৯ সংবতে (১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে) তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাও সুরজন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এতদিন বুন্দির রাজগণ একপ্রকার বিশুদ্ধ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহাদের সেই স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। মোগল সূর্য্যের পার্শ্বে যেন তাঁহারা ক্ষুদ্র গ্রহরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শাবন্ত নামে একটি রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। বুন্দির নিম্নতম শাখাকুলে ইঁহার জন্ম। ইনি বুন্দিরাজ্যের বিশেষ হিতৈষী। ইঁহার চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতা সর্ব্বজনপ্রশংসিত। সেরশাহী অধঃপতনের পর তিনি রিন্থম্বরের আফগান শাসনকর্ত্তার সহিত একটি সন্ধিস্থাপন করিলেন। সেই সন্ধিবন্ধনের ফলস্বরূপ রিন্থম্বর-দুর্গ তাঁহার অধিকৃত হইল। কিন্তু শাবন্তসিংহ সেই দুর্গ স্বহস্তে রাখিলেন না। বুন্দিপতি সুরজনের হস্তে তিনি উহা প্রদান করিলেন। ইহা বুন্দির পক্ষে একটি সামান্য লাভ নহে। ইহাতে হাররাজ ধর-দুর্গ ও তৎসংবলিত ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ ভূসম্পত্তি সমগ্র বুন্দিরাজ্যের মধ্যে ছিল না। এরূপ মহান্ লাভ হওয়াতে রাও সুরজন আপন রাজধানীর সমীপেই শাবন্তসিংহকে কতকগুলি ভূমিখণ্ড প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে শাবন্ত সিংহের নাম ইতিবৃত্তে জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইল। তৎকর্ত্তৃক শাবন্ত হারনামক যে একটি গোত্র স্থাপিত হইল, অদ্যাপি তাহা শাবন্তনামের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

রিন্থম্বর নগরের সমৃদ্ধিশালিতা শ্রবণে উহা অধিকার করিবার জন্য আকবরের হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিছু দিন পরেই তিনি সদলে রিন্থম্বরে আপতিত হইলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইল; কিন্তু রিন্থম্বর জয় করিতে তিনি সমর্থ হইলেন না। বৈদলার চৌহানসর্দ্দার মধ্যস্থ হইয়া উক্ত দুর্গ সুরজনহারের করে প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ধিবন্ধনের সময় হাররাও এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, মিবারের অধীনে থাকিয়া জায়গীররূপে রিন্থম্বরভোগ করিতে হইবে। সুরজন তাঁহাতে অস্বীকার করেন নাই; অম্বরপতি ভগবান্দাস ও তৎপুত্র মানসিংহ মোগলের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সেই সময়ে মোগল-সম্রাট আকবরের সহিত রিন্থম্বর-দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এই যে, যেরূপে হউক, সুরজনকে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করাইবেন। কিন্তু বুন্দিরাজের সহিত সাক্ষাতের উপায় কি? রাজপুতগণের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে

স্বজাতীয় শত্রু যদি দুই একটি মাত্র সেনাসহ দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে রাজপুতবৃন্দ কোন আপত্তি করেন না। আকবর এই বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং চোপদারের বেশে মানসিংহের সহিত তিনি দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রাও সসম্মানে তাঁহাকে সভাতলে গ্রহণ করিলেন। উভয়পক্ষে নানারূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে বুন্দিরাজের একটি পিতৃব্য ছদ্মবেশী সম্রাটকে চিনিতে পারিলেন; অমনি তাঁহার হস্ত হইতে দণ্ডটি গ্রহণপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান সহকারে তাঁহাকে দুর্গাধ্যক্ষের আসনে বসাইলেন। আকবর প্রত্যুৎপন্নমতি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত'। দুর্গপতির আসন গ্রহণ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে রাও সুরজন, এখন কি করা উচিত?" রাও উত্তর দিতে না দিতেই মানসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "আর কি করিবেন?— রাণার সহিত সম্বন্ধত্যাগ করুন; রিন্থম্বর পরিত্যাগ করুন্ এবং উচ্চ সম্মান ও পদগৌরবের সহিত ভারতেশ্বরের অধীনতাপাশে বদ্ধ থাকুন।" বুন্দিরাজকে মোগলের অধীন করিবার জন্য সম্রাট্ যে সকল প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তাহা সংবরণ করা দুঃসাধ্য। দ্বিপঞ্চাশৎ জেলার উপর একাধিপত্য; রাও নিয়মিত সামন্তসেনা সংযোজন করিলে কোন মোগল কর্ম্মচারীই সেই সকল জনপদের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখিতে পারিবে না। এতদ্ভিন্ন রাও সুরজন অন্য কোন প্রস্তাবও উত্থাপন করিতে পারেন। বুন্দিরাজ এই প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া গলদেশে মোগলের অধীনতাপাশ ধারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আশু সেই সভাতলে একটি সন্ধিপত্র লিখিত হইল। অম্বর-রাজকুমার উভয়পক্ষের মধ্যস্থ হইয়া সন্ধিপত্রসংবলিত সূত্রগুলি সমালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই কয়েকটি সূত্র এই;—

(ক) মোগলের অন্তঃপুরে দোলা-প্রেরণরূপ যে অবমাননা, বুন্দিপতি সে অবমাননা হইতে মুক্ত হইবেন। *

(খ) জিজিয়া (মুণ্ডকর) রহিত হইবে।

(গ) বুন্দিরাজগণকে আটক পার হইতে হইবে না।

(ঘ) ন-রোজা উৎসবে মীনবাজারে দোকান খুলিবার জন্য বুন্দির অধিপতিগণ রাণী বা রাজকুমারীকে প্রেরণ করিবেন না।

(ঙ) তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দেওয়ান আমে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(চ) তাঁহাদের পবিত্র দেবালয়াদির কোনরূপ অবমাননা হইবে না।

(ছ) তাঁহাদের কোন হিন্দু-সেনাপতির অধীনে থাকিতে হইবে না।

(জ) তাঁহাদের অশ্বসমূহের গাত্রে (প্রথামত) মোগলের অধীনতাসূচক কোন চিহ্ন অঙ্কিত হইবে না।

(ঝ) তাঁহারা রাজধানীর রথ্যাসমূহে "লাল দরজা" পর্য্যন্ত নাগরা বাদ্য করিতে পারিবেন এবং সম্রাট্-সদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে মস্তক অবনত করিতে হইবে না।

(ঞ)। দিল্লী যেরূপ সম্রাটের, বুন্দিও সেইরূপ হারকুলের হইবে। তাঁহাদিগকে কখনও রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না।

সম্রাট্ আকবর সমস্ত প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। কেবল ইহাই নহে; বুন্দিরাজ আরও একটি স্বত্বে স্বত্ববান্ হইলেন; পবিত্র বারাণসীধামে তিনি স্থানপ্রাপ্ত হইবেন। এই সমস্ত উচ্চ

* মুসলমানরাজের হস্তে যে রাজপুত্রী অর্পিত হয়, তাহাকে দোলা বলে

প্রলোভনে বিমুগ্ধ হন্ না, এরূপ উচ্চহৃদয় মহাপুরুষ তখন রাজপুতকুলে কে ছিল? একমাত্র মহারাণা বীরকেশরী প্রতাপসিংহ ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি আক্‌বরের প্রলোভনে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন? বুন্দিরাজ লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি অম্লানবদনে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। রিস্থম্বর-দুর্গ লইয়া মিবারপতি রাণার সহিত তাঁহার যে বাধ্যবাধকতা ছিল, সে বাধ্যবাধকতা রাও স্বহস্তে ছেদন করিয়া আক্‌বরের দাসত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন।

যবনের প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া রাও সুরজন হারবংশে কলঙ্কবীজ রোপণ করিলেন, কিন্তু সেই কলঙ্কমোচনের জন্য একজন হারবীর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই মহাতেজস্বী বীরকেশরী শাবন্তসিংহ নামে পরিচিত। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শাবন্তসিংহ কোতারিওর-চৌহানসর্দ্দারের সহিত একমত হইয়া রাণার রিস্থম্বর অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখন সেই রিস্থম্বর যে যবনের পদে উৎসর্গীকৃত হইবে, তাহা তাঁহার প্রাণে অসহ্য। তাঁহার অধিপতি অম্লানমুখে আক্‌বরের করে দুর্গ প্রদান করিলাম, একবার আপনার বংশগৌরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, একবার মিবারেশ্বরের মুখের দিকেও চাহিলেন না। রাও সুরজনের এই ব্যবহারে শাবন্তসিংহ একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণ থাকিতে আক্‌বরকে রিস্থম্বর দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

অচিরে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। শাবন্তসিংহ তাহাতে লিখিয়া দিলেন যে, "পবিত্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কোন হার রিস্থম্বর-দুর্গে আরোহণ করিবে কিংবা আরোহণ করিয়া যে কেহ জীবদ্দশাতে তাহা পরিত্যাগ করিবে, তাহার বংশ অভিশপ্ত হইবে। তখনই রণভেরী গম্ভীর নির্ঘোষে বাদিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই কতিপয় হারবীর স্বাধীনতাপ্রিয় মহাতেজা শাবন্তসিংহের সহিত উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যবনের সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন এবং পিতৃপুরুষগণের গৌরব ও রাণার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

বীরকেশরী শাবন্তসিংহের শোণিতে পদতল বিধৌত করিয়া মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর রিস্থম্বর অধিকার করিলেন। সেই দিন হাররাও মিবারেশ্বরের রাণার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া যবন রাজের নিকট রাও রাজা উপাধি লাভ করেন।

কিছুদিন অতীত হইল। সম্রাট্ রাও সুরজনকে সভায় আহ্বান করিলেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। যবনরাজ তাঁহাকে গণ্ডদিগের প্রদেশ গণ্ডবান জনপদ জয় করিতে অনুমতি করিলেন। আশু হাররাজের হস্তে তাহাদের রাজধানী অধীকৃত হইল। এই জয় বিবরণ চিরস্মরণীয় দেখিবার ইচ্ছায় রাও রাণা তথায় "সুরজন পেলী" নামে একটি তোরণ স্থাপন করিলেন। গণ্ড-সেনাপতিগণ বন্দী হইয়া রাজধানীতে আনীত হইলেন। সেনাগণের বন্ধন মোচনপূর্ব্বক তাহাদিগের অধিকারের কিছু কিছু অংশ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সম্রাটের নিকটে রাও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বুন্দিরাজের অনুরোধ রক্ষিত হইল। অধিকন্তু সম্রাটের অনুগ্রহে সুরজন বারাণসী ও চুণার প্রভৃতি সাতটি নূতন জনপদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। যে সময় শিলোটকুলকেশরী স্বদেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুজাতির পরিত্রাণের জন্য পবিত্র হল্‌দিঘাটক্ষেত্রে সেলিমের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ১৬৩২ সংবতে (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে) রাও সুরজন সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন।

রাজশরীরে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সুরজন তৎসমস্ত গুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও পাণ্ডিত্যও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষসাধন করিয়া হিন্দুজাতির

বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার সুদক্ষ শাসনগুণে তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। চতুরশীতি প্রাসাদ ও মন্দির এবং বিংশতি স্নানাগার তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। নগরীর যে অংশে তাঁহার বাস, সে অংশের শোভার পরিসীমা ছিল না। সেই পবিত্র কাশীধামেই সুরধুনীর পবিত্র তটে রাজা রাও সুরজন সিংহ প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার তিন পুত্র;—রাও ভোজ, দুদা ও রায়মল্ল। আকবর দুদাকে লস্কর খাঁ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রায়মল্ল পোলৈটা ও তদন্তর্ভূত সমস্ত ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

অতঃপর রাও ভোজ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই সময়ে আকবর স্বনামপ্রসিদ্ধ আকবরাবাদ নগরে মোগলরাজধানী স্থাপন করেন। অনতিকালমধ্যেই মোগলসম্রাট্ একটি বিশাল সেনা গুর্জ্জরজয়ার্থ প্রেরণ করেন। রাও ভোজ আপন ভ্রাতা দুদার সহিত সেই সেনাদলের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া সুরাটনগরে অগ্রসর হইলেন। তথায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। হাররাওয়ের হস্তে শত্রুকুলের সেনাপতি নিহত হইলেন। ইহাতে আকবর তৎপ্রতি একান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে পারিতোষিক প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন রাও ভোজ বিনয়নম্রভাবে কহিলেন, "সম্রাট্! আমি আর কিছু প্রার্থনা করি না, আপনি কেবল আমাকে এই স্বত্ব প্রদান করুন, যাহাতে আমি প্রতিবর্ষে বর্ষাঋতুতে আমার রাজ্য একবার পরিদর্শন করিতে পাই।" সম্রাট্ সানন্দে হাররাজের সেই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

সমগ্র ভারতভূমে একাধিপত্য স্থাপন করাই আকবরের উদ্দেশ্য। এই জন্যই যুদ্ধে পরিলিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল যুদ্ধে প্রায় সমস্ত রাজপুত-সন্তান যোগদান করিতেন। সেই সকল সংগ্রামে বুন্দির হারগণ যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ উচ্চসম্মানেও তাঁহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আহম্মদনগরে প্রসিদ্ধ বীররমণী চাঁদসুলতানীর সহিত তুমুল সংগ্রাম ঘটে, স্বরাজ্যের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য বীরাঙ্গনা সুলতানা আপন বীর্য্যবতী সঙ্গিনীর সহিত সেই সংগ্রামে যে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক বলগর্ব্বিত মোগলবীর ও রাজপুত্রের মস্তক অবনত হইয়াছিল; কিন্তু বুন্দিরাজ ভোজ রাও সেই বীরাঙ্গনাকে সদলে নিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই মোগলের অবনতমস্তক উন্নমিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ দর্শনে প্রসন্ন হইয়া সম্রাট্ ভোজ রাওকে স্বীয় মাতঙ্গ অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার স্মরণার্থ একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ স্থাপন করিলেন। সেই প্রাসাদ ভোজবুরুজ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এইরূপে রাও ভোজ মোগলসাম্রাজ্যের মঙ্গলার্থ—আকবরের উন্নতিলাভার্থ হারকুলের বিপুল শোণিত ব্যয় করিলেন বটে, কঠোর অনুষ্ঠানের জন্য সম্রাটের নিকট উপযুক্ত উপযুক্ত পুরস্কারও প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে সেই সম্রাটের বিষনয়নে পতিত হইতে হইল। আকবরের প্রিয়তমা মহিষী যোধাবাই লীলাসংবরণ করিলে সম্রাট্ আজ্ঞা করিলেন যে, কি হিন্দু, কি যবন, সমস্ত সৈন্যসামন্তগণকেই শোক-চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে এবং সকলকেই গুম্ফ শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। এই ঘোষণা প্রচার মাত্র রাজকীয় নাপিতগণ ক্ষুর লইয়া যবন ও রাজপুত সেনাগণের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ কেহই তাহাদের তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার হইতে শ্মশ্রু রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইল না; কিন্তু সেই নাপিতগণ হাররাজের আবাসে উপস্থিত হইলে হারসৈন্যগণ তাহাদিগকে চপেটাঘাত ও নানারূপ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। সম্রাট্ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। বুন্দিরাজের শত্রুপক্ষীয়েরা উক্ত ঘটনাকে নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া সম্রাটের নিকট

কহিল, "মহারাজ! ইহাতে আপনার, বিশেষতঃ স্বর্গীয়া মহিষীর অবমাননা করা হইয়াছে।" আক্‌বরের হৃদয় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, রাজ ভোজকৃত তত উপকার, তত আত্মত্যাগ, সকলই তিনি বিস্মৃত হইলেন। তখনই তিনি অনুমতি করিলেন,"রাও ভোজের কর চরণ বন্ধনপূর্ব্বক কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দাও।" রোষোন্মত্ত সম্রাটের কঠোর আজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র হারগণ অসি নিষ্কোষিত করিয়া মোগলসেনাকে আক্রমণ করিল। অবিলম্বে শিবিরমধ্যে বিষম হুলস্থূল উপস্থিত হইল, যবনগণ আহত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিবার উপক্রম করিল। সেই সময়ে আক্‌বর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হাররাজকে শান্ত করিতে প্রয়াস না পাইলে নর-শোণিতে সেই শিবির প্লাবিত হইয়া যাইত। আক্‌বর আপন অবিবেকতা বুঝিতে পারিয়া অবশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। রাও ভোজের নিকট উপস্থিত হইয়া মাতঙ্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তিনি তদীয় বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইলেন। উদ্ধত ও অবমানিত রাও ভোজ অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহেন। পিতৃলব্ধ স্বত্ব সমূহের উল্লেখ করিয়া তিনি কহিলেন, "তোমার তুল্য শূকরভোজী এ সম্মান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে।" এই কঠোর বাক্য অন্যের মুখে উচ্চারিত হইলে মোগল-সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতেন, কিন্তু তিনি নীতিবিশারদ; রাও ভোজের কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে তাঁহার নিজ শিবিরে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সম্রাটের মৃত্যুর পর রাও ভোজ স্বরাজ্যে প্রস্থিত হন এবং বুন্দিস্থ আপন প্রাসাদেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার তিন পুত্র;—রাও রতন, হরদা নারায়ণ ও কেশুদাস।

আক্‌বর লীলাসংবরণ করিলে সেলিম জাহাগীর নাম ধারণপূর্ব্বক ভারত-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি স্বীয় পুত্র পারাবেজের হস্তে দক্ষিণাবর্ত্তের শাসনভার সমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে বুরহানপুর নগরে অভিষিক্ত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হন। কিন্তু রাজপুত্র খুরম একটি ষড়যন্ত্র রচনা করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন এবং জাহাগীরকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। মোগলসাম্রাজ্যে ভীষণ অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভূত হইল। খুরম রাজপুত-রাজগণের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন; দ্বাবিংশতিজন রাজা তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক জাঁহাগীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন।

বিদ্রোহাগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে জাঁহাগীর বুন্দিরাজ রাও রতনকে তন্নিবারণার্থ সেনানীপদে বরণ করিলেন। হাররাজ স্বীয় পুত্র মধুসিংহ ও হরিসিংহের সহিত বুরহানপুরে গমন-পূর্ব্বক বিদ্রোহীদলের সম্মুখীন হইলেন। বুন্দির ভট্টকবিরা এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন;—

"সরওয়ার ফুটা, জল বহা,
আব কেয়া কর যতন?
যাতা গড় জাহাঙ্গীর কা,
রাখা রাও রতন।"

অর্থাৎ সরোবরের সেতু ভগ্ন হইয়া জল বাহির হয়, এখন আর উপায় কি? জাঁহাগীরের ঘর ভাসমান হইয়া যায়; রাও রতন তাহা রক্ষা করিলেন।

বুরহানপুরে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সেই যুদ্ধে বিদ্রোহিগণ সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। ১৬৩৫ সংবতে (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) কার্ত্তিকমাসে পূর্ণিমা-তিথিতে মঙ্গলবারে এই যুদ্ধ ঘটে।

এই যুদ্ধে রাও রতনের দুইটি পুত্রই ঘোরতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য রতন বুরহানপুর লাভ করেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মধুরসিংহ কোটা নগর ও তদন্তর্ভূত সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে হারাবতী রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

রাও রতন যখন বুরহানপুর শাসন করেন, সেই সময় রতনপুর নামে একটি নগর তৎকর্ত্তৃক-সংস্থাপিত হয়। এই সময় আর একটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি মোগলসম্রাট্ ও মিবারের রাণা উভয়কেই পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। মোগলের অধীনস্থ দেরায়ু খাঁ নামে এক দুর্ব্বৃত্ত উজীর মিবারে দস্যুভাবে দিনপাত করিতেছিল। দেরায়ু খাঁর অত্যাচারে মিবারের প্রজাপুঞ্জ নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। হাররাজ তাহাকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া বন্দিভাবে সম্রাট্-সমক্ষে আনয়ন করিলেন। সম্রাট্ প্রসন্ন হইয়া পুরস্কারস্বরূপ বুন্দিরাজ রাও রতনকে একদল অবৈতনিক নহবত প্রদান করিলেন। যে প্রকাণ্ড পীতপতাকা আজিও হাররাজের পার্শ্বে সমুত্থাপিত হয় এবং যে লোহিতবৈজয়ন্তী তাঁহার শিবিরের সমুচ্চচূড়ায় সমুড্ডীন হয়, তাঁহাও ঐ দিন তিনি পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাও রতন একজন উপযুক্ত রাজা। তাঁহার রাজপুত ভ্রাতৃগণ, এমন কি, সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিপ্রদর্শন করিত। কারণ, হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতনসময়ে তিনিই সেই পবিত্রধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে কোন যবনই তদীয় রাজ্যমধ্যে গোহত্যা করিতে সক্ষম হইত না। স্বীয় বাহুবলে এইরূপ হিন্দুজাতির হিতানুষ্ঠান করিয়া বুন্দিরাজ রাও বুরহানপুরের সমীপে একটি সামান্য যুদ্ধে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করেন।

রতনের চারিপুত্র;—গোপীনাথ, মধুসিংহ, হরিজী ও জগন্নাথ। জ্যেষ্ঠ গোপীনাথ পিতার জীবদ্দশাতেই লীলাসংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। বলদীয়গোত্রীয় এক বিপ্র-পত্নীর সহিত তাঁহার গুপ্তপ্রণয় ছিল। প্রত্যহ রাত্রি দুই প্রহরের পর তিনি সেই ব্রাহ্মণের বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজ প্রণয়িনী-সমীপে গমন করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার করচরণ বন্ধনপূর্ব্বক বুন্দিরাজ রাও রতনের সমীপে লইয়া গিয়া কহিল, 'মহারাজ! এক চোর আমার মর্য্যাদা হরণ করিতেছিল, আমি তাহাকে ধরিয়াছি; আপনি উচিত দণ্ডপ্রদান করুন।" রাও গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "মৃত্যুদণ্ড।" অভিতপ্ত বিপ্র আর অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং একটি লৌহমুদ্গর লইয়া রাজপুত্রের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। শবদেহ রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইল। রথ্যার উপরিভাগে হাররাজকুমারের মৃতদেহ দেখিয়া নাগরিকবৃন্দ নিতান্ত শোকাভিভূত হইল এবং রাও-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "কে রাজপুত্রকে বধ করিয়াছে।" এই হৃদয়বিদারক বাক্য শুনিবামাত্র বুন্দিরাজ দুঃসহ শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সেই বীভৎস কাণ্ডের আশু তদন্ত করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, স্বহস্তে তিনি আপনার পদে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। আশু সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। তখন রাও রতন হৃদয়ের শোকভার নিজহৃদয়েই বিলীন করিলেন।

রতনের দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহ কোটা এবং তৃতীয় পুত্র হরিজী গুগোর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র জগন্নাথ নির্ব্বংশ। গোপীনাথের দ্বাদশ পুত্র। তাঁহারা প্রত্যেকেই রাও রতনের নিকট হইতে এক একটি ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাও চত্ত্বরশাল বুন্দিরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় পুত্র ইন্দ্রসিংহ ইন্দ্রগড় স্থাপন করেন। তৃতীয় পুত্র বেরিশাল বুন্দবন ও ফিলোদী প্রতিষ্ঠা করেন এবং করবার ও পিপালদো প্রাপ্ত হন। চতুর্থ পুত্র মাকমসিংহ অন্তর্দে প্রাপ্ত হন

এবং পঞ্চম পুত্র মানসিংহ থানো লাভ করেন। ইন্দ্রসিংহ ইন্দ্রসালোট, বেরিশাল বেরিশালোট এবং মাক্কমসিংহ মাক্কমসিংহোট নামে এক একটি গোত্র-স্থাপন করিয়াছিলেন। থানো পূর্ব্বে জুজাবার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত আর সপ্তম পুত্রের সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না।

সম্রাট্ শাজিহান রাও চত্তরশালকে বুন্দিসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত সম্রাট্ তাঁহাকে রাজধানীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এই সম্মানসূচক পদ শাজিহানের শাসনকাল পর্য্যন্ত বুন্দিরাজ ভোগ করিয়াছিলেন। যে দিন মোগল-সম্রাট্ দারা, আরঙ্গজেব, সুজা ও মোরাদের করে সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দেন, সেই দিন আরঙ্গজেবের অধীনে রাও দাক্ষিণাত্যে একটি উচ্চ সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দক্ষিণাবর্ত্তে সেই সময় কয়েকটি যুদ্ধ ঘটে, তৎসমস্তগুলিতেই —বিশেষতঃ দৌলতাবাদ ও বিদির নামক নগরদ্বয়ের অবরোধসময়ে বুন্দিপতি বিশেষ বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সম্রাটের সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত নগর চত্তরশাল কর্ত্তৃক বিজিত হয়। এতদ্ভিন্ন ১৭০৯ সংবতে (১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে) কালবার্গ ও তাহার কিছুদিন পরে দামুনী এই নগরদ্বয়ও হাররাজের বাহুবলে বিজিত হইয়াছিল।

এ দিকে সহসা দক্ষিণাবর্ত্তে জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে, সম্রাট্ শাজিহান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিন হইতে ক্রমাগত দশদিন ধরিয়া রাজপুত্র আরঙ্গজেব রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেন না, এমন কি, তিনি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। জনশ্রুতিতে অনেকেরই বিশ্বাস জন্মিল। সম্রাটের পুত্রগণের মধ্যে সে সময়ে কেবল দারা শিকো রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর অন্যান্য সকলে ভারতের সিংহাসনে স্ব স্ব স্বত্ব দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ দিকে সুজাও বঙ্গদেশ হইতে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ওদিকে আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া মোরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "ভাই! সৈন্যসামন্ত লইয়া আশু আমার সহিত যোগদান করিবে, আমি দরবেশ—পার্থিববিষয়ে আমার স্পৃহা নাই। আমার ইচ্ছা, দরবেশ-বেশে নিভৃতবাসেই জীবন যাপন করি দারা কাফের হইয়া পড়িয়াছে এবং সুজা নাস্তিক হইতে উদ্যত হইয়াছে, এখন সম্রাট্ শাজিহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনলাভের যোগ্যপাত্র তুমি ব্যতীত আর কেহই নাই। আজি মোগলের সিংহাসন শূন্য, তুমি সৈন্যসামন্ত সহ অচিরে আমার নিকট উপস্থিত হইবে; তোমাকে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি সুখী হইব।"

আরঙ্গজেবের দুরভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া সম্রাট্ গোপনে হাররাজকে পত্র দ্বারা জানাইয়া পাঠাইলেন, "তুমি আশু আমার নিকট উপস্থিত হইবে।" গুপ্তপত্র প্রাপ্তমাত্র হাররাজ প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, আমি সম্রাটের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি, সুতরাং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অনুচিত। মনে মনে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়া চত্তরশাল পরিশেষে দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আরঙ্গজেবের কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিল। তিনি হাররাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সম্রাটের নিকট যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন কেন? কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি।" বুন্দিরাজ কহিলেন, "সম্রাটের আজ্ঞাপালনই আমার প্রধান কর্ত্তব্য, এই ফর্ম্মাণ দেখুন।" তিনি আরঙ্গজেবকে সম্রাট্প্রেরিত অনুজ্ঞাপত্র দেখাইলেন। কুবচরিত্র আরঙ্গজেব মনে মনে রুষ্ট হইলেন এবং "আপনি কদাচ যাইতে পারিবেন না" বলিয়া হাররাজের শিবির অবরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। সুচতুর চত্তরশাল পূর্ব্ব হইতেই আরঙ্গজেবের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আপনার দ্রব্যজাত রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি আপনার ও অন্যান্য রাজপুতগণের সৈন্যসামন্তকে একত্র করিয়া আরঙ্গজেবের

চক্কের উপর শিবির পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিতে কেহই সমর্থ হইল না। দেখিতে দেখিতে তিনি সদলে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। অবিরত বারিবর্ষণে নর্ম্মদার দুই কূল পরিপূর্ণ। সেই তটভূমে কতকগুলি শোলান্‌কিসর্দ্দার অবস্থিত ছিল। বুন্দিরাজ তাহাদের সাহায্যে নদীপার হইয়া সৈন্যসামন্তগণ সহ স্বরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর আপন রাজ্যের সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া চত্বরশাল বুন্দি হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাট্‌সদনে আগমন করিলেন।

রাজা চত্বরশাল ধর্ম্মিষ্ঠ ও রাজভক্ত। অন্যান্য রাজপুতগণের ন্যায় তিনিও হিন্দুপ্রিয় বৃদ্ধ সম্রাটের স্বার্থরক্ষার্থ হৃদয়শোণিত দান করিয়াছিলেন। ফতিয়াবাদরণক্ষেত্রে আরঙ্গজেব বিজয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেই সেই পাষণ্ড মোগল তখন আপন ভ্রাতৃগণের শোণিতে হস্ত বিধৌত করিতে সঙ্কল্প করিল। সে দেখিল যে, তাঁহাদিগকে নিপাত করিতে না পারিলে কদাচ বৃদ্ধ পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড আচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তাহার দুরভিসন্ধি বিফল করিবার জন্য দারা স্বীয় সৈন্যসামন্ত সহ ধোলপুরে সজ্জিত হইয়া রহিলেন। রাজবারার অন্য ক্ষত্রিয়রাজগণের ন্যায় রাও চত্বরশালও তাঁহার পক্ষে যোগদান করিলেন। কিন্তু কুক্ষণে দারা ধোলপুরের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই তিনি যে বিপদ্‌জালে জড়িত হইলেন, জীবনে আর সে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি সেই কালসময়ে সসজ্জ ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, বুন্দিপতি সদলে পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্বীয়পক্ষীয় বিশালসেনার পুরোভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। চিরন্তন প্রথা অনুসারে দারা সকলের সম্মুখে এক বিশালকায় রণমাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক ঘোরপ্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তুমুলসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধ ক্রমে ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়া উঠিল; ক্রমে দুই পক্ষের রণভেরীর গভীর হৃদয়োত্তেজক নির্ঘোষে, বীরবৃন্দের শ্রুতিবিদারক হুহুঙ্কারে এবং কামান ও বন্দুক-সমূহের ভয়ানক শব্দে রণভূমি ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, দারা অদৃশ্য হইলেন। তখন তৎপক্ষীয় প্রায় সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। কিন্তু হাররাজ এক পদও বিচলিত হইলেন না, স্বীয় সামন্তগণকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের সম্মুখে ফিরিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "এখন যে ব্যক্তি প্রস্থান করিবে, তাহার সর্ব্বনাশ হউক। এই দেখ, প্রভুর লবণ সার্থক করিবার উদ্দেশে আমার পদদ্বয় এই রণক্ষেত্রে দৃঢ়স্থাপিত হইল, জয় ব্যতীত আর কিছুতেই ইহা এ জীবনে অপসারিত হইবে না।" অতঃপর বুন্দিপতি একটি বিশালকায় রণ-মাতঙ্গোপরি আরূঢ় হইলেন এবং প্রচণ্ড বিক্রম ও জ্বালাময়ী উত্তেজনায় আপন দলবলকে সমুত্তেজিত করিয়া বিপক্ষের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ একটি জলন্ত গোলক আসিয়া তাঁহার হস্তিপৃষ্ঠে পতিত হইল। বিকট চীৎকার করিয়া আহত রণমাতঙ্গ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধভূমি হইতে পলায়ন করিল। তাহাকে পলায়মান দর্শনে বুন্দিপতি তৎপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় তুরঙ্গ আনয়নে আজ্ঞা করিয়া প্রচণ্ডস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার রণমাতঙ্গ শত্রুকুলকে পৃষ্ঠ দেখাইতে পারে, কিন্তু আমি ত এ জীবনে তাহা পারিব না।" তখনই তদীয় অশ্ব আনীত হইল। রাও চত্বরশাল তৎক্ষণাৎ তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক আপন সৈন্যসামন্তকে লইয়া একটি ব্যূহ রচনা করিলেন এবং ভীষণ শূল উদ্যত করিয়া রাজপুত্র মোরাদের উপর আপতিত হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যেমন শূলনিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার ললাটদেশে একটি গুলী নিক্ষিপ্ত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। তখনই তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ভরতসিংহ তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া সৈন্যমণ্ডলীকে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন এবং প্রভুধর্ম্মের

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক অনন্তধামে পিতার অনুগামী হইলেন। এ দিকে বুন্দিপতির ভ্রাতা মাক্কমসিংহ স্বীয় দুইটি পুত্র এবং উদি নামক একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সম্রাট্ শাজিহানের স্বার্থরক্ষার্থ যুদ্ধভূমে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এই প্রকারে উজ্জীন ও ধোলপুরের দুইটি ভীষণ রণক্ষেত্রে অন্যূন দ্বাদশজন হাররাজপুত্র মহাবীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক অম্লানমুখে স্ব স্ব প্রাণদান করিয়া প্রভুপরায়ণতার পরিচয় প্রদর্শন করিলেন।

রাও চত্ত্বরশাল দ্বিপঞ্চাশদ্‌বার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই শেষবার ১৭১৫ সংবতে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার সাহস ও প্রভুভক্তি সর্ব্বজনপ্রশংসিত। তিনি বুঁন্দির প্রাসাদের এক অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই বর্দ্ধিত অংশ চত্ত্বরমহল নামে প্রথিত। এতদ্ভিন্ন পত্তননগরের কিশোরী-মন্দিরও তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। চত্ত্বরশালের চারি পুত্র;—রাও ভাওসিংহ, ভীমসিংহ, ভগবন্তসিংহ ও ভরতসিংহ। তন্মধ্যে ভীমসিংহ গুগোর ও ভগবন্ত মৌরাজ্য প্রাপ্ত হন। ধোলপুরযুদ্ধে ভরতের মৃত্যু হয়।

আরঙ্গজেব পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। চত্ত্বরশালের পুত্র রাও ভাওকে শাস্তিদানই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। চত্ত্বরশাল যে বৃদ্ধ শাজিহানকে রক্ষা করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত পিতৃদ্রোহীর প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, পুত্র রাও ভাওকে শাস্তি দিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। আজি আরঙ্গজেব ভারতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর, আজ তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণে কে সাহস করিবে? দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গ শিবপুরের গবনৃপতি রাজা আত্মারামকে অনুমতি করিলেন, "সেই দুর্দ্দান্ত ও রাজদ্রোহী হারকুলকে দমন করিয়া বুন্দি রিহ্বরের সহিত একত্র কর; আমি ইতিমধ্যে আশু দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করিতেছি, গমনকালে যেন তোমাকে বিজয়ী দর্শন করি।" সম্রাটের এই আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র রাজা আত্মারাম দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ হারাবতী নগরীতে আপতিত হইলেন এবং তরবারি ও অগ্নির সাহায্যে দেশকে ছারখার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তৎকর্ত্তৃক বুন্দির প্রধান সামন্ত-ভূমি ইন্দ্রগড়ের অন্তর্গত খাট্টোলি নগর আক্রান্ত হইলে হার সর্দ্দারেরা গোপনে সমবেত হইয়া গোতুদা নগরে আত্মারামকে আক্রমণ করিল। শিবপুররাজ তাহাতে পরাভূত হইয়া রাজকীয় নিদর্শন ও দ্রব্যজাত পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। হার-সর্দ্দারেরা ইহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া মহা বিক্রমে আত্মারামের শিবপুর অবরোধ করিল যুদ্ধে আত্মারামের পরাজয় হইল। হারকুলের প্রতি অত্যাচারের বিষয় ভাবিয়া আত্মারাম মনে মনে অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার দুঃখে কেহই সমবেদনা প্রকাশ করিল না, বরং তাঁহার পরাজয়ে সকলেরই হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

দুরাচার আরঙ্গজেবের হৃদয়ে প্রতিশোধ পিপাসা দিন দিন বলবতী হইয়া উঠিল। হারকুল নির্ম্মূল হইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। যাহা হউক, দুর্ম্মতি মোগলসম্রাট্ মুখের মধুরহাস্যে অন্তরের ক্রূরভাব গোপন করিয়া রাও ভাওয়ের নিকট ফর্ম্মাণ প্রেরণপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন, "হার! তোমার বীরত্ব ও সাহস দর্শনে আমি পরম প্রীত হইয়াছি, তোমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিলাম। তুমি আশু রাজধানীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" প্রথমতঃ বুন্দিরাজ অসম্মত হইলেন, কিন্তু সম্রাট্ পুনঃ পুনঃ অভয়দান করাতে পরিশেষে তৎসহ সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাজপুত্র মোজামের অধীনে আরঙ্গাবাদের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন ও তেজস্বী স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। মোগলের অধীনে অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইলেও তিনি বিবেক ত্যাগ করিতে পারেন নাই; বিপন্নের উদ্ধারার্থ তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে

সমুন্নত হইতেন। বিকানীররাজ কর্ণের প্রতিকূলে একবার একটি কুটিল ষড়্‌যন্ত্র রচিত হইয়াছিল, যদি রাও ভাও সেই ষড়্‌যন্ত্র ছিন্নভিন্ন না করিতেন, তাহা হইলে কর্ণের জীবন বিপন্ন হইত সন্দেহ নাই। ধাতনগরের সাহসিক বুন্দেলগণকে লইয়া রাও ভাও অনেকস্থলে অনেকগুলি সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আরঙ্গাবাদ নগরে তৎকর্ত্তৃক অনেকগুলি প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৭৩৮ সংবতে (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) রাও ভাও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যে কেবল বীরত্ব, সাহস, তেজ ও বিক্রমাদিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এমন নহে, অতি দুরারোগ্য পীড়া আরোগ্য করিতেও তাঁহার অচিন্তনীয় ক্ষমতা ছিল।

রাও ভাও নিঃসন্তান; সুতরাং তদীয় ভ্রাতা ভীমসিংহের পৌত্র অনুরাদসিংহ বুন্দি-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ভীমসিংহের পুত্র কিষণসিংহ আরঙ্গজেবের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং অনুরাদসিংহের অভিষেকের আদেশ প্রদান করিয়া আভিষেচনিক পুরস্কারের সহিত আপন মাতঙ্গ গজগৌরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেবের অধিকারকালে দাক্ষিণাত্যে যতগুলি সংগ্রাম ঘটে, তৎসমস্তেই অনুরাদ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। সেই সমস্ত সংগ্রামে একদা সম্রাটের অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা শত্রুকরে পতিত হন। বুন্দিপতি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বীরত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে স্বেচ্ছামত পারিতোষিক প্রার্থনা করিতে অনুমতি করেন। রাও অনুরাদ তখন উত্তর করিলেন, "যদি মৎপ্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাতে আমি সেনার পুরোভাগ চালিত করিতে পারি, এই স্বত্ব প্রদান করুন।" সম্রাট্ তাহাতেই সম্মত হইলেন। এই সকল ঘটনার পর বিজয়পুরের অবরোধ ও বিপ্লবসময়ে বুন্দিপতি যে বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে দিগদিগন্তে তদীয় কীর্ত্তিপতাকা সমুড্ডীন হইয়াছিল।

কোন সময় বুন্দির প্রধান সর্দ্দার দুর্জ্জনসিংহের সহিত বুন্দিপতি রাও অনুরাদের একটি শোচনীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুর্জ্জনসিংহের গর্ব্বিত ব্যবহারে রোষান্ধ হইয়া তিনি কতকগুলি অযোগ্য কটুবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "তোমার নিকট কি আশা করা যায়, তাহা আমি অবগত আছি।" এই কথাতে রুষ্ট হইয়া দুর্জ্জনসিংহ স্বামিধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বুন্দিরাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন এবং স্বনগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মীয়স্বজন ও সৈন্যদিগকে একত্র করিয়া বুন্দি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। আশু এই সংবাদ সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইল। তখনই তিনি অনুরাদকে একটি সেনাদলসহ প্রেরণ করিলেন। দুর্জ্জন পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেন। তাঁহার বিষয়সম্পত্তি রাজসম্পত্তির অন্তর্ভূত হইল। স্বরাজ্যে এই প্রকারে শান্তিস্থাপনপূর্ব্বক রাও অনুরাদ সম্রাটের আজ্ঞায় অম্বরপতি বিষণসিংহের সহিত মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরসীমা স্থির করিতে তৎপ্রদেশে প্রস্থান করেন। দুঃখের বিষয়, সেই দূরদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনুরাদের দুই পুত্র; বুধসিংহ ও যোধসিংহ। বুধসিংহ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহার অভিষেকের কিয়দ্দিন পরে আরঙ্গজেব স্বপ্রতিষ্ঠিত আরঙ্গাবাদনগরে উৎকট পীড়ায় অভিভূত হন। দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল; তাঁহার ওমরাহ ও উজীরগণ বুঝিতে পারিলেন যে, এ সঙ্কটে সম্রাটের রক্ষা নাই। তখন তাঁহারা তাঁহার রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কহিলেন, "মহারাজ! কোন্ রাজপুত্রকে আপনি উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন?" মুমূর্ষু সম্রাট্ উত্তর করিলেন, "সকলই

ঈশ্বরের হাতে, তবে আমার ইচ্ছা, বাহাদুর শা আলম ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন; কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, আজিম সবলে সিংহাসনলাভে যত্নবান্ হইবে।"

আরঙ্গজেবের ভবিষ্যদ্বাণী যাথার্থ্যে পরিণত হইল। দাক্ষিণাত্যের সেনাসাহায্যে আজিম শা অস্ত্রবলে নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন এবং অচিরে একখানি দম্ভপূর্ণ পত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট পাঠাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, "ধোলপুরের রণক্ষেত্রে বলাবল পরীক্ষা করা হইবে।" বাহাদুর স্বপক্ষীয় সমস্ত সর্দ্দার ও সামন্তগণকে একত্র করিলেন এবং আপনার বিপক্ষের কথা সকলের নিকট প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের সমবেত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সামন্তদিগের মধ্যে তখন রাও বুধ উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি পূর্ণ যুবা। ভ্রাতা যোধসিংহের অকালমরণে তাঁহার হৃদয় বিষমশোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বুন্দিতে উপস্থিত হইয়া যোধসিংহের পারলৌকিককার্য্য সম্পাদন করিতে এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে প্রবোধ প্রদানে সম্রাট্ বুধসিংহকে অনুমতি করিলেন। বুন্দিরাজ উত্তর করিলেন, "সম্রাট্! বুন্দিতে যাইয়া কি করিব? আমার কর্ত্তব্য ত আমাকে বুন্দিতে ডাকিতেছে না, রাজার সহিত সেই ধোলপুরের সমরভূমে আমার আহ্বান হইতেছে। সেই ধোলপুরের অসংখ্য প্রভুভক্ত রাজপুতবৃন্দ কর্ত্তব্যানুসারে প্রভুধর্ম্মের জলন্ত নিদর্শন ও আত্মত্যাগে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে, তথায় আমার পূর্ব্বপুরুষ চত্তরশাল আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সেই স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের প্রদীপ্ত কীর্ত্তি আজি আমাকে তৎসদৃশ আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্যপালন করিতে সমুত্তেজিত করিতেছে; প্রভুর কল্যাণার্থ আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব; জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করি, আমার অসির সহায্যে সম্রাট্ বিজয়বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন করুন।"

শা আলম লাহোর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধোলপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ওদিকে স্বীয় পুত্র বিদারবক্তের সহিত আজিমও দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে ভ্রাতার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। ধোলপুরের নিকটবর্ত্তী জাজৌ নামক ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সম্মুখীন হইল। আশু একটি যুদ্ধ বাধিল। এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ মোগলসাম্রাজ্যে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। রাজকুমারদিগের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য রাজপুতানার প্রধান প্রধান বীর সেই ভয়াবহ সংগ্রামে যোগদান করিলেন। এই সূত্রে রাজপুতগণের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ সংঘটিত হইল। এক রাজা অন্য রাজার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের হৃদয়-শোণিতপাতে সমুদ্যত। ধাত ও কোটার রাজকুমারেরা বহুদিন পর্য্যন্ত আজিমের অধীনে নিযুক্ত, তৎসকাশে তাঁহারা সময়ে সময়ে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন; এখন তাঁহারা আরঙ্গজেবের আজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া প্রভুর জন্য প্রকৃত উত্তরাধিকারীর প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। এদিকে বুন্দি ও ধাতের রাজদ্বয় অভেদ্য বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, সেই মৈত্রীবন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল, এখন তাঁহারা প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কোটার অধীশ্বর রামসিংহ শা আলমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, বুধসিংহকে নিপাত করিয়া হারকুলের একাধিপতি হইব, বুন্দি ও কোটা উভয় রাজ্যই ভোগ করিব. এইরূপ আশার কুহকে ভুলিয়া রামসিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিকূলপক্ষে যোগদান করিলেন। আশামুগ্ধ আজিম মনে করিয়াছিলেন যে, তিনিই জয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবেন; এই আশায় তিনি রামসিংহকে যুদ্ধের অগ্রেই বুন্দিরাজ বলিয়া অভিষেক করেন। সেই অভিষেক সফল করিবার উদ্দেশে রামসিংহ একান্ত সমুত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধারম্ভের আগে তিনি রাও বুধের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, "শা আলমের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আজিমের পক্ষে যোগদান করুন, আপনার মঙ্গল হইবে।" পত্র পাইয়া বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ-সহকারে বুন্দিরাজ বলিয়া

পাঠাইলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষ আত্মোৎসর্গ দ্বারা যে ক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে আমি আমার রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোকের নাম কলঙ্কিত করিতে পারিব না।

শা আলমের অনুগ্রহে বুধসিংহ সেনাদলের মধ্যেই একটি উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ উৎসাহ-সহকারে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অন্য কেহই সেরূপ রণনৈপুণ্য প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই; তাঁহারই বাহুবলে বিজয়লক্ষ্মী শা আলমের মস্তকে গৌরব-মুকুট প্রদান করেন। শা আলম বাহাদুর শা নাম ধারণপূর্ব্বক ভারতের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই ভীষণ সংগ্রামে দুই পক্ষের রাজপুতগণকেই বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কোটার মহারাজা রামসিংহ ও ধাতনগরীর বুন্দেলারাজ দলপৎ উভয়েই গোলকাঘাতে রণস্থলে শয়ন করেন; আজিম ও বিদারবক্তও রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়া সংসারজ্বালার শান্তি করেন।

শা আলমের হৃদয় অপবিত্র বা অকৃতজ্ঞ নহে, সেই জাজোক্ষেত্রে হারবীর বুধসিংহ যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন, সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়া বাহাদুর তাহা বিস্মৃত হইলেন না। সংগ্রামে জয়লাভ হইলেই সেই শোণিতাপ্লুত-দেহে তিনি হাররাজকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া তৎসহ বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে "রাও রাজা" উপাধি প্রদানপূর্ব্বক পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। এই বিমল সৌহার্দ্দবন্ধন দীর্ঘকাল আচ্ছিন্ন রহিল। যে দিন বাহাদুর শা লীলাসংবরণপূর্ব্বক মোগল-সাম্রাজ্যের নূতন বিপদের বীজরোপণ করিলেন, সেই দিন বুন্দিপতি পরমবন্ধু হারাইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। বাহাদুর পরলোকগত হইলে আরঙ্গজেবের পৌত্রগণের মধ্যে ভীষণ অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভূত হইল। অবশেষে একে একে সকলেই সেই বিপ্লবাগ্নিতে পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইল। অতঃপর মোগলসাম্রাজ্য ফিরকশিয়রের হস্তগত হয়; কিন্তু তাঁহার রাজত্বসময়ে দুর্ব্বৃত্ত সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় আবির্ভূত হইয়া পাশব-অত্যাচার দ্বারা রাজ্যের মহা অনিষ্টসাধন করে। এক সময়ে তাহারা সম্রাট্‌কে রাজ্যচ্যুত করিতে যত্নবান্ হওয়ায় বুধসিংহ তাহাদের সেই অনর্থকর উদ্যম বিফল করিতে সঙ্কল্প করেন। ইহাতে প্রাসাদের চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণতলে যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাতে বুন্দিপতির পিতৃব্য জয়সিংহ এবং অন্যান্য অনেক হার সৈন্যসামন্তের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল।

রক্তাপ্লুত জাজোক্ষেত্রে কোটা ও বুন্দির মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, রামসিংহের পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভীমসিংহ হইতে তাহা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। রাজা ভীম নিজ অবিমৃশ্যকারিতা-দোষে অন্ধপ্রায় হইয়া দুরাচার সৈয়দদিগের পক্ষে যোগদান করিলেন এবং বুধসিংহের রক্তে জ্বলন্ত প্রতিশোধতৃষা প্রশমিত করিবার অভিলাষে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্বীয় দুরভিসন্ধি-সাধনে তিনি এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার হিতাহিতবিচার অন্তর্হিত হইল। মূর্খ ভীমসিংহ সম্মুখসমরে সমর্থ না হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। একদিন তিনি বুধসিংহকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলেন। রাজধানীর বহির্ভাগস্থ ময়দানে বুন্দিপতি তুরঙ্গ লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার নিকট কতিপয় মাত্র সৈনিক দণ্ডায়মান, ইত্যবসরে দুর্ব্বৃত্ত ভীমসিংহ সদলে আসিয়া তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। বুধসিংহের সর্দ্দারেরা তাঁহাকে ব্যূহাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতক ভীমসিংহের সহিত প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে একটি নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন কোটারাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বুধসিংহ রাজধানীতে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মোগল-সম্রাট্‌কে পিশাচগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারিলেন না, কুচক্রীদিগের কুটিল ষড়্‌যন্ত্রে তাঁহারই

আত্মপ্রাণ শেষে বিপন্ন হইয়া পড়িল ; তখন তিনি আত্মরক্ষার্থ স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ইহার পরেই মন্দভাগ্য ফিরকশিয়র সৈয়দের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর মোগলসাম্রাজ্য ঘোর অরাজক হইয়া উঠিল। রাজা, উজীর ও ওমরাহগণ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব অভিমত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে অম্বরপতি জয়সিংহ বুন্দিরাজ বুধসিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়া তৎপ্রতি বিষম বৈরতাচরণ করিতে লাগিলেন। জয়সিংহের ভগিনীর সহিত এক সময়ে বাহাদুর শা ও বুধসিংহের সম্বন্ধ স্থির হয় ; কিন্তু মোগল-সম্রাট্ বুন্দিরাজের অকপট বন্ধুত্ব মান্য করিয়া সেই বৈজাত্য-সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন ; ইহাতে বুধসিংহের সহিত অম্বররাজপুত্রীর বিবাহ হইয়া গেল। জয়সিংহের ভগিনী বন্ধ্যা। কিন্তু বৈগুর কাসমেঘের কন্যাকে বুন্দিরাজ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মে। সপত্নীকে পুত্রবতী দেখিয়া কুশাবহকুমারীর হৃদয় ঈর্ষায় অধীর হইয়া উঠিল। পতির অনুপস্থিতিসময়ে তিনি আপনাকে গর্ভবতী বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সুযোগক্রমে একটি পুত্রসন্তান সংগ্রহ করিয়া রাজার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন। স্বরাজ্যে উপস্থিত হইলে রাও বুধ মহিষীর এই জঘন্য ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারিয়া শ্যালক জয়সিংহের নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। মহিষী তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। জয়সিংহ তখনই সহোদরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি! তোমার এরূপ আচরণ কেন ?" এই কথা শুনিবামাত্র বুন্দিমহিষী রোষপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাড়িতবেগে ভ্রাতার কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা তুলিয়া লইয়া 'দর্জ্জিকা বাচ্ছা" বলিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে উপক্রম করিলেন। অগত্যা অম্বরপতি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপূর্ব্বক সেই রণচণ্ডীর হস্ত হইতে আত্মপ্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই দারুণ অবমাননায় জয়সিংহের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। বুন্দি হইতে রাও বুধসিংহকে বিতাড়িত করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বুন্দির প্রধান ঠাকুর ইন্দ্রগড়পতি দেবসিংহকে তদুপরি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দেবসিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন জয়সিংহ করবার-সর্দ্দার সলিমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি বুন্দিরাজ্য গ্রহণ কর। সলিমসিংহের আনন্দের অবধি রহিল না।

মালব, অজমীর ও আগরার শাসনভার রাজা জয়সিংহের হস্তে অর্পিত ছিল। বুন্দিরাজের সহিত বিবাদ বাধাইবার তাঁহার একটি গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। তাঁহার অন্তরে একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন তরঙ্গায়িত হইতেছিল। মোগলসাম্রাজ্যের অকর্ম্মণ্যতা এবং অন্তর্বিপ্লব দর্শনে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য নরপতিগণের উপর স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন। এই জন্য মোগল-সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা দর্শনে তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইয়াছিল। যে দিন মন্দভাগ্য ফিরকশিয়র সৈয়দের করে প্রাণত্যাগ করিলেন, সেই দিন অম্বরপতির চিরলালিত আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। সম্রাটের দুর্দ্দশা দর্শনে মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি স্বরাজ্যে গমন করিলেন। ভগিনীপতি রাও বুধ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া অভ্যাগত অতিথিরূপে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

রাও বুধসিংহ জয়সিংহের ভগিনীপতি, তাহাতে আবার আজি তাঁহার বাটীতে অভ্যাগত, জয়সিংহের ইচ্ছা, বুন্দিরাজকে কোনপ্রকারে অম্বরে রাখিয়া তিনি তদীয় রাজ্য অধিকার করেন। এই দুরভিসন্ধিসিদ্ধ্যর্থ জয়সিংহ একদিন রাও রাজাকে কহিলেন, "অম্বরকে তুমি বুন্দি হইতে স্বতন্ত্র

জ্ঞান করিও না, এ অম্বর তোমারই। অতএব তুমি কিছু কাল এখানেই বসতি কর; তুমি প্রত্যহ পাঁচশত টাকা পাইবে; ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে না।" এই কথা শুনিয়া বুধসিংহের পিতৃব্যের মনে দারুণ সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে গোপনে বলিলেন, "জয়সিংহের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছ কি? তোমাকে এইখানে রাখিয়া বুন্দি অধিকার করাই তাহার ইচ্ছা।" তিনি তৎক্ষণাৎ বুন্দিতে পত্র লিখিয়া বৈগুরাণীকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন আশু আপন পুত্রদ্বয়কে লইয়া পিতৃগৃহে গমন করেন। অতঃপর হার-সর্দ্দার ও সামন্তগণকে অম্বরের বাহিরে একটি গুপ্তস্থানে একত্র করিয়া তিনি বুধসিংহের সমভিব্যাহারে বুন্দি-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে তিনশত হারবীর তাঁহাদের অনুগামী ছিল। সেই ত্রিশত মহাবল সৈনিক লইয়া বুন্দিরাজ বিশ্বাসঘাতক জয়সিংহের পাপগৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং নির্ভীকহৃদয়ে আপনার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি নিরাপদে পৌঁছিতে পারিলেন না, বুন্দি ও অম্বর রাজ্যের সীমান্তস্থিত পাঞ্চোলাশ নামক নগরে অম্বরের প্রধান পঞ্চসর্দ্দার সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। বুধসিংহ আপন ত্রিশত সেনা সহ একটি ব্যূহরচনা করিয়া বিপক্ষের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। আজি রাজপুত রাজপুতের প্রতিকূলে অসি-হস্তে দণ্ডায়মান; শ্যালক ভগিনীপতির সংহারে স্থিরসংকল্প। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ ভীষণতর হইয়া উঠিল; হারবীরবৃন্দের অব্যর্থ সন্ধানে একে একে অম্বরের পঞ্চসর্দ্দার এবং অনেকগুলি সৈন্য রণভূমে শয়ন করিল। অবশিষ্ট সকলে প্রাণভয়ে অম্বরের দিকে প্রস্থান করিল। বুধসিংহের পক্ষও আহত; তাঁহার পিতৃব্য নিহত, অনেকগুলি রণদক্ষ সৈনিকও ভূমিশায়ী; কতিপয় সৈন্যমাত্র জীবিত। সেই হতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বুধসিংহ বুন্দিগমনে ভীত হইলেন। পাথরের গাঢ় গহনাদির মধ্য দিয়া তিনি শ্বশুরগৃহ বৈগুনগরে উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহের অনেকগুলি সৈন্যের শোণিতপাত হইল বটে, কিন্তু বুধসিংহ যে জয়ী হইয়া গমনে ভীত হইলেন, ইহাতে অম্বরপতি একান্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন; তিনি করবার-সর্দ্দার সলিমসিংহের পুত্র দলিমসিংহের করে আপন কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে রাও রাজা উপাধি দান করিলেন। বুন্দির সিংহাসন তাঁহারই করে প্রদত্ত হইল।

জ্যেষ্ঠ হারারাজপুত্রকে সঙ্কটাপন্ন দর্শনে কনিষ্ঠ ভীমসিংহ চিরপোষিত প্রতিশোধ-তৃষার তৃপ্তিবিধান করিতে অগ্রসর হইলেন। চম্বলনদের তীরপ্রদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়া তিনি তাহার পূর্ব্বকূলবর্ত্তী সমগ্র খাসজমী অধিকার করিলেন।

এই প্রকারে চারিদিকে শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া মন্দভাগ্য বুধ আপন রাজ্য উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু তাঁহার সকল যত্নই বিফল হইল। তাঁহার বিপুল শোণিত ও অর্থব্যয় হইল, ক্রমে ক্রমে তিনি নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আশা-ভরসাও বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। সেই শোচনীয় অবস্থায় চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বৈগুক্ষেত্রেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার দুই পুত্র;—উমেদসিংহ ও দীপসিংহ।

দুর্ম্মতি জয়সিংহের হৃদয় কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে। বুধসিংহের শিশুপুত্রদ্বয় যে মাতুল-গৃহে থাকিবে তাহাও তাঁহার প্রাণে অসহ্য হইল। রাণাকে বলিয়া তিনি বৈগু-জনপদ কালমেঘের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিলেন। রাজপুত্রদ্বয় নিরাশ্রয় হইয়া কয়েকটি সৈনিক সমভিব্যাহারে পুচাইল নামক বিজন পর্ব্বতবাসে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন অতীত হইলে তাঁহারা কোটারাজ দুর্জ্জনশালের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। দুর্জ্জনশাল ভীমসিংহের পুত্র। পিতৃবৈরীর

কুমারযুগলকে আশ্রয়ার্থী দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল ; তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাদের সাহায্য-প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দবলনার যুদ্ধ, উমেদের ঘোটক হুঞ্জের মৃত্যু, বিধবা বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ, অম্বররাজকুমারের পরাজয়, উমেদের বুন্দিলাভ, ঈশ্বরীসিংহের আত্মহত্যা, মধুসিংহ, জালিমসিংহ মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ, উমেদের রাজ্যত্যাগ, অজিতের অভিষেক, উমেদের তীর্থযাত্রা, রাণার গুপ্তহত্যা, সতীদত্ত অভিশাপ, অজিতের বীভৎসমৃত্যু, পূর্ব্ব-ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা, বিষণসিংহের অভিষেক, উমেদের মৃত্যু, হারাবতীর ভিতর দিয়া বৃটিস-সেনার পশ্চাদপসরণ, ইংরাজদিগের সহিত বুন্দির সখ্যভাব, বিষণসিংহের মৃত্যু, রাও রাজা রামসিংহ।

১৮০০ সংবতে রাও বুধসিংহের ভীষণ শত্রু অম্বররাজ জয়সিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। উমেদের বয়ঃক্রম তখন ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। পিতৃশত্রুর মরণবার্ত্তা শ্রবণমাত্র বীরবালক উমেদ স্বীয় সৈন্যসামন্তগণ সহ পত্তন ও গৈনোলি আক্রমণ করিলেন ; অচিরেই তাঁহার জয়লাভ হইল। বুধসিংহের পুত্র জাগরিত হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্বত্র এই সংবাদ বিঘোষিত হইল। প্রাচীন হারগণ চতুর্দ্দিক্‌ হইতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উন্নত পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। এ দিকে কোটার অধীশ্বর দুর্জ্জনশাল প্রকৃত হার বিক্রমকে পুনরুদ্দীপিত হইতে দেখিয়া যার পর নাই পুলকিত হইলেন এবং উমেদের সাহায্যার্থ সানন্দচিত্তে সেনাবল প্রেরণ করিলেন।

তৎকালে অম্বরের সিংহাসনে ঈশ্বরীসিংহ অধিরূঢ় ছিলেন। পিতার কুটিলনীতির অনুগামী হইয়া তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, কোটা ও বুন্দি উভয়রাজ্যই অধিকার করিয়া পদতলে বিদলিত করিবেন। তিনি কোটা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে রণভূমি হইতে পলায়ন করিতে হইল। পরে তিনি উমেদকে দমনার্থ একদল নানকপন্থী সেনা তৎপ্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। উমেদ সে সময় মীনগণের মধ্যে বুদলোহারী নামক একটি নিভৃতস্থানে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া মীনগণ তাঁহার রক্ষাবিধানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। আশু পঞ্চসহস্র ধনুর্দ্ধর বীরবালক উমেদের সাহায্যার্থ ঈশ্বরীদাসের প্রতিকূলে যাত্রা করিল। বীচোরী নামক স্থলে উমেদ অম্বরসেনার উপর নিপতিত হইলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকগুলি কুশাবহ সেই বীরবালকের করে প্রাণত্যাগ করিল। অপর সকলে ধ্বজা ও রণভেরী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ

দূরে পলায়ন করিল। তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রী উমেদের অধিকৃত হইল।' এই পরাজয়সংবাদ প্রাপ্তমাত্র অম্বরপতি ঈশ্বরীসিংহ নারায়ণদাস নামক একটি ক্ষত্রিয়বীরের অধীনে অষ্টাদশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যমই বিফল হইল। বীরবালক উমেদের এই অদ্ভুত বীরত্বের সংবাদ শুনিয়া চারিদিক্ হইতে হারগণ দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনেও উমেদ স্থিরপ্রতিজ্ঞ। আজি তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইল। দেখিতে দেখিতে দুই পক্ষের সেনাদল দবলানা নামক স্থলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। সংগ্রাম আরম্ভ হইবার অগ্রে উমেদ শীতুনগরে আশাপূর্ণা দেবীর অর্চ্চনার্থ তাঁহার পবিত্রমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভগবতীপদে প্রণামপূর্ব্বক তিনি গাত্রো-ত্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বুন্দির অত্যুচ্চ সৌধশিখে নিপতিত হইল। অমনি তাঁহার হৃদয় মহাতেজে সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল। যে বুন্দি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের লীলাভূমি, যেখানে তাঁহারা প্রচণ্ড বিক্রমে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, যাহার দুর্গাভ্যন্তরে শত শত বন্দী দীন-ভাবে দেহপাত করিয়াছে, আজি স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই জন্মভূমি বুন্দিরাজ্য হইতে তিনি বঞ্চিত। আজি সেই সাধের লীলাক্ষেত্র একজন স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের হস্তে সমর্পিত। এই কঠোর চিন্তা সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে দংশন করিতে লাগিল। তিনি ভগবতী আশা-পূর্ণার সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "মা আশাপূর্ণে! জননি! এই তোমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা সংগ্রামে এ পাপদেহ বিসর্জ্জন দিব।"

দেখিতে দেখিতে হারকুলের রণভেরী গম্ভীরনির্ঘোষে বাজিয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক হইতে হারবীর-গণ উমেদের পীতবর্ণ বৈজয়ন্তীমূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দুর্জ্জয় দেরায়ু খাঁকে পরাভূত করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাও রতন সম্রাট্ জাঁহাগীরের নিকট সেই বৈজয়ন্তী লাভ করিয়াছিলেন। উমেদ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সে বৈজয়ন্তীকে আজি কখনই কলঙ্কিত হইতে দিবেন না। অচিরেই রণো-ন্মত্ত সৈনিকগণকে লইয়া হারবীর উমেদ শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত অগণ্য আগ্নেয়াস্ত্র দর্শনেও বীরবালক উমেদ বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। বরং দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত শূলদণ্ড উদ্যত করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ প্রহরণ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া বিপক্ষসেনা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল; উমেদের বিজয়িনী সেনার অগ্রগমনের পথ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া হারবীর তাঁহাদের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য শত্রুমুণ্ড তাঁহার পদতলে বিদলিত হইল। তখনই জয়পুরসেনা তাঁহার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া অনর্গল গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জের বিশ্বদাহী তেজে অনেকগুলি মহাবীর রণভূমে শয়ন করিলেন; প্রথম যুদ্ধে উমেদের মাতুল শোলানকি পৃথ্বীসিংহ এবং মতরার মহারাজ হারমুরজাদসিংহের প্রাণবিয়োগ হইল। মুরজাসিংহ চক্র নিক্ষেপপূর্ব্বক কুশাবহ-সেনাপতি নারায়ণদাসের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন, ইত্য-বসরে শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলিকাঘাতে তাঁহাকেও অনন্তনিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিতে হইল। উমেদ কিছু তেই ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ হইলেন না। স্বীয় তরবারি উদ্যত করিয়া তিনি বিপক্ষের দিকে অগ্র-সর হইতে লাগিলেন। বিশ্বনাশিনী কামানশ্রেণীর জ্বলন্তকবলে শত শত হারবীর রণভূমে শয়ন করিল। ক্রমে ক্রমে শোরণের সর্দ্দার প্রয়াগসিংহ ও অন্যান্য অনেক বীর জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। ইহাতেও বীরবালক উমেদ বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার বীরপ্রতিজ্ঞা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি অবিরত শত্রুসেনা বধ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে অদ্ভুত উৎসাহ, প্রচণ্ড বীরত্ব ও অপূর্ব্বরণকৌশলের সহিত বীরবালক উমেদ সংগ্রামে লিপ্ত আছেন,

ইত্যবসরে তাঁহার প্রিয়তম বাহন অশ্বটির উদরে একটি জ্বলন্ত গোলক আসিয়া পতিত হইল। সেই নিদারুণপ্রহারে তুরঙ্গবরের অন্ত্রসমুদয় বহির্বিনিঃসৃত হইল; তথাপি সে প্রভুকে পরিত্যাগ করিল না। উমেদ পূর্ব্ববৎ অদম্য সাহসের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাঁহার সৈন্যগণ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল, সহকারী প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইলেন, ভবিষ্যতের আশাভরসা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার এইরূপ বীরভাব দর্শনে তদীয় অবশিষ্ট সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রণস্থল হইতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিনীতভাবে তাঁহারা কহিলেন, "মহারাজ! এ কালসময়ে আপনি জীবিত থাকিলে বুন্দি উদ্ধারের আশা আছে; কিন্তু যদি আপনি পরিণাম চিন্তা না করিয়া সংগ্রামে দেহপাত করেন, তাহা হইলে আমাদের আশা-ভরসা সকলই রসাতলে নিমগ্ন হইবে।"

সর্দ্দারগণের প্রস্তাবে বীরবালক উমেদ অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক সদলে ইন্দ্রগড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা শোয়ালি নামক পর্ব্বতবর্ত্মের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। উমেদ অশ্ব-হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রিয়তম বাহনের বন্ধনরশ্মি উন্মোচনপূর্ব্বক তত্রত্য ছায়াতরুমূলে উপবেশন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই অশ্বটি তাঁহার পদতলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; তাদৃশ উপকারী অশ্বের মৃত্যুতে উমেদ শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই অশ্বটি হুঞ্জা নামে অভিহিত হইত। ইরাকদেশে তাহার জন্ম। উমেদের পিতা সম্রাটের নিকট অশ্বটি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকবার অনেকস্থলে সে তাঁহাকে নিরাপদে বহন করিয়াছিল। হুঞ্জা যদিও বৃদ্ধ, তথাপি সে দবলানাক্ষেত্রে উমেদকে যেরূপ সতর্কভাবে বহন করিয়াছিল, মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলকাঘাতে তাহার উদর ছিন্নভিন্ন হইলেও সে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে নাই। সেই প্রিয়তম অশ্ব উমেদের পদতলে প্রাণত্যাগ করিল। বহুক্ষণ রোদনের পর তিনি হুঞ্জার শব-দেহটির সৎকার করিলেন। তখনই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি কখন পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিব।" উমেদ সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। বুন্দিরাজ্য তাঁহার করগত হইলে তিনি হুঞ্জার একটি পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিমা অদ্যাপি নগরের চৌকে বিরাজ করিতেছে। আজিও প্রত্যেক হার তাহাকে ভক্তি-সহকারে পুষ্পচন্দন উপহার দিয়া সুশোভিত করে।

হারবীর উমেদ পুনরায় সদলে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে শোয়ালি পর্ব্বতবর্ত্ম অতিক্রমপূর্ব্বক তিনি পদব্রজে ইন্দ্রগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য সর্দ্দার তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলেন না। সেই নরাধম হারকুল-কলঙ্ক ইতিপূর্ব্বে জয়পুররাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে; এখন উমেদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিল, "তুমি কি ইন্দ্রগড় ও বুন্দির সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছা কর?" তাহার বাক্যবাণে উমেদের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি তখন নিঃসহায়, কাজেই মনের আগুন মনোমধ্যে বিলীন রাখিয়া সেই পাপরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর উমেদ করবৈনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণমাত্র তত্রত্য সর্দ্দার নগর হইতে বহির্গত হইয়া যথোচিত সম্মান-সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য ও একটি অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক তৎকালে তাঁহার উপকার করিতে ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার আশ্রয়চ্ছায়াতলে শ্রান্তি দূর করিয়া উমেদ স্বীয় সর্দ্দারগণকে বলিলেন, 'বীরবৃন্দ! তোমরা আমার জন্ত সমূহ কষ্ট স্বীকার করিয়াছ; এখন তোমরা আপন আপন গৃহে গিয়া কিছুদিন বিশ্রামসুখ

অনুভব কর। এখন আমার ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সেই কালমেঘ অপসৃত হইলে আবার তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিব।" সর্দারগণ প্রণামপূর্ব্বক বিদায়গ্রহণ করিলে উমেদ চম্বলতীরবর্ত্তী প্রাচীন রামপুরের ভগ্নপ্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কোটাপতি দুর্জ্জনশাল দবলানাসংগ্রামে উমেদের সাহায্য করিয়াছিলেন; এখন সেই উমেদকে সঙ্কটাপন্ন দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইলেন এবং বুন্দি উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আশু একটি বিশাল বাহিনী সুসজ্জিত হইল। রণবিশারদ একজন ভট্টকবি সেই বাহিনীর নেতৃপদ গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুহস্তগত বুন্দিরাজ্য অবরোধ করিলেন। অজস্র সংগ্রামে বুন্দি নগরের প্রাকারাবলী ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হারসেনাকে অধিক ক্লেশস্বীকার করিতে হইল না। ভট্টসেনাপতি অতঃপর তারাগড়দুর্গ অবরোধপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইত্যবসরে তাঁহারই পক্ষ হইতে একজন বিশ্বাসঘাতক গুলিকাঘাতে তাঁহার প্রাণবধ করিল। তথাপি হারসেনাগণ নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইল না। নিম্নপদস্থ সেনাপতি তৎক্ষণাৎ নায়কের শবদেহের উপর একখানি বসনাচ্ছাদন দিয়া সৈন্যমণ্ডলীকে বীরতেজে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। এ দিকে আক্রমণকারীরাও প্রচণ্ডবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। হারবীরগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া হতভাগ্য রাষ্ট্রাপহারী দলিম অচিরেই দূরে পলায়ন করিল; উমেদসিংহের আশা ফলবতী হইল, তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র সিংহাসন তৎক্ষণাৎ অধিকার করিলেন।

কাপুরুষ দলিমের লজ্জা ও অপমানের পরিসীমা রহিল না। সে স্বীয় প্রভু ঈশ্বরীসিংহের পাদমূলে শরণাগত হইল। তখন অম্বরপতি বুন্দিজয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সেনাপতি মহাবীর ক্ষেত্রী কেশুদাসের করে কুশাবহকুলের সৈন্যমণ্ডলী সমর্পণপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে বুন্দির প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন; আশু বুন্দি অবরুদ্ধ হইল। আত্মরক্ষণোপযুক্ত সৈন্যসংগ্রহের অবসর না পাইয়া উমেদ অগত্যা নগর পরিত্যাগ করিলেন। আবার দেববঙ্গের সমুচ্চ কাঙ্গরার উপর ধুন্দরের বিজয়-বৈজয়ন্তী বিরাজিত হইল; কিন্তু ঈশ্বরীসিংহ যখন দলিমসিংহকে বুন্দিসিংহাসনে পুনরভিষেক করিতে চাহিলেন, তখন দলিম সন্তপ্তহৃদয়ে কহিল, "রাজন্! আমি রাজপদের যোগ্য নহি, আমি বুন্দির প্রজা, রাজার সিংহাসন অধিকার করিয়া জগতে আমার কলঙ্ক ঘোষিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সিংহাসন পুনরায় লইয়া গভীর কলঙ্ক-কালিমা গভীরতর করিতে সমর্থ হইব না।"

উমেদসিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়া যথা তথা বিচরণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু যখনই সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হইত, তখনই শত্রুরাজ্যে আপতিত হইয়া নগর-গ্রাম লুণ্ঠন করিতেন। পিতৃরাজ্য বুন্দিও তাঁহার রোষদৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। একদিন লুণ্ঠনব্যাপারে লিপ্ত হইয়া তিনি সদলে বিনোদীয় নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরে হারবংশের সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ তাঁহার বিমাতা কুশাবহ-রাণী আত্মকৃত পাতকের প্রায়শ্চিত্তবিধানার্থ আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুতাপানলে নিরন্তর তাঁহার অন্তর দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছিল। বিমাতার বৃত্তান্ত শ্রবণে উমেদ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী হইলেন। বিমাতার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া কচ্ছাবহ-রাজপুত্রীর অন্তর্নিগূহিত অনুতাপানল প্রচণ্ডতেজে জ্বলিয়া উঠিল; তাঁহার দুরাচরণে যে উমেদ রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত, পরানুগ্রহে জীবিত, এই চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড দংশন করিতে লাগিল। তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। কচ্ছাবহ-রাজপুত্রী তখন উমেদকে সম্বোধন করিয়া সন্তপ্তহৃদয়ে কহিলেন, "পুত্র! এই হতভাগিনী হইতেই তোমার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এখন আমি একবার দক্ষিণদেশে গিয়া তোমার বুন্দিরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা দেখি।"

বুধসিংহের বিধবা মহিষী দক্ষিণাবর্ত্তে প্রস্থান করিলেন। তিনি নর্ম্মদাতটে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি তাঁহাকে একটি স্তম্ভ দেখাইয়া কহিলেন, "নর্ম্মদার পরপারে গমন করা আপনাদিগের নিষিদ্ধ। দেখুন, স্তম্ভগাত্রে কি ক্ষোদিত রহিয়াছে ?" বিধবা বুন্দিমহিষী তৎক্ষণাৎ সেই স্তম্ভের শিলাশাসনখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন এবং নর্ম্মদা পার হইয়া মুলহর রাও হুলকারের স্কন্ধাবারে প্রবিষ্ট হইলেন। জয়সিংহের অসূর্য্যম্পশ্যা ভগিনী আজি সাহায্যার্থিনী হইয়া মেষপালক মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর নিকট উপস্থিত।

মুলহর রাওয়ের সহিত রাজপুতমহিষী ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ বন্ধনপূর্ব্বক বিনয়গর্ভবাক্যে কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বুন্দি উদ্ধার করিয়া উমেদকে প্রদান করুন।" নিকৃষ্ট ছাগপালের বংশে হুলকারের জন্ম বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় উচ্চ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিল। তিনি কচ্ছাবহ-রাজকুমারীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আশু একটি বিশাল সেনাদল সুসজ্জিত হইল। বিধবা মহিষী সেই বিরাট-বাহিনী একবারে জয়পুরের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। ঈশ্বরীসিংহকে নির্ম্মূল করিয়া তাঁহার শাখাপল্লব পর্য্যন্ত ধ্বংস করেন, ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যবশতঃ বিধাতা তাঁহারই প্রতি প্রসন্ন হইলেন। অম্বরের সিংহাসন লইয়া তখন ঈশ্বরীসিংহের সহিত রাণার ভাগিনেয় মধুসিংহের ভীষণ বিবাদ চলিতেছিল। রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ মধুসিংহের পক্ষ হইয়া ঈশ্বরীসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এ দিকে উমেদসিংহের বিমাতা ঈশ্বরীব প্রতিকূলে অবতীর্ণ হইতেছেন; সুতরাং তাঁহার ও রাণার উভয়েরই এক উদ্দেশ্য হুলকার ইঁহাদের উভয়েরই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়া সদলে অম্বরে উপস্থিত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক ঈশ্বরীসিংহ তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সসৈন্যে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বিপুল সেনা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তাঁহার দুইটি কর্ম্মচারী মহারাষ্ট্রীয়সেনা দেখিয়া গিয়া বলিয়াছিল, শত্রুকুলের সৈন্যসংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়াই ঈশ্বরীসিংহ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করেন নাই। তাঁহাকে নিজ দুর্ব্বৃত্ততা ও নৃশংসতার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে হইল। অম্বরের প্রধান মন্ত্রীকে বধ করিয়া মন্দভাগ্য ঈশ্বর স্বহস্তে আপনার অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে অম্বরের ভট্টকবিরা এই কবিতাটি পাঠ করিয়া থাকেন ;—

"যাবি ছোড়ি ঈশ্বরো রাজ্ কর্‌নেকা আশ ;
মন্ত্রী মুটা মারা ক্ষেত্রী কেশুদাস।"

অর্থাৎ মন্ত্রিবর ক্ষত্রিয় কেশুদাসকে যে দিন ঈশ্বর বধ করিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার রাজ্যভোগের আশা বিলুপ্ত হইল।

যে কর্ম্মচারিদ্বয় মহারাষ্ট্রীয়সেনার সংখ্যা অল্প বলিয়া ঈশ্বরের নিকট মিথ্যাকথা বলিয়াছিল, তাহারা সেই নিহত কেশুদাসের পুত্র। পিতৃবৈরনির্য্যাতনার্থ তাহারা বিশ্বাসঘাতকতাকে মস্তকে করিয়া ঐরূপ মিথ্যাবাক্যে ঈশ্বরকে প্রতারিত করিয়াছিল। অম্বরপতি তাহাদেরই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ রাজধানীর নিকটস্থ ভাগ নামক দুর্গসম্মুখে যুদ্ধার্থ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন মহারাষ্ট্রীয়সেনা দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল, তখন তিনি একেবারে নিরুপায় ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা তিনি পলায়নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত

ভাগ দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এ দিকে মহারাষ্ট্রীয়দল কর্ত্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। দশদিন অবরোধের পর ঈশ্বরীসিংহ শত্রুকুলের শরণাগত হইলেন। আশু একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিপিবদ্ধ হইল। তাহাতে লিখিত থাকিল, অম্বরপতি বুন্দি উমেদের করে প্রদান করিলেন। তাহাতে তাঁহার ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণের কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না; অধিকন্তু উমেদকে বুন্দির নৃপতি স্বীকার করিয়া তাঁহার ভালতটে টীকা অঙ্কিত করিবেন। ঈশ্বরীসিংহ সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। অতঃপর উমেদের আত্মীয়স্বজনেরা কোটার সহকারী সেনাদল মহারাষ্ট্রীয় সেনার সহিত সেই স্বত্বপত্র লইয়া বুন্দিনগরে আগমন করিল এবং স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক দলিমকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া উমেদকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত উমেদকে বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ১৮০৫ সংবতে (১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। স্বদেশদ্রোহী দলিমের পাপস্পর্শে যে সিংহাসন কলুষিত হইয়াছিল, উমেদের পদার্পণে তাহা আবার পরমপবিত্র বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু সেই ভীষণ বিপ্লবে বুন্দির আভ্যন্তরীণ বল মন্দ হইয়া পড়িয়াছে, নগরীর শোভা-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহা মহা বীরগণও তিরোহিত হইয়াছেন। সেই শোচনীয় দশার উপর মূলহর রাও হুলকার আবার স্বীয় বিষদন্তের দংশনে উৎপীড়িত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ধরিতে গেলে তিনি উমেদের ধর্ম্ম-মাতুল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, অর্থের নিকট ধর্ম্মবন্ধন তাঁহার পক্ষে কোন কার্য্যকর হয় নাই। একটি দুরভিসন্ধিসিদ্ধির উদ্দেশেই তিনি বালক উমেদের স্বার্থরক্ষার্থ ঈশ্বরীসিংহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। বলবতী ভূমিলিপ্সাই তাঁহার সেই দুরভিসন্ধি। সেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই হুলকার স্বীয় ভাগিনেয়ের সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং এই উপকারের জন্য তিনি পাকা পাট্টায় লেখাপড়া করিয়া চম্বলের বামকূলবর্ত্তী পত্তনজনপদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পিতৃরাজ্য লাভ করিয়া উমেদসিংহ তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুরাচরণে অনেক পরিমাণে তাঁহার উৎসাহভঙ্গ হইয়াছিল। যাহারা তাঁহার পিতৃরাজ্যোদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছে, অবশেষে তাহারাই স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া তাঁহার হৃদয়শোণিত পান করিতে থাকিবে, অগ্রে তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রাজপুতগণ পরিণামচিন্তা না করিয়া সেই ক্রূর দাক্ষিণীগণকে একদা বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিত্ররূপী ভণ্ড মহারাষ্ট্রীয়দল যে তাঁহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদেরই সর্ব্বনাশ করিবে, পূর্ব্বে তাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা পঙ্গপালের ন্যায় রাজস্থানের সর্ব্বত্র পতিত হইয়া রাজপুতগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিত। যাহা হউক, মনে নানারূপ দুশ্চিন্তার উদয় হওয়াতে সংসারের প্রতি উমেদের বিরাগসঞ্চার হইল, তিনি অকালে রাজকার্য্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বহস্তে স্বরাজ্যের অধঃপতনপথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

উমেদসিংহ কেন যে রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাহা অনুশীলন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে করিলেই তিনি নরপিশাচ দেবসিংহের মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। আট বর্ষ অতীত হইল। সকলে মনে করিল, বুঝি রাজা দেবসিংহের দুরাচরণের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। দবলানাক্ষেত্রে পরাজয়ের পর যে উমেদ আশ্রয়ার্থী হইয়া যাহার ইন্দ্রগড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহাকে সে একগণ্ডূষ জল পর্য্যন্তও প্রদান করে নাই, সেই উমেদ আবার এখন বুন্দি-সিংহাসনে সমারূঢ়। পাপিষ্ঠ নারকী ইন্দ্রগড়-সর্দ্দার ক্ষমাশীল উমেদের দেবোপম মহচ্চরিত্রকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়া তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া

ঘৃণা. করিতে লাগিল। দুরাচার পুনরায় আবার এমন একটি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিল যে, উমেদ তাহাকে প্রতিফল না দিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। উমেদ স্বীয় ভগিনীর নামে অম্বরপতি মধুসিংহের নিকট বিবাহসম্বন্ধসূচক নারিকেলফল প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রগড়ের পাপিষ্ঠ দেবসিংহ সেই সময়ে অম্বরের সভাতলে উপস্থিত ছিল। অম্বররাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে উমেদের ভগ্নীর কিরূপ যশোঘোষণা করে?" রাজদ্রোহী কপটী প্রকাশ্য সভাসমক্ষে সহস্র সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে উমেদের পবিত্র পিতৃকুলে কলঙ্কারোপ করিল। সেই নরাধমের উত্তরে লঘুচেতা মধুসিংহেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। বুধসিংহের কন্যার পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া নারিকেলফল বুন্দিপতিকে ফিরাইয়া দিলেন। রাজপুতবংশে জন্মিয়া কেহ কখনও এরূপ অপমান সহ্য করিতে পারে নাই। সুতরাং উমেদ তাহা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? যখন তিনি শুনিলেন যে, প্রকাশ্যসভায় সেই দুরাচার নররাক্ষস দেবসিংহ তাঁহার পবিত্রকুলে মিথ্যা কলঙ্কারোপ করিয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে রোষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নরপিশাচকে সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

১৮১৩ সংবতে (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে) বুন্দিরাজ করবার-জনপদের নিকটবর্ত্তিনী বিজয়সেনী মাতার অর্চ্চনার্থ তদীয় মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বুন্দির সর্দ্দার ও সামন্তগণও সপরিবারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। করবার ইন্দ্রগড়ের নিকটবর্ত্তী। রাজা দুরাচার দেবসিংহকে তথায় নিমন্ত্রণ করিলেন। ইন্দ্রগড়াধিপতি পুত্র-পৌত্রের সহিত রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মন্দভাগ্য দেবসিংহ সবলে নিহত হইল; সেই সঙ্গে তাহার বংশও নির্ম্মূল হইল। তাহাদের শবদেহ হ্রদগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। হতভাগ্যের ভ্রাতার করে ইন্দ্রগড় প্রদানপূর্ব্বক উমেদ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

উমেদ হতভাগ্য দেবসিংহের দুরাচরণের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় তদবধিই বিচলিত হইল। সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিল, দুশ্চিন্তার বিষদংশনে তিনি জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই কঠোর চিন্তার দংশন হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৮২৭ সংবতে (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। মুনিব্রতধারণ রাজস্থানে যোগরাজব্রত নামে অভিহিত হয়। যোগরাজব্রত আরম্ভ হইবামাত্র উমেদের একটি কুশপুত্তলি নির্ম্মিত হইয়া প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকারধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। অতঃপর অশৌচের দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে তাঁহার শিশুপুত্র অজিত মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক উমেদ শ্রীজী নাম ধারণ করিয়া পবিত্র কেদারনাথ তীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে পথরের প্রথম রাজা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কলুন ভগবান্ কেদারনাথের অনুগ্রহে উৎকট পীড়া হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। উমেদ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু রাজযোগ্য চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইলে দস্যুতস্করাদির হস্তে নিপতিত হইতে হয়, দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের আবাসভূমির মধ্য দিয়া দুর্গম তীর্থস্থানে গমন করিতে হয়; সুতরাং তিনি রাজযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রসহ সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে তপস্বীর শান্তিভাব, কিন্তু অঙ্গে বীরসাজ। তাঁহার অঙ্গে এত পুরু তুলার সাঁজোয়া পরিহিত হইল যে, সুতীক্ষ্ণ তরবারিও তাহা ভেদ করিতে সমর্থ নহে। অস্ত্রের মধ্যে একটি বন্দুক, একটি ভল্ল, একখানি অসি, একখানি তরবারি এবং এতৎসমুদায়ের কোষাবলী

ও আধার ব্যতীত কয়েকখানি ছুরি, কয়েকটি থলী, একটি অগ্নিচূর্ণাধার শৃঙ্গ, একটি বর্শা, কুঠার, চক্র এবং শরাসন ও শর পূর্ণ বৃহৎ তূণীর। এতগুলি অস্ত্রশস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিয়াও সপ্তভিবর্ষীয় বৃদ্ধ উমেদ অম্লানবদনে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন।

উমেদ স্বীয় কতিপয় তেজস্বী সর্দ্দার সমভিব্যাহারে ভারতের সমগ্র তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গার উদ্ভবস্থান, সীতাকুণ্ডনিচয়, ভগবান্ জগন্নাথদেবের পবিত্র মন্দির, সেতুবন্ধরক্ষক দেবদেব রামেশ্বর এবং দ্বারকাক্ষেত্র প্রভৃতি সমস্ত তীর্থস্থলেই রাজর্ষি উমেদ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে যখন যখন তিনি পিতৃলোকের লীলাভূমি বুন্দিতে প্রত্যাগত হইতেন, তখন হার এবং রাজবারার সমস্ত নরপতিই তাঁহাকে দেখিবার জন্য বুন্দিরাজ্যে উপস্থিত হইতেন। শ্রীজী যদি কাহারও বাটীতে পদার্পণ করিতেন, সে ব্যক্তি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত। তাঁহার বাক্য দৈববাণীস্বরূপ প্রত্যেক রাজপুত কর্তৃক গৃহীত হইত। হারগণ তাঁহার প্রতি দেবতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিত। এই প্রকারে নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া উমেদ সিন্ধুনদপারে সুদূর মাকারণ উপকূলে অগ্নিদেবীর মন্দির পরিদর্শনপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলেন। তথা হইতে বুন্দিরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে ক্যাবা নামক এক দল দস্যু তাঁহার উপর আপতিত হইল। তখন উমেদ বাহুবলের সাহায্যে তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। তাহাদের দলপতি বন্দিরূপে নৃপতি-সমীপে আনীত হইল। সেই দস্যুরাজ আপন নিষ্ক্রয়স্বরূপ এই শপথ করিল যে, আর কখনও সে দ্বারকা-যাত্রীর উপর অত্যাচার করিবে না।

এ দিকে রাজকুমার অজিত অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কাজেই কিছুদিন রাজধানীতে থাকিয়া শ্রীজী স্বীয় পৌত্রের শিক্ষাবিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতে বাধ্য হইলেন। রাজকুমার অজিতের মৃত্যু-বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। "রাও ও রাণা একত্র আহেরিয়া-উৎসবে মৃগয়া-ব্যাপারে বহির্গত হইলে উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইবেই হইবে" শত শত বর্ষ পূর্ব্বে বুমুদার সহমরণোন্মুখ সতীশিরোমণির মুখে এই যে নিদারুণ অভিসম্পাত উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা পদে পদে সফল হইয়াছে। অজিত উহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। বিলৈট (বিলৈচা) নামক সামান্য একটি ভূমিখণ্ড লইয়া এই অনর্থক বিবাদ উপস্থিত হয়। বিলৈচা একটি ক্ষুদ্র পল্লী; কতিপয় মীন তত্রত্য অধিবাসী; উদ্ভিজ্জের মধ্যে কয়েকটি আম্রবৃক্ষমাত্র দৃষ্ট হয়। বুন্দিরাজ অজিত বিলৈচাকে আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনায় অথবা তাহা অন্তর্নিবিষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া গ্রামটির প্রান্তভাগে একটি উচ্চ প্রাকার স্থাপনপূর্ব্বক দস্যুগণের ভয়োৎপাদনার্থ তদুপরি কতিপয় রণবিশারদ বলিষ্ঠ সৈন্য রক্ষা করিলেন।

সেই সময়ে কোন কারণে নৃপাতর উপর মিবারের সর্দ্দারগণের বিরক্তি জন্মিয়াছিল। বৃথা অনর্থকর বিবাদে জড়িত করিয়া কৌতুক দেখিবার অভিলাষে তাহারা কলে-কৌশলে তাঁহাকে বুন্দিরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অতঃপর রাণা স্বীয় সর্দ্দারগণ ও এক দল সৈন্ধবী সেনাসহ সেই ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং অজিতকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অজিত রাণার শিবিরে উপস্থিত হইলে তাঁহার সদ্ব্যবহার দর্শনে গিহ্লোটপতি এরূপ প্রীত হইলেন যে, বিলৈচা ও তত্রত্য আম্রকাননের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। এই সময় আহেরিয়া-পর্ব্ব উপস্থিত। এই সময়েই রাজপুতগণ ভগবতী গৌরীর সমীপে বরাহবলি দিয়া বৎসরের ফলাফল গণনা করেন। রাণার সাদরসম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া অজিত তাঁহাকে বুন্দির অরণ্যাভ্যন্তরে আহেরিয়া উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। মৃগয়ার দিন স্থিরীকৃত হইলে শিশোদীয়নৃপতি

চিরন্তন নিয়মানুসারে স্বীয় সর্দারগণকে সবুজ পাগ্‌ড়ী ও রুমাল বিতরণ করিলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে অশ্বসেনা সহ নন্দতার গিরিগহ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উমেদ সেই সময় তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। পুত্রের মৃগয়াগমন-বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি অজিতকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু অজিত সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দেখিতে দেখিতে মৃগয়ার নির্দিষ্ট দিন সমাগত। রাণা বুন্দিরাজের সহিত সানন্দে মৃগয়াক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। রাণার হৃদয় প্রীতি ও আনন্দে পরিপূর্ণ; কিন্তু রাও অজিতের হৃদয়ে অণুমাত্রও সুখ-শান্তি নাই। সে হৃদয় এক যন্ত্রণাময়ী চিন্তায় আলোড়িত। গতরাত্রে রাণার মন্ত্রী রাও-সদনে আগমনপূর্ব্বক অতি কঠোরস্বরে বলিয়াছিল, "রাও! রাণা আমাকে যে জন্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন্। আপনি বিবৈচা পরিত্যাগ করিবেন ত করুন, নচেৎ তিনি আশু এক দল সেনা পাঠাইয়া দিয়া আপনাকে অবরোধ করিবেন।" এই কয়েকটি কথা শুনিয়া অজিতের হৃদয় মর্ম্মাহত হইয়াছিল। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্য যে কপটী মন্ত্রী তাঁহাকে প্রতারিত করিল, বুন্দিরাজ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। রাণাকে প্রকৃত অপরাধী জ্ঞানে তিনি সে অপরাধের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

মৃগয়াবসানে অজিতসিংহ রাণার সমীপে বিদায় লইয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই আবার তাঁহার সম্মুখে ফিরিয়া আসিলেন। ইচ্ছা যে, সেই স্থলেই তাঁহার সংহারসাধন করেন, কিন্তু রাণা তাঁহাকে পুনর্ব্বার ফিরিতে দেখিয়া মধুরবাক্যে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক কহিলেন, "আসুন, আবার দেখা হইবে?" রাণার সরল সম্ভাষণে পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইল; রাও অভিবাদনপূর্ব্বক আবার প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়াই আবার তিনি ফিরিলেন এবং মহাবিক্রমে অসিহস্তে অসতর্ক রাণার প্রতি ধাবমান হইলেন। সুতীক্ষ্ণ শূল এরূপ অব্যর্থ সন্ধানে শিশোদীয় নৃপতির অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল যে, তাহার শাণিত ফলক তাঁহার দেহ ভেদ করিয়া তদীয় বাহন অশ্বের স্কন্দদেশে প্রবিদ্ধ হইল। আহত রাণা বাণাবিদ্ধ মৃগেন্দ্রের ন্যায় জ্বলন্তনয়নে পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলেন, 'রে হাড়! কি করিলি?" এই বলিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন পাষণ্ড ইন্দ্রগড়সর্দ্দার অসিপ্রহারে সেই মূর্চ্ছিত রাজপুত্রের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক বিশ্বাস-ঘাতকতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। নিষ্ঠুর হাবরাজপুত্র স্বীয় নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না, বরং অধিকতর পুলকিত হইয়া সগর্ব্বে গিহ্লোটের রাজনিদর্শন ছেঙ্গী অপহরণপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল তাহার পৈশাচিক আচরণ আশু উমেদের কর্ণগোচর হইল। তদবধি তিনি আর সেই কুপুত্রের মুখদর্শন করেন নাই।

রাণা ও রাও উভয়েই কিষণগড়পতির দুইটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের একটা নিকটসম্বন্ধ ছিল। যখন দুর্ব্বৃত্ত অজিত রাণার প্রাণবধ করে, তখন একজনমাত্র বিশ্বস্ত রক্ষক তাঁহাকে রক্ষা করিতে উদ্যম করিয়াছিল। অবশিষ্ট সৈন্যসামন্তগণের মধ্যে কেহই সেই ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই। বরং রাণার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া সকলে শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর রাণার একটি উপপত্নী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদনার্থ ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। চন্দনকাষ্ঠে একটি বৃহৎ চিতা সজ্জিত হইল। তখন সতী পতির শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ তরুবরকে সাক্ষী করিয়া পতিহন্তাকে কঠোর অভিশাপ প্রদান করিলেন, "বনস্পতি! তুমি সাক্ষী,

যদি কেহ বিনা অপরাধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার প্রাণনাথের প্রাণবধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে দুই মাসের মধ্যেই যেন সেই পাষণ্ডের সর্ব্বাঙ্গ খসিয়া পড়ে; কিন্তু যদি প্রতিশোধ লইবার জন্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পাপস্পর্শ করিবে না।" সতীর বাক্য অনুমোদন করিবার জন্যই যেন তৎক্ষণাৎ সেই বটবৃক্ষের একটি প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন হইয়া পড়িল, অমনি প্রচণ্ড চিতা ভীমরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত চিতানলে অম্লানবদনে সতীশিরোমণি অচিরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন।

সতীর অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। দুই মাসের মধ্যেই অভিসম্পাত ফলিল। আত্মকৃত পাপের ভীষণ শাস্তিভোগ করিয়া নিষ্ঠুর রাও জীবন-বিসর্জ্জন করিল। তাহার অস্থিপঞ্জর হইতে মাংসরাশি খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। দ্বিতীয় মাস পূর্ণ হইতে না হইতে তাহার পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণবিহঙ্গ পলায়ন করিল।

অজিত একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া লীলাসংবরণ করেন। তাঁহার নাম বিষণসিংহ। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প ছিল। শ্রীজী তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং এক জন সুদক্ষ ধাই-ভাইকে প্রধান মন্ত্রিত্বে স্থাপনপূর্ব্বক আবার তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন; তিনি এবারে চারি বৎসর দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; যত দিন না জরাদোষে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তত দিন তীর্থভ্রমণে ক্ষান্ত হন নাই। অবশেষে রাজযোগী যে দিন সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, সেই দিন কেদারনাথ আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অল্পমতি বিষণসিংহ কতকগুলি দুষ্টলোকের মোহজালে জড়িত হইয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে বলিল, "শ্রীজী পুনরায় রাজসিংহাসনলাভে চেষ্টিত আছেন, অতএব তাঁহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।" কুচক্রীর কি ভীষণ চক্র! উমেদসিংহ সংসার ত্যাগ করিয়া তাপসব্রত অবলম্বন করিলেন, তিনি পৌত্রের মঙ্গলার্থই কেবল মধ্যে মধ্যে বিষয়কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে দেশে প্রত্যাগত হন, তিনি রাজ্যপ্রত্যাশী! আশ্চর্য্যের বিষয়, মূর্খ বিষণসিংহ পাষণ্ডদিগের সেই অমূলক কথাতেই বিশ্বাস করিলেন এবং পিতামহকে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া পাঠাইলেন, "বারাণসীক্ষেত্রে মিষ্টান্ন খাইয়া হরিনাম-মালা জপ করিবেন, রাজ্যে আসিবার আবশুক নাই।" উমেদ নয়া সহর নামক স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, ইত্যবসরে দূত তাঁহার হস্তে বিষণসিংহের সেই পত্র প্রদান করিল। পৌত্রের মূর্খতার পরিচয় পাইয়া তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

বিষণসিংহের মূর্খতা আশু রাজবারার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজপুতগণ তাঁহাকে শত শত ধিক্কার দিয়া রাজর্ষি উমেদকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তৎসমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। উমেদের দেবোপম স্বর্গীয় চরিত্রের বিষয় অনুশীলন করিয়া অম্বরপতি প্রতাপসিংহের হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল। তিনি আপনাকে পুত্র ও ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীজীর নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, "যদি আদেশ হয়, শ্রীপদ দেখিয়া রাজধানীতে লইয়া আসি।" শ্রীজী সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের সহিত অম্বরপতির পূজোপচার অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রণস্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। উমেদ তৎক্ষণাৎ দর্শন দিলেন, উদারমতি প্রতাপসিংহ সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বিনয়গর্ভবাক্যে বলিলেন, "প্রভো! যদি বিন্দুপরিমাণেও বিষয়স্পৃহা আপনার হৃদয়ে জাগরূক থাকে, অনুমতি করুন, এই মুহূর্ত্তেই আমি অম্বরের সমস্ত সেনা লইয়া আপনাকে বুন্দি ও কোটা উভয়রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করি।" শ্রীজী উত্তর করিলেন, "রাজন্! বুন্দি ও কোটা ত এখনও আমারই রহিয়াছে; -দেখুন, একটির সিংহাসনে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, অন্যটিতে আমার পৌত্র

সমারূঢ়।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কোটার জলিমসিংহ মধ্যস্থস্বরূপ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীজীকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বিষণ তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, না বুঝিয়া তিনি কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। অনুতাপাগ্নি তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। লালজী পণ্ডিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি পিতামহ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনুতপ্ত পৌত্রকে দেখিয়া উমেদসিংহ তাঁহার করে আপনার অসি প্রদানপূর্ব্বক স্নেহগর্ভবচনে বলিলেন, "বৎস! তুমি এই অসি গ্রহণ কর, তোমার উপর যদি আমার কোন মন্দ অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা তুমি স্বয়ং শাস্তি প্রদান কর, কিন্তু নরাধমগণকে আমার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে দিও না।" তখন বিষণসিংহ শিশুর ন্যায় চীৎকারস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং পিতামহপদে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাষণ্ড চাটুকারগণ বুন্দিরাজ্য পরিত্যাগ করিল। বিষণসিংহ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু শ্রীজী আর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন না।

অবিরাম কালস্রোতের সঙ্গে আট বর্ষ অতীত হইল। পরমার্থচিন্তায় শ্রীজী দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার চরমকাল উপস্থিত হইল। তখন বিষণসিংহ তৎসকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! চলুন, পিতৃলোকের আবাসগৃহে গিয়া নয়ন মুদিত করিবেন।" উমেদ সম্মত হইলে একখানি শিবিকা করিয়া বিষণ তাঁহাকে পিতৃগৃহে আনয়ন করিলেন। সেই দিন ১৮৬০ সংবতে রাত্রিকালেই পুণ্যময় উদারমতি শ্রীজী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যে দিন শ্রীজী ইহলোক হইতে প্রস্থিত হইলেন, সে দিন ইংরাজগণ সর্ব্বপ্রথম হাবাবতীতে প্রবেশ করেন। রাজপুতের—বিশেষতঃ হারকুলের প্রবলবৈরী দুর্জ্জয় হুলকারকে দমন করিবার জন্য সেই সময়ে মনসন একটি প্রচণ্ড সেনাদল লইয়া তৎপ্রদেশে প্রবেশ করেন। হুলকারের ভীষণ ভ্রূকুটিতে ভীত হইয়া তিনি যে দিন পলায়ন করেন, যে দিন শত্রুকুলের জয়রব তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘোরস্বরে বিকট চীৎকারে প্রবৃত্ত হইল, সেই দিন একমাত্র বুন্দিপতি ভিন্ন আর কোন রাজপুতই তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন নাই। এই কারণে হুলকার বুন্দির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড উদ্যম করিয়াছিলেন। ইংরাজের সাহায্যে হুলকারের বিষদন্ত ভগ্ন হয়। তখন বুন্দিরাজ অপহৃত জনপদ ও নগরগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হন। ইহাতে বিষণসিংহ ইংরাজের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বিপ্লবের সময় বুন্দিনগরপতি বিষণসিংহ ইংরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হন নাই। যে দিন হুলকার ও সিন্ধিয়ার কবল হইতে বুন্দিপতির নগরগুলি পুনরুদ্ধার হয়, সেই দিন তিনি ব্রিটিস এজেন্টের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই আপনাদের, যখন ইচ্ছা আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন।" বুন্দিপতির এইরূপ মহোচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তৎসহ সৌহার্দ্দ-স্থাপন করিয়াছিলেন।

পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিয়া বুন্দিপতি বিষণসিংহ চারি বৎসর পরেই উৎকট বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। মুমূর্ষুকালে তিনি মহিষীগণকে সহমরণে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং স্বীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে মহাবল ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির করে সমর্পণপূর্ব্বক অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

বিষণসিংহ সচ্চরিত্র এবং প্রকৃত রাজপুতনামের যোগ্য। তাঁহার হৃদয় পবিত্র ও তেজস্বী। তিনি মৃগয়া করিতে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু সিংহ ব্যতীত অপর কোন জন্তু শীকার করিতে

ভালবাসিতেন না। অন্যান্য পশুর কথা দূরে থাকুক, তাঁহার হস্তে ন্যূনতঃ শতাধিক সিংহ নিহত হইয়াছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে একটি পদ ভগ্ন হওয়াতে তিনি চিরজীবন খঞ্জ হইয়াছিলেন। জনরব এইরূপ, বুন্দিপতির একটি স্বতন্ত্র তহবিল ছিল। সেই তহবিলে মন্ত্রীকে প্রতিদিন একশত টাকা করিয়া জমা দিতে হইত। যে দিন কোষাধ্যক্ষ আপন কর্ত্তব্যে অমনোযোগ করিতেন, সেই দিন ইন্দ্রজিতের বিকট মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উদ্যত হইত। এই ইন্দ্রজিত একখণ্ড বৃহদাকৃতি উপানৎমাত্র। একটি নাগদন্তে উহা বিলম্বিত থাকিত। কোন মন্ত্রী অপরাধী হইলে রাজা উক্ত অদ্ভুত রাজদণ্ডের সাহায্যে তাঁহাকে দণ্ডিত করিতেন।

বুন্দিতে চারিজন প্রধান কর্ম্মচারী আছেন;—দেওয়ান বা মোসাহেব, ফৌজদার বা কিল্লাদার, বকসী ও রসালা। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীই দেওয়ান নামে কথিত। ইনি রাজকার্য্য পরিচালনা করেন; আয়ব্যয়গণনার ভারও ইঁহার হস্তে অর্পিত; ফৌজদার দুর্গাধ্যক্ষ; রাজার ধাইভাই কিংবা রাজসংসারের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; দুর্গরক্ষণ, সামন্তসমিতির বা বেতনভোগী সেনার পালন ও নায়কত্বভার তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত। তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কতকগুলি ভূমিবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকে। সাধারণ হিসাবপত্রের ভার বকসীর প্রতি অর্পিত। রসালা রাজপরিবারের আয়ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন।

রাজা বিষণসিংহের দুই পুত্র;—রামসিংহ ও গোপালসিংহ। যে সময়ে পিতার মৃত্যু হয়, রামসিংহ তখন একাদশবর্ষীয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গোপালসিংহ তাঁহা অপেক্ষা দুই চারি মাসের কনিষ্ঠ। পিতার ন্যায় রামসিংহও মৃগয়ানিপুণ ছিলেন।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে বুন্দিরাজ্য শোচনীয় দশা হইতে পুনর্ব্বার মস্তক উন্নমিত করিতে লাগিল। আবার সেই পুণ্যশীল রাজগণের পবিত্র রাজ্য শনৈঃ শনৈঃ গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। স্বদেশপ্রেমিক উদারমতি শ্রীজীর পরলোকগমন ও বিষণসিংহের মৃত্যু এবং তৎপুত্র রামসিংহের সিংহাসনারোহণের সহিত বুন্দির ইতিবৃত্তও পরিসমাপ্ত হইল।

চৌহানদিগের বংশপত্রী

জয়পাল — হর্ষপাল

অজয়দেব — বিজয়দেব — উদয়দেব

সোমেশ্বর — কণরায় — জৈতগেলদেব

জৈতগেলদেব → ঈশ্বরদাস
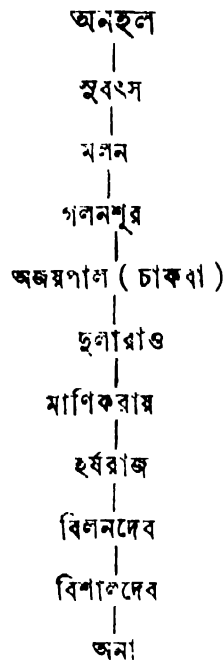
সোমেশ্বর → পৃথ্বীরাজ → রণসিংহ

কণরায় → চাহিরদেব → বিজয়রাজ → লক্ষ্মণসিংহ

অনহলই প্রথম চৌহান, ইঁহার অপর নাম অগ্নিপাল। বিক্রমের ৬৫০ বর্ষ পূর্ব্বে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি কাঙ্কান, গোলকুণ্ড ও আসির জয় করেন। মকাবতী নগরী ইঁহার প্রতিষ্ঠিত. ইঁহার রাজত্বসময়েই তক্ষকেরা ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিল। মলন হইতেই মালিনীকুলের উদ্ভব হইয়াছে। ৭৫১ সংবতে যখন ভারতে যবন আক্রমণ হয়, সেই সময়ে চুলারাও সমরে আত্মবিসর্জ্জন করেন। মাণিকরায় সম্ভর স্থাপন করাতে তদীয় বংশধরেরা সম্ভরী রাও নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহম্মদ গজনন যখন অজমীর আক্রমণ করেন, তখন বিলনদেব তাঁহার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন ; ইঁহারই অপর নাম ধর্ম্মগজ। অজমীরে অদ্যাপি অনাসাগর নামে যে সরোবর আছে, অনা তাহার প্রতিষ্ঠাতা। অজয়দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সোমেশ্বরের সহিত অনঙ্গপালকন্যা রুকা-বাইয়ের বিবাহ হয়। অজয়দেবের পৌত্র ঈশ্বরদাস ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৪৯ সংবতে শাহাবুদ্দীনের হস্তে পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হয়। লক্ষ্মণসিংহ একবিংশতি পুত্রের পিতা ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়

—— ❋ ——

বুন্দি হইতে কোটার স্বাতন্ত্র্যলাভ, মধুসিংহ, রাজা মুকুন্দ, জগৎসিংহ, পরমসিংহ,
কিশোরসিংহ, রামসিংহ, তাঁহার নিধন, ভীমসিংহ, ভীলাধিপ চক্রসেন,
নিজাম-উল-মুলুককে ভীমের আক্রমণ এবং মৃত্যু, রাও অর্জ্জুন, অন্তর্বিবাদ,
শ্যামসিংহের মৃত্যু, দুর্জ্জনশাল, মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব, রাজা হেমন্তসিংহ,
জালিমসিংহ, দুর্জ্জনশালের মৃত্যু, মহারাও অজিত, রাও চত্রশাল,
বাতোয়ারের যুদ্ধ, রাজা জালিমসিংহ, চত্রশালের মৃত্যু।

পূর্ব্বে কোটা ও বুন্দি এক সমরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শাজিহানের রাজত্বকালে উহা পরস্পর ভিন্নভাবে বিভক্ত হয়। রাও রত্নের দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহ যখন বুরহানপুর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সংগ্রামে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করেন, সম্রাট সেই সময়ে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার করে পুরস্কারস্বরূপ কোটারাজ্য সমর্পণ করেন। তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হয়। বুর-হানপুর-যুদ্ধের সময় মধুসিংহের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবর্ষমাত্র। তৎকালে কোটারাজ্যে বর্ষে বর্ষে দুই লক্ষ টাকা আয় উদ্ভূত হইত। সর্ব্বসমেত তিন শত বাহাত্তর নগরে এই রাজ্য সংগঠিত ছিল। বুন্দি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মধুসিংহ মহাগৌরবে ধর্ম্মানুসারে কোটারাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে কোটারাজ্য উজলা-জাতীয় কোটীয়া ভীলগণের অধীনে ছিল। তখন প্রাচীন কৈলগড় উহার রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সে রাজধানী একটি সামান্য দুর্গমাত্র। কোটীয় ভীলগণের অধিপতি ঐ দুর্গে বাস করিত। হারবংশের অধিকৃত হইলে দিন দিন কোটা উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল; মধুসিংহ হইতে এই রাজ্য সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে চম্বলতীরবর্ত্তী সুলতানপুর, পূর্ব্বে পরগণের অধিকৃত মাঙ্গরোল ও রাঠোরাধিকৃত নাহরগড়, দক্ষিণে খীচিগণের অধিকৃত গাগরোণ ও ঘাটোল্লী এবং পশ্চিমে পর্ব্বতমালা। এই রাজ্যে অনেকগুলি স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী প্রবাহিতা হইতেছে।

মধুসিংহের শাসনগুণে ও অদম্য উদ্‌যোগে অল্পদিনের মধ্যেই তদীয় রাজ্য মালব ও হারাবতীর মধ্যস্থিত বিশালগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। অতঃপর ১৬৮১ সংবতে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ;—মুকুন্দসিংহ, মোহনসিংহ, জুজারসিংহ, কানাইরাম ও কিশোরসিংহ। এই পাঁচটি পুত্র কোটার জায়গীরস্বরূপ পাঁচটি ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কোটা, দ্বিতীয় পোলৈটা, তৃতীয় কোটারা ও রামগড় রিলাবন, চতুর্থ কোইলা ও দেওগুয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গোদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর মুকুন্দসিংহ কোটার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইঁহার নামানুসারেই হারাবতী ও মালবের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য কূটপথ মুকুন্দারা নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজা মুকুন্দ অনেকগুলি দুর্গ, অট্টালিকা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুকুন্দারা-গিরিবর্ত্ম হতভাগ্য কর্ণেল মনসনের পতনকূপ। পর্ব্বতপথেই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরাভূত হইয়া লজ্জাবনতবদনে কোটাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

যে দিন পিতৃদ্রোহী পাষণ্ড আরঙ্গজেব বৃদ্ধ শাজিহানকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হয়, সেই দিন যে সকল রাজপুত নৃপতি সম্রাটের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, রাঠোর ও হারগণই তন্মধ্যে প্রধান। মধুসিংহের পঞ্চপুত্রও সেই সময়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই ভীষণযুদ্ধে এই পঞ্চভ্রাতা যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। মহাসমরের অভিনয় হইতেছে, এমন সময় পঞ্চরাজপুত্র হারকুলের সৈন্যসামন্তসহ পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া সেই ভয়াবহ সমররঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। "হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা বীরের ন্যায় রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিব," পঞ্চভ্রাতাই এই মন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু বিধির বিধানে পিতৃদ্রোহী আরঙ্গের মস্তকেই জয়মুকুট উত্থাপিত হইল। রাঠোররাজ যশোবন্তসিংহের অবিমৃশ্যকারিতায় বৃদ্ধ শাজিহান পরাজিত হইলেন বটে, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সেই পঞ্চহার-বীর রণভূমি হইতে পদমাত্রও অপসৃত হইলেন না। তাঁহারা বীরের ন্যায় আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর চারি ভ্রাতা রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন, কনিষ্ঠ কিশোরসিংহ গুরুতর আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে পুঞ্জীকৃত শবদেহের মধ্য হইতে তাঁহার দেহ বহিষ্কৃত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন।

মুকুন্দ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র জগৎসিংহ কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, সম্রাটের অনুগ্রহে তিনি দুই সহস্রের মনসবপদ প্রাপ্ত হইলেন। মোগলের অধীনে দক্ষিণাবর্ত্তে তাঁহাকে বিষয়কার্য্যে পরিলিপ্ত থাকিতে হইল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন; ১৭২৬ সংবতে তিনি লীলাসংবরণ করেন।

অতঃপর কৈলার কানাইরামের পুত্র পরমসিংহ কোটার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকর্তৃক সুচারুরূপে রাজ্যশাসন না হওয়াতে সর্দ্দারগণ ছয়মাস পরেই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে কিশোরসিংহকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। অকর্ম্মণ্য পরমসিংহ কৈলানগরে প্রত্যাগত হন। আরঙ্গজেব যখন ভারতের সিংহাসন অধিকার করেন, কিশোর তখন দক্ষিণাবর্ত্তে মোগলকুলের জয়লাভার্থ মহাসংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারই অমিত বাহুবলে বিজাপুর বিজিত হয়। বিজাপুরজয়ের পর তিনি আরকগড় জয় করিতে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু সেই স্থানেই ১৭৩২ সংবতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। কিশোরসিংহকে অসংখ্যবার সমরসাগরে অবতরণ করিতে হইয়াছিল; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পঞ্চাশটি অস্ত্রচিহ্ন তদীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিত।

কিশোরসিংহের তিন পুত্র;—বিষণসিংহ, রামসিংহ ও হরনটসিংহ। পিতার সহিত দক্ষিণদেশগমনে অসম্মতি প্রকাশ করাতে কিশোর ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণকে অগ্রজস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। পিতার নিকট ভূমিবৃত্তিস্বরূপ অন্তা এবং তত্রত্য প্রাসাদ মাত্র তিনি প্রাপ্ত হন।

রামসিংহ পিতার আসন্নকাল পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি পিতার ন্যায় রণদক্ষ, বুদ্ধিমান্, সুচতুর ও সাহসী। যে

সময় ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লইয়া আরঙ্গজেবের পুত্রগণের মধ্যে ঘোর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়, হারবীর রামসিংহ তখন আজিমের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সগোত্রীয় বুন্দিরাজ তাঁহার প্রতিকূলপক্ষে দণ্ডায়মান হন। হারের অসি হারের প্রতিকূলে উদ্যত; কোটা বুন্দির সর্ব্বনাশসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৭৬৪ সংবতে জাজৌক্ষেত্রে এইরূপে একটি ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। সেই প্রচণ্ডসমরে কোটারাজ রামসিংহ মহাবিক্রমে শত্রুসেনা মথিত করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি গোলকাঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

অতঃপর ভীমসিংহ কোটার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ফিরক্শিয়রের অভিষেক-সময়ে পাষণ্ড সৈয়দদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাহারা তাঁহাকে পঞ্চসহস্রের সেনাপতিপদে বরণ করিল। তদবধি কোটা প্রথমশ্রেণীর রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হয়, তৎপূর্ব্বে তৃতীয়শ্রেণীর রাজ্যমধ্যে গণনীয় হইত। বুন্দিরাজ সৈয়দদ্বয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়াতে ভীমসিংহ তৎপ্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। জাজৌক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, ক্রমশঃ সেই বিবাদ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বুধসিংহের সংহারার্থ ভীমসিংহ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন; এমন কি, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি কাপুরুষের ন্যায় অসতর্ক বুধসিংহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া প্রভুর মনস্তুষ্টিসাধন করাতে তিনি নূতন নূতন ভূমি লাভ করিতে লাগিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে তিনি কোটা ও আহিরাবারার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইলেন। সেই সুবিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে খীচিগণের ও বুন্দির অনেক অংশ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই প্রকারে গাগরোণ, মো-মাইদানা, শিবগড়, বারা, মাঙ্গরোল, বারোদ এবং অন্যান্য সামান্য অনেকগুলি ভূভাগ তাঁহার হস্তগত হইল।

চারাবতীর দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী নিবিড় পর্ব্বতগহনের অনেক স্থান এই সময় উজলা-ভীলগণের অধিকৃত ছিল। তাহাদের রাজা চক্রসেন মনোহরথানা নামক নগরীতে অবস্থিতি করিত। ভীলপতি চক্রসেনের অধীনে পঞ্চশত অশ্বারোহী এবং অষ্টশত ধানুষ্ক সৈন্য নিযুক্ত ছিল। ভীলেরা ধারানগরীর ভোজরাজের অধিকারকাল হইতে এত দিন স্বাধীনভাবে দিনপাত করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কোটাপতি ভীমসিংহ তাহাদিগকে সেই প্রাচীন বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। অসংখ্য ভীল তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

ভীমসিংহের ন্যায় রাজভক্ত অতি বিরল। রাজার আজ্ঞায় তিনি প্রিয়তম বন্ধুকে ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রসিদ্ধ নিজাম উল মুলুক যখন রাজধানী হইতে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন, অম্বরপতি জয়সিংহ সম্রাটের প্রতিনিধিরূপ হইয়া কোটাপতি ভীমসিংহ এবং মারবাররাজ গজসিংহকে তখন আজ্ঞা করিলেন, "খিলিজি খাঁর পথরোধপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া আন।" নিজাম কোটাপতির পরমবন্ধু, বিশেষতঃ উভয়ে পরস্পরের উষ্ণীষ বদল ভাই। ইতিপূর্ব্বে খিলিজি খাঁ ভীমের নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তদীয় সবলবন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া নিজাম হাররাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "প্রিয়সুহৃদ্! জয়সিংহের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক অতি বিরল। আমি রাজসরকার হইতে একটি কপর্দ্দকমাত্রও অপহরণ করি নাই। আপনি আমার পরম সুহৃদ্, অতএব এ সময়ে আমার পথরোধ করা অথবা আমাকে বিপন্ন করা আপনার ন্যায় পরম বন্ধুর কার্য্য নহে।" ধর্ম্মভ্রাতার পত্র পাঠ করিয়া রাজভক্ত ভীমসিংহ উত্তর করিলেন, "সুহৃদ্বর! কর্ত্তব্য ও বন্ধুত্বের মধ্যে কোন্‌টি গুরুতর, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; কর্ত্তব্যপালনই রাজপুতের ধর্ম্ম। আপনার পথরোধ করিতে সম্রাট্ আমাকে অনুমতি

করিয়াছিলেন ;—আমি তাহা করিব এবং সেই উদ্দেশ্যেই এতদূর অগ্রসর হইয়াছি ; অতএব অধুনা যুদ্ধ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আপনার সৈন্যসামন্ত আছে, অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব নাই ; এখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পথ পরিষ্কার করিবেন। আগামী কল্য প্রত্যূষে আমি আপনাকে আক্রমণ করিব।" এই সরলতাপূর্ণ পত্র পাইয়া নিজাম সাবধান হইলেন এবং কুর্বাই ভোয়োশো নগরের নিকটস্থ সিন্ধুনদীর পুলিনবর্ত্তী একটি অসম ভূভাগের মধ্যে নিজ সৈন্যসংরক্ষণপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যতরুসমূহের অন্তরালে কামান সজ্জিত করিয়া রাখিলেন পরদিন প্রভাতে রাজা ভীমসিংহ অহিফেনরস সেবনপূর্ব্বক সামন্তগণকে সজ্জিত হইতে অনুমতি করিলেন। আশু সকলেই সুসজ্জিত হইয়া হারকুলের বিশাল পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হইল। অতঃপর কোটারাজ রণমাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক সমবেত সেনাদল লইয়া শত্রুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অচিরেই সমস্ত সেনা সেই জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হইল। ভীমসিংহ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে নিজামের রণপিপাসা সেই সিন্ধুনদীর জলেই বিসর্জ্জিত হইত. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভীমসিংহ চতুর মুসলমানবীরের বলাবলের বিষয় একবার চিন্তাও করিলেন না ; সেই বনমধ্যে যে কামানাবলী গোপনে সজ্জিত আছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যেমন তিনি সদলে সেই জঙ্গলের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি বজ্রনাদে আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ গর্জ্জিত হইয়া উঠিল ; হার ও কুশাবংসেনার উপর উপর্য্যুপরি রাশি রাশি জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জ পতিত হইতে আরম্ভ হইল ; হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। ভীমসিংহ ও গজসিংহ অচিরেই সেই অনলযুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহাদের সেনাদল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। খিলিজার পথ নিষ্কণ্টক ও পরিষ্কৃত হইল।

হারকুলের রাজাই যে কেবল এই ভীষণ সমরে দেহত্যাগ করিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদের কুলদেবতা ব্রজনাথজীও চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইলেন। এই দেবপ্রতিমা স্বর্ণময়ী। প্রত্যেক সংগ্রামেই হাররাজ ইঁহাকে স্বীয় বাহনের উপর স্থাপনপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হইলেই হারসেনা "জয় ব্রজনাথজী" এই উন্মত্তরবে রণভূমি কম্পিত করিয়া বিকট উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। হারকুলের অধিষ্ঠাতা ভগবান্ ব্রজনাথজীর পবিত্র স্বর্ণমূর্ত্তি সেই রণভূমে শোণিতাক্ত হইয়া কোথায় যে অন্তর্হিত হইল, কেহই তাহা নিরূপণ করিতে পারিল না। এই ঘটনার বহুদিন পরে হারগণ তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হয়। তখন কুলদেবতা আবার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত হইলেন।

১৭৭৬ সংবতে (১৭২০ খৃষ্টাব্দে) কোটারাজ ভীমসিংহের মৃত্যু হয়। তিনি পঞ্চদশবর্ষ রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। রাজা ভীমের বিদ্বেষবশতঃ ঢোলপুরের রণভূমে বুন্দি ও কোটার মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহাতে বুন্দির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। সত্যধর্ম্মরাজ বুধ অম্বরপতির নিষ্ঠুরতায় নগর হইতে প্রস্থিত হইলে ভীমসিংহ বুন্দি আক্রমণ করেন। তৎকর্ত্তৃক হারকুলের বৈজয়ন্তী ও অন্যান্য রাজনিদর্শন অপহৃত হয়। বুন্দির প্রাচীন রণশঙ্খ পর্য্যন্ত তিনি হরণ করিয়া কোটানগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারসাধনে অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; সকল প্রকার চাবী প্রস্তুত করিয়া অনেকে সেই সকল দ্রব্য পুনর্লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীমসিংহের সতর্কতাবশতঃ কেহই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে নাই। তদবধি সূর্য্যাস্তের পরই কোটার সিংহদ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে।

কোটার নরপতির মধ্যে রাজা ভীমসিংহই সর্ব্বপ্রথমে পাঁচহাজারী মনসবিপদে অধিরোহণ করেন। মিবারের রাণা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে মহারাও উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বুন্দির রাও

গোপীনাথের পূর্ব্বে তত্রত্য হারগণ আপজী উপাধি ধারণ করিতেন, তৎপরে ইন্দ্রশাল জয়পুরে গিয়া রাণা সমীপে মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি বুন্দির উপসামন্তগণ আপজী শব্দে অভিহিত হন।

ভীমসিংহের তিন পুত্র;—অর্জ্জুনসিংহ, শ্যামসিংহ ও দুর্জ্জনশাল। পিতার মৃত্যুর পর অর্জ্জুন কোটার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া চারি বৎসর রাজত্বের পরেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। ঝালাসিংহের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহারাও অর্জ্জুনসিংহ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তদীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। হারসামন্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষসমর্থন করিবার জন্য রণভূমে অবতীর্ণ হইলেন। অচিরেই একটি সংগ্রামের আয়োজন হইল। শ্যামসিংহ সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন; দুর্জ্জনশাল শ্যামসিংহের শবদেহের উপর পতিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুরাকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "যদি আমার জ্যেষ্ঠ পুনর্জ্জীবিত হন, তাহা হইলে আমি এখনই এ ছার রাজ্য পরিত্যাগ করিব।" এই বিপ্লবের সময় রামপুর, ভানপুর ও কালাপিট নামক তিনটি জনপদ কোটারাজের হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

১৭৮০ সংবতে (১৭২০ খৃষ্টাব্দে) দুর্জ্জনশাল কোটার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে তৈমুরের শেষ অযোগ্য বংশধর দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ ভারতের সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাট্ নিজ সভাতলে আনয়নপূর্ব্বক দুর্জ্জনকে অভিষিক্ত করিলেন। সম্রাটের সম্মুখে রাজযোগ্য খিলাত লইবার সময় দুর্জ্জনশাল তৎসমীপে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, কালিন্দীর যে যে তীরে হিন্দুগণ অবস্থিতি করিবে, তথায় কেহ যেন গোহত্যা করিতে না পায়। উদারহৃদয় মহম্মদ শাহ তৎক্ষণাৎ কোটারাজের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়বীর বাজিরাও এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয়সেনা সহ সর্ব্বপ্রথম হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলেন; ইহার পূর্ব্বে তিনি তারুজ নামক কূটপর্ব্বতবর্ত্ম দিয়া গমন করেন এবং যবনাধিকৃত নাহরগড় আক্রমণ ও জয় করিয়া দুর্জ্জনশালের করে তাহা প্রদান করিয়া যান। সেই সূত্রেই ১৭৯৫ সংবতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত কোটার সর্ব্বপ্রথম বন্ধুত্বস্থাপন হয়। কোটারাজ দুর্জ্জনশাল মহারাষ্ট্রীয়বীর বাজিরাওকে বারুদ ও গোলাগুলী সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিদানস্বরূপ বাজিরাও তাঁহাকে নাহরগড় প্রদান করেন। বন্ধুত্ব-বন্ধন হইল বটে, কিন্তু স্বার্থপর মহারাষ্ট্রীয় কিছু দিন পরেই সেই সৌহার্দ্দ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অম্বরপতি জয়সিংহ ও তৎপুত্র ঈশ্বরসিংহ বুন্দিরাজ বুধসিংহের উপর যে কত অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। ঈশ্বরসিংহ বুধসিংহকে বিতাড়িত করিয়া বুন্দি হস্তগত করেন। অবশেষে কোটারাজ্য অধিকার করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিন জন প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয়সেনানী ও সুরজমলপ্রমুখ জাটগণকে আহ্বান করেন। রাজপুত, জাট ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তিন মাস পর্য্যন্ত সেই বিশালসৈন্য কোত্রী-ক্ষেত্রে অল্প বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক কোটা অবরোধ করিল। নগর অবরুদ্ধ রহিল; কিন্তু অবরোধকারীরা সিদ্ধকাম হইতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা নগরের চতুর্দ্দিকস্থ উদ্যানতরুরাজি নির্ম্মূল করিতে আরম্ভ করিল; একদিন জয় আপ্পা সিন্ধিয়া অনুচরগণ সহ উদ্যান পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে নগর-প্রাচীর হইতে জ্বলন্ত গোলক আসিয়া তাঁহার একটি হস্তের উপর পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার একটি বাহু ছিন্ন হইয়া পড়িল। ভগ্নমনোরথ হইয়া তিনি সদলে নগর ত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

হিমৎসিংহ নামক এক ঝালা রাজপুতের পরামর্শে দুর্জ্জনশাল বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন; সেই ব্যক্তি অসীমসাহসে উৎসাহিত করিয়া দুর্জ্জনের অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। এই

হিমৎসিংহ দুর্জ্জনের অধীনে দুর্গাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিই মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধিবন্ধন-পূর্ব্বক নাহরগড় নগর কোটারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়েই ১৭৯৬ সংবতে জালিমসিংহের জন্ম হয়। এই সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত ভারতের মেকিয়াবেলি। ইঁহার জীবনীই কোটার ইতিবৃত্তের প্রধান অবলম্বন।

কোটাজয় করিতে আসিয়া ঈশ্বরসিংহের অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। এ দিকে অসীমসাহসী দুর্জ্জনশাল উমেদকে বুন্দিরাজ্যে পুনঃস্থাপন করিবার জন্ম সাহায্য প্রদান করেন। পরন্তু হুলকারের সহায়তাবলেই দুর্জ্জন উমেদের রাজ্যোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বৎসরেই ১৮০৫ সংবতে (১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে) কোটার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয়; কোটারাজ মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনতা স্বীকার করেন।

খীচিগণের হস্ত হইতে ফুল-বুরোদী জয় করিয়া দুর্জ্জনশাল গুগোরদুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বলবাদরের প্রচণ্ডবল প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। খীচিবীর বলবাদর আপন দুর্গ দৃঢ়ীভূত করিয়া রামপুর, শিবপুর ও বুন্দির সর্দ্দারগণের সহিত ষড়যন্ত্র করেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে দুর্জ্জনশালের উপর আপতিত হন। সেই সঙ্কটকালে ১৮১০ সংবতে হাররাবীর উমেদসিংহ সাহায্যদানে দুর্জ্জনকে রক্ষা করেন। ইহার তিন বৎসর পরে দুর্জ্জনশালের মৃত্যু হয়।

দুর্জ্জনশাল কোটারাজ্যের সীমা অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুতের সমস্ত উচ্চগুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। মৃগয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিকরী ছিল; এজন্য স্বীয় রাজ্যের প্রতি কোণেই তিনি এক একটি নিবিড় বন রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সকল বনে মৃগয়াসন সজ্জিত থাকিত। মৃগয়াযাত্রাকালে মহিষীগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিতেন। সেই বীরবালারাও বন্দুক ছুড়িতে শিখিয়াছিলেন। বনমধ্যস্থ মৃগয়াবাটিকার উপবিভাগে আরোহণ করিয়া তাঁহারা অব্যর্থসন্ধানে ধাবমান পশু সংহার করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যাস্তের পরই কোটার তোরণদ্বার রুদ্ধ হইত। স্বয়ং রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেও সে রজনীতে আর দ্বার উন্মুক্ত হইত না। একদিন কোন যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাজা দুর্জ্জনশাল কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় কোটার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং প্রহরীকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া দ্বার উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল না। রাজা দুর্জ্জনশাল উচ্চৈঃস্বরে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দিলেন, তাহাতে প্রহরী হাস্য করিয়া উঠিল। অধিকন্তু রাজার অনুনয়-বিনয়ে উত্যক্ত হইয়া "দূর হউক, রাজা রসাতলে যাউক" বলিয়া তৎপ্রতি আপনার বন্দুক উদ্যত করিল। অগত্যা রাজা তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী একটি মন্দিরে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইলে প্রহরিবৃন্দ আপনাদের সহচর প্রমুখাৎ রজনীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতেছে, ইত্যবসরে রাজা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রহরী মনে করিয়াছিল, কোন প্রবঞ্চক রাত্রিকালে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্রতারণা করিতেছিল, কিন্তু প্রভাতে প্রকৃত দুর্জ্জনশালকে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; তখন প্রহরী স্বীয় অসি ও ঢাল রাজার পাদমূলে স্থাপনপূর্ব্বক অবনতশিরে তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উদারমতি রাজা সস্নেহে তাহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার কর্ত্তব্যপালনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় গাত্রস্থ সজ্জা ও কতকগুলি মোহর পারিতোষিক দিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করিলেন।

মিবারের রাণার একটি কন্যার সহিত দুর্জ্জনশালের বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি নিরন্তর মনোদুঃখে দিনপাত করিতেন। অবশেষে চরমকাল উপস্থিত হইলে মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে একদিন তিনি মহিষীকে কহিলেন, "দেবি! জ্যেষ্ঠের শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছি, বোধ হয়, সেই পাপেই বিধি আমার প্রতি বাম হইয়াছেন। বুঝিলাম, সেই কারণেই আমাকে পুত্রধনে বঞ্চিত হইতে হইল। যাহা হউক, আর এখন সময় নাই, এই সময় একটি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী গ্রহণ কর।" তৎকালে বিষণসিংহের পৌত্র অজিত-সিংহ অন্তার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য নিকটবর্ত্তী। অজিতের তিন পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চত্তরশাল সর্ব্বগুণে সমলঙ্কৃত। কোটার মহিষী তাঁহাকেই দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। চত্তরশাল যথানিয়মে মহিষীর অঙ্কে স্থাপিত হইয়া পুরোহিত ও পৌরজনবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পিতৃপুরুষগণের নামাবলী ও গোত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কারণ, তখন তিনি ভীম-সিংহোট রাজা দুর্জ্জনশালের পুত্র চত্তরশাল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত গোত্রাবলী তাঁহার অভ্যস্ত হইল।

প্রজাবৃন্দ চত্তরশালকে ভাবী অধীশ্বর বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু মহারাজ দুর্জ্জনশালের মৃত্যুর পর তাঁহার ঝালা ফৌজদার হিমৎসিংহ উত্তরাধিকারিত্ববিধি পরিবর্ত্তিত করিলেন। চত্তর-শালের জন্মদাতা পিতা অজিতসিংহ তখনও জীবিত। চত্তরশালের অভিষেকের বাধা দিয়া হিমৎ সিংহ কহিলেন, "পুত্র রাজা হইবে, পিতা তাহার আদেশ বহন করিবেন, ইহা নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। অজিতসিংহের জীবদ্দশায় চত্তরশাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না।" অজিতের নিকট অচিরে দূত প্রেরিত হইল।—অজিত তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি কালিন্দীতীরবর্ত্তী শাণ্ডদুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে তিনি সম্মত হইলেন না; কিন্তু দুর্গরক্ষক ছাড়িবার লোক নহেন, সুতরাং অগত্যা বৃদ্ধ অজিতকে শেষে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। অশীতিপর বৃদ্ধ অজিত কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু রাজ্যাভিষেকের সার্দ্ধদ্বিবৎসর পরেই তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। অজিতের তিন পুত্র;—চত্তরশাল, গোমানসিংহ ও রাজসিংহ।

অনন্তর চত্তরশাল হারকুলের মহারাও নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব্বে প্রথিত ঝালা হিমৎসিংহ প্রাণবিসর্জ্জন করাতে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জালিমসিংহ ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অম্বরের সিংহাসন এই সময় মধুসিংহের অধিকারে ছিল। কাপুরুষ ঈশ্বরীসিংহের আত্মহত্যার পর তিনি কুশাবহকুলের শাসনদণ্ড লাভ করেন। দুর্নীতি ও পাশবী স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তিসাধনার্থ কোটা অধিকার করিতে গিয়া ঈশ্বরীসিংহ যে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিদিত থাকিয়াও মধুসিংহের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল না। তিনি অধর্ম্মকে মস্তকে ধারণ করিয়া কোটার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরবসময়ে বুন্দি ও কোটার রাজগণ অম্বরের নৃপতি-দিগের অধীনে রণভূমে রাজাজ্ঞা বহন করিতেন। মধুসিংহ হারকুলের উপর কুশাবহ রাজগণের সেই কর্ত্তৃত্ব স্বীয় স্বার্থসাধনের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আজি চত্তরশালের উপর আস্থা-স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মোগলকুল এখন নিষ্প্রভ, কুশাবহকুলেও আর মহাপ্রতাপ জয়সিংহ নাই; তবে কেন হাররাজগণ আজি তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণের নিকট অধীনতা স্বীকার করিবেন?

১৮১৭ সংবতে (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে) অম্বরপতি মধুসিংহ হারগণের উপর নিজ আধিপত্য-পরি-স্থাপনার্থ কুশাবহকুলের সৈন্যসামন্তগণকে একত্র করিলেন। আহ্মদশাহ আবদাল্লার ভীষণ আক্রমণে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে; এখন রাজপুতগণ স্বাধীন; এখন আর প্রতিপদে মহারাষ্ট্রের আজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় না।

মধুসিংহ সসৈন্যে হারাবতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে উমিয়ারা নামক নগর জয় করিয়া তিনি অম্বরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। অতঃপর দাক্ষিণীদিগের অধিকৃত নাথৈড়ী নগর আক্রান্ত হইল। হতদর্প নিস্তেজ মহারাষ্ট্রীয়গণ মধুসিংহের আক্রমণ-প্রাতরোধে সমর্থ না হইয়া পলায়ন করিল; সুতরাং উহা বিজয়ী অম্বরপতির অধিকৃত হইল। এই প্রকারে নূতন নূতন জয়লাভে উল্লসিত হইয়া মধুসিংহ চম্বলের সঙ্গমস্থল পল্লীঘাটে নদী পার হইলেন এবং প্রচণ্ডবিক্রমে সুলতানপুর আক্রমণ করিলেন। সুলতান-সর্দ্দার তখন পাল্লীঘাট রক্ষা করিতেছিলেন। অম্বরসেনা অলক্ষিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; এক্ষণে মস্তকপার্শ্বে শত্রু দেখিয়া সদলে দুর্গের বহির্ভাগে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। উভয়দলে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল; হার-সর্দ্দার রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন।

বিজয়মদে উন্মত্ত হইয়া অম্বরসেনা কোটার মধ্য দিয়া বাতোয়ারো নামক স্থানে উপস্থিত হইল। মধুসিংহ ভাবিয়াছিলেন যে, কোন হারবীরই তাঁহার বিজয়িনী সেনার সম্মুখীন হইবে না; কিন্তু বাতোয়ারোক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি দেখিলেন, মহাবল পঞ্চসহস্র হার দলবদ্ধ হইয়া প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অম্বরসেনার সংখ্যা অধিক, কিন্তু হারগণ তদ্দর্শনে নিরুৎসাহ না হইয়া স্বদেশরক্ষার্থ রণস্থলে অবতীর্ণ হইল; দেখিতে দেখিতে হার ও কচ্ছাবহে তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অম্বরপতির অশ্বসেনা প্রচণ্ডবেগে পঞ্চসহস্র হারসেনাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু একটিমাত্র হারবীরের চরণ টলিল না। পঞ্চসহস্র হারবীরও অটল, অকম্পিতপদে দণ্ডায়মান রহিল। তাহাদের প্রহরণনিক্ষেপে শত শত কুশাবহতুরঙ্গ রণভূমে নিপতিত হইতে লাগিল। ক্রমে যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল। অম্বরের বিশালবাহিনীর ভীমবিক্রমে তখন হারসেনা ক্রমে ক্রমে টলিতে আরম্ভ করিল;—ইত্যবসরে জালিমসিংহ স্বায় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অধীনস্থ সৈন্যগণকে প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত করিলেন। হারসেনা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অম্বরবাহিনী পরাভূত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

অতঃপর বহুসংখ্যক কচ্ছাবহ বন্দিরূপে কোটানগরে আনীত হইল। অম্বরের পঞ্চরঙ্গিণী পতাকা বীরকেশরী চম্বরপালের অধিকৃত হইল। হারাবতীর ভট্টকবি বাতোয়ারো-যুদ্ধে জালিমের যশোগান করিয়াছিলেন;—

"জঙ্গ বাতোয়ারো জিতা
তারা জালিম ঝালো,
রঙ্গ এক রঙ চারা
রঙ পঞ্চ রঙ কা"

অর্থাৎ বাতোয়ারোর রঙ্গভূমে ঝালা জালিমের তারাই জয়ী হইল। সেই রঙ্গভূমে একমাত্র রঙে অম্বরের পঞ্চরঙ্গিণী পতাকা আচ্ছন্ন হইল।

ইতিপূর্ব্বে কুশাবহরাজগণ মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া যে হারাবতীর উপর আপনাদের প্রভুত্বস্থাপন করিতে অগ্রসর হইতেন, সেই দিন হইতে তাহা রহিত হইল; সেই দিন হইতে অম্বরপতির সেই অযথাবাদীর পথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, সেই দিন হইতে উৎসবসময়ে হারগণ একটি অম্বরদুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলেন।

এ মহান্ জয়লাভের অল্পদিন পরেই মহারাও চত্বরশাল লীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই, সুতরাং তদীয় ভ্রাতা গোমানসিংহ ১৮২২ সংবতে কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোমানসিংহ, জালিমসিংহ, মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ, বুকৈনীবিপ্লব, সুকিতের সেনাসংহার, টীকাডোর, কৈলবারাজয়, রক্ষকের সঙ্কট, চক্রোদিগের নিধন, হারসর্দ্দারের নির্ব্বাসন, মোশাঁই সর্দ্দারের ষড়্‌যন্ত্র, মোশাঁই সর্দ্দারের প্রাণসংহার, চক্রে মহারাওয়ের ভ্রাতৃগণের সংস্রব, তাঁহাদের কারারোধ ও মৃত্যু, রাজপ্রতিনিধির জীবনের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র, স্ত্রীলোকের ষড়যন্ত্র, জালিমসিংহের সতর্কতা।

রাজপুত শরীরে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, গোমান তৎসমস্ত গুণেই বিভূষিত ছিলেন। তিনি যেমন উৎসাহী, সাহসী ও বীর্য্যবান্, তদ্রূপ রণবিশারদ ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। যখন পিতৃপুরুষগণের রাজগদী প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি পূর্ণযুবা। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পরেই দক্ষিণ-প্রদেশ হইতে প্রবল বৈরী ধূমকেতুর ন্যায় মন্থরগতিতে রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু গোমানসিংহ তাহার পূর্ণ উদয় দেখিতে পান নাই। অল্পদিনের মধ্যেই সেই যুবাবীর ভবলীলা সংবরণ করিলেন। মহারাও গোমানসিংহ স্বীয় পুত্রের হস্তে কোটার শাসনভার অর্পণপূর্ব্বক কৃতান্তের আদেশপালনে তৎপর হইলেন।

এই স্থানে জালিমসিংহের জীবনী বিশেষ আলোচ্য। এই জালিমসিংহের জীবনী লইয়াই কোটার ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। রাজস্থানের প্রত্যেক রাজ্যের ইতিবৃত্তেই জালিমের অনুপম চরিত্র আছে। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তিনি রাজপুতানার বিশাল রঙ্গভূমে অসংখ্য অসংখ্য বিস্ময়কর অলৌকিক ব্যাপারের অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৭৯৭ (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) জালিমের জন্ম হয়। ঝালাগোত্রে ইঁহার জন্ম। তাঁহার জন্মবর্ষে দুর্দ্ধর্ষ নাদির শা স্বীয় বিজয়িনী সেনাসহ ভারতক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং তৈমুরের বংশতরুমূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করিয়া মোগলশাসনের শেষ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু হিন্দুবৈরী দুর্দ্দান্ত আরঙ্গজেবের

অত্যাচারে যদি মোগলবংশের মূলদেশ ছিন্ন না হইত, তাহা হইলে নাদির তত শীঘ্র সফলকাম হইতে পারিতেন না। দিল্লীর সিংহাসনে এই সময় মহম্মদ শা অধিরূঢ় ছিলেন; কোটার রাজাসনে মহাপ্রতাপ বীরকেশরী দুর্জ্জনশাল সমাসীন।

ঝালাবার নামক জনপদের অন্তর্গত একটি নগরের নাম হলবুদ। ঝালাবার সৌরাষ্ট্রীয় প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট। জালিমসিংহের পিতৃপুরুষগণ এই হলবুদে অবস্থিতি করিতেন; ঐ নগর তাঁহাদের ভূমিবৃত্তিস্বরূপ ছিল। ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লইয়া যে সময়ে আরঙ্গজেবের পুত্রগণের মধ্যে বিষম অন্তর্বিপ্লব সমুত্থিত হয়, হলবুদের তদানীন্তন সর্দ্দারের কনিষ্ঠ পুত্র ভাওসিংহ তখন কতিপয় অনুচরসহ একটি সেনাদলে নিবিষ্ট হন। তাঁহার পুত্র মধুসিংহ কোটায় আসিয়া মহারাজ ভীমের আশ্রয়গ্রহণ করেন। মধুসিংহের সহিত তৎকালে পঞ্চবিংশতিমাত্র অশ্বারোহী ছিল। তথাপি ভীমসিংহ তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শনে ঘৃণা না করিয়া তদীয় ভগিনীর সহিত আপন পুত্র অর্জ্জুনের বিবাহ দিলেন। এই সম্বন্ধবন্ধনের কিয়দ্দিবস পরেই কোটাধীশ্বর মধুসিংহের হস্তে নন্দতা নামক বিষয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে দুর্গাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজকীয় সেনার অধিনায়কত্ব ভিন্ন দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের রক্ষণভার তখন ফৌজদারের করে অর্পিত ছিল। মধুসিংহ এই সকল কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন। রাজসরকারে মধুসিংহের একটু প্রভুত্ববৃদ্ধি হইল। রাজপুত্রগণ তাঁহাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তদবধি মধুসিংহের উত্তরাধিকারীরা মামা সাহেব নামে প্রথিত হইয়াছেন। মধুসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মদনসিংহ ফৌজদার-পদ প্রাপ্ত হইলেন। মদনসিংহের দুই পুত্র;—হিমৎসিংহ ও পৃথ্বীসিংহ। জালিমসিংহ এই মদনের কনিষ্ঠ আত্মজ পৃথ্বীসিংহের দ্বিতীয় পুত্র। জালিমের জ্যেষ্ঠের নাম শিবসিংহ। শিবসিংহ তাঁহা অপেক্ষা এক বৎসরের জ্যেষ্ঠ।

মধুসিংহের বংশধরেরা উত্তরাধিকারিক্রমে ফৌজদারের পদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মদনসিংহের মৃত্যুর পর হিমৎসিংহ পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। হিমৎ নিঃসন্তান; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জালিমসিংহ একবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহারই উদ্যমে জয়পুরের কবল হইতে কোটারাজ্যের উদ্ধার হয়।

ক্রমে তরুণ ফৌজদারের গুণে সর্ব্বত্রই তাঁহার সুযশ বিঘোষিত হইল; অধিক কি, অন্তঃপুরচারিণী মহিলারাও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইলেন। ইহাতে মহারাও গোমানসিংহের হৃদয় বিদ্বেষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। জালিমের সুখ্যাতি তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া তাঁহার বিবেচনা হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তিনি নন্দতা আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন; সেই পদ ও তদীয় ভূমিবৃত্তি রাজপুত্রের মাতুল বাহুরোটসর্দ্দার ভূপৎসিংহের করে প্রদত্ত হইল। পদচ্যুত ঝালা ফৌজদার মনোদুঃখে কোটা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং একবার রাজবারার অবস্থা ভাবিয়া দেখিয়া স্বীয় গন্তব্যপথ স্থির করিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন যে, অম্বরের দ্বার তাঁহার প্রতিকূলে রুদ্ধ; মারবার তাঁহার পক্ষে দগ্ধ মরুশ্মশানের তুল্য। তখন তিনি মিবারের তদানীন্তন অধীশ্বর রাণা অরিসিংহের নিকট আশ্রয়গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। দৈলবারার ঝালা-সর্দ্দার রাণার প্রধান মন্ত্রণাদাতা। জালিম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দৈলবারাসর্দ্দারের অতুল ক্ষমতা; তিনি তৎক্ষণাৎ জালিমের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। রাণা অরিসিংহ জালিমের গুণের পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি পরম প্রীত হইলেন এবং মিষ্টবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"আপনি যদি আমাকে এই দুর্জ্জয় দৈলবারার কবল হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।" জালিমসিংহ তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং অচিরেই সেই দৈলবারা-সর্দ্দারকে নিপাত করিয়া রাণার অভীষ্টসিদ্ধি করিলেন। পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাণা জালিমকে রাজরা উপাধি ও চিতোরথৈরো নগর ভূমিবৃত্তি প্রদান করিলেন। জালিম এই প্রকারে মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীয় সর্দ্দাররূপে গণনীয় হইলেন। কিন্তু অপ-নৃপতি তখনও ক্ষান্ত হন নাই। অভীষ্টসিদ্ধির অন্য উপায় না পাইয়া তিনি পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়গণের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়-সেনা মিবারের দ্বারদেশে আসিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু অরিসিংহ বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া জালিমের সৎপরামর্শক্রমে একটি বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষে ঘোরযুদ্ধ বাধিল। রাণা পরাভূত হইলেন। অনেক প্রধান প্রধান সর্দ্দারও রণভূমে নিপতিত হইলেন। জালিমসিংহ আহত হইয়া শত্রুকরে বন্দী হইলেন। মিবার-ইতিবৃত্তে ইহা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

জালিম আহত অবস্থায় সেই রণস্থলে পতিত ছিলেন। ত্র্যম্বকজীনামা এক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করে। ত্র্যম্বকজী প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয়বীর অম্বজী ইঙ্গলীয়ার পিতা। ত্র্যম্বকজী সযত্নে জালিমকে স্বীয় শিবিরে লইয়া তাঁহার ক্ষতস্থলসমূহে প্রলেপ প্রদান করিলেন; অল্পকালের মধ্যেই জালিম সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এদিকে উদয়পুর রক্ষা করিতে না পারিয়া রাণা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনতা-স্বীকারে বাধ্য হইলেন। ত্র্যম্বকজীর হৃদয় অতি উচ্চ। তিনি একদিনের জন্যও জালিমের প্রতি বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করেন নাই, তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থদর্শনে ইচ্ছামত স্থানে গমনে অনুমতি করিলেন, নীতি-বিশারদ জালিম তখন পণ্ডিত লালজী বল্লালের সহিত কোটারাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন।

গোমানসিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করেন নাই বটে, কিন্তু সেই তরুণ ঝালাবীরের গুণ তাঁহার হৃদয় অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাঁহাকে পুনর্ব্বার আশ্রয়ে আগত দেখিয়া তিনি তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন,করিলেন না; কিন্তু চতুর জালিমসিংহ কিছুতেই নিরুৎসাহ হইলেন না; স্বীয় দূরদর্শিতাবলে কোটার ভবিষ্য ভাগ্য-লিপি পাঠ করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,এই ক্ষুদ্র রাজ্যেই আপনার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিবেন; সে প্রতিজ্ঞা অটল রাখিলেন। তিনি উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন কোটার দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। বুকৈনীদুর্গের প্রতি তখন তাহাদের আক্রোশ। সামন্তগোত্রের ধুরন্ধর বীর মধুসিংহ চারি শত সামন্তসেনার সহিত অনুক্ষণ দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত আছেন। শত্রুগণ পুনঃপুনঃ কঠোর উদ্যম করিয়াও দুর্গপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে পারিল না; অবশেষে তাহারা একটা প্রকাণ্ড হস্তীর সাহায্যে দুর্গদ্বার ভগ্ন করিতে সংকল্প করিয়া সেই মদমত্ত বারণরাজকে তদভিমুখে চালিত করিল। স্বীয় বিকট শুণ্ড কুণ্ডলিত এবং বিরাট মস্তক উন্নত করিয়া সেই অঙ্কুশতাড়িত বারণ দুর্গের রুদ্ধদ্বারাভিমুখে প্রধাবিত হইল। প্রাকারশিরে থাকিয়া সামন্তবীর মধুসিংহ তাহা দেখিতেছিলেন। দ্বার ভগ্ন হইবার উপক্রম দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তে তিনি অসি হস্তে অত্যুচ্চ দুর্গপ্রাচীর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বারণরাজের পৃষ্ঠোপরি পতিত হইলেন এবং একটিমাত্র প্রহারে মাহুতকে সংহার করিয়া পুনঃ পুনঃ অসিপ্রহারে সেই প্রকাণ্ড হস্তীর প্রাণবধ করিলেন। মধুসিংহের অতুল বিক্রম ও অসীমসাহস দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণকালের জন্য চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই প্রচণ্ডবিক্রমে সেই নিঃসহায় রাজপুতবীরকে আক্রমণ করিল। তিনি প্রাণপণে অসিচালনা করিয়াও শেষে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, অবশেষে শত্রুসেনামধ্যেই আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

তাঁহার সৈন্যগণ রণোন্মত্ত হইয়া দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক অসিহস্তে শত্রু-সেনাসাগরে ঝম্প প্রদান করিল। সেই চতুঃশত রাজপুতবীরের মধ্যে যাবৎ একটিমাত্র বীর জীবিত ছিল, তাবৎ মহারাষ্ট্রীয়েরা বুকৈনী দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়ের ত্রয়োদশ শত সাহসিকতম বীরের প্রাণ বহির্গত হইল; তথাপি মহারাষ্ট্রীয়গণ নিরুৎসাহ হইল না। বুকৈনী লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাহারা অচিরে সুজিত-দুর্গ অবরোধ করিল। ইতিপূর্ব্বে রাজা গোমানসিংহ হারসেনাগণের প্রতি আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, কোটারক্ষার্থ তাহারা সকলে যেন সুজিত পরিত্যাগ করে। তদনুসারে রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত হার-সেনা একটি বিশাল নলবনের মধ্য দিয়া কোটার দিকে যাত্রা করিল। অকস্মাৎ অনলস্পর্শে সেই তৃণ-বন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিরূপে অগ্নি লাগিল, তাহা কেহ নিরূপণ করিতে পারিল না। তখন ভয়গ্রস্ত হারসৈন্যগণ পলায়নের পথ না পাইয়া একেবারে মহারাষ্ট্রীয়সেনার সম্মুখে আসিয়া পড়িল; কাজেই শত্রুহস্তে তাহাদের পতন আরম্ভ হইল। মূলহর রাও হুলকার বুকৈনীযুদ্ধে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া একটু নিরুদ্যম হইয়াছিলেন; এই অচিনব জয়লাভে তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বেই তিনি স্বীয় বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহারে কোটার দিকে অগ্রসর হইলেন।

গোমানসিংহ বিষম সঙ্কটাপন্ন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধ করা তাঁহার দুঃসাধ্য। তখন তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ ব্যাকুল হইয়া বাঙ্গরোট-ফৌজদারকে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় সেনানী সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

কোটাপতি বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পদচ্যুত ফৌজদার জালিমের কথা তাঁহার মনে পড়িল; তিনি ভাবিলেন, জালিম থাকিলে এ সঙ্কটে বিপদুদ্ধার হইতে পারিত। সুখের বিষয়, তাঁহাকে আর অধিক চিন্তা করিতে হইল না। সেই সময়ে জালিম অবসর বুঝিয়া রাও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন এবং বাত্তোয়ারোক্ষেত্রের জয়লাভের কথা বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিলেন। গোমানসিংহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সন্ধিস্থাপনার্থ মহারাষ্ট্রীয়শিবিরে প্রেরণ করিলেন। জালিম মহারাষ্ট্রীয়শিবিরে উপস্থিত হইয়া এরূপ মহোচ্চভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাও গোমানসিংহের মনোরথ সিদ্ধ হইল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া জালিমকে পুনর্ব্বার ফৌজদারীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তদীয় ভূমিসম্পত্তিও পুনঃ প্রদত্ত হইল। ছয় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়বীর হুলকার সসৈন্যে কোটা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন অতীত হইল। গোমানসিংহ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। দিন দিন রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল; জীবনের আশা বিলুপ্ত হইল। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া কোটাপতি মনে মনে কোটার সমস্ত চিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী শিশু;—বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। কিরূপে সেই শিশু হইতে রাজ্য রক্ষিত হইবে? একে রোগের বিষময়ী যন্ত্রণা, তাহার উপর কঠোর চিন্তার তীব্রদংশনে রাজা একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সেই শোচনীয় অবস্থায় তিনি জালিমসিংহকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ফৌজদার! এ সময়ে কে উপযুক্ত পাত্র আছে? তোমা দ্বারা কোটারাজ্য দুইবার রক্ষিত হইয়াছে, এখন তৃতীয় সঙ্কট উপস্থিত। আমার উমেদ তোমার হস্তে অর্পিত হইল, আজি হইতে তুমিই ইহার একমাত্র রক্ষক হইলে।" অতঃপর স্বীয় সর্দ্দারগণের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তিনি সকলের সম্মুখে শিশু উমেদসিংহকে জালিম-সিংহের অঙ্কে প্রদান করিলেন।

১৮২৭ সংবতে (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) শিশু উমেদসিংহ কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজপুতের নিয়মানুসারে টীকাডোর উৎসব পুনরনুষ্ঠিত হইল। সুচতুর রাজপ্রতিনিধি জালিম নর-বার-রাজকুলের অধিকার হইতে কৈলবারা জয় করিয়া নবীনরাজের আভিষেচনিক উপঢৌকন প্রদান করিলেন। বীরানুষ্ঠান দর্শনে সকলের ধারণা হইল, জালিমসিংহের তেজ কদাচ নির্ব্বাপিত হইবে না। যে সময়ে ভারতে দস্যুতা, নরহত্যা ও সর্ব্বোৎসাদিগণের পৈশাচী মূর্ত্তি নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সেই সঙ্কটময়কালে রাজনীতিবিশারদ জালিমসিংহ সতর্কভাবে থাকিয়া আপন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের কত বিপদ্ হইয়াছে, কতবার প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি নিমেষের জন্যও ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ হন নাই।

জালিমসিংহ রাজকুমারের রক্ষক ও প্রতিনিধি বটে, কিন্তু ফৌজদারী কার্য্য ভিন্ন দাওয়ানী কার্য্যে তাঁহার হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা নাই। রায় অখিরাম তখন প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন। চত্বরশাল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকারকালে তিনিও দাওয়ানী বিভাগের কার্য্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন। অখিরাম অমিতবুদ্ধি, নীতিবিশারদ ও বহুদর্শী; সুতরাং তাঁহাকে পরাভূত করা সুসাধ্য নহে; কিন্তু জালিমসিংহের সৌভাগ্যবশে অখিরাম কতকগুলি কূটমন্ত্রীর কুটিলচক্রে পড়িয়া লীলা সংবরণ করিলেন। মন্ত্রীর মৃত্যুর পর জালিম স্বেচ্ছামত ফৌজদারী ও দাওয়ানী উভয়বিধ কার্য্যই পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে একটি বিপদের মূর্ত্তি ফিরিতে লাগিল। অখিরামের মৃত্যুর পর যে দিন জালিম উভয়বিধ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, সেই দিন তাঁহার প্রতিকূলে একটি ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র রচিত হইল। স্বর্গীয় মহারাও গোমানসিংহের ভ্রাতা মহারাজ স্বরূপসিংহ, হতভাগ্য বাঙ্করোট-সর্দ্দার এবং রাজপুতের ধাইভাই যশকর্ণ সেই চক্রান্তের অধিনায়ক। তাঁহারা এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন যে, মহারাও গোমানসিংহ মরণসময়ে জালিমকে রাজপ্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই।

জালিমসিংহের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য কুচক্রীরা চক্রব্যূহ রচনা করিল বটে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সুচতুর জালিম তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আশু তাহা বিফল করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অদ্ভুত চাতুর্য্যজালে বিজড়িত হইয়া অবশেষে চক্রিগণই বিপন্ন হইয়া পড়িল। ধাইভাই মহারাজকে নিপাত করিয়া নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং বাঙ্করোট-সর্দ্দার প্রাণভয়ে অদৃশ্য হইলেন। মহারাজ স্বরূপসিংহ ও ধাইভাইয়ের মধ্যে তাদৃশ কোন বিবাদ ছিল না, যাহাতে এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের অভিনয় হইতে পারে; তথাপি চতুর জালিমসিংহ এরূপ সুকৌশলের সহিত যশকর্ণকে করগত করিয়া তাঁহাকে মহারাজের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন যে, উচিতানুচিত বিচার না করিয়াই ধাত্রীপুত্র প্রকাশ্যে সূর্য্যালোকে ব্রজবিলাস নামক উপবনে স্বরূপসিংহকে আক্রমণপূর্ব্বক এক আঘাতেই তাঁহার প্রাণসংহার করিল। চারিদিকে হাহাকার উঠিল; জালিম সক্রোধে ভৎ র্সনা করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই হন্তাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই হারাবতী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। এই সমস্ত অত্যদ্ভুত কাণ্ডের অভিনয় দর্শনে রাজকর্ম্মচারীমাত্রেই স্তম্ভিত ও সতর্ক রহিলেন।

হতভাগ্য যশকর্ণ জয়পুরে বিতাড়িত হইয়া অতি দীনভাবে দিনযাপন করিতে লাগিল। চিন্তায় চিন্তায় তাহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হইল, অবশেষে দেহত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিল। মনে করিলে জালিম তাহার প্রাণবধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। তিনি কূটমন্ত্রণায় সুদক্ষ। ধাইভাইকে নিপাত করিলে তৎপ্রতি লোকের সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে, এই

জন্যই তিনি তাহাকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। যাহা হউক, কুটনীতিজ্ঞ জালিমসিংহ যে যথার্থই ধাইভাইকে সেই নিষ্ঠুর কাণ্ডের অভিনয়ে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিন তিনি যশকর্ণকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "মহারাজের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছ কেন, মহারাও এবং তাঁহার রক্ষকগণকে নিপাত করিয়া তিনি স্বয়ং রাজা হইতে উদ্যম করিতেছেন।" জালিমের এই কুহকে মুগ্ধ হইয়াই যশকর্ণ ঐ জঘন্য পাপাচরণে হস্ত কলুষিত করিয়াছিল।

এই বীভৎসকাণ্ড দর্শনে ভীত হইয়া জালিমের বিরুদ্ধাচারী অন্যান্য সকলে কোটা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিল। কেহ জয়পুরে, কেহ বা যোধপুরে গিয়া আশ্রয় লইল এবং তত্রত্য রাজাদিগকে আপন আপন মনোবেদনার কথা নিবেদন করিয়া জালিমের প্রতিকূলে সাহায্যপ্রার্থনা করিল। সুচতুর জালিম ইতিপূর্ব্বে আত্মরক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সময় সকল রাজ্যেই মহারাষ্ট্রীয়ের উপদ্রব। জালিম জয়পুর ও যোধপুরের রাজাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি রাজবিদ্রোহী তাহাদিগের রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা শরণাগত হারগণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে হতভাগ্যগণের সকল দিক্ বন্ধ হইল। নিঃসহায় ও নিরবলম্বন হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল; অবশিষ্ট সকলে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া জালিমের শরণাপন্ন হইল। জালিম তাহাদিগকে স্বদেশবিদ্রোহীর ন্যায় কোটায় আশ্রয়দান করিলেন। তাহাদিগের বিষয়সম্পত্তি রাজকোষের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, সংপ্রতি তাহারা জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কিছু ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া একরূপে সুখে-দুঃখে দিনপাত করিতে লাগিল।

অতঃপর অবমানিত সর্দ্দারগণ জালিমের প্রাণসংহারে স্থিরসংকল্প হইয়া স্বার্থসিদ্ধির নানারূপ সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে আথুন-দুর্গের অধীশ্বর দেবসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র রচনা করিলেন। সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে জালিমকে বিশেষ আয়াসস্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দেবসিংহ একজন আথুনের পরাক্রান্ত সর্দ্দার; তাঁহার বার্ষিক আয় ষষ্টিসহস্র মুদ্রা। অভিতপ্ত সর্দ্দারগণের সহিত তিনি স্বীয় দুর্গ দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিলেন এবং জালিমের দমনার্থ অপর অপর উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। জালিম বুঝিতে পারিলেন যে, চক্র হইতে অব্যাহতি লাভ করা সুদুরূহ; তথাপি নিশ্চিন্ত না থাকিয়া উপযুক্ত উপায়াবলম্বনে যত্নপর হইলেন। মুখা নামক এক ব্যক্তি এই সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে যে সকল দস্যুদল ভারতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভ্রমণ করিতেছিল, মুখা তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ অধিনায়ক। তাহার অধীনে অসংখ্য পদাতি অশ্বারোহী, অনেকগুলি কামান ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ছিল। জালিমের বিপদুদ্ধারার্থ মুখা স্বীয় দলবল সহ আথুনদুর্গ অবরোধ করিল; বহুদিন ধরিয়া দুর্গ রুদ্ধ থাকিল। সময়ে সময়ে সুযোগমতে দুর্গবাসীরা দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক শত্রুসেনা আক্রমণ করিত এবং সম্মুখে যাহাকে পাইত, তাহাকেই বধ করিয়া দুর্গনিলয়ে লুক্কায়িত হইত। এই জন্য মুখাকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইত। কিন্তু দুর্গের মধ্যে কত দিন এরূপভাবে থাকিবে? তাহাদের গুলী, বারুদ এবং আহারীয় নিঃশেষপ্রায় হইয়া গেল। তখন আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্জ্জয় সর্দ্দারগণ মুখার করে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন; জালিম তাহাদিগকে প্রাণে বধ করিলেন না। তাহারা দুর্গ হইতে একেবারে বিতাড়িত হইল। তাহাদের

ভূমিসম্পত্তি রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই প্রকারে নির্ব্বাসিত ও বিষয়ভ্রষ্ট হইয়া মন্দভাগ্য হার-সর্দ্দারগণ অতিকষ্টে বিদেশে দিনপাত করিতে লাগিল; ষড়্‌যন্ত্রের অধিনায়ক দেবসিংহ নির্ব্বাসন-ক্লেশ ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে চিন্তাজ্বরে আক্রান্ত হইলেন; অল্পদিনমধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাঁহার পুত্র জন্মভূমির জন্য বহুদিন বিলাপ করিয়া পরিশেষে জালিমের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। জালিম তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু সেই হতভাগ্য সর্দ্দারপুত্রকে তদীয় পিতৃসম্পত্তি আথুন-দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন না। রাজপ্রতিনিধি জালিম তাঁহার ভরণপোষণার্থ বার্ষিক পঞ্চসহস্র টাকা আয়ের একটি ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন। সেই ভূমি-সম্পত্তি বাঁমোলিয়া নামে অভিহিত। সেই চক্রান্তের মধ্যে অপরাপর যে সকল সর্দ্দার সংলিপ্ত ছিল, তাহারাও তদ্রূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইল; কেহই আর পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ ক্ষমতা ও নিজ নিজ ভূমিসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইল না।

রাজকুমার উমেদের রক্ষকপদে নিয়োজিত হইয়া একদিনের জন্যও জালিম সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারেন নাই। তদীয় প্রচণ্ড প্রতাপে পরাহত হইয়া কোটার প্রায় সমগ্র সামন্ত-সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাঁহার অনিষ্টসাধনে সমর্থ হয় নাই। ১৮৩৩ সংবতে দেবসিংহের অধঃপতনের ত্রয়োবিংশতি বৎসর পরে বাহাদুরসিংহ নামক এক জন দুর্জ্জয় সর্দ্দার জালিমের প্রাণসংহারাভিপ্রায়ে কঠোর উদ্যম করিতে লাগিলেন। মোশাই নামক নগর বাহাদুরের ভূমিসম্পত্তি। তাঁহার বার্ষিক আয় দশসহস্র টাকা। যে সমস্ত বিদ্রোহী সর্দ্দার, নাগ-রিক ও রাজকর্ম্মচারীর সম্পত্তি জালিম রাজসম্পত্তির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বাহাদুরসিংহের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোশাই-দুর্গের অভ্যন্তরে জালিমের বিরুদ্ধে একটি চক্রব্যূহ রচিত হইল। জালিমের প্রাণবধে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া বাহাদুরসিংহ প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের একখানি তালিকা প্রস্তুত করিলেন। জালিম, তাঁহার পরিবারবর্গ, তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং মন্ত্রী লালজী পণ্ডিতের নাম তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ হইল। অতঃপর ধার্য্য হইল, জালিম যখন রাজসভায় গমন করিবেন, তখন তাঁহাকে অলক্ষিতে আক্রমণ করিতে হইবে।

জালিম কূটনীতিজ্ঞ হইয়াও ষড়্‌যন্ত্রের বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না। স্বীয় আবাসবাটী হইতে নিয়মিত শরীররক্ষকসমভিব্যাহারে তিনি রাজসভার দিকে অগ্রসর হইলেন। চক্রিগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র জালিমের অন্তরে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। এত দিন সতর্কভাবে কার্য্য করিয়াও সর্দ্দারগণ আপনাদের ভয়ঙ্করী কল্পনা গোপন রাখিতে পারিল না। তন্মধ্যে এক বিশ্বাসঘাতক জালিমকে ইঙ্গিতে পথিমধ্যেই সমস্ত জ্ঞাপিত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত বুঝিয়া লইলেন এবং ধীর ও গম্ভীরভাবে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পরমবন্ধু পণ্ডিত লালজীর একদল অশ্বসেনা প্রায়ই তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিত। জালিম আশু তাহাদিগকে আনাইয়া স্বীয় শরীররক্ষকসেনার সহিত সমবেত করিলেন। ষড়্‌যন্ত্রী সর্দ্দারেরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, তিনি জালনিবদ্ধ হইতেছেন। ইত্যবসরে সুচতুর জালিম আপন সৈন্যগণের প্রতি সেই সমস্ত সর্দ্দারকে আক্রমণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পরিপালিত হইল। অসতর্ক সর্দ্দারেরা সহসা আক্রান্ত হইয়া পড়িল। অনেকের প্রাণবিয়োগ হইল, অনেকে বন্দী হইল, কেহ কেহ পলায়ন করিল। হতভাগ্য বাহাদুরসিংহ পলায়ন-পূর্ব্বক চম্বলতীরস্থ পত্তননগরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কিশোরীদেবের মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করি-লেন। পত্তন বুন্দির অন্তর্ভুক্ত এবং ভগবান্ কিশোরী হাবকুলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। বাহাদুরসিংহ

মনে করিয়াছিলেন যে, সেই পবিত্র দেবমন্দির হইতে জালিম তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহার সেই ধারণা ভ্রমমূলক। দুর্জ্জয় রাজপ্রতিনিধি জালিমের প্রচণ্ড প্রতি-হিংসানল সেই পবিত্র দেবমন্দিরের প্রাচীর ভেদ করিয়া হারকুলের ইষ্টদেবতার সঙ্গেই বাহাদুরকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

জালিমসিংহের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজপরিবারের পুরুষ-গণের মধ্যে রাজার পিতৃব্য রাজসিংহ এবং গরধন ও গোপালসিংহ নামা ভ্রাতৃদ্বয় সংলিপ্ত ছিলেন। যে দিন আথুনদুর্গপতি দেবসিংহের ষড়্‌যন্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়. সেই দিন হইতে এই সকল ব্যক্তির উপর জালিম বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভয়ানক চক্রান্তের পর্য্যবসান হইলে যখন চক্রি-গণের তালিকামধ্যে আবার ইঁহাদের নাম দৃষ্ট হইল, রাজপ্রতিনিধি তখন তাঁহাদিগকে কঠোরতর অবরোধে নিক্ষেপ করিলেন। এই দুঃসহ কারারোধে পতিত হওয়ার দশ বৎসর পরে রাজভ্রাতা গরধন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন; কনিষ্ঠ গোপালসিংহ বহুদিন জীবিত ছিলেন। পরে যে দিন তাঁহাকে সংসার হইতে প্রস্থান করিতে হইল, সেই দিন হতভাগ্য কারাযন্ত্রণা হইতে অব্যা-হতি পাইল। পিতৃব্য রাজসিংহ সেই চক্রান্তে সংলিপ্ত না হইলেও তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা জালিম-সিংহের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। তবে তিনি কারারুদ্ধ হন নাই। তিনি পরমার্থচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন।

জালিমসিংহ একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইয়া শান্তি-সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রতিকূলে একটি না একটি বিপদ্ উত্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার বিরুদ্ধে সর্ব্বসমেত অষ্টাদশটি ষড়্‌যন্ত্র রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একদল স্ত্রীলোকের ষড়্‌যন্ত্রই ভীষণতম। একটি দুঃসাহসিনী প্রেমিকার অদ্ভুত কৌশলে তিনি সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই রমণী জালিমের অদ্ভুত রূপে মুগ্ধ হইয়া তদীয় প্রাণরক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। একদিন কনিষ্ঠ রাজপুত্রগণের মাতার নিকট হইতে একখানি নিমন্ত্রণপত্র আসিল। জালিম রাজজননীর সম্মানরক্ষার্থ অন্তঃপুরে গিয়া একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষণকাল অতীত হইল, কিন্তু কেহই সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন না। অল্পক্ষণ পরেই এক বিস্ময়কর দৃশ্য তাঁহার নেত্র-পথে নিপতিত হইল; তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। উন্মুক্ত তরবারিকরে কতকগুলি রুদ্রচণ্ডী চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রথমেই অস্ত্রাঘাত না করিয়া তাঁহারা তিরস্কারপূর্ব্বক জালিমকে নানাপ্রকার কঠোর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তিনি জন্মাবধি কি কি কার্য্য করিয়াছেন, একে একে তাহাই জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। জালিম ভুজঙ্গিনীবেষ্টিত কূপগর্ভস্থ মণ্ডূকের ন্যায় হতাশহৃদয়ে তাঁহাদের বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে তাঁহার উদ্ধারকর্ত্রী তথায় উপস্থিত হইল। তাহার বেশভূষাদর্শনে রাজজননীর প্রধানা সহচরী বলিয়া বোধ হইল। সেই করুণাময়ী রমণীর সাহস ও বীরত্বকে ধন্য! কল্পিত ক্রোধ সহকারে জালিমের দিকে উৎকট ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিয়া সেই উগ্রচণ্ডী বলিয়া উঠিল, "কি দুরাত্মন্, তুই যে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিস্? দূর হ! এখনই এ গৃহ হইতে প্রস্থান কর্!" চতুরার চাতুরী অন্যান্য রুদ্রচণ্ডীরা বুঝিতে পারিল না; তাহাদের হাতের অসি হাতেই রহিল; জালিমকে বধ করিতে কেহই সাহসী হইল না;—চিত্রপুত্তলিকাবৎ সকলেই দাঁড়াইয়া রহিল। জালিম আত্মপ্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

——:*:——

রাজবারায় জালিমের প্রচণ্ড প্রতাপ, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার সম্বন্ধবন্ধন, কর্ণেল মনসনের পশ্চাদপসরণ, জালিমের উপর হুলকারের বৈরতাচরণ, হুলকারের কোটা আক্রমণোদ্যম, পিণ্ডারী সেনাপতিদিগের ও আমীর খাঁর সহিত একতা-বন্ধন, কতিপয় উপকথা, মহারাও উমেদসিংহের প্রতি জালিমের ব্যবহার, ফৌজদার বিষণসিংহ, পাঠান দলিল খাঁ, কোটা অবরোধ, ঝালাপত্তন নগরস্থাপন, মেহরাব খাঁ।

কি উপায়ে রাজ্য উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইবে, কি করিলে প্রজাপুঞ্জ সুখে থাকিবে, কি করিলে রাজ্য শান্তির ক্রোড়ে বিরাজ করিবে, এই সমস্ত চিন্তাতেই জালিম অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকিতেন। রাজনৈতিক প্রতিভাবলে বিদ্রোহী সর্দ্দারগণের দুর্ব্বৃত্ততা দমন করিয়া তিনি রাজপুত রাজগণের মধ্যে বলসাম্য স্থাপন করিতে সংকল্প করিলেন। এক শত্রুকে অধীনে আনিয়া তাহার সাহায্যে অপরের সংহার এবং অবশেষে সাহায্যকারী শত্রুকেও কিরূপে বিনাশ করিতে হয়, জালিমসিংহ তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি যেরূপ উদ্‌যোগী পুরুষ, তাঁহার অবলম্বনীয় প্রণালীও তদনুরূপ নীতিমার্গানুসারিণী ছিল।

জালিম যে সময়ে কোটার রাজপ্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হন, ভারতভূমির অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। ভারতের চতুর্দ্দিকে তখন দস্যুতা, নরহত্যা, অরাজকতা বীভৎসবেশে বিচরণ করিতেছিল; দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল কৃতান্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; কিন্তু কোটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হয় নাই। সেই সময়ে বিশাল রাজবারাক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত রাজাই জালিমের মন্ত্রণাকে মূল্যবান জ্ঞান করিতেন। প্রত্যেক রাজ্যেই জালিমের একটি না একটি দূত অবস্থিত ছিল। দেশকালপাত্র বিবেচনায় কার্য্য করিতে জালিমের ন্যায় চতুর লোক তৎকালে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব ও গর্ব্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার ন্যায় বিনয়ী ও অবনত হইতে আর কাহাকেও দেখা যাইত না। কি শত্রু কি মিত্র সকলেই তাঁহার মধুর আলাপনে পরিতুষ্ট হইত। এইরূপেই জালিম সকলকে বশীভূত করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া লইতেন। এই সমস্ত নিদর্শনেই জালিমের রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮১৬—১৭ খৃষ্টাব্দে যোধপুরের প্রতিকূলে একটি সমিতি স্থাপিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে তিনটি দলের সন্তোষসাধন করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকের সহিত তাঁহার একটি না একটি ধর্ম্ম সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। তিনি সকলের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন,—প্রত্যেকেরই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন; সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁহাকে মধ্যস্থরূপে জ্ঞান করিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে দৃষ্ট হইল, সুচতুর জালিমসিংহ কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই।

কর্ণেল মনসন মধ্যভারতে আগমনপূর্ব্বক যখন হুলকারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন, কোটার রাজপ্রতিনিধি জালিম তখন বৃটিসবীরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়বীরের প্রচণ্ড পরাক্রমে পরাজিত হইয়া হতভাগ্য মনসন যখন দীনভাবে কোটায় পলাইয়া আসিয়া

নগরের অভ্যন্তরে আশ্রয়লাভার্থ জালিমের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, চতুর জালিম তখন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "কতকগুলি ছত্রভঙ্গ সৈন্য লইয়া আমার রাজ্যে অরাজকতা ও শান্তিময় নাগরিকবৃন্দের মধ্যে অশান্তির বীজবপন করিতে দিতে আমি অসম্মত। নগরপ্রাকারের ছায়াতলে আপনার সৈন্যগণ অবস্থিতি করুক, আমি তাহাদিগের আহারীয় প্রদান করিব এবং বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমার সেনাদল আপনার সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবে না।" কিন্তু মনসন জালিমের কথার উপর নির্ভর না করিয়া পলায়ন করিলেন এবং অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরিশেষে প্রায় একাকীই সুপ্রথিত লর্ড লেকের সমীপে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মন্দভাগ্য ইংরাজ সেনাপতি স্বীয় ভীরুতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য পরাজয়ের কারণ অপরের উপর ন্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন এবং অম্লানবদনে বলিলেন, "কোটারাজ অপর কতকগুলি ব্যক্তির সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন।" মিথ্যাবাদীর বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া লর্ড লেক কোটায় যে কত শোণিতপাত করিয়াছিলেন, ইতিহাসই তাহার জলন্ত প্রমাণ।

জালিম যে ইংরাজসেনাকে সাহায্য দান করিতেছেন, তজ্জন্য হুলকারের রোষ ও জিঘাংসার আর সীমা রহিল না। তিনি কোটার বক্সীকে বন্দী করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধের এবং বক্সীর নিষ্ক্রয়স্বরূপ তিনি হাররাজের নিকট দশলক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন;—ভয় দেখাইলেন, সেই পণ প্রাপ্ত না হইলে কোটারাজ্য ধ্বংস করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সেই বন্দী হারসেনাপতি রাজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং বক্সীর অনুষ্ঠানে দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন;—বলিলেন, "তুমি যে প্রকারে পার, তোমার মুক্তিপণ দাও;—আমি সে জন্য দায়ী নহি।" কথিত আছে, হতভাগ্য বক্সী কঠোর ঘৃণা ও লজ্জায় আত্মদ্রোহী হইয়া বিষপানে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিল। পণ আদায় করিতে না পারিয়া হুলকার কোটা আক্রমণ করিবার ভয়প্রদর্শন করিলেন এবং সুবিধাক্রমে সদলে হারাবতীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাজধানীর নিকট স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। আশঙ্কিত আক্রমণ বিফল করিবার জন্য নগরপ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্তে সুসজ্জিত হইল এবং প্রাচীরের বহির্দ্দেশস্থ পল্লী ও নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে ঘোষণাপ্রচার হইল যে, একটি নির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত পাইবামাত্র পল্লীবাসীরা বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিবে। সেই সঙ্গে ভীলগণও পর্ব্বতবাস হইতে বহির্গত হইয়া হুলকারের সেনাদলকে আক্রমণ করিবে। এই প্রকারে সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া জালিম প্রতিক্ষণে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হুলকার আর অগ্রসর না হইয়া আবার সেই দশলক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজপ্রতিনিধি সে প্রস্তাবে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। অচিরে একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ইত্যবসরে কতিপয় বন্ধু মধ্যস্থ হইয়া দুই পক্ষের বিবাদ মীমাংসা করিতে চাহিলেন। মহারাষ্ট্রীয়ের প্রতি জালিমের বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "চম্বলনদের বক্ষে নৌকার উপর বসিয়া সন্ধিবিগ্রহের কথাবার্ত্তা হইবে, যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছি, নচেৎ নহে।" হুলকার তাহাতেই সম্মত হইলেন। যথাকালে নদীবক্ষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল; উভয়ে একটি ধর্ম্মবন্ধনেও আবদ্ধ হইলেন। হুলকার জালিমকে পিতৃব্য সম্বোধন করিলেন এবং তিন লক্ষ টাকা লইয়া নগরত্যাগে সম্মত হইলেন।

জালিম বুদ্ধিমত্তাবলে নানাকৌশলে কোটারাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন। জালিম প্রধান প্রধান মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের

সমস্ত কূটনীতি বুঝিতে পারিয়া কোটা-রাজ-প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন জালিম সিন্ধিয়া ও হুলকার উভয়েরই দুইটি বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা স্ব স্ব প্রভুর সমস্ত কল্পনা গোপনে জালিমের নিকট প্রকাশ করিত। দুর্দ্ধর্ষ মির খাঁ তাঁহার একজন প্রধান সহায়। মির খাঁর পরিবারবর্গের ভরণপোষণনির্ব্বাহার্থ জালিম তাহাকে শিবগড়-দুর্গ প্রদান করিয়াছিলেন।

জালিম পণ্ডিতগণকেও সজ্জনযোগ্য সম্মান ও শীলতার সহিত অভ্যর্থনা করিতেন; সুতরাং তাঁহারাও জালিমের সদ্ব্যবহারে মোহিত ও বশীভূত হইয়াছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়া পিণ্ডারিগণের দলপতি করিমকে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলে জালিম বহু অর্থ নিষ্ক্রয় প্রদান করিয়া তাহাকে মুক্ত করেন।

জালিমের আতিথ্যসৎকার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার দ্বার সকলশ্রেণীস্থ লোকের সম্মুখেই সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। মিবার ও মারবারের সর্দ্দারগণ নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে জালিমের নিকট আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিত। অনেকে স্ব স্ব অপহৃত সম্পত্তি অপেক্ষাও অধিক মূল্যের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইত এবং পরমসুখে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিত। জালিম আশ্রয়প্রার্থী সামন্তগণকে কেবল আশ্রয় দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, তাহাদিগের সহিত তাহাদিগের রাজগণের পুনর্মিলন স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার এরূপ উদ্যম প্রায়ই সফল হইত। এই জন্য তিনি সকলের নিকটে সন্ধিকর্ত্তা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জালিম এরূপ উচ্চতম নীতিবিশারদ হইলেও সময়ে সময়ে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। মিবার তদীয় কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া পরিশেষে কোটাকে যে দুস্তর পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে, তাহা হইতে অব্যাহতিলাভ বহুসময়সাপেক্ষ। গরদিগের রাজধানী শিবপুরকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া জালিম মনে করিয়াছিলেন যে, তাহা করগত করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশাও ফলবতী হয় নাই।

জালিমসিংহ রাজা ও রাজপুতগণের প্রতি চিরদিনই সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। কিংবদন্তী আছে, একদা শীতকালে জালিম দুর্গাভ্যন্তরস্থ কুলদেবতার মন্দিরে বসিয়া দেবার্চ্চনা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজার কনিষ্ঠপুত্রদ্বয় দেবারাধনার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণতল আর্দ্র ছিল; জালিম তখনই স্বীয় তূলাপূর্ণ গাত্রাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক প্রাঙ্গণতলে আস্তৃত করিয়া দিলেন। রাজকুমারেরা তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া অর্চ্চনাদি সমাপনপূর্ব্বক মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। অতঃপর রাজপুত্রগণের সমভিব্যাহারী ভৃত্য শীতবস্ত্রখানিকে অব্যবহার্য্য বোধে এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিতে উদ্যত হইলে জালিম তাহার হস্ত হইতে উহা লইয়া সানন্দে আপন গাত্রে পুনঃস্থাপন করিলেন। ভৃত্য বিস্মিত হইয়া রহিল।

চতুর্থ অধ্যায়

——:০:-

একতাবন্ধনার্থ রাজাদিগকে বৃটিসগবর্ণমেণ্টের আহ্বান, তাহাতে জালিমের স্বীকার, কোটা-রাজ্যে হেষ্টিংসের এজেণ্ট প্রেরণ, পিণ্ডারিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্‌যোগ, ভারতে সর্ব্বত্র শান্তি, উমেদসিংহের মৃত্যু, মহারাও উমেদসিংহের পুত্রগণ, রাজপ্রতিনিধির পুত্রগণ, দলবলের অবস্থা, কিশোরসিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষেকার্থ ঘোষণা, বৃটিস এজেণ্টের প্রতি তাঁহার পত্র, জালিমের সাংঘাতিক রোগ, বৃটিস গবর্ণ-মেণ্টের সঙ্কটময় অবস্থা, কিশোরসিংহের রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক রাজকুমারের অবরোধ, গরধনদাসের নির্ব্বাসন, মহারাওয়ের অভিষেক, জালিম কর্তৃক কোটার সর্ব্বত্র দণ্ডনিবারণ।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারিগণ অত্যাচারী হইয়া উঠিলে ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড হেষ্টিংস্ তাহাদিগের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিয়া রাজবারার নৃপতিগণকে যোগদানার্থ আহ্বান করিলেন। জালিমসিংহ সর্ব্বপ্রথম বৃটিসশাসনকর্ত্তার আমন্ত্রণপত্র স্বীকার করিলে ক্রমে অন্যান্য রাজন্যবর্গও তাঁহার আদর্শের অনুগামী হইলেন।

রাজগণ ইংরাজের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে ইহা হইতে কি ফল প্রসূত হইবে, জালিম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন;—বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নৃপতি-দিগকে হস্তগত করিয়া ইংরাজের আশালতা সমূলে উৎপাটন করিতে চেষ্টা করেন নাই। ঈশ্বরাশী-র্ব্বাদে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া জালিম সিংহ ইংরাজগণের অনুষ্ঠান সম্যক্‌রূপে অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে, এখন ইচ্ছা করিলে সমস্ত রাজপুতগণের সাহায্যে তিনি ইংরাজকে অবাধে দমন করিতে পারেন বটে, কিন্তু ইংরাজকে দমন করিলে ভবিষ্যতে সমস্ত ভারত তাঁহাদেরই করতলগত হইবে; ভারত কদাচ স্বাধীনতারক্ষণে সমর্থ হইবে না। জালিম স্বীয় অদ্ভুত ভাবী দর্শনবলে ভারতের ভাগ্যলিপি পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ইংরাজ ব্যতীত অন্য কোন জাতি ভারতের তদানীন্তন অরাজকতা দূর করিয়া শান্তিস্থাপনে সক্ষম হইবে না। সেই জন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথম লর্ড হেষ্টিংসের আমন্ত্রণপত্র স্বীকার করিলেন এবং ব্রিটিসগণের সহিত মৈত্রী স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিলেন।

অনেকে অনুমান করেন, ইংরাজের সহিত যখন মৈত্রীবন্ধন হয়, জালিম তখন অশীতিবর্ষপর বৃদ্ধ। তিনি ভাবিলেন যে, বিশাল রাজস্থানকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া এতদিন তিনি যে অখণ্ড প্রভুত্ব পরিচালন করিলেন, তাঁহার পুত্রগণ সে প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাদের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, তাহাতে যে তাহারা পিতৃপদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। জালিম নিজে বৃদ্ধ; অল্পকালমধ্যেই সুখের সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে অনন্তধামের পথিক হইতে হইবে। ইংরাজের সহিত একতাবন্ধন হইলে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাদের সাহায্যে অনায়াসে তদীয় গৌরব ও পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। এইরূপ স্থির করিয়া চতুরচূড়ামণি জালিম ব্রিটিসগণের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় ইহা ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হইয়া-ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

জালিমের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজ্য হইতে নৃপতিগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত লইয়া ইংরাজের পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিলেন। অসংখ্য রণবীর আসিয়া সারজন মেলকমের সহিত যোগদান করিবার জন্য নর্ম্মদানদীর দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে চারিদিক হইতে ইংরাজ ও রাজপুতসেনা দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলকে আক্রমণ করিতে লাগিল। চারিমাসের মধ্যে পিণ্ডারিগণ বিতাড়িত হইল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২১এ ডিসেম্বর দিবসে নাহিদপুরক্ষেত্রে হুলকার ভগ্নদন্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারিগণের অধঃপতনের সূচনা হইল। ক্রমে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৫এ জানুয়ারীদিবসে দস্যু-সর্দ্দার চিতুর পরাজিত হইলে ভারতের বহুদিনব্যাপিনী অশান্তি প্রশমিত হইল। ইংরাজগণ শান্তিপ্রিয় হিন্দুবৃন্দগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নবেম্বরমাসে মহারাও উমেদসিংহ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জালিমসিংহ যে সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, ইংরাজের সাহায্য না পাইলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। উমেদের তিনি পুত্র;—কিশোরসিংহ, বিষণসিংহ ও পৃথ্বীসিংহ। উমেদ যখন লীলাসংবরণ করেন, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোরসিংহের বয়ঃক্রম তখন চল্লিশ বৎসর। কিশোরসিং নিরীহ শান্তপ্রকৃতি মহাপুরুষ। ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার হৃদয়কে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছিল; বিষয়ব্যাপারে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না।

বিষণসিংহের বয়ঃক্রম তখন ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষ। তিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় শান্ত ও ধর্ম্মানুরাগী, বিশেষতঃ রাজপ্রতিনিধির প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সর্ব্বকনিষ্ঠ পৃথ্বীসিংহের বয়স ত্রিংশং বর্ষের ন্যূন। তিনি উগ্রপ্রকৃতি ও উদ্ধতস্বভাব; প্রকৃত রাজপুতের ন্যায় তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেই ভালবাসিতেন। কোটার বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী তাঁহার মনোনীত নহে। তাঁহার ধারণা ছিল, চতুরচূড়ামণি জালিম তাঁহাদিগকে আজীবন ক্রীড়াপুত্তলিকাস্বরূপ রাখিয়া স্বীয় অভিসন্ধিসাধন করিবেন। পিতার জীবিতাবস্থায় পৃথ্বীসিংহ এতদিন বহুকষ্টে জালিমের দুরাচারণ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে পিতা পরলোকগত; এখন কে পৃথ্বীসিংহের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিতে সাহসী হইবে? তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সেই গ্লানিকর অধীনতা-পাশ ছেদন করিবেন, নচেৎ আত্মোদ্ধারার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিবেন, তাহাও শ্রেয়ঃ। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা-পালনের অবসর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুখের বিষয়, ভ্রাতৃত্রয় পরস্পরের প্রতি অনুগত ছিলেন।

জালিমের দুই পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মধুসিংহ সহধর্ম্মিণীর গর্ভে এবং কনিষ্ঠ গরধনদাস উপপত্নীর গর্ভে সমুৎপন্ন। গরধনদাসের প্রতিই পিতার স্নেহ ছিল। সেই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ মধুসিংহের সহিত সমান ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন উমেদের মৃত্যু হয়, মধুসিংহের বয়ঃক্রম তখন প্রায় ষট্‌চত্বারিংশদ্বর্ষ। তাঁহার বদনকমলে প্রতিভাশালিতার পূর্ণলক্ষণ পরিব্যক্ত হইত। মহারাও উমেদসিংহ জালিমের পুত্রদ্বয়কে বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন, এমন কি, রাজপুতগণের সহিত তাঁহাদের কোন কলহ উপস্থিত হইলে তিনি প্রায়ই মধুসিংহ ও গরধনদাসের পক্ষসমর্থন করিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সংঘর্ষসময়ে জালিমসিংহ কোটা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোতানগড়ে শিবিরস্থাপন করিলে মহারাও উমেদসিংহ মধুসিংহকে ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেনাদল-পরিচালন ও তাহাদের বেতনবিতরণ, মধুসিংহের হস্তে এই উভয়বিধ কার্য্যভার সমর্পিত হইয়াছিল। নিজ হস্তে বিপুল ধন প্রাপ্ত হইয়া নবীন ফৌজদার স্বেচ্ছামত আমোদে লিপ্ত হইলেন। মধুসিংহের এইরূপ গৌরব দর্শনে রাজকুমারদিগের হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল।

গরধনদাসের বয়ঃক্রম তখন সপ্তবিংশতিবর্ষমাত্র। তিনি স্বভাবতঃ উগ্র, কিন্তু চতুর ও সাহসী।

মধুসিংহের ন্যায় তিনি বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ বা বিলাসসুখসম্ভোগ করিতে ভালবাসিতেন না। রাজকুমারগণ তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বিশেষতঃ কিশোরসিংহ ও পৃথ্বীসিংহের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল। তৎকালে রাজসম্ভাকারের শস্যাদির উপর তত্ত্বাবধান করা প্রধানের কার্য্য ছিল। পিতার অনুগ্রহে গরধন উক্ত নূতনপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

মধুসিংহ গরধনকে জারজ বলিয়া ঘৃণা করিতেন; সময়ে সময়ে অতি কটূক্তি করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না। জালিম নীতিজ্ঞ হইয়াও স্বীয় পুত্রদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন না। এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য জালিমকে পরিণামে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল।

মহারাও উমেদসিংহের মৃত্যুকালে জালিম গাগরৌণ নগরে স্বীয় শিবিরে অবস্থিত ছিলেন। রাজার পরলোকগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তিনি ত্বরিতগতিতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। যাহাতে মৃতরাজার অন্ত্যেষ্টিসংকার যথাবিধানে সম্পাদিত হয় এবং কিশোরসিংহ কোটার শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে সহায়তা করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময়ে বৃটিস পলিটিকাল এজেণ্ট মারবার হইতে মিবার-রাজ্যে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে জালিমের পত্র পাইয়া অবগত হইলেন, 'মহারাও উমেদ লীলাসংবরণ করিয়াছেন। পত্রপাঠমাত্র তিনি কোম্পানী বাহাদুরকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া আদেশ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কতিপয় দিবস মিবার রাজধানীতে অবস্থিতির পর এজেণ্ট সাহেব বৃটিসগবর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র পাইয়া কোটার দিকে অগ্রসর হইলেন। কোটার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, জালিম রাজধানীর অর্দ্ধক্রোশ দূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিত আছেন, কিন্তু তদীয় পুত্র মধুসিংহ তাঁহার প্রাসাদে আমোদপ্রমোদে পরিলিপ্ত। কিশোরসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পৃথ্বীসিংহ ও গরধনদাস নবীনরাজের নিকটে অনুক্ষণ থাকিয়া তাঁহাকে আপনাদের মন্ত্রণায় নমিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। বিষণসিংহের সহিত তাঁহাদের কাহারও মনোমিল নাই। রাজপ্রতিনিধির প্রতি বিষণের অনুরাগ দর্শনে তাঁহার ভ্রাতৃগণ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। প্রাসাদের মধ্যে গূঢ়ভাবে যে এইরূপ ষড়্‌যন্ত্র রচিত হইতেছিল, পুত্র গরধন যে পিতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে, চতুর জালিম ইহা আদৌ পরিজ্ঞাত নহেন। মহারাও উমেদসিংহের মৃত্যুর পর জালিম উৎকট পীড়াভিভূত হইলেন। একে বৃদ্ধ বয়স, তাহার উপর উৎকট রোগের আক্রমণ, জালিমের স্বাস্থ্যলাভ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল; তাঁহার রোগবৃদ্ধি দর্শনে পৃথ্বীসিংহ ও গরধনদাসের মনোমধ্যে আশাকুহকিনী নৃত্য করিতে লাগিল। জালিম ইহলোক হইতে বিদায় লইলে মধুসিংহকে কোটা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তাঁহারা আপনাদের সুখের পথ পরিষ্কার করিবেন, এইরূপ নানাবিধ আশার মোহনমন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া পৃথ্বীসিংহ ও গরধনদাস গোপনে গোপনে আপনাদিগের উদ্দেশ্যসাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশালতা সমূলে উন্মূলিত হইল; অল্পকালমধ্যেই জালিম স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। তথাপি তাঁহারা হতাশ না হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নানারূপ আয়োজন করিতে লাগিলেন। জালিম তখনও কিছু জানিতে পারিলেন না। পরিশেষে বৃটিস এজেণ্ট তাঁহাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আপনি দেখিতেছেন না, আপনার পুত্রদ্বয় পরস্পরের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনারই পদে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস পাইতেছে? গরধনদাস মহারাও কিশোরসিংহ ও রাজকুমার পৃথ্বীসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মধুসিংহকে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

তাহাদের উত্তম সফল হইলে আপনারই অনিষ্ট।" জালিমের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, কোম্পানী বাহাদুর অসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। বস্তুতঃ বৃটিস-এজেণ্ট তাঁহাকে নানারূপে আশ্বাসপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং মহারাও কিশোরসিংহকে অনুরোধ করিয়া মধুসিংহকে রাজ-প্রতিনিধিপদে দৃঢ় রাখিতে চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কিশোরসিংহের সহিত মধুসিংহের সমস্ত সদ্ভাব ও আলাপসম্ভাষণ শেষ হইল। রাজপুত্রগণ দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া আপনাদের ষড়্‌যন্ত্র সুদৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জালিম বিষম সঙ্কটাপন্ন। বৃটিস-এজেণ্ট তাঁহাদিগকে পুনর্ম্মিলিত করিবার জন্য রাজাকে নানারূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিশোরসিংহ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তাহার উপর যখন আবার শুনি-লেন যে, বৃটিস-গবর্ণমেণ্ট জালিমের প্রভুত্বসমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তিনি হস্ত দ্বারা স্বকর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "যাহারা আমাকে মহারাষ্ট্রীয় ও মোগলের সহিত সমান জ্ঞান করে, তাহারা আমার প্রবলবৈরী বলিয়া গণ্য, আমি তাহাদের কথা গ্রাহ্য করি না।" মধুসিংহকে রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিবার জন্য বৃটিস-গবর্ণ-মেণ্টের সহিত যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিলেন।

জালিম দেখিলেন, পৃথ্বীসিংহ ও গরধনদাস কিশোরসিংহের নিকটে থাকিলে মহারাওকে সুপথে আনয়ন করা একান্ত কঠিন। কিন্তু কি উপায়ে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? দুর্গদ্বার রুদ্ধ; বলসহকারে দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে ঘোরতর বিবাদের সম্ভাবনা, তাহাতে হয় ত রাজকুমারের প্রাণসংহার হইতে পারে। সুতরাং দুর্গ অবরোধ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কেন না, খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হইলেই কিশোরসিংহ দুর্গদ্বার উন্মোচন করিতে বাধ্য হইবেন। জালিম দুর্গ অবরোধ করিলেন। যতদিন দুর্গমধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি রহিল, ততদিন মহারাও দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন না, পরিশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পাঁচশতমাত্র অশ্বারোহী তাঁহার সহায় ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হার। সেই স্বল্পসংখ্যক সৈনিক সমভিব্যাহারে মহারাও কিশোরসিংহ দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। কেহই তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। স্বীয় দলবল সহ তিনি নিরাপদে রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বৃটিস-এজেণ্ট তৎক্ষণাৎ জালিমের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, শিবিরের চতুর্দ্দিকেই গণ্ডগোল;—সৈন্যগণ ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর জালিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে. এ অনর্থনিবারণের কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?" কি করিলে কি হইবে, জালিম তখন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্ত সন্দেহদোলায় দুলিতেছিল। এজেণ্টের প্রশ্ন শ্রবণে তিনি উত্তর করিলেন, "রাজার অনুগত হইয়া তাঁহার সেবা, ইহাই আমার সঙ্কল্প। প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কলঙ্কের ভাগী হওয়া অপেক্ষা নাথদ্বারে গিয়া ভগবানের অর্চ্চনায় দিনযাপন করি, তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল।" রাজভক্তির জলন্ত নিদর্শন দেখিয়া বৃটিস-এজেণ্ট জালিমের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া রাজার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজধানীর তিন ক্রোশ দক্ষিণে রঙ্গবাড়ী নামক পল্লীতে কিশোরসিংহ সদলে অবস্থিত ছিলেন। এজেণ্ট তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; এজেণ্টও যথাবিধি সকলকে অভিবাদন-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজা ও সর্দ্দারদিগকে সুমিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া

এজেণ্ট-সাহেব শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সদ্দারগণ, আপনারা না বুঝিয়া ভ্রমকূপে নিমগ্ন হইয়াছেন; রাজার উপকারের আশা করিয়া আপনারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি দূরে থাকুক, বরং আপনারাই বিপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। বৃটিস-গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিবে; এখনও সময় আছে, এই বেলা অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করুন।" এই বলিয়া গরধনদাসের দিকে জ্বলন্তদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক তদনুরূপ স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "পিতৃদ্রোহী ভ্রমান্ধ যুবক! তুমি নৃপতির সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। যাহা হইতে জগৎসংসার দর্শন করিলে, সেই পিতার উপর যখন তুমি অসি উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তোমা হইতে কাহার উপকার হইতে পারে? তোমার দ্বারা উপকার হইবে, এ আশা যদি রাজার মনে পোষিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার সে আশা দুরাশামাত্র।" এজেণ্টের ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণমাত্র গরধনের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল, নয়নদ্বয় আরক্ত আভা ধারণ করিল, ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। দন্তে দন্ত পেষণপূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে তিনি স্বীয় তরবারি কোষোন্মুক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঈষৎ হাস্য করিয়া সাহসী বৃটিসকর্ম্মচারী রাজার দিকে ফিরিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহারাও! অনুরোধ রক্ষা করুন, এখনও সময় আছে, এখন আমাদের পরামর্শ অবহেলা করিলে পরিশেষে আপনাকে নিশ্চয়ই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। তখন আপনার কোন কথাই গ্রাহ্য হইবে না। আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলে আমরা আপনার সম্মান-মর্য্যাদা, সুখ ও শান্তির জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। একমাত্র নিবেদন, রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারিবেন না। আমরা প্রতিশ্রুত আছি, কায়মনোবাক্যে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিব।" নানাপ্রকার চিন্তায় কিশোরসিংহের হৃদয় আকুল হইয়া পড়িল। তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া এজেণ্ট-সাহেব চীৎকারস্বরে অনুমতি করিলেন, "মহারাওয়ের অশ্ব প্রস্তুত কর।" তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালিত হইল। সসম্ভ্রমে রাজার হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া এজেণ্ট বলিলেন, "গাত্রোত্থান করুন, আপনার অশ্ব প্রস্তুত।" কিশোরসিংহ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এজেণ্টের সঙ্গে গিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন; আরোহণ করিবার সময় এইমাত্র বলিলেন, "আপনাকে আমি বন্ধু বলিয়া মান্য করি, আমি এখন সেই বন্ধুতার উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া রহিলাম; আর আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নাই।"

অবিলম্বেই তাঁহারা দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলেন। এজেণ্ট-সাহেব তখনও রাজার পার্শ্বে অবস্থিত। অবশেষে রাজাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনপূর্ব্বক প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আমরা নিয়ত আপনার মঙ্গল কামনা করি। বৃটিসের আশ্রয়তরুমূলে আপনি পরমসুখে দিনযাপন করেন, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। এখন যেরূপ সময় উপস্থিত, তাহাতে তদুপযোগী নীতির অনুগামী না হইলে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যরক্ষা করা আপনার পক্ষে দুঃসাধ্য। রাজপ্রতিনিধির সহিত মনোমালিন্য দূর করুন। আমরা প্রতিশ্রুত আছি, যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখিব; অতএব তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুন। গরধনদাসকে হারাবতী হইতে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিউন, নচেৎ আপনার মঙ্গল নাই। পৃথ্বীসিংহও স্থানান্তরিত হউন।" কিশোরসিংহ এজেণ্ট-সাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। মে মাসের মধ্যকালে এই ঘটনা ঘটে। একমাসের মধ্যেই সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হইলে জুনমাসে গরধনদাস দিল্লীনগরে নির্ব্বাসিত হইল। রাজকুমার পৃথ্বীসিংহ ও অপরাপর রাজপুরুষগণের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত হইল। রাজা ও রাজপ্রতিনিধি প্রকাশ্যরূপে পুনর্ম্মিলিত হইলেন।

এই সুখময়ী ঘটনার পর সেই বর্ষের ৮ই শ্রাবণ দিবসে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সেই দিন মহারাও কিশোরসিংহ মহা-সমারোহে পিতৃপুরুষগণের রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। রাজকুল-পুরোহিত যথাস্থানে চন্দন ও দুর্ব্বাক্ষত দিয়া নবীনরাজকে আশীর্ব্বাদ করিলে ব্রিটিসরাজের প্রতিনিধি সর্ব্বপ্রথম কিশোরসিংহের ললাটে রাজতিলক অঙ্কন করিলেন এবং তাঁহার শিরোদেশে মুক্তামণ্ডিত দিব্য রাজমুকুট ও গলদেশে রত্নহার পরাইয়া দিয়া কটিতটে দিব্য অসি সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। চারিদিকে শঙ্খনাদ, হুলুধ্বনি ও মঙ্গল আরতি হইতে লাগিল। অতঃপর মহারাও তেজস্বিনী বক্তৃতায় বৃটিস গবর্ণমেণ্টের গুণকীর্ত্তন করিয়া একশত একটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা ইংরাজকে নজর প্রদান করিলেন। অনন্তর বৃটিস-এজেণ্ট ভারতের শাসনকর্ত্তার নাম করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে একটি সম্মানসূচক সজ্জা উপহার প্রদান করিলে, তৎপরিবর্ত্তে রাজাও তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি মোহর নজর প্রদান করিলেন।

এই সময়ে মধুসিংহ রাজপ্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সমস্ত গণ্ডগোল দুরীভূত হইল। রাজ-প্রতিনিধির সহিত মহারাওয়ের যে পুনর্ম্মিলন হইল, তাহা দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং নূতন রাজ-প্রতিনিধি মধুসিংহের হৃদয়ে তদীয় কর্ত্তব্যের গুরুত্ব দৃঢ় অঙ্কিত করিবার অভিলাষে এজেণ্ট মহোদয় আরও একমাস কোটায় অবস্থিতি করিলেন। অতঃপর কোটায় সুখশান্তি স্থাপন করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন সেই প্রকাশ্যসভায় বৃদ্ধ রাজপ্রতিনিধি জালিম দুইটি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জগতে মহাপুণ্যসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। একখানি স্বত্বপত্র লিখিয়া তিনি সেই দিন সকলের সমক্ষে তাহা স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "যদি আমার উত্তরাধিকারীরা এই সকল বর্ত্তমান কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ অবস্থিতি করিতে পারিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এখন এই স্বত্বপত্রে আপনারা তিন জনে স্বাক্ষর করিলেই আমি সুখী হই।" তদনুসারে মহারাও কিশোরসিংহ, নবীন রাজপ্রতিনিধি মধুসিংহ এবং এজেণ্টসাহেব তৎক্ষণাৎ বিনা আপত্তিতে তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহাই দুইটি অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটির দ্বারা তিনি কোটার সর্ব্বস্থলে অকারণ অর্থদণ্ড (করভার) রহিত করিয়া দিলেন। জালিম এই কার্য্য করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। ফলতঃ তাঁহার কোটারাজ্য সুখশান্তির ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়

গরধনদাসের নির্ব্বাসন, মালবে তাঁহার পুনরাবির্ভাব, কোটারাজ্যে বিবাদারম্ভ, দুর্গ অবরোধ, সদলে মহারাওয়ের পলায়ন, মহারাওয়ের বুন্দিত্যাগ, বৃন্দাবনে তাঁহার গমন, ব্রিটিস-গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কতিপয় প্রধান প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারীর সহিত গরধন-দাসের ষড়্‌যন্ত্র, সন্ধিবন্ধনের পরিশিষ্ট সূত্রগুলির অনুশীলন, রাজপ্রতিনিধির সঙ্কট, বৃটিসসেনার যুদ্ধযাত্রা, মহারাওকে আক্রমণ, তাঁহার পরাজয় ও পলায়ন, ভ্রাতা পৃথ্বীসিংহের মৃত্যু, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, মিবারে কৃষ্ণ-মন্দিরে মহারাওয়ের গমন, জালিমসিংহের মৃত্যু।

পুত্র শতগুণে অপরাধী হউক না কেন, জন্মদাতা পিতার হৃদয় হইতে সুতস্নেহ কখনই বিলুপ্ত হয় না। গরধন জালিমের বার্দ্ধক্যের সন্তান, বিশেষ স্নেহের আস্পদ। তাঁহার নির্ব্বাসনদণ্ডের সময় পিতার হৃদয় যে মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু নীতিবিশারদ রাজপ্রতিনিধি স্বীয় সহিষ্ণুতাগুণে হৃদয়মধ্যেই তাহা বিলীন রাখিয়াছিলেন।

নির্ব্বাসিত হইয়া হতভাগ্য গরধন দিল্লীতেই আপনার বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইল। তথায় সপরিবারে গমনপূর্ব্বক উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সে বিষম মনোবেদনার সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিল। তত্রত্য ব্রিটিস-কর্ম্মচারী প্রয়োজনমত তাহাকে কতিপয় অশ্বারোহী প্রদান করি-লেন। মুক্তকারাগারে গরধন ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করিত। গরধন নির্ব্বাসিত হইল বটে, কিন্তু অণু-মাত্রও নিরুৎসাহ হইল না।

কিছু দিন অতীত হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ অতীতপ্রায়। এমন সময় মালবের অন্তর্গত জাবোয়ার সামন্তনৃপতির একটি আত্মজকন্যার সহিত গরধনের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। সেই শুভবিবাহব্যাপার সম্পাদন করিবার জন্য তিনি রাজার আদেশে জাবোয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে না হইতে এ দিকে কোটা নগরে ভাবী বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। রাজধানীর মধ্যে অলক্ষিতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইল। জাবোয়া, বুন্দি ও কোটার মধ্যে গূঢ়ভাবে ষড়্‌যন্ত্র রচনা হইতে লাগিল। চতুর জালিম এ গুপ্তচক্রের কিছুই জানিতে পারিলেন না। ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল; রাজধানীমধ্যে একটি বিদ্রোহের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। জালিম অবহিতভাবে বিদ্রোহীদিগের দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সৈয়দ আলী নামক এক মুসলমান প্রায় ত্রিংশবর্ষ রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনি রাজ-পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। জালিম শুনিতে পাইলেন যে, সৈয়দ আলী সেই ষড়্‌যন্ত্রের একজন প্রধান চক্রী। চতুর জালিম তখন রাজকীয় সেনাদলের সহিত দুর্গের মধ্যে একটি অপর বাহিনী রক্ষা করিলেন। মহারাও কিশোরসিংহ দুর্গ হইতে সৈয়দ আলী-সমীপে যাহাতে পত্রাদি প্রেরণ করিতে না পারেন, ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুর্গ হইতে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে পত্রবাহককে জালিমের সেনাদলের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। জালিম এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহারাও কিশোরসিংহ দুর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক জলপথ দিয়া সেনাপতি ও তদধীন বাহিনীর এক অংশ দুর্গমধ্যে আনয়ন করিলেন। জালিম তখন একখানি শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক একদল সেনা লইয়া সৈয়দ আলীর

অবশিষ্ট দলের উপর আপতিত হইলেন। এ দিকে আর এক দল দুর্গ আক্রমণ করিল। উভয় দিকেই হুলস্থুল বাধিল। আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া কুমার পৃথ্বীসিংহ ও নিজ দলবল সমভি-ব্যাহারে মহারাও নৌকারোহণপূর্ব্বক বুন্দিরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

এই ভীষণ গণ্ডগোলের সময় কাপুরুষ বিষণসিংহ জালিমের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। কি উপায়ে যে জালিম ও মহারাও উভয়ের মানরক্ষা হয়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে অধর্ম্মের প্ররোচনাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। বৃটিস এজেণ্ট বুন্দিপতিসমীপে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, "সগোত্রীয় পলায়িত নৃপতিকে আশ্রয় দিয়া আপনি স্বীয় আতিথেয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; মহারাজের অতিথিসৎকারে বাধা দিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, কিন্তু যদি ইহা দ্বারা রাজ্যের শান্তিভঙ্গের উপক্রম হয়, যদি রাজপ্রতিনিধির প্রতিকূলে শত্রুতাচরণের জন্য পলায়িত কোটাপতি আপনার রাজ্যে সেনাদল সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে আপনি বিদ্রোহের দায়ী হইবেন।" এ দিকে নিমচনগরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সেনাদল ছিল, তাহার নায়কের প্রতি আদেশ আসিল, "গরধনদাস যদি জাবোয়া হইতে বুন্দিতে আগমনে উদ্যত হয়, তাহা হইলে পথিমধ্যে তাহাকে ধৃত করিবে। তাহাতে তাহার মৃত্যু হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবিত বা মৃত, যে অবস্থাতেই সে থাকুক, বন্দী করিবে।" আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ইংরাজ সেনাপতি সদলে জাবোয়া ও বুন্দির মধ্যভাগে সেনাদল স্থাপনপূর্ব্বক সতর্কভাবে গরধনদাসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুচতুর ঝালা-বীর ইংরাজের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এবং বুন্দিরাজেরও তাহাতে সংস্রব আছে বুঝিয়া মারবারের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সেখানে আশ্রয় না পাওয়াতে পুনরায় তাহাকে দিল্লীনগরে প্রতিগমন করিতে হইল।

কিছু দিন অতীত হইল। মহারাও কিশোরসিংহ পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এ দিকে সর্দ্দারগণ উত্তরপ্রদেশে স্ব স্ব কুটুম্বগণের নিকট পত্রপ্রেরণপূর্ব্বক মহারাওয়ের তীর্থযাত্রার কথা জানাইলেন এবং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। মহারাও বুন্দি হইতে যত উত্তরে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তত্তৎপ্রদেশবাসী সর্দ্দারগণ পরম আদরে ও সম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একমাত্র ভরতপুরের রাজা তাঁহাকে সাদর আমন্ত্রণ করিলেন না। জাটরাজা অন্ধ; তিনি কতকগুলি লোক দ্বারা মহারাওকে কয়েকটি উপঢৌকন দিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু আমন্ত্রণ করিলেন না। জাটের সেই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া মহারাও তৎপ্রেরিত উপহার গ্রহণ করিলেন না। ভরতপুরাধিপ এই সংবাদ পাইয়া সক্রোধে মহারাওকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার রাজ্যের ত্রিসীমায় আপনি আসিবেন না।"

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া মহারাও মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে ক্রমে বিষম বৈরাগ্য জন্মিল। এ দিকে উদ্ধত গরধনদাস দিল্লীবাসী প্রতিষ্ঠান্বিত দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া মহারাও কিশোরসিংহের স্বত্বোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

গরধনদাসের সহযোগীরা মহারাও কিশোরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিল এবং তাঁহার বৈরাগ্যভাব দূর করিয়া তাঁহাকে স্বার্থসাধনে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। অতঃপর কিশোরসিংহ সেনাদল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অনেক ব্যক্তি তাঁহার পক্ষে যোগদান করিল। তখন মহারাও ক্রমশঃ কোটার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে সমস্ত রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনি গমন করিতে লাগিলেন, সেই সমস্ত রাজ্যেই সাদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সকল রাজাদিগের সহানুভূতিলাভের প্রত্যাশায় কিশোরসিংহ বলিতে

লাগিলেন, "ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে আমি রাজাসন পুনগ্রহণার্থ স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিতেছি।" তাঁহার সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেকেই তাঁহার সাহায্যার্থ তৎপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি প্রায় সহস্র লোক সমবেত করিলেন। তখন সদলে চম্বলনদ উত্তীর্ণ হইয়া স্বরাজ্যস্থ সর্দারগণের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, "যদি অধর্ম্মের কবল হইতে ধর্ম্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আশু আমার পক্ষে যোগদান করিবে।" তৎক্ষণাৎ জালিমকে ত্যাগ করিয়া হারসর্দ্দারগণ কিশোরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া কিশোরসিংহ কহিলেন, "বন্ধুগণ! বিবাদ করা আমার ইচ্ছা নহে, যুদ্ধবিগ্রহে শোণিতপাত করিতেও চাহি না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে স্বত্বপত্র প্রদান করিয়া আমাদের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহারই সার্থকতা ইচ্ছা করি।"

একমাস অতীত হইল। অতঃপর কিশোরসিংহ একখানি পত্র দ্বারা ব্রিটিস এজেণ্টকে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ন্যায়ের সম্মান রক্ষিত হয়, সেই পত্রে ইহাই লিখিত ছিল। বস্তুতঃ সে পত্র অন্যায় বলিয়া কেহ নিন্দা করিতে পারে না। ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষার্থ প্রকৃত রাজপুত্রমাত্রই মহারাও কিশোরসিংহের পক্ষে যোগদান করিতে লাগিলেন।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে সমস্ত বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। এত দিনের প্রতিপালক বৃদ্ধ জালিমকে ত্যাগ করিয়া সকলেই মহারাওয়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। জালিম বিষম সঙ্কটাপন্ন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি অতিশয় বিপদে পতিত হইলেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টেরও মহাসঙ্কট উপস্থিত। যদি উপকারী বন্ধুর পক্ষসমর্থন না করেন, তাহা হইলে দুস্তর কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে; আর ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একটি রাজ্যের উপকার করিতে হইলে ধর্ম্মের পবিত্র পথে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে। জালিমের নিকট তাঁহারা উপকৃত, কিন্তু কিশোরসিংহের নিকট ধর্ম্মবন্ধনে সংবদ্ধ। বস্তুতঃ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। সেই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য চতুর ইংরাজ একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। জালিমকে সঙ্কটাপন্ন দর্শনে তাঁহারা মনে করিলেন যে, তিনি এইবার মহারাওয়ের প্রতিকূলে আপত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহারই করে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিবেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজেরা কিয়ৎকাল নিঃসংস্রবভাবে রহিলেন। জালিম তাহা করিলেন না; তিনি স্বীয় কঠোর সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। মহারাও কিশোরসিংহ বিনীত হইবার নহেন। ব্রিটিসের সন্ধিপত্রের একখানি প্রতিলিপি এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া সদর্পে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্বত্বপত্রের প্রতিজ্ঞা পালিত হইবে কি না?" মহাত্মা টড সাহেব নিরপেক্ষভাবে বলিয়াছিলেন, "মূলসন্ধিপত্রে যদি পরিশিষ্ট প্রতিজ্ঞাগুলি সন্নিবেশিত হইত, তাহা হইলে এ সকল হুলস্থূল সহজেই দূর হইয়া যাইত; তাহা হইলে ধর্ম্মের ব্যভিচার হইত না; সার্ব্বভৌম ক্ষমতাও কলঙ্কিত হইয়া পড়িত না। বাস্তবিক সে কলঙ্কারোপের প্রতিকূলে কিছুতেই আত্মসমর্থন করিতে পারা যায় না, কারণ, মূল সন্ধিপত্রের বিধিকর্ত্তারাই সেই পরিশিষ্ট প্রতিজ্ঞাগুলি তাহাতে সন্নিবেশিত করিলেন।"

ক্রমে বিবাদ ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মীমাংসা করিয়া দিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জালিম ও মহারাও কিছুতেই স্ব স্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট জালিমেরই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ব্রিটিসসেনা জালিমের বিশালবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া রাজকীয়সেনার দিকে অগ্রসর হইল। কালীসিন্ধু নামক নদীর পরপারে মহারাও কিশোরসিংহ সসৈন্য অবস্থিত ছিলেন, জালিমের সেনাদলও তটিনীতটে উপস্থিত

হইল। বর্ষাকাল প্রবল ধারাপতনে নদীর উভয় কূল পরিপূর্ণ;—তটে তটে জল। সুতরাং রিপক্ষ-বাহিনী তাহা উত্তীর্ণ হইতে সাহসী হইল না। কিছু দিন এইভাবে অতীত হইল। সেই অবসরে এজেন্টসাহেব মহারাওয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে অনর্থকর সংগ্রাম হইতে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাও কিছুতেই দৃঢ়সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। টড সাহেব বলিলেন, "আপনি বুঝিতেছেন না, এ যুদ্ধে আপনারই পরাজয়ের বিশেষ সম্ভাবনা।" নির্ভয়চিত্তে তৎক্ষণাৎ মহারাও উত্তর করিলেন, "তাহা ত বুঝিতেছি, কিন্তু আশাতৃষ্ণার জলাঞ্জলি দিয়া পুরুষত্ব রসাতলে দিতে পারিতেছি না।"

মহারাও কিছুতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর দিবসে রাজপ্রতিনিধির সেনাদল মহারাও কিশোরসিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। জালিমের অধীনে আট দল পদাতিক, বত্রিশটি কামান এবং চৌদ্দ দল বলবান্ অশ্বারোহী; তন্মধ্যে চৌদ্দটি কামান ও দশটি অশ্বসেনার সহিত পাঁচ দল পদাতি প্রথমে অগ্রসর হইল; অবশিষ্ট সকলে জালিমের সহিত তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ধীরে ধীরে চলিল। দেশীয় পদাতিসেনার পঞ্চম পল্টনের লেফ্‌টেনাণ্ট এম, মিলান জালিমের উক্ত সহকারী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া মহারাওয়ের প্রতিকূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ইংরাজদল দুইটি দুর্ব্বল পদাতি ও ছয়টি অশ্বারোহী লইয়া সংগঠিত। জালিমের দক্ষিণপার্শ্বে ইহারা গমন করিতে লাগিল। যে স্থান দিয়া সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে হইল, তাহা নিতান্ত বন্ধুর, একটি নদী তাহার মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মহারাও কিশোরসিংহের সেনাকটক সেই নদীর অনতিদূরবর্ত্তী একটি উচ্চ-ভূমির উপরিদেশে সন্নিবেশিত। স্বীয় পটগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি সসৈন্যে নদীপুলিনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

কিশোরসিংহের সেনাকটকের চারি শত হস্ত দূরে বিপক্ষসেনা দণ্ডায়মান হইল। মহামতি এজেন্ট-সাহেব ইংরাজ-সেনাপতিকে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়া আর একবার মীমাংসা করিবার চেষ্টায় কিশোরসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মহারাও এবং তদীয় অনুগত সৈন্যসামন্তগণকে বলিলেন, "এখনও সময় আছে, আমার অনুরোধ রাখুন, এখনও আপনারা অনর্থ হইতে নিবৃত্ত হউন। মহারাওকে সম্মানের সহিত কোটার সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক সকলে দেশের শান্তিবিধান করুন্।" এইরূপ প্রস্তাব হইতেছে, এ দিকে উভয়পক্ষের সেনাদল শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইতে লাগিল। ক্রমে সকলে যুদ্ধের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। এজেন্ট-সাহেবের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। কিশোরসিংহ কহিলেন, "আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমি যুদ্ধসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারি, নচেৎ অদৃষ্টপরীক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলাম।"

যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মহারাওয়ের নির্ব্বাচিত বাহিনী জালিমের দলবলকে আক্রমণ করিল। অজস্র গোলকপুঞ্জ নিক্ষিপ্ত হইয়া গগনমণ্ডল ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিক্ হইতেই লোহিতবর্ণ গোলকপুঞ্জ বজ্রনাদে ছুটিয়া আসিতেছে। রাজকীয় বাহিনীর অনেকগুলি বীর রণভূমে শয়ন করিলেন; কিন্তু তথাপি কেহ নিরুৎসাহ নহে; বরং দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে দুই চারিটি করিয়া হারাবতীর অনেকগুলি বীর নিপতিত হইলেন। অবশিষ্ট সকলে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিতে অগ্রসর হইল। জালিমের আগ্নেয়াস্ত্র-সম্মুখে পড়িয়া অনেকে

প্রাণত্যাগ করিল। জালিমের বামপার্শ্বস্থ যোদ্ধৃগণ ক্রমে নিস্তেজ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে পূর্ব্বকথিত তিন দল বৃটিস অশ্বসেনা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের পৃষ্ঠপোষকরূপে দাঁড়াইল এবং প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত রাজকীয় সেনার উপর গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাও কিশোরসিংহ তখন অশ্বারোহী চারি শত হারবীর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চাদপসৃত হইতে লাগিলেন। ক্রমে শত্রুসেনার আট মাইল দূরবর্ত্তী সেই উচ্চভূমির উপর দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সহকারী পদাতিক সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। বৃটিস-সেনা নদী উত্তীর্ণ হইল। তাহাদের পদাতিকগণ পলায়মান রাজকীয় সৈন্যদিগের পথরোধ করিবার জন্য দক্ষিণদিক্ হইয়া ত্বরিতগতিতে ধাবমান হইল; এ দিকে মহারাওকে আক্রমণ করিবার জন্য দুইটি অশ্বারোহী দলও তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মহাতেজা মহারাও কিশোরসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রাণ থাকিতে ব্রিটিসসেনাকে অগ্রে আক্রমণ করিবেন না, সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিলেন। সেনাপতি কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া তিনি উচ্চভূমে দণ্ডায়মান রহিলেন। সম্মুখে বিপক্ষগণ আস্ফালন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়া রাজকীয় সেনারা একপদও অপসৃত হইল না। জালিমের প্রত্যেক সেনাদলের সম্মুখে এক এক জন বৃটিস সেনানী অগ্রবর্ত্তী। তাহারা সকলেই সমরদক্ষ। বৃটিসসেনাকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিশোরসিংহ পদমাত্রও অপসৃত হইলেন না। তদ্দর্শনে বৃটিসসেনাগণ বিস্মিত হইল। বলমদে উন্মত্ত হইয়া ব্রিটিসসেনাগণ যেমন রাজপুতবীরগণকে আক্রমণ করিল, অমনি রাজপুতবৃন্দও আত্মরক্ষার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের অব্যর্থ সন্ধানে ক্লার্ক ও রীড নামক দুইটি ইংরাজযোধ রণভূমে শয়ন করিলেন। তাঁহাদের বীর্য্যবান্ সেনাপতি কর্ণেল জোরিজ অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই সমস্ত কাণ্ড শেষ হইয়া গেল। দুইটি যোধকে ভূশায়ী এবং সেনাপতিকে আহত দর্শনে শত্রুসেনা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তবোধে মহারাও কিশোরসিংহ সদলে রণভূমি হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, ইংরাজকে অগ্রে আক্রমণ করিবেন না, সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইল। তাঁহাকে রণভূমি হইতে বিদায় লইতে দেখিয়া হতোদ্যম শত্রুদল পুনরুৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তাহারা সাহসে ভর করিয়া আবার রাজাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু মহারাও তখন একটি নিবিড় জনারক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন; সুতরাং বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ হইল।

বীর পৃথ্বীসিংহ মহারাও কিশোরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিও সেই যুদ্ধে জ্যেষ্ঠের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। চিরগৌরবান্বিত হারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমা উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ তিনি পঞ্চবিংশতিমাত্র অশ্বারোহী সহ জ্যেষ্ঠের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার প্রায় সমস্ত সৈন্যের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং গুরুতর আহত হইয়া একটি শস্যক্ষেত্রের মধ্যে পতিত ছিলেন। ব্রিটিসসেনা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া একখানি শিবিকায় স্থাপনপূর্ব্বক শিবিরে আনয়ন করে; উপযুক্ত চিকিৎসারও ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে পৃথ্বীসিংহ যুদ্ধের পরদিবসেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মযুদ্ধে পৃথ্বীসিংহের মৃত্যু হয় নাই। এক জন কাপুরুষ অলক্ষিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে শূল বিদ্ধ করিয়াছিল। আহত হইবামাত্র তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হন। সেই সূত্রেই অকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পৃথ্বীসিংহের হৃদয় উচ্চ ও সাহসপূর্ণ। মৃত্যুর প্রাক্কালেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভীত হন নাই।

যৎকালে কালের করালমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন কুমার পৃথ্বীসিংহ এজেণ্ট-সাহেবকে বলিলেন, "সাহেব! আমি মৃত্যুতে ভয় করি না, আমার বাঁচিবার সাধ নাই; অধীন জীবন রাজপুতের পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র।" অতঃপর তিনি শিবিরের অনতিদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আবার বলিলেন, "সাহেব! আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইল, কিন্তু আমার অবিনশ্বর প্রেতাত্মা ঐ বৃক্ষোপরি থাকিয়া মদীয় পিতৃপুরুষদিগের লীলাক্ষেত্র দর্শন করিবে।" তাহার পর পৃথ্বীসিংহ আপন তরবারি, মুক্তামালা ও অন্যান্য মহার্হ অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক এজেণ্টের হস্তে প্রদান করিলেন;—বলিলেন, "আপনিই এখানে আমাদের একমাত্র বন্ধু, আজি হইতে আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার এবং আমার পুত্রের একমাত্র রক্ষকরূপে বিদ্যমান রহিলেন। আপনার আশ্বাস পাইলে আমি সুখে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" উদারমতি এজেণ্টসাহেব মুমূর্ষু রাজকুমারকে উপযুক্ত আশ্বাস প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের প্রাণ অদৃশ্য হইল।

পৃথ্বীসিংহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন, জালিম ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কণ্টক দূর হইল। এ দিকে মহারাও কিশোরসিংহ সদলে সেই নিবিড় জনারণ্যক্ষেত্রাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ছিলেন, শত্রুকুল তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। যে সমস্ত পদাতি সেনা তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলায়নপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রিটিস অশ্বারোহিগণের সম্মুখে পতিত হইল। নিষ্ঠুর বিপক্ষগণ তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সংহার করিল।

এই ভয়াবহ সংগ্রামে দুইটি হারবীর অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। মহাত্মা টড ও মিলান সাহেব স্বচক্ষে সেই দুই বীরের রণনৈপুণ্যদর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন, "গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে তত্তদ্দেশীয় বীরবৃন্দের যে সমস্ত বীরত্বকাহিনী পাঠ করিয়াছি, উক্ত দুই হারবীর তাঁহাদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ।" রণভূমির মধ্যস্থল দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই নদীর একদিকের তটভূমি অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ, অন্যতীর উচ্চ প্রাকারবৎ। জালিমের পদাতি সেনা দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সেই উচ্চ তট দিয়া অগ্রসর হইতেছে, ইত্যবসরে নিকটবর্ত্তী একটি বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতকূট হইতে তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ হইতে লাগিল। বিস্মিত হইয়া সকলে সেই পর্ব্বতকূটের দিকে নেত্রপাত করিল;- দেখিল দুইটি যোদ্ধা পর্ব্বতকূটোপরি দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের উপর অজস্র গুলীবর্ষণ করিতেছে। একজন পশ্চাতে থাকিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত করিয়া দিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি অব্যর্থসন্ধানে তদনুরূপ ক্ষিপ্রহস্তে তাহা নিক্ষেপ করিতেছে। জালিমের সেনাদল কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দভাবে সেই অদ্ভুত বীরদ্বয়ের রণনৈপুণ্য দেখিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাহাদের উপর গুলী নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অজস্র গুলীবর্ষণ হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অসংখ্য গুলিকাঘাতেও তাহাদের কিছুই হইল না; কিন্তু তাহাদের সেই একমাত্র বীরের অব্যর্থসন্ধানে জালিমের অনেকগুলি সৈন্য দারুণ আহত হইল। তখন জালিমের সেনাদল হইতে দুইটি ছয় সেরা কামান সজ্জিত হইয়া বজ্রনাদে জ্বলন্ত গোলক উদ্গারপূর্ব্বক সেই অদ্ভুত বীরদ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের কোন অনিষ্ট হইল না; বরং বিকটহাস্যসহকারে উভয়েই সেই পর্ব্বতকূটের উচ্চতম শিরে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণকে দুইবার সেলাম করিলেন এবং পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থানে প্রতিগমনপূর্ব্বক আবার রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের প্রতি আরও অনেকগুলি অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল; কিছুতেই কিছু হইল না; বরং বিপক্ষসেনা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ ও হতবল হইতে লাগিল। পরিশেষে শত্রুসেনাপতি আপন সৈন্যগণকে অস্ত্রক্ষেপণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ঈদৃশ বীরদ্বয়ের প্রাণবধ করা

অনুচিত ; চল, আমরা উহাদিগকে ধৃত করি ; অথবা যদি কেহ সাহসী হও, উহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ কর।" তৎক্ষণাৎ দুই জন রোহিলা-সৈনিক স্ব স্ব তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতকূটে আরোহণ করিল। অবশিষ্ট সকলে নিষ্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বীরদ্বয় অমনি প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। একে শত্রুনিক্ষিপ্ত অসংখ্য গুলিকাঘাতে সেই বীরদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত-ধারা অবিরলধারে বিগলিত হইতেছিল, তাহার উপর বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর কত সহ্য করিবেন ? ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া অবশেষে বীরদ্বয় সেই পর্ব্বতকূটের উপরিভাগে প্রাণত্যাগ করিলেন। যে দুই মহাবীর ইতিপূর্ব্বে শত্রুর দশটি পদাতিদল এবং বিংশতি কামানের প্রভাব প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহারা নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িলেন। আর সে বীরদ্বয় গাত্রোত্থান করিলেন না, আর কেহ তাঁহাদের বিস্ময়কর রণনৃত্য দেখিতে পাইল না।

রাজপুতের ন্যায় রাজভক্ত জাতি জগতে আর নাই। রাজার জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। কিশোরসিংহের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া সেই ভক্ত হারসমিতি যুদ্ধস্থলে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই ; তথাপি সেই রাজভক্তপ্রাণ হারবীরগণ মুহূর্ত্তের জন্যও কিশোরসিংহকে পরিত্যাগ করে নাই। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের পর মহারাওয়ের সহিত সকলে পার্ব্বতীনদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতে তখন নৌকাদি কিছুই ছিল না, অগত্যা কিশোর-সিংহকে সন্তরণ দ্বারা পরপারে গমন করিতে হইল। নদীগর্ভ হইতে তিনি তীরে উত্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার অশ্বটি প্রাণত্যাগ করিল। মহারাও তখন পার্শ্বস্থ একজন অনুচরের বাহনে আরোহণ করিয়া তিন শত অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে বরদানগরে উপস্থিত হইলেন।

সংসারের অসারতা দেখিয়া, মানবের স্বার্থপরতা দেখিয়া, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ জগতের অলীকতা বুঝিতে পারিয়া মহারাও কিশোরসিংহের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাজ্য ও ধনসম্পত্তি কেবল অনর্থের মূল, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। বরদা পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি মিবারে উপস্থিত হইয়া নাথদ্বারে ভগবান্ বালমুকুন্দের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছু দিন পরে আবার তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। এত দিন তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, ব্রিটিসের পরিশিষ্ট সন্ধিপত্র কদাচ গ্রাহ্য করিবেন না, এক্ষণে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে এজেণ্ট-সাহেব মধ্যস্থ হইয়া জালিমকে বলিলেন, "যে সর্দ্দার ও সৈনিকগণ মহারাও কিশোরসিংহের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা এখন সমূহ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে, দেশে প্রত্যাগত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও দণ্ডভয়ে তাহারা আসিতে পারিতেছে না ; অতএব আপনি তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন্।" এজেণ্ট-সাহেবের অনুরোধ তৎক্ষণাৎ রক্ষিত হইল। আশ্বাস পাইয়া সর্দ্দারগণ নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আবার তাহারা স্বদেশের শান্তি-নিকেতনে আশ্রয়লাভ করিয়া সুখে দিনপাত করিতে লাগিল।

অতঃপর জালিমের সম্মতিক্রমে এজেণ্ট-সাহেব মহারাও কিশোরসিংহের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। মহারাও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন, পত্রগর্ভে ইহাই সবিনয়ে লিখিত হইয়াছিল। কিশোরসিংহ স্বদেশে আসিতে সম্মত হইলেন। তখন এজেণ্ট-সাহেব একখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে উভয়পক্ষের অবস্থা ও কর্ত্তব্য স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইল ; যাহাতে

ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে আর বিবাদ উত্থিত না হয়, তদুপযোগী কয়েকটি বিধি ও ব্যবস্থা অঙ্গাতে লিখিত থাকিল এবং রাজার ক্ষমতা ও সম্মান উপযুক্তপাত্রে পুনরর্পিত হইল। রাজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তা করাই সেই সন্ধিপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে সকল কুচক্রী অনর্থকর পরামর্শ দিয়া মহারাওকে এতদিন দেশ-দেশান্তরে লইয়া বেড়াইল, তাহারা এখন তাঁহাকে স্বদেশগমনে উদ্যত দেখিয়া লজ্জিত হইল; কিন্তু তাহারা নিরুদ্যমে থাকিবার লোক নহে। একটি মিথ্যা ও জঘন্য উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারা মহারাওকে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিল। তাহারা একটা ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া কিশোরসিংহকে বলিল, "জালিমের পুত্র মধুসিংহ মহারাওয়ের ভ্রাতা বিষণসিংহের নাসা-কর্ণ ছেদনপূর্ব্বক রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে।" সেই ছিন্নাঙ্গের আকৃতি ও মুখভাবের সহিত রাজপুত্র বিষণসিংহের অনেক সাদৃশ্য ছিল। প্রথমে অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিল বটে; কিন্তু সত্যকথা অল্পকাল মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িল; তখন শিশোদীয়রাজ সেই প্রতারককে ধৃত করিয়া স্বনগরে আনয়নপূর্ব্বক তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। অতঃপর প্রকাশ পাইল, দুশ্চরিত্র প্রতারক জয়পুরের একজন প্রজা; দুষ্কর্ম্মের শাস্তিস্বরূপ রাজবিচারে তাহার নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল।

অতঃপর মহারাও কিশোরসিংহ নাথদ্বার হইতে স্বরাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বৎসরের শেষদিনে রাজপ্রতিনিধি জালিম বৃটিশ-এজেন্ট সাহেবের সহিত কোটারাজের প্রত্যুদগমনে বহির্গত হইলেন। রাজাকে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত দেখিয়া প্রজাবৃন্দের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সেই শুভদিনে শুভক্ষণে মহারাও কিশোরসিংহ প্রফুল্লচিত্তে পিতৃপুরুষগণের রাজাসনে আর একবার উপবেশন করিলেন।

সেই দিন কোটারাজ্যে কতকগুলি নূতন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। যথানিয়মে বিধিগুলি পালনের তত্ত্বাবধানের জন্য বৃটিস-গবর্ণমেণ্টের একজন রেসিডেণ্ট কোটার রাজসভাতলে রক্ষিত হইলেন। নূতন নূতন নিয়মগুলির বিধি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল যে, মহারাওয়ের স্বকীয় ব্যয়ভূষণ ভিন্ন রাজপরিবারের আরও অনেক অনেক বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার করে অর্পিত থাকিবে। রাজার আদেশ ব্যতীত দান, ধ্যান ও উৎসবামোদ প্রভৃতি ব্যাপারের ব্যয় প্রদত্ত হইবে না। উৎসবের সময় ধ্বজদণ্ড প্রভৃতি যে সকল রাজচিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তৎসমস্তই দুর্গাভ্যন্তরে তাঁহার প্রাসাদে থাকিবে, তাঁহার আদেশ ভিন্ন কেহই তাহা ব্যবহার করিতে পাইবে না। প্রত্যেক সমারোহ ব্যাপারে সদলে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিবেন; তাঁহারই নামে পুরস্কার ও উপহারাদি প্রদত্ত হইবে। রাজধানীর মধ্যস্থ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের মধ্যে তিনি যেখানে ইচ্ছা বাটী ও উদ্যানাদি স্থাপন করিতে পারিবেন। এই সকল নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে আরও ধার্য্য হইল, স্বর্গীয় পৃথ্বীসিংহের অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র ভরণপোষণার্থ উপযুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। ভ্রাতৃদ্রোহী বিষণসিংহ রাজধানীর দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অন্তানগরে বিতাড়িত হইলেন; তথায় তিনি উপযুক্ত জায়গীরের অধিকারী হইয়া রহিলেন।

কোটারাজ্য সুখশান্তির আগার হইয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে পুনর্ব্বার সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইল। অতীত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া সকলেই সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এজেণ্ট-সাহেব আরও একমাস কোটা নগরে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার বিশেষ উদ্যোগে কোটারাজ্য শান্তিসলিলে ভাসমান হইল। যে মধুসিংহ ইতিপূর্ব্বে কিশোরসিংহের চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, সেই মধুসিংহ ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে মহারাও কিশোরসিংহ তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলেন;

মহারাও তাঁহার করে করস্থাপন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই সুখকর দৃশ্য দর্শনে জালিমেরও আনন্দের অবধি রহিল না।

অতঃপর জালিমের ইচ্ছা হইল, সমগ্র কোটারাজ্য পরিভ্রমণপূর্ব্বক রাজ্যের অবস্থা পরিদর্শন ও প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করেন। তৎক্ষণাৎ রাজ্যভ্রমণের সমস্ত আয়োজন হইল। তখন অন্ধ বৃদ্ধ রাজপ্রতিনিধি কতকগুলি যানবাহন ও অনুচরসহ কোটার নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত, প্রজাপুঞ্জও সকলেই পরমসুখে অবস্থিত। জালিমের আনন্দের অবধি রহিল না। সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন, এদিকে রাজা নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; সর্দ্দার ও সামন্তগণ স্ব স্ব জায়গীর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সুখে রাজার যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে পঞ্চাশীতিতম বয়ঃক্রমকালে জালিম ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যৌবনাবস্থায় জালিম অতীব মল্লযুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই আমোদে নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রকাশ পাইত। বাঘনখ নামক একপ্রকার অস্ত্র ছিল, জালিম মল্লদিগের হস্তে এক একটি করিয়া সেই অস্ত্রপ্রদান করিতেন। মল্লগণ সেই অস্ত্রদ্বারা পরস্পরের গাত্রে আঘাত করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিত। একদা শ্রীজী দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই বীভৎসদৃশ্য নেত্রগোচর করেন। তাঁহারই অনুরোধে ও উপদেশে সেই দিন হইতে জালিম এই পাশব আমোদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ই জালিমের অজ্ঞাত ছিল না। এক কথায় তিনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি পর্ব্বতশিরে মৃত্তিকানিক্ষেপপূর্ব্বক তদুপরি মনোহর উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে যত প্রকারের সুন্দর সুন্দর ফল পুষ্প আছে, সে উদ্যানে তৎসমস্ত বৃক্ষই রোপিত হইয়াছিল এতদ্ব্যতীত প্রায় ত্রিংশৎসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে তিনি সেই উদ্যানে একটা স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্‌যোগে দেশে শাল, লুই, ধোসা প্রভৃতি উত্তম উত্তম উর্ণবাস প্রস্তুত হইত; রাজ্যমধ্যে যুদ্ধোপকরণ অস্ত্রশস্ত্রাদিও বিস্তর নির্ম্মিত হইত। জালিম উৎকৃষ্ট কেওড়া, গোলাপজল ও আতর প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতে জানিতেন।

ঐন্দ্রজালিক ও ডাকিনীগণের প্রতি জালিমের আন্তরিক ঘৃণা ছিল। ডাকিনীগণকে তিনি অতি নিষ্ঠুররূপে দণ্ড প্রদান করিতেন। তাহারা হস্তপদবদ্ধ হইয়া জলাশয়গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত। জলমগ্ন হইয়া পড়িলেই তাহারা নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইত, কিন্তু ভাসিতে থাকিলে দোষী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

রাজকার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্র অবসর পাইলেই জালিম অনুচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে মৃগয়াযাত্রা করিতেন; মৃগয়াবসানে স্নিগ্ধচ্ছায়-তরুতলে সকলের সহিত বনভোজন করিতেন। অন্ধ হইবার পর তিনি স্বহস্তে পত্রাদি স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না, এই জন্য হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিস্বরূপ একটি মোহর ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত একটি কর্ম্মচারীর নিকট সেই মোহরটি থাকিত। কর্ত্তব্যকর্ম্মে জালিমের ঔদাস্য ছিল না। তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন, যাহা করণীয় বলিয়া স্থির হইত, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার চরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেয় ছিল। তিনি কখনও কাহার নিকট হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন নাই; সুতরাং তাঁহার হৃদয়মন্দিরে যে কিরূপ চরিত্রের

চিত্র অঙ্কিত আছে, কেহই তাহা নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় নাই ফল কথা, তাঁহার চরিত্র গূঢ় দুর্জ্জেয় ও অমানুষিক।

এই স্থানেই কোটা-রঙ্গভূমির যবনিকা পতিত হইল। কোটার ইতিবৃত্ত এই স্থানেই পরিসমাপ্ত। জালিমের জীবনীই এই ইতিবৃত্তের প্রধান উপকরণ ও প্রধান অবলম্বন। বৃটিসসিংহের সহায়তায় কোটারাজ্যে সুখশান্তিবিধান হইল, সকলেই দুই হাত তুলিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। *

* কোটারাজ্যের পরিমাণ পাঁচহাজার বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ; মহারাওয়ের তত্ত্বাবধানে যতগুলি সৈন্য আছে, তাহার মধ্যে অশ্বারোহীর সংখ্যা ৭০০ শত, পদাতিসংখ্যা ৫৬০০ এবং কামানসংখ্যা ১১৯টি।

যশল্মীর

প্রথম অধ্যায়

——:*:-

যশল্মীর নামের ব্যুৎপত্তি, যাদব ভট্টিগণ, অন্তর্বিপ্লব, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রপৌত্রগণ, নব ও ক্ষীর, ঝারিজা ও যাদভান, সিন্ধুশ্যামবংশ-স্থাপন, পৃথ্বীবাহু, গজনীনগর-প্রতিষ্ঠা, গজনী আক্রমণ, কাশ্মীর আক্রমণ, গজনীর পতন, গজরাজের মৃত্যু, শালিবাহন, শালিবাহনপুর-প্রতিষ্ঠা, পঞ্জাব জয়, শালিবাহনের বিবাহ, বলন্দ, চাকিতো, বলন্দ রাজার মৃত্যু, ভট্টিকুল, মঙ্গলরাও, মনসুর রাও, তক্ষক জাতি, মাজুন রাও, কেহুড়, খানোট নগর-প্রতিষ্ঠা, কেহুড়ের অভিষেক, খানোট আক্রমণ, বারাহাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন।

যশল্মীর ভারতমরুস্থলীর অন্তর্গত। ইহার অপর নাম মীর ও মেরু এই রাজ্য পর্ব্বতমণ্ডিত। যদুকুলসম্ভূত ভট্টিগণ বহুদিন হইতে এই রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন।

যাদবগণ চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন। ইঁহাদের আদিম বাসস্থান প্রয়াগপুরী। তাহার পর রাজা পুরুরবা মথুরানগরী প্রতিষ্ঠা করিলে যদুকুল বহুদিন পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। অতঃপর দ্বারকানগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন।

ভীষণ গৃহবিবাদে যদুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের দুইটি পুত্র ও অন্যান্য সন্তান-সন্ততিগণ ভারতভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধুনদের পরপারে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা অষ্টমহিষীর মধ্যে রুক্মিণী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়। বিদর্ভরাজনন্দিনীর সহিত প্রদ্যুম্নের বিবাহ হয়। বিদর্ভকুমারীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের দুই পুত্র জন্মে; একের নাম অনিরুদ্ধ, দ্বিতীয়ের নাম বজ্র। বজ্র হইতেই যশল্মীরের ভট্টিগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

যদুকুল নির্ম্মূল হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করেন। বজ্র সেই সময় পিতার পাদপদ্মদর্শনার্থ মথুরা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বিংশতি ক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হইবামাত্র তিনি শুনিলেন, যদুকুল সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। সেই হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইবামাত্র তিনি পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ;—নব ও ক্ষীর। পিতার মৃত্যুর পর নব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মথুরানগরে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্ষীর দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

এক সময়ে যাদবগণের প্রতাপে সমগ্র ভারত কম্পিত হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা সার্ব্বভৌম আধিপত্য পরিচালন করিয়াছিলেন ; এখন অন্যান্য রাজপুতবৃন্দ অবসর বুঝিয়া যাদবগণের দমনার্থ রাজা নবকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া নব পবিত্র মথুরাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিমদেশীয় মরুস্থলীতে গিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন !

নবের পুত্র পৃথ্বীবাহু এবং ক্ষীরের পুত্র ঝারিজা ও যাদভান। কোন সময়ে যাদভান তীর্থযাত্রায়

বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে এক দিন নিদ্রায় অভিভূত আছেন, ইত্যবসরে তাঁহার কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তদীয় মনোভিলাষ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। যাদভান গাত্রোত্থান করিবামাত্র দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বর প্রার্থনা কর?" যাদভান বলিলেন, "আমাকে বাসোপযুক্ত ভূমি প্রদান করুন।" "এই পার্ব্বত্য প্রদেশেই তুমি রাজত্ব কর" এই কথা বলিয়াই দেবী তিরোহিত হইলেন। যাদভান স্বপ্নের বিষয় আন্দোলন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে এক অস্পষ্ট কোলাহল তাঁহার শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তত্রত্য রাজা সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্রসন্তান নাই; সেই জন্য উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিষম হুলস্থূল পড়িয়াছে। রাজ্যের প্রধান অমাত্য বলিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক বংশধর বিহারে উপস্থিত হইয়াছেন।" এই বলিয়াই মন্ত্রিবর তাঁহাকে লইয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। মন্ত্রীর প্রস্তাবে সকলেরই অনুমোদন হইল। যাদভান রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই ঐ প্রদেশ যদুকা-ডাঙ্গা নামে অভিহিত হইল। যাদভান অনেকগুলি সন্তান সন্ততির পিতা ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাজচ্ছত্র ও রাজনিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া পৃথ্বীবাহু মরুস্থলীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীবাহুর পুত্র বাহুবল। মালবপতি বিজয়সিংহের কন্যা কমলাবতীর সহিত বাহুবলের বিবাহ হয়। শ্বশুরের নিকট তিনি যৌতুকস্বরূপ সহস্র খোরাসানী তুরঙ্গ ও পঞ্চশত দাসী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কমলাবতীই তাঁহার প্রধানা মহিষী। তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র জন্মে;—নাম বাহু। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হওয়াতে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। তাঁহার পুত্র সুবাহু। অজমীরের চৌহানরাজ মুণ্ডের কন্যার সহিত সুবাহুর বিবাহ হয়। পত্নীর হস্তে বিষপ্রয়োগে সুবাহু প্রাণত্যাগ করেন। সুবাহুর পুত্রের নাম রিবন্। ইনি দ্বাদশবর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মালবপতি বীরসিংহের কন্যা সুভগাকে ইনি বিবাহ করেন। গর্ভবতী অবস্থায় সুভগা স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন একটি শ্বেত হস্তী প্রসব করিয়াছেন। যথাকালে তাঁহার গর্ভে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র জন্মে। সেই পুত্র গজ নামে প্রসিদ্ধ।

গজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বদেশাধীশ্বর যাদভান তাঁহার নিকট বিবাহের সম্বন্ধসূচক নারিকেলফল প্রেরণ করিলেন। হঠাৎ সংবাদ আসিল, যে সমস্ত ম্লেচ্ছ ইতিপূর্ব্বে সুবাহুকে আক্রমণ করিয়াছিল, প্রায় চারি লক্ষ সেনাসহ তাহারা সাগরতীর হইতে পুনরায় মরুস্থলীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। খোরাসানের খাঁ তাহাদের সেনানী। সংবাদ পাইবামাত্র রাজা রিবন্ গোপনে চর প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সসৈন্যে হারিয়ু নামক স্থলের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষসেনা কুল্লসহরের দুইক্রোশ দূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। অচিরেই একটি যুদ্ধ বাধিল। শত্রুপক্ষের ত্রিংশৎসহস্র বীর এবং চতুঃসহস্র হিন্দুসৈন্য সেই রণক্ষেত্রে শয়ন করিল। ম্লেচ্ছগণ পরাজিত হইয়াও আবার নববল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সসৈন্য হিন্দুগণের সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধেই রিবের প্রাণবিয়োগ হইল। এই সময়েই রাজকুমার গজ যাদভানকুমারী হংসবতীকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। উপর্য্যুপরি দুইটি যুদ্ধেই খোরাসানপতি পরাভূত হইল। অবশেষে কাফেরের রাজ্যে ইসলামধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য মরুরাজ তাহার সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন অসুরগণ এই প্রকারে আত্মবল দৃঢ়ীভূত করিতে উদ্যত হয়, তখন গজ আপন আমত্যবর্গের সহিত আত্মরক্ষায় পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার রাজ্যে উপযুক্ত দুর্গ ছিল না; সুতরাং উত্তরদিগ্বর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে একটি দৃঢ় দুর্গ স্থাপন করিতে

সংকল্প করিলেন। অতঃপর আত্মীয়বন্ধু এবং সৈন্যসামন্তগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নরপতি কুল-দেবতামন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূজাসমাপনান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, "হিন্দুগণের বিক্রম ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু তুমি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একটি দুর্গ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাহার গজনী নামকরণ কর।" কুলদেবীর আজ্ঞায় রাজা গজ দুর্গনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে দূত আসিয়া বলিল;—

"রুম-পত, খোরাসান পত, গয় পাথুর পায়,
চিন্তা তেরা চিতলেগে, শুন, যদপতরায়।"

অর্থাৎ হে যদুপতিরাজ! রুম ও খোরাসানের নৃপতিদ্বয় গজ, বাজি ও পদাতি সেনা লইয়া নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন।

রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ রণভেরী বাজিয়া উঠিল। দৈবজ্ঞেরা যুদ্ধযাত্রার শুভলগ্ন করিলে মাঘমাসের ত্রয়োদশ দিবসে বৃহস্পতিবারে শুক্লা সপ্তমী ও শিবযোগে প্রথম প্রহর অতীত হইলে রাজা সদলে রণযাত্রা করিলেন। আট ক্রোশ অতিক্রমপূর্ব্বক দুলাপুরে উপস্থিত হইয়া সে দিন তিনি তথায় শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। ম্লেচ্ছসেনাগণও তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু সেই রাত্রেই খোরাসানের শাহ উদরাময়রোগে লীলাসংবরণ করিলেন। রুমরাজ শাহ সিকান্দর রুমী যখন অবগত হইলেন যে, শাহ মামরেজের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। ক্ষণপরেই উৎ-সাহে হৃদয় বাঁধিয়া তিনি বিশাল বাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন। এদিকে রাজা গজ এবং তাঁহার সামন্তগণ নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক যোগিনীগণকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রচণ্ডবেগে শত্রু-সেনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষীয় পদভরে পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। রণঘণ্টার উচ্চনাদ, অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি এবং যোধগণের বাহ্বাস্ফোটনে রণভূমি কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষ পরস্পর অস্ত্রচালনায় প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য অসংখ্য বীর রণভূমে শয়ন করিতে লাগিলেন। শোণিতধারায় রণভূমি পঙ্কিল হইয়া পড়িল। যদুরায় তীব্রবেগে ম্লেচ্ছগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বিস্ময়কর বীরত্বদর্শনে বিপক্ষসেনা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; ক্রমে তাহারা হৃতবল ও নিস্তেজ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। শাহের পক্ষে বিংশতি সহস্র সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে সপ্তসহস্র হিন্দু স্বদেশরক্ষার্থ প্রাণ উৎসর্গ করিলেন বটে, কিন্তু জয়লক্ষ্মী হিন্দুগণের প্রতিই সুপ্রসাদ বিতরণ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ৩০০৮ অব্দে বৈশাখমাসের তৃতীয় দিবসে রবিবারে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুভতিথিতে যদুপতি গজ গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। জয়লাভে উল্লাসিত হইয়া তিনি পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী অনেক দেশ জয় করিলেন এবং কাশ্মীরপতি কন্দর্পকেলিকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিয়া একটি দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই রাজকুমার তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, সংগ্রামে জয় করিতে না পারিলে তিনি কোন্ সাহসে আমার প্রতি আজ্ঞা প্রদান করেন? তখন রাজা গজ রোষভরে কাশ্মীর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে কাশ্মীরপতির পরাজয় হইল। তিনি গজের করে আপন কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক সম্বন্ধবন্ধন করিলেন। সেই কুমারীর গর্ভেই সুপ্রসিদ্ধ বীর শালিবাহনের জন্ম হয়।

কতিপয় বর্ষ পরে আবার সংবাদ আসিল, খোরাসান হইতে একদল শত্রুসেনা আগমন করি-তেছে। রাজা গজ তিন দিন ধরিয়া কুলদেবীর মন্দিরে অর্চ্চনা করিলেন। চতুর্থদিনে দেবী আবির্ভূতা

হইয়া কহিলেন, 'বৎস! এবার গজনী শত্রুর অধিকৃত হইবে, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎবংশ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অধিকার করিবে। অতএব শালিবাহনকে পূর্ব্বদেশে হিন্দুগণের নিকট প্রেরণ কর। তথায় তিনি স্বনামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করিবেন। শালিবাহন পঞ্চদশ পুত্রের পিতা হইবেন। তাহাদিগের দ্বারা তোমার বংশ বহুবিস্তৃতি প্রাপ্ত হইবে।

যদুরায় গজ আত্মীয়স্বজনকে আহ্বানপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং শালিবাহনকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক জ্বালামুখী তীর্থদর্শনের ছলে পূর্ব্বদেশে যাইতে কহিলেন। শালিবাহনের বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ।

নরপতি গজ স্বীয় নগররক্ষার ভার পিতৃব্য সহদেবের হস্তে প্রদান করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। দেখিতে দেখিতে শত্রুসেনা গজনীর পাঁচক্রোশ দূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। রাজা গজ সসৈন্যে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইলেন। উভয়দলে তুমুলযুদ্ধ সংঘটিত হইল। পাঁচ প্রহর পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিল। এক লক্ষ মীর এবং ত্রিংশৎসহস্র রাজপুত সেই যুদ্ধে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইল। মুসলমানগণ বিজয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ পাইয়া গজনী অবরোধ করিল বটে, কিন্তু যবনরাজ সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন, নরপতি গজেরও প্রাণবিয়োগ হইল। সহদেব একমাস পর্য্যন্ত প্রাণপণে গজনী রক্ষা করিলেন; অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয়াবহ জহরব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নয় সহস্র বীরের সহিত জীবন উৎসর্গ করিলেন।

এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শ্রবণে শালিবাহনের হৃদয় বিষম শোকে আকুল হইয়া পড়িল। দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রোদন করিলেন। অবশেষে তিনি পূর্ব্বদেশ হইতে পঞ্চনদপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় একস্থানে প্রভূত জলরাশি তাঁহার নেত্রগোচর হইল, তিনি তৎপ্রদেশকে স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসস্থলরূপে মনোনীত করিলেন। অতঃপর স্বীয় সর্দ্দার ও সামন্তগণকে একত্র করিয়া তিনি তথায় শালিবাহনপুর নামে একটি নগর স্থাপন করিলেন। বিক্রমসংবতের দ্বিসপ্ততিবর্ষ পরে ভাদ্রমাসের অষ্টমদিবসে রবিবারে এই নগর প্রতিষ্ঠা হয়। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিয়াগণ স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া শালিবাহনের অধীনতা স্বীকার করিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র পঞ্জাব শালিবাহনের অধিকৃত হইল।

শালিবাহনের পঞ্চদশ পুত্র,—তন্মধ্যে ত্রয়োদশজনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই এক একটি রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইঁহারা যথাক্রমে বলন্দ, রসালু, ধর্ম্মাঙ্গদ, বাচা, রূপ, সুন্দর, লেখ, যশকর্ণ, মায়ুত, নিপক, গাঙ্গু ও যশু নামে অভিহিত।

দিল্লীর তুয়ারপতি জয়পালের কন্যার সহিত বলন্দের বিবাহ হইল। রাজকুমার বলন্দ নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণী সহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে শালিবাহন গজনী উদ্ধারে প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের আয়োজন হইল; আটকপার হইয়া তিনি জিল্লালকে আক্রমণ করিলেন। অচিরেই যবননরপতি পরাস্ত হইলেন. পৈতৃক রাজধানী গজনী শালিবাহনের অধিকৃত হইল। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বলন্দকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পঞ্জাবে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ষ নয়মাস রাজ্যশাসনের পর রাজা শালিবাহন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এ দিকে তুর্কিগণ ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল; গজনীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত ভূভাগ তাহারা অধিকার করিল। বলন্দ স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাঁহার মন্ত্রী ছিল না। তাঁহার সাত পুত্র।—ভট্টি, ভূপতি, কল্লর, জিজ্জ, শূররাম, ভিংসরেচ, মাঙ্গি ও। বলন্দের দ্বিতীয় পুত্র ভূপতির একটি পুত্র জন্মে; তাহার নাম চাকিতো। এই চাকিতো হইতে চাকিতোকুলের উৎপত্তি

হইয়াছে। চাকিতোর আট পুত্র; দেবসি, অরু, কেমকর্ণ, নাহর, জয়পাল, ধরসি, বিজলীকর্ণ ও শা-সমন্দ। বলন্দের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ পঞ্চনদ-প্রদেশের পার্ব্বত্য ভূমিতে এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গজনীতে স্বীয় পৌত্র চাকিতোকে অভিষেক করিয়া বলন্দ শালিবাহনপুরেই অবস্থিতি করিতেন। ম্লেচ্ছদিগের পরাক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল চাকিতোর সর্দ্দার ও সামন্তগণ মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী; তাহারা রাজাকে বলিল যে, যদি তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে বোখারার রাজা করিয়া দিতে পারে। উজবেগেরা তথায় বাস করিত। তত্রত্য অধিপতির একটিমাত্র কন্যা ছিল। চাকিতো সেই যবনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া বালিচ-বোখারার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার হস্তে অষ্টাবিংশতি সহস্র অশ্বসেনা সমর্পিত হইল। বালিচ ও বোখারার মধ্যে একটি বেগবতী নদী প্রবাহিত। বালিচস্থানের কোরণদ্বার হইতে হিন্দুস্থানের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ চাকিতোর অধিকৃত হইল। চাকিতোমোগলবংশ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত।

বলন্দের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ভট্টি সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দশটি রাজ্য তিনি জয় করেন। প্রথম রাজাসনে আরোহণ করিবার পরেই টীকাডোর উৎসব উপলক্ষে তিনি লাহোর নগরে সমস্ত সেনা একত্র করিলেন এবং কনকপতি বীরভানকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাভূত করিলেন। রণস্থলে রাণা বীরভানের পতন হইল।

ভট্টির দুই পুত্র,—মঙ্গলরাও ও মসুরাও। ভট্টির রাজত্বকাল হইতেই যদুকুল ভট্টিকুল নামে প্রথিতিলাভ করিয়াছে।

মঙ্গলরাও লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে গজনীর অধিপতি ঢুণ্ডী তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মঙ্গলরাও পরাভূত হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ তত্রত্য নদীতীরবর্ত্তী গভীর বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শত্রুকুলকর্তৃক শালিবাহনপুর আক্রান্ত হইল। রাজার পরিবারবর্গ তথায় অবস্থিতি করিত। মসুরাও লক্ষ্মীজঙ্গল নামক অরণ্যমধ্যে পলায়ন করিলেন। সেই বনে কেবল কতকগুলি কৃষিজীবীর বাস, মসুরাও তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তত্রত্য আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র;—অভয়রাও এবং সারণরাও। সমগ্র লক্ষ্মীজঙ্গল অভয়ের অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা আভোরিয়া ভট্টি নামে প্রথিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া সারণ পৃথক্ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা জাট নামে প্রসিদ্ধ। কৃষিবৃত্তি তাহাদিগের উপজীবিকা।

ঢুণ্ডীর ভয়ে মঙ্গলরাও রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র;—মাজমরাও, কল্পুর রাব, মূলরাজ, শিবরাজ, ফুল ও কেবল।—ইহারা শ্রীধরনামা একটি মণিকারের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সতীদাস নামক তক্ষকজাতীয় ভূম্যধিকারীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা সেই মণিকারের বাটী অবরোধ করিবার জন্য সদলে সতীদাসকে প্রেরণ করিলেন। শ্রীধর ধৃত হইয়া রাজসমুখে উপস্থিত হইলে ঢুণ্ডীরাজ কহিলেন, "তুমি শালিবাহনের পুত্রদিগকে সমর্পণ কর, নচেৎ তোমার সমস্ত পরিবারবর্গকে নিপাত করিব।" শ্রীধর কহিল, "রাজন্! রাজার কোন পুত্রই আমার গৃহে নাই; তবে একটি ভূমিয়ার কতকগুলি পুত্র আমার বাটীতে ছিল, সংপ্রতি তাহারা পলায়ন করিয়াছে।" ঢুণ্ডী তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া সেই বালকগণকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের বাসস্থানের সন্ধান করিয়া তথা হইতে কতকগুলি ভূমিয়াকে আনিতে

কহিলেন। শ্রীধর বিষম সঙ্কটাপন্ন। রাজপুত্রগণের জীবনরক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সে তাহাদিগকে কৃষকের বেশে সজ্জিত করিয়া রাজসমক্ষে আনয়ন করিল। রাজা তাহাদিগকে ভূমিয়া জাটগণের সহিত একত্র আহার করিতে বলিলেন এবং জাটকন্যাগণের সহিত তাহাদিগের বিবাহ দিলেন। এই প্রকারে কল্লরায়ের বংশধরেরা কল্লরিয়া জাঠ, মুণ্ডরাজের পুত্রগণ মুণ্ড এবং শিবরাজের বংশধরেরা শিবরা জাট নামে অভিহিত হইল। শিশু ফুল এবং কেবল কুম্ভকার বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে সেই সেই বংশেই পতিত হইল।

এ দিকে মঙ্গলরাও পলায়নপূর্ব্বক গারাপারে গিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। ঐ নদীতীরে তৎকালে বারাহাজাতির বাস ছিল। তাহাদের দূরে বুটাবানে বুটা-রাজপুতগণ, পুগলে প্রমারকুল,ধাতরাজ্যে সোদার বংশ এবং লোহুর্ব্বায় লোড্র রাজপুতেরা বাস করিত। তথায় উপস্থিত হইয়া মঙ্গলরাও সোদারাজের আজ্ঞায় লোড্র, বারাহা ও সোদাগণের মধ্যস্থলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনান্তে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মাজমরাও পিতৃস্থাপিত নবরাজ্যের অধিপতি হইলেন। অমরকোটের সোদারাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

মাজমরাওয়ের তিন পুত্র ;—কেহুড়, মূলরাজ ও গোগলি। কেহুড় মহাবীর বলিয়া প্রথিত। একদিন তিনি শুনিলেন, আরোর হইতে পাঁচ শত অশ্বারোহী সহ একটি বণিক-সম্প্রদায় মূলতানের দিকে আগমন করিতেছে। কেহুড় উষ্ট্রবিক্রেতার বেশধারণপূর্ব্বক পঞ্চনদে গিয়া তাহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। অচিরেই বণিক্গণ পরাজিত হইল। এইরূপ বীরানুষ্ঠান দ্বারা তিনি সর্ব্বত্র প্রথিতি লাভ করিলেন। ঝালোরের দেব-রাজা আল্লানসি মাজমরাও এবং তাঁহার দুইটি জ্যেষ্ঠপুত্রকে নারিকেলফল প্রেরণ করিলেন। মহা-সমারোহে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া কেহুড় ভগবতী তনুদেবীর স্মরণার্থ তনোট-দুর্গের ভিত্তিস্থাপন করিলেন, এই দুর্গ সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই রায় মাজুম ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কেহুড় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তনোট-দুর্গ বারাহাবংশের রাজ্যসীমার উপর নির্ম্মিত। বারাহাগণের অধিপতি যশোরিত তনোট আক্রমণ করিলে কেহুড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মূলজী তাঁহাকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিলেন।

৭৮৭ সংবতে (৭৩১ খৃষ্টাব্দে) মাঘমাসে পূর্ণিমা তিথিতে বুধবারে তনোট-দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। কেহুড় কর্ত্তৃক তথায় তনুমাতার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহার কিছু দিন পরেই বারাহাগণের সহিত সন্ধিস্থাপন হইল এবং বারাহাপতির কন্যাকে মূলরাজ স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেহুড়ের বংশধরগণ, প্রান্তরভূমিতে কেহুড়ের আধিপত্য, তাঁহার মৃত্যু, তনুর অভিষেক
তনোট আক্রমণ, তনুর বিবাহ, গুপ্তধনপ্রাপ্তি, বিজনোট-দুর্গ, তনুর মৃত্যু, বিজয়রায়,
তনোট-পতন, দেওরাওয়াল নগর-প্রতিষ্ঠা, লঙ্গহাদিগের হত্যা, লোদ্রুর্ব্বা-জয়,
ধারানগরী অবরোধ, খাড়ালে সরোবর-প্রতিষ্ঠা, তাঁহার হত্যা, রাবল
মুণ্ডের পিতৃসিংহাসনে আরোহণ, মুণ্ডের পুত্র বাছেরার বিবাহ,
বাছেরার মৃত্যু, দুশজের অভিষেক, হামিরের আক্রমণ, দুশ-
জের পুত্রগণ, দুশজের কনিষ্ঠ পুত্র লঙ্গ বিজয়রায়ের
বিবাহ, যশল ও বিজয়রায়, ভোজদেব, লোদ্রুর্ব্বা-
আক্রমণ, ভোজদেবের মৃত্যু, যশলের আধি-
পত্য, যশল্মীর স্থাপন, যশলের
মৃত্যু, দ্বিতীয় শালিবাহন।

কেহুড়ের পুত্রগণ হইতে এক একটি গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। চুন্নারাজপুতগণের ভূমিভাগ কেহুড়ের করে পতিত হইয়াছিল। কেহুড় মৃগয়ার্থ বনমধ্যে গমন করিলে রাজ্যচ্যুত রাজপুতগণ তাঁহাকে সংহার করিল। কেহুড়ের পাঁচ পুত্র ;—তনু, উটিরাও, চুন্নর, কাফ্রিয়ো ও দায়েম।

পিতার মৃত্যুর পর তনু পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলে বারাহা ও মুলতানের লঙ্গহাগণের অধিকৃত ভূমিভাগ তৎকর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। হোসেন শাহ তাঁহার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য লঙ্গহা-পাঠানগণকে লইয়া দুদি, খাদি, খোকুর, মোগল, জোহয়, জুড় ও সৈয়দদিগের সমভিব্যাহারে যদুপতিকে আক্রমণ করিল। তাহাদের সংখ্যা দশ সহস্র। বারাহেরাও তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তনুরায় ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত থাকিলেন। চারি দিন পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষিত হইল। পঞ্চম দিবসে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিতে আজ্ঞা দিয়া যদুরায় স্বীয় পুত্র বিজয়রায়ের সহিত অসিহস্তে শত্রুসেনার অভিমুখীন হইলেন। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষেরা পলায়ন করিল। জয়লব্ধ দ্রব্যসামগ্রী যাদবগণ কর্ত্তৃক আনীত হইল। মুলতানী সেনা ও লঙ্গহাগণের পরাজয়ে বুটাবানের বুটারাজ জিজ্জু তনোটে নারিকেলফল প্রেরণপূর্ব্বক মুলতানের প্রতিকূলে যদুকুলের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন।

তনুর পাঁচ পুত্র ;—বিজয়রায়, বকুর, জয়তুঙ্গ, অল্লুন ও রাচিকো। দ্বিতীয় পুত্র বকুরের পুত্র মৈপা, মৈপার দুই পুত্র ;—মহোলা ও দিকাও। দিকাও-সরোবর দিকাও কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার বংশধরেরা সূত্রধর হইয়াছিল। তাহারা মকুর ছুতার নামে প্রথিতি লাভ করিয়াছে।

তৃতীয় পুত্র জয়তুঙ্গের দুই পুত্র ;—রতনসিংহ ও চৌহীর। রতনসিংহ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত বিক্রমপুর নগর পুনঃসংস্কৃত হয়। চৌহীরের দুই পুত্র ;—কোলা ও গিরিরাজ। কোলা কর্ত্তৃক কোলাসর এবং গিরিরাজ কর্ত্তৃক গিরিজাসর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অল্লুনের চারি পুত্র ;—দেবসি, ভিরপাল, ভাওনি, রাকিচো। দেবসির বংশধরেরা উষ্ট্রপালনবৃত্তি এবং রাচিকোর বংশধরেরা বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসোয়ালজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

তন্নুরায় বিপুল গুপ্তধন প্রাপ্ত হন। সেই অর্থের সাহায্যে তিনি বীজনোট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ৮১৩ সংবতে অগ্রহায়ণমাসের ত্রয়োদশ দিবসে রোহিণীনক্ষত্রে পূর্ণিমাতে ভগবতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। অশীতিবর্ষ রাজ্যশাসনের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

৯৭০ সংবতে বিজয়রায় পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। বুটারাণীর গর্ভে তিনি দেবরাজ নামে একটি পুত্র লাভ করেন। ৮৯২ সংবতে দেবরাজের জন্ম হয়, বারাহা ও লঙ্গাহাগণ বারাহাপতির কন্যার সহিত কুমার দেবরাজের বিবাহ স্থির করিল। ভট্টিগণ বর ও বরযাত্রী সহ যেমন বারাহা-রাজের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে, অমনি বিশ্বাসঘাতকেরা বিজয়রায় এবং তদীয় কুটুম্ব ও সৈন্যসামন্ত-দিগকে সংহার করিল। পুরোহিত বাটীতে দেবরাজ আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সে স্থানেও নিরাপদ হইতে পারিলেন না; শত্রুগণ সে স্থানেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

দেবরাজকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলেন এবং বারাহাগণকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছায় তাহাদিগের সম্মুখে তাহার সহিত একপাত্রে ভোজন করিতে লাগিলেন, তাহারা তনোট আক্রমণপূর্ব্বক তাহা করগত করিল। দুর্গবাসীরা প্রায় সকলেই শত্রুর শাণিত তরবারিধারে প্রাণত্যাগ করিল। ভট্টিকুল নির্ম্মূল হইয়া পড়িল।

দেবরাজ পলায়নপূর্ব্বক বুটানগরে মাতুলগৃহে গমনপূর্ব্বক স্বীয় জননীপদে প্রণাম করিলেন। তনোটধ্বংসের সময় তাঁহার জননী পলাইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুত্রের মুখকমল দর্শনে তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রের মস্তকোপরি লবণ ঘূর্ণিত করিয়া তাহা সলিলগর্ভে নিক্ষেপপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "বৎস! তোমার শত্রু যেন এই প্রকারে গলিয়া যায়।" বুটাপতির নিকটে দেবরাজ কিঞ্চিৎ ভূমি প্রার্থনা করাতে বুটারাজ বলিলেন, "একটি মহিষের চর্ম্মরজ্জুতে মরুভূমির যতখানি ভূমি আচ্ছাদিত হইতে পারিবে, ততখানি তোমাকে প্রদান করিলাম।" দেবরাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ভুটনৈর-দুর্গের নির্ম্মাণকর্ত্তা স্থপতি কেকয়ের সাহায্যে তথায় একটি দুর্গ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯০৯ সংবতে মাঘ মাসের পঞ্চম দিবসে পুষ্যানক্ষত্রে সোমবারে দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। এই দুর্গ দেবগড় বা দেবরাওল নামে প্রসিদ্ধ। দুর্গনির্ম্মাণ-সংবাদ পাইয়া বুটাপতি একটি সেনাদল প্রেরণপূর্ব্বক দেবরাজকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। দেবরাজ স্বীয় জননীর হস্তে সমস্ত কুঞ্চিকা প্রদানপূর্ব্বক সেই আক্রমণকারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার দুর্গ ও পুজা স্বীকার করিবার জন্য সেনানীগণকে আমন্ত্রণ করিলেন। একশত বিংশতি-জন সামন্ত তাঁহার বাটীর মধ্যে আহূত হইল। পরামর্শ করিবার ছলে তিনি তাহাদের মধ্যে দশজনকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া সংহার করিলেন এবং তাহাদের মৃতদেহ দুর্গপ্রাকারের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে অবশিষ্টগুলিরও প্রাণবধ হইল।

বারাহাদিগের আক্রমণসময়ে রাজকুমার যে পুরোহিতের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তথায় একটি যোগী বাস করিতেন; তৎকর্তৃকই কুমারের প্রাণ রক্ষিত হয়। তিনি দেবগড়ে আগমন-পূর্ব্বক কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সিদ্ধ উপাধি প্রদান করিলেন। ইনি রসায়নবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একদিন সন্ন্যাসী স্বীয় জীর্ণ কন্থা ফেলিয়া স্থানান্তরে প্রস্থিত হইলে দেবরাজ তাহা নাড়িয়া দেখিতেছিলেন, ইত্যবসরে তন্মধ্যস্থ একটি পাত্র হইতে বিন্দুমাত্র রস তাঁহার তরবারির উপর পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তরবারি স্বর্ণে পরিণত। দেবরাজের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, কন্থার ভিতরে রসকুম্প বিদ্যমান। দেবরাজ তৎক্ষণাৎ সেই বস্তুদ্বয় লইয়াই বারাহা-কুলপুরোহিতের বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই অমূল্য রত্নের সাহায্যেই

তিনি দেবরাওল নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এ দিকে যোগী গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় কন্থা ও রসকুম্ভ না দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, দেবরাজ তাহা হরণ করিয়াছেন। তিনি রাজপুত্রকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে অভয়বর দান করিয়া বলিলেন, "রাজন্! যদি তুমি আমার শিষ্য হও, রাজবেশ ত্যাগ করিয়া যদি যোগিগণের বেশভূষা ধারণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি।" দেবরাজ স্বীকৃত হইলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক যোগিগণের বেশভূষায় সুসজ্জিত করিলেন। তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র, কর্ণে মুদ্রা, কণ্ঠে শৃঙ্গ এবং কটিতটে কৌপীন বিরাজিত হইল। রাজযোগী ভিক্ষাপাত্র-হস্তে আলক আলক শব্দে আত্মীয়-স্বজনগণের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভিক্ষাপাত্র স্বর্ণ ও মুক্তা-রত্নে পরিপূর্ণ হইল। যোগী রাও উপাধির পরিবর্ত্তে তাঁহাকে রাবল উপনাম প্রদানপূর্ব্বক তদীয় ভালতটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং রাজাকে শপথ করাইয়া লইলেন যে, সেই প্রকার আভিষেচনিক প্রথা বহুদিন পরিপালিত হইবে। অনন্তর সেই যোগিবর অবিলম্বে তথা হইতে তিরোহিত হইলেন।

প্রতিজিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া দেবরাজ বারাহাগণকে সংহার করিলেন। অতঃপর তিনি লঙ্গহাগণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে লঙ্গহাকুলের যুবরাজ আলীপুরে বিবাহার্থ গমন করিয়াছিলেন। দেবরাজ তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক প্রায় সহস্র ব্যক্তির প্রাণবধ করিলেন। অবশিষ্ট সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল।

লঙ্গহাগণ শোলাঙ্কিবংশের একটি শাখা। পঞ্জাবস্থ লোহকোট ইহাদের আবাসভূমি। অগ্নিকুলের সৃষ্টির পূর্ব্বে বোধ হয়, ইহারা লাহোর নগরে অবস্থিতি করিত। ৭৮৭ সংবতে তনোট-দুর্গ স্থাপিত হয়। তদবধি ক্রমাগত সাত শত তেতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভট্টি ও লহঙ্গাকুলে অবিরাম বিবাদ চলিতেছিল। অবশেষে শেষোক্ত বৎসর রাবল চাচিকের রাজত্বসময়ে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেই বহুদিনব্যাপী সংঘর্ষের শেষ হয়। সেই ঘটনার কিছু দিন পরেই বাবর্ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিজিত হয়; সুতরাং মুলতান মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল এবং সেই সঙ্গে লহঙ্গা-বংশও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। ফেরিস্তা-গ্রন্থে লিখিত আছে, একটি লঙ্গহাবংশের পাঁচ জন রাজা ক্রমান্বয়ে মুলতানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করে। খিজির খাঁ সৈয়দ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক সেখ ইউসফ নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধিরূপে মুলতানে প্রেরণ করেন। ইউসফ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ-গণের পূজোপচার গ্রহণ করেন। সেই সকল রাজন্যবর্গের মধ্যে রায়-শেহরা নামে একটি রাজপুত্র ছিলেন। তিনি লহঙ্গাগণের অধীশ্বর। রায়-শেহরা যবনরাজ প্রতিনিধির অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক তদীয় করে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত শিবি ও মুলতানের সহিত আলাপ-সম্ভাষণ চলিতে লাগিল; অবশেষে শেহরা রায় স্বীয় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেখকে বন্দী করিয়া দিল্লীনগরে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং কুতবউদ্দীন নামধারণপূর্ব্বক মুলতানের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

ফেরিস্তা গ্রন্থপাঠে জানা যায়, রায় শেহরা এবং তাঁহার লঙ্গহাবংশ আফগান। আবুলফজলের মতে শিবির অধিবাসিবৃন্দ সুমরি (শিবা) জাতীয়। এই শিবাই জিতকুলের একটি শাখা। ভাট্টবাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, লঙ্গহাগণ রাজপুত, স্থানান্তরে পাঠান নামে বর্ণিত হইয়াছে।

দেবরাওলের দক্ষিণদিকে লোদ্র রাজপুতগণের বাস ছিল। লোদ্রবা তাহাদের রাজধানী। এই রাজধানীর দ্বাদশটি সিংহদ্বার। লোদ্ররাজপুতগণের কুলপুরোহিত কোন কারণে

আপনার যজমানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং লোদ্রকুল উৎসাদিত করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। দেবরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ লোদ্রকুলের শাসনকর্ত্তা নৃপভানের নিকট একটি বিবাহের প্রস্তাব প্রেরিত হইল। নৃপভান সাদরে সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে দেবরাজ দ্বাদশ সহস্র নির্ব্বাচিত তুরঙ্গসেনা হইয়া লোদ্রুর্ব্বার দিকে অগ্রসর হইলেন। বরের আগমনে নগরদ্বারগুলি উন্মুক্ত হইল। নগরমধ্যে সদলে প্রবেশ করিয়াই দেবরাজ অসি নিষ্কোষিত করিলেন। লোদ্রগণ বিস্মিত হইল। অল্পসময়ের মধ্যেই লোদ্রুর্ব্বা দেবরাজের অধিকৃত হইল। নৃপভানের কন্যাকে তিনি বিবাহ করিলেন এবং নবজিত নগরে একটি সেনাদল রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

দেবরাওলে যশকর্ণ নামে এক বণিক্ বাস করিত। সে ধারানগরীতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য শাসনকর্ত্তা প্রমার ব্রজভানের আদেশে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। নিষ্ক্রয়স্বরূপ বিপুল অর্থ দিয়া অবশেষে সেই বণিক্ স্বদেশে প্রত্যাগত হইল এবং দেবরাজের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। যতক্ষণ অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদত্ত না হয়, তাবৎ জলগণ্ডুষমাত্র গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবরাজ পরক্ষণেই ভাবিলেন, ধারানগরী দেবরাওল হইতে বহুদূরবর্ত্তী। তখন একটি মৃন্ময় ধারাপুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবরাজ সেই কল্পিত নগর ধ্বংস করিয়া প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বিঘ্ন জন্মিল। তৎকালে অনেকগুলি প্রমার তাঁহার সেনাদলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। তাহারা নিজবংশের সম্মান-রক্ষার্থ সেই কল্পিত ধারানগরী রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল; রাজা যেমন কৃত্রিম নগরী উৎসাদনে উদ্যম করিলেন, অমনি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল;—

"যাহা পুয়ার তাঁহা ধার হি আওর ধার তাঁহা পুয়ার,
ধার বিনা পুয়ার নাহি আওর নাহি পুয়ার বিনা ধার।"

অর্থাৎ যেখানে পুয়ার, সেইখানেই ধারা এবং যেখানে ধারা, সেইখানেই পুয়ার; ধারা বিনা পুয়ার এবং পুয়ার বিনা ধারা হইতে পারে না। এই বলিয়া তাহারা নৃপতি সহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দেবরাজের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। এইরূপ কৌশলে প্রতিজ্ঞাপালনপূর্ব্বক দেবরাজ প্রকৃত ধারানগরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ধারাধিপ ব্রজভান পাঁচ দিন পর্য্যন্ত স্বীয় নগরী রক্ষা করিয়া সদলে রণভূমে শয়ন করিলেন।

দেবরাজের দুই পুত্র;—মুণ্ড ও চেহু। তন্নুসর, দেবসর এবং তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি সরোবর দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর মৃগয়ার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া কতিপয় চুন্না-রাজপুতের হস্তে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবরাজ ষট্‌পঞ্চাদশ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক মুণ্ড তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং পিতৃহন্তা রাজপুতগণের শোণিতে কঠোর উৎসব অনুষ্ঠান করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধার্থ তাহারা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইল। মুণ্ড তন্মধ্যে অষ্টশত যোদ্ধাকে সংহার করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পুত্র বাছেরা। পত্তনরাজ শোলান্‌কি বল্লভসেনের কন্যার সহিত বাছেরার বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই বাছেরা প্রাণত্যাগ করেন। বাছেরার পাঁচ পুত্র;—দুশজ, সিংহ, বাপ্পিরাও, উথো ও ময়লপুশাও।

কোন সময়ে কতকগুলি অশ্ব লইয়া এক বণিক্ লোদ্রুর্ব্বা নগরে উপস্থিত হইল। সেই সকল ঘোটকের মধ্যে একলক্ষ টাকা মূল্যের একটি অশ্ব ছিল। অশ্বটির অধিকারী একজন পাঠান। এই

অশ্বটি হরণ করিবার জন্য দুশল স্বীয় ভ্রাতা উর্থোর সহিত কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সেই পাঠানসর্দ্দারকে বধ করিলেন এবং অশ্বটি জয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সিংহের পুত্র শাখাবাস, তাঁহার পুত্র বল্ল। বল্লের দুই পুত্র,—রতন ও জগ। ইঁহাদের বংশধরেরা সিংহরাও রাজপুত নামে প্রথিত।

বাপ্পিরাওয়ের দুই পুত্র;—পাহু ও মদন। পাহুরও দুই পুত্র;—বিরাম ও টুলির। ইঁহাদের বংশধরেরা পাহু-রাজপুত নামে প্রথিত। সেই সকল পাহু-রাজপুত পুগলে আপনাদের রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় অনেকগুলি কূপ খনন করিয়াছিল। সেই সকল কূপ অদ্যাপি পাহুকূপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জাড়া নামক একটি খীচিবীর জয়তুঙ্গ ভাটির প্রাণবধ করিয়া সময়ে সময়ে পুগলের নিকটবর্ত্তী নগরগ্রাম লুণ্ঠন করিত। নাগোর-জনপদের অন্তর্গত খাটোনগরে তাহার বাস। দুশজের হস্তে সেই খীচিবীর সদলে সংগ্রামে নিপাতিত হইয়াছিলেন।

গোহিলোটসর্দ্দার প্রতাপসিংহের তিনটি কন্যার সহিত দুশজ ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার বিবাহ হয়। উহার কিছু কাল পরেই বেলুচীগণ খাড়ালরাজ্য আক্রমণ করে, সেই সূত্রে যুদ্ধে পঞ্চশত সৈন্যের প্রাণবিয়োগ হয়, অবশিষ্ট সকলে নদীপারে পলায়ন করে।

১১০০ সংবতের আষাঢ়মাসে দুশজ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সোদারাজকুমার হামির তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক বিস্তর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন। দুশজ ক্রুদ্ধ হইয়া হামিরের ধাত্তনগর আক্রমণ করিলেন; সে যুদ্ধে তাঁহারই জয়লাভ হইল। দুশজের তিন পুত্র;—যশল, বিজয়রাজ ও লঞ্জ বিজয়রাজ। মিবারের রাণাবংশ-সর্দ্দারের একটি কন্যার গর্ভে এই কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়। ইনি পিতার বৃদ্ধাবস্থার সন্তান। দুশজের মৃত্যুর পর রাজ্যের সর্দ্দার ও মন্ত্রিগণ বিজয়রাজকেই সিংহাসনে স্থাপন করেন। শোলাঙ্কি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের কন্যার সহিত বিজয়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিজয়রাজের পুত্র ভোজদেব। পিতার মৃত্যুর পর ভোজদেব লোদ্রর্ব্বার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে যশের বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ এবং বিজয়রাজের দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ।

ধারানগরীর শাসনকর্ত্তা উদয়াদিত্য-প্রমারের বংশধর রাঘবদেবের কন্যার সহিত বিজয়াদিত্যের বিবাহ হয়। সেই রাজকুমারীর গর্ভে রাহির নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাহিরের দুই পুত্র;—নেতসি ও কেকসি।

ভোজদেব লোদ্রর্ব্বার সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য শোলাঙ্কি-সৈন্যগণকে লোদ্রর্ব্বা হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টিত হইলেন। তৎকালে শোলাঙ্কিরাজ ঘোরী সুলতানের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। যশল মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যবনপতির সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া পত্তননগর আক্রমণ করিতে পারিলে শোলাঙ্কিসৈন্যগণ স্বদেশরক্ষার্থ লোদ্রর্ব্বা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। সেই সুযোগে তিনি ভোজদেবকে পদচ্যুত করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সদলে পঞ্চনদপ্রদেশে গমন করিলেন। তথায় বিজয়ী ঘোরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর যবনরাজের সহিত সিন্ধুরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী আরোরনগরে উপস্থিত হইয়া যশল তাঁহার নিকট স্বীয় অভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অধীনতাস্বীকার করিতে শপথ করাতে একটি সেনাদল প্রাপ্ত হইলেন। সেই সেনা-সাহায্যে যশল অচিরে লোদ্রর্ব্বা অবরোধ করিলেন। সেই সূত্রে যে যুদ্ধ হয়,

ভোজদেব তাহাতে প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর দুইদিনমধ্যে নাগরিকবৃন্দ নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে তৃতীয় দিবসে যবনসেনা নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। যবন-সেনাপতি করিম খাঁ নগরী লুণ্ঠনপূর্ব্বক বেখেরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

লোদ্রুর্ব্বা যশলের অধিকৃত হইল। লোদ্রুর্ব্বার দশ মাইল দূরে একটি নাত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা বিরাজিত ছিল। যশল তদুপরি এক দুর্গ স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেই পর্ব্বতমালার শিখর-দেশে একটি যোগী তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ব্রহ্মসর কুণ্ডের নিকটে সেই যোগীর আশ্রম ছিল। যশল তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সে যোগীর নাম ঐশল। রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি কহিলেন, "বৎস! সম্মুখে ঐ যে তিনটি গিরিশিখর দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম ত্রিকূট পর্ব্বত। ত্রেতাযুগে কাগনামা মহাতেজা মহর্ষি ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেন। ঐ স্থানে যে একটি প্রস্রবণ আছে, তাহা হইতে একটি নদী বহির্গত হইয়াছে. ঐ নদী ঋষির নামানুসারে কাগা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাণ্ডববীর অর্জ্জুন একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐ নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,'ভবিষ্যতে আমার এক বংশধর এই নদীতীরে একটি নগর এবং ত্রিকূটপর্ব্বতের সানুপ্রদেশে একটি দুর্গ স্থাপন করিবেন।' কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, 'সখে! ঐ তটিনীর জল নিতান্ত মলিন।' শ্রীকৃষ্ণ তখন হস্তস্থ চক্র ত্রিকূটপর্ব্বতের এক স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই স্থল হইতে একটি স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী বহির্গত হইয়া কলকলনাদে প্রবাহিত হইল।" এই কথা বলিয়া মহর্ষি ঐশল আবার বলিলেন, "ঐ দেখ বৎস! নদীপুলিনে পাষাণফলকে তিনটি শ্লোক লিখিত রহিয়াছে।" চমকিত হইয়া যশল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।—একখানি প্রস্তরফলকে তিনটি শ্লোক ক্ষোদিত রহিয়াছে। সেই তিনটি শ্লোকের মর্ম্ম এই,—

(১) হে যদুবংশাবতংস! এই প্রদেশে আগমন কর এবং এই গিরিবরের শৃঙ্গদেশে একটি ত্রিকোণাকার দুর্গ স্থাপন কর।

(২) লোদ্রুর্ব্বা বিধ্বস্ত হইয়াছে, কিন্তু উহার পাঁচ ক্রোশ দূরে যিশানো সংস্থিত। সে প্রদেশে তাহা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়।

(৩) হে যদুবংশাবতংস যশল! লোদ্রুপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন কর এবং এইখানেই তোমার আবাসপ্রাসাদ নির্ম্মাণ কর।

একমাত্র যোগিবর ঐশল ভিন্ন আর কেহই সেই নদী ও তত্তীরবর্ত্তী শিলা-শাসনের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এক্ষণে তিনি যশলকে ইহা দেখাইয়া বলিলেন, "এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ কর, কেবল দুর্গের পশ্চিমভাগস্থ ক্ষেত্রসমূহ যেন ঐশল ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়।" অতঃপর তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, "যে দুর্গ তৎপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা সার্দ্ধদ্বিবার বিধ্বস্ত হইবে, রক্তনদী প্রবাহিত হইবে এবং যশলের বংশধরগণ কিছু দিনের জন্য তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।"

১২১২ সংবতের শ্রাবণমাসের দ্বাদশ দিবসে রবিবারে শুক্লা সপ্তমীতিথিতে যশল্মীরদুর্গের ভিত্তি-স্থাপন হইল। আশু নাগরিকবৃন্দ লোদ্রুর্ব্বা পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যশের দুই পুত্র;—কৈলুন ও শালিবাহন। যশল পাহুবংশ হইতে মন্ত্রী ও সচিব নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন শত্রুকুল চুন্না-রাজপুতগণকর্ত্তৃক পুনরায় খাড়ালরাজ্য আক্রান্ত হইল; কিন্তু তাহা জয় করিতে তাহারা সমর্থ হইল না। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরেই যশল ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কৈলুনের নির্ব্বাসন, শালিবাহনের অভিষেক, বদ্রিনাথের যদুনৃপতি, শালিবাহনের পতন, বিজিরের আত্মহত্যা, খাড়াল আক্রমণ, কৈলুনের মৃত্যু, চাচিকদেবের অভিষেক, রাঠোরদিগের উপদ্রব, চাচিকের মৃত্যু, কর্ণের অভিষেক, কর্ণের মৃত্যু, লক্ষ্মণসেন, পুনপাল, রণঙ্গদেব, যশল্মীর-আক্রমণ, রাবল জয়ৎসিংহের মৃত্যু, মূলরাজের অভিষেক, সমরসমিতি, জহরব্রত, রাবল মূলরাজ ও রতনের রণস্থলে পতন, যশল্মীর-ধ্বংস।

যশল লীলাসংবরণ করিলে ১২২৩ সংবতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শালিবাহন যশল্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মন্ত্রীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলুন রাজ্য হইতে ইতিপূর্ব্বেই বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই শালিবাহন কাত্তিজাতির বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিলেন। সেই যুদ্ধে কাত্তিরায় সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার সমস্ত অশ্ব ও উষ্ট্র ভট্টিবীরের অধিকৃত হইল। শালিবাহনের তিন পুত্র ;—বিজির, বানার ও হংস।

যদুবংশীয় রাজারা বহুদিন পর্য্যন্ত বদ্রিনাথের পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী একটি রাজ্যে অবস্থিতি করিতেন। গজনী হইতে যদুকুল বিতাড়িত হইলে প্রথম শালিবাহনের বংশধরেরা সেই পর্ব্বত-প্রদেশে গিয়া বাস করে। এক্ষণে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা নিঃসন্তান হইয়া লীলাসংবরণ করাতে রাজাসন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই শূন্য সিংহাসন পূরণ করিবার জন্য তৎপ্রদেশ হইতে কতিপয় দূত আসিয়া শালিবাহনের নিকট একটি রাজপুত্র প্রার্থনা করিল। ভট্টিরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র হংসকে প্রদান করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বদ্রিনাথে উপস্থিত হইবামাত্র হংসের প্রাণবিয়োগ হইল। তৎকালে তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। পথিমধ্যেই তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। একটি পলাশতরুমূলে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পলাশমূলে জন্মগ্রহণ করাতে শিশু পলাশীয় নামে প্রথিত হইল। তাঁহার নামানুসারে সেই প্রদেশ প্লাশয়ো নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

অতঃপর মানসিংহের নিকট হইতে বিবাহ-প্রস্তাব আসিলে ভট্টিরাজ শিরোহী যাত্রা করিলেন। গমনকালে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিরের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া গেলেন। তাঁহার শিরোহী-যাত্রার স্বল্পকাল পরেই রাজপুত্রের ধাইভাই রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিল, রাবল ব্যাঘ্রদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন অতঃপর ধাইভাই রাজপুত্র বিজিরকে রাজপদ গ্রহণ করিতে বলিলেন বিজির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শালিবাহন স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্রের কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন। পিতৃদ্রোহী পুত্রের দুর্ব্যবহারে একান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি খাড়াল-রাজ্যে গমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজধানী দেবরাওলে বেলুচগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সংগ্রামেই প্রাণত্যাগ করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত বিজিরের ভাগ্যে কিন্তু অধিকদিন সুখভোগ করিতে হয় নাই। একদা সে ক্রোধভরে ধাইভাইকে প্রহার করিল ; ধাত্রীপুত্রও তাহাকে প্রহার করিতে বিরত থাকিল না। অবমাননায় নিপীড়িত হইয়া হতভাগ্য বিজির ছুরিকাঘাতে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

বিজির নিঃসন্তান; সুতরাং দ্বিতীয় শালিবাহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৈলুন রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ছয় পুত্র—চাচিকদেব, পল্লন, জয়চাঁদ, পিতলসিংহ, পিতমর্চাদ ও উশরাও। কৈলুনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে জয়শির ও শিহান রাজপুত নামে অভিহিত।

এই সময়ে বলোথ খিজির খাঁ পুনরায় খাড়ালরাজ্য আক্রমণ করিল। ইহাই তাহার দ্বিতীয় আক্রমণ। তাহার আগমন সংবাদ পাইয়া কৈলুন সদলে তাহার সম্মুখীন হইলেন। মুসলমানবীর খিজির বহু সৈন্যসহ রাজপুতরাজের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিল।

ঊনবিংশতিবর্ষ রাজ্যশাসনের পর কৈলুন লীলাসংবরণ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চাচিকদেব ১২৭৫ সংবতে যশল্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অত্যল্পদিন পরেই তিনি চুন্না-রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে সমরযাত্রা করিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্যকে নিপাত করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু হরণপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট সমস্ত চুন্না-রাজপুত পলায়নপূর্ব্বক জোহিয়াদিগের শরণ গ্রহণ করিল। এই জয়লাভের অত্যল্পদিন পরে রাবল চাচিকদেব সোদারাজ রাণা অমরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সোদানৃপতি তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হইয়া রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানী অমরকোটের মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি বিজয়ী ভট্টিরাজের হস্তে আপন কন্যা প্রদানপূর্ব্বক অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

এই সময়ে রাঠোরগণ ক্ষীররাজ্যে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দের উপর একান্ত উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাবল চাচিক তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সোদা-সৈন্যগণের সমভিব্যাহারে যেসোল ও ভেলোত্র নামক নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় চাহু ও থিহু নামক দুই ব্যক্তি তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা তদীয় করে কয়েকটি রাজকুমারী প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন।

দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ রাজ্যশাসনের পর রাবল চাচিক লীলাসংবরণ করেন। তাঁহার এক পুত্র, নাম তেজরাও। দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বসন্তরোগে তেজরাওয়ের মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠপুত্র কর্ণ পিতার অধিকতর প্রিয় ছিলেন। মুমূর্ষুকালে তেজরাও স্বীয় সর্দ্দারগণকে আহ্বানপূর্ব্বক শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার লোকান্তরগমনের পর তাঁহারা যেন তদীয় প্রিয়পুত্র কর্ণকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জ্যেষ্ঠ জয়ৎসিংহ অগ্রজস্বত্বে বঞ্চিত হইয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক গুর্জ্জরে গিয়া যবনের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় মজঃফর নামক এক যবন নাগোর জনপদের অধিপতি ছিল। তাহার অধীনে পঞ্চসহস্র তুরঙ্গসেনা ছিল। সেই সকল সৈন্য লইয়া মজঃফর খাঁ চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসিবৃন্দের উপর ভীষণ উৎপীড়ন করিত তাহার অত্যাচারে সকলে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। নাগোরের পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে ভগবতীদাস নামে এক বারাহা ভূমিয়া রাজপুত অবস্থিতি করিত। তাহার এক সহস্র পাঁচ শত অশ্বারোহী সেনা ছিল। ভগবতীদাসের একটি মাত্র কন্যা। দুরাচার মজঃফর সেই কুমারীকে প্রার্থনা করিল; কিন্তু ভূমিয়া-রাজপুত তাহার অযথা প্রার্থনা অবহেলা করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গ ও সেনাদল সহ মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল এবং আশ্রয়লাভার্থ যশল্মীরের দিকে অগ্রসর হইল। মুসলমানপতি তাহা জানিতে পারিয়া সসৈন্যে তাহার পথ অবরোধ করিল। আশু দুইপক্ষে একটি তুমুলসংগ্রাম বাধিল। সেই সংগ্রামে চারিশত বারাহা প্রাণবিসর্জ্জন

করিল এবং ভগবতীদাসের কন্যা ও দ্রব্যসামগ্রী বিজেতার করে নিপতিত হইল। দুঃখ, শোক ও রোষে ব্যাকুল হইয়া ভূমিয়া-রাজপুত ভট্টিনৃপতি রাবল কর্ণের সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বীয় দুঃখকাহিনী নিবেদন করিল। ভট্টিনৃপতির হৃদয়ে দারুণ প্রতিশোধতৃষ্ণা জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি কতিপয় বীরসহ দুর্ব্বৃত্ত খাঁকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে ও তাহার তিন হাজার সেনাকে বধ করিয়া ভূমিয়া ভগবতীদাসকে রক্ষা করিলেন। রাবল কর্ণ অষ্টাবিংশতি বর্ষ রাজ্যশাসনের পর ১৩২৭ সংবতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি এতদূর মূর্খ যে, শৃগালে চীৎকার করাতে তাহাদিগের শীতনিবারণার্থ লেপ প্রস্তুত করিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণ নিবেদন করিল যে, তদীয় আজ্ঞা পালিত হইয়াছে; তথাপি শিবাগণ ক্রন্দন করিতে নিরস্ত হইল না। তখন তিনি রাজকীয় উদ্যানমধ্যে তাহাদিগের বাসোপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি করিলেন; লক্ষ্মণসেনের নির্ব্বুদ্ধিতার নিদর্শনস্বরূপ সেই সকল শিবাগৃহের অদ্যাপি দুই একটি বিদ্যমান আছে. সোদাকুলে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সেই রাজকুমারী স্বীয় সহোদরগণকে অমরকোট হইতে যশল্মীরে আনয়ন করেন। কিন্তু উন্মত্ত লক্ষ্মণসেন তাহাদিগের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক নগরপ্রাচীরের বহির্দ্দেশে তাহাদিগের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন. চারিবর্ষ রাজ্যশাসনের পর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপরে রাজ্যের সর্দ্দারবৃন্দ তৎপুত্র পুনপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পুনপাল উগ্রস্বভাব ও স্বতই ক্রোধন-প্রকৃতি ছিলেন; এই জন্য সর্দ্দারবৃন্দ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং স্বত্বচ্যুত জয়ৎসিংহকে রাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজ্যের এক প্রান্তে হতভাগ্য পুনপাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

১৩৩২ সংবতে জয়ৎসিংহ যশল্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—মূলরাজ ও রতনসিংহ। মূলরাজের পুত্র দেবরাজ। শোণিগুরু-সর্দ্দারের কন্যার সহিত মূলরাজপুত্র দেবরাজের বিবাহ হয়। এই সময়ে মহম্মদ (খুনী) পাদশা মুন্দিরের পুরীহররাজা রাণা জয়সিংহের রাজ্য আক্রমণ করাতে আক্রান্ত রাজপুতরাজা আত্মরক্ষার্থ মুসলমানের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া স্বীয় দ্বাদশ কন্যা সহ তাঁহাকে রাবলের শরণাগত হইতে হইল। আশ্রয়ার্থী পুরীহররাজের বাসার্থ ভট্টিনৃপতি বারু নামক নগর প্রদান করিলেন।

দেবরাজের তিন পুত্র;—জন্মন, শিরবাণ ও হামির। হামির প্রসিদ্ধ বীর বলিয়া প্রথিত। তিনি মিহবোর কুম্পসেনকে আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। হামিরের তিন পুত্র;—জৈতো, লুনকর্ণ ও মৈরু। এই সময়ে ঘোরী আল্লা উদ্দীন ভারতবর্ষে আপতিত হন। টাট্টা ও মুলতানের নৃপতি তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করেন এবং যবনরাজের হস্তে বিপুল ধনরত্ন প্রদান করিতে বাধ্য হন। রাবল জয়সিংহের পুত্রগণ সেই সকল ধনরত্ন হস্তগত করিতে সঙ্কল্প করিয়া শস্যবিক্রেতার ছদ্মবেশে য বনপতিকে আক্রমণ করিলেন। রাত্রিযোগে তাঁহাদিগের উপর আপতিত হইয়া তিনি বহুসংখ্যক যবনসৈন্য সংহার করিলেন এবং তৎসমস্ত দ্রব্যজাত আচ্ছিন্ন করিয়া সগর্ব্বে যশল্মীরে প্রত্যাগত হইলেন। আল্লা উদ্দীন রোষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ভট্টিগণের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সংবাদ পাইয়া এ দিকে ভট্টিরাজ স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দুর্গ প্রচুর খাদ্যাদিতে পরিপূর্ণ হইল। শত্রুসেনার শিরোদেশে নিক্ষেপ করিবার জন্য ভট্টিরাজ দুর্গপ্রাকারের

উপরিভাগে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড সংস্থাপন করিয়া রাখিলেন। নগরে বালক, বৃদ্ধ, নারী ও অসুস্থ ব্যক্তিরা মরুভূমির মধ্যভাগে প্রেরিত হইল। এইরূপে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রাখিয়া তিনি সদলে অতি সতর্কভাবে দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ও পঞ্চ সহস্র বীর তৎসহ দুর্গমধ্যে অবস্থিত থাকিল। এ দিকে দেবরাজ ও হামির আর একটি সেনাদল লইয়া দুর্গের বহির্ভাগে অবস্থিত রহিলেন। সুলতান স্বয়ং রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন না। লৌহবর্ম্মাবৃত বিশাল খোরাসানী ও কোরিষী সেনাকে যশল্মীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং অজমীরে অবস্থিত রহিলেন।

এ দিকে যবনসেনাও আসিয়া সম্মুখীন হইল। আশু উভয়দলে যুদ্ধ বাধিল। প্রথম সপ্তাহে যবনের সপ্ত সহস্র বীর রাজপুতকরে জীবন বিসর্জ্জন করিল। যবনেরা স্বীয় শিবিরে পরিখা খনন করিয়াছিল। ভট্টিবীর দেবরাজ হামির তাহাদিগকে দুই বর্ষ পর্য্যন্ত পরিখামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং তাহাদিগের উদ্ধারার্থ বুন্দর হইতে যে সকল যবনসেনা আসিতে লাগিল, ভট্টিগণ তাহাদিগেরও পথ অবরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আট বর্ষ অতীত হইল, তথাপি যবনেরা কৃতকার্য্য হইল না। সেই সময়ে রাবল জয়ৎসিংহের প্রাণবিয়োগ হইল। দুর্গমধ্যেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। অষ্টাদশবর্ষ রাজ্যশাসনের পর সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ সময়েই তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই বহুদিনব্যাপী অবরোধের মধ্যে যশল্মীরে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতেছিল। রতনসিংহ ও মুসলমান সেনানী নবাব মাবুব খাঁর মধ্যে বন্ধুত্বালাপ চলিতেছিল; তাঁহারা পরস্পরে স্ব স্ব কতিপয় রক্ষক সমভিব্যাহারে প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি খর্জ্জুরমূলে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করিতেন। উভয়ে নানারূপ আমোদ-আহ্লাদ করিতেন; কোন সময়ে একত্র বসিয়া দ্যূতক্রীড়ায় নিবিষ্ট হইতেন, কোন সময়ে বা নানারূপ গল্প করিতেন; আবার যে সময়ে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইত, তখন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অস্ত্রশস্ত্রও প্রয়োগ করিতেন। তাঁহাদিগের সেই বীরোচিত সমালাপে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল।

১৩৫০ সংবতে মূলরাজ যশল্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। আভিষেচনিক উৎসবব্যাপারের সহিত দুর্গমধ্যে নানারূপ আমোদ-প্রমোদ হইতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে রতনসিংহ ও মাবুব খাঁ সেই খর্জ্জুরমূলে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ভট্টিরাজপুত্র স্বীয় বন্ধুসমীপে সেই আনন্দরোলের কারণ প্রকাশ করিলেন। মাবুব খাঁ কহিলেন, "সুহৃদ্বর! সুলতান আমাদিগের সৌহার্দ্দের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই যে, এই মিত্রতা বশতই অবরোধে এত বিলম্ব হইতেছে। এখন আমি কলঙ্কের ভাগী হই কেন? সুলতানের আজ্ঞায় আগামী কল্য ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে; আমি স্বয়ং সেনাদল চালিত করিব।" রতনসিংহ সংগ্রামার্থ সজ্জিত হইলেন। যথাকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজপুতবৃন্দ প্রচণ্ডবিক্রমে শত্রুকুলের সেই ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিল। যবনপক্ষে নয় সহস্র বীর প্রাণত্যাগ করিল। তথাপি তাহারা নিরুৎসাহ না হইয়া নূতন সেনাবল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল এবং অচিরেই আবার যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই বর্ষের শেষে যশল্মীরের অভ্যন্তরে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অনশনে অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তখন মূলরাজ স্বীয় সর্দ্দারগণকে একত্র করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বীরবৃন্দ! এত বর্ষ ধরিয়া আমরা জন্মভূমি রক্ষা করিলাম, কিন্তু আর উপায় নাই; আমাদিগের আহারীয় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; এখন উপায় কি?" সেহির ও বিক্রমসিংহ উত্তর করিলেন, "মহারাজ!

এখন শাক ব্যতীত উপায় নাই; আমরা জহরব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শত্রুকরে আত্মোৎসর্গ করিব।" কিন্তু এ দিকে বিপক্ষেরা তাঁহাদিগের সেই দুর্দশা বুঝিতে না পারিয়া সেই দিবসেই রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

বিপক্ষসেনার পলায়নের পর রতনসিংহ স্বীয় বন্ধু মাবুব খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যশল্মীরের অভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন। সেই মুসলমান ভট্টিকুলের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া গুপ্তভাবে দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যবনসেনানীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন তাহারা পুনরায় দুর্গ অবরোধ করিল। মূলরাজ স্বীয় ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুমিই এই অনর্থের মূল, এখন উপায় কি?" রতনসিংহ কহিলেন, "মুসলমান এতদূর বিশ্বাসঘাতক, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, এখন একট উপায় আছে, এক্ষণে রমণীদিগকে বধ করিতে হইবে, অগ্নি ও জলে যাহা কিছু ধ্বংস করা যাইতে পারে, তৎসমস্তই বিধ্বস্ত করা চাই। এতদ্ভিন্ন সমস্ত দ্রব্য ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক তরবারি-হস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিব এবং জন্মভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া অক্ষয় স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইব।"

রণভেরী বাদিত হইল। সর্দ্দারগণ একে একে আসিয়া দলবদ্ধ হইলেন। সকলকে সম্বোধন করিয়া মূলরাজ বলিলেন, "বন্ধুগণ! বীরকুলে তোমাদের উদ্ভব, মাতৃভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে তোমাদের মধ্যে কেহই ভীত নহেন। ক্ষত্রিয়বংশে তোমাদের ন্যায় বীর আর কেহই নাই। তোমরা প্রভুভক্ত; এখন অসিহস্তে শত্রুদিগকে আক্রমণ কর।" তৎক্ষণাৎ সৈন্য-সামন্তগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মূলরাজ আপন ভ্রাতা রতনসিংহের সঙ্গে অন্তঃপুরমধ্যে মহিষীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। পত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে ধীরগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বীরপত্নীগণ! প্রিয়সম্ভাষণের সময় নাই, যশল্মীর আর রক্ষা হয় না; আর সময় নাই; এখন স্বর্গপুরে মিলিত হইবার জন্য তোমরা সোহাগুনের জন্য প্রস্তুত হও।" *

সোদা মহিষী তখন সহাস্যবদনে বলিলেন, "আজ রাত্রেই আমরা প্রস্তুত হইয়া থাকিব এবং প্রাতঃকালের সূর্য্যালোকের সহিত স্বর্গধামে গমন করিব।" রাজা ও রাণী চিরজীবনের জন্য সেই রাত্রে একত্র যাপন করিয়া প্রভাতে লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল, তরুণ অরুণরাগে চতুর্দ্দিক অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সকলেই অন্তঃপুরদ্বারে সমবেত হইয়া আত্মীয়বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অচিরেই ভীষণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান হইল; চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রাজপুতবালা সহাস্যমুখে জীবন উৎসর্গ করিলেন। যশল্মীরে যে কিছু মহামূল্য দ্রব্য ছিল, তৎসমস্তই রাজপুত-বনিতাগণের জ্বলন্ত বহ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হইল। যশলের চিরসাধের রাজধানী আজি রোমহর্ষণ বীভৎসদৃশ্য শ্মশানে পরিণত হইল। এ দিকে সেই প্রচণ্ড রাজপুতবীরগণ দীনদরিদ্রগণকে প্রভূত ধনরত্ন বিতরণ করিলেন, কর্ণে তুলসী, গলদেশে শালগ্রাম ও মস্তকে মুকুট ধারণ করিলেন এবং পীতবস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক রণভূমে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন।

রতনসিংহের দুই পুত্র;—গরসিংহ ও কনক। গরসিংহের বয়ঃক্রম তখন একাদশবর্ষ মাত্র। পুত্রদ্বয়ের প্রাণরক্ষার্থ রতনসিংহ যবন-সেনাপতিকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি

* পতি বর্ত্তমানে যে স্ত্রী চিতানলে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাকে সোহাগুন কহে। পতির সহগামিনী হইলে তাঁহাকে দোহাগুন বলা যায়।

তাঁহাদিগকে আনয়নার্থ দুইটি বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণ করিলেন। রতনসিংহ অনন্তকালের জন্য প্রাণ-পুত্রদ্বয়ের নকট বিদায় লইয়া তাহাদিগকে সেই যবনানুচরের করে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা রাজশিবিরে আগমন করিলে সদাশয় নবাব সদয়ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণার্থ দুইটি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইলেন।

সে দিন অতীত হইল। পরদিন প্রভাতে সুলতানের বিশাল সেনাদল যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রতন একশত বিংশতিজন মীরযোধের প্রাণসংহার করিলেন। রণভূমিতে শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। অতঃপর যদুবীর সপ্তশত আত্মীয়বীর সমভিব্যাহারে রণস্থলে নিপতিত হইলেন। জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া মুসলমানগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। রাশি রাশি শবদেহের মধ্য হইতে রাজভ্রাতৃগণের শবদেহ তুলিয়া আনাইয়া মাবুব খাঁ অনলে সৎকার করিলেন। ১৩৫১ সংবতে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটে। দুই বৎসর পর্য্যন্ত যশল্মীর-দুর্গে বাস করিয়া অবশেষে যবন-সেনাগণ সিংহদ্বারসমূহ রুদ্ধ এবং কঙ্গরাগুলি ভগ্ন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ অধ্যায়

যশল্মীরের ভগ্নাবশেষরাশির মধ্যে মেহবোর রাঠোরগণের বাস, দুদুর মৃত্যু, মোগলের অভিযান, গরসিংহ কর্তৃক যশল্মীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কেহুড়, গরসিংহের গুপ্তহত্যা, কেহুড়ের অভিষেক, বিমলাদেবীর প্রাণত্যাগ, রাও রণিঙ্গদেবের অনুশোচনা, সোমের গিরাপে গমন, রণিঙ্গদেবের পুত্রগণের মুসলমানত্ব স্বীকার, কৈলুন, কিরোদুর্গ নির্ম্মাণ, কৈলুনের বিবাহ, কৈলুনের মৃত্যু, চাচিকের অভিষেক, অশ্বিনীকোট, খোকরদিগের বিবরণ, চাচিকের সদলে প্রাণত্যাগ, কুম্ভের প্রতিশোধ গ্রহণ, ধুনিয়াপুর পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বাবর কর্তৃক মূলতান জয়, ভট্টিগণের মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণ, রাবল বীরসিংহ, জৈত, নূনকর্ণ, ভীম, মনোহরদাস ও সুবলসিংহ।

কতিপয় বর্ষ অতীত হইল; যশল্মীর মরুশ্মশানে পরিণত। মেহবোর-অধিপতি রাঠোর মলোজীর পুত্র জগমল সেই ধ্বংসরাশির মধ্যে বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অবিলম্বেই বিবিধ দ্রব্যজাত সমভিব্যাহারে তদীয় সৈন্যসামন্তগণ যশল্মীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এই সংবাদ পাইয়া ভট্টিবীর যশিরের দুই পুত্র দুদু ও তিলকসিংহ অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রাঠোরেরা পরাজিত ও বিতাড়িত হইল। ভট্টিবীর দুদুর বীরত্বদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া যশল্মীরের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রাবলপদে স্থাপন করিল। তখন তিনি বিধ্বস্ত যশল্মীরের পুনঃ-সংস্কারসাধনে উদ্যত হইলেন। দুদুর পাঁচ পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা তিলকসিংহ মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুর্দ্দান্ত বেলুচ ও

মাঙ্গোলিয়োগণ এবং মেহেবো, আবু ও ঝালোরের বীরবৃন্দ রাবল দুদুর অতুলবিক্রমের নিকট বিনীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, তাঁহার সেনা অজমেরে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ফিরোজ শাহের অশ্বগুলিকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এই দারুণ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য যবনবীর যশল্মীর আক্রমণ করিলেন। যশল্মীরের আবার দারুণ শোচনীয় অবস্থা ঘটিল। আবার সেই রোমহর্ষণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান হইল।

দশবর্ষ রাজ্যশাসনের পর বালক দুদু ইহলোক পরিত্যাগ করিলে মাবুবও লোকান্তরে প্রস্থিত হন। তৎপর ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে রতনসিংহের পুত্রদ্বয় গরসি ও কানর জুলফিকার ও গাজিখাঁর হস্তে সমর্পিত হন। জুলফিকার ও গাজি উভয়েই মাবুবের পুত্র। কানর গোপনে যশল্মীর আগমন করিলেন এবং গরসি মেহবো রাজ্যে গমনে আদিষ্ট হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিমলা-নাম্নী এক রাঠোরকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এক দেবরা-রাজপুতের সহিত ইতিপূর্ব্বে বিমলার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; সুতরাং তিনি বিধবামধ্যে গণনীয়া। গরসিংহ এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে একদিন শোণিঙ্গদেবনামা তাঁহার একটি কুটুম্ব তৎসহ সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। গরসিংহের দিল্লীতে প্রতিগমনকালে তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে সক্ষম হইলেন। শোনিঙ্গের অতুল বাহুবলের কথা শুনিয়া যবনরাজ তাহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহাকে খোরাসানরাজপ্রেরিত একটি বৃহৎ লৌহধনুতে জ্যারোপণ করিতে দিলেন। মহাবীর অনায়াসে সেই প্রকাণ্ড আয়সকার্ম্মুকে গুণযোজনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে তৈমুরশাহ ভারতবর্ষে আপতিত হন। দিল্লীশ্বর মোগলবীরের সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য গরসিংহকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যশল্মীরের সংস্কারসাধন করিতে আদেশ দিয়া তৎপ্রদেশের পাট্টা লিখিয়া দিলেন। অল্পদিনমধ্যেই ভট্টিরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। অচিরেই তিনি একটি বিশাল বাহিনীর অধীশ্বর হইলেন। হামির ও তদীয় সর্দ্দারগণ ভট্টিরাজের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু বশিরের পুত্রগণ তাঁহার নিকট বিনীত হইলেন না।

মুন্দরাজ্যের পুত্র দেবরাজের সহিত মুন্দরাধিপ রাণা রূপরার কন্যার বিবাহ হয়। সেই রাজনন্দিনীর গর্ভে কেহড় নামে একটি পুত্র জন্মে। সুলতান যখন যশল্মীর আক্রমণ করেন, কেহড়-জননীর সহিত তাহার পূর্ব্বেই মুন্দরে গমন করেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কেহড় স্বীয় মাতামহের গোপালকদিগের সহিত বনে বনে গোচারণ করিতেন। রাখালগণ ইতস্ততঃ ক্রীড়া প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকিলে কেহড় ইক্ষুদণ্ড লইয়া ধেনুগুলিকে বদ্ধ করিতেন। একদিন তিনি ক্লান্ত হইয়া একটি বিবরের উপরিভাগে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে একটা সর্প সেই গর্ত হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত রাজপুত্রের মস্তকোপরি আপন বিশালফণা বিস্তার করিয়া রহিল। তখন একজন চারণ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল। সর্পকে তদবস্থায় দেখিয়া সে ব্যক্তি রাণার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। রাণা আশু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য বুঝিতে পারিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন। এ দিকে বিমলাদেবীর গর্ভে পুত্রাদি জন্মগ্রহণ না করাতে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণে উদ্যত হইলেন। ভট্টিকুলের সমস্ত রাজপুত্র তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল; কিন্তু কেহই কেহড়ের সমতুল্য হইল না। সুতরাং তিনি কেহড়কেই দত্তকপুত্রগ্রহণে মনোনীত করিলেন। ইহাতে বশিরের পুত্রগণ ক্ষুব্ধ হইয়া সিংহাসনলাভের জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে গরসিংহ প্রতিদিন একটি সরোবর দেখিতে

যাইতেন। সেই সরোবরটি তখন নূতন খনন করা হইয়াছিল। যশিরের দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণ একদিন তাঁহাকে সেই সরোবরতীরে আক্রমণপূর্ব্বক সংহার করিল। এই শোচনীয় সংবাদ পাইয়া বিমলা দেবী হত্যাকারিগণের প্রতিফল প্রদানার্থ কেহুড়কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তৎকালে তিনি পতির অনুগমন না করিয়া কেহুড়ের পদ দৃঢ়ীকরণ এবং সেই সরোবরের সমাপন, এই দুইটি কার্য্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। ছয়মাসের মধ্যে উভয় কার্য্যই সুসিদ্ধ হইল। তখন তিনি চিতানলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে পতির সহিত মিলিত হইলেন। বিমলাদেবী হামিরের পুত্রদ্বয় জৈত ও লুনকর্ণকে কেহুড়ের পোষ্যপুত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

চিতোরেশ্বর রাণা কুম্ভের কন্তার পাণিগ্রহণার্থ রাজকুমার জৈত মিবারের দিকে যাত্রা করিলেন। আরাবল্লী পর্ব্বতের দ্বাদশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইবামাত্র শালবাণীর প্রসিদ্ধ শঙ্কলাবীর মীরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তথায় সে দিন অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে জৈত পুনরায় মিবারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে দক্ষিণপার্শ্বে একটা বন্য-কপোত পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল। শঙ্কলা-বীরের শ্যালক তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন; তিনি শাকুন-শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী। কপোতের শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক তিনি কহিলেন, "ইহা একটি ভীষণ অলক্ষণ, অতএব অদ্য যাত্রা করা উচিত নহে।" সেইদিন তথায় বিশ্রাম করাই স্থির হইল। পরদিন প্রাতে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব অশ্বে আরূঢ় হইয়াছেন, এমন সময়ে একটা ব্যাঘ্রী চীৎকার করিতে লাগিল। তখন শাকুনবিদ্ গণনা করিয়া বলিল, "বড় ঘরের ভিতরের কথা প্রকাশ করা উচিত নহে, মিবারে যাওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে একজন রাজপুত-যুবককে নাপিতানীর ছদ্মবেশে কমলমীর গিয়া সমস্ত গুহ্য বিষয় জানিয়া আসিতে বলুন।" তৎক্ষণাৎ একটি মহাবল রাজপুত মিবারে গমন করিল। সে প্রত্যাগত হইয়া বলিল, "বড় ভাল বোধ হয় না। রাণার মনে ভয়ানক দুরভিসন্ধি আছে।" জৈত তখন মিবারের দিকে না গিয়া শঙ্কলা সর্দ্দারের কন্যা মারুণীকে বিবাহ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাণা ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু নিজ দুরভিসন্ধির বিষয় ভাবিয়া তিনি প্রতিশোধ লইতে পারিলেন না। কিছুদিন অতীত হইলে জৈত স্বীয় ভ্রাতা লুনকর্ণ এবং শ্যালকের সহিত পুগল অধিকার করিবার উপক্রম করাতে একশত বিংশতিজন সেনা সমভিব্যাহারে রাও রণঙ্গদেবের করে প্রাণত্যাগ করিলেন। যখন রাও রণঙ্গদেব নিহত ব্যক্তিগণের পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না।

কেহুড়ের আট পুত্র,—সোমজী, লক্ষ্মণ, কৈলুন, কিলকর্ণ, শতুল, বিজয়, তহু ও তেজসী। সোমজী অনেকগুলি পুত্র লাভ করেন। তাহারা সোমভট্টি নামে প্রথিত। কৈলুন বলপূর্ব্বক স্বীয় অগ্রজ সোমজীর জায়গীর বিক্রমপুর অপহরণ করিলে সোমজী গিরাপ নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। শতুল একটি পুরাতন নগরের জীর্ণসংস্কারসাধন করিয়া তাহার নাম শতুলমীর রাখিলেন।

কৈলুন বিপাসা নদীতীরে স্বীয় পিতার নামে দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা কেরো নামে প্রসিদ্ধ। জোহর ও লঙ্গহাদিগের সহিত তাঁহার এক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। লঙ্গহাদিগের সেনাপতি অমরকণ্ঠ কোরাই কৈলুনকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল। তৎপ্রদেশস্থ চাহিল, মোহিল ও জোহরকুলের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া ভট্টিবীর কৈলুন সগর্ব্বে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। জামরাজের শ্যামবংশীয়া একটি কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জাম নিঃসন্তান হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে কৈলুন বিনা বিবাদে তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। বিসপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কৈলুনের প্রাণবিয়োগ হয়।

অতঃপর চাচিকদেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মারোট তাঁহার রাজপাট বলিয়া স্থির হইল। এ দিকে মুলতানরাজ ভট্টিকুলের প্রাচীন শত্রু, লঙ্গহা, জোহর, খীচি ও তৎপ্রদেশস্থ অপর অপর অধিবাসীদিগকে একত্র করিয়া চাচিকদেবকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। অচিরে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। ভট্টিরাজ জয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং জয়ার্জ্জিত দ্রব্যাদি লইয়া জয়োৎফুল্ল চিত্তে মারোট নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। একবর্ষ পরে আবার একটি যুদ্ধ ঘটিল। তাহাতে ভট্টিরাজ জয়লাভ করিলেন। ক্রমে চাচিকদেবের রাজ্য বিপাশার পরপারস্থ অশ্বিনীকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। উক্ত নগরে একটি সেনাদল স্থাপনপূর্ব্বক চাচিকদেব পুগলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর দণ্ডীদিগের শাসনকর্ত্তা মহীপালও তাঁহার হস্তে পরাভূত হইলেন। এই নূতন জয়ার্জ্জনের পর তিনি যশল্মীরে প্রত্যাগমন করিলেন। বারু নামক নগর হইয়া তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, ইত্যবসরে পথিমধ্যে এক জিপ্র-রাজপুত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! বীরজঙ্গ নামক এক দুর্দ্দান্ত রাঠোর আমার উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করে; আপনি না রক্ষা করিলে আমার আর উপায়ান্তর নাই।"

চাচিকদেব নিজ সৈন্সসামন্তগণকে একত্র করিলেন এবং সেটা-জাতির অধীশ্বর সুমর খাঁর সহিত একত্র হইয়া বীরজঙ্গের উপর আপতিত হইলেন। শতুলমীরের সমস্ত রাঠোর তাঁহার নিকট পরাভূত হইল; অনেকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। সেই নগরের শ্রেষ্ঠী ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিগণও স্ব স্ব মুক্তির জন্য নিষ্ক্রয়স্বরূপ অতুল ধনদান করিতে চাহিল; কিন্তু চাচিকদেব তাহাদের কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য করিলেন না;—কহিলেন, "তোমরা যদি সপরিবারে এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া যশল্মীরে গিয়া অবস্থিতি কর, তাহা হইলেই মুক্তি প্রদান করিতে পারি, নচেৎ আজীবন তোমা-দিগকে কারাগৃহে দিনযাপন করিতে হইবে।" পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা বিজে-তার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভট্টিরাজ্যে গমন করিল। সেই দিন হইতে যশল্মীর-নগর সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। বিজেতৃগণ দেবরাওল, পুগল, মারোট ইত্যাদি নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বিজিত রাঠোরের তিনটি পুত্র চাচিকের করে বন্দী হইল; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ দুইটি মুক্তিলাভ করিল, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ মৈরাকে দেহবন্ধকরূপে রক্ষা করিলেন। অতঃপর চাচিকদেব আপন বন্ধু সেটা-সর্দ্দারকে বিদায় প্রদান করিলেন এবং তদীয় পৌত্রী সোনালদেবীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ শ্বশুর হৈবত খাঁর নিকট হইতে চাচিক পঞ্চাশটি অশ্ব, পঞ্চত্রিংশৎ ক্রীতদাস, চারিখানি শিবিকা ও দ্বিসহস্র উষ্ট্রী প্রাপ্ত হইয়া ত্বরিতগতি প্রফুল্লচিত্তে মারোট নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুই বর্ষ অতীত হইল। চাচিকদেব পীলিবাঙ্গের শাসনকর্ত্তা খোকুর বিষ-রাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আক্রমণে বিপক্ষগণ পরাভূত হইল; তিনি তাহাদিগের রাজ্যের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। এই অবসরে ভট্টিবংশের চিরশত্রু লঙ্গহাগণ ধুনিয়ারপুর নামক নগরের উপর আপতিত হইয়া তত্রত্য ভট্টিগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিল। বহুজয়ার্জ্জনের পর রাবল চাচিকদেব পরিশেষে রোগাভিভূত হইয়া পড়িলেন। রোগে মৃত্যু অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মরণই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় ভট্টিরাজ লঙ্গহারাজের নিকট দূত প্রেরণপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি; রোগে মরণ অপেক্ষা শত্রুর হস্তে প্রাণত্যাগ করাই পুণ্যপ্রদ।" লঙ্গহারাজ সম্মত হইলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হইল। রাবল স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গজকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সপ্তশত সৈন্য সমভিব্যাহারে ধুনিয়ারপুর নগরে অগ্রসর হইলেন। তথায়

উপস্থিত হইয়া জানিলেন, মুলতানপতি দুই ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না।

অচিরেই যুদ্ধ বাধিল। বহুরায় বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন; নশ্বর নরদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি দিব্যবিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গধামে প্রস্থিত হইলেন।

চাচিকদেবের কনিষ্ঠ পুত্র রণবীর দেবরাওল নগরে অবস্থিতিপূর্ব্বক পিতার পারলৌকিকী ক্রিয়া সমাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার অপর ভ্রাতা কুম্ভ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং সর্ব্বসমক্ষে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে সেই দিবসেই তিনি রাজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেই শিবির একটি প্রকাণ্ড পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভটিরাজ কুম্ভ রাত্রিকালে অশ্বারোহণে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই পরিখা উত্তীর্ণ হইলেন এবং অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কালুশাহের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। অতঃপর সেই ছিন্নমুণ্ড লইয়া তিনি দেবরাওল নগরে ভ্রাতৃগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। বীরশীল ধুনিয়ারপুর পুনঃস্থাপনপূর্ব্বক কিরোরে গমন করিলেন। এ দিকে লঙ্গহাগণ হাইবৎ খাঁর দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনরায় তাহাদের উপর আপতিত হইল; তাহার অনেক সৈন্যসামন্ত ভটিরাজপুত্রের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল; অবশেষে সে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই সময়ে বেলুচ হোসেন খাঁ বিকমপুর আক্রমণ করে।

এই সময়ে রাবল বীরসিংহ যশল্মীরের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। রাও বীরশীলের প্রত্যাগমনসময়ে তিনি তৎসহ সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ১৫৩০ সংবতে বিকমপুরের তোরণ ও প্রাসাদ তৎকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয়।

কৈলুনের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা বহুশাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গারানদীর উভয়কূলবর্ত্তী ভূমিসমূহে বাস করিতে লাগিল। এই সময়ে সুলতান বাবর কর্ত্তৃক লঙ্গহাগণের হস্ত হইতে মূলতান আচ্ছিন্ন হয়। তথায় একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা সংস্থিত ছিল। সেই দিন হইতে ভটি ও মোগলে বিষম বিদ্রোহসূচনা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

যশল্মীরের স্বাধীনতাচ্যুতি, সুবলসিংহ, অমরসিংহ, চুন্না-রাজপুতদিগের বিদ্রোহ, রাজা অনুপমসিংহ, যশল্মীর আক্রমণ, অমরসিংহের মৃত্যু, যশোবন্ত, পুগল, বারমৈর ফিলোদী, খাড়াল আক্রমণ, অখিসিংহ, তাঁহার রাষ্ট্রাপহারকের হত্যা, রাবল, মূলরাজ, স্বরূপ সিংহ মেহতা, রাজকুমার রায়সিংহের নির্ব্বাসন, ভট্টিসর্দ্দারগণের বিদ্রোহ, সলিমসিংহ, জোরাবরসিংহ, গজসিংহ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মূলরাজের সন্ধি, তাঁহার মৃত্যু, গজসিংহের অভিষেক।

সুবলসিংহ যশল্মীরের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন। ইঁহারই শাসনকালে যশল্মীর মোগলসাম্রাজ্যের অধীনে সামন্তরাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সুবলসিংহ রাবল লুনকর্ণের সিংহাসনের যোগ্যপাত্র নহেন। ইঁহারই পূর্ব্ববর্ত্তী

রাজা মনোহরদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র রাবল নাথুকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীরা ভটিকুলের সিংহাসন লাভ করিতে পারে নাই। রাজহন্তা মনোহরদাসের লোকান্তরগমনের পর রাবল পুরকর্ণের দ্বিতীয় পুত্র মালদেবের প্রপৌত্র সুবলসিংহ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

মনোহরদাসের পুত্র রামচাঁদ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারে, তাহার তাদৃশ কোন গুণই ছিল না। কাজেই ভট্টিসর্দ্দারগণ সুবলকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিল। সুবল অম্বরপতির ভাগিনেয়, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য আফগান-দস্যুগণকে জয় করিয়া সুবল সম্রাটের প্রসাদ প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ যোধপুরের অধিপতি যশোবন্তসিংহের প্রতি এই আদেশ করিয়া পাঠান যে, "সুবলসিংহকে যশল্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" সম্রাটের আদেশে নাহর খাঁ যশল্মীরে আসিয়া সুবল-সিংহকে সম্রাটের স্বাক্ষরিত সনন্দপত্র সমর্পণ করিলেন।

সুবল ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে তদীয় পুত্র অমরসিংহ যশল্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার অগ্রে তিনি টীকাডোর উৎসব-সম্পাদনার্থ বেলুচগণকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সেই সমরক্ষেত্রেই অভিষিক্ত হইলেন। ইত্যবসরে চুন্না-রাজপুতগণ ঈশানকোণ হইতে পুনরায় ভটিরাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

এ দিকে বিকমপুরের অধিবাসিগণ কণ্ডুলোট রাঠোরদিগের অত্যাচারে একান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। তখন সুন্দরদাস ও দলপৎ নামক সর্দ্দারদ্বয় প্রতিশোধপিপাসার শান্তিবিধানার্থ বিকানীরের প্রান্তবর্ত্তী জুজু নামক নগর আক্রমণ করিলেন এবং নগরলুণ্ঠনপূর্ব্বক অগ্নিদগ্ধ করিয়া বিকমপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। কণ্ডুলোট রাঠোরেরাও ভট্টিনৃপতির নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া প্রতিশোধ লইল। এই সূত্রে অচিরেই উভয়দলে একটি যুদ্ধ বাধিল। মহাবীর ভট্টিগণ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

এই সময় বিকানীরপতি অনুপসিংহ দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন। ভট্টিগণের জয়লাভ এবং রাঠোরগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রীর প্রতি অনুমতি করিলেন, "অমাত্যবর! সত্বর ঘোষণাপত্র প্রচার কর, অস্ত্রধারণে সমর্থ কণ্ডুলোটমাত্রেই যেন যশল্মীর আক্রমণ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। আশু বিকমপুর হস্তগত ও বিধ্বস্ত করিতে হইবে। এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত হইতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। সকলেই রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল। এ দিকে রাবল অমরসিংহও যুদ্ধের আয়োজন করিয়া শত্রুকুলের সম্মুখীন হইলেন। আশু তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বারমৈর ও কটোরার রাঠোরদিগকে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া মহাবীর অমরসিংহ পুনর্ব্বার পুগল অধিকার করিয়া লইলেন।

রাবল অমরসিংহের আট পুত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৫৮ সংবতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যশোবন্ত-সিংহ যশল্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

এ দিকে রাঠোরগণ পুগল, বারমৈর, ফিলোদী এবং অন্যান্য অনেকগুলি নগর আচ্ছিন্ন করিয়া লইল। গারানদীর তীরভূমে যে সমস্ত স্থান ভট্টিকুলের অধিকৃত ছিল, দাউদ খাঁ নামক আফগানসর্দ্দার তাহা হস্তগত করিল। তদবধি সেই রাজ্য দাউদপৌত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

যশোবন্তসিংহের পাঁচ পুত্র,—জগৎসিংহ, ঈশ্বরসিংহ, তেজসিংহ, সর্দ্দারসিংহ ও সুলতানসিংহ।

তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ জগৎসিংহ আত্মহত্যা করেন। তাঁহার তিন পুত্র ;—অখিসিংহ, বুধসিংহ ও জোরাবরসিংহ।

অখিসিংহ রাজসিংহাসন লাভ করেন। বসন্তরোগে অখিসিংহের মৃত্যু হয়। অখিসিংহের পিতৃব্য তেজসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন ; অগত্যা রাজপুত্র দিল্লী নগরীতে প্রস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহাদের পিতামহ রাবল যশোবন্তসিংহের ভ্রাতা হরিসিংহ সম্রাটের অধীনে দিল্লীতে কার্য্য করিতেছিলেন। ভ্রাতুষ্পৌত্রদিগের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি রাষ্ট্রাপহারী তেজসিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার জন্য যশল্মীরে উপস্থিত হইলেন। যশল্মীরে একটি উৎসব প্রচারিত ছিল, তাহার নাম লাস। সেই উৎসবে ভট্টিরাজ প্রতিবর্ষে গরসিসর নামক সরোবরে গমনপূর্ব্বক হ্রদগর্ত হইতে স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে এক মুষ্টি কর্দ্দম খনন করিয়া লইতেন। তৎপরে রাজ্যের অন্যান্য সকলে তাঁহার আদর্শের অনুকরণ করিত। এই প্রকারেই গরসিসর-সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইত। তেজসিংহ সেই উৎসবের সময় মহাসমারোহে সরোবরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এ দিকে হরিসিংহ সসৈন্যে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। তেজসিংহের প্রাণসংহার হইল ; কিন্তু হরিসিংহের আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইল না। কারণ, তেজসিংহের শিশুপুত্র শোবেসিংহ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন অখিসিংহ যশল্মীরের চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং তেজসিংহের শিশুপুত্র শোবের প্রাণবধ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

চত্বারিংশদ্বর্ষ রাজ্যশাসনের পর অখিসিংহ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে ১৮১৮ সংবতে মূলরাজ ভট্টি-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ;—রায়সিংহ, জগৎসিংহ ও মানসিংহ। মূলরাজের একটি মন্ত্রী স্বরূপসিংহ হইতেই যশল্মীরের বিস্তর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল ; এমন কি, যশল্মীরের শোচনীয় দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না ; মেহতাগোত্রে স্বরূপসিংহের জন্ম। সে ব্যক্তি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ; জাতিতে বণিক্। এই মন্ত্রীর সহিত সর্দ্দারসিংহনামা এক ভট্টিসর্দ্দারের কলহ উপস্থিত হওয়াতে সর্দ্দারসিংহ যুবরাজ রায়সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। স্বরূপের উপর রায়সিংহের ঘৃণা ছিল। ভট্টিসর্দ্দারগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি পিতার সমক্ষেই সেই দুর্ব্বৃত্ত মন্ত্রীর প্রাণবধের উপক্রম করিলেন। তাঁহার একমাত্র আঘাতে গুরুতর আহত হইয়া স্বরূপসিংহ প্রাণভয়ে রাবল মূলরাজকে জড়াইয়া ধরিল। সর্দ্দারগণ কহিল, রাবলের প্রাণবধ না করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। কিন্তু রায়সিংহের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। পিতার প্রতিকূলে তিনি অস্ত্র উদ্যত করিতে পারেন না। রাবল অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভট্টিসর্দ্দারগণ রায়সিংহকে রাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিল ; কিন্তু যুবরাজ সম্মত হইলেন না। একখানি খট্টার উপর বসিয়া তিনি রাজকার্য্য পারদর্শন করিতে লাগিলেন।

তিন মাস অতীত হইল। রাবল মূলরাজ কারামধ্যে শৃঙ্খলিত। প্রধান ভট্টিসর্দ্দার অনুপসিংহের স্ত্রী তাঁহার উদ্ধারসাধনে যত্নবতী হইয়া স্বীয় পুত্র জোরাবরসিংহকে কহিলেন, "বৎস! রাজার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এক সময়ে উঁহাকে পদচ্যুত করিতে আমিই তোমার পিতাকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। অতএব তুমি রাজাকে উদ্ধার কর এবং প্রকৃত রাজভক্তির উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতে অতুল কীর্ত্তির অধিকারী হও। ইহাতে তোমার পিতা প্রতিকূল হইলে তাঁহাকে হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইও না, বরং আমি তাঁহার মৃতদেহ অঙ্কে লইয়া চিতানলে প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি রাজার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর মর্ম্মবেদনা সহ্য করিতে পারি না।"

জননীর আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে না পারিয়া জোরাবর তৎক্ষণাৎ রাজার উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইলেন, পিতৃব্য অর্জ্জুন ও মেঘনামক এক সর্দ্দার তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়া তাঁহারা রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন। আমরা আপনার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হইয়াছি।" অচিরে নাগরা বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ঘোষণা প্রচার হইল, রাবল মূলরাজ সিংহাসনে পুনরভিষিক্ত হইলেন।

মূলরাজ রাজপদে পুনরভিষিক্ত হইয়াই পুত্র রায়সিংহকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। রায়সিংহ নির্ব্বাসিত হইয়া কোটারো নামক নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তত্রত্য সর্দ্দারেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। একটি সর্দ্দার তখন কহিলেন, "আসুন, যশল্মীর-রাজ্যকে রসাতলে নিমগ্ন করি।" গর্জ্জন করিয়া রায়সিংহ বলিলেন, "জন্মভূমির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ! জন্মভূমির অনিষ্টসাধনে যে উদ্যত হইবে, সে আমার শত্রু।" অতঃপর তিনি যোধপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তদীয় সমভিব্যাহারী সর্দ্দারবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে না গিয়া সেই শিব-কোটানা ও বারমৈরে অবস্থান করিল এবং লুণ্ঠনাদি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিল। তাহাদের সেই পাশব ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভট্টিরাজ তাহাদিগের দুর্গ ভগ্ন করিলেন এবং ভূমিসম্পত্তি আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। তখন তাহারা সেই নিষ্ঠুর ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে ভট্টিরাজ তাহাদিগের ভূমিবৃত্তি পুনঃ প্রদান করিলেন।

আড়াই বর্ষ অতীত হইল। এ যাবৎ নির্ব্বাসিত রায়সিংহ মারবারপতি বিজয়সিংহের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু সেখানেও সকলে তাঁহার উদ্ধতপ্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যোধপুরের কোন বণিক্ তাঁহার নিকট কিছু টাকা পাইত; একদিন সেই ব্যক্তি প্রাপ্য অর্থের জন্য তাঁহার প্রতি অবমাননাসূচক বাক্যপ্রয়োগ করাতে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং মারবার পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মূলরাজ তাঁহাকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তখন রায়সিংহ দীবো নামক দুর্গে নির্ব্বাসিত হইলেন। পুত্রকলত্রাদি সহ তিনি সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রায়সিংহের হস্তে মেহতামন্ত্রী স্বরূপসিংহের প্রাণবধ হইলে পুত্র সলিমসিংহ যশল্মীরের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের শোণিতে পিতৃশোক নিবারণ করিয়াছিল। বিষ, ছুরিকা ও অগ্নির সাহায্যে সেই নিষ্ঠুর সলিম ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি লোকের প্রাণবধ করিল। তাহার চক্রে পতিত হইয়া রায়সিংহ সস্ত্রীক দীবো-দুর্গে অগ্নিদগ্ধ হইলেন; তাঁহার পুত্র দুইটি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু তথাপি সেই নিষ্ঠুরের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। সলিম তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক ধৃত করিয়া মরুভূমির এক প্রান্তস্থিত রামগড়-দুর্গে অবরুদ্ধ করিল। মহামতি জোরাবরসিংহ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাবলকে কহিলেন যে, রাজপুত্রদ্বয়কে সেই দূরপ্রদেশ হইতে আনিয়া রাজধানীতে রক্ষা করা উচিত; নতুবা তাঁহাদের জীবনসংশয়। কি দুঃখের বিষয়, রাবল মূলরাজ সে বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। নরপিশাচ সলিম দেখিল, তাহার দুরভিসন্ধি জোরাবরের তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিকট গোপন রাখা দুরূহ। তদবধি সে ভট্টিসর্দ্দারের প্রাণসংহারের চেষ্টায় থাকিল। দুর্ভাগ্যবশে রাক্ষসের মনোরথ সিদ্ধ হইল। দুর্ব্বৃত্ত বিষপ্রয়োগে জোরাবরসিংহের প্রাণবধ করিল এবং অভয়সিংহ ও ধনকুলসিংহের জীবনসংহারের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুর্ব্বৃত্ত তাহারও উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইল। সরলমতি অভয় ও ধনকুল পুত্রকলত্র-সহ অলক্ষিতে তৎপ্রদত্ত বিষমিশ্রিত দ্রব্য সেবন করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। এই প্রকারে ক্রমে

ক্রমে অনেকগুলি রাজপুত্র, সর্দার ও সেনাপতি পিশাচ সলিমের বিদ্বেষচক্রে পতিত হইয়া বিষ-পানে কিংবা ছুরিকাঘাতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যশল্মীরে প্রকৃত অরাজকতা উপস্থিত হইল। যশল্মীরের সিংহাসনে রাজা আছেন বটে, কিন্তু তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, রাজ-নামের যোগ্য নহেন; তাঁহাকে কাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সমক্ষে তদীয় পুত্র ও পৌত্রগণ নিহত হইলেন, রাজ্যের গৌরবস্বরূপ জোরাবরের প্রাণনাশ হইল, তিনি কিছুই প্রতি-বিধান করিতে সমর্থ হইলেন না। যে যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক শক্তিবলে এক সময়ে সমগ্র গান্ধার ও জাবালিস্থান পর্য্যন্ত স্বীয় মুষ্টিগত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহাকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া আজিও জগতের লোকে পূজা করে, যাঁহার বংশধরদিগের প্রতাপ এক সময়ে সমগ্র ভারত —অধিক কি, সুদূর হিন্দুকুশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, আজি তাঁহার বংশধর হইয়া যশল্মীরের রাজা নিস্তেজ ও দীনহীনভাবে অবস্থিত।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে রাবল মূলরাজ লীলাসংবরণ করিলেন। অতঃপর মূলরাজের পৌত্র যশল্মীরের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন সলিমের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ থাকিয়া তাঁহাকে দীনভাবে দিন-যাপন করিতে হইল।

জয়পুর

ও

শিখাবতী

প্রথম অধ্যায়

——:*:——

জয়পুরের প্রাচীন নাম, শিখাবতশাখা, কচ্ছাবহদিগের উৎপত্তি, নরবরপ্রতিষ্ঠা, বুন্দর স্থাপন, অজমীররাজের কন্যার বিবাহ, বুন্দরজয়, মৈদুলরায়, কণ্ডুল, পুজনের সিংহাসনারোহণ, মীনজাতি, পুজনের বিবাহ, তাঁহার যুদ্ধবিক্রম, কনোজের রাজকুমারীহরণে তাঁহার প্রাণবিয়োগ, মেলীসিংহের অভিষেক, পৃথ্বীরাজের গুপ্তহত্যা, বাহার-মল, ভগবান্‌দাস, ভগবান্‌দাসের কন্যার বিবাহ, মানসিংহ, রাও ভাও, মাহা, মির্জা, রাজা জয়সিংহ, পুত্রের হস্তে তাঁহার মৃত্যু, রামসিংহ, বিষণসিংহ।

জয়পুর অম্বররাজ্যের নামান্তর। প্রাচীন ধুন্দরাজ্যই অম্বর নামে অভিহিত। জয়পুর-নগরীপী অম্বরের রাজধানী। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ একত্র হইয়া অম্বররাজ্য সংগঠিত হইয়াছে। মীনগণই অম্বরের আদিম অধিবাসী। কুশাবহগণ মীনদিগের হস্ত হইতে এই রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। অম্বররাজের বংশধর হইতেই শিখাবতী নগরীর প্রতিষ্ঠা; সুতরাং তত্রত্য রাজবংশ ও অম্বররাজবংশ সমকুল বলিয়াই পরিগণিত।

কুশাবহগণ বলেন, ভগবান্ রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশ হইতে তাঁহাদের বংশের উৎপত্তি হই-য়াছে। মহারাজ কুশ পিতৃলোকের বাসস্থান হইতে সোমনদের তীরে আসিয়া রোতস্ নগর স্থাপন করেন। কতিপয় পুরুষ পরে তদ্বংশীয় নলরাজা ৩৫১ সংবতে নরবর (নিষধ) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থপাঠে জানা যায়, নিষধরাজ্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বে কুশাবহগণ লাহার ও গোয়ালিয়র নগরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। লাহার নগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অদ্যাপি কচ্ছাবাগার নামে অভিহিত হয়। কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কুশাবহবংশীয় কোন্ রাজা যে লাহার ও গোয়ালিয়র নগরে গিয়া বাস করেন, কোন ইতিবৃত্তে তাহার উল্লেখ নাই। নলরাজার বংশ-ধরেরা পাল উপাধি ধারণ করিয়াছে; তাঁহার অধস্তন ত্রয়স্ত্রিংশৎ পুরুষ সোরসিংহ পর্য্যন্ত ঐ উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছিল। সোরসিংহের পুত্র ঢোলারায় পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ধুন্দররাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১০২৩ সংবতে খুন্দরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

সোরসিংহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলে তাঁহার ভ্রাতা তদীয় রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তখন মহারাজ সোরসিংহের পুত্র ঢোলারাও অতি শিশু। ঢোলারাওয়ের মাতা শিশুটিকে একটি করণ্ডিকামধ্যে স্থাপন করিয়া ছদ্মবেশে রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজ্যের পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। জয়পুরের আড়াই ক্রোশ দূরে খোগঙ্গনগর সংস্থিত। মীনগণ তথায় অবস্থিতি করিত। বিধবা রাজমহিষী শিশুপুত্রটিকে লইয়া সেই নগরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমে ও দারুণ ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল। পুত্রটিকে করণ্ডিকাসমেত ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক তিনি নিকটবর্ত্তী বন্যবৃক্ষ হইতে কয়েকটি ফল চয়ন করিতে লাগিলেন। সহসা পুত্রের দিকে নেত্রপাত হইল। তিনি দেখিলেন, একটি বিশালকায় অজগর সর্প স্বীয় ফণা সেই করণ্ডিকার উপর ধীরে ধীরে বিস্তার করিতেছে। প্রাণকুমারের প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভয়বিহ্বলা রাজমহিষী তৎক্ষণাৎ মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। একটি পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ অনতিদূর দিয়া গমন করিতেছিলেন। আর্ত্তস্বর তাঁহার শ্রুতিবিবরে প্রবেশমাত্র তিনি সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই অত্যদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। সস্নেহবচনে তিনি মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! ভয় নাই, তোমার পুত্র অচিরেই রাজচক্রবর্ত্তী হইবে।" ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া ঢোলারাওয়ের জননী সবিষাদে উত্তর করিলেন, "প্রিয়বর! উৎকট ক্ষুৎপিপাসা হইতে প্রাণরক্ষা হইলে তবে ত ভবিষ্যৎ সুখের মুখ দেখিতে পাইব; হয় ত এখানেই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে।" "জননি! চিন্তা নাই, আমি তোমার উপায় করিয়া দিতেছি," বলিয়া সেই পরিব্রাজক তাঁহাকে খোগঙ্গনগরের পথ দেখাইয়া দিয়া তথায় যাইতে উপদেশ দিলেন।

ভিক্ষুকের আশ্বাসবাক্যে নির্ভর করিয়া রাজমহিষী সেই করণ্ডিকাসহ শিশুটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া খোগঙ্গনগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগরী শৈলমালায় পরিবেষ্টিত। নগরীমধ্যে প্রবেশমাত্র মীনরাজের একটি দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহিষী তাঁহার নিকট আপনার দুর্দ্দশার কথা বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "যদি কাহারও দাসীত্ব করিয়া এই শিশুটির প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহাতেও আমার অমত নাই। ভগিনি! তুমি আমাকে কোন স্থানে দাসী রাখিয়া দাও।" দাসীমুখে সংবাদ পাইয়া মীনরাজমহিষী তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলেন।

একদিন ঢোলারাওয়ের মাতা রাজার আহারের জন্য নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া মীনরাজ রালুনসিংহের তৃপ্তির পরিসীমা রহিল না। সেরূপ উপাদেয় অন্ন তিনি জীবনে কখনও সেবন করেন নাই। কে এই সমস্ত অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা পাচিকাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ঢোলারাওয়ের জননী মীননৃপতির নিকট আনীত হইলে রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিধবা রাজমহিষী কোন কথা গোপন না করিয়া নিজবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। রাজপুতরাণীর পরিচয় পাইয়া রালুনসিংহ তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মভগিনী এবং ঢোলারাওকে ভাগিনেয়রূপে স্বীকার করিলেন। সেই দিন হইতে পরম যত্ন ও আদরের সহিত রাজকুমার ঢোলারাও জননীর সহিত মীনরাজের আশ্রয়চ্ছায়াতলে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন।

ক্রমে ঢোলারাও চতুর্দ্দশবর্ষে পদার্পণ করিলেন। খোগঙ্গ দিল্লীর অধীন রাজ্য, বর্ষে বর্ষে দিল্লীশ্বরকে নিয়মিত কর প্রদান করিতে হয়। মীনরাজ রালুনসিংহ নিয়মিত করসহ ঢোলারাওকে দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। সেই উপলক্ষে দিল্লীতে গিয়া ঢোলা একাধিক্রমে পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অনেকগুলি রাজপুতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইল। অনেকে

তাঁহার উপকার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সেই সকল বন্ধুর আশ্বাসবাক্যে নির্ভর করিয়া ঢোলা আপনার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার নেত্রসম্মুখে যেন অম্বরের ভবিষ্যগৌরবচ্ছবি বিরাজ করিতে লাগিল। খোগঙ্গনগরে স্বীয় গৌরবপতাকা উত্তোলন করাই ঢোলার সংকল্প। যিনি বিপদের পরম বন্ধু, মাতাপুত্রে সঙ্কটাবস্থায় যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণদান পাইলেন, পুত্রনির্ব্বিশেষে যিনি তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এখন ঢোলারাও কি সেই অন্নদাতা পিতৃকল্প ধর্ম্মমাতুল রালুনের উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই উৎসাদনে স্থিরসঙ্কল্প হইবেন?—কে বলিতে পারে? রাজপুতের মূলমন্ত্র ভূমিলাভ। রাজপুতের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। উপকারী রালুনসিংহকে সংহার করিয়া খোগঙ্গরাজ্য অধিকার করিবেন, ইহাই ঢোলার সঙ্কল্প। ধাদিলের (মীনকুলের কুলাখ্যাত) সহিত তিনি এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ধাদিল বলিল, "দেয়ালীর দিন অভীষ্টসিদ্ধির বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইবে। মীনরাজ সেই দিন সদলে একটি পুষ্করিণীতে অবতরণ-পূর্ব্বক অবগাহন করেন।" ধাদিলের কথায় প্রীত হইয়া ঢোলা দেওয়ালীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে উৎসবদিন উপস্থিত হইল। রাজা পুষ্করিণীতীরে যেমন উপস্থিত হইয়াছেন, ঢোলাও অমনি কতিপয় রাজপুতবীরসহ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক সদলে সংহার করিলেন। নরশোণিতে সরসীসলিল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল।

যাহা দ্বারা প্রভুর বিশ্বাস নষ্ট হয়, জগতে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, কোনরূপ দুষ্ক্রিয়া-চরণেই সে কুণ্ঠিত হয় না। ঢোলার মনে মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। এই কারণেই আশ্রয়দাতার প্রাণহরণের পরেই তিনি হতভাগ্য ধাদিলেরও প্রাণসংহার করিলেন। নৃশংসব্রতের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। খোগঙ্গনগর ঢোলারাওয়ের অধিকৃত হইল। অত্যল্পদিন পরেই তিনি দেওশা (দেবনশা) জনপদে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান জয়পুরের ত্রিশ মাইল পূর্ব্বে বাণগঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত। বীর গুজরগোত্রীয় এক স্বাধীন রাজপুত তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঢোলারাও তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন। বীরগুজর উত্তর করিলেন, "সে কি? তাহা কখনই হইতে পারে না। আপনারা সূর্য্যবংশীয়; আমরাও সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এখনও আমাদের মধ্যে শত পুরুষ অতীত হয় নাই।" বীরগুজর এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু অচিরেই জানিতে পারিলেন, তাঁহার গণনায় ভ্রম হইয়াছে, ঢোলার সহিত কন্যার বিবাহ দিলে কোন দোষ নাই। তখন তিনি সাদরে ঢোলার করে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বীরগুজর অপুত্রক ছিলেন, জামাতার গুণে প্রীত হইয়া স্বীয় রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ঢোলার আশাপিপাসা প্রশমিত হইল না। অতঃপর শিরোনামক মীনগণের উপর তাঁহার আক্রোশদৃষ্টি নিপতিত হইল। তাহাদের শাসন-কর্ত্তার নাম রাওনাতো। মাচনামক নগরে থাকিয়া সেই মীনরাজ শাসনদণ্ড পরিচালন করিত। তাহাকে পরাজয় করিয়া ঢোলা মাচনগর অধিকার করিলেন। তদবধি সেই নবজিত নগরই তাঁহার রাজপাট বলিয়া পরিগণিত হইল। এই মাচনগরই পরিশেষে রামগড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কিছু দিন অতীত হইল। ঢোলারাও আর একটি বিবাহ করিলেন। এই নবীনা মহিষীর নাম মারুণী; ইনি অজমীররাজের কন্যা। একদা ঢোলা এই নবোঢ়া পত্নীর সমভিব্যাহারে অম্বাহিং-মাতার পবিত্রমন্দিরে পূজা দিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তৎপ্রদেশবাসী প্রায় একাদশ সহস্র মীন সমবেত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল। তৎক্ষণাৎ তুমুলযুদ্ধ সংঘটিত হইল। বহুসংখ্য মীন ঢোলার হস্তে নিপতিত হইল বটে, কিন্তু তিনিও স্বীয় প্রাণরক্ষা করিতে না পারিয়া পরিশেষে রণক্ষেত্রে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন মারুণী পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন।

তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে তাঁহার গর্ভে কক্কুলের জন্ম হইল। ইনিই ধুন্দর-প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। কক্কুলের পুত্র মৈদুলরাও শুশাবৎ-মীনগণের নিকট হইতে অম্বর জনপদ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। তখন অম্বরে মীনকুলের শাসনকর্তা রাওনাত্তো অবস্থিতি করিত। এতদ্ভিন্ন নন্দলামীনদিগকে পরাভূত করিয়া মৈদুলরাও গাটুরগাটি নামক জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন।

মৈদুলরাও পরলোক গমন করিলে হুনদেব ধুন্দরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। পিতৃপুরুষগণের ন্যায় হুনদেবও অসভ্যগণের প্রতিকূলে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন; হুনদেবের পর কুন্তল ধুন্দরের সিংহাসন লাভ করেন। কুন্তল স্বীয় রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ববাসী পার্ব্বত্যগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই সময় ভুটরার জনপদে একটি চৌহানরাজা অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার কন্যার সহিত কুন্তলের পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির হয়। কুশাবহ-রাজকুমার বরসাজে সজ্জিত হইয়া বিবাহযাত্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় তদীয় মীনপ্রজাপুঞ্জ চারিদিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, "মহারাজ! পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমরা বিস্মৃত হই নাই। আপনার পিতৃপুরুষগণের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের হৃদয়ে অন্তর্নিগূহিত রহিয়াছে; অতএব আপনি যখন রাজ্য হইতে দূরে গমন করিতেছেন, তখন নাগরা নিশানা প্রভৃতি আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া যাত্রা করুন।" কুন্তল তাহাতে অসম্মত হইলেন। মীনগণও আপনাদের নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিল না; সুতরাং উভয়দলে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সেই যুদ্ধে কুন্তল জয়লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি সমগ্র ধুন্দরের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার রাজত্বের পর প্রাতঃস্মরণীয় গৌরবান্বিত রাও পূজন ধুন্দরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাও পূজন স্বীয় বীর্য্যবত্তা ও মহত্ত্বাদিগুণে সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। দিল্লীর বীরকেশরী চৌহান পৃথ্বীরাজের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পৃথ্বীরাজ পূজনকে বিশেষ সম্মান করিতেন; এমন কি, রাও পূজনকে তিনি একটি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। পূজনের বীরত্বের পরিচয় অধিক কি দিব, বীরবর আলা-উদ্দীনও তৎসকাশে পরাজিত ও অবমানিত হইয়া গজনী-অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই কুশাবহবীরের সাহায্যে পৃথ্বীরাজ চাঁদেলদিগের মাহোবাররাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই কারণেই পূজন পৃথ্বীরাজের নিকট পুরস্কারস্বরূপ মাহোবারের শাসনভার প্রাপ্ত হন। যখন পৃথ্বীরাজ কনোজ-রাজকুমারীকে হরণ করেন, তৎকালে রাও পূজনই তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

যখন কনোজরাজ জয়চাঁদের সহিত পৃথ্বীরাজের ভীষণ সংগ্রাম ঘটে, ক্রমাগত পাঁচদিন মহাযুদ্ধ চলিতে থাকে, তখন সেই ভীষণযুদ্ধের প্রথম দিবসে বীরকেশরী পূজন ও গিহ্লোটবংশীয় মহাবীর গোবিন্দসিংহ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রণক্ষেত্রে পতিত হইবামাত্র পূজন চীৎকারস্বরে বলিয়াছিলেন, "মানুষের পরমায়ু শতবর্ষ মাত্র; তাহার অর্দ্ধাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত হয়, অপরার্দ্ধ শৈশবে ক্ষয়িত হইয়া যায়; কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিমান্ জগন্নিয়ন্তা আমাকে অসিচালনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই জন্য বীরধর্ম্ম পালন করিলাম।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি আনন্দের সহিত নয়ন নিমীলন করিলেন। তাঁহার পুত্রও এই যুদ্ধে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর মেলীসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি পিতার অনুরূপ পুত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। অনেকগুলি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা স্বত্রাহি নগরে মান্দুরাজের সহিত যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে তিনি যেরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্য

কোন যুদ্ধে সেরূপ বীরত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে কবিগণের কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতা রচিত আছে ;—

"পহ্লন পূজন জিতে,
মাহোবা কনোজ লড়ে,
মান্দু মেলীসি জিতা,
রাড় রুত্রাহিকা
আজ ভগবান্দাস জিতা,
মোবাসি লড়ে
রাজা মানসিং জিতা
খোটন ফৌজ হুবাহি।"

অর্থাৎ পহ্লন, মাহোবা, পূজন, কনোজ, মেলীসিংহ, মান্দু, মানসিংহ, মোবাসি ও খোটন রাজ্যে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

মেলীসিংহের অধস্তন একাদশ পুরুষ যথাক্রমে বিজুল, রামদেব, কলীন, কুন্তল, জুনসিংহ উদয়-কর্ণ, নরসিংহ, বনবীর, উদ্ধারণ, চন্দ্রসেন ও পৃথ্বীরাজ নামে অভিহিত। পৃথ্বীরাজের সপ্তদশ পুত্র। তন্মধ্যে পাঁচটি শৈশবাবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। যে দ্বাদশ জন প্রাপ্তব্যবহারকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সেই দ্বাদশ পুত্র ও তাঁহাদের সন্তানগণকে পৃথ্বীরাজ স্বরাজ্যে দ্বাদশটি ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই দ্বাদশটি ভূসম্পত্তি বারো কুঠ্রী (দ্বাদশ কক্ষ) নামে প্রথিত। পৃথ্বীরাজের তনয়দিগের মধ্যে কুশাবহ সামন্তভূমি এই প্রকারে বিভক্ত হইবার অনেক পূর্ব্বে বলোজী নামক একটি কুশাবহ-রাজপুত্র পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি পৃথক্ বিশালরাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মেলীসিংহের ষট্পুরুষ অধস্তন উদয়কর্ণের তৃতীয় পুত্র পিতার জীবিতাবস্থায় বলোজী অম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক সোপার্জ্জিত অমৃতসর নগরে গমন করেন।

এই বলোজী হইতেই শিখাবতীর প্রতিষ্ঠা হয়। বলোজীই শিখাবৎ-সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ। অমৃতসর ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহার তিন পুত্র,—মুকুলজী, খেমারজী ও খারুদ। মুকুলজী পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। খেমারজীর বংশধরেরা বালপোতা নামে প্রসিদ্ধ। খারুদের পুত্র কুলন হইতেই কুমাবৎ বংশধরগণের উৎপত্তি হয়। একটি ফকীরের আশীর্ব্বাদে মুকুলের পুত্রসন্তান জন্মে, তাহার নাম সেখজী। পিতার মৃত্যুর পর সেখজী পিতৃপদ লাভ করিয়া নিজ বাহুবলে পৈতৃক রাজ্য বহু পরিমাণে বিস্তৃত করেন। এই সময়ে অম্বররাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সেখজী জয়লাভ করেন। যে অম্বর হইতে শিখাবতীরাজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল, এই সময় হইতেই সেই মূলরাজ্যের সহিত পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে সংস্থাপিত হইল। ইহার পর অম্বররাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে আবার শিখাবতী তদধীনে সামন্তরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সেখজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র রায়মল্ল শিখাবতীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎপরে সুজ (সূর্য্য) রাজপদ লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ;—নূনকর্ণ, রায়শাল ও গোপাল। জ্যেষ্ঠপুত্র অমৃতসর, দ্বিতীয় লাম্বা এবং তৃতীয় পুত্র ঝারলদ প্রদেশ প্রাপ্ত হন। নূনকর্ণের মন্ত্রী রায়শালের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীতে সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে আফগানদিগের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রায়শাল সম্রাটের পক্ষ হইয়া সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি রায়-শালদরবারী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি প্রদেশও তিনি জায়গীর প্রাপ্ত হন।

খান্দাইলার শাসনকর্ত্তার একটি কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অবশেষে তিনি খান্দাইল অধিকার করিয়া তথায় প্রধান নগর স্থাপন করিলেন।

রায়শালের সাত পুত্র ;—গিরিধর, লারখান, ভোজরাজ, বীরমল্লরাও, পরশুরাম, হররামজী, ও তাজখান। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গিরিধর পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মেহো নামক পার্ব্বত্য-দস্যুগণকে দমনপূর্ব্বক সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। গিরিধরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বারকাদাস পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। শাজিহান লোদীর সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর তৎপুত্র বীরসিংহদেব পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ইনিও পিতার ন্যায় বীরত্বে সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহার সপ্ত পুত্র ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাহাদুরসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বাহাদুরের সহিত আরঙ্গজেবের মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে আরঙ্গ খান্দাইলার অসংখ্য দেবমন্দির বিধ্বস্ত করেন। বাহাদুরের মৃত্যুর পর কেশরীসিংহ পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া জঘন্য পাশববৃত্তির বশবর্ত্তী হইলেন। নিজ ভ্রাতার প্রাণসংহারপূর্ব্বক তিনি সমস্ত সম্পত্তি নিজ অধিকারভুক্ত করেন।

তৎপরে উদয়সিংহ কেশরীসিংহকে পরাস্ত করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করেন। উদয়গড়দুর্গ উদয়সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। অম্বরপতি জয়সিংহ উদয়ের বাহুবলের প্রশংসা শুনিয়া খান্দাইল অবরোধ করিলে উদয়সিংহ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। তৎপরে তদীয় পুত্র শিউরাইল এবং শিউরাইলের পর বৃন্দাবনদাস খান্দাইলের অধীশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

বৃন্দাবনদাসের জীবদ্দশাতেই গোবিন্দদাস রাজপদে অভিষিক্ত হন ; কিন্তু এক বৎসরের অধিক তাঁহাকে রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই। রাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে তিনি একটি ভৃত্যসহ রাজ্যপরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেই ভৃত্যই তাঁহার প্রাণসংহার করে। তাঁহার পঞ্চপুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই সময়ে রাজ্যমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়ের উপদ্রব উপস্থিত হয়। খান্দাইলার একাংশের অধীশ্বর ইন্দ্রিয়সিংহ প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর নানারূপ যুদ্ধবিগ্রহের পর অম্বররাজকর্ত্তৃক খান্দাইলারাজ্য অধিকৃত হয় এবং নরসিংহ বন্দী হইয়া অম্বরের কারাগারে অবরুদ্ধ হন। তৎপরে অম্বরপতির বিরুদ্ধে মহাবীর রাঘবসিংহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া খান্দাইলা দুর্গ জয় করিলে অম্বরপতি একটি ব্রাহ্মণের হস্তে ঐ প্রদেশ জমাবিলী করিয়া দেন। অতঃপর নিয়মিত সন্ধিবন্ধন পরিসমাপ্ত হইলে নরসিংহ কারাগারের ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন ; কিন্তু তৎপরেই মারবারের মহাসমরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

নরসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র অভয়সিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু শেষে জগৎসিংহ তদীয় রাজ্য করগত করিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করাতে তিনি মাচোররাজ ভক্তসিংহের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এ দিকে সিকরের সামন্ত লক্ষ্মণসিংহ নিজ বুদ্ধিমত্তাবলে ও কূটকৌশলে খান্দাইলারাজ্য অধিকার করিলেন। খান্দাইলার অধীশ্বরদিগের চিরদিনের পৈতৃকস্বত্ব বিলুপ্ত হইল। শিখাবতীরাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর এইরূপেই আবার সেই রাজ্যের অধঃপতন ঘটে। ফলকথা, অম্বরই শিখাবতীর মূলরাজ্য। অতঃপর আমরা অম্বরপতি পৃথ্বীরাজের ইতিবৃত্ত সমালোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম।

ভট্টগণের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে, অম্বরপতি পৃথ্বীরাজ দেউল (দেবিল) নামক পবিত্রতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন। ভট্টগ্রন্থপাঠে জানা যায়,

পিতৃঘাতী পাষণ্ড ভীমের মুখমণ্ডল রাক্ষসের ন্যায় বিকট দৃশ্য ছিল। পিতৃহন্তা ভীম স্বীয় পুত্র ঐশকর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া পিতৃহত্যাজনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়াছিল। ঐশকর্ণের ভ্রাতৃগণই তাহাকে সেই নিষ্ঠুর আচরণে উৎসাহিত করিয়াছিল। অতঃপর ঐশকর্ণ তীর্থপর্য্যটন দ্বারা পিতৃহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঐশকর্ণের পর বাহারমল অম্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কুশাবহরাজগণের মধ্যে ইনিই স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বপ্রথম যবনের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হন। ইনিই হুমায়ুনের নিকট মোগলাধীনে পঞ্চসহস্রের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাহারমলের পর তৎপুত্র ভগবান্‌দাস পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পিতা অপেক্ষা পুত্র যবনের প্রতি আরও অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। ভগবান্‌দাস মোগলবীর আক্‌বরের পরমবন্ধু। রাজা ভগবান্‌দাসই সর্ব্বপ্রথম মুসলমানের সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া পবিত্র রাজপুতকুলে কলঙ্ককালিমা প্রদান করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকুমার সেলিমের করে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কন্যার গর্ভেই হতভাগ্য খসরুর জন্ম হয়।

রাজা ভগবানদাসের তিনটি ভ্রাতা ছিলেন,—সুরতসিংহ, মধুসিংহ ও জগৎসিংহ। জগৎসিংহের পুত্র মানসিংহ। ভগবান্‌দাসের পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মানসিংহ অম্বরসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মানসিংহ আক্‌বরের মহতী সভার একটি উজ্জ্বলতম রত্ন; মানসিংহ হইতেই আক্‌বরের সৌভাগ্য ও উন্নতির পথ পরিষ্কার হয় এবং এই মানই আবার তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ। আকবর সন্তুষ্ট হইয়া মানসিংহকে প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; অতি বিশ্বস্ত ও কঠোর কার্য্যের ভার মানের প্রতি অর্পিত ছিল। মানসিংহ স্বদেশের অনিষ্ট করিয়াও সেই বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। খোতন হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ রাজা মানসিংহের প্রচণ্ড ভুজবলে বিজিত হইয়াছিল। উড়িষ্যা জয়, আসামের দর্পচূর্ণীকরণ ও কাবুলের বিদ্রোহদমন, এই তিনটি কার্য্যই মানসিংহ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। বঙ্গ, বিহার, দাক্ষিণাত্য ও কাবুল এই কয়টি রাজ্য তিনি শাসন করিয়াছিলেন। রাজপুতের সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধ বন্ধন করিয়া আক্‌বর মনে করিয়াছিলেন যে, নিষ্কণ্টকে সাম্রাজ্য পালন করিবেন; কিন্তু তাঁহার সে ধারণা ভ্রমমূলক হইয়া দাঁড়াইল। মানসিংহ তাঁহার সেই ভ্রম বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপ বৈজাত্যবিবাহই অন্তর্বিপ্লবের প্রধান কারণ। মুসলমানীর গর্ভজাত রাজপুতদিগের সহিত রাজপুতকুমারীর গর্ভজাত রাজকুমারগণের মনোমিলন হওয়া অসম্ভব। প্রায়ই দেখা যায়, পরস্পরে পরস্পরের প্রতি শত্রুতাচরণ করেন। বিশেষতঃ রাজপুতশোণিতে যাঁহাদের জন্ম, তাঁহারা মাতৃকুলের প্রতি অধিক অনুরাগী হন এবং মাতুল ও মাতামহগণকেই প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষমতা হইতে রাজপুতবৃন্দ বিশেষ গোলযোগ উত্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যকে বিপদ্‌জালে জড়িত করেন এবং রাজার উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে প্রায়ই কার্য্য করিয়া থাকেন। সেলিম মানসিংহের পিতৃব্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল এই সম্বন্ধবন্ধন হইতেই যে অম্বরপতি রাজসকাশে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহা তাঁহার ক্ষমতামত্তার একটি কারণ বটে, কিন্তু বিপুলবিক্রম, রাজনীতিজ্ঞতা ও রণনৈপুণ্য প্রভৃতি অন্যান্য গুণের সাহায্যেই তিনি সেই উচ্চক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অম্বরপতির সেই উচ্চক্ষমতা নষ্ট করিতে গিয়া আক্‌বর পরিশেষে আত্মপ্রাণ হারাইয়াছিলেন। মানসিংহের প্রতাপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া আক্‌বরের হৃদয় ঈর্ষায় অধীর হইল। মানসিংহকে তিনি একটি প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। প্রতিক্ষণেই তাঁহার

বিবেচনা হইতে লাগিল, মানসিংহ যেন তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। ঈর্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিষম চিন্তা তাঁহাকে জড়িত করিল; পরিশেষে তিনি অম্বরপতিকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন আকবর একপ্রকার মাজন প্রস্তুত করিয়া মানসিংহের জন্য তাহার অর্দ্ধাংশে বিষমিশ্রত করিয়া রাখিলেন, অপরার্দ্ধ বিশুদ্ধভাবে আপনার জন্য রক্ষা করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সম্রাট্ অনবধানতা বশতঃ অবশেষে সেই বিষাক্ত অর্দ্ধাংশ আপনিই সেবন করিয়া ফেলিলেন; পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে ফলিল।

আকবর মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। এ দিকে মানসিংহ স্বীয় ভাগিনেয় রাজপুত্র খসরুকে সম্রাট্‌পদে স্থাপন করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতে স্বয়ং সেলিমের মস্তক রাজমুকুটে সুশোভিত করিলেন। রাজা মানসিংহের অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। তিনি বঙ্গরাজ্যে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই অন্তর্বিপ্লব আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তখন মোগলসম্রাট্ জাঁহাগীর খসরুকে চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরগণকে নিষ্ঠুররূপে সংহার করিলেন। মানসিংহের উত্তেজনায় তদীয় ভাগিনেয় বিদ্রোহিতাচরণে উত্তেজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মাতুল মানসিংহ অতি চতুরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে ছিলেন। জাঁহাগীর ইচ্ছা করিলেও প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে প্রতিফল প্রদান করিতে পারেন নাই, কারণ, অম্বরপতি প্রবলপ্রতাপান্বিত, তাহাতে আবার প্রায় বিংশতি সহস্র বীর রাজপুতসৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। অম্বরের রাসগ্রন্থে লিখিত আছে, সম্রাট্ জাঁহাগীর মানসিংহের দশক্রোর টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। আবার ফেরিস্তাগ্রন্থপাঠে জানা যায়, অম্বরপতি মানসিংহ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পরলোকগমন করেন; কিন্তু ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, খিলিজিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দুই বৎসর পরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মানসিংহের মৃত্যুর পর সম্রাট্ তাঁহার পুত্র রাও ভাওসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে অভিষেক করিয়া পাঁচহাজারী মনসবপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাও ভাও অত্যন্ত মদিরাসক্ত ছিলেন; চারি বৎসর মাত্র রাজ্যশাসনের পর ১৬২১ খৃষ্টাব্দে তিনি লীলাসংবরণ করেন।

তৎপরে মাহাসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও নিতান্ত পানাসক্ত ও অতিশয় লম্পট ছিলেন; এই কারণে তাঁহাকেও অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময়ে যোধপুরনৃপতিগণ সম্রাট্-সভায় প্রাধান্যলাভ করেন। জাঁহাগীর স্বীয় রাজপুত্রী ভার্য্যা যোধবাইয়ের প্ররোচনায় মানসিংহের ভ্রাতা জয়সিংহকে অম্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদ্দর্শনে সম্রাটের প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহাঁ ঈর্ষায় অধীরা হন।

জয়সিংহ মির্জারাজা নামে প্রথিত। রাজপুতানার সকলেই তাঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিত। তিনি মানসিংহের উপযুক্ত ভ্রাতা। ভাওসিংহ ও মাহাসিংহের সময়ে অম্বরের গৌরব কিছু মলিন হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জয়সিংহের গুণে তাহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেই উপকার স্মরণ করিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে ষট্‌সহস্রের সেনাপতিপদ প্রদান করেন। জয়সিংহের কৌশলেই মহারাষ্ট্রবীর শিবজী ধৃত হন। জয়সিংহ প্রতিশ্রুত ছিলেন, শিবজীকে নিরাপদে রাখিবেন; কিন্তু আরঙ্গজেবের কপটতায় তাঁহার সে প্রতিজ্ঞাপালনের ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হয়; তখন তিনি মহারাষ্ট্রবীরের পলায়নে সহায়তা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ সদাশয় লোকের গৌরব দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা-নিবন্ধন ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। জয়সিংহেরই কপটতায় সেই মহাবীর মোগলরাজপুত্রের সকল যত্ন ও উদ্যম বিফল হইয়াছিল। জয়সিংহের অধীনে দ্বাবিংশতি সহস্র

রাজপুত অশ্বারোহী এবং দ্বাবিংশতিজন প্রধান সামন্তনৃপতি ছিলেন। তিনি সেই সকল সামন্ত-রাজসহ দরবারে বসিতেন। সেই সময় তাঁহার দুই হস্তে দুইখানি কাচ থাকিত; তিনি তাহার একখানিকে দিল্লী ও দ্বিতীয়খানিকে সাতারা নাম দিয়া শেষোক্তখানিকে ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক সদর্পে বলিয়া উঠিতেন, "এই সাতারা রসাতলে গেল, আর দিল্লীর অদৃষ্টসূত্র এই আমার দক্ষিণ করে; আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকেও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপ করিতে পারি।" এইরূপ গর্ব্বিত-বাক্য ক্রমে ক্রমে আরঙ্গজেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। তদবধি তিনি জয়সিংহের প্রাণসংহারের উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সহজে অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে না পারিয়া পাষাণহৃদয় মোগল-সম্রাট্ এক জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। অম্বরপতির কনিষ্ঠপুত্রের নাম কিরাতসিংহ। আরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক পিতৃবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন; বলিলেন, "যদি তুমি জয়সিংহের প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হও, তোমাকে অম্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করি।" রাজপুতগণের ভূমিস্পৃহা কি ভয়ানক! নরাধম কিরাতসিংহ সেই পৈশাচিক কাণ্ড স্বহস্তে সাধন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। মহারাজ জয়সিংহ অহিফেন সেবন করিতেন। কুলাঙ্গার পুত্র সেই অহিফেনের সহিত বিষমিশ্রিত করিয়া দিয়া সেই পৈশাচিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিল। কিন্তু পাষণ্ড পিতৃহন্তাকে কপটী সম্রাট্ কামা নামক একটি জনপদমাত্র সমর্পণ করিলেন; মহারাজ জয়সিংহ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন, এ দিকে অম্বরের ভাগ্যাকাশও সুগভীর কালমেঘে সমাচ্ছন্ন হইল।

রামসিংহ মহারাজ জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র; পিতার মৃত্যুর পর তিনিই অম্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে সেনাপতিপদে বরিত হইয়া তিনি আসামীগণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রামসিংহের মৃত্যুর পর বিষণসিংহ অম্বরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অল্পদিন-মাত্র রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে ত্রিসহস্র মাত্র সেনা ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শোবে জয়সিংহের অভিষেক, সম্বর কর্তৃক অম্বর অপহরণ, বহুবিবাহজনিত অনিষ্টের বিবরণ, জয়পুর-প্রতিষ্ঠা, রাজোর ও দেউটিজয়, জয়সিংহের পানাসক্তি, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অভিলাষ, তাঁহার মৃত্যু, তদীয় পত্নীগণের সহমরণ।

১৭৫৫ সংবতে জয়সিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ইনি শোবে জয়সিংহ নামে প্রথিত; ইহার রাজ্যাভিষেকের ছয় বৎসর পরে সম্রাট্ আরঙ্গজেব লীলা-সংবরণ করেন। আরঙ্গজেবের পরলোকগমনের পর ভারতে সার্ব্বভৌম আধিপত্য লইয়া রাজপুত্রদিগের মধ্যে যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়, শোবে জয়সিংহ তাহাতে আজিমশাহের পক্ষে যোগদানপূর্ব্বক শাহ আলমের প্রতিকূলে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঢোলপুরক্ষেত্র সেই ভীমযুদ্ধের রঙ্গভূমি; সেই যুদ্ধে আজিম ও তদীয় পুত্র বিদারবক্তের পরাজয় হয়; শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম ধারণপূর্ব্বক সম্রাট্-পদে

অভিষিক্ত হন। রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াই বাহাদুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অম্বরের উপর পতিত হইল। অম্বর-পতি শোবে জয়সিংহ তাঁহার প্রতিকূলে আজিমের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, এখন বাহাদুর তাঁহার সেই কার্য্যের প্রতিশোধদানে অগ্রসর হইলেন এবং অম্বর আচ্ছিন্ন করিয়া একজন যবনের হস্তে তাহার শাসনভার প্রদান করিলেন। নবাভিষিক্ত শাসনকর্ত্তা একদল রাজকীয় সেনা লইয়া অম্বর অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু জয়সিংহ উন্মুক্ত তরবারিকরে সসৈন্যে স্বরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মোগলসেনাকে অম্বর হইতে বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর তিনি মারবারাধিপতি অজিতসিংহের সহিত মৈত্রীবন্ধনপূর্ব্বক পরস্পরের রক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন।

• মহারাজ জয়সিংহকে অনেকবার ভীষণ ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। বুন্দিরাজ্যের প্রতি জয়সিংহের প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। বুন্দিপতি বুধসিংহ ও তদীয় বীরপুত্র উমেদসিংহের প্রতি তিনি যার-পর-নাই অত্যাচার করিয়াছিলেন।

মহারাজ শোবে একজন প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাধর নামা একজন বঙ্গীয় স্থাপত্যবিশারদ মহাপুরুষের উপদেশানুসারে এই সুন্দর নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার রথ্যাসমূহের নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিদ্যাধর যে বঙ্গের কোন্ গ্রামে বাস করিতেন, কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম, দুঃখের বিষয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার কোন উপায় নাই। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; বিশেষতঃ জ্যোতিষ ও পুরাতত্ত্বে তাঁহার গভীর পারদর্শিতা ছিল। বিদ্যাধরেরই সাহায্যে শোবে জয়সিংহ জ্যোতিষগণনায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। সম্রাট্ মহম্মদশাহ তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ্যায় প্রীত হইয়া তদানীন্তন পঞ্জিকাসংশোধনের ভার তাঁহারই করে অর্পণ করিয়াছিলেন। গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও আকারনিরূপণ করিবার জন্য জয়সিংহ জয়পুর, দিল্লী, কাশী, উজ্জয়িনী ও মথুরায় এক একটি গ্রহদর্শন স্থাপনপূর্ব্বক তৎসমস্ত স্থানেই স্বকৃত যন্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রহদর্শন ও যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি অভ্রান্তরূপে গণনা করিতে পারিতেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতিসাধনার্থ জয়সিংহ দেশদেশান্তরে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মেনুমেলন নামে এক পর্ত্তুগীজ পাদরী ভারতবর্ষে আগমন করেন। পর্ত্তুগালে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি, পাদরীপ্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া জয়সিংহ সেই পাদরীর সহিত কতিপয় পণ্ডিতকে পর্ত্তুগাল-রাজ ইমানুয়েলের সভায় প্রেরণ করিলেন। এই ঘটনার পর ইমানুয়েল তত্রত্য একটি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার নাম সেভিয়ার ডিসিল্ভা। এই পাদরী ভারতে আসিয়া জগৎসিংহকে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ডি-লা-হায়ারের জ্যোতিরঙ্ক প্রদান করেন। সেই নূতন তালিকা লইয়া জগৎসিংহ জ্যোতিশ্চক্র সন্দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত পরিদর্শনের সহিত এই সমস্ত তালিকা মিলাইয়া দেখাতে এগুলিতে চন্দ্রের স্থিতিনির্দ্দেশ সম্বন্ধে অর্দ্ধ অক্ষাংশের প্রভেদ দৃষ্ট হইল। ইহা সাধারণ ভ্রম নহে। অন্যান্য গ্রহের গণনাবিষয়ে এরূপ গুরুতর ভ্রম দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণে প্রায় পনের পলের ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।" তিনি তুর্কিজ্যোতির্ব্বিদ্ উলুকবেগেরও আবিষ্কৃত যন্ত্রাবলীর ভ্রম দেখাইয়া ডি-লা-হায়ারের যন্ত্রসমূহকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, অম্বরপতির এরূপ গর্ব্ব করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। কারণ, তাঁহার আবিষ্কৃত জ্যোতিষ-যন্ত্রসমূহকে সকলেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যাহা হউক, অম্বররাজ শোবে জয়সিংহ যে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বীয় অভিজ্ঞতাবলে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক "জিরাজ

মহম্মদশাহী" নামে একখানি অঙ্কপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এই পুস্তক সম্রাট্ মহম্মদ শাহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থলিখিত নিয়ম অবলম্বনে আজিও রাজস্থানে পঞ্জিকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজীবন অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ ও ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে পতিত থাকাতে জয়সিংহ মনের সাধে শাস্ত্র অনুশীলন করিতে পারেন নাই। একদিকে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনজনিত প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লব, অন্যদিকে মহারাষ্ট্রীয় বিক্রমের তেজোময় অভ্যুত্থান; সুতরাং সে সময়ে ভারতবর্ষে নানা ভীষণ সংঘর্ষ সমুত্থিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ সংঘর্ষে পড়িয়া কত হিন্দুরাজ্য একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অম্বরপতি জয়সিংহ সেই সকল সংঘর্ষে জড়িত হইয়াও স্বীয় বুদ্ধিমত্তাবলে সুচারুরূপে স্বীয় রাজ্য দৃঢ়ীকরণ ও অপর অপর রাজ্যের উর্দ্ধে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার এই সমস্ত অদ্ভুত গুণাবলী অনুশীলনপূর্ব্বক দেখিলে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। মোগল-সাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতনদর্শনে অম্বরপতি মনে করিয়াছিলেন যে, সেই বিশাল-রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে অম্বররাজ্যকে দৃঢ় করিয়া লইবেন। তদীয় এ উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইলেও তিনি স্বীয় প্রভু মোগলসম্রাটের প্রতি কদাচ বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিতেন না। দুর্ব্বৃত্ত সৈয়দভ্রাতৃযুগলের কুটিল চক্রান্ত হইতে ফিরকসিয়রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র মোগলসম্রাটেরই কাপুরুষতাতে তাঁহার তৎসমস্ত উদ্যম বিফল হইয়াছিল।

সৈয়দদ্বয়ের সেই রাক্ষসিক উৎপীড়নসময়ে ফিরকসিয়র যখন কিছুতেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, তখন জয়সিংহ একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তিন বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্তভাবে জ্যোতিষ ও পুরাতত্ত্বের অনুশীলন করেন। তৎকালে মোগল-সাম্রাজ্যের ঘোর সংঘর্ষ মহাবেগে সমুত্থিত হইলেও তাঁহার অভিনিবেশ আলোড়িত করিতে পারে নাই। কিন্তু ১৭২১ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ মহম্মদ শাহের প্রতাপে সৈয়দযুগলের গর্ব্ব খর্ব্ব হইলে জয়সিংহ ক্রমান্বয়ে আগরা ও মালবে সম্রাটের প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হন। অগত্যা শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে কার্য্যস্থলে গমন করিতে হইল। অনেক কার্য্যেই জয়সিংহের উচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উদ্যমেই জঘন্য "মুণ্ডকর" রহিত হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রীয়বীর বাজিরাওকে মালবের সুবাদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাক্ষিণীদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিষণসিংহের দুই পুত্র ;—জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ। জয়সিংহের অভিষেকসময়ে বিজয়সিংহের মাতা স্বীয় পুত্রের প্রাণসংহারের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে আপন পিতৃগৃহ কীচিবার নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বহুল ধনরত্ন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এই সমস্ত রত্ন লইয়া রাজধানীতে গমন কর এবং সম্রাটের উজীর নবাব কামুরুদ্দীনকে উৎকোচ দিয়া তাঁহার অনুগ্রহলাভ করিতে যত্নবান্ হও। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে অম্বরের অধিপতি করিয়া দিতে পারেন।" মাতার আদেশে বিজয়সিংহ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সেই সকল ধন-রত্নাদির সাহায্যে উজীরের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। কামুরুদ্দীন প্রীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কি প্রার্থনা করেন?" বিজয়সিংহ প্রথমে বুদা নামক জনপদ প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা অম্বরপতি জয়সিংহের নিকট তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জননীর মনস্তুষ্টি হইল না, তিনি অম্বররাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

তাঁহার উপদেশানুসারে ক্রমে বিজয়সিংহ উজীরকে কহিলেন, "আমি অম্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে সম্রাট্‌কে পাঁচক্রোর টাকা নজর প্রদান করি এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হই।" নবাব কামুরুদ্দীন সম্রাট্‌সদনে এই কথা বিজ্ঞাপন করিলে সম্রাট্‌ সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, "ইহার প্রতিভূ কে? বিজয়সিংহ যে প্রতিজ্ঞাপালন করিবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?" উজীর কহিলেন, "তজ্জন্য আমি দায়ী,—আমিই বিজয়সিংহের প্রতিভূ।" তখন সম্রাট্‌ স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর বিজয়সিংহের জন্য অম্বরের সনন্দ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন সময় জয়সিংহের পাগড়ী-বদল ভাই খাঁদোয়ান খাঁ এই বিষয় অবগত হইয়া জয়পুরের রাজদূত কৃপারামের নিকট প্রকাশ করিলেন। কৃপারাম সেই মুহূর্ত্তে রাজা জয়সিংহকে সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্র প্রাপ্ত হইয়া জয়সিংহের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার আশা-ভরসা একেবারে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি সেই পত্রখানি স্বীয় পরম বিশ্বস্ত নাজীরের নিকট প্রদান করিলেন।

পুনঃপুনঃ অভিনিবেশসহকারে পত্রপাঠ করিয়া প্রশান্তস্বরে নাজীর কহিলেন, বড় সহজ কাণ্ড নহে; বলে, বিক্রমে বা ধনরত্ন হইতে ইহার প্রতীকার হইবে না। ইহাতে বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন। কৌশলবলে চক্রীকে বশীভূত করিয়া এই ষড়্‌যন্ত্র ধ্বংস করিতে হইবে।" নাজীরের উপদেশানুসারে রাজা জয়সিংহ আপনার প্রধান প্রধান সামন্তগণকে আহ্বান করিলেন। নাখাবাৎ-পতি মোহনসিংহ, ভাস্কোর খেন্বানীসর্দ্দার দীপসিংহ, শিবচরণ পোতা, জোরবারসিংহ, নারুকসর্দ্দার হিমৎসিংহ, ঝুলাইসর্দ্দার কুশলসিংহ, মোজাবাদের ভোজরাজ এবং মৌলার ফতেসিংহ এই সমস্ত প্রধান প্রধান সর্দ্দার রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন রাজা জয়সিংহ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত সঙ্কটের বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "আপনাদের সাহায্যেই আমি অম্বরের সিংহাসন লাভ করিয়াছি; এই সঙ্কটে আপনারা ভিন্ন আমার আর ভরসা নাই। বিজয়সিংহ বুসা পাইলেই প্রীত হন, কিন্তু নবাব কামুরুদ্দীন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অম্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইতেছেন।"

কুশাবহ-সর্দ্দারেরা আশ্বাসবচনে রাজাকে কহিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আমরা ইহার উপায় করিতেছি; কিন্তু কুমার বিজয়সিংহকে বুসা অর্পণ করিতে হইবে।" রাজা জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ একখানি সনন্দ প্রস্তুত করিয়া শপথসহকারে তাহা সর্দ্দারদিগের করে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি আপনাদিগের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিলাম, যাহা বিহিত হয়, আপনারা করুন।" সর্দ্দারগণ নিজ নিজ মন্ত্রীকে বিজয়সিংহের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে বুসাতে অভিষেক করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না, ভ্রাতার প্রতিজ্ঞায় তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, এ কথাও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন। তখন সর্দ্দারগণ প্রত্যুত্তরে পুনরায় জানাইলেন, "জয়সিংহ নিজ প্রতিজ্ঞাপালন না করিলে আমরা আপনাকে অম্বরের সিংহাসনে স্থাপন করিব।" তখন বিজয়সিংহ সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া সনন্দপত্র স্বীকার করিলেন এবং কামুরুদ্দীন-সমীপে সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু উজীর তাহাতে প্রীত হইলেন না। বিজয়সিংহ খাঁদোয়ান ও কৃপারামকে কহিলেন, "চলুন, আমার নূতন জায়গীর বুসা-জনপদে গমন করি।" সেই সময়ে অম্বরের সর্দ্দারগণ উভয় ভ্রাতার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন ইচ্ছা করিয়া বিজয়সিংহের অনুমোদনানুসারে একটি সভা স্থাপন করিলেন। জয়পুরের ছয় মাইল দক্ষিণপশ্চিমবর্ত্তী মঙ্গলৈর নগরে বিজয়সিংহ স্বীয় শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। এ দিকে রাজা জয়সিংহ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্দ্দারগণের সহিত সভা,

হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছেন, ইত্যবসরে নাজীর তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! রাজজননী দুঃখ করিতেছেন যে. তিনি কি লালজীদ্বয়ের সুখের মিলন দেখিয়া চক্ষু চরিতার্থ করিতে পাইবেন না?" জয়সিংহ স্বীয় সর্দ্দারদিগের মতামতের উপর নির্ভর করিলেন; সর্দ্দারেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

চতুরচূড়ামণি নাজীরের ছলনা কেহই বুঝিতে পারিল না। তিনি রাজজননীর সহচরীগণের উপযুক্ত তিন সহস্র শকট এবং তাঁহার জন্য এক প্রকাণ্ড মহাদোলা প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে গুপ্তভাবে ভট্টিসর্দ্দার উগ্রসেন এবং এক একখানি শকটে দুইটি করিয়া নির্ব্বাচিত সশস্ত্র যোধ রক্ষিত হইল। নাজীর স্বয়ং এবং তাঁহার প্রভু ব্যতীত আর কেহই সেই প্রতারণার বিষয় জানিতে পারিল না; সেই বৃহৎ শকটগুলি রাজধানীর বহির্ভাগে উপস্থিত হইল; তখনও কেহ জানিতে পারিল না। নাগরিকবৃন্দ রাজভ্রাতৃযুগলের সুখময় সম্মিলন হইবে শুনিয়া সানন্দে সেই সকল শকট-দর্শনার্থ রাজ-পথে উপস্থিত হইতে লাগিল।

জয়সিংহ মজলৈরে রাজশিবিরে উপস্থিত হইলেন। দুই ভ্রাতার পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। জয়-সিংহ ভ্রাতার করে বুসার দানপত্র প্রদানপূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমাতে আমাতে প্রভেদ নাই। তুমি অম্বরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে যদি অভিলাষ কর, আমি এই দণ্ডে তাহা দিয়া বুসার গিয়া বাস করি।" কপটবাক্যে মুগ্ধ হইয়া বিজয়সিংহ উত্তর করিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে, আমার সকল আশা পূর্ণ হইল।" এইরূপ আলাপ-সম্ভাষণের পর পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইতে উদ্যত হইতেছেন, ইত্যবসরে নাজীর আসিয়া কহিলেন, "রাজজননী বলিতেছেন, যদি সর্দ্দারেরা এ স্থান হইতে একবার স্থানান্তরিত হন, তাহা হইলে তিনি আসিয়া আপনাদের ভ্রাতৃমিলন দেখিয়া আনন্দলাভ করেন অথবা আপনারা রাজভবনে চলুন।" তখন রাজভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের হস্তধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অমনি জয়সিংহ আপন অসি নিষ্কোষিত করিয়া একটি ক্লীব ভৃত্যের করে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "ইহা এখানে কি কাজে আসিবে?" তদ্দর্শনে বিজয়-সিংহেও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণপূর্ব্বক স্বীয় অসি সেই খোজার করে প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমনি নাজীর কর্ত্তৃক দ্বার রুদ্ধ হইল। কোথায় রাজজননী, কোথায়ই বা তাঁহার সহচরীবৃন্দ! দুর্দ্দান্ত ভট্টিবীর আসিয়া কঠোরহস্তে বিজয়সিংহকে ধারণ করিল। উগ্রসেন বিজয়সিংহের হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে মহাদোলায় স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ অম্বরনগরে প্রত্যাগত হইলেন।

বন্দী দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ। অতঃপর জয়সিংহ আপন সর্দ্দারগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। তখন সর্দ্দারেরা এই পাশবকাণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া যার পর-নাই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। নীরবে তাঁহারা রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। নগরের বহির্ভাগে ছয় সহস্র রাজকীয় অশ্বারোহী বিজয়সিংহের প্রতীক্ষা করিতেছিল, কামরুদ্দীনের আদেশে তাহারা বিজয়ের সহিত আগমন করিয়াছিল। রাজপুত্রের বিলম্বদর্শনে সেই সেনাদলের সেনানী রাজা জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়সিংহের কি হইল?" রাজা উত্তর করিলেন, "তোমাদের তাহা জানিবার আবশ্যক কি? তোমরা এখান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা তোমাদের অশ্বগুলি আমি গ্রহণ করিব।" অগত্যা তাহারা প্রস্থান করিল। এই প্রকারে রাজপুত্র বিজয়সিংহ বন্দী হইলেন। তদবধি তাঁহার আর কোন সন্ধানই হইল না।

জয়সিংহ অম্বরের সীমা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অম্বর, দেওসা ও বুসাও, এই

তিনটি পরগণা লইয়া অম্বর সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পশ্চিমভাগস্থ জনপদসমূহ অম্বরের শাসন হইতে আচ্ছিন্ন হইয়া রাজকীয়ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দেউটি জনপদ অধিকার করিয়া জয়সিংহ রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। এই দেউটি জনপদের প্রধান নগরের নাম রাজোর। ইহা অতি প্রাচীন নগর। বীরগুজর বংশীয় এক রাজপুত তত্রত্য শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। এই বীর গুজরগণ অত্যন্ত সাহসী ও বীর্য্যবান্। যবনদিগের সহিত বৈবাহিকবন্ধনের প্রতি উৎকট ঘৃণা ও বিদ্বেষবশতঃ ইহারা আধুনিক রাজপুতবৃন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আপনাদিগের কন্যা ও ভগিনীগণকে মোগল-হস্তে প্রদানপূর্ব্বক কচ্ছাবহগণ ধনসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজোরের বীর্য্যবান্ বীরগুজরগণ সেরূপ জঘন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনকে ঘৃণা করিতেন। আপনাদিগের সম্মান-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা প্রফুল্লবদনে জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। বীরগুজরগণ মোগলসাম্রাজ্যের অধীন; সুতরাং শেষে জয়সিংহ যখন সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, বীরগুজর তখন স্বীয় সামন্তসেনা লইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনুপসহর নামক নগরে তাঁহার আজ্ঞাপালনে ব্যাপৃত। দেউটিরাজের অনুপস্থিতিসময়ে তৎপ্রদেশের শাসনদণ্ড তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পিত ছিল। একদিন এই কনিষ্ঠ বীরগুজর বরাহশীকারের উপযুক্ত আয়োজন করিয়া আহারের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিলে তদীয় ভ্রাতৃজায়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, "তোমার ব্যগ্রতা দেখিলে অন্যলোকে বিবেচনা করিবে যেন, তুমি জয়সিংহের সহিত সংগ্রামার্থ এত ব্যস্ত হইয়াছ।" এই কথাকয়টি রাজপুত্রের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইল; একটি অতীত ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইয়া উঠিল। মারবার হইতে বহির্গত হইয়াই কুশাবহকুল জনস্থানভূভাগে সর্ব্বপ্রথম দেশবা জনপদ অধিকার করেন; সেই দেশবা বীরগুজরবংশের অধিকারে ছিল। আজি ভ্রাতৃজায়ার পরিহাসবাক্যে সেই অতীত কথা তাঁহার স্মৃতিপটে সমুদিত হইল। প্রশান্ত-গম্ভীরস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "আর্য্যে! ঠাকুরজীর দিব্য, এই কার্য্যসাধন করিয়া আমি আবার আপনার করে খাদ্য গ্রহণ করিব।" তৎক্ষণাৎ তিনি দশজনমাত্র অশ্বারোহী সেনাসহ রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন এবং অম্বররাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাহার মৃন্ময় প্রাকারতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি উদ্দেশ্য-সাধনের অবসর পাইলেন না। ক্রমে তাঁহার খাদ্যাদির অভাব হইল, অশ্বগুলিকে তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, অনুচরগণও দেশে প্রেরিত হইল। তথাপি সুযোগ আসিল না; তিনি প্রতিজ্ঞাও ত্যাগ করিতে পারিলেন না; ক্রমে এত অভাব হইল যে, তিনি সমস্ত বসনভূষণ ও অস্ত্রাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন, একটিমাত্র ভল্ল তাঁহার নিকটে রহিল। অতঃপর অনাহারে তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে হইল। তিন দিবস এই ভাবে গেল। তখন তিনি উষ্ণীষের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করিলেন; তাহাতে একবারমাত্র আহারের সংস্থান হইল। সেই দিন শেষে জয়সিংহ দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোরা নামক গিরিবর্ত্ম দিয়া আপন প্রমোদবাটিকায় সমারোহণে বহির্গত হইলেন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, ইত্যবসরে একটি ভল্ল তাঁহার শিবিকার এক প্রান্তে বিদ্ধ হইল। তখনই শত সৈনিক উন্মুক্ত অসিহস্তে সেই রাজহন্তার প্রতি প্রধাবিত হইল; কিন্তু রাজা চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উহাকে বধ করিও না, বন্দী করিয়া লইয়া চল।"

বীরগুজর বন্দিভাবে আনীত হইলে জয়সিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? আমার প্রতি ভল্লনিক্ষেপেরই বা কারণ কি?" রাজপুত-যুবক সদর্পে উত্তর করিলেন, "আমি দেউটি

বীরগুজর; ভ্রাতৃপত্নীর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, আপনার প্রাণবধ করিব; এখন আমাকে সংহার করুন, নচেৎ ছাড়িয়া দিউন। যদি চারিদিন অনাহারে না থাকিতাম, তাহা হইলে আমার অস্ত্রক্ষেপ কদাচ বিফল হইত না।" জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধনমোচনপূর্ব্বক ও সম্মানসূচক সজ্জা দিয়া পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী সেনাসহ তাঁহাকে নিরাপদে রাজোরে প্রেরণ করিলেন। স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া বীরগুজর পত্নীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে বীরগুজর-পত্নীর অত্যন্ত ভয় হইল; তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি কি করিলে? ভুজঙ্গকে তুমি পদতাড়িত করিয়াছ। হায়! এত দিনে রাজোররাজ্য ছারখার হইবে। তুমি জান যে, জয়সিংহ দেউটি জয় করিবার অভিলাষে এতদিন কেবল ছল খুঁজিতেছিলেন।" অতঃপর বৃদ্ধগণের পরামর্শ অনুসারে বীরগুজরকুলের নারী ও বালকবৃন্দ অনুপসহরে রাজার নিকট উপস্থিত হইল এবং দেউটি ও রাজোরের দুর্গ আশঙ্কিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারার্থ দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিল।

সেই ঘটনার পর তিন দিন অতীত হইল। জয়সিংহ একদিন সামন্তগণের নিকট উদ্‌ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া দেউটির বিরুদ্ধে বীড়া প্রদান করিলেন কিন্তু চমূপতি সর্দ্দার মোহনসিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "মহারাজ, সহজে বীরগুজর পরাজয় করা কঠিন।" চমূপতি অম্বরের প্রধান সর্দ্দার; সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে কেহই সাহসী হইলেন না; কেহই বীড়া গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর একমাস অতীত হইল। রাজা জয়সিংহ পুনরায় সর্দ্দারগণের নিকট দেউটির বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন; কিন্তু সেবারেও কেহ বীড়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না অবশেষে বনবীর পোতা ফতেসিংহ সদর্পে হস্ত প্রসারণ করিয়া বীড়া গ্রহণ করিলেন। ফতেসিংহের অধীনে একশত পঞ্চাশজন সামন্ত ছিলেন; তদ্ভিন্ন পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যও ছিল। এই বিশালবাহিনী লইয়া ফতেসিংহ দেউটির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই সময় বীরগুজর-রাজপুত্র রাজোর পরিত্যাগপূর্ব্বক গাঙ্গোর উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফতেসিংহ তাহা বিদিত হইয়া সেই দিকেই সসৈন্যে অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার অগ্রে তৎসমীপে কয়েকটি দূত পাঠাইয়া বলিলেন, "বনবীর ফতেসিংহ আপনাকে কুশল-সম্ভাষণ করিয়া আপনার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।" উগ্রপ্রকৃতি বীরগুজর রাজধর্ম্মের ব্যভিচার করিয়া সেই দূতবৃন্দের শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু আশু তাঁহাকে এ দুষ্কর্ম্মের শাস্তি ভোগ করিতে হইল। কুশাবহবীর ফতেসিংহ তৎকালে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সসৈন্যে বধ করিলেন। আশু তথা হইতে জয়পুরসেনা রাজোর অবরোধ করিল। রাজোরের বীরগুজররাণী প্রধান কচ্ছাবহ সর্দ্দার মোহনসিংহের ভগিনী। যখন ফতেসিংহ কর্ত্তৃক রাজোর অবরুদ্ধ হয়, তখন তিনি অরিষ্টগৃহে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। বিজেতা ফতেসিংহকে সম্বোধনপূর্ব্বক সদ্যপ্রসূতি কহিলেন "ভাই! আমার পুত্রকে রক্ষা কর।" পরক্ষণেই তাঁহার স্মরণ হইল, একমাত্র তাঁহারই বিদ্রূপবাক্যে এই সকল অনর্থ ঘটিয়াছে। অমনি বীরগুজরপত্নী বলিয়া উঠিলেন, "বিবাদ বাধাইবার জন্য এ জীবন কেন বহন করিব?" সেই মুহূর্ত্তে একখানি ছুরিকা লইয়া তিনি স্বহস্তে আপন বক্ষ বিদার্ণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিলেন।

অনন্তর বিজয়ী কুশাবহবীরবৃন্দ বিজিত বীরগুজরদিগের ছিন্নমুণ্ড রুমালে বাঁধিয়া প্রফুল্লবদনে জয়পুরে প্রত্যাগমন করিল। জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই দাম্ভিক প্রগল্‌ভ বীরগুজর যুবক কোথায়? যে আমার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার মস্তক কোথায়?" অচিরে রাজোররাজ-পুত্রের শোণিতলিপ্ত ছিন্নমুণ্ড রাজার করে প্রদত্ত হইল। কুশাবহ-সর্দ্দার মোহনসিংহ স্বীয় কুটুম্বের

ছিন্নমস্তক দর্শনে শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না, অবিরল অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা জয়সিংহ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "এরূপ শোকপ্রকাশ বিদ্রোহিতার লক্ষণ। যখন আমার প্রাণবপার্থ ভল্ল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন ত তোমার চক্ষে বিন্দুমাত্র জল দৃষ্ট হয় নাই।" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া চমূসর্দ্দার মোহনসিংহের ভূমিসম্পত্তি হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধুন্দর হইতে বিতাড়িত করিলেন। অগত্যা সর্দ্দার উদয়পুরের রাণার নিকট গিয়া শরণগ্রহণ করিলেন।

জয়সিংহ অত্যন্ত মদিরাসক্ত ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুশাবহ-নৃপতিগণ মানসিংহ-প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ তদপেক্ষাও মনোহর। ১৭৮৪ সংবতে জয়সিংহ কর্ত্তৃক জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। শোচনীয় শিশুহত্যা ও সহমরণ প্রথা-নিবারণার্থ জয়সিংহ সমগ্র রাজবারা-প্রদেশে বিবাহের একটি নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

জয়সিংহের প্রগল্ভ ব্যবহারও ইতিবৃত্তে উল্লেখযোগ্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তিনি এক সময় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তিনি একটি মনোহর যজ্ঞশালা করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞশালার স্তম্ভ ও ভিত্তি রৌপ্যপাত্রে বিমণ্ডিত। দুঃখের বিষয়, জয়সিংহের অযোগ্য পুত্র সেই সকল অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক যজ্ঞবাটিকার সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়াছেন। মহারাজ জয়সিংহ এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দেশদেশান্তরে লোক প্রেরণপূর্ব্বক বিপুল অর্থ ও শ্রমের ব্যয়ে নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ অবশেষে দ্বারে দ্বারে বিক্রীত হয়। তাঁহাদের অযোগ্য বংশধর জগৎসিংহ তৎসমস্তের অর্দ্ধাংশ একটা বেশ্যাকে প্রদান করেন।

চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষ রাজ্যশাসনের পর ১৭৯৯ সংবতে জয়সিংহের মৃত্যু হয়। তিনটি মহিষী ও অনেকগুলি উপপত্নী তাঁহার সহগমন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

——:*:-

রাজপুত-নৃপতিত্রয়ের একতা, অম্বর দৃঢ়ীকরণ, ঈশ্বরসিংহের অভিষেক, বহুবিবাহজনিত অন্তর্বিপ্লব, মধুসিংহ, জাটদিগের রাজা মাছেরির অভ্যুত্থান, পৃথ্বীসিংহ, প্রতাপসিংহ, ফিরোজের মৃত্যু, টঙ্গায় প্রতাপের জয়লাভ, তাঁহার সঙ্কট, জগৎসিংহ, রসকর্পূর, মোহনসিংহ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৭০১ সংবতে মিবার, মারবার ও অম্বর স্ব স্ব উপাস্যদেবতার শপথ করিয়া একতাসূত্রে বদ্ধ হন। আত্মসমর্থনই সেই একতাবন্ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সুযোগে রাঠোর ও কুশাবহ-নরপতিগণ স্ব স্ব রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শিখাবতী অম্বরের অধীনে করদরাজ্যরূপে পরিগণিত। এই সময়ে জাটগণ মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া অম্বরের শ্রীবৃদ্ধির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

শেষে জয়সিংহ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি অকর্ম্মণ্য কাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত। মধুসিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মধুসিংহের গুণে অম্বরের প্রজাপুঞ্জ তৎপ্রতি অনুরাগী ছিল। শিশোদীয়-নৃপতি রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ মধুসিংহের মাতুল। রাণার নিকট হইতে মধুসিংহ রাজপুরভালপুর নামক সমৃদ্ধ জনপদ জায়গীর প্রাপ্ত হন। ঐ জনপদ মিবারের অন্তর্ভূত। তদ্ব্যতীত মধুসিংহ পিতার নিকট টঙ্ক, রামপুর, ফাগি ও মালপুর নামক চারিটি পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, মধুসিংহ জীবনে এ সকল সম্পত্তি ভোগ করিতে পান নাই। অম্বরসিংহাসনে আত্মপদ-দৃঢ়ীকরণার্থ তিনি ইহার মধ্যেই টঙ্ক, রামপুর ও ভালপুর এবং আট লক্ষ টাকা মহারাষ্ট্রীয় হুলকারের হস্তে উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মাতুলের সাহায্যেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। রায় জগৎসিংহ ঈশ্বরসিংহকে পদচ্যুত করিয়া অম্বরসিংহাসনে স্বীয় ভাগিনেয়কে স্থাপন করিবার জন্য সসৈন্যে অম্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সেবার কৃতকার্য্য হইলেন না তদীয় সৈন্যগণ ঈশ্বরসিংহের করে পরাভূত হইয়া ছত্রভঙ্গে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল. রাণা অবশেষে মুলহররাও হুলকারকে চৌষট্টি লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হতভাগ্য ঈশ্বরসিংহ বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। অতঃপর মধুসিংহ অম্বরসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু জাটপতি জবহীরসিংহের শত্রুতায় তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। শেষে অকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

জাটপতি জবহীরসিংহ মধুসিংহের নিকট কামুনা নামক পরগণা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; অম্বরপতি তাহা প্রদানে অসম্মত হওয়াতে জাটরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সদর্পে সদলে অম্বররাজ্যের মধ্যভাগ দিয়া পুষ্করতীর্থে গমন করেন। অম্বরপতি তখন উৎকটরোগে শয্যাগত ছিলেন। হরশাই ও গুরুশাই নামক দুইটি ভ্রাতা তখন রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। মধুসিংহ হরশাই ও গুরুশাইকে বলিলেন, "আপনারা জবহীরকে পত্র লিখুন, যেন তিনি সেরূপ সদম্ভে আমার রাজ্যে আর প্রবিষ্ট না হন; এ দিকে সামন্তগণও সসৈন্যে প্রস্তুত থাকুন। জাটরাজ অম্বরের সীমায় পদার্পণ করিলে তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে" মধুসিংহের পত্র গ্রাহ্য না করিয়া জাটপতি পূর্ব্ববৎ সদর্পে অম্বরের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। এ দিকে অম্বরের সর্দ্দারেরা তাঁহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আশু একটি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। জাটনৃপতি সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধের চারিদিন পরেই মধুসিংহ লীলাসংবরণ করিলেন। সর্ব্বসমেত তিনি সপ্তদশ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

মধুসিংহের দুই পুত্র; তন্মধ্যে পৃথ্বীসিংহ শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া বিমাতার হস্তে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; চন্দাবৎকুলে তাঁহার বিমাতার জন্ম। তাঁহার চরিত্র অতি ঘৃণিত। নিজ কুলসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া ফিরোজনামক এক মুসলমান মাহুতের প্রেমে তিনি আসক্ত হইয়াছিলেন। এই জঘন্য আচরণদর্শনে অম্বরের সর্দ্দারবৃন্দ যার পর নাই বিরক্ত হইয়া রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব জায়গীরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুকালে পৃথ্বীসিংহ অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন; সুতরাং সেই দুরাচারিণী ও তাহার উপপতি দ্বারাই রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান হইত। সর্দ্দারদিগকে সভা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সেই দুঃশীলা রাজজননী কতকগুলি বেতনভোগী সৈন্যনিয়োগপূর্ব্বক অম্বরজীকে তাহাদের অধিনায়কপদে বরণ করিলেন। এই সময়ে আকুতরাম প্রধান মন্ত্রী এবং খোসওয়ালিরাম দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ফিলবানের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল না।

এইরূপে নয় বর্ষ অতীত হইল। পৃথ্বীসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দুঃশীলা বিমাতার জন্য স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হওয়াতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। অনেকের অনুমান, বিমাতৃপ্রদত্ত বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পৃথ্বীসিংহের দুই বিবাহ,—একটি বিকানীরে, দ্বিতীয় কিষণগড়ে। কিষণগড়ের রাজকুমারীর গর্ভেই মানসিংহের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর মানসিংহ মাতুলগৃহে প্রেরিত হইলেন; কিন্তু সে স্থানও নিরাপদ নহে বিবেচনায় গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়ার শিবিরে রক্ষিত হইলেন।

পৃথ্বীসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা প্রতাপসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তখন খোসওয়ালিরাম রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি এখন বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। খোসওয়ালিরামের হস্তে ফিরোজ পরাস্ত হইয়াছিল।

অম্বরের অন্তর্গত মাছেরি জনপদ তখন প্রতাপসিংহনামা এক নারুক-রাজপুতের অধীনে ছিল। কোন কারণে মহারাজ মধুসিংহ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। জাটরাজ জবহীরসিংহের সহিত যে দিন অম্বরপতির যুদ্ধ ঘটে, সেই দিন প্রতাপসিংহ সগণে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পূর্ব্বস্বামীর সহায়তা করেন। মধুসিংহ তৎপ্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার মাছেরি জনপদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রতাপসিংহ খোসওয়ালিরামের পূর্ব্বস্বামী। খোসওয়ালিরাম দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও পূর্ব্ব-প্রভুকে ভুলিতে পারেন নাই। মাছেরি-সর্দ্দার স্বীয় জায়গীর পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও খোসওয়ালিরাম তাঁহাকে আরও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আগরা নগরে জাটগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সম্রাটের প্রধান সেনাপতি নাজিফ খাঁ মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে সেই বিদ্রোহিগণকে তথা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হন।

নিবুলসিংহ সেই সময় জাটগণের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভরতপুরে অবস্থিতি করিতেন। মোগল-সেনানী প্রথম উদ্যমেই সফলকাম হইয়া ভরতপুরে আপতিত হন। রাজা খোসওয়ালিরাম মাছেরি-সর্দ্দারকে কহিলেন, "আপনি নাজিফ খাঁকে সাহায্য করিলে আপনার মঙ্গললাভের সম্ভব।" বুদ্ধিমান্ বন্ধুর পরামর্শানুসারে প্রতাপসিংহ সদলে মোগল-সেনাপতির সহায়তা করিলেন। ইহাতে নাজিফ খাঁ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাও-রাজা উপাধি দিলেন; এতদ্ব্যতীত তিনি মোগলের অধীনে মাছেরির সনন্দও প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারেই অম্বর হইতে মাছেরি পৃথক্ হইয়া পড়িল। খোসওয়ালিরাম তখন বুঝিলেন যে, এইবার প্রতাপসিংহের সেনাদলের সহায়তায় তিনি গূঢ়ভাবে ফিরোজকে পরাভূত করিতে পারিবেন। মোগল-সেনানীকে ভরতপুরের যুদ্ধে সহায়তা করিবার ছলে তিনি অম্বরের সৈন্যসামন্তসহ নাজিফ খাঁর নিকট গমন করিতে চাহিলেন; তাহাতে চন্দাবতনী সম্মত হইয়া স্বীয় প্রেমপাত্র ফিরোজকে সেই সকল সেনার সেনানীপদে বরণ করিলেন। অনন্তর কুশাবহ-সেনা রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হইল। মাছেরিপতি রাও-রাজা প্রতাপসিংহ ভাবিয়াছিলেন যে, ফিরোজকে প্রকাশ্য বলের সাহায্যে বধ করিবেন, কিন্তু এখন সে উপায় ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া তিনি খোসওয়ালিরামের প্ররোচনানুসারে বিষপ্রয়োগে দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিলেন। মন্দভাগিনী চন্দাবতনী অল্পদিনের মধ্যেই প্রেমপাত্রের অনুগামিনী হইলেন। রাজা প্রতাপ তখন অল্পবয়স্ক, স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য অনুশীলন করিতে তখন তিনি সক্ষম নহেন; সুতরাং রাও-রাজা প্রতাপসিংহ ও রাজা খোসওয়ালিরাম উভয়ে একত্রে অম্বর শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েই দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী; সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই পরস্পরের বিবাদ বাধিল।

খোসওয়ালিরাম স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিবার জন্য মোগল-সেনানী হামদা খাঁর আনুকূল্যপ্রার্থী হইলেন। সেই সময় হইতে অম্বররাজ্যে যে অশান্তির উদয় হইল, আশু তাহার উপশম হইল না। প্রতাপসিংহ বালক, সুতরাং কিরূপে তিনি সেই অশান্তি নিবারণ করিবেন? এ দিকে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়গণ দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

কালস্রোত অবিরাম চলিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। রাজ্যের অশান্তি দূর করাই তাঁহার প্রধান সংকল্প হইল। দুর্জ্জয় মাধাজী সিন্ধিয়া তখন মহারাষ্ট্রীয়ের অধিনায়ক। মহারাষ্ট্রীয়েরাই অম্বরের প্রচণ্ড বৈরী। সমস্ত রাজপুত-সমিতির সাহায্য ভিন্ন তাদৃশ প্রবলশত্রুর দমন অসম্ভব, এই বিবেচনায় রাজবারার প্রধান নৃপতিত্রয় একতাসূত্রে অবরুদ্ধ হইলেন।

অচিরে একটি যুদ্ধের আয়োজন হইল। টঙ্গা নামক ক্ষেত্রে সমবেত রাজপুত-সেনাদল মহারাষ্ট্রীয়গণের সম্মুখীন হইল। প্রসিদ্ধ ফরাসীবীর দী-বইন সিন্ধিয়ার সেনাদলের অধিনায়কত্বে নিয়োজিত হইলেন। মোগলসেনানী ইস্‌মায়েল বেগ ও হামদানী, ইঁহারা উভয়ে রাজপুতের পক্ষে যোগদান করিলেন। রাঠোররাজ বিজয়সিংহের বিশালবাহিনী রিয়াপতির হস্তে অর্পিত হইল. টঙ্গাক্ষেত্রে রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়ের তুমুলযুদ্ধ সংঘটিত হইল। ফরাসীবীর দী-বইন পরাভূত হইলেন। সিন্ধিয়া মথুরানগরে পলায়ন করিলেন। রাজা প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক অম্বর হইতে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় বিতাড়িত হইল, কিন্তু প্রতাপের এ জয়গৌরব অধিকদিন থাকিল না। পত্তনযুদ্ধে তাহারই অসদাচরণে রাঠোরগণ মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট পরাভূত হইলে টকাজী হুলকার জয়পুর আক্রমণ করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে সেই কাণ্ড ঘটে। প্রতাপসিংহ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক বার্ষিক পণদানে বাধ্য হইলেন।

সর্ব্বসমেত পঞ্চবিংশতিবৎসর রাজ্যশাসনের পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপসিংহ লীলাসংবরণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ বীর ও সাহসিক পুরুষ ছিলেন। টঙ্গা-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি চব্বিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

অতঃপর জগৎসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। সপ্তদশবর্ষ তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কাপুরুষ মূর্খ বিলাসী রাজা অতি বিরল। তাঁহার অধিকারকালে অম্বরের গৌরবগরিমা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নিকৃষ্ট বারনারীগণের সহবাসেই তিনি দিনপাত করিতেন। রাসকর্পূরনাম্নী একটি বারাঙ্গনা তাঁহার প্রিয়তমা হইয়াছিল. পত্নীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি তাহারই নিকট দিনযামিনী যাপন করিতেন। সেই যবনী-বারাঙ্গনার নামে অম্বররাজ্যে মুদ্রা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। এক সময়ে রাজা সর্দ্দারগণের প্রতি এই আদেশ প্রদান করেন যে, তাঁহার বিবাহিতা মহিষীগণ যেরূপ সম্মানপ্রাপ্ত হন, রাসকর্পূরের প্রতিও সকলকে সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহাতে সর্দ্দারগণ একান্ত উত্যক্ত হইয়া জগৎসিংহকে পদচ্যুত করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজার এক কপটবন্ধু তাঁহাকে গোপনে বলিল, "রাসকর্পূর বিশ্বাসঘাতিনী, সে অন্য একজনের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে।" এই মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজা একান্ত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন। তিনি সেই দুশ্চারিণী বারাঙ্গনার সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক নাহরগড়ের কারাগারে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর জগৎসিংহ প্রাণত্যাগ করেন।

জগৎসিংহ নিঃসন্তান। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে হইতেই নপুংসক মোহনলালের হস্তে রাজকার্য্য-পরিচালনের ভার সমর্পিত ছিল। সেই মোহন নরবাররাজকুলের একটি শিশুকুমারকে পূর্ব্বাবধে

স্থাপনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মৃতরাজার মুখাগ্নি সম্পাদন করিলেন। রাজকুলপুরোহিত, ধাইভাই এবং দিগগি জনপদের সর্দ্দার মেঘসিংহ, এই তিন ব্যক্তির অনুমোদনে তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজা জগৎ-সিংহের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ-সম্পাদনের পর ঐ কয় ব্যক্তির অনুমোদনে মোহন সেই শিশু রাজ-কুমারকে রাজা বলিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক দ্বিতীয় মানসিংহ আখ্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু জগৎসিংহের বিধবা মহিষী সেই শিশুকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। জগৎসিংহের ভট্টিণী ভার্য্যা তখন গর্ভবতী ছিলেন। যখন এই কথা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল, তখন রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা সমস্বরে বলিলেন, "রাণীর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিলে তিনিই অম্বরের রাজাসনে অধিরূঢ় হই-বেন, অপর কাহাকেও আমরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।"

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের পঞ্চবিংশতিদিবসে প্রাতে ভট্টিণী রাণী একটি নবকুমার প্রসব করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে শিশু মানসিংহের ভাগ্যাকাশ কালমেঘে আচ্ছন্ন হইল। সেই দিন তিনি সুদূর নরবাররাজ্যে প্রেরিত হইলেন। এইখানেই আমরা রাজস্থান ইতিবৃত্তের উপসংহার করিলাম। ভগ-বানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, রাজবারার রাজপুতরাজগণ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নিজ নিজ সিংহাসন সমুজ্জ্বল ও পবিত্র বংশের গৌরব-গরিমা পরিবর্দ্ধিত করুন্।

পরিশিষ্ট

রাজপুতজাতির সামাজিক অবস্থা

রাজপুতানা স্বাধীনতার লীলানিকেতন, বীরত্ব ও মহত্বের সাধনক্ষেত্র, হিন্দু-গৌরবের আদর্শস্থল। বীরজননী রাজপুতানার প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস যথাসাধ্য বর্ণিত হইল। যে গ্রন্থে বাপ্পা রাওয়ের বীরত্ব, সমরসিংহের সমর-কৌশল, সংগ্রামসিংহের অতুলনীয় নির্ভীকতা, প্রতাপসিংহের জলন্ত অপ্রতিম স্বদেশানুরাগ ও স্বার্থত্যাগ এবং রাজসিংহের তেজস্বিতা ও রণনৈপুণ্য যথাক্রমে বিবৃত হইল, সেই গ্রন্থেই সেই মহাপুরুষগণের বংশধরগণের ভীরুতা, কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা, অবশেষে বীরশূন্য রাজপুতজাতির শোচনীয় অধঃপতন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইল। যে রাজপুতগণ বীরতা, সভ্যতা, তেজস্বিতা ও মহানুভাবুকতায় একদা সভ্য-জগতের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, যাঁহাদের বীর্য্যবহ্নি সুদূর হিন্দুকেশ ভেদ করিয়া জলন্তস্রোতে পৌরাণিক শাকদ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, যাঁহাদের একটিমাত্র বংশধরের অলৌকিক বীরত্বে প্রবল-প্রতাপান্বিত মোগল-সম্রাট্ আকবরের প্রচণ্ড দল প্রতিহত হইয়াছিল, আজি তাঁহাদের বংশধরগণ সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দীনহীনভাবে কালযাপন করিতেছেন। যে জলন্ত বহ্নিকণা ইঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি লোমকূপ হইতে বিস্ফুরিত হইত, আজি তাহা দুর্ভাগ্যরূপ কঠোর শৈত্য-সংস্পর্শে নির্ব্বাণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর সে তেজ নাই, সে দীপ্তি নাই,—সে দিগ্দাহী উত্তাপ নাই। সকলই নিবিয়া গিয়াছে; সমস্তই শীতল হইয়া পড়িয়াছে,—জড়তা,—নিস্তব্ধতা, নিস্পন্দতা রাজস্থানের সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। রাজস্থানের আর উঠিবার শক্তি নাই!—শক্তির অজেয় দুর্গস্বরূপ রাজবারা আজি শক্তিহীন।

রাজপুতজাতি স্বভাবতঃ তেজস্বী। তাঁহাদের হৃদয় ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বীরোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত ছিল। ঐ সকল গুণ কর্তৃক এক সময়ে তাঁহাদের বীর্য্যবত্তা ও তেজস্বিতা নিয়মিত হইত বলিয়া তাঁহারা কঠোরতর অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রতিহিংসা লইবার জন্য ধীরভাবে উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রচণ্ড বীরত্বের সাহায্যে তাঁহারা কখনও সমগ্র শত্রুকুলকে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কখনও বা নিরুপায় ও নিরবলম্বন হইয়া ধীরভাবে অপ্রতিবিধেয় কঠোর অদৃষ্টের দারুণ অনুশাসন বহন করিয়াছেন। তাঁহাদের ভীষণ বিক্রমপ্রভাবে কত শত মুসলমানরাজ্য বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া পরমাণুতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—কত মুসলমানবংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হয় নাই। সেই সকল বিধ্বস্ত ও উৎসাদিত জনস্থান-ভূভাগে আবার নব নব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আবার অভিনব রাজবংশ সেই সকল বিলুপ্ত বংশনিচয়ের শূন্যস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহারা সকলেই সমান নিষ্ঠুর;—সমান হিন্দুবিদ্বেষী—সমান অত্যাচারী! যে পাশব-প্রবৃত্তি দ্বারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বজাতিগণ পরিচালিত হইত, তাহাতে তাহাদিগেরও হৃদয় নিয়ন্ত্রিত; সেই পাশব-প্রবৃত্তির কুটিল চক্ষে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায়ের ভেদাভেদ ছিল না। তাহাদের স্বাভাবিকী দুর্নীতি দ্বারা এক সময়ে নরহত্যা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল;—পরস্বাপহরণ ও পরদ্রব্যলুণ্ঠন ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল;—সর্ব্বোৎসাদন অবশ্য-পালনীয় পবিত্র প্রত্যাদেশরূপে পরিপালিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সকল ভীষণ দুর্বিবহ অত্যাচার সহ্য করিয়াও আর্য্যবীর রাজপুত্রগণ আপনাদের

তেজোময় জাতীয়জীবন বীজভাবেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তত অত্যাচার, তত উপদ্রব—তত দুঃসহ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সেই প্রশস্ত জাতীয়-জীবন কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। ইহাই রাজপুতচরিত্রের অনুপম বৈচিত্র্য।

আর্য্যবীর রাজপুতগণের উক্ত বৈচিত্র্যের বিষয় চিন্তা করিয়া মহাত্মা টড্ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি প্রাণ ভরিয়া উচ্চকণ্ঠে রাজপুতের মহিমা সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন,—পৃথিবীর কোন্ জাতি বীরত্ব, মহত্ত্ব, তেজস্বিতা ও সহিষ্ণুতায় রাজপুতকুলের সমকক্ষ হইতে পারে? শতাব্দীর পর শতাব্দীর কঠোর দাসত্ব ও পরপীড়ন সহ্য করিয়াও জগতের আর কোন্ জাতি রাজপুতকুলের ন্যায় আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের সভ্যতা, তেজস্বিতা ও আচার-ব্যবহার সমভাবে সংরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? আর্য্যবীর রাজপুতের প্রকৃতি প্রচণ্ড ও নির্ভীক বটে; তথাপি তাঁহারা প্রয়োজনমত সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক অতি দুঃসহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া প্রতিহিংসা লইবার জন্য সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন। যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ নরহত্যা ও জগৎসংসারকে উৎসাদন করিতে বিধান দেয়, এরূপ পাষাণ-হৃদয় অসভ্য অরাতিদল কর্ত্তৃক যতপ্রকার কঠোরতম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং শোণিত-মাংসগঠিত মনুষ্যের হৃদয় যে পরিমাণে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ, জগতের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, এই বিশাল মানব-সংসারে একমাত্র রাজস্থানই তাহার আদর্শস্থল। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পাষাণহৃদয় শত্রুগণের ভীষণতম পৈশাচিক অত্যাচারে রাজস্থানের যত জনপদ, যত নগর, যত পল্লী একেবারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে;—যত রাজপুতকুল একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রাজপুতের একমাত্র জাতীয়-জীবন অক্ষুণ্ণ থাকাতেই শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তাহার প্রভাবে স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় তন্মুহূর্ত্তেই আবার উল্লম্ফিত হইয়া উঠিয়াছে? সমস্ত বিঘ্নবিপদ্ ও অত্যাচার শাণশিলার ন্যায় তাঁহাদের সাহসরূপ অস্ত্রকে সহস্রগুণে সুশাণিত করিয়াছেন রোমানদিগের একটিমাত্র আশাতে প্রাচীন ব্রিটনগণ একেবারে কি ঘোরতররূপে অধঃপতিত হইয়াছিল। সেই নিদারুণ দীনদুর্দ্দশা হইতে উত্থিত হইতে এবং রোমানদিগের করাল কবল হইতে আপনাদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও রাজনীতির উদ্ধারসাধন করিতে তাহারা কতই চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সকলই নিরর্থক,—কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। রোমানদিগের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতে তাহারা আবার সক্‌সেনগণ কর্ত্তৃক কঠোরতর দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আবার দীনামারগণ আসিয়া সেই হতভাগ্য ব্রিটনগণের সেই শৃঙ্খলিত দেহকে নূতন শৃঙ্খলে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। আবার সেই সমস্ত জেতা ও বিজিতদলের সংযোগে যে কয়েকটি সঙ্করজাতি সমুদ্ভূত হয়, তাহারা সমরে দুর্দ্ধর্ষ নর্ম্মাণ বীরগণ কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটিমাত্র যুদ্ধে তাহাদের ভাগ্যের মীমাংসা হইয়াছে; তাহারা জন্মভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অথবা নূতন রাজ্য জয় করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা সমুদায় বিলীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর্য্যবীর রাজপুতদিগের তুলনা করিয়া দেখ, কোন অংশেই সেই প্রাচীন ব্রিটনগণ ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। রাজপুতগণ কতবার আপনাদের রাজ্য হইতে একেবারে চিরকালের জন্য বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্ভাগ্যের প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া কতবার দূরদূরান্তরে তাড়িত হইয়াছেন, তথাপি কখন তিলপরিমাণেও আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম ও রীতিনীতি ত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদের যত রাজ্য একবারে রাজপুতের অধিকারসীমায়

মানচিত্র হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বজাতিশত্রুতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতার বিষময় প্রতিফলস্বরূপ গর্ব্বিত রাঠোর, গর্ব্বোন্নত কনোজ এবং গৌরবান্বিত চৌলুক্যের গরীয়সী আনহলবারা আজি বহুকাল বিস্মৃত সামান্য স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র পবিত্র ধর্ম্মের অটল দুর্গস্বরূপ পবিত্র মিবার তাদৃশ শত শত প্রচণ্ড বিপ্লব করিয়াও আত্মরক্ষার বিনিময়ে কখনও আপনার প্রাচীন গৌরবসম্ভ্রম বিক্রয় করে নাই। সেই অতুলনীয় বিপুল পুণ্যের প্রভাবে আজিও তাহা পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রয়োজন-বোধে রাজপুত সমাজের কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যবহারের উল্লেখ করিব।

পূজাবিধি।—সমরবিলাসী রাজপুতদিগের রণধর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অতি অল্পই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, অধিকাংশ হিন্দুগণই শান্তিপ্রিয় ও অহিংসক। কন্দমূলফল ও স্বচ্ছসলিল তাঁহাদের প্রধান ভোজ্য ও পেয়। ধ্যানধারণা, দেবোপাসনা অথবা কোনরূপ শান্তিময় কার্য্যেই তাঁহাদের অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উক্ত প্রকার উপাসনা-বিধির সহিত রণপ্রিয় রাজপুতগণের উপাসনাদির তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। উপাস্য-দেবতার মনস্তুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত তিনি যে ভোজ্য বা পেয় উৎসর্গ করেন, তাহাও শোণিত-মাংসময় জীবদেহ অথবা কেবল শোণিত ও সুরা। নরকপাল তাঁহার খর্পর। এই সকল দ্রব্যে তদীয় উপাস্যদেব হর সন্তুষ্ট থাকেন বলিয়া তিনি তৎসমুদায়কে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে এই প্রকার ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, ভগবান্ ভবানীপতি স্বীয় উপাসকদিগের শত্রুকুলের শোণিত সেই রক্তাক্ত বিকট খর্পরে পান করেন। সেই সমরদেবের মূর্ত্তি ও বেশবিন্যাস অতি বীভৎস। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাবগুণ্ঠিত ও ভুজঙ্গ-বেষ্টিত। নয়নযুগল কুসুম ও ধুস্তুররসসেবনে আরক্ত ও ঘূর্ণ্যমান, তাঁহার অনাবৃত উরুদেশের উপরিভাগে পার্ব্বতী আসীনা এবং হস্তে শোণিতপূর্ণ বিকট নরকপাল। এই ভীষণমূর্ত্তি মহাদেব রাজপুতদিগের রণদেব ও প্রধান উপাস্যদেবতা। ভারতবর্ষের যে প্রতপ্ত মরুপ্রান্তরে আর্য্যবীর রাজপুতগণ বাস করেন, তাহাতে কি এই বীভৎসবেশধারী দেবমূর্ত্তির কল্পনা হইতে পারে? জানি না, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে হঠাৎ ইহাকে রণবীর স্কন্দনভীয়গণের বীরাচারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হয়।

বীরাচারী রাজপুত মৃগ, বরাহ, হংস, ও বন্য কুক্কুটাদি শীকার করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করেন। ঘোটক, সূর্য্য ও তরবারি তাঁহার উপাস্য। ব্রাহ্মণের শান্তিময়ী ধর্ম্মকাহিনী অপেক্ষা ভট্টকবিগীতে তাঁহার ভক্তি অধিকতর অটল। তাহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ। যে দিন—যে শোচনীয় দুর্দ্দিনে সেই ভক্তির বিলোপ হইয়াছে, সেই দিন রাজপুতের প্রকৃত মহিমা মানব-নয়ন হইতে বিদায় লইয়াছে, সেই দিন রাজপুতের তেজস্বিতা ও বীর্য্যবত্তা কবিকল্পনার স্থান অধিকার করিয়াছে। আজি রাজপুত নাম কেবল নামমাত্রেই পর্য্যবসিত রহিয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার।—আর্য্যবীর রাজপুতগণ আপনাদের গৃহলক্ষ্মীদিগের প্রতি যেরূপ শিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রাচীন জর্ম্মন, স্কন্দনভীয় ও জিতগণ আপনাদের রমণীগণের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। এই বিষয়ে এই জাতির পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন বিষয়েই পরিলক্ষিত হয় না।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তা টসিটস বলেন, জর্ম্মনগণ সঙ্কটকালে রমণীর মন্ত্রণা পবিত্র দৈববাণী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কবিবর চাঁদভট্টের অমৃতময় কাব্যগ্রন্থে রাজপুতদিগের

সম্বন্ধে তদনুরূপ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। রমণী রাজপুত ও জর্ম্মনদিগের জীবনের জীবনস্বরূপিণী —হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী। আপনারা জীবিত থাকিতে সেই রমণী যে শত্রু কর্তৃক অপহৃতা হইয়া বন্দিনী ও তাহাদিগের বিলাস-লালসার উপভোগ্য হইবে, এ যন্ত্রণাময়ী কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিতেও রাজপুত ও জর্ম্মনের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইত। যে পবিত্র হৃদয়-মন্দিরে একমাত্র তাঁহাদিগেরই মূর্ত্তি স্থাপিত, তাঁহাদেরই কল্যাণ-কামনা যাঁহার একমাত্র অনুধ্যান, প্রয়োজন হইলে সেই পবিত্র হইতেও পবিত্রতর সুকুমার হৃদয় স্বহস্তে ছেদন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু প্রয়োজন কি সদাসর্ব্বদাই হইত?—না, তাহা আশার চরমকালে—যখন দেখিতেন, সে প্রচণ্ড দেশবৈরীর ভীষণ আক্রমণ হইতে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই; যখন দেখিতেন, সেই হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী রমণীগণের স্বর্গীয় সতীত্বধন শত্রু কর্তৃক অপহৃত হইতে চলিল; সেই ভীষণ সঙ্কটকালে নৈরাশ্যের কঠোর অঙ্কুশতাড়নে উন্মাদিত হইয়া তেজস্বী রাজপুতগণ স্বহস্তে তাঁহাদের হৃৎপিণ্ডচ্ছেদন করিতেন, অথবা তাঁহাদিগকে সজীবনে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিবার জন্য ভয়াবহ "জহর-ব্রতের" উদ্‌যাপন করিতেন। এই হৃদয়-বিদারক লোমহর্ষণ ব্রতানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইয়াছে।

দ্যূত।—কি রাজপুত, কি জর্ম্মন, কি শক সকল প্রকার প্রাচীন জাতিরই দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষ আসক্তির বাহুল্য বিবরণ দেখা যায়। এই অনর্থকারিণী ক্রীড়া হইতে যে কত শত অনিষ্টঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিয়া শুনিয়াও কেন যে তাঁহারা তাহাতে সাগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন, ইহা একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

জর্ম্মনগণ আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি, আপনাদের স্বাধীনতা পর্য্যন্তও পণ রাখিয়া এই অনর্থকরী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং বিজিত হইলে জেতৃকর্তৃক দীনভাবে প্রকাশ্য স্থানে বিক্রীত হইতেন। এই সর্ব্বনাশকরী দ্যূতবিলাসিতায় বিমোহিত হইয়া পাণ্ডবগণ আপনাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি, অবশেষে হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী দ্রৌপদীকেও পণ রাখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের সেই ভয়ঙ্করী দ্যূতাসক্তির জন্য ভারতের যে বিষম অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রদীপ্ত চিহ্ন আজিও কুরুক্ষেত্রের ভীষণ প্রান্তরে সুস্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান রহিয়াছে। সে চিহ্ন—আর্য্যজাতির অধঃপতনের সেই জ্বলন্ত নিদর্শন—ভারতমাতার হৃদয়ে সেই গভীর অস্ত্রলেখার বিশেষ বিবরণ দেখিয়াও আর্য্যবীর রাজপুতগণ সেই অনিষ্টকরী দ্যূতক্রীড়ায় এখনও মহাকৌতূহলের সহিত প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য। অশেষ অনর্থের আকর এই ভীষণ ব্যসনবিধান তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের পংক্তিতে পংক্তিতে স্থান পাইয়াছে। সেই বিধানের অনুসরণে তাঁহারা আজিও প্রতিবৎসর "দেওয়ালি" উৎসব উপলক্ষে ভগবতী কমলার কৃপালাভের অভিলাষে সেই অনর্থকারিণী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

পানাসক্তি।—স্কন্দনভীয় ও জর্ম্মনগণ বিবিধবিধানে বারুণী দেবীর পূজা করেন; আর্য্যবীর রাজপুতও এ বিষয়ে কোন অংশে তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কি সমরবিলাস, কি দেবারাধনা, কি অতিথিসৎকার, সকল বিষয়েই রাজপুতের মদিরাব্যবহারের বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। বাটীতে অতিথি-সমাগম হইবামাত্র গৃহস্বামী সর্ব্বাগ্রে মদিরাপূরিত "মানোয়ার পিয়ালা" করে ধারণ করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। একদা যে ভীষণ শত্রু,—যাহার হৃৎপিণ্ডচ্ছেদন করিবার নিমিত্ত রাজপুতবীরের অসি অনুদিন সমুদ্যত, সে যদ্যপি অতিথিভাবে তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তৎপ্রদত্ত সেই মানোয়ার পিয়ালা হইতে সুরাপান করে, তাহা হইলে

বীরহৃদয় রাজপুত সমস্ত শত্রুতা ভুলিয়া যাইয়া তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। সেই সুরাপূর্ণ পানপাত্রের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে রাজপুত ও স্কন্দনভীয় কবিগণের বীণাতন্ত্রী হইতে অজস্র অমৃতধারা নিঃস্যন্দিত হইত। তাঁহারা সেই সুরাকে পার্থিব সকল প্রকার অমৃতময় পেয় দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। রাজপুত জিৎবীরগণের সুদৃঢ় ধারণা এই যে, তাঁহারা যদ্যপি স্বদেশরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে পতিত হন, তাহা হইলে অনন্ত সুখের নিলয় ত্রিদিবধামে সুরসুন্দরীগণ সুরাপূর্ণ পানপাত্র লইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা মহোৎসাহ সহকারে সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইতেন এবং অস্ত্রশয্যায় শায়িত হইলেও সহাস্য-বদনে বলিতেন, "আমি মানব-জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গের নিত্যসুখালয়ে অমরগণের সহিত সুরামৃত পান করিব।"

নারীবিষয়ক শিষ্টাচার।—অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য। যদি এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতে হয়, যদি স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগ ও শিষ্টব্যবহারের পরিমাণক্রমে জাতীয় সভ্যতার তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে রাজপুতদিগকে সভ্যতার অগ্রনায়ক বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। রমণী রাজপুতহৃদয়ের আরাধ্য দেবতা; সে দেবতার সামান্য মাত্র অবমাননা হইলে, তাহার সম্মানোপযোগী শিষ্টাচারের সামান্য ব্যতিক্রম হইলে তেজস্বী রাজপুতের হৃদয় বিষম রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; যতক্ষণ না সেই অবমানকর্ত্তার হৃদয়শোণিত দ্বারা সেই ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সামান্য বিদ্রূপচ্ছলে এই শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম হইয়াছিল বলিয়া একটি হৃদয়ের বন্ধুও ভীষণ শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। যে রাঠোর ও কুশাবহগণ অনেক দিন ধরিয়া এক অভিন্ন সৌহার্দ্দসূত্রে গ্রথিত ছিলেন, নারীবিষয়ক শিষ্টাচারের বিরোধী বিদ্রূপাত্মক বাক্য হইতেই তাঁহারা পরস্পরের প্রচণ্ড শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে তাঁহাদের উভয়েরই অধঃপতন হইল। যখন তাঁহারা একত্র মিত্রভাবে অবস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহাদিগের একীভূত বল এত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রচণ্ড মহারাষ্ট্রীয়গণ তৎসম্মুখে তৃণের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেই অনর্থকর বিবাদ নিবন্ধন যখন তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ সুযোগ পাইয়া তাঁহাদিগের উভয়কেই পরাভূত করিয়া তাঁহাদিগের ঘোরতর অনিষ্টসাধন করিল। সেই জন্য বলিতেছি, তেজস্বী রাজপুতের পক্ষে রমণীবিষয়ক শিষ্টাচার সামান্য নহে। রমণীসম্বন্ধে অতি সামান্য পরিহাস করাতে মিবারের রাণা লক্ষ রায় জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডের হৃদয়ে যে ভয়ানক অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা অল্পে নির্ব্বাপিত হয় নাই। সে অনল নিবাইতে যাইয়া রাজ্যের একটি চিরন্তন বিধির পরিবর্ত্তন হইল; তাহাতে মিবারের যে ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইল, মোগল বা মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে সেরূপ অনিষ্ট কখন হইতে পারে কি না সন্দেহ।

এই রমণী-বিষয়ক শিষ্টাচারের উপরে কুলধ্বংসকর ভয়াবহ জহরব্রত অধিষ্ঠিত। শত্রুকুলের আক্রমণ হইতে রাজপুত কুলকামিনীগণের সতীত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত এই ভীষণ জহরব্রত অনুষ্ঠিত হইত। দেশবৈরীর আক্রমণ হইতে রাজপুতের স্বদেশ ও স্বাধীনতারক্ষার যখন কোন উপায় না থাকে, যখন তাঁহাদিগের সকল আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেই ভীষণকালে, আপদের সেই অন্তিম অবস্থায় রাজপুতবীরগণ এই হৃদয়স্তম্ভন লোমহর্ষণ কঠোরতম ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হন। দুর্গের অভ্যন্তরে, অন্তঃপুরমধ্যে, ভূগর্ভে একটি বিশাল সুড়ঙ্গ ছিল। তন্মধ্যে

স্তূপীকৃত শালকাষ্ঠ এবং ঘৃত, সর্জ্জরস প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিতা প্রজ্বলিত হইত। রাজপুত-ললনাগণ আরক্তবসন পরিধানপূর্ব্বক আলুলায়িত-কুন্তলে হৃদয়-বিদারক শোকসঙ্গীত সহকারে সেই সকল জ্বলন্ত চিতা সাতবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেন এবং পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষগণের সমক্ষে অম্লানবদনে সেই সকল প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইতেন। এইরূপ এক একটি জহরব্রতে সহস্র সহস্র রাজপুত-নারী জীবনবিসর্জ্জন করিতেন। সেই ভয়াবহ ব্রতের অতি ভয়াবহ অনুষ্ঠানকালে তেজস্বী রাজপুত বীরগণ ধীর, গম্ভীর, অটল, অচল, শত শত লৌহপ্রাকারবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধসংবদ্ধ নয়নে তাহা অবলোকন করিতেন; সম্মুখে স্নেহময়ী জননী, হৃদয়ের প্রীতিদায়িনী সহধর্ম্মিণী ও আনন্দময়ী কন্যা-ভগিনীগণ অনন্তকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়া চক্ষুর উপর জ্বলন্ত পাবকে জীবনবিসর্জ্জন করিতেন, তথাপি তাঁহাদিগের নয়নে একবিন্দুও অশ্রু দেখা যাইত না। শোক-জিঘাংসা-নিদারুণ রোষে তাঁহাদের নয়ন বিশুষ্ক, গভীর আরক্ত, তাহা হইতে যেন বিশ্বদাহকারী অনলশিখা নির্গত হইত। তাঁহাদের যে হৃদয় এককালে সুকুমার প্রেমসুধার আধারস্বরূপ ছিল, তৎকালে তাহা যেন দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত হইত। মহিলাগণ সেই ভীষণ সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিলে উপরিভাগ হইতে ভীষণ শব্দে সেই ভয়াবহ সুড়ঙ্গের বিরাট্ লৌহকবাট রুদ্ধ হইত। অসংখ্য হতভাগিনীর হৃদয়বিদারক করুণ শোকনিনাদ মুহূর্ত্তের জন্য বিলীন হইত। রূপ, যৌবন, লাবণ্য, গৌরব, আত্মত্যাগ সকলই সর্ব্বসংহারক অনলে ভস্মীভূত হইয়া পড়িত।

রাজপুত রমণীগণের সেই ভীষণ আত্মবলির অবসানে রাজপুতবীরগণ বর্ম্মাদি রণসজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক পীত-কৌষেয়-বসন পরিধান করিতেন এবং পরস্পরে বীরা সেবনপূর্ব্বক পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে শত্রুসেনার মধ্যে আপতিত হইতেন। তাহার পর যথাসাধ্য শত্রুসংহার করিয়া সকলেই অনন্তনিদ্রার জন্য বীরশয্যায় শয়ন করিতেন। এই ভয়াবহ জহরব্রতের অনুষ্ঠানে রাজপুতজাতির তেজস্বিতা ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে তেজস্বিতা ও বীর্য্যবত্তা প্রকৃত বীরধর্ম্মের অনুমোদিত নহে; কারণ, তাহার পরিণামফল কালে অতি ভয়াবহ হইয়াছিল এবং তাহাতেই রাজপুতজাতির অধঃপতন হইয়াছে। বীভৎস জহরব্রতের ভীষণ অনুষ্ঠানে চিতোরের বীরবংশ এক একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

সম্পূর্ণ